অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

অষ্টম খণ্ড

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

Achintyakumar Rachanavali (Vol-VIII).
(Collected writings of Achintyakumar Sengupta)
Price : Rs. 30·00

সম্পাদনা

নিরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রকাশক

আনন্দরূপ চক্রবর্তী
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১/এ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

মুদ্রাকর

দুলাল চন্দ্র ভুঞা
সুদীপ প্রিন্টার্স
৪/১-এ সনাতন শীল লেন
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ-শিল্পী :

আনন্দরূপ চক্রবর্তী
শৈলেন শীল
সমরেশ বসু

মূল্য : ত্রিশ টাকা

সূচীপত্র

জীবনী-সাহিত্য :

আলেখ্য-সূচী

জীবনী-সাহিত্য

ধ্যানস্থ দেখে বললুম, ও নরেন্দ্র। একটু
চোখ চাইলে। বুঝলুম ওই একরূপে
সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে।
তখন বললুম, মা, ওকে মায়ায় বদ্ধ কর।
তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়।
বচনবাগীশরা বক্তৃতা করুক। নাম যশ আর
কামিনীকাঞ্চন নিয়ে তারা বিভোর থাক।
আমরা যেন ব্রহ্মলাভের জন্যে—ব্রহ্ম হওয়ার
জন্যে দৃঢ়তর হই।

বিবেকানন্দ

গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে যা, লোকহিত,
জগতের কল্যাণ কর—নিজে নরকে যা,
পরের মুক্তি হোক—আমার মুক্তির বাপ
নির্বংশ। আপনার ভালো কেবল পরের
ভালোয় হয়, আপনার মুক্তি ও ভক্তিও
পরের মুক্তি-ভক্তিতে হয়—তাইতে লেগে
যা, মেতে যা, উন্মাদ হয়ে যা।

বিবেকানন্দ

দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে নিম্নলিখিত পুস্তকাবলীর উপর নির্ভর করেছি :

শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত
শ্রীপ্রমথনাথ বসুকৃত স্বামী বিবেকানন্দ
মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ স্বামীজির জীবনের ঘটনাবলী
সরলাবালা সরকার লিখিত স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ
The Life of Swami Vivekananda (Advaita Ashrama)
The Master as I saw him by Sister Nivedita
স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী
স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকৃত স্বামীশিষ্যসংবাদ

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

ভূমিকা

জন্ম থেকে শুরু করে আমেরিকায় রওনা হওয়া পর্যন্ত প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ড আমেরিকা জয় করে ইংলণ্ডে প্রথম পাড়ি।

'ইংলণ্ড আমরা ধর্মবলে জয় করব, অধিকার করব ধর্মবলে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। সভাসমিতি করে কি এ দুর্দান্ত অসুরের হাত থেকে উদ্ধার করা যাবে? অসুরকে দেবতা করতে হবে। আমার এই এখন মহামন্ত্র, ইংলণ্ড-বিজয়, ইউরোপবিজয়। তাতেই দেশের কল্যাণ। বিস্তারই জীবনের চিহ্ন। আমাদেরও সমস্ত জগৎ জুড়ে আমাদের ধর্মাদর্শগুলি প্রচার করতে হবে।'

সমস্ত জগৎকে বলতে হবে হিন্দুর ঈশ্বর সর্বভূতময়, সর্বভূতের অন্তরাত্মা। মানুষ ছাড়া তিনি কিছু নন। সমত্বদর্শনই হিন্দুর ঈশ্বর-আরাধনা। যে আত্ম-সাদৃশ্যে সর্বত্র সমান দেখে সেই ঈশ্বরে পরমযুক্ত। তাই হিন্দুর বেদান্তই বিশ্বপ্রেমের ভিত্তি। মনুষ্যপ্রীতিই ঈশ্বরভক্তির মূল।

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন পূজিছে ঈশ্বর॥

'ওরে ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে কূর্মাবতারের পূজা চাই, পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম। একে আগে ঠাণ্ডা না করলে তোর ধর্মকর্মের কথা কেউ নেবে না। দেখতে পাচ্ছিস না পেটের চিন্তাতেই ভারত অস্থির। খালি পেটে ধর্ম হয় না, বলতেন না গুরুদেব? ঐ যে গরিবগুলো পশুর মত জীবনযাপন করছে, আমরা আজ চার যুগ ধরে ওদের রক্ত চুষে খেয়েছি আর দু পা দিয়ে দলেছি। এরা না উঠলে দেশ জাগবে না। একটা অঙ্গ পড়ে গেলে অন্য অঙ্গগুলি সবল থাকলেও ঐ দেহ দিয়ে কোনো বড় কাজ হয় না। তোরা সব কী করলি বল দেখি? পরার্থে একটা জন্ম দিয়ে দিতে পারলি না? আর জন্মে এসে বেদান্তফেদান্ত পড়িস—এবার পরসেবায় দেহটা দিয়ে যা।'

বিবেকানন্দের ডাক তাই পরম বিস্তারের ডাক। বিবেকানন্দের গৌরব সত্যের গৌরব, প্রেমের গৌরব, মঙ্গলের গৌরব, কঠিনবীর্য নির্ভীক আত্মোৎসর্গের গৌরব।

অচিন্ত্যকুমার

আঠারোশ তিরানব্বুই সালের একত্রিশে মে জাহাজ ছাড়ল স্বামীজির। তাঁর বয়েস তখন ত্রিশ বছর সাড়ে চার মাস।

দণ্ড কমণ্ডলু আর কোপীন যাঁর একমাত্র সম্বল জাহাজে তাঁকে এক বিস্তীর্ণ লটবহর সামলাতে হচ্ছে, পোশাকের আর বিছানার, ট্রাঙ্ক আর ওয়ার্ডরোববোঝাই যত বিচিত্র আচ্ছাদন। এ সব কি আমার কর্ম! এ সবের তদারক করতে-করতেই কি সমস্ত শক্তি ব্যয় হয়ে যাবে? কিন্তু উপায় নেই, মহাকালের নির্দেশ পালন করতে চলেছি—আর ঠাকুর বলে দিয়েছেন, যখন যেমন তখন তেমন।

অন্তর্জ্যোতির্ময় দীর্ঘদেহ পুরুষ, সিংহের মত বিচরণ করছে। স্বয়ং কাপ্তেন পর্যন্ত আকৃষ্ট না হয়ে পারছে না। নিজের থেকে জুড়ে দিয়েছে গল্প, জাহাজের কলকব্জা এটা-সেটা সব বোঝাচ্ছে সযত্নে আর সবতাতেই স্বামীজির শিক্ষার্থীর মত কৌতূহল। যাত্রীদের সঙ্গেও আলাপ জমে গেছে, আলাপের থেকে অবধারিত বন্ধুত্ব। বিদেশী খাদ্য বিদেশী রীতিপদ্ধতি বিদেশী পরিবেশ, তবু খাপ খাওয়াতে বেগ পেতে হল না। সদাজাগ্রত তীক্ষ্ণ মনের কাছে কোনো সংস্কারই বন্ধন নয়।

সাতদিন পরে কলম্বোতে জাহাজ পৌঁছুল। পুরো একদিন থামবে। স্বামীজি শহর দেখতে বেরুলেন। গাড়ি করে গেলেন প্রসিদ্ধ বুদ্ধমন্দিরে যেখানে বুদ্ধের সুবিশাল মূর্তি—পরিনির্বাণমূর্তি—শুয়ে আছে। তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলেন বুদ্ধকে।

মানুষকেই বড় করেছেন বুদ্ধ, মানুষের মুখকে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন দেবতার দিক থেকে, ফিরিয়ে দিয়েছেন নিজের দিকে, আত্মশক্তির দিকে। মানুষ হীন নয় দৈবাধীন নয়, মানুষ তার উদ্যমে ও অধ্যবসায়ে মহীয়ান।

নিরন্তর চেষ্টা নিরন্তর আগ্রহ—নিরন্তর দাঁড় টেনে যাওয়া। হীনবল হীনসাহস না হওয়া। 'কখনো হীনসাহস হবিনি। খেতে শুতে পরতে, গাইতে বাজাতে, কলরোলে কেবলই সৎসাহসের পরিচয় দিবি। ভাবিব আমি কার সন্তান? তবে কেন আমার এই দুর্বলতা? হীনবুদ্ধি হীনসাহসের মাথায় লাথি মেরে, আমি বীর্যবান, আমি মেধাবান, আমি ব্রহ্মবিৎ—বলতে বলতে দাঁড়িয়ে উঠবি। রামপ্রসাদের গান শুনিসনি? তিনি বলতেন, এ সংসারে ডরি কারে রাজা যার মা মহেশ্বরী। এমনি অভিমান সর্বদা জাগিয়ে রাখতে হবে। তাহলে মনে কখনো দুর্বলতা আসবে না। মহাবীরকে স্মরণ করবি। তাহলেই মহামায়া কৃপা করবেন।'

বনপথ দিয়ে যাচ্ছেন নারদ, কাহিনী বলছেন স্বামীজি, দেখতে পেলেন একাসনে বসে এক যোগী ধ্যান করছে নিশ্চল হয়ে। তার চারদিকে ছোট-বড় বিচিত্র উইয়ের ঢিবি উঠে গেছে। তবু স্থান বদল নেই যোগীর, এমন অনন্যলক্ষ সাধনা। নারদকে দেখতে পেয়ে যোগী জিগগেস করলে, প্রভু কোথায় যাচ্ছেন?

নারদ বললে, বৈকুণ্ঠে যাচ্ছি।

তাহলে দয়া করে নারায়ণকে জিগগেস করবেন, আমার আর মুক্তির দেরি কত? মিনতি নিয়ে বললে সেই যোগী।

কতদূর এগিয়েছেন নারদ, আরেকজনের সঙ্গে দেখা। তার সাধন-ভজন কিছু নেই ধ্যান-সমাধির সে ধার ধারে না। সে শুধু লম্ফ-ঝম্ফ করছে আর গান গাইছে। সে গানেও না আছে সুর না আছে তালমান। কণ্ঠস্বরও বিকৃত-কর্কশ। নারদকে দেখে উল্লসিত হয়ে সে জিগগেস করলে, কোথায় চলেছেন প্রভু ?

বৈকুণ্ঠে।

বাঃ, তাহলে একবার জিগগেস করবেন তো ভগবানকে, আমার মুক্তির আর কতদিন !

বৈকুণ্ঠ থেকে তারপর যখন ফিরছেন নারদ, সেই বল্মীকস্তূপাবৃত যোগীর সঙ্গে ফের দেখা। যোগী জিগগেস করল, আমার কথা বলেছিলেন নারায়ণকে ?

বলেছিলাম।

কি বললেন নারায়ণ ?

বললেন, আরো চার জন্ম লাগবে।

আরো চার জন্ম ? বিলাপ করতে লাগল যোগী। এত যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম এত ক্লেশকৃচ্ছ্র, এত একাগ্রসংযোগ, চারদিকে বল্মীকস্তূপ উঠে গেল, তবু এখনো চার জন্ম বাকি ? যোগী আর্তনাদ করতে লাগল।

আরো কিছুদূর এগিয়ে সেই নাচুনে লোকটার সঙ্গে দেখা।

কি হে দেবর্ষি , আমার কথা জিগগেস করেছিলে ভগবানকে ?

করেছিলাম।

কি বললেন ? আরো কত জন্ম ?

তোমার সামনে এই তেঁতুল গাছ দেখতে পাচ্ছ ?

পাচ্ছি।

এর কত পাতা পারছ গুণতে ?

ওরে বাবা, অসংখ্য অগণন —

ও গাছে যত পাতা, ভগবান বললেন, তোমার তত জন্ম বাকি !

আনন্দে নৃত্য করতে লাগল সেই লোক। বলতে লাগল, এত শিগগির ? এত শিগগির ? এত কম জন্ম ? এত অল্প সময় ?

নারদ বিমূঢ়ের মত রইল তাকিয়ে।

সেই লোকটা বলতে লাগল, তবু আমি যে আমি, আমারো তো একদিন মুক্তি হবে, আমিও একদিন পাব সেই পরমপদ। কি মজা ! হোক লক্ষ জন্ম, হোক কোটি জন্ম, কোটি-কোটি জন্ম, তবু একদিন আমারো তো হবে সেই অধিকার, তাইতেই আমি কৃতার্থ। আমি কিছুতেই নিরুদ্যম নই আমার যাত্রায়, কিছুতেই অবসাদ নেই আমার অধ্যবসায়ে —

বৎস, দৈববাণী হল, এই মুহূর্তেই তুমি মুক্ত। যে উদ্যমশীল যে অধ্যবসায়সম্পন্ন উচ্চতম ফল শুধু তারই প্রাপ্য।

কলম্বো থেকে পেনাঙ, পেনাঙ থেকে সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুরে নামলেন স্বামীজি। গেলেন বোটানিক্যালগার্ডেন দেখতে। কত জাত ও চেহারার পাম-গাছই না এখানে লালিত হচ্ছে। এই সেই রুটিফলের গাছ। মাদ্রাজে যেমন আম অপর্যাপ্ত এখানেও তেমনি ম্যাঙ্গোস্টিন ! ম্যাঙ্গোর সঙ্গে ম্যাঙ্গোস্টিনের কি তুলনা হয় ? আম হচ্ছে অমৃতের নামান্তর।

সিংগাপুর থেকে হংকং। হংকঙেই বিশাল চীনের প্রথম আভাস, এই সেই চীন, স্বপ্ন আর রূপকথার রাজ্য। কে জানে তাদের কর্মচাঞ্চল্যই হয়তো রূপকথা, তাদের কর্মনৈপুণ্যেই বুঝি স্বপ্নের মত। জাহাজ পারে নোঙর করার সংগে সংগেই শয়ে-শয়ে নৌকো এসে হাজির, ডাঙায় নিয়ে যাবে। আর সেই সব নৌকোর মাঝি মেয়ে। নৌকোও অদ্ভুত, দুটো করে হাল। মেয়ে মাঝি একটা হাল হাতে দিয়ে আরেকটা হাল পা দিয়ে চালাচ্ছে এক সংগে, ছন্দের এতটুকুও হেরফের হচ্ছে না। আর সব চেয়ে মজা, তাদের পিঠে একটা করে ছেলে বাঁধা, যার যেটা কনিষ্ঠ। ছেলেগুলোর একটুও ভয় নেই, একটুও কান্নাকাটা করছে না, বরং দিব্যি হাত-পা নাড়ছে, তাকাচ্ছে মিটমিট করে। প্রাণপণ শক্তিতে মা-রা নৌকো চালাচ্ছে, বোঝা সরাচ্ছে, এক নৌকো থেকে আরেক নৌকোয় লাফিয়ে পড়ছে, যে কোনো মুহূর্তে শিশুটার 'টিকিওলা মাথাটা গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে, তাতে মা ও শিশুর কারুরই ভ্রূক্ষেপ নেই। মাঝে মাঝে মা যে তাকে একটু করে ভাতের মণ্ড খেতে দিচ্ছে তাইতেই শিশু মহাপ্রসন্ন। যে মায়ের সংগে যুক্ত হয়ে আছে তার আর ভয় কি, অভাব কি। রাখতে হলেও মা ফেলতে হলেও মা। মায়ের কাছে যদি আঘাত পাই মায়ের কাছেই আবার উপশম পাব।

এই প্রথম উপলব্ধি হল স্বামীজির, চীন কত দরিদ্র, ভারতবর্ষেরই মত। সভ্যতার যারা ভিত্তি তারা যে সোপান ধরে উঠতে পারছে না উচ্চচূড়ে তার কারণই হচ্ছে দারিদ্র্য, সবচেয়ে যা কঠিন শৃঙ্খল। নিত্য অভাব ও দারিদ্র্যের তাড়নায় যারা উদ্‌ভ্রান্ত তাদের অন্য চিন্তা করবার সময় কোথায়? পেটে যার ভাত নেই মাথায় তার কি থাকবে?

হংকং থেকে ক্যান্টন। শুনলেন এখানে অনেক চীনে মঠ আছে, একটা কোথাও দেখে আসি। খোঁজ নিয়ে জানলেন বিদেশীদের সেই মঠে ঢোকবার অধিকার নেই। অধিকার নেই? স্বামীজির রোক চাপল। কি হয় যদি বিদেশী কেউ ঢোকে? স্বামীজির দোভাষী বললে, খুন করে ফেলে। চলোই না দেখি না, কেমন খুন করে। যারা মঠবাসী তারা বুদ্ধাশ্রয়ী আর তারা নিশ্চয়ই জানে বুদ্ধের জন্ম হিন্দুর দেশ, ভারতবর্ষে। যদি তাদেরকে জানানো হয় তিনি সেই ভারতবর্ষের একজন হিন্দু সাধু তবে নিশ্চয়ই তারা ছেড়ে দেবে দরজা, আমাকে মনে করবে তাদের সহোদর-সগোত্র। দোভাষী তবু দ্বিধা করতে লাগল। স্বামীজি বললেন, 'আগেই পালাই কেন, দেখি না তাদের কেমন অভ্যর্থনা।'

কেমন অভ্যর্থনা? ফটকের কাছে যেতেই চার-চারজন মঠবাসী হাতে গদা নিয়ে মার-মার শব্দে তেড়ে এল।

ঐ, ঐ দেখুন। ভীতব্যস্ত দোভাষী পালাবার জন্যে ফিরে দাঁড়াল।

তার হাত চেপে ধরলেন স্বামীজি। বললেন, 'পালাতে চাও পালাবে, আমি একাই মরব, কিন্তু যাবার আগে বলে যাও চীনে ভাষায় ভারতবর্ষের যোগীকে কি বলে?'

অস্ফুটস্বরে সেই প্রতিশব্দটা উচ্চারণ করে দোভাষী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল।

দূর হতে শঙ্খের ধ্বনির মত ঘোষণা করলেন স্বামীজি, আমি যোগী, আমি ভারতবর্ষের যোগী।

সাপের ফণায় ধুলো পড়ল। যে হাত প্রহারে উদ্যত ছিল তা প্রণামে অবনত হল। আপনি যোগী? আসুন আসুন আমাদের মঠে। আমাদের ধন্য করুন।

মুহূর্তে ইন্দ্রজাল ঘটে গেল দেখে দোভাষী এগুলো ধীরে ধীরে। বিচিত্রশব্দে লোকগুলো কোলাহল করতে লাগল। একবর্ণ বোঝেন স্বামীজির সাধ্য কি। শুধু

একটা কথা তাঁর হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে। সে কথাটা হচ্ছে 'কবচ', আর তাদের হাতের ভঙ্গি থেকে অনুমান করতে পারছেন, হিন্দু যোগীর কাছে তারা কবচ চাইছে। দোভাষীকে জিগগেস করলেন স্বামীজি, 'কবচ কথাটার কি মানে ? কি চাইছে ওরা ?'

'ওরা কবচই চাইছে, মন্ত্রপূত কবচ, যাতে করে ওরা ভূতপ্রেত বা অশুভ আত্মার থেকে রক্ষা করতে পারে নিজেদের। আর কিছু নয়, আপনার কাছ থেকেই ওরা ত্রাণ চায় আশ্রয় চায়।'

এই কথা ? স্বামীজি পকেট থেকে শাদা কাগজ বের করলেন ও তাকে ভাঁজ করে করে টুকরো-টুকরো করলেন ও প্রতিটি টুকরোতে সংস্কৃত অক্ষরে লিখলেন, ওঁ, তত্ত্বাতীত সত্যের যা ঘনীভূত মন্ত্র। প্রত্যেককে দিলেন একটি টুকরো। প্রত্যেকে শ্রদ্ধানত মাথায় তা গ্রহণ করল। প্রণাম করল স্বামীজিকে, মঠের মধ্যে নিয়ে চলল। মঠের মধ্যে অগণিত সংস্কৃত পুঁথি, আর কি আশ্চর্য, সেই সব সংস্কৃত বাংলা অক্ষরে লেখা। বৌদ্ধদের যে দারুময় মূর্তি সাজানো আছে, সব যেন বাঙালির মুখ। কত বাঙালি ভিক্ষু না এসেছিল চীনে বুদ্ধের অনির্বাণ নির্বাণবাণীর দীপ নিয়ে। তারা আজও জ্বলছে, আজও জাগছে স্বামীজির চোখে। স্বামীজিকে প্রসন্ননেত্রে আশীর্বাদ করছে।

ক্যাণ্টন থেকে আবার হংকঙে ফিরলেন স্বামীজি, হংকং থেকে জাপানের অভিমুখে।

প্রথমে নাগাসাকি। নাগাসাকি থেকে কোবে। কোবেতে জাহাজ ছেড়ে দিয়ে ট্রেন নিলেন, উদ্দেশ্য শুধু বন্দর নয় মধ্যবর্তী প্রদেশটাও একটু দেখি। ওসাকা, কিয়োটো আর টোকিয়ো ঘুরলেন। সমস্ত দেশ শিল্পে-বাণিজ্যে যন্ত্রে-অস্ত্রে চিত্রে-স্থাপত্যে জেগে উঠেছে, মেতে উঠেছে। বড়-বড় পা ফেলে সঙ্গ ধরেছে পশ্চিমের। কিসে দেশের সর্বাঙ্গীণ হিত হবে, সভ্যতার আবাস থেকে দারিদ্র্য নির্বাসিত হবে সমস্ত জাতি এই এক লক্ষ্যে প্রেরিত। ধর্মেও পিছিয়ে নেই। আর আশ্চর্য, মন্দিরের গায়ে সংস্কৃত মন্ত্র বাংলা হরফে লেখা !

যা কিছু সৎ আর মহৎ, জাপানীদের কাছে, ভারতবর্ষই তার স্বপ্নরাজ্য !

কি করছ তোমরা ? ইয়াকোহামায় এসে তার মাদ্রাজী শিষ্যদের লিখছেন স্বামীজি : সারাজীবন কেবল বাজে বকছ। এস একবার এদের দেখে যাও, তারপর গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও। ভারতবর্ষের যেন ভীমরতি ধরেছে। দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাত যায় ! হাজার বছরের কুসংস্কারের বোঝা কাঁধে নিয়ে বসে আছ, শুধু খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করে শক্তিক্ষয় করছ। পুরোতগুলির আহাম্মকির আবর্তে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছ। শত শত যুগের অবিরাম অত্যাচারে তোমাদের ভিতরের মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। তোমরা কী বলো দেখি।

এস, মানুষ হও। আরো লিখছেন বিবেকানন্দ : তোমরা কি দেশকে ভালোবাসো ? দেশের মানুষকে ভালোবাসো ? তা হলে দুষ্টু পুরোতগুলোকে আগে দূর করে দাও। যাতে আমাদের দেশের উন্নতি হয় তার জন্য লাগো প্রাণপণে। পিছনে চেয়ো না, কাঁদুক প্রিয়জন ; শুধু সামনের দিকে তাকাও, সামনের দিকে এগোও, হোক পথ চড়াই, হোক গন্তব্যস্থল দূরদুরান্তে। সামনে বাড়ো। ভারতমাতা অন্তত সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয়। কে আছ ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন দেবে, নিরক্ষরদের মাঝে শিক্ষা বিস্তার করবে আর যারা পূর্বপুরুষদের অত্যাচারে পশুর পদবীতে নেমে

এসেছে তাদের মানুষ করবার ব্রত নেবে! ধীর স্তব্ধ অথচ দৃঢ়—এই তিনমন্ত্র সার করে কাজ করো। মনে রাখবে নাম যশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

ইয়াকোহামা থেকে জাহাজ ছাড়ল। থামল ভ্যানকুভার। কানাডার কাছে প্রশান্ত মহাসাগরে—বৃটিশ কলাম্বিয়া নামে যে দ্বীপ আছে তারই রাজধানী। এখান থেকেই যেতে হবে শিকাগো, ট্রেনে করে, কানাডার ভিতর দিয়ে। হাড়ে-দাঁত-বসানো শীত। সমস্ত জাহাজ প্রায় কাঁপতে-কাঁপতে এসেছেন। জামাকাপড় মন্দ ছিল না কিন্তু এই তীক্ষ্মদংষ্ট্র শীতের কাছে যৎসামান্য। কেউ অনুমানও করতে পারেনি জুন-জুলাই মাসেই এমনি বরফ-গলা ঠাণ্ডা পড়বে।

একটানা ট্রেনে তিন দিনের দিন শিকাগোতে এসে নামলেন স্বামীজি। পথভ্রষ্ট শিশু যেমন করে তাকায় তেমনি করে তাকাতে লাগলেন চার দিকে। কোন্ দিকে যাবেন, কোথায় উঠবেন, কি করে বা সামলাবেন এ সব মালপত্র! তখন শিকাগোতে ওয়ার্লডস ফেয়ার বা বিশ্বমেলা বসেছে, তাই শহরে বিস্তর লোকের আমদানি। তাদের চোখের সামনে স্বামীজি এক কিমাকার-কিম্ভূত! গায়ে আলখাল্লা মাথায় পাগড়ি, এ কি কোনো সার্কাসের ক্লাউন না সাপুড়ে-বাজীকর! রাস্তার ছোঁড়াগুলো পিছনে লাগল, হাততালি দিতে লাগল, কেউ কেউ বা কাটতে লাগল টিটকিরি। যেন অজানা দেশের পথভোলা এক পাগল এসে উপস্থিত হয়েছে। একে শীত তায় অনাহার তার এ উৎপাত।

'একটা হোটেলে নিয়ে যেতে পারো?' পথের একটা মুটেকে জিগগেস করলেন স্বামীজি: 'হ্যাঁ, যে কোনো হোটেল, যেটা সব চেয়ে কাছে?'

কত ভাড়া দেবেন? ভাড়ার হার আমি কি কিছু জানি? যা ন্যায্য তাই দেব অনায়াসে। ন্যায্য? যা চার আনা তাই মুটেদের ন্যায়ে চার টাকায় দাঁড়াল। লুব্ধের ন্যায় আর ক্ষুব্ধের ন্যায় কি এক? সমস্ত রাস্তা একটা মূর্তিমান তামাসা হয়ে, আশে-পাশের লোকজনের প্রচুর হাসি-আমোদ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের খোরাক জুগিয়ে অবশেষে পৌঁছুলেন এক হোটেলে। রিক্ত বিধ্বস্ত বিলীনস্বপ্ন। থাকতে দেবে এখানে? দেব। কিন্তু টাকা দিতে পারবে তো?

দেখি যত দিন পারি। একটা চুরুটের দাম আট আনা। আমেরিকায় টাকা তো নয় খোলামকুচি। এক কণা মাটি রাখেনি যেখান থেকে সোনা না উৎপন্ন হয়। যেমন বিস্তীর্ণ দেশ তেমনি অফুরন্ত প্রাণশক্তি। তুমিও দাও মাটিও দেবে। তুমিও ঢালো মাটিও অঢেল হবে। এত প্রাচুর্য যে একটা কুলির দিনে অন্তত দশটাকা রোজগার।

নোটে-নগদে একশো উনাশি পাউণ্ড ছিল স্বামীজির কাছে, এরই মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ পাউণ্ড বেরিয়ে গেছে। হোটেলেই এক পাউণ্ড করে দৈনিক খরচ। তারপর যে পারছে ঠকিয়ে নিচ্ছে দুহাতে। এরকম ভাবে চললে কদিন পরেই তো ফতুর। তারপর কি আমি ভিক্ষায় বেরুব? আমেরিকায় ভিক্ষুক নেই, ভিক্ষেয় বেরুলে সটান শ্রীঘর। বিদেশে এসে কি শেষে জেলে যেতে হবে?

অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন স্বামীজি। তারপর খবর নিয়ে জানলেন শিকাগোর ধর্মসভা আরম্ভ হতে এখনো ঢের দেরি। এখন জুলাইয়ের মাঝামাঝি, সভা বসবে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। এত আগে না এলেও চলত। তা ছাড়া, বক্তৃতা যে দিতে চাও তোমার ডেলিগেটের টিকিট কই? ডেলিগেটের টিকিটই বা কি যাকে-তাকে দেওয়া যায়? তার জন্যে উপযুক্ত সার্টিফিকেট চাই। তা তোমার আছে? আর থাকলেই বা কি।

সে টিকিট দেবার দিনও শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন আর উপায় নেই, স্বস্থানে প্রস্থান করো।

যারা তাঁকে পাঠিয়েছে, ভেবে-চিন্তে নিয়মশৃঙ্খলার রাস্তা ধরে পাঠায় নি। ভেবেছে স্বামী বিবেকানন্দ একবার গিয়ে দাঁড়ালেই সভার রুদ্ধদ্বার খুলে যাবে, সে সভা যতই মদমত্ত হোক আর সে দরজা হোক যতই উদ্ধত-উত্তুঙ্গ। কিন্তু আইনকানুনের যে কত বায়নাক্কা তা কারু জানা ছিল না। নিজেও সাংসারিক রীতি-নীতির ধার ধারেননি স্বামীজি, তিনিও এসব বিষয় দেখেননি তলিয়ে। কিন্তু এখন দেখলেন অনেক লাল ফিতের জটিলতা, অনেক পত্র-পত্রিকার জঞ্জাল।

তবে আর কি। ঘরের ছেলে আবার বিবরে ফিরে যাই। কিন্তু আমি যে এখানে এসেছি এ আমি আমার নিজের ইচ্ছায় এসেছি? আর কেউ কি আমাকে নিয়ে আসেনি হাত ধরে? আমি নিজে পথ দেখতে পাচ্ছি না বলে আর কেউ কি আমাকে দেখছেন না? আমিও তবে দেখে যাব শেষ পর্যন্ত।

৪৬

কপূরতলার রাজা এসেছেন শিকাগোতে। তাঁকে কেষ্টবিষ্টু ঠাউরে শিকাগোর সমাজ খুব মাতামাতি সুরু করেছে। তিনিও এমন একখানা ভাব করে আছেন যেন হিমালয় থেকে নেমে এসেছেন। দেদার টাকা ওড়াচ্ছেন ফুর্তিতে। বইয়ে দিয়েছেন বিলাসের বন্যা।

ওয়ার্ল্ডস ফেয়ারে গিয়েছেন একদিন, স্বামীজির সঙ্গে দেখা। কে কোথাকার পথের ফকির, মুখ ফিরিয়ে নিলেন রাগে, কথাও কইলেন না।

ধুতি-পরা এক মারাঠী ব্রাহ্মণ, মাথায় পাগলামির ছিট, হাতের নখে কাগজে ছবি এঁকে বিক্রি করছে সেই মেলায়। রাজার অহঙ্কার দেখে সে বেজায় খেপে গিয়েছে। খবরের কাগজের রিপোর্টার ঘুরছে চারদিকে, তাদের কয়েকজনকে জড়ো করে সেই পাগল রাজার নামে কেচ্ছা কাটতে লাগল। নানারকম মুখরোচক কাহিনী, শুনলেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। রিপোর্টারদের লোভ হল এই সব কাহিনীর কিছু পাঠকসমাজে পরিবেশন করি। লুফে নেবে সংবাদ-ক্ষুধাতুরের দল। কিন্তু এই পাগলাটে লোকটাকে এ সব কাহিনীর স্রষ্টা বলে প্রচার করলে সত্যের মত শোনাবে না। ঐ কে একজন এসেছে না ভারতবর্ষ থেকে, রাজার স্বদেশ থেকে? সৌম্যদর্শন, অনেক জ্ঞানের কথা বলে, ইংরেজী-জানা শিক্ষিত—স্বামীজিকেই নির্দিষ্ট করল সকলে—ওঁরই নামে চালিয়ে দেওয়া যাক। এ হলেই লোকে নেবে, সত্যের গন্ধ শুঁকে শুঁকে পড়বে কৌতূহলে।

হলও তাই। খবরের কাগজের দুই স্তম্ভ বোঝাই বেরুল রাজার কুকীর্তির গল্প। এ সব কার বলা? আজেবাজে লোক নয়, ভারতবাসী এক বিখ্যাত পণ্ডিত, দূরস্থ নয় ইহাগত, নাম বিবেকানন্দ। কর্পূরতলাকে নামাবার জন্যে স্বামীজিকে এরা স্বর্গে তুলল, আবার যখন দরকার হবে স্বামীজিকে করা যাবে কুপোকাৎ। সে পাগল মারাঠি যা যা বলেছিল সব এনে বসাল স্বামীজির মুখে, স্থানে অস্থানে একটু বা রং চড়িয়ে। ফলে কর্পূরতলার খ্যাতি উড়ে গেল কর্পূরের মত। আর কে সেই পণ্ডিত? হোটেলে ভিড় বাড়তে লাগল রিপোর্টারদের।

আমাকে দিয়েই আমার এক স্বদেশবাসীর অপযশ করানো হল? একেই বলে সংবাদপত্রের সত্য। স্বামীজি প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু কে তা কানে তোলে? যা হয়ে গেছে বেশ হয়েছে, এখন তোমার নিজের কথা বলো। মনে হয় তোমার ভিতরে আছে অনেক খবরের খাবার। উপবাসী দেশকে তাই এখন আমরা বিতরণ করি।

সম্প্রতি অর্থাভাবে ক্লিষ্ট হচ্ছি এই আমার একমাত্র খবর। এ তো আর রিপোর্টারদের বলা যায় না। এমন বন্ধু নেই যার সঙ্গেও বা এ ব্যাপারে অন্তরঙ্গ হওয়া যায়, সুতরাং মাদ্রাজী বন্ধুদেরই ফের চিঠি লেখা যাক টাকা চেয়ে।

'যদি আমার এখানে থাকবার জন্যে টাকা না যোগাড় করতে পারো অন্তত যাতে দেশে ফিরে যেতে পারি তার রাহা-খরচটা পাঠিও। ধর্মসভা শুরু হতে এখনো ঢের দেরি, তা ছাড়া আমি ডেলিগেটের টিকিট পাইনি, আমার প্রবেশের অধিকার নেই। যে যেখান থেকে পারছে নানারকম ধোঁকা দিয়ে আমার থেকে টাকাপয়সা লুট করে নিচ্ছে। একটা কেবল যে করব সাহস পাই না। প্রতি শব্দের দাম চার টাকা।'

বারোদিন কাটলো শিকাগোয়—এ তো অনর্থক কালক্ষেপ। যদি অপেক্ষাই করতে হয় একটা সস্তার জায়গা দেখা ভালো। কিন্তু কোথায় যাই? নিজে সস্তা হব না অথচ জায়গা সস্তা হবে এমন জায়গা কোথায়? কেউ-কেউ বোস্টনের নাম করলে। আর দেরি নয়, বোস্টনের ট্রেন ধরলেন স্বামীজি।

শিকাগোর থিয়োসফিস্টরা খাপ্পা ছিল স্বামীজির উপরে। স্বামীজির দুর্দশা দেখে তাদের বড় আহ্লাদ। পালিয়ে যাচ্ছে শুনে আরো। তাদের একজন লিখল: শয়তানটা শিগগির মারা যাবে। ঈশ্বরের দয়ায় বাঁচবে সকলে।

'যদি কেউ তোমার গলা কাটতে আসে', লিখছেন স্বামীজি: 'তাকে না বোলো না। কারণ তুমি নিজেই নিজের গলা কাটছ। কোনো গরিবের কিছু যদি উপকার করো তাহলে বিন্দুমাত্র অহংকৃত হয়ো না। তা তোমার পক্ষে উপাসনা মাত্র। তাতে অহঙ্কারের কিছুই নেই। সমুদয় জগৎই কি তুমি নও? এমন কোথায় কি জিনিস আছে যা তুমি-ছাড়া? তুমিই জগতের আত্মা। তুমিই সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র। সমুদয় জগৎই তুমি। তুমি কাকে ঘৃণা করবে, কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করবে? শুধু জেনে রাখো তিনিই তুমি। আর সমুদয় জীবন ঐ ছাঁচে গড়ে তোলো। যে এই তত্ত্ব জেনে জীবনকে সেইভাবে গড়ে তোলে সে আর কখনো অন্ধকারে ভ্রমণ করে না।'

রণে কিছুতেই ভঙ্গ দেবেন না স্বামীজি। দেখে যাবেন শেষ পর্যন্ত।

'এখন অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করছি।' লিখছেন স্বামীজি: 'বারে বারে মনে হচ্ছিল এদেশ ছেড়ে চলে যাই। কিন্তু আবার মনে হচ্ছিল আমি একগুঁয়ে দানা, এত সহজেই হেরে যাব? আমি কি ঈশ্বরের কাছ থেকে আদেশ পাই নি? আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু তিনি তো সব দেখছেন। তাঁর চিরজাগ্রত চক্ষু তো এক মুহূর্তের জন্যেও অস্ত যাচ্ছে না। তবে আর ভয় কি, মরি-বাঁচি, আমার উদ্দেশ্য যেন না টলে।'

শোনা গেল বোস্টনে খরচ কম, সুতরাং বোস্টনের দিকেই যাত্রা করলেন স্বামীজি। আর সেই ট্রেনে মিস কেট স্যানবর্ণের সঙ্গে দেখা। বৃদ্ধ ভদ্রমহিলা, অনিমেষ তাকিয়ে রইলেন স্বামীজির দিকে। এ কে প্রদীপ্ত-পুরুষ। আকাশের স্বর্ণসূর্য যেন নেমে এসেছে মাটিতে। আলাপ শুরু করলেন মহিলা।

'কতদূর যাবে ?'

'বোস্টন।' বললেন স্বামীজি।

'উঠবে কোথায় ?'

'জানি না। শুনেছি বোস্টন সস্তার জায়গা, দেখি কোনো একটা সাদাসিদে হোটেল পাই কিনা।'

'আচ্ছা, তুমি তো ভারতীয় সন্ন্যাসী—তাই না ?'

সায় দিলেন স্বামীজি।

'আমেরিকায় এসেছ কেন ?' কৌতূহলে একাগ্র মিস স্যানবর্ণ।

'বেদান্ত প্রচার করতে। আসল উদ্দেশ্য ছিল শিকাগোতে ধর্মসভায় যোগ দেব, কিন্তু সভা আরম্ভ হতে এখনো আরো প্রায় তিন সপ্তাহ বাকি। এতটা সময় শিকাগোতে থাকি আমার এমন রসদ নেই। তাই চলেছি সস্তার জায়গার উদ্দেশে।'

'তুমি আমার ওখানে যাবে ? আমার অতিথি হবে ?' মিস স্যানবর্ণ আগ্রহে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।

অবন্ধু বিদেশে এ কার স্নেহস্বর ! এ কার হাত বাড়ানো !

'তুমি থাকো কোথায় ?' কৃতজ্ঞ চোখে মহিলার করুণামাখানো নীল চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে রইলেন স্বামীজি।

'বোস্টনের কাছে এক গ্রামে মাসাচুসেটস-এ আমি থাকি।' বললেন মিস স্যানবর্ণ : 'আমার কুটিরের নাম 'ব্রীজি মেডোজ'—হাওয়াখাওয়া মাঠ। বাড়ির চারদিকে পাইন আর রুপোলি বার্চ, দেওয়ালবাওয়া আঙুরের লতা। পদ্মফুলে ভরা দিঘি, আর কাছেই দুটো ঝর্ণা, তাদের ধারে ধারে ফরগেট-মি-নট ফুটে আছে। যাবে তুমি ?'

'যাব।'

মিস স্যানবর্ণের বেশ সচ্ছল অবস্থা, প্রসন্ন আতিথেয়তায় গ্রহণ করলেন স্বামীজিকে। রোজ এক পাউন্ড করে খরচ বেঁচে যেতে লাগল স্বামীজির। কিন্তু স্যানবর্ণের লাভ কি ? বন্ধুমহলে একটি ভারতীয় কিউরিয়ো দেখিয়ে প্রতিপত্তি বাড়াচ্ছেন। দেখ দেখ কি অদ্ভুত পোশাক। মাথায় একটা কাপড়ের স্তূপ তারপরে আবার একটা পুচ্ছ ঝুলেছে। আর গায়ে এই লম্বা ঢিলে বালিশের গড় দেখেছ, একটা গোটা মানুষই আস্ত খোলের মধ্যে ! যে দেখে সেই হাঁ করে থাকে। রাস্তায় বেরুলেই টিটকিরি দেয়। উপায় নেই, এ যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে মুখ বুজে। সমস্ত উদ্ধত বিরুদ্ধতাকে বিগলিত করব, সমস্ত বিদ্রূপকে নিয়ে যাব অমিশ্র স্তুতিতে—তবেই তো আমি বিবেকানন্দ।

একদিন দু ঘোড়ার গাড়িতে করে মিস স্যানবর্ণ স্বামীজিকে নিয়ে বেরুলেন রাস্তায়। সাধককে কে চিনতে পারবে, ভাবল ভারতের কোনো রাজারাজড়া চলেছেন বেড়াতে। খবরের কাগজে বেরুল ভারতবর্ষের এক রাজা এসেছে স্যানবর্ণের কুটিরে। তার যেমন রূপ তেমন শোভা। সর্বোপরি তার বিচিত্র বেশ।

শুধু পোশাক দেখবার জন্যেই কাতার দিয়ে লোক দাঁড়ায় রাস্তায়। স্বামীজি ঠিক করলেন, সাধারণ চালচলনে চলবেন। গেরুয়া, কালো লম্বা একটা কোট তৈরি করে নিতে হবে। যদি সভায় গিয়ে দাঁড়াতে হয় বক্তৃতা দিতে তখন পরব আমার রাজবেশ—আলখাল্লা আর পাগড়ি। এই এখানকার মেয়েদের পরামর্শ। আর পোশাকব্যাপারে মেয়েরাই সর্বময়ী কর্ত্রী এখানে। কিন্তু চলনসই একটা পোশাক করতে তিনশো টাকা খরচ। হাতে মোটে

ষাট পাউন্ড অবশিষ্ট। যা থাকে অদৃষ্টে, বোস্টনে গিয়ে পোশাকের অর্ডার দিলেন স্বামীজি। কিছু টাকা পাঠাবার কথা লিখলেন আলাসিঙ্গাকে।

'যদি নাও পারো, আমি ছাড়ব না, আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে দেখব। আমি যদি এখানে রোগে শীতে বা অনাহারে মরে যাই, তোমরা আছ, তোমরাই এই ব্রত নিয়ে উঠে পড়ে লাগবে। কি ব্রত? শুধু পবিত্রতা সরলতা আর বিশ্বাস। অগ্নিময় বিশ্বাস। রোম একদিনে নির্মিত হয়নি। প্রভু আমাদের নেতা, জয় দাও প্রভুর। আমরা জ্যোতির তনয়, জয় দাও জ্যোতির্ময়ের। তুচ্ছ জীবন তুচ্ছ মরণ তুচ্ছ ক্ষুধা তুচ্ছ শীত। শুধু অগ্রসর হও। কে পড়ল চেয়ে দেখো না। একজন পড়বে তো আরেকজন তার জায়গা নেবে। বন্ধ হবে না অগ্রগতি।'

রমাবাঈ হিন্দু মেয়ে, খৃষ্টান হয়েছে। আমেরিকায় ঘুরে ঘুরে মেয়েদের ক্লাব খুলছে। হিন্দু বালিকাবিধবাদের অবর্ণনীয় দুর্দশা, তারই প্রতিকারের জন্যে ঐসব ক্লাবের সাহায্যে চাঁদা তুলছে অজস্র। দুর্দশা, তাতে সন্দেহ কি। তাই বলে, ধর্মান্তর গ্রহণ করেছ বলে দেশের বিধবাদের তুমি হেনস্তা করবে? যা নয় তাই বলে দেখাবে। বোস্টনে একটা রমাবাঈ-সার্কাল ছিল, স্বামীজি সেখানে বক্তৃতা দিতে গেলেন। আমেরিকায় সেই তাঁর প্রথম বক্তৃতা। বিষয়, ভারতীয় নারী—তথা বালবিধবা। আমেরিকায় মেয়েরা যারা শুনতে এসেছিল তারা থমকে গেল। ভারতে নারীত্ব স্ত্রীত্ব নয়—ভারতে নারীত্ব মাতৃত্ব। এমন সব শুভ্র পবিত্র উজ্জ্বল কথা বললেন স্বামীজি যা রমাবাঈ বলেনি। এমন ছবি তুলে ধরলেন যা কলঙ্কের ঊর্ধ্বে চন্দ্রিকার মত।

তারপর একদিন মিস স্যানবর্ণ স্বামীজিকে নিয়ে গেলেন শেরবর্ণ মহিলা জেলখানায়। মাথায় হলদে পাগড়ি গায়ে জ্বলন্ত গেরুয়া, বিষাদধূসর বন্দীশালায় সর্বকাল-প্রসাদ বিবস্বান সূর্যের মত আবির্ভূত হলেন স্বামীজি। সর্ববন্ধনবিমোচন ও সর্বব্যাধিনির্মুক্তির আশ্বাস নিয়ে কয়েদীর দল বহুমঙ্গল সন্ন্যাসীকে দেখে উল্লাস করে উঠল। তিনি যেন রুগ্নের আরোগ্য—দরিদ্রের বৃহৎনিধি। সেখানেও ভারতীয় নারীর জীবনযাত্রা নিয়ে বক্তৃতা করলেন স্বামীজি।

দণ্ড যে প্রতিশোধের জন্যে নয় সংশোধনের জন্যে এই নতুন তত্ত্ব দেখলেন এই জেলখানায়। যারা পাপী আর পতিত তাদেরকে ঠেলে ফেলে দেবার জন্যে নয় তাদের টেনে তুলে নেবার জন্যেই এই আশ্চর্য কর্মমন্দির। তারা যে পশু নয় ক্রীতদাস নয় গৃহহীন ভিক্ষুক নয় এই বিশ্বাসে তারা বলীয়ান।

'যখন ভারতবর্ষের দরিদ্র ও পতিতের কথা ভাবি', লিখছেন স্বামীজি, 'তখন ব্যথায় বুক বিদীর্ণ হয়ে যায়। তাদের দাঁড়াবার জায়গা নেই, ওঠবার উপায় নেই, রাস্তা নেই পালাবার। তারা ডুবে যাচ্ছে দিন দিন। তারাও যে মানুষ এ কথাটাই তাদের কাছ থেকে গোপন রাখা হচ্ছে প্রাণপণে। হিন্দুধর্মের দোষ কি। হিন্দুধর্ম তো শেখাচ্ছে যেখানে যত প্রাণী সবাই তোমার আত্মার প্রতিরূপ মাত্র। দোষ ধর্মের নয়, দোষ হৃদয়ের অভাব। প্রভু এসেছিলেন বুদ্ধ হয়ে, গরিবের জন্যে দুঃখীর জন্যে পাপীর জন্যে কত কেঁদে গেলেন, কত শেখালেন কাঁদতে, কেউ তাঁর কথায় কান দিলে না। কিন্তু নিরাশ হয়ো না। প্রভু আবার আমাদের ডেকেছেন, কোমর বাঁধো, সমুচ্চ পতাকা তুলে নাও দৃঢ়করে।'

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক সাহিত্যের ডক্টর, অধ্যাপক জন হেনরি রাইট শুনতে

পেয়েছেন স্বামীজির কথা। স্যানবর্নদের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠতা অনেক দিনের, মিস কেটই পরিচয় করিয়ে দিলেন। কিন্তু কী বৃহত্তেজা ব্যক্তিত্ব স্বামীজির, কথা কিছুতেই শেষ হতে চায় না। রাইট ভাবলেন একদিন তাঁর নিজের বাড়িতে স্বামীজিকে নিয়ে গেলে কেমন হয়।

যে কাছে এসে দেখে, কথা কয়, সেই জয় গায়। কেট স্যানবর্নের খুড়তুতো ভাই ফ্র্যাঙ্কলিন বেঞ্জামিন - তারও কানে উঠেছে এই অদ্ভুতদর্শন হিন্দু সাধুর কথা। বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিতে চাইছিল কিন্তু কাছে বসে কথা কইতে এসেই মজে গেল। যে সে লোক নয় ফ্র্যাঙ্কলিন, সংবাদপত্রী, দার্শনিক, সমাজসেবক। ধরে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে, বোস্টনে।

রাইট এসেছেন বোস্টনে, স্বামীজির খোঁজে। কোথাও দুজনে বেরিয়ে গিয়েছে হয়তো, ধরতে পেলেন না। চিঠি লিখে রেখে গেলেন - স্বামীজি, যদি দয়া করে আসেন আমার ওখানে, সমুদ্রের ধারে অ্যানিসকোয়াম গ্রামে, যদি আমাদের সংগে কাটান একটা উইক-এণ্ড।

এক শুক্রবার এসে হাজির হলেন স্বামীজি। গৈরিকের সৈনিক, দিব্যদীপ্তিতে সহস্রাংশু। যেন স্বপ্নের মূর্তিতে জাগ্রত সত্য এসে দাঁড়ালেন। সমস্ত গাঁ-শহর আলো হয়ে গেল। হুল্লোড় পড়ে গেল চারদিকে। বাড়ি-ঘর-হোটেল-দোকান ভেঙে পড়ল দলে দলে। ত্রিশ বছরের যুবক, দেখ কি মহিমা তার আকৃতিতে। দেখ কি গৌরবে বহন করছে তার দেহ। দেহ তো নয় উর্ধ্ব-উচ্ছ্রিত স্তব। অব্যাহতবল বিগ্রহ। বিপুলাংস, মহাবাহু, কম্বুগ্রীব, বিশালাক্ষ। স্নিগ্ধবর্ণ, সর্বশুভলক্ষণ, নিত্য-নির্মলাত্মা। চলো দেখবে চলো। আছে কোথায়? হোটেলে-মেসে-নয়, গাছতলায় নয়, ডক্টর রাইটের বাড়িতে। পণ্ডিত চিনেছে এবার পণ্ডিতকে। সারাক্ষণ কি কথা কইছে হে? শুধু ধর্মের কথা। প্রতি নিশ্বাসে প্রত্যেকটি চক্ষুর পলকে ধর্ম। ধর্মই আলো ধর্মই বাতাস ধর্মই জল ধর্মই খাদ্য।

উনি বলছেন আর সবাই তাই শুনছে স্থির হয়ে? সায় দিচ্ছে? তর্ক করছে না? অনর্গল তর্ক করছে। কিন্তু সাধ্য নেই তুমি পরাস্ত কর। পরাস্ত করা দূরের কথা সাধ্য নেই তাঁকে তুমি ফেল বেকায়দায়। সেই শুদ্ধ জ্ঞানের দক্ষিণামূর্তির কাছে সমস্ত তর্ক স্তব্ধ। তুমিও বসে পড়ো সামনে। তারপরে শোনো উৎকর্ণ হয়ে।

একদিন রাইট স্বামীজিকে গির্জেতে নিয়ে গেলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত সবাই শুনল তাঁর দীপ্তবাণী। যাকে সবাই মূর্তিপূজক বলে চেয়েছিল দূরে রাখতে, তাকেই এখন হৃদয়ে এনে বসাল ধ্যানের মূর্তি করে।

'জগতের সমগ্র জাতিকে বলতে হবে বেদের ভাষায়, তোমাদের বাদবিসম্বাদ বৃথা। তোমরা যে ঈশ্বরকে প্রচার করতে চাও তাকে কি দেখেছ কখনো? যদি না দেখে থাকো, প্রচার নিরর্থক, তুমি কি বলছ তাই তোমার জানা নেই। আর যদি তুমি ঈশ্বরকে দেখে থাকো, আর কিসের তবে বিবাদবচসা? তোমার মুখ তখন অন্য শ্রী ধারণ করবে। জীবনে তাই শ্রীমান হয়ে ওঠো। এক ঋষি তার পুত্রকে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্যে পাঠিয়েছিল গুরুগৃহে। শিক্ষা সমাপ্ত করে পুত্র যখন ফিরে এল ঋষি জিগগেস করলে, কি শিখলে? নানা বিদ্যা নানা বাক্য নানা বেদ। কিছু হয়নি। আবার যাও গুরুগৃহে। আবার যখন ফিরল আবার সেই বাগাড়ম্বরের স্পর্ধা। এবারও হয়নি, আরেকবার চেষ্টা করো।

তৃতীয়বার যখন ফিরল পুত্র, তখন তার আর কথা নেই, তখন তার শুধু বিভা, তার শুধু শ্রী। তখন ঋষি বললেন, বৎস, তোমার মুখ আজ উদ্ভাসিত দেখছি, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। যখন কেউ ঈশ্বরকে জানবে তখন তার মুখশ্রী তার স্বর তার দৃষ্টি তার ভঙ্গি তার সমগ্র আকৃতিই বদলে যাবে। তখন সে মানুষের মহামঙ্গলস্বরূপ হয়ে উঠবে। তখনই সে ঋষি নামের অধিকারী হবে। ঋষিত্বলাভই হিন্দুর মুক্তি।

এ কি সেই হিন্দু নয়? এ কি নয় সেই ঋষি?

৪৭

'ভারতবর্ষকে তুলতে হবে, গরিবদের খাওয়াতে হবে পেট ভরে, শিক্ষার বিস্তার করতে হবে দিকে-দিকে আর পুরোতের দলকে এমন ধাক্কা দিতে হবে যেন তারা ঘুরপাক খেতে-খেতে আটলান্টিক মহাসাগরে ছিটকে পড়ে—তা তিনি ব্রাহ্মণই হোন, সন্ন্যেসীই হোন, যিনিই হোন।' আলাসিঙ্গাকে লিখছেন স্বামীজি: 'সামাজিক আচার একবিন্দুও যাতে না থাকে তাই দেখতে হবে। প্রত্যেকে যাতে আরো ভালো করে খেতে পায় আর সুবিধে পায় উন্নতি করতে [illegible]। আমাদের নির্বোধ যুবকেরা ইংরেজের থেকে ক্ষমতা পাবার জন্যে সভাসমিতি করছে, ইংরেজ হাসছে মুখ লুকিয়ে। যে অন্যকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয় সে কি করে স্বাধীন হবার যোগ্য? ধরো ইংরেজ তোমাদের হাতে শক্তি ছেড়ে দিলেন, তাতে হবে কি? আর কেউ এসে শক্তি কেড়ে নেবে। দাসেরা শক্তি চায় অন্যকে দাস করে রাখবার জন্যে।'

আর ইংরেজ?

'ভারতবর্ষে কী রেখে যাবে ইংরেজ?' বক্তৃতা দিচ্ছেন স্বামীজি। 'হিন্দুরাজারা রেখে গিয়েছে মন্দির, মুসলমান রাজারা অট্টালিকা, আর ইংরেজ? ইংরেজ রেখে যাবে ভাঙা ব্র্যান্ডির বোতলের স্তূপ। কী করেছে ইংরেজ? নিজের ফুর্তির জন্যে আমাদের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত শুষে নিয়েছে। শত হাতে আমাদের ভাণ্ডার লুট করে নিয়েছে যাতে আমরা নিরন্নের দল পথে-পথে ঘুরে বেড়াই। তাদের পশুশক্তির নির্লজ্জ প্রতীক হচ্ছে বুট আর বুলেট। একটা গোটা দেশের মুখ থেকে কেড়ে নিয়েছে ভাষা, দেহ থেকে খসিয়ে নিয়েছে মেরুদণ্ড। কিন্তু নিরাশ হবার কিছু নেই। আসছে জ্বলন্ত প্রতিশোধ। সে জ্বলন্ত প্রতিশোধ আর কেউ নয়—সেই জ্বলন্ত প্রতিশোধ চীন। চীনের জন-জলপ্লাবন।'

'আমাদের এই দুর্দশা কেন?' আবার বলছেন স্বামীজি: 'আমরা আমাদেরই দেশবাসীকে হেয় বলে অপজাত বলে অস্পৃশ্য বলে নির্যাতন করেছি—সেই হেতু। যেখানে অত্যাচার, জানবে, সেখানেই প্রতিশোধ। স্তূপীভূত মেঘের মধ্যে বজ্রের আয়োজন।'

রাইট বললেন, 'তুমি যাও এবার শিকাগো—' রাইটের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট ও দৃঢ়।

রাইটের মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকালেন স্বামীজি। শিকাগো! সে আশা তো তিনি কবে ছেড়ে দিয়েছেন। 'শিকাগো! সে তো অনেক দূর!'

না মোটেই দূর নয়। আমিই সব ব্যবস্থা করে দেব।'

'আপনি ব্যবস্থা করে দেবেন ?' অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন স্বামীজি : 'আমার ঢাল নেই তরোয়াল নেই, চাল নেই চুলো নেই—আমাকে পাত্তা দেবে না।'

'আপনাকে পাত্তা দেবে না ?' রুখে উঠলেন প্রফেসর : 'আপনার জন্যেই তো ধর্মসভা, আপনিই তো সেই সভার প্রধান ব্যক্তি, প্রথম ব্যক্তি।'

'বলেন কি ! আমি যখন সেখানে গেলাম আমাকে বলল, আপনার সার্টিফিকেট কই ? পরিচয়পত্র কই ?'

'বললে ?' প্রফেসর গর্জন করে উঠলেন : 'তা হলে যেন ওরা সূর্যকে জিগগেস করে, তুমি যে আকাশে আলো দেবে, তোমাকে কে চেনে, কোথায় তোমার বাড়ি-ঘর, কবে আর কোথায় এর আগে আলো দিয়েছ, তোমার সম্বন্ধে কার কি অভিমত, এত বড় আকাশে আলো দিতে পারবে তার ভরসা কি ! সূর্য কারু প্রশ্নের তোয়াক্কা করে না, ধার ধারে না কোনো অধিকারের। সে নিজের ঔজ্জ্বল্যে পরিচিত। স্বামীজি, তুমি সেই সূর্যের মত স্বপ্রকাশ।'

'ডেলিগেটের টিকেট দেবে কে আমাকে ?'

'প্রতিনিধি নির্বাচনের কমিটির যে চেয়ারম্যান সে আমার বন্ধু। তাকে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। তুমি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করবে।' গম্ভীরমুখে বললেন প্রফেসর রাইট।

এ সব কি গল্পকথা শুনছি নাকি ! স্বামীজি উৎসাহে প্রতপ্ত হতে লাগলেন। স্মরণ করতে লাগলেন ঠাকুরকে।

'তুই দেখে নিস।' দেশে থাকতে বলেছিলেন তুরীয়ানন্দকে : 'এই আমার জন্যেই শিকাগোতে ধর্মসভা হচ্ছে, শুধু আমি সেখানে বক্তৃতা দেব বলে। তুই দেখে নিস হরি ভাই।'

'কিছুতেই ভয় পেয়ো না', লিখছেন রামকৃষ্ণানন্দকে : 'যতদিন তিনি আমার মাথায় হাত রাখছেন, ততদিন কি কারুর আমাকে দাব্যবার জো আছে ? ভবেয়ুঃ কণ্ঠাগতাঃ প্রাণাঃ, প্রাণ কণ্ঠাগত হোক, তবু ভয় পাবে না। সিংহবিক্রম অথচ কুসুমকোমলতার সঙ্গে কাজ করবে।' আরো লিখছেন : 'তিনি কি শুধু ভারতের ঠাকুর ? ঐ সংকীর্ণ ভাবের থেকেই অধঃপতন হয়েছে। ঐ সংকীর্ণ ভাবের বিনাশ না হলে কল্যাণ অসম্ভব। আমার যদি টাকা থাকত তোমাদের প্রত্যেককে পৃথিবীপর্যটনে পাঠাতাম। কোণ থেকে না বেরুলে কোনো বড় ভাব হৃদয়ে আসে না। তিনিই কাণ্ডারী, ভয় কি ?'

কমিটির চেয়ারম্যানকে চিঠি লিখলেন রাইট। লিখলেন, 'যাঁকে পাঠাচ্ছি তাঁর একার বিদ্যা আমাদের দেশের প্রাজ্ঞ পণ্ডিতদের একত্রিত বিদ্যার চেয়ে বেশি। ধারে তো বটেই, ভারেও।'

'তবে একটু ইংরেজি ভাষাটা দোরস্ত করতে হবে।' স্বামীজি লিখছেন ব্রহ্মানন্দকে : 'অর্থাৎ ফলকথা এই যে, এদের দেশের বাঘভাল্লুকে-পাদ্রি পণ্ডিতদের মুখ থেকে রুটি ছিনিয়ে নিয়ে খেতে হবে। অর্থাৎ বিদ্যার জোরে এদের দাবিয়ে দিতে হবে, নইলে ফু করে উড়িয়ে দেবে দেখো। এরা না বোঝে সাধু, না বোঝে সন্ন্যাসী, না বোঝে ত্যাগ-বৈরাগ্য। বোঝে বিদ্যার তোড়, বক্তৃতার ধুম আর মহাউদ্যোগ। জগদম্বার ইচ্ছায় সকলি সম্ভব।'

'আপনি তো পাঠাচ্ছেন আমাকে শিকাগোতে—' ভাবতেও স্বামীজি রোমাঞ্চিত হচ্ছেন, বলছেন, 'কিন্তু আমার ট্রেনের টিকিট কেনবার পয়সা কই ?'

'আমি দেব।' বললেন রাইট।

'আপনি দেবেন ?'

'হ্যাঁ, মনে করো ঈশ্বরই দিচ্ছেন করুণা করে।' রাইটের দুচোখ চকচক করে উঠল।

'কিন্তু সেখানে থাকব কোথায় ? খাব কি ?'

'তাও পুরোপুরি বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।'

সন্দেহ কি, ঠাকুরের করুণা। ঠাকুরের অমিত মহিমা, অমোঘ মহিমা।

কিন্তু শিকাগো থেকে উত্তর আসতে দেরি আছে। সভা তো সেই এগারোই সেপ্টেম্বর। এর মধ্যে ঘুরে আসি সালেম। মিসেস টানাট উড্‌স সেখানে নেমন্তন্ন করেছেন বক্তৃতা দিতে। "থট য়্যাণ্ড ওয়াক" ক্লাবের একজন বিশিষ্ট সভ্যা, মিসেস উড্‌স্ আবার শিশু-সাহিত্যেরও রচয়িত্রী। একেবারে তাঁর বাড়িতে এনে আশ্রয় দিলেন স্বামীজিকে। একটি নিত্যানন্দবর্ধন শিশুকে।

"থট য়্যাণ্ড ওয়াক" ক্লাবেই বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয় ভারতবর্ষ, তার ধর্ম ও রীতিনীতি। কে বক্তৃতা দেবে ? নাম কি ? কেউ বলে বিবেকানন্দ, কেউ বিবিক্তানন্দ, কেউ বা বিবিক্ষানন্দ। করে কি ? জানো না বুঝি ? ভারতবর্ষের কোন এক রাজা। সভায় আসবে তার স্বদেশে তৈরি রাজকীয় পোশাকে। ভারি মজা। দেখবে চলো। শুনবে চলো।

এ কি ! রাজা কোথায় ! এ যে রাজরাজেশ্বর ! এ যে নববেশে বুদ্ধ, যীশুখৃষ্টের আবির্ভাব। আর কি কণ্ঠস্বর ! যেন স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে বিশাল সমুদ্র সম্ভাষণ করে উঠেছে। সে কণ্ঠস্বরে সারল্য ও আন্তরিকতার জাদু, পবিত্রতার অমৃতস্পর্শ। কী বলছে ? নতুন কথা বলছে। পশ্চিম কখনো শোনেনি এমন কথা। বলছে, ভালোর জন্যেই ভালো কাজ করো, পুরস্কারের জন্যে নয়। আর কী ভালো কাজ করেছি তা যেন না বলে বেড়াও। নিজের আমি-টাকে হাম-বড়া ভাবটাকে জলাঞ্জলি দাও। সোজা কথা, ভালো কাজই ঈশ্বরের কাজ। এই ঈশ্বরের কাজেই নিযুক্ত থাকো, নিমগ্ন থাকো। সবাই অনুভব করল, বক্তার উপস্থিতিটাই ঈশ্বরকর্মের উদ্দীপনা। পরের কথা ভাবা, পরের হিতের জন্যে কাজ করাই ঈশ্বরকর্ম।

পরোপকারে কার উপকার ? নিজের উপকার। বলছেন বিবেকানন্দ। উচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে, দু'টো পয়সা নে রে, বলে গরিবকে তা দিও না, বরং তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও যে সে গরিব হওয়াতে তাকে সাহায্য করে তুমি নিজের উপকার করতে পারছ। যে গ্রহণ করে সে ধন্য হয় না, যে দাতা সেই ধন্য। তুমি যে তোমার দয়াশক্তি প্রয়োগ করে নিজেকে পবিত্র করতে পারছ, কৃতার্থ করতে পারছ তাতে নিজেই তুমি কৃতজ্ঞ হও। যদি দুঃস্থ না থাকত তবে তোমার এই আশ্চর্য শক্তিটাকে দেখাতে কি করে ? কি করে নিজের মধ্যে পেতে তুমি তোমার অপরিমেয়তার স্বাদ ?

সুতারাং জগতের উপকার করব এই অজ্ঞানের কথা ছাড়ো। জগৎ তোমার বা আমার সাহায্যের জন্যে বসে নেই। আমাদের কাজ করতে হবে, সর্বদাই পরোপকার, যেহেতু তা আমাদেরই সৌভাগ্যস্বরূপ। শুধু এই উপায়েই আমরা পূর্ণ হতে পারি। কোনো গরিবই আমাদের এক পয়সা ধারে না, আমরাই তার সব ধারি, কারণ সে আমাদের দয়াশক্তি তার

উপর ব্যবহার করতে দিচ্ছে। এই সুযোগই আমাদের সৌভাগ্য। অমুক অমুক লোককে উপকার করেছি, সাহায্য করেছি এই চিন্তাটাই ভুল। এ বৃথা চিন্তা, আর বৃথা চিন্তাতেই কষ্ট। মনে মনে ভাবি, একে যখন সাহায্য করেছি সে অন্তত একটা ধন্যবাদ দিক, কৃতজ্ঞতা জানাক, না দিলে না জানালেই অশান্তি। কেন প্রতিদান আশা করব? যাকে তুমি সাহায্য করছ, বলছেন বিবেকানন্দ, তাকে তুমি ঈশ্বরবুদ্ধি করো। যদি সে তোমার ঈশ্বর, তাকেই তুমি ধন্যবাদ দাও, তাকেই তুমি জানাও তোমার কৃতজ্ঞতা। তোমার সেই সাহায্যকার্যই ঈশ্বরের উপাসনা। পরের জন্যেই তুমি, এ বাণী ভারতবর্ষের। আর, চাচা, আপন বাঁচা, এ ধ্বনি পশ্চিমের।

'একটি ছেলে কাজ করে যা উপার্জন করেছিল তার কিছু অংশ তার মাকে এনে দিলে, ছেলেবেলার ইংরেজী নীতিশিক্ষার বইয়ে পড়েছিলাম তার প্রশংসা।' বলছেন স্বামীজি : 'এর মধ্যে প্রশংসার কি আছে, নীতিশিক্ষাই বা কি। পরে বুঝেছিলাম পশ্চিমে বাবা-মাকে খাওয়ানোই একটা বড় কথা, সাংঘাতিক কথা। আমাদের ভারতবর্ষে ছেলের ব্যবহার সম্বন্ধে কোনো দ্বৈধ নেই। সে তার রোজগারের সবটাই তার মাকে এনে দিত। এ মাকে উপকার নয়, নিজেকে উপকার।'

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যজ্ঞ করছে পঞ্চপাণ্ডব। বিরাট যজ্ঞ, এমনটি কেউ দেখেনি, চমকে-জমকে অভূতপূর্ব। উথলে উঠেছে দানসাগর—ধনরত্নের ছড়াছড়ি। সে যজ্ঞে এক অদ্ভুতদর্শন বেজি এসে উপস্থিত। তার গায়ের আদ্ধেক সোনা, আদ্ধেক পাঁশুটে। সে এসে বললে, এ কি, এই যজ্ঞ? ছি ছি এ একটা যজ্ঞই নয়।

বলো কি, এত যেখানে দান, দানের পর্বতস্তূপ, সে যজ্ঞ নয়?

না, যজ্ঞ দেখেছিলাম সেই এক গাঁয়ে, এক গরিব ব্রাহ্মণের কুটিরে। কুটিরে ব্রাহ্মণ আর তার স্ত্রী, তাদের ছেলে আর ছেলের বউ। ধর্মের উপদেশ দিয়ে যা ভিক্ষে পেত তাই দিয়েই ব্রাহ্মণ নির্বাহ করত জীবিকা। সে গাঁয়ে সেবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হল। লোকে খেতে পাচ্ছে না, শুকনো উপদেশ কে শোনে? অনাহারের মধ্যে এসে দাঁড়াল সেই দরিদ্রের পরিবার। পাঁচ-পাঁচ দিন ধরে সমানে সকলের উপবাস—এই বুঝি মৃত্যু এসে হানা দিল দুয়ারে। ছ দিনের দিন কিছু ছাতু যোগাড় করল ব্রাহ্মণ। ক মুষ্টি ছাতু, মনে হল বসুন্ধরার উজাড়করা ধন। সমান ভাগ করে বসেছে চারজনে, এমন সময় দরজায় ঘা পড়ল। কে? আমি অতিথি। অতিথি? তুমি নারায়ণ। ব্রাহ্মণ উঠে দরজা খুলে দিল। অতিথি বললে, আমি ক্ষুধার্ত, দীর্ঘ দশদিন ধরে উপবাসী, কিছু খেতে দাও আমাকে। ব্রাহ্মণ তার নিজের ভাগ তুলে দিল অতিথিকে। দু গ্রাসে সেই ভাগ নিঃশেষ করে অতিথি বললে, এটুকু খেয়ে আমার খিদে আরো বেড়ে গেল, আরো ভাগ দাও। এ কি সর্বনাশী ক্ষুধা! ব্রাহ্মণ চোখে অন্ধকার দেখল। ব্রাহ্মণী তখন স্বামীকে বললে, আমার ভাগও দাও এই পীড়িতকে। ব্রাহ্মণ প্রতিবাদ করে উঠল, বললে, না, তোমাকে বিপন্ন করতে পারব না। তখন স্ত্রী বললে, না, আমাকে স্ত্রীর কর্তব্য করতে দাও। স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে স্বামীর নারায়ণসেবায় সাহায্য করা। ব্রাহ্মণী দিয়ে দিল তার ছাতুর ভাগ। এবং এই ভাবে ছেলে আর ছেলের বউও তাদের ভাগ দিয়ে দিল অতিথিকে। তখন সর্বগ্রাস করে সেই অতিথি তৃপ্ত হল। সেই কুটিরে ঘরের মেঝেতে কিছু ছাতুর গুঁড়ো ছিল, আমি সেই মেঝেতে যখন এসে গড়াগড়ি দিলাম আমার আদ্ধেক শরীর সোনা হয়ে গেল। সেই থেকে আমি আরেকটা এমন যজ্ঞ খুঁজে বেড়াচ্ছি—যেখানে আমার শরীরের বাকি আদ্ধেকও সোনা হয়ে যাবে। সমগ্র জগৎ

ঘুরে বেড়াচ্ছি, আজও অমন আরেকটা যজ্ঞের দেখা পেলাম না। আমার দেহের বাকি আধেকটা পাঁশুটেই থেকে গেল—

কেন, এই যজ্ঞ? এ কি একটা যজ্ঞ? এটা একটা অহঙ্কারের রাজসূয়। এতে দান আছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু আত্মদান কই? কই প্রচারবৈমুখ্য?

আরেকটা বক্তৃতা দিলেন সালেমে। বিষয়, হিন্দুদের জাতিভেদ; ভারতীয় নারীদের সামাজিক দুর্গতি; ভারতবর্ষের নিদারুণ দারিদ্র্য। জাতিভেদ সামাজিক কর্মবিভাগ থেকে, ধর্ম থেকে নয়। আর নারীদের দুর্গতি তাদের আমরা শুধু দেবী বলে পূজা করেছি বলে, অন্তঃপুরের মন্দিরবেদীতে বন্দিনী রেখেছি বলে। কিন্তু এ সব দুর্গতি-দুর্দশার একদিন অবসান হবে, কিন্তু দারিদ্র্য? এ নাগপাশের মোচন হবে কবে? এ যে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ।

'বুদ্ধ থেকে রামমোহন রায় সকলেই এই ভুল করেছিলেন যে, জাতিভেদ ধর্মবিধান, তাই তাঁরা ধর্ম ও জাতি দুটোকেই ভাঙতে চেয়েছিলেন একসঙ্গে।' শিকাগো থেকে লিখছেন স্বামীজি: 'হিন্দু ধর্মনেতারা যাই বলুন, জাতি একটা সামাজিক বিধান মাত্র। এ দূর হতে পারে যদি লোকের সামাজিক স্বত্ববুদ্ধিকে জাগ্রত করা যায়। এখানে যে কেউ জন্মায় সে জানে সে একজন মানুষ। ভারতে যে কেউ জন্মায় সে জানে সে সমাজের একজন ক্রীতদাস মাত্র। স্বাধীনতাই উৎখাত করতে পারে এই মনোভাব। স্বাধীনতা হরণ করে নাও, অধোগতি ছাড়া আর কিছু নেই চতুর্দিকে। আধুনিক প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষেই উঠে যাচ্ছে জাতিভেদ। ব্রাহ্মণ জুতোব্যবসায়ী বা ব্রাহ্মণ শুঁড়ি দুর্লভ কি আজকাল?'

আরো লিখছেন: 'হিন্দু যেন কখনো তার ধর্ম না ছাড়ে। ভারতের সকল সংস্কারক ভুল করে ধর্মকেই পৌরোহিত্যের সমস্ত অত্যাচার ও অবনতির জন্যে দায়ী করেছেন। তাই তাঁরা হিন্দুধর্মের অবিনশ্বর দুর্গকে ভাঙতে উদ্যত হলেন। ফল কী হল? ফল হল তাঁরা সকলেই ব্যর্থ হলেন।'

পর্দা উঠে যাবে, নারীদের অশিক্ষাও দূরীভূত হবে একদিন। লিখছেন স্বামীজি: 'সৎপুরুষ আমাদের দেশেও অনেক কিন্তু এদেশের মেয়েদের মত মেয়ে কই? যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু—যে দেবী সুকৃতী পুরুষের গৃহে স্বয়ং শ্রীরূপে বিরাজমান। চণ্ডীকথিত কোথায় আমাদের সেই গৃহশ্রী? বাবাজী, শাক্ত শব্দের অর্থ জানো? শাক্ত মানে মদভাঙ নয়, শাক্ত মানে যিনি সমগ্র স্ত্রী-জাতিতে মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। এদেশের পুরুষেরা তাই দেখে। মনু মহারাজ বলেছেন, যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যে গৃহে স্ত্রীলোক সম্মানিত সেই গৃহের উপরেই ঈশ্বর সুপ্রসন্ন। এখানে তাই এরা সুখী, বিদ্বান, স্বাধীন, উদ্যোগী। আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ হেয় অধম অপবিত্র বলি। তার ফল—আমরা পশু, দাস, নিরুদ্যম, দরিদ্র।

'আর এদের মেয়েরা কি পবিত্র! তুষারের মত শুভ্র। পঁচিশ-তিরিশ বছরের কম কারু বিয়ে হয় না। আকাশে পাখির মত স্বাধীন। বাজার-হাট রোজকার দোকান, কলেজ, প্রোফেসর, সব কাজ করে—অথচ কি পবিত্র। স্কুল-কলেজ মেয়েতে ভরা। আমাদের পোড়া দেশে মেয়েছেলেদের পথ চলবার জো নেই। আবার মেয়ে এগারো বছরে বিয়ে না হলে খারাপ হয়ে যাবে। আমরা কি মানুষ বাবাজী? মনু বলেছেন, কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। ছেলেদের মত মেয়েদেরও ত্রিশ বছর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য করে বিদ্যাশিক্ষা

করতে হবে। কিন্তু আমরা কী করছি? মেয়েদের যদি উন্নত করতে পারি তবেই আমাদের আশা আছে। নইলে ঘুচবে না পশুজন্ম।'

কিন্তু তোমাদের সেই বর্বরপ্রথা সতীদাহ কী? সভার মধ্য থেকে প্রশ্ন করল কে একজন। সে-প্রথা উঠে গেছে। কিন্তু সে-প্রথার জন্ম স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অচ্ছেদ্য অনুরক্তি থেকে, কোনো একটা বর্বর অনুশাসন থেকে নয়। বিবাহে স্বামী-স্ত্রী এক ছিল, মৃত্যুতেও স্বামী-স্ত্রী এক—এই আদর্শই ধরতে চেয়েছিল সমাজে। কিন্তু সে যখন গেছে তখন তা নিয়ে আর কথা কেন?

কিন্তু তোমাদের পৌত্তলিকতা? আবার এক প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হয়।

আমরা কি পুতুলকে পুজো করি? আমরা পুজো করি প্রতিমাকে, ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়াকে। অনন্তকে ধরি কি করে যদি তার একটি অবয়ব না কল্পনা করি? তাই আমার সীমাবদ্ধ ঘটের শূন্যতাই মহাকাশের প্রতীকের কাজ করে! কিন্তু জিগগেস করি পৌত্তলিক কে নয়? বহু ভক্ত খৃস্টানকে জিগগেস করেছি, সত্যি করে বলো, উপাসনার সময় কী ভাবো? কেউ বলেছে চার্চ ভাবি, কেউ বলেছে ক্রুশ, কেউ বলেছে স্বয়ং যীশু। বুদ্ধ ঈশ্বর মানলেন না, কিন্তু নিজে ঈশ্বর হয়ে বসলেন। সাধারণ মানুষ মূর্তি ছাড়া ধরবে কাকে? অক্ষরের সাহায্য ছাড়া কার পাঠোদ্ধার করবে?

কিন্তু এত যে মিশনারি যাচ্ছে তোমাদের দেশে তারা করছে কী?

দয়া করে তাদের কথা আর বোলো না। তারা কি ধর্ম শেখাচ্ছে? তারা শুধু দলের খাতায় নাম বাড়াচ্ছে। দেশের ধর্ম দিয়ে কী হবে যদি দেশের আহারের না সংস্থান হয়? পেটে খিদে রেখে ঈশ্বরের নাম চলে না। এখন থেকে আর মিশনারি পাঠিও না, এঞ্জিনিয়র পাঠিও। ধর্মবিস্তারে কি হবে, কর্মবিস্তারের সুবিধে করে দাও। কলকারখানা বসাও, জীবিকার ক্ষেত্রে ডাক দাও উপবাসীকে। তা যদি না পারো পরের দেশে গিয়ে ধর্মের ধ্বজা আর তুলতে চেও না। সমস্ত কুসংস্কার দূর হবে একদিন দেশ থেকে, সমস্ত অনাচার, সমস্ত বিকৃতি-বিচ্যুতি। কিন্তু এই পর্বতভার দারিদ্র্যের উচ্ছেদ হবে কি করে? শ্মশানে দগ্ধ অংগারের অক্ষরে কবে লেখা হবে সুশ্যামলের কবিতা।

শিকাগো থেকে লিখছেন স্বামীজি: 'গড়ে ভারতবাসীর মাসিক আয় দু টাকা। সকলে চেচাচ্ছেন আমরা বড় গরিব, কিন্তু ভারতের দরিদ্রের সহায়তা করবার কটা প্রতিষ্ঠান আছে? লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্যে কজনের প্রাণ কাঁদে? হে ভগবান, আমরা কি মানুষ? ঐ যে পশুবৎ হাড়ি-ডোম তোমার বাড়ির চারদিকে, তাদের উন্নতির জন্যে, তাদের মুখে একগ্রাস অন্ন দেবার জন্যে তোমরা কী করেছ বলতে পারো? তোমরা তাঁদের ছোঁও না, শুধু দূর-দূর কর। আমরা কি মানুষ? এখন ধর্ম কোথায়? এখন খালি ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না। মনে রাখবে, দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতির জীবন। আর আমাদের কাজের মূল কথা, কারু ধর্মে একবিন্দু আঘাত না করে জনসাধারণের উন্নতি। আমাদের আধুনিক সংস্কারকেরা [illegible]বিবাহ নিয়েই বেশী ব্যস্ত। সকল সংস্কারকর্মেই আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু বিধবাদের স্বামীর সংখ্যার উপরে কোনো জাতির অদৃষ্ট নির্ভর করে না। জাতির অদৃষ্ট নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার উপর। তার উন্নতি করতে পারো?'

দুজন পাদ্রী, ডক্টর গার্ডনার আর রেভারেণ্ড [illegible], প্রতি [illegible]ই স্বামীজীকে বিরক্ত করছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে [illegible] বিড়ম্বিত করতে। [illegible] পরাস্ত হবার পাত্র
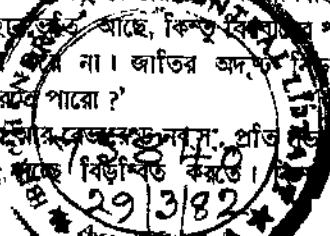
স্বামীজি নন। শান্তভাবে দৃঢ়কণ্ঠে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। তবু তারা নিরস্ত হচ্ছে না, গির্জেয় গিয়ে বেদীর থেকে অপভাষণ করছে। তার চেয়ে প্রকাশ্য সভায় পাদ্রীদের সঙ্গে হোক একটা সাক্ষাৎকার। টানাট উডস সালেমের সমস্ত পাদ্রীবংশকে নিমন্ত্রণ করে আনলেন, শোনো সনাতন ভারতবর্ষের নবীন প্রাণের প্রতীক বীরোত্তম সন্ন্যাসীকে, বোঝো যদি বুঝতে পারো হিন্দুধর্মের উদার তত্ত্ব। সেই সভায় পাদ্রীর দল তীব্র কদর্য ভাষায় আক্রমণ করল স্বামীজিকে, যত পারল বর্ষণ করতে লাগল কটূক্তি, কিন্তু কি আশ্চর্য, স্বামীজির শান্তিতে বা দৃঢ়তায় এতটুকুও রেখা পড়ল না। তাঁর ভদ্রতা ও প্রসন্নতা অক্ষুণ্ণ রইল। তাঁর বক্তব্য তাঁর প্রতিপাদন থেকে তিনি এতটুকু ভ্রষ্ট হলেন না। নিরপেক্ষর দল মুগ্ধ হয়ে গেল স্বামীজির ব্যবহারে—মৌনই যে মহান উত্তর তার উচ্চারণে।

পাদ্রীদের সঙ্গে এই স্বামীজির প্রথম সংঘর্ষ। পরে আরো আছে।

কিন্তু স্বামীজি বিগতভীঃ, ব্রহ্ম-শ্রীসম্পন্ন। দিবাকর কখনো পূর্বদিক ত্যাগ করে না, স্বামীজিও তেমনি ত্যাগ করেন না তাঁর ধর্মকে। ধর্মই একমাত্র শ্রেয়, ক্ষমাই একমাত্র শান্তি, বিদ্যাই একমাত্র তৃপ্তি, আর অহিংসাই একমাত্র সুখনিদান।

লিখছেন স্বামীজি : 'ভ্রাতৃগণ, কোনো ভালো কাজই বিনা বাধায় সম্পন্ন হয় না। শুধু যারা শেষ পর্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে লেগে থাকে তারাই কৃতকার্য হয়। সনাতন হিন্দুধর্মের জয় হোক। মিথ্যাবাদী ও পাষণ্ডদের পরাভব হোক। ওঠো, আমরা নিশ্চিত জয়ী হব।'

৪৮

শিকাগোর ট্রেন ধরলেন স্বামীজি। রাইটের ব্যবস্থানুযায়ী চিঠি এসেছে স্বামীজির কাছে। কোথায় গিয়ে উঠতে হবে থাকতে হবে তারও নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে রাইট। নিজের পয়সায় টিকিটও কিনে দিয়েছে একখানা। এ সব কী করে হয় ? কার কৃপায় ?

'জীবন ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নমাত্র, যৌবন ও সৌন্দর্য বসে থাকে না—' লিখছেন স্বামীজি : 'দিবারাত্র বলো, তুমি আমার পিতা, মাতা, স্বামী, দয়িত, প্রভু, ঈশ্বর—তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না, আর কিছুই না, আর কিছুই না। তুমি আমাতে, আমি তোমাতে—আমি তুমি, তুমি আমি। ধন চলে যায়, সৌন্দর্য চলে যায়, শক্তি চলে যায়, জীবন নিবে যায় এক ফুঁয়ে, কিন্তু প্রভু চিরদিন থাকেন, প্রেমও অম্লান-অক্ষয়। যদি দেহকে সুস্থ রাখতে পারায় কিছু গৌরব থাকে তবে দেহের অসুখের সঙ্গে আত্মাতে অসুখের ভাব আসতে না দেওয়ায় আর গৌরব। জড়ের সম্পর্ক না রাখাই একমাত্র প্রমাণ যে তুমি জড় নও। সুতরাং ঈশ্বরে লেগে থাকো, দেহে বা অন্য কোথায় কি হচ্ছে কে গ্রাহ্য করে ? যখন বিপদ আর দুঃখ এসে বিচিত্র ভয় দেখাতে শুরু করে তখন বলো, হে আমার ভগবান, হে আমার প্রিয় ; যখন মৃত্যুর ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যে এসে পড়েছ তখনো বলো, হে আমার ভগবান, হে আমার প্রিয়! তুমি তো এখানেই, আমার সঙ্গেই আছ, আমি তোমাকে দেখছি, তোমাকে অনুভব করছি। আমি এই জগতের নই, আমি তোমার, তুমি আমাকে ত্যাগ কোরো না। হীরার খনি ছেড়ে কাচখণ্ডের অন্বেষণে নিয়ে যেও না।

এই জীবন একটা মস্ত সুযোগ, তোমরা কি এই সুযোগ অবহেলা করে বসে থাকবে? যিনি সকল আনন্দের প্রস্রবণ তাকে খুঁজবে না?'

যদি ধর্মসভায় ঢুকতে পাই, কী না জানি বলা হবে সেখানে! কোনো বক্তৃতাই তৈরি নেই, কিছু লিখে নিয়ে আসিনি সঙ্গে করে। তিনি যেমন বলান তেমনি বলব।

শিকাগোতে রওনা হবার আগে স্বামীজি সালেম থেকে গিয়েছিলেন সারাটোগায়। সেখানে আমেরিকান সোশ্যাল সায়েন্স য়্যাসোসিয়েশন তাঁকে ডেকেছিল বক্তৃতা দিতে। সে প্রতিষ্ঠানে ধর্ম-আলোচনা চলবে না, সামাজিক সাংস্কৃতিক বা ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে বলতে হবে। তাই সই। যে বিষয় চাও সেই বিষয়ে বলব। সর্ব ব্যাপারে আমি প্রস্তুত। স্বামীজিকে প্রথম বিষয় দেওয়া হল, ভারতে মুসলমানী শাসন, দ্বিতীয় বিষয়, ভারতে রৌপ্যের ব্যবহার; তৃতীয়, ভারতীয়দের রীতি-নীতি সংস্কার-বিশ্বাস। সমস্ত বিষয় নখাগ্রে, নখাগ্রে শুধু নয় জিহ্বাগ্রে। যে শোনে সে শুধু শোনেই না, দেখে। বিষয় যাই হোক না কেন দেখে এক বিষয়াতীত বিস্ময়। লৌকিক ছাড়া কিছু চলে না সেই সমাবেশে কিন্তু এঁর আবির্ভাবই যেন অলৌকিকের স্বাক্ষর।

ট্রেনে এক গণ্যমান্যের সঙ্গে দেখা। খুব একজন বড় ব্যবসাদার বলে মনে হচ্ছে।

'কোথায় চলেছেন?' জিগগেস করল স্বামীজিকে।

'শিকাগোর ধর্মসভায় যোগ দিতে।'

'উঠবেন কোথায়?'

'জেনারেল কমিটির চেয়ারম্যান রেভারেন্ড জন হেনরি ব্যারোজ-এর ওখানে।'

'ডক্টর ব্যারোজ?'

'হ্যাঁ, তাই। দেখুন দেখি এ ঠিকানাটা কোথায় হবে?' স্বামীজি পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে দেখালেন সেই ভদ্রলোককে।

কাগজের উপর একবার চোখ বুলিয়েই ভদ্রলোক বললেন, 'আমিও যাচ্ছি ওদিকে। আমি আপনাকে ঠিক পৌঁছে দেব ঠিক জায়গায়।'

ঈশ্বরের কৃপা অহেতুক। তাঁর রঙ্গও অকারণ। প্রকাণ্ড স্টেশন শিকাগো। দুর্দান্ত জনসমুদ্র। উত্তাল ব্যস্ততা চতুর্দিকে। ভিড়ের ঢেউয়ের মধ্যে সেই সদাচার ভদ্রলোক কখন যে কোথায় তলিয়ে গেলেন টের পেলেন না স্বামীজি। গলা বাড়িয়ে এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগলেন, টিকিরও সন্ধান মিলল না। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, নিজেই তবে খুঁজে-পেতে বার করতে হয় ব্যারোজের আস্তানা। ঠিকানাটার জন্যে পকেটে হাত ঢোকালেন স্বামীজি। কই, কই সেই কাগজের টুকরোটা? সেই ঠিকানা-লেখা কাগজের টুকরোটাও অন্তর্হিত। এখন উপায়? কাউকে জিগগেস করি।

পথচারীদের সম্মুখীন হলেন স্বামীজি। বলতে পারো ধর্মমহাসভার অফিসটা কোথায়? ডক্টর ব্যারোজের নাম শুনেছ? বলতে পারো কোনদিকে তাঁর বাড়ি?

সবাই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। টুঁ শব্দটিও করে না। কেউ-কেউ বা সটান অগ্রাহ্য করে, পাশ কাটিয়ে চলে যায়। বিন্দুমাত্র সাহায্য করবারও কারু মন নেই।

প্রথমত এটা জর্মানদের পাড়া, দ্বিতীয়ত এ লোকটা কাফ্রি না নিগ্রো তার ঠিক কি।

'অন্তত দিতে পারো একটা হোটেলের ঠিকানা?'

কেউ গ্রাহ্যও করে না। যার পথে যে, সরে পড়ে। সন্ধ্যা হয়ে এল। চারদিকে অন্ধকার দেখলেন স্বামীজি। ফিরলেন স্টেশনের দিকে, উঠলেন এসে মালগাড়ির খোলা

ইয়ার্ডে। দেখতে পেলেন কতগুলি খালি কাঠের বাক্স পড়ে আছে এদিক-ওদিক। বড় দেখে বাছলেন একটা। আর তার মধ্যেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লেন কুঁকড়ি-সুঁকড়ি হয়ে।

আশ্রয় নেই আহার নেই—তাই বলে ভয় বা নৈরাশ্য বলেও কিছু নেই স্বামীজির। যিনি সমস্ত অন্ধকারে দীপপ্রদ উপস্থিতি সেই শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন তাঁর শিয়রে, তাঁর হৃদয়ের মধ্যে। সমস্ত বিপদে যিনি আশ্বাস, সমস্ত ব্যাধিতে যিনি ওষধি, সমস্ত প্রত্যাখ্যানেও যিনি অপরাঙ্মুখ। দুশ্চিন্তার কুয়াশার রেখাটিও কোথাও রইল না, পরম আরামে ঘুম এল স্বামীজির। পথ চলতে চলতে যেখানেই সন্ধ্যা হয় সেখানেই সন্ন্যাসীর রাত্রির শয্যা, তা সে রাস্তার ফুটপাথই হোক বা রেলইয়ার্ডের কাঠের বাক্সই হোক।

অক্রিয়াই পরাপুজা, মৌনই পরম জপ, অচিন্তাই পরম যোগ, অনিচ্ছাই পরম সুখ। শান্তির মত আর মন্ত্র নেই, নিজের মত আর দেবতা নেই, আত্মানুসন্ধানের মত আর অর্চনা নেই, তৃপ্তির মতো আর ফল নেই। আমি ভবার্ণবে মজ্জমান বলেই তো তুমি আমার উপযুক্ত কূল। আর তুমি কৃপা দিতে অকৃপণ বলেই তো আমি তোমার উপযুক্ত পাত্র।

ভোর হতেই উঠে পড়লেন স্বামীজি। হাওয়াতে যেন জলের ঘ্রাণ পেলেন। খানিক এগিয়ে দেখতে পেলেন হ্রদ আর তার পাড় বেয়ে প্রশস্ত রাস্তা যে রাস্তায় বিলাসী ধনীদেরই বসবাস। রাস্তার মতই মনও যদি তাদের প্রশস্ত হত! নিদারুণ খিদে পেয়েছে স্বামীজির, কে তাঁকে দু'টুকরো রুটি দেবে, গ্রাসে দেবে একটু আচ্ছাদন! ভিক্ষে করলে কেমন হয়! আমি সন্নেসী, আমার ভিক্ষে করতে কী দোষ? সন্নেসী তো চিরকেলে ভিক্ষুক। দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষে চেয়ে ফিরতে লাগলেন স্বামীজি। যতটুকু দিয়ে আমার এ বেলার ক্ষুধার নিবৃত্তি, শুধু ততটুকুই আমার ভিক্ষে। অতিরিক্তে আমার স্পৃহা নেই কণামাত্র। অপমান করে তাড়িয়ে দিল দ্বারীরা। পরনে ময়লা কাপড়, সমস্ত গায়ে-পায়ে ধুলো, এ কে কিম্ভুতকিমাকার! আর কি স্পর্ধা, খেতে চায় একমুঠো। খাদ্য খাবার কেউ ভিক্ষে করে নাকি? কেউ-কেউ মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেয় সজোরে।

'ভিক্ষে না দাও ধর্মমহাসভার ঠিকানাটা বলে দাও।'

কেউ কর্ণপাতও করে না। কোথায় গেলে বা শহরের ডিরেক্টরি বা টেলিফোন-গাইড পাবে তারও হদিস জানা নেই স্বামীজির। কি করি কোথায় যাই কাকে ধরি। যতক্ষণ পায়ে শক্তি আছে হাঁটি, যেখানেই শ্রান্ত হয়ে বসে পড়ব সে তোমারই কোল আর তুমি ছাড়া কে আছে আমার হাত ধরবে!

হে জগদীশ্বর, তুমি আমাকে বিতাড়িত করলেও আমি তোমার পাদপদ্ম ছাড়ব না। রোষহেতু মাতার দ্বারা নিরস্ত হলেও স্তনান্ধ শিশু মায়ের চরণ ছাড়ে না কিছুতেই। তুমি থাকতে আমি নিজেকে অসহায় ভাবব? আমি আর কিছুই চাই না, আমাকে ধৈর্য দাও, তোমার অনন্তশক্তিই আমার রক্ষক আমার এই বিশ্বাসকেই আরো দৃঢ় কর, এই বিপদ-বাধা তোমারই মঙ্গলেচ্ছা, দাও সেই অভয়-আশ্বাস। আমার অহঙ্কারকে চূর্ণ করবার জন্যে আমাকে দীন করো, কিন্তু তোমার আনন্দ থেকে আমাকে বিচ্যুত কোরো না। যে ভয়গ্রস্ত সেই নিরানন্দ। আমাকে সর্বংসহ কর। যেন চিন্তা-বিলাপ-বর্জিত হয়ে থাকতে পারি শেষ পর্যন্ত।

অবসন্ন হয়ে পথপ্রান্তে বসে পড়লেন স্বামীজি। যা হবার তাই হোক। উত্তীর্ণ হই কি না হই, চরম পরীক্ষার শেষ উত্তর দিয়ে যাই।

'আপনি কি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি ?' কে একজন জিগগেস করল কাছে এসে।

ভদ্র, মার্জিত, কোমল কণ্ঠ। চোখ চাইলেন স্বামীজি। রানীর মত দেখতে, স্বরে ও দৃষ্টিতে দ্রবীভূত দাক্ষিণ্য। আশ্চর্য, কি করে চিনতে পারল ? কে পরিচয় দিয়ে দিল কানে-কানে ?

'হ্যাঁ, সেখানে যাব বলেই বেরিয়েছি।'

'কিন্তু এখানে কেন—এ অবস্থায় ?'

স্বামীজি আনুপূর্বিক বললেন তার দুর্দশার কথা।

'আপনি আমার সঙ্গে আসুন।' ভদ্রমহিলা মমতাভরা ঔদার্যে আহ্বান করলেন স্বামীজিকে : 'রাস্তার ওপারে ঐ আমার বাসা। আমার সঙ্গে চলুন। আপনি আমার অতিথি।'

এ কি সম্ভব ? নাকি এ ইন্দ্রজাল ? যে মাকে মেনেছে নরেন এ কি সেই আর্দ্রান্তরাত্মা জননী। করুণার কল্পলতা। পীযূষবাদিনী স্বর্গস্বর্গদা।

'আপনি কে জানতে পারি ?' ভঙ্গুর পায়ে উঠে দাঁড়ালেন স্বামীজি।

'আমি মিসেস জর্জ হেল।'

শালীন, বদান্য ভঙ্গি। স্বামীজি উঠে পড়লেন। অনুগমন করলেন।

'তিনি কি সারাজীবন তাঁর কোলে আশ্রয় দিয়ে এখন পরিত্যাগ করবেন ? কখনো করবেন ?' লিখছেন স্বামীজি : 'হিংস্র বাঘের মধ্যেও তিনি, মৃগশিশুর মধ্যেও তিনি। ভগবানের যদি কৃপাদৃষ্টি না থাকে, সমুদ্রে এক ফোঁটাও জল থাকে না, গভীর জঙ্গলেও এক টুকরো কাঠ পাওয়া যায় না, আর কুবেরের ভাণ্ডারেও মেলে না এক মুঠো অন্ন। আর যদি তাঁর কৃপা হয়, মরুভূমিতে নির্মলজল স্রোতস্বতী বইতে থাকে আর ভিখারী ভিক্ষুকেরও জুটে যায় অঢেল দৌলত। একটা চড়ুই পাখি কোথায় উড়ে যাচ্ছে, কোথায় বা ঝরে পড়ছে একটা শুকনো পাতা, তাও তিনি দেখতে পান।

প্রভু, আমার শিব, তুমিই আমার ভালো তুমিই আমার মন্দ। তুমিই আমার গতি আমার নিয়ন্তা, আমার শরণ, আমার সখা, আমার গুরু, আমার ঈশ্বর, আমার যথার্থ স্বরূপ। আমি কখনো-কখনো একলা প্রবল বাধাবিঘ্নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে-করতে দুর্বল হয়ে পড়ি, তখন মানুষের সাহায্য পাবার জন্য ব্যগ্র হই। আমায় চিরদিনের জন্য এ সব দুর্বলতা থেকে মুক্ত করে দাও, যেন আমি তোমা ছাড়া কখনো কারু কাছে সাহায্য প্রার্থনা না করি। যদি কোনো লোক কোনো ভালো লোকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে সে কখনো তাকে ত্যাগ করে না বা তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে না। তুমি প্রভু, সকল ভালোর সৃষ্টিকর্তা, তুমি কি আমায় ত্যাগ করবে ? তুমি তো জানো সারা জীবন আমি কেবল তোমারই দাস। তুমি কি আমাকে ত্যাগ করবে যাতে অপরে আমাকে প্রবঞ্চনা করবে বা আমি অশুভের দিকে চলে পড়ব ?'

মিসেস হেল স্বামীজিকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে প্রচুর সেবাশুশ্রূষা আপ্যায়ন করলেন। শুধু তাই নয় ধর্মমহাসভার কার্যালয়ে নিয়ে গেলেন, পরিচয় করিয়ে দিলেন কর্মাধ্যক্ষদের সঙ্গে, যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছেন নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে। যত সব বিধিনিয়মের বাধা ছিল সব অপসৃত হয়ে গেল। এখন শুধু দুজন, আকাশে

ঈশ্বর আর মাটিতে ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দুধর্মের এক ব্যাখ্যাতা। নিজের কথা ভাবছেন না স্বামীজি। ব্যক্তিগত সাফল্য তাঁর লক্ষ্য নয়। তাঁর লক্ষ্য হিন্দুধর্মের জয়, ভারতবর্ষের জয়। সমস্ত বিশ্ব বন্ধুক তার উদার মন্ত্র, তার মিলন মন্ত্র। সমস্ত বিশ্ব বন্ধুক শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী।

হেলদের বাড়ির সামনেই লিংকন পার্ক। সেখানে মাঝে মাঝে রোদ্রে হাওয়ায় বসেন এসে স্বামীজি। একটি তরুণী মা তার ছ বছরের ছোট একটি মেয়ে নিয়ে বাজারে যায় স্বামীজির সামনে দিয়ে। স্বামীজি দেখেও দেখেন না। কিন্তু তরুণী মা দেখে সেই উজ্জ্বল স্নিগ্ধ সন্ন্যাসীকে, কি দয়াভরা চোখ, কি বিশ্বাসব্যঞ্জক দীপ্তি। একদিন তরুণী এসে বললে, 'আমার এই দুষ্টু মেয়েটিকে একটু দেখবেন? আমি বাজারটা সেরে আসি। বাড়ি ফেরবার সময় নিয়ে যাব।'

খুশি হয়ে স্বামীজি মেয়েটির ভার নিলেন। এমন এক দিন নয়, কয়েক দিন।

মেয়েটির যখন ষোলবছর বয়স তাকে তার মা স্বামীজির একখানি ফোটো দেখাল। বললে, 'এঁকে চিনিস?'

'চিনি মা চিনি। কোথায় তিনি?' আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল মেয়ে।

সেই ছ বছর বয়সে কয়েক মুহূর্তের জন্যে দেখা সেই ভাস্বর স্নেহমূর্তি অন্তরে গাঁথা হয়ে আছে সেই মেয়ের। সেই মেয়ে আজ ভক্তির সরোবরে শ্বেত শতদল।

মিসেস হেল মহাসভার আপিসে নিয়ে গেল স্বামীজিকে। দেখুন, প্রাচ্যধর্মের এ আরেকজন প্রতিনিধি। এই এঁর পরিচয়পত্র।

আর কথা কি। নির্বাচিত হলেন স্বামীজি। আর আর প্রাচ্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে একত্র বাসা পেলেন। সমস্ত সুলভ ও সুগম হয়ে গেল।

আপনি কোন্ ধর্মের?

'হিন্দুধর্মের।' গৌরবগাঢ় কণ্ঠে বললেন স্বামীজি।

আপনি?

'আমি ব্রাহ্মধর্মের।' বললেন প্রতাপ মজুমদার। 'আর ইনিও আছেন আমার সঙ্গে।' দেখিয়ে দিলেন বম্বের নাগারকারকে।

আপনি?

'আমি থিয়সফির।' বললেন চক্রবর্তী। 'আর ইনিও আমার দলে।' এনি বেসান্টকে দেখিয়ে দিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম আর থিয়সফি তো হিন্দুধর্মেরই শাখা। তা কে না জানে। তবু এঁরা মজুমদার আর চক্রবর্তী, যখন স্বতন্ত্র হতে চাচ্ছেন তখন তাই হোন। আমি সকলকে নিয়ে, আমিই সনাতন। আমার ধর্মের কোনো প্রবর্তন নেই, কোনো পরিবর্তনও নেই। আমি সর্বব্যাপী, অপরিণামী। আমি সেই এক সত্তা, আমরা সকলে সেই এক সত্তা—এই আমার ধর্ম, হিন্দুধর্ম। শাশ্বত ধর্ম।

মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও বলো, আমিই সেই। এক সন্ন্যাসী ছিল, অনুক্ষণ শিবোহহং, শিবোহহং আবৃত্তি করত। একদিন একটা বাঘ এসে তার উপর লাফিয়ে পড়ল ও তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলল। যতক্ষণ বেঁচে ছিল ততক্ষণ শোনা গিয়েছিল সাধুর কণ্ঠস্বর: শিবোহহং, শিবোহহং। মৃত্যুর দ্বারে, ঘোরতর বিপদে, রণক্ষেত্রে, সমুদ্রতলে, পর্বতশিখরে, গভীরগহন অরণ্যে, যেখানেই পড়ো না কেন, সর্বদা বলতে থাকো,

আমিই সেই, আমিই সেই। যতক্ষণ না প্রত্যেক স্নায়ু, মাংসপেশী এমন কি প্রত্যেক রক্তবিন্দু পর্যন্ত এই ভাবে পূর্ণ হয়ে যায়, ততক্ষণ কানের মধ্য দিয়ে এই তত্ত্ব ভিতরে প্রবেশ করাও। দিনরাত বলতে থাকো, আমিই সেই। কোথায় আমার ভয় কোথায় আমার পাপ কোথায় আমার দৌর্বল্য। আমি নিত্যমুক্ত, আমি কোনোকালে বদ্ধ নই, আমি অনন্তকাল ধরে এই জগতের ঈশ্বর। আমাকে আবার পূর্ণ কে করবে? আমিই নিরবধি গগনাভ, অতিবেলানিরূপম, আমি নিত্য পূর্ণস্বরূপ। আমি সেই তেজোময় স্বপ্রকাশ পুরুষ, আমি দেহ নই আমি আত্মা আমি ব্রহ্ম—এই ধর্মই আমার হিন্দুধর্ম।

'হিন্দুধর্মের মত আর কোনো ধর্ম এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না', লিখছেন স্বামীজী 'আবার হিন্দুধর্ম যে পিশাচের মত গরিব ও পতিতের গলায় পা দেয় জগতে আর কোনো ধর্মে তেমন নেই। এতে ধর্মের কোনো দোষ নেই, শুধু কতগুলি আত্মাভিমানী ভণ্ড ভেদবুদ্ধির সাহায্যে এই আসুরিক অত্যাচারের ব্যবস্থা করে চলেছে। সমাজের এই অবস্থাকে দূর করতে হবে, হিন্দু ধর্মকে ক্ষুণ্ণ করে নয়, হিন্দুধর্মের মহান উপদেশগুলি অনুসরণ করে ও তার সঙ্গে হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি যে বৌদ্ধধর্ম তার হৃদয়বত্তা মিশিয়ে। সুতরাং পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হও, ভগবৎবিশ্বাসের বর্ম পরো, তারপর দরিদ্র, পতিত ও পদদলিতের প্রতি প্রেমে প্রেরিত হও। সিংহবিক্রমে বুক বেঁধে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করো। সেবা ও সাম্যের মঙ্গলময় বাণী প্রচার করো দ্বারে দ্বারে।'

ধর্মমহাসভা হচ্ছে কেন? কী উদ্দেশ্য? পৃথিবীর যাবতীয় মহৎধর্মগুলিকে এক রঙ্গমঞ্চে একত্র করা। বিভিন্ন ধর্মে কী ঐক্য আছে তাই বিশ্বের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরা। তার জন্যে প্রত্যেক ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তাকে নির্বাচন ও নিমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে। কোন ধর্মের কী বৈশিষ্ট্য, সত্যকে দেখবার ও পাবার তার কী পথ ও প্রণালী তার এবার বিচার-বিস্তার হবে। দেখা হবে 'এক ধর্ম আরেক ধর্মকে সাহায্য করতে পারে কিনা, পারলে কিভাবে পারে। ঐহিক সমস্যা, সামাজিক বৈষম্য, দারিদ্র্য ও অশিক্ষা, যাবতীয় অত্যাচার অব্যবস্থার অপনয়ন করতে ধর্মের কী শক্তি, কিংবা শক্তি তার আদৌ আছে কিনা। সর্বতমে উদ্দেশ্য, আন্তর্জাতিক শান্তি আনতে পারে কিনা ধর্ম—তার পরীক্ষা। পারস্পরিক সৌভ্রাত্রে সম্ভব কিনা সহ-অবস্থান।

দেশ-দেশান্তর থেকে নিমন্ত্রিত হয়েছে মনীষীরা। পরিচালক কমিটিতে প্রায় তিন হাজার সভ্য। প্রায় দু বছরের উপর চলেছে এর তোড়জোড়। রাশি-রাশি পত্র, রাশি রাশি দলিল, স্তূপের পর স্তূপ, বাণ্ডিলের পর বাণ্ডিল। একটানা সতেরো দিন ধরে সভা চলবে, সকালে বিকেলে ও সন্ধ্যায় অবিচ্ছিন্ন বক্তৃতা। এলাহি কাণ্ড, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন আর হয়নি কখনো। অগণন লোক কাজ করছে আপিসে। প্রায় দশ হাজারের উপর চিঠি চল্লিশ হাজারের উপর দলিল। বক্তৃতা যে কত হবে তার অন্ত নেই। লিখিত পঠিত উদ্গীরিত। শুধু বাক্যের বুদ্বুদ। বাক্যের উৎপাত।

কমিটিতে ভারতীয় পাঁচজন। হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক আয়ার, নাগারকার, প্রতাপ মজুমদার, মহাবোধি সোসাইটির সেক্রেটারি ধর্মপাল আর জৈনদের প্রতিনিধি মুনি আত্মারাম। স্বামীজি? স্বামীজি কেউ নন। তিনি উপরে-পড়া। তিনি রবাহূত। ঢাল নেই তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার।

কিন্তু একবার যখন মনোনীত হয়েছি, পেয়েছি প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার, দৃঢ় করে

পতাকা তুলে ধরব উর্ধ্বে। প্রভু, শক্তি দাও। আমাকে তোমার হাতের শঙ্খ করে তোলো। আমি যেন হতে পারি হিন্দুত্বের যোগ্য ভাষ্যকার, হতে পারি তোমারই যোগ্য বার্তাবহ। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তু ছাড়া আর কিছু নেই সংসারে। রজ্জুতে সর্পের ন্যায়, শুক্তিতে রজতের ন্যায়, মরীচিকায় জলভ্রান্তির ন্যায় যাতে জগৎ ভাসমান সেই মহাসমুদ্র সত্য-স্বরূপের শরণাপন্ন হই।

পরদিন, এগারোই সেপ্টেম্বর, সভার প্রথম দিন।

সারারাত ধ্যানে ও প্রার্থনায় কাটালেন স্বামীজি। হে মন! নিজেকে কখনো পরাভূত মনে কোরো না। সর্বদা তোমার মাথা উঁচুতে রাখো। কারণ তুমি যে ঈশ্বরের বাহক। তুমিই যে গরুত্মান বেদ। তুমি মহতো মহীয়ান। তুমি ধর্মরূপী বৃষভ, খাদ্য বেদান্ত, যা মানুষকে বলবান বীর্যবান ও ওজস্বী করে। তোমার জ্ঞানে সর্বাস্তিত্বের প্রমাণ, তাই সর্ব-বিধানের প্রতিষ্ঠাই তোমার ধর্ম। তোমার মন্ত্র সমন্বয়। তোমার শুধু সংগতির সংগীত।

৪৯

আঠারোশ তিরানব্বই সালের এগারোই সেপ্টেম্বর, সোমবার, বেলা দশটায় গম্ভীরনাদে ঘণ্টা বেজে উঠল। একে-একে দশবার। পৃথিবীর প্রধানতম দশ ধর্মকে আহ্বান করা হচ্ছে।

হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, জুডা, তাও, কনফুসিয়ান, শিন্তো, জোরোয়াস্ট্রিয়ান, ক্যাথলিক, গ্রীক চার্চ আর প্রটেস্টান্ট। তালিকা প্রস্তুত করেছেন প্রেসিডেন্ট বনি। কিছু বলবার-কইবার নেই। আমার দেশে তোমাদের নিমন্ত্রণ।

খৃস্টান দেশে অখ্রীস্টীয়দের যে ডাকা হয়েছে তাই যথেষ্ট। শুধু ঐ অতিকায় দশজনই নয়, লঘুদেহ আরো অনেকেই পাত পেয়েছে। উদ্যোক্তাদের মনে গোড়ায় এক ভাব এসেছিল, অত হাংগামার দরকার কি, শুধু খ্রীস্টধর্মের গুণগান করবার জন্যে সভার আয়োজন হোক। আর সব ধর্ম খ্রীস্টধর্মের চেয়ে নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ তাই প্রতিপন্ন করা হোক ঢাকেঢোলে। শেষ পর্যন্ত অনেক তর্কবিতর্কের পর ঠিক হল অমন কাঠখোট্টা গোঁয়ারতুমি প্রত্যক্ষে না করাই শোভন হবে। বস্তুত সত্য যখন একমাত্র খ্রীস্টধর্মে, উদ্যোক্তারা আশ্বস্ত হলেন। অন্যান্য ধর্ম তো এমনিতেই হেরে যাবে। আসুক না যত সব আচার-অনুষ্ঠানের ঝুলি নিয়ে, কুসংস্কারের পুঁটলি বেঁধে। দেখি না কার কত দৌড়। সত্যের সঙ্গে সত্যের সঙ্গে কে কবে পেরেছে? সুতরাং খ্রীস্টধর্মের জয় অবধারিত।

তাই ব্যারোজ অবারিত হতে পারলেন নিমন্ত্রণে। অভাগ্য অভ্যাগতদের এমন আশ্বাসও দিলেন, ভয় নেই, কোনো কলহ বা তিক্ততার প্রশ্রয় দেওয়া হবে না, সর্বক্ষণ বইবে বন্ধুতার প্রফুল্ল হাওয়া। অন্যকে খণ্ডন নয় শুধু নিজের কীর্তন। অন্যকে পাতন নয় শুধু নিজের স্থাপন।

তাই ঘণ্টা বাজল মন্দিরে।

উদ্যোগের পুরোহিতেরা কিন্তু মুখ লুকিয়ে হাসল। ক্রিশ্চয়ানিটির সামনে আবার স্থাপন-কীর্তন কি! কে দাঁড়াবে শক্ত পায়ে! কে গাইবে গলা উঁচিয়ে।

মিচিগান এভিনিয়ুর পারে আর্ট ইনস্টিটিউট। তার বিরাটতম হল-ঘরে, হল অফ

কলম্ব্যাসে সভা হচ্ছে। হলের এক পাশে প্রকাণ্ড মঞ্চ সামনে পর-পর গ্যালারির কাতার, লোকের পর লোক গাদি মেরে বসা। ছ থেকে সাত হাজারের মধ্যে। মঞ্চে দেয়ালের দিকে দু পাশে দুই গ্রীক দার্শনিকের মূর্তি, মাঝখানে বিদ্যার দেবী, হিন্দুদের সরস্বতীর অনুরূপ। হাতের মুদ্রা অভয়ংকরী।

একটু এগিয়ে এসে মাঝখানে উঁচু এক সিংহাসন, তার দু দিকে সারবাঁধা কাঠের চেয়ার। সিংহাসনে এসে বসল কার্ডিনাল গিবসন, আমেরিকার ক্যাথলিক চার্চের প্রধান বিশপ। আর কাঠের চেয়ারে আসন নিল দেশ-বিদেশের প্রতিনিধিরা, আর যারা সভার সঙ্গে উচ্চ তন্ত্রে যুক্ত কিংবা যারা বিশেষ অতিথি।

মঞ্চের উপর, চতুর্দিকে রঙের ঢেউ উঠেছে। চীনা বৌদ্ধদের শাদা পোশাক, গ্রীক চার্চের বিশপদের কালো। জাপানের রঙ রমধনুর, কারুর বা শাদা আরে হলদের মিতালি। কেউ পরেছে উচ্চ লালেব ধার ঘেঁষে। শুধু কি রঙ? আছে আবার ছাঁট-কাটের বৈচিত্র্য। কেউ আটসাঁট কেউ বা ঢিলেঢালা। প্রতাপ মজুমদারের তো চোস্ত স্যুট। আর ধর্মপাল শাদা একটি পশমের টিপি। এরই মধ্যে একখানি চেয়ারে বসে আছেন বিবেকানন্দ, সকলের চেয়ে বয়সে ছোট, মোটে ত্রিশ বছরের যুবক, গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা আর মাথায় গেরুয়া পাগড়ি—যেন আশার আকাশে আশ্বাসের সূর্য।

সামনে বিশাল-বিপুল জনতা। শুধু একতাল নির্বিচার মানুষের পিণ্ড নয়, শিক্ষিত বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীদের ভিড়। তার মধ্যে যাজক-পুরোহিতও অসংখ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে কস্মিনকালেও হয়নি এত বড় ধর্মসভা। একই মঞ্চে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের সম্মিলন। কি করে বলব এদের সামনে দাঁড়িয়ে? স্বামীজির গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, বুক কাঁপছে ঢিপঢিপ করে, হাতে-পায়ে বল-বশ কিছু নেই।

প্রথমেই বলতে উঠল গ্রীক চার্চের প্রতিনিধি, জান্তের আর্কবিশপ। তারপরে প্রতাপ মজুমদার। তারপরে প্বং কুয়াং ইউ, কনফুসিয়ানিজম-এর প্রবক্তা। তারপরে চক্রবর্তী। তারপরে বৌদ্ধ ধর্মপাল।

'এবার আপনি।' স্বামীজিকে চিহ্নিত করলেন সভাপতি।

'আমার নম্বর তো একত্রিশ।' বললেন স্বামীজি।

'তা হোক। এখনই বলুন। এ সকালের পর্বেই।'

'না, এখন না।' গম্ভীর হলেন স্বামীজি: 'পরে বলব।'

স্বামীজি দেখলেন সবাই কেমন লিখে এনেছে বক্তৃতা। কি বলবে সব গুছিয়ে-গাছিয়ে তৈরি করে এনেছে। নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন স্বামীজি—তাঁর কেন এমন বুদ্ধি হয়নি? এখন আর লেখবার সময় কোথায়? কোথায় বা মিলবে এখন গবেষণার মালমশলা? কেমন সবাই সানন্দ হাততালি পাচ্ছে, তার বেলায় সবাই বোধহয় ছি-ছি করে উঠবে, ছি-ছি না করুক হয়তো বসে থাকবে বিরসমুখে। সভায় কোনো দীপ্তি থাকবে না, স্বাদ থাকবে না, স্ফূর্তি থাকবে না। সব বিবর্ণ নিষ্প্রভ হয়ে যাবে।

বিকেলের পর্বে প্রথমেই ডাক পড়ল স্বামীজির।

'এখন না।'

লোকটা কি দেবে না নাকি বক্তৃতা? বারে-বারে এড়িয়ে যাচ্ছে কেন? সমুদ্রের মত জনতা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছে বুঝি? দু'চার কথা বলবার মতও সাহস নেই? আবার ইঙ্গিত এল স্বামীজির কাছে।

'আরো পরে।'

এ কি অকরুণ! যদি মুখ বুজে নিষ্ক্রিয় হয়েই থাকবে তবে এলে কেন? আসবার জন্যে, টিকিট পাবার জন্যে কত না লড়াই করেছিলে? ভেবেছিলে এ বুঝি ক্লাবঘরে বক্তৃতা না কি মাঠের চিৎকার! যে ধর্মের প্রতিনিধিই এমন ভীরু সে ধর্মের আবার আস্ফালন কি। চুপ করে আছ, তবে চুপ করেই থাকো।

আরো চার-চার জন প্রতিনিধি তাদের লিখিত বক্তৃতা পড়লেন। যথারীতি হাততালি পেলেন সকলে।

প্রার্থনার ভঙ্গিতে আত্মস্থের মত বসেছিলেন এতক্ষণ, এবার উঠে দাঁড়ালেন স্বামীজি। এবার স্বামীজির বলবার লগ্ন।

দেখ, দেখ, কে দাঁড়িয়েছে মঞ্চে। যৌবনোজ্জ্বল কী মহৎ মূর্তি! কী আশ্চর্য সুন্দর পোশাক। দেখ, দাঁড়াবার কী দৃঢ়দীপ্ত ভঙ্গি! আর চোখ দেখেছ? প্রেম আর প্রার্থনা একসঙ্গে। বীর্য আর মাধুর্যের সংযোগ। পবিত্রতায় জ্বলছে যেন আগুনের মত। কী না জানি বলে! কী না জানি তার বলবার!

সরস্বতীকে মনে-মনে বন্দনা করলেন স্বামীজি। মঞ্চে যিনি অধিষ্ঠিতা সেই বিদ্যাধিদেবীকে নমস্কার। ঋষিসূক্ত মনে পড়ল বোধহয়।

কেউ বাণীকে দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না। কিন্তু কারো-কারো কাছে তিনি আপন স্বরূপ প্রকট করেন, যেমন সুবাসা স্ত্রী পতির নিকট প্রকাশিতা।

যিনি ব্রহ্মার মুখে বিরাজমানা সেই সর্বশ্বেতকান্তি সরস্বতী আমার মানস-সরসে নিত্য বিহার করুন। হে দেবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা, মাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠা, নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা, আমাকে বিদ্যা দাও, প্রশস্তি দাও, দাও প্রতিভা-কল্পনা। তোমার চারহাতে অক্ষসূত্র, অঙ্কুশ, পাশ আর পুস্তক। তুমি আমার জিহ্বাগ্রে বাস করো। তুমিই শ্রদ্ধা, তুমিই মেধা, তুমিই ধারণা। তুমিই মধুচ্ছন্দা। হে স্মিতমুখী সুভগে, তোমাকে নমস্কার। 'মাতর্মাতর্নমস্তে দহ দহ জড়তাং দেহি বুদ্ধিং প্রশস্তাং। শাস্ত্রে বাদে কবিত্বে প্রসরতু মমধীর্মাস্তু কুণ্ঠা কদাচিৎ॥'

প্রথম কথা কী বললেন স্বামীজি? কী তাঁর সম্ভাষণ?

লেডিস য়্যাণ্ড জেণ্টলম্যান নয়, বললেন, সিস্টার্স য়্যাণ্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা। এ আর এমনি কি নতুন বললেন? মামুলি লেডিস য়্যাণ্ড জেণ্টলম্যান-এর চেয়ে বেশি কি অভিনব! এতক্ষণ ধরে ভাষণে-বক্তৃতায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এই কথাই তো বারে-বারে বলা হয়েছে যে সবাই আমরা এক পিতার সন্তান, পরস্পর সবাই আমরা ভাইবোন। তাই স্বামীজির এই সম্বোধনে এমন কি বাহাদুরি!

বাহাদুরি এইখানে যে, ও শুধু মুখের কথা নয় ও প্রাণের কথা, সত্যের স্পর্শে গদ্গদ! শুনেছ কী উদাত্ত কণ্ঠ, যেন মুক্তদ্বার মন্দিরের ঘণ্টা বাজছে। আর এ স্বর তাপে তেজে ছন্দে গন্ধে অপরূপ। যদি এমনি কথার কথা হত, যদি না থাকত এতে সারল্যের সম্পদ, অন্তরের অমৃত, তাহলে কে করত প্রতিধ্বনি? বায়ুতরঙ্গে আরো অনেক কথার মত মিলিয়ে যেত বুদ্বুদ হয়ে।

কিন্তু এ বলায় হল কী? করতালিতে উত্তাল হয়ে উঠল জনতা। এ মামুলি করতালি নয়, এ রুদ্ধ হৃদয়ের উদ্ঘাটন। উল্লাসের জলপ্রপাত। শেষের সমর্থন নয় আরম্ভের অভ্যর্থনা। আরম্ভের জয়ধ্বনি। এক মিনিট, দু মিনিট, তিন মিনিট—থামতে চায় না।

এমন করে কে কবে বলেছে! কণ্ঠস্বরে মিশিয়েছে এমন প্রগাঢ় আন্তরিকতা! কার এমন তেজঃপুঞ্জ ব্যক্তিত্ব! কার এমন উদার-উজ্জ্বল ভঙ্গি। শুধু একটা ভাবালুতা নয়, কার এমন সত্যের স্পষ্টতা! আমেরিকাবাসীর মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসীকে সম্বোধন। উতরোল থামতে চায় না কিছুতেই। উৎসাহে দাঁড়িয়ে পড়েছে অনেকে। হাততালির শব্দে মনে হচ্ছে দেয়াল-ছাদ ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে। সমুদ্র হয়ে যাবে মানুষের জনতা। মানুষের হৃদয়।

একটি শব্দের জাদুস্পর্শে এমন অঘটন ঘটবে কল্পনার অতীত ছিল স্বামীজির। তিনি কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলেন। বুঝলেন, একেই বলে আদ্যাশক্তি, মাতৃশক্তির লীলা। একেই বলে কৃপাশক্তির বিস্ফোরণ।

কিন্তু লোকজন একটু শান্ত নাহলে আমার বক্তব্যটুকু পেশ করি কি করে? শান্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন স্বামীজি। শান্ত স্থির হয়ে গেল জনতা।

বলতে শুরু করলেন স্বামীজি। প্রথমেই পৃথিবীর তরুণধর্মদের প্রাচীনতম ধর্মের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা করলেন। আর সব ধর্ম নতুন, হিন্দুধর্ম প্রাচীনতম। আর সব ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছে, হিন্দুধর্ম সনাতন। হিন্দুধর্মই সমস্ত ধর্মের জননী।

হিন্দুধর্ম দুটো জিনিস শিখিয়েছে—সহনশীলতা আর বহনশীলতা। শুধু সইব না, সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে বেড়াব। পথ দিয়ে তুমিও চলো আমিও চলি—হিন্দুধর্ম শুধু এইটুকুই বলে না, বলে, ভাই, কাছে এস, হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলো। হিন্দুধর্ম শুধু মেনে নেয় না, টেনে নেয়।

আর হিন্দুধর্ম এ শেখায়, সব ধর্মই সমান মহান। সব ধর্মই পৌঁচেছে ঈশ্বরে, সব রাস্তাই রোমে। যে পথ দিয়েই হোক, সোজাই হোক আর আঁকাবাঁকাই হোক, সব নদীই যেমন পড়ছে গিয়ে সমুদ্রে, তেমনি সব ধর্মই মিলছে গিয়ে সেই পরমবিরামে। 'যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।' এ কথাই আমার গুরু, আমার দক্ষিণেশ্বর, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নিজের জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জাতীয়-বিজাতীয় হেন সাধন নেই তিনি করেননি, কিন্তু সব সাধনেরই শেষ স্বাদ ঈশ্বর। যত পথ আছে তিনি বিচরণ করেছেন, যত মত আছে আচরণ করেছেন, এবং বলেছেন, যত মত তত পথ। মতই আর ঈশ্বর নয়, পথই আর প্রাপ্তি নয়। কিন্তু সব মতে সব পথেই সেই পরম সম্বোধি। পথ বিচিত্র কিন্তু প্রাপ্তি এক। মত বিচিত্র কিন্তু মানুষ এক, মানুষের ঈশ্বর এক।

মিনিট পাঁচেক বললেন স্বামীজি এবং বলার শেষে যখন বসলেন, সমস্ত আমেরিকা তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে।

আর কারো বক্তৃতা শুনতেই চায় না জনতা। এর পরে আর যেন কিছু বলবার নেই। গাইবার নেই। আমাদের ছেড়ে দাও। আমরা যাব ঐ ভারতীয় সাধুর কাছে। আমরা তাঁকে আরো কাছে থেকে দেখব। আরো অন্তরঙ্গ হয়ে শুনব। ধরব তাঁর ঐ গেরুয়া আলখাল্লা। আর, দেখেছ, কি সুন্দর ইংরিজি বলছে! স্পষ্ট, দ্রুত ও সাধু ইংরিজি! এমন অবলীলায় বলছে এ যেন তাঁর মাতৃভাষা। কোথায় শিখল এমন বলবার নৈপুণ্য! জনতাকে দাবিয়ে রাখবার ক্ষমতা! বিদেশী ইস্কুলে-কলেজে পড়েছে নাকি কোনোদিন? মাঠে-পর্বতে ঘোরা সাধু, এদের আবার শিক্ষায় রুচি, তার আগ্রাস! তবে এর বেলায় এ অসাধ্য সম্ভব হয় কি করে? সন্দেহ কি, অর্থশক্তি নয়, আত্মশক্তি—অধ্যাত্মশক্তি।

'দর্শন' বলে কোনো কিছু জানত না আমেরিকা, কিন্তু স্বামীজির দর্শন পাবার জন্যে সবাই ক্ষেপে উঠল। কী সুস্নিগ্ধ আয়তশান্ত চোখ দেখেছ। যদি একবার মুখের দিকে তাকায় মনে হয় যেন প্রাণ জুড়িয়ে গেল। পবিত্র হল দেহ-মন। ভেসে উঠল যেন আরেক জগতের ইশারা। চলো চলো এগিয়ে চলো ভিড় ঠেলে। এমন নয়নের প্রসাদ নেবে না?

'দেশে তুমি থাকো কোথায়?' কে একজন জিগগেস করলে।

'কখনো পাহাড়ে পর্বতে কখনো বা বাজারে বন্দরে। কখনো বা শহরের ফুটপাতে। আমি সর্বস্বাধীন। সর্বত্র আমার গতিবিধি। রাজপ্রাসাদ থেকে গরিবের কুটির, ভিখিরির গাছতলা।'

'খাও কি?'

'যখন যা জোটে। না জোটে তো খাই না।'

'কবো কি?'

'মাধুকরী।'

'পয়সা নেই?'

'একটা কপর্দকও না।'

কে একজন পোশাকে আকৃষ্ট হয়েছে। বললে, 'এই বুঝি তোমাব দেশের সাধুদের পোশাক?'

'এ তো তোমাদেব দেশেব বিশেষ এ-অনুষ্ঠানের জন্যে। এ তো ভালো, ভদ্রতম পোশাক। দেশে আমার গায়ে হয় ছেঁড়া কানি, নয়তো চট কিংবা চামড়া।'

'জাত মানো?'

'মানি না।' গম্ভীব হলেন স্বামীজি: 'জাতটা আমাদেব সামাজিক প্রথা, ধর্ম নয়।'

'বিবে কবোনি কেন?' এ একটি তরুণীর প্রশ্ন।

'কাকে বিয়ে করব? যে কোনো মেয়েব দিকে তাকাই আমার মা, জগম্মাতাকে দেখি।'

হোটেলে ফিবে এসে কাঁদতে বসলেন স্বামীজি। ঈশ্বরের কৃপার কথা ভেবে নয়, মূককে বাচাল কবেছেন সে কৃতজ্ঞতায় নয়, কাঁদতে বসলেন বঞ্চিত অধঃপতিত দেশবাসীদের দুঃখেব কথা ভেবে। আমার দেশেব লোকের যখন এত দুঃখ এত দারিদ্র্য তখন এই যশ ও সমাদর দিয়ে আমার কী হবে! যদি দেশকে টেনে তুলতে পারি এই অভাবের পঙ্ককুণ্ড থেকে, তবেই আমার যশ তবেই আমার সমাদর।

৫০

সাতাশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, টানা সতেরো দিন চলছে ধর্মমহাসভার অনুষ্ঠান— সকালে-বিকেলে, কখনো-কখনো দুপুরে। এবং প্রত্যহই কিছু-না-কিছু বলতে হচ্ছে স্বামীজিকে। না বলে উপায় কি। এমনি সব শুকনো জ্ঞানের কথা শুনে অতিষ্ঠ হচ্ছে শ্রোতারা, খানিক পরে-পরেই উঠে-উঠে যাচ্ছে, তাদের ধরে রাখা দুঃসাধ্য।

তখন সেই অবস্থায়, একটি মাত্র মন্ত্র আছে। বশীকরণের মন্ত্র। 'এর পর বিবেকানন্দ বলবে।'

এর পর বিবেকানন্দ বলবে। তবে আর কথা নেই। বসে যাও, যতক্ষণ না এ যন্ত্রণাটা শেষ হয় অপেক্ষা করো। পোষাবে অপেক্ষা করা। কন্টকাঠিনের পরেই মধুমাধবী।

কী আনন্দময় বিবেকানন্দ। কী উজ্জ্বল গভীরস্পর্শ চোখ, কী হৃদয়গলানো গাঢ় কণ্ঠস্বর। মুখের হাসিটিতে বন্ধুতার গন্ধ। আর কী শুদ্ধশুদ্ধ ইংরিজি। হয়তো বা কোথাও একটি পরিচ্ছন্ন আইরিশ সুর।

বিবেকানন্দকে শোনা মানে দেবতাকে শোনা। যেন প্রার্থনার মন্দিরে স্তব-মুগ্ধ হয়ে থাকা। আর কোনো দাবিতে নয়, বিবেকানন্দ যেন বলছে দৈবের দাবিতে। না শুনে তুমি যাবে কোথায়? কে তোমাকে ছুটি দেবে? যেই বিবেকানন্দের বলা শেষ, অমনি প্রায় হল খালি। আর বসে থেকে কি হবে? আর কি শোনবার আছে? বিবেকানন্দ যদি বন্ধ হল, বন্ধ হল আনন্দের জলধারা।

কর্তাব্যক্তিরা বিব্রত হলেন। বিবেকানন্দের বলার পরে সভায় যদি আর লোক না থাকে তা হলে বিবেকানন্দকে সকলের শেষে বলতে বলো। আর সকলের বেলায় লোক থাকবে না এ কেমনতরো কথা!

'আপনারা বসুন। স্থির হোন। বলবেন বিবেকানন্দ।' ঘোষণা করল কর্মকর্তারা।

'বলবেন? কখন বলবেন?'

'সকলের শেষে।'

'কতক্ষণ বলবেন?'

'পনেরো মিনিট।'

তাই সই। বসে যাও। পনেরো মিনিট শোনবার জন্যেই বসে যাব পাঁচ ঘণ্টা। পোষাবে বসে থাকা। পনেরো মিনিটই জীবনের রোমাঞ্চরুচির অভিজ্ঞতা। পনেরো বছর মনে থাকবে। যাবজ্জীবন মনে থাকবে।

সকলেই তো সত্য কথা বলছে, ধর্মের কথা আবার মিথ্যে হয় কি করে? কিন্তু বিবেকানন্দ যা বলছেন তা পুঁথির সত্য নয়, জীবনের সত্য। পরীক্ষিত সত্য, উপলব্ধ সত্য। সে সত্য যেন তাঁর ব্যক্তিত্বে উচ্চারিত। আর তাঁর বাণী যেমনি সরল তেমনি পবিত্র। তাঁর সমস্ত উপস্থিতিই যেন মঙ্গলের আলো। স্নেহাসবাসিত আশীর্বাদ।

'সমুদয় জগৎ ঈশ্বর দিয়ে আচ্ছাদন করো। জগতে যে সব অশুভ ও দুঃখ আছে তা উপেক্ষা করে নয়, সবই মঙ্গলময় সবই সুখময় এ ভ্রান্ত অলস ভাব অবলম্বন করেও নয়, প্রত্যেক সুখ-দুঃখ মঙ্গল-অমঙ্গলের মধ্যে সজ্ঞান সন্ধানে ঈশ্বরকে দর্শন করে। এই ভাবেই ত্যাগ করতে হবে সংসার—আর যদি সংসার একবার ত্যাগ হয়, বাকি কী থাকে? বাকি থাকে ঈশ্বর। একমাত্র ঈশ্বর। এই উপদেশের তাৎপর্য কি? তাৎপর্য এই, তোমার স্ত্রী থাক তাতে কোনো ক্ষতি নেই, তাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে তার কোনো মানে নেই, কিন্তু ঐ স্ত্রীর মধ্যে দর্শন করো ঈশ্বরকে। সন্তান-সন্ততিকে ত্যাগ করো তার অর্থ কি? ওদের কি রাস্তায় ফেলে দিতে হবে? কখনোই না। ওদের মধ্যেও ঈশ্বরকে দেখ। অনন্তকাল ধরে প্রভুই একমাত্র বিদ্যমান। তিনিই স্ত্রীতে স্বামীতে

সন্তানে, ভালোয় মন্দে, পাপে পাপীতে, হত্যাকারীতে। সবই সেই প্রভুর বস্তু। তোমার ভোগ্য ধনে তিনি, তোমার মনে যে বাসনা তাতেও তিনি। তুমি যদি তোমার বসনে ভূষণে তোমার বচনে মননে তোমার শরীরে ছায়ায় সর্বদ্রব্যে ঈশ্বরকে স্থাপন করো তা হলে জগতে কোথায় দুঃখ কোথায় ন্যূনতা কোথায় বিচ্যুতি ? যে একত্বদর্শী তার আর মোহ কোথায় ?'

আত্মত্যাগের উচ্ছ্বসিত বহ্নি। যৌবনের তেজস্বী উদ্ঘোষ। সমস্ত সংশয় ও সঙ্কীর্ণতার প্রত্যাখ্যান। কে প্রাতিকূল্য করবে, দাঁড়াও সামনে, আমি সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ। আমি একা আর সমস্ত পৃথিবী আমার বিরুদ্ধে। তাই সই, একাই লড়ে যাব খালি হাতে। ত্রিভুবনেশ্বরীর সন্তান হয়েও আমি পথের ভিখারী। আমার মরতে কী ভয়! আমি আমার প্রাণ উৎসর্গ করে যাব আমার ঈশ্বরের জন্যে, আমার পরাধীন দেশের নির্যাতিত অজ্ঞানগুহাবাসী দরিদ্রদের জন্যে।

এই অকপট সত্য প্রতিষ্ঠার কীর্তিমান মূর্তি বিবেকানন্দ। এত তেজ এত বিশ্বাস এত উন্মুক্ততা এর আগে দেখেনি আমেরিকা। এত সরল এত নির্মল এত বলবীর্যদৃপ্তও কেউ হয়! পথে-ঘাটে চারদিকে ধ্বনিত হতে লাগল—বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দ। পত্র-পত্রিকায় শুধু বিবেকানন্দের ছবি। শুধু পত্র-পত্রিকায় নয়, রাস্তার মোড়ে-মোড়ে টাঙানো হল বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। বড়-বড় অক্ষরে পরিচয় লেখা—সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। যে সামনে দিয়ে হেঁটে যায়, সে-ই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় খানিকক্ষণ, মাথা নত করে ভক্তিতে। দেহমনোময় ঈশ্বরস্বরের উচ্ছ্বাসে।

মনে সঙ্কল্প করবে, বাক্যে উচ্চারণ করবে, কর্মে সুসিদ্ধ করবে। এই সেই সুসিদ্ধ মূর্তি। দেখ দেখ তার বিদ্যাপ্রদীপ্ত পৌরুষ। বিদ্যা কি? যার প্রভাবে ব্রহ্ম ও জীবের একত্ববিজ্ঞান অধিগত হয়, তাই বিদ্যা।

'কতগুলো ভুলচুক হয়ে গেছে বলে একেবারে বসে পোড়ো না। তাদের ফলও পরিণামে শুভই হবে। অন্যরূপ হতে পারে না কেননা শিবত্ব ও বিশুদ্ধত্ব আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম। কোনো উপায়েই সেই প্রকৃতির ব্যত্যয় হয় না। আমাদের যথার্থরূপ সর্বদাই একরূপ। জ্ঞানের আলো জ্বালো, এক মুহূর্তে সব অশুভ চলে যাবে। নিজের প্রকৃত স্বরূপকে প্রকাশ করো। অতি জঘন্য মানুষ দেখলে তার বাইরের দুর্বলতাকে লক্ষ্য কোরো না, লক্ষ্য কোরো তার হৃদয়নিহিত ভগবানকে, আর তার নিন্দা না করে বোলো, হে স্বপ্রকাশক, হে জ্যোতির্ময়, ওঠো। হে সদাশুদ্ধস্বরূপ, হে সর্বশক্তিমান, হে অজ অবিনাশী, আত্মস্বরূপে প্রকাশ করো। তুমি যে ক্ষুদ্রতায় আবৃত আছ, আবদ্ধ আছ, এ তোমাতে সাজে না। তোমার মধ্যে যে অমিতশক্তি দৈত্য প্রসুপ্ত আছে তাকে জাগ্রত করো, শৃঙ্খলমুক্ত করো। অদ্বৈতবাদ এই শ্রেষ্ঠতম প্রার্থনারই উপদেশ। শুধু নিজরূপ স্মরণ করো, তার অর্থ শুধু সেই অন্তরস্থ ঈশ্বরকেই স্মরণ করো, সেই সদাশিব সদাশক্তি সদাশুদ্ধ পুরুষকে। যে মুহূর্তে আমি অদ্বৈতবাদী, সেই মুহূর্তে আমি মুক্ত। সেই মুহূর্তেই আমি আত্মা, আমি নিখিল বিশ্বের একেশ্বর সম্রাট। যদি রাজা পাগল হয়ে আপন দেশে 'রাজা কোথায়', 'রাজা কোথায়' বলে খুঁজে বেড়ায়, সে কখনো তার উদ্দেশ পাবে না যেহেতু সে নিজেই রাজা। নিজেকে রাজস্বরূপ বলে জানো। জানো তোমার এ দারিদ্র্য সত্য নয়, এ বদ্ধতা সত্য নয়, এ খণ্ডতা সত্য নয়। যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকে সে তুমিই। তুমি যদি ঈশ্বর না হও, তাহলে ঈশ্বর কোনোদিন নেই,

কোনোদিন হবেও না। আর যদি পাপ বলে কিছু থাকে, তবে এরূপ বলাই একমাত্র পাপ যে আমি দুর্বল বা অপরে দুর্বল।'

এই বুঝি হিন্দুর বেদান্ত। মুগ্ধ হয়ে বলাবলি করে সকলে। কী সুন্দর কথা। কী শাশ্বত সত্য কথা।

'বেদান্ত জগৎকে উড়িয়ে দেয় না, জগৎকে ব্যাখ্যা করে। ব্যক্তিকে উড়িয়ে দেয় না, ব্যক্তিকে ব্যাখ্যা করে। আমিত্বকে বিনাশ করতে বলে না, প্রকৃত আমিত্ব কি তাই বুঝিয়ে দেয়। আপাতপ্রতীয়মানের মধ্য থেকে বার করে সত্যস্বরূপকে।'

'আমরা আবার ভারতবর্ষে মিশনারী পাঠাই!' বলাবলি করে শ্রোতার দল: 'ভারতবর্ষই পাঠাক এখানে মিশনারী।'

ধর্ম নয়, রুটি—রুটিই ভারতবর্ষের একমাত্র প্রয়োজন। কী ধর্ম তুমি ভারতবর্ষকে শেখাতে পারো, কী তোমার স্পর্ধা, তোমরা কোথায় ছিলে, ভারতবর্ষ যখন বেদান্ত দিয়েছে, যখন দিয়েছে বৌদ্ধবাদ যা হিন্দুধর্মেরই স্বাভাবিক পরিণতি। কোথায় তোমরা ছিলে যখন হিন্দু বলেছে, শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। সুতরাং ধর্মের কথা বোলো না, পারো তো তার কাছে রুটি নিয়ে যাও, নিয়ে যাও রুটি তৈরি করবার যন্ত্র, নিরন্নকে খাদ্য দাও, দাও তাকে খাদ্য উৎপাদন করবার বৈজ্ঞানিক উপায়। পরশাসন তাকে অজ্ঞানে-দারিদ্র্যে জর্জর করে রেখেছে, দাও তাকে সেই শেকলভাঙার সামর্থ্য। তাকে মহৎ হতে পবিত্র হতে দয়ালু হতে শেখাতে যাবার দরকার নেই। সে এমনিতেই মহৎ ও পবিত্র আছে, দয়ার সে নিত্যনির্ঝর। তাকে ক্ষুধা থেকে রোগ থেকে অশিক্ষা থেকে মুক্ত হবার মন্ত্র শোনাও—যদি সে মহত্ত্ব সে পবিত্রতা সে করুণা তোমার থাকে।

'আপনি কোথায় আছেন? আমাদের বাড়িতে থাকবেন চলুন।' কত লোক সস্নেহ অনুরোধ করতে লাগল।

'আপনাকে যদি অতিথিরূপে পাই, আমরা ধন্য হই, আমাদের গৃহ ধন্য হয়।'

'শুধু ধন্য? আমাদের গৃহ পুণ্যময় হয়ে ওঠে।'

'মন্দির হয়ে ওঠে।—আপনি যাবেন?'

দেশে চিঠি লিখছেন স্বামীজি: 'আমেরিকানদের দয়ার কথা কী বলব! জানো, আমার আর এখন এক কপর্দক অভাব নেই। আমার বাড়ি ভাড়া বা খাইখরচার জন্যে এক পয়সাও লাগে না। ভাবতে পারো? ইচ্ছে করলে এই শহরের যে কোনো সুন্দর বাড়িতে আমি থাকতে পারি। এ বাড়ি নয় তো ও বাড়ি, সব সময়েই কারু না কারু অতিথি হয়ে আছি। এত সুখ যেন কল্পনার অতীত ছিল। ইউরোপে যেতে যে আমার খরচ লাগবে, জানো, তাও আমি এখান থেকে পাব। ক্ষণে ক্ষণে বুঝছি প্রভু আমার সঙ্গে-সঙ্গে আছেন আর আমি তাঁর আদেশ পালন করবার চেষ্টা করছি। জগতের লোকের ভালোবাসার বস্তু অনেক আছে—তারা তাদের ভালো বাসুক—আমাদের প্রেমাস্পদ শুধু একজন—আর কেউ নয়, প্রভুই আমাদের একমাত্র প্রেমাস্পদ।'

ধর্মসভার প্রতিনিধিদের বাড়িতে রাখতে আগ্রহ দেখাচ্ছে অনেকে। শুধু আগ্রহ নয়, সভার কার্যালয়ে প্রত্যক্ষ আবেদন করছে কেউ কেউ। আমি স্থান দিতে পারি একজনকে, আমি একাধিক। বেশ উদারস্বভাব দেখে কাউকে পাঠাবেন, কিংবা বড় জোর একজন খৃস্টান দেশের লোক।

মিসেস জন লিয়ন, ২৬২ মিচিগান এভিনিয়ুতে থাকে, সেও একজন চেয়ে পাঠাল।

কোনো শর্ত আরোপ করে দেয়নি। ধর্মের ব্যাখ্যাতা যখন তখন নিশ্চয়ই সাধারণের বাইরে। খবর এল, তোমার বাড়িতে পাঠাচ্ছি একজনকে। বাড়ি তখন অতিথিতে ভর্তি, শহর-মফস্বল থেকে আত্মীয়স্বজন অনেকে এসেছে এই ধর্মসভার আকর্ষণে, কোনো ঘরই আর খালি নেই। এখন এই প্রতিনিধিকে জায়গা দিই কোথায় ? মিসেস লিয়ন ভাবনায় পড়লেন। দেরি নেই, আজ সন্ধ্যায়ই তো সে আসছে।

তোর ঘরটা খালি করে দে। বললেন বড় ছেলেকে।

কে আসছে ?

কই, নাম পাঠায়নি তো। যে আসুক, ঘর একখানা তাকে দিতে হবে। তুই কোনো বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নে।

কে এমন সে নবাবপুত্তুর ! ছেলে গজগজ করতে লাগল, কিন্তু মায়ের কথার অবাধ্য হল না।

আসতে-আসতে সেই মধ্যরাত্রি ! ঘণ্টা শুনে দরজা খুলে দিয়ে তো সবাই বাক্যহীন। এ-কি ! স্বামী বিবেকানন্দ।

মিসেস লিয়ন স্বামীজিকে তাঁর ঘর দেখিয়ে দিলেন। এইখানে থাকবেন আপনি।

ঘর নিয়ে নয়, বাড়িতে থাকা নিয়েই আপত্তি উঠল। প্রবল, প্রমত্ত আপত্তি। আপত্তি উঠল বাড়িতে যারা আত্মীয়-বন্ধু সমবেত হয়েছে তাদের দিক থেকে। এ কালা-আদমির সঙ্গে এক বাড়িতে থাকা চলবে না আমাদের। না, কিছুতেই না। হলই বা না ধর্মবক্তা কিন্তু গায়ের রঙ তো অবিমিশ্র সাদা নয়। যে করে পারো তাড়াও গেরুয়াধারীকে।

মিসেস লিয়ন মহা ফাঁপরে পড়লেন। হোমরাচোমরা সব আত্মীয়, তাদের চটানো দুঃসাধ্য। এদিকে স্বামীজিও আমন্ত্রিত। তাঁর প্রতিও বা রূঢ় হই কি করে ?

আজ রাতটা শান্ত হয়ে কাটাও সকলে। মিসেস লিয়ন আত্মীয়দের প্রবোধ দিতে চাইলেন। কাল সকালে না হয় স্বামীজিকে সামনের হোটেলে উঠে যেতে বলব।

সকালে লাইব্রেরি-ঘরে স্বামীর টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন মিসেস। মিস্টার লিয়ন খবরের কাগজ পড়ছেন।

'এখন কি করা !' মিসেসের স্বরে কুণ্ঠার কুয়াশা জড়ানো।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুললেন না মিস্টার।

'নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনে এখন কি করে বলি হোটেলে গিয়ে উঠুন !'

'কাকে কী বলবে ?' কাগজের মধ্যে ডুবে থেকেই প্রশ্ন করলেন মিস্টার।

'স্বামীজিকে।'

'তাড়িয়ে দাও, তাড়িয়ে দাও।' কাগজ ফেলে দিয়ে হুঙ্কার করে উঠলেন মিস্টার।

'তাড়িয়ে দেব ?' মিসেস লিয়ন পিছিয়ে গেলেন দু পা।

'একশোবার দেবে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার: 'এ সব আত্মীয়ের মুখদর্শন করাও পাপ। এত বড় লোক, আমি পাব কোথায় ? বলে কিনা কালো ! অন্তরজ্যোতিতে কী দিব্যদীপ্তিমান পুরুষ, কার সাধ্য ওঁর সামনে এসে দাঁড়াক একবার দেখি। আগুনের আবার রঙ কি ! কী রঙ বসন্তের ! তুমি স্বামীজিকে বলো যতদিন খুশি তিনি থাকুন এ বাড়িতে আর ওঁরা, আমাদের একচক্ষু আত্মীয়েরা, যে যার পথ দেখুন, কেটে পড়ুন। আর যদি থাকতে চান মিলে-মিশে থাকুন এক আকাশের নিচে একই মাটির মত।'

মিস্টার লিয়নের এই রোষরুদ্র মূর্তি দেখে আত্মীয়েরা সমস্ত জোর খুইয়ে বসল। যাব-যাব করেও যেতে পারল না। থাকল মিলে-মিশে। ঘাড় গুঁজে। স্বামীজির উদার উপস্থিতিই ভেঙে ফেলল অন্ধ জেদের উদ্ধত প্রাচীর। এক খাবারের টেবিলে বসল সবাই পাশাপাশি। আমরা সকলেই সেই এক অমৃতের অধিকারী। এক পঙক্তির সরিক। এক ভোজ্যের ভাগীদার।

লিয়নের একটি নাতনি আছে, ছ বছর বয়স, তার সঙ্গে স্বামীজির খুব ভাব। নাম কর্নেলিয়া।

'তোমাদের দেশের গল্প বল না।' কর্নেলিয়া এসে অনুনয় করে।

'আমাদের দেশের গল্প! উঃ, সে কত বড় দেশ—জানো, কত বানর আছে সেখানে, গাছে-গাছে লাফানো পাল-পাল বানর, আর কত ময়ূর, আর ঝাঁকে-ঝাঁকে ওড়া কত সবুজ টিয়ে—যাবে তুমি আমাদের দেশে? কত বড়-বড় বট গাছ, অশ্বত্থ গাছ, কী সুন্দর ছায়া, কী সুন্দর কচি-পাতার শিরশির—'

যেন পরী-অপ্সরীর দেশ। কর্নেলিয়ার চোখে স্বপ্নের রঙ লাগে। বলে, 'ও কি, থামলে কেন?'

স্নেহের তুলি দিয়ে আরো কত কি ছবি আঁকেন স্বামীজি। গল্পের আনন্দে কর্নেলিয়া একেবারে স্বামীজির কোলের উপর উঠে বসেছে। বলছে, 'তোমার দেশ কোথায়?'

'তুমি তো ইস্কুলে পড়। তোমার ভূগোলের বই নিয়ে এস। দেখিয়ে দি।'

কর্নেলিয়া ভূগোলের বই নিয়ে এলে মানচিত্রে লাল জায়গাটা চিহ্নিত করলেন স্বামীজি। এই আমাদের দেশ। ইংরেজের অহঙ্কারে রক্তিম। আমাদের বেদনায় রক্তাক্ত।

'জানো, আমাদের দেশ বড় গরিব।' বললেন স্বামীজি, 'তোমার বয়সের কত মেয়ে লেখবার-পড়বার সুযোগই পায় না।' লিয়ন-দম্পতির দিকে তাকালেন: 'আমি এ দেশে শুধু আমার ধর্মের কথাই বলতে আসিনি, আমার দেশের দৈন্য কি করে মোচন করতে পারি তারও উপায় খুঁজতে এসেছি।'

ধর্মসভার একটা বিজ্ঞান-শাখা বলে বিভাগ আছে। সেখানেও বক্তৃতা দিচ্ছেন স্বামীজি। নানা দুরূহ বিষয়ের উপরেই বলছেন। নৈষ্ঠিক হিন্দুত্ব ও বেদান্তদর্শন কিংবা ভারতের ইদানীন্তন ধর্ম কিংবা হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব কিংবা বৌদ্ধধর্মই হিন্দুধর্মের পরিপূর্ণ রূপ। 'হিন্দুত্ব ছাড়া বুদ্ধত্ব নেই।' বলছেন স্বামীজি, 'আবার বুদ্ধত্ব ছাড়া হিন্দুত্ব পঙ্গু। ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে মেশাতে হবে বুদ্ধকরুণা। অতীন্দ্রিয়তার সঙ্গে মানবীয়তা। দেবের সঙ্গে জৈবের গ্রন্থি।'

শুধু কি ধর্মসভায়? ধর্মসভার বাইরেও বলতে হচ্ছে স্বামীজিকে। বক্তৃতা দিয়ে পয়সা পাচ্ছেন। ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে তিনি যে মহৎ কাজ করবেন তারই উদ্দেশ্যে এ দান। তোমার দেশের লোকদের আমরা চিনি না, কিন্তু যে দেশের লোক তুমি, তার যদি কিছু উপকারে আসতে পারি আমরা থাকব না পিছিয়ে। স্বামীজির তো টাকার থলে নেই, একটা রুমালে করে বেঁধে আনেন টাকা। মিসেস লিয়নের কোলে ঝরঝর করে ঢেলে দেন। মিসেস লিয়ন তাঁকে চেনান কোনটা কোন ধরনের মুদ্রা, কোনটার কত মূল্য। তারপর একত্র করে স্বামীজির পক্ষে নিজের ব্যাঙ্কে রেখে দেন জমা করে।

'কি সুন্দর টুপি তোমার মাথায়!' কর্নেলিয়া চোখ বড় বড় করে তাকায়।

'এ টুপি কে বললে ? এ খোলা যায় আবার পাকানো যায় গোল করে।' হাসিমুখে বললেন স্বামীজি।

'তবে ফেল না খুলে।' কর্নেলিয়ার চোখে জ্বলন্ত কৌতূহল।

'খুলে ফেলব ?'

'আবার যখন পাকিয়ে জড়িয়ে নিতে পারবে তখন খুলে ফেলতে দোষ কি। দেখি না !'

'তোমার যখন ইচ্ছে—' স্বামীজি অনায়াসে খুলে ফেললেন পাগড়ি। নতুন করে কি ভাবে ফের বাঁধতে হয় শিখিয়ে দিলেন কৌশল।

'আমাদের আমেরিকার খাওয়া নিশ্চয়ই তোমার পছন্দ হচ্ছে না।' বললেন মিসেস লিয়ন, 'নিশ্চয়ই ফিকে লাগছে, হয়তো বা জোলো—'

'না, না, আমার বেশ ভালো লাগছে, একটুও অসুবিধে হচ্ছে না।' বললেন স্বামীজি, 'যখন যেমন তখন তেমন এই আমার জীবনের শিক্ষা, যে দেশে যে আচার।'

তবু স্বামীজির জন্যে এক বোতল সস্ কিনেছেন মিসেস লিয়ন যদি তিনি স্বাদে একটু বা ঝাঁজ পান।

'এই সস্ দু এক ফোঁটা আপনার মাংসের প্লেটে ঢেলে নিতে পারেন।' মিসেস লিয়ন বললেন উৎসুক হয়ে।

অঢেল হাতে বোতল উপুড় করলেন স্বামীজি।

কর্নেলিয়া তো বটেই, টেবিলের আর-সকলেও চেঁচিয়ে উঠল : 'এ কি সর্বনাশ ! এ সস্ যে ভীষণ ঝাল।'

স্বামীজি মুচকে হাসলেন। পরম আরামে খেলেন মাংসটা। সেই থেকেই খাবার টেবিলে স্বামীজির জন্যে রোজ এক বোতল সস্ রাখছেন মিসেস। যা ওদের কাছে মরণ তাই স্বামীজির কাছে ছেলেখেলা।

৫১

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তবু কিনা আমেরিকানদের কুণ্ঠা। একটু বা উন্নাসিক অবজ্ঞা।

'আপনাদের মধ্যে কজন পড়েছেন হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ ?' ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা দিতে-দিতে একদিন মাঝপথে হঠাৎ থেমে পড়লেন স্বামীজি। শ্রোতাদের মধ্যে কোথাও বুঝি বা লক্ষ্য করেছেন একটু বিরাগের ভাব, একটু বা বিদ্রূপের। হুঙ্কার করে উঠলেন : 'যাঁরা যাঁরা পড়েছেন দয়া করে হাত তুলুন। তুলুন। সত্যের কাছে যাঁরা সাহসী তাঁরা পিছিয়ে থাকবেন না। অকপট হোন।'

কত গণ্যমান্য শিক্ষিত বিদগ্ধের ভিড়, কিন্তু হাত তুলল মোটে তিনজন। তেজস্বী সিংহের মত কেশর ফোলালেন স্বামীজি। তীক্ষ্ণ প্রহারের মত বর্ষণ করলেন তিরস্কার। মোটে তিনজন। আর তাইতেই আপনাদের জনমত। আপনাদের বিচার করার দুঃস্পর্ধা। নিজেদের বিদ্যার বহর দেখে মাথা হেঁট করল আমেরিকানরা।

আসলে ওদের তত দোষ নেই, ওদেরকে ভুল বোঝানো হয়েছে। আর এই ভুল বোঝানোর পান্ডা হচ্ছে ইংরেজ—ভারতবর্ষের সর্বশোষণের যে অজগর। শোনো, আমার

কাছ থেকে শেখ। হিন্দুধর্মই সমস্ত বিশ্ববাসীকে অমৃতের পুত্র বলে সম্বোধন করেছে. পেরেছে করতে। তোমরা কোথায় ছিলে যখন হয়েছে সে উদার শঙ্খনাদ। তমসার পরপারে আদিত্যবর্ণ যে পুরুষ—তোমার আমার মধ্যে এক যে সেই সূর্য—তাকেই দেখেছে মুক্ত চক্ষে। আয়ত চক্ষে। শোনো আমি যা বলছি।

তোমার কথা না শুনি এ আমাদের সাধ্য কি। তুমি দুর্বার সত্যের তেজে সমুজ্জ্বল। তুমি অপ্রতিরোধ্য।

তিনি চলেন, তিনি আবার নিশ্চল। তিনি দূরে, আবার তিনি নিকটস্থ। তিনি সমস্ত জগতের অন্তরে, আবার তিনি সমস্ত জগতের বহির্ভূত। হিরন্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যস্বরূপের, সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষের মুখ ঢাকা। হে পূষন্, হে জগৎ পরিপোষক সূর্য, সত্যধর্ম, আমার উপলব্ধির জন্যে সেই আচ্ছাদন অপসারিত করো। হে মহৎ একাকী, হে নিয়ন্তা, তোমার রুদ্রতেজ সংবরণ করো, তোমার শোভনতম কল্যাণতম রূপে আমাকে দেখতে দাও। দেখতে দাও সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষও যে, আমিও সে-ই। শোনো। যে সমুদয় বস্তু সেই পুরুষে এবং সমুদয় বস্তুতেই সেই পুরুষকে দেখে সেই দর্শনের বলে তার আর কোনো ঘৃণা নেই অসূয়া নেই, নেই ভেদবুদ্ধি। সেই একদর্শীর একত্বদর্শীর কোথায়ই বা মোহ, কোথায়ই বা শোক। পূর্ণের সঙ্গে পূর্ণ যোগ করলে সমুদ্ভূতও পূর্ণ—পূর্ণের থেকে পূর্ণ বিয়োগ করলে অবশিষ্টও পূর্ণ।

আরো শোনো। বলছেন স্বামীজি, 'এ নয় যে খৃস্টান হিন্দু হোক বা বৌদ্ধ হোক, বা হিন্দু কি বৌদ্ধ খৃস্টান হোক। আসল কথা পরস্পর পরস্পরের ধর্মসৌরভ গ্রহণ করুন। নিজের-নিজের প্রাণবায়ু ঠিক রাখুক, নিশ্বাসে নিক প্রতিবেশী ফুলের সুগন্ধ। ব্যক্তিত্ব বিশুদ্ধ রেখে উদার সমন্বয়। আর এ জেনো ধার্মিকতা বা পবিত্রতা বা চিত্তের বিশালতা কোনো মঠ বা মন্দির বা গির্জের একচেটে নয়। প্রত্যেক ধর্মের পতাকাতেই এক মন্ত্র লেখা—শান্তি আর কল্যাণ, প্রেম আর মৈত্রী।'

খৃস্টান মিশনারিরা রুষ্ট হন। তাদের ভাত মারা যায় বুঝি। এতকাল তারা বোঝাতে চেয়েছে যে হিন্দুধর্ম শুধু পুতুলপুজো, এক বাণ্ডিল কুসংস্কার। বজ্র-বিদ্যুন্ময় বাত্যার মত স্বামীজি ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই মতবাদের উপর, সমস্ত ধূমধূলি মেঘকুয়াশা উড়িয়ে দিয়ে উদ্ঘাটিত করলেন অখণ্ড আকাশের উদার নীলিমা। হিন্দু-ধর্মই বিশ্বজনীন, বেদান্তের হিন্দুর বসবাস শুধু দেশে নয় বিশ্বে, শুধু বা বিশ্বে নয় ত্রিভুবনে।

'আমাদের ধর্মের এক কেন্দ্রীভূত সত্য।' বলছেন স্বামীজি, 'তা এই যে মানবাত্মা অজ, অবিনাশী, সর্বব্যাপী সর্বভৌমিক। কোনো বাক্য কোনো বেদ এর মহিমা প্রকাশ করতে অক্ষম, যার সামনে অনন্ত সূর্য চন্দ্র তারকা নীহারিকা বিন্দুতুল্য। প্রত্যেক নরনারী—শুধু নরনারীই নয়, উচ্চতম দেবতা থেকে তোমার পদতলস্থ ঐ কীট পর্যন্ত সকলেই ঐ আত্মা—হয় উন্নত নয় অবনত। প্রভেদ—প্রকারগত নয়, পরিমাণগত। আত্মার এই অনন্ত শক্তি জড়ের উপর প্রয়োগ করলে ভৌতিক উন্নতি হবে, চিন্তার উপর প্রয়োগ করলে মনীষার বিকাশ হবে আর নিজের উপর প্রয়োগ করলে মানুষ ঈশ্বর হয়ে উঠবে। জড় আমাদের লক্ষ্য নয়, চৈতন্যই আমাদের লক্ষ্য। আর মানুষকে ঈশ্বর করার ধর্মই হিন্দুধর্ম।'

আর তোমরা, পাদ্রীরা, এসব কী কাণ্ড করছ বল দেখি। তোমাদের দেশের

ছেলেমেয়েদের স্কুলপাঠ্য বইয়ে ছবি ছেপেছ যে হিন্দু মা তার সন্তানকে গঙ্গায় কুমিরের মুখে নিক্ষেপ করছে। আর বলিহারি তোমাদের রুচি, মাকে কৃষ্ণকায়া করে তার শিশুকে করেছে শ্বেতাঙ্গ। যাতে সহজেই তোমাদের দেশের লোকের সহানুভূতি জাগে ঐ শিশুর উপর। হিন্দু তার শত্রুদের পীড়ন করতে চায়—তাই ছবি ছেপেছ, সেই হিন্দু তার স্ত্রীকে এক খুঁটিতে বেঁধে পোড়াচ্ছে যাতে তার ঐ স্ত্রীর ভূত শায়েস্তা করতে পারে শত্রুদের। সেদিন আর এক বইয়ে দেখলাম এক পাদ্রী সাহেব তাঁর কলকাতা-দর্শনের বিবরণ দিচ্ছেন। লিখছেন কলকাতার রাস্তা দিয়ে রথ যাচ্ছে আর তার চাকার নিচে পড়ে পিষ্ট হবার জন্যে লাফিয়ে পড়ছে ধর্মোন্মত্ত জনতা। এ সব গাঁজাখুরি পেলে কোথায়? মেমফিস শহরে সেদিন এক পাদ্রী বললেন, ভারতবর্ষের প্রত্যেক গ্রামে শিশুদের কঙ্কালে পরিপূর্ণ একটা করে পুকুর আছে। এ সবের মানে কী? খৃস্টশিষ্যদের হিন্দুরা কী করেছে যে প্রত্যেক খৃস্টান ছেলেমেয়েদের শোনানো হবে হিন্দুরা মন্দ, হিন্দুরা দুষ্ট, পৃথিবীর মধ্যে হিন্দুরা জঘন্যতম জীব, এক কথায় বর্বর বিশেষ। যাতে ছেলেবেলা থেকেই শিক্ষার্থীরা চাঁদা দেয় মিশনে, হিন্দু-উদ্ধারে। হিন্দুদের ধর্মব্যাপারে শিক্ষিত-সংস্কৃত করতে না পারলে যেন তাদের ঘুম নেই, ঘুচবে না মাথাব্যথা। কিন্তু আমি এসব হেঁট মাথায় মেনে নেব না কিছুতেই, সবলে ছিন্ন করব সব মিথ্যার কুয়াশা। চোখে চোখ রেখে আমাকে দেখ, কান পেতে শোনো আমার কথা—আমিই সমস্ত মিথ্যার জাগ্রত প্রতিবাদ, অভ্রান্ত সত্যের জ্বলন্ত উপস্থিতি।

'হ্যাঁ, বলো, আমাকেও আমার মা জলে কুমিরের মুখে ফেলে দিয়েছিলেন', স্বামীজি বলছেন শ্লেষ করে, 'আর আমি তোমাদের বাইবেলের জোনার মত আবার পারে উঠে এসেছি।'

যীশুখৃস্ট শিরোধার্য, কিন্তু তাঁর নামে যে মারামারি কাটাকাটি করছ, দেশে-বিদেশে জ্বালিয়েছ যে নির্যাতনের আগুন, তাতে তাঁর মুখ প্রশান্ত বা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে কি? যদি আজ এখানে তিনি থাকতেন মাথায় দিয়ে শোবার জন্যে এক-টুকরো পাথর পেতেন কিনা সন্দেহ।

'কী যীশুর ধর্ম তা আমার কাছ থেকে শোনো।' খৃস্টধর্মের প্রেম আর ভক্তির কথা বলতে লাগলেন স্বামীজি।

'তুমি এত কথা, খৃস্টধর্মের আদর্শের কথা, কী করে জানলে?' এক ধর্মযাজক জিগগেস করলেন স্বামীজিকে।

স্বামীজি হাসলেন। বললেন, 'যীশু যে প্রাচ্যের লোক। আমারই দেশবাসী। তাঁর কথা আমি ভালো জানব না তো আর কে জানতে পারবে?'

শোনো, যারা ভয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসে তারা অধম, অক্ষম, অপরিণত। ঈশ্বর এক প্রচণ্ড পুরুষ, তাঁর এক হাতে দণ্ড আর এক হাতে চাবুক, তাঁর কথা না শুনলে শাস্তি পেতে হবে, তারই জন্যে তাঁকে উপাসনা করব? কিংবা তাঁর আদেশ পালন করলে জুটবে কিছু পার্থিব সুখ সেই লালসায়? আমি কি ভিক্ষুক না কি আমি ক্রীতদাস? আমি প্রেমী। আমি সমর্থ, আমি কৃতার্থ, আমি পরিপূর্ণ। আমার ভালোবাসায় কেনা-বেচা নেই, আমি দোকানদারি করতে বসিনি। একটা সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে তাকে ভালোবাসলাম, সে কি আমার কাছে কিছু চায়, না, আমিই কিছু প্রার্থনা করি তার কাছে? তবু তাকে দেখে আমার কত আনন্দ কত শান্তি কত প্রসাদ, আর মনের কোণে

কোথাও যদি এতটুকু ভয় থাকে, ভালোবাসাই তো পারে তা দূর করতে। পথিপার্শ্বে তরুণী মা দাঁড়িয়ে আছে, একটা কুকুর ডাকলেই সে ভয় পেয়ে ঘরে গিয়ে ঢোকে। কিন্তু যদি তার শিশু তার সঙ্গে থাকে আর যদি কোনো সিংহ এসে তার শিশুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন সেই মা কোথায় যাবে মনে করো? তার ঘরে, না, সিংহমুখে? অবশ্যই সিংহমুখে, যেহেতু প্রেম তাকে নির্ভয় করেছে, পরিণামের কথা ভাববারও সময় দেয়নি। আর এই সে প্রেম যার বিকল্প নেই, যার জন্য আর দ্বিতীয় পাত্র নেই। যাকে ভালোবাসা মানেই সকলকে ভালোবাসা।

পাদ্রীরা যদি বা ক্ষান্ত হয়, স্বদেশের লোকই শত্রুতায় মাতে। আর এ যে-সে লোক নয়, ধর্মনেতা, শিকাগোর সভায় বক্তা সেজে এসেছে। নিজে বিশেষ কলকে পায়নি বলেই স্বামীজির প্রতি ঈর্ষা। চাল নেই চুলো নেই কোথাকার এক যুবক সন্ন্যাসী এসে মুহূর্তে তাঁর ও তাঁর দলের জাঁক ভেঙে দিল, এ অসহ্য। স্বামীজির পূর্ববৃত্তান্ত জানেন কিছু? কর্তৃপক্ষ উৎসুক হয়ে জিগগেস করল সেই লোকটিকে। জানি না? খুব জানি। ধর্মনেতা মনের সুখে ঝাল ঝাড়ল। ও একটা ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে। ভারতবর্ষে ওকে কেউ চেনে না, নামও শোনেনি কোনোদিন। লোক ঠকানোই ওর ব্যবসা, সন্নেসীর ভেক ধরে এখন এসেছে বিদেশে।

না, না, এ আমরা মানতে প্রস্তুত নই। চোখের সামনে দেখছি যে ভাস্বর মূর্তি। নবোদিত সূর্যের মত সুন্দর, যার মুখে এমন সত্যস্বচ্ছ কথা, দুই চোখে অগাধ আহ্বান, জ্যোতির্ময় আনন্দধামের সংকেত, তাকে প্রতারক বলি কি করে, কি করে বলি এ সব শুধু অভিনয়? অগ্নিময় আন্তরিকতাকে কি স্পর্শমাত্রই চেনা যায় না? এ এক দৈবী দীপ্তি। দৈবী দীপ্তি ছাড়া এ কিছু নয়।

তবু দেখা যাক আরো পরীক্ষা করে।

'আমাকে লোকে উপহাস করেছে, অবজ্ঞা করেছে, বদমাস জোচ্চোর বলেছে, আর তাদের কথা ভেবেই সব সহ্য করছি।' লিখছেন স্বামীজি: 'এ জগত দুঃখের আবাস কিন্তু আবার তা শিক্ষার মন্দির। এ দুঃখ থেকেই আহরণ করি সহিষ্ণুতা, অদম্য ইচ্ছাশক্তি যে শত বিপদে-বৈফল্যেও মানুষকে নিষ্কম্প রাখে। যারা আমাকে ভণ্ড বলে তাদের কোনো দোষ নেই। তারা ক্ষুদ্রচেতা, ক্ষীণদৃষ্টি—পানাহার, অর্থোপার্জন, আর বংশবৃদ্ধি—এই নিষ্প্রাণ নিয়মে তারা আবদ্ধ। তাদের কাছে যেও না। যারা ধনী, গণ্যমান্য, উচ্চপদাসীন, তাদের জীবনীশক্তি নেই, তারা মৃত-কল্প, তাদের ভরসা রেখো না। ভরসা শুধু তোমাদের উপর, যারা পদমর্যাদাহীন, দরিদ্র, কিন্তু উদ্দীপ্ত-বিশ্বাসী। বৎস, কোনো কৌশলের প্রয়োজন নেই। কৌশলে কিছুই হয় না। দুঃখীদের জন্যে প্রাণে-প্রাণে কাঁদো আর ভগবানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো। সাহায্য আসবেই আসবে। যে আন্তরিক হয় কিছুই আর তার অন্তরালে থাকে না।'

অনেক সুন্দরী আমেরিকান মেয়ে স্বামীজির বন্ধুতার জন্যে ভিড় করেছে। তাদের কারু কারু বা ইচ্ছে স্বামীজিকে সংসারপথে টেনে নিয়ে যায়, ভ্রষ্ট করে সন্ন্যাসধর্ম থেকে। তার জন্যে মিসেস লিয়নের খুব দুশ্চিন্তা। লোকব্যাপারে অনভিজ্ঞ, সর্বদা অন্যমনস্ক, শিশুর মত সহজনির্ভর, আকস্মিক কোনো ভুল করে না বসে। গেলেন তিনি স্বামীজিকে সতর্ক করতে, মায়ের সস্নেহ উদ্বেগে।

মায়ের উদ্বেগের উত্তরে স্বামীজি বললেন, 'মা, আমার আমেরিকান মা, আমার জন্যে

ভয় করো না।' গদগদগাঢ়স্বরে বললেন স্বামীজি, 'এ সত্যি, আমি মুক্ত প্রান্তরে গাছের তলায় শুয়ে রাত কাটাতেই অভ্যস্ত, কিন্তু মাঝে মাঝে আমি রাজপ্রাসাদে পালঙ্কে শুয়েও ঘুমিয়েছি আর রাজার আদেশে তার দাসী সারারাত ময়ূরপুচ্ছের পাখা দিয়ে আমাকে ব্যজন করেছে। আমার ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হয়নি। প্রলোভনে আমার ভয় নেই—গুরু আর গেরুয়াই আমার রক্ষাকবচ।'

'গেরুয়া ?'

'হ্যাঁ, গেরুয়াই তো বিলাসবাসন আর কামকাঞ্চনের প্রতিষেধ। আজ যদি গেরুয়া জগতে না থাকত তাহলে ভোগলালসা পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্যত্ব হরণ করে নিত।'

'আর গুরু ?'

'হ্যাঁ, আমার পরম গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি সব সময়ে আমার সঙ্গে-সঙ্গে আছেন। আমি যতক্ষণ তাঁর ইচ্ছায় খাঁটি আছি কারু সাধ্য নেই আমাকে বশীভূত করে বা আমার প্রতিবন্ধক হয়। আমি যদি সংসারত্যাগ না করতাম তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ যে বিরাট সত্য প্রচার করতে জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তা প্রকাশিত হত না। আমার গুরুদেবের সত্যই রাখবে আমাকে সত্য পথে, অকম্প পবিত্রতায়।'

দৃঢ়ব্রত সর্ববন্ধনির্মুক্ত স্বামীজি। বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি নেই কিছুতেই। বিমলবোধ শিশু, তন্তুতে তন্তুতে সাধু, অকৃত্রিম সারল্যের অমিয়নির্ঝর। আত্মার অভিঃমন্ত্রের উদ্ভাসক, অদ্বৈত বেদান্তঘন দেহ, কে তাতে ছায়া ফেলে! অখিল ধর্মের অধীশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের কর্মমূর্তি—কে তার কাছে ঘেঁষে! শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপ্রসূতা আধ্যাত্মিক গঙ্গা যে বইয়ে দিয়েছে তাকে দেখা মাত্রই ধুয়ে যাবে অস্বাস্থ্য। উত্থিত হবে প্রার্থনা, হে নির্মলকাশিত, তোমার প্রবাহে আমার সমস্ত পাপ আর দ্রোহ, দ্বেষ আর অনৃত ভাসিয়ে নিয়ে যাও। অবিদ্যাকে নিঃশেষ-নির্মূলিত করো। ক্ষুদ্রসত্তা থেকে মুক্তি দাও।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন স্বামীজি। যারা প্রলুব্ধ করতে এসেছিল প্রণত হল পদপ্রান্তে। সকলে বুঝল পরাক্রান্ত মহান সূর্যের মতই একা-একা ভ্রমণ করছেন স্বামীজি। চোখে চরম জ্ঞানের জ্যোতি, জিহ্বায় উপনিষদ, মুখমণ্ডলে বুদ্ধের শান্তি, যীশুখৃস্টের প্রেম। আর কারু সংশয় নেই, এ লোক ঈশ্বরের প্রেরিত প্রত্যাদিষ্ট আধিকারিক পুরুষ। ঊর্ধ্বহস্তে শুধু কৃপা আর অভয়। কণ্ঠস্বরে পরম সত্যের বজ্রনির্ঘোষ, কখনো বা করুণার জলপ্রপাত। আর সমস্ত উপস্থিতিই উদার বন্ধুতায় উচ্ছ্বসিত।

'মা, আমার আমেরিকান মা, আমার এক জায়গায় শুধু প্রলোভন!' বললেন স্বামীজি।

'কোথায় ?' মিসেস লিয়নের চোখে ভয়ের আভাস।

'কোনো মানুষ নয় মা ' স্বামীজি হাসলেন : 'আমার প্রলোভন আমেরিকার এই বলিষ্ঠ সংগঠনে। সর্বত্র বিরাটের যজ্ঞে বিরাটের নিমন্ত্রণ।'

শুধু তাই ? দয়া নয় ? ভালোবাসা নয় ? নয় অজস্র উদার অভ্যর্থনা ? যে দরজায় গিয়ে দাঁড়ান সে দরজাই খুলে যায়। যার চোখের দিকে তাকান সেই আলোর জন্যে উৎসুক হয়ে ওঠে। কেন ? আমেরিকানদের মধ্যে ধর্মের প্রবণতা প্রবল বলে।

কিন্তু চতুর্দিকে এত খ্যাতি আর যশকীর্তন, বিলাসবিচিত্র সমাদর—স্বামীজি নিরালায়

কাঁদতে বসলেন। আমি। বিবিক্তসেবী সন্ন্যাসী, আমার স্বাধীনতা গেল, আমি পত্র-পত্রিকার মুখাপেক্ষী হলাম। আর যেখানে আমার দেশের লোক না খেয়ে মরছে সেখানে আমার সুখসৌভাগ্যভোগ অসহ্য। হে ঈশ্বর, তবু জানি তোমার অনন্ত শক্তিই আমার রক্ষক, তাই আমাকে নির্ভয়-নির্বিচল রাখবে। লিপ্ত হতে দেবে না, মুগ্ধ হতে দেবে না। বিরত হতে দেবে না।

৫২

ফরাসিনী গায়িকা এমা কালভে তখন শিকাগোতে। মেট্রোপলিটান অপেরা কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে গান গাইতে এসেছে। এর আগে মাতিয়ে দিয়েছে নিউইয়র্ক, তারো আগে ইউরোপ। যে শহরেই গিয়েছে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে—সুরের আগুন। ঝড় তুলে দিয়েছে—সুরের ঝড়। লালসাবাসিনী বিলাসিনী কালভে। ঝড়ের মতই দুর্দান্ত। আগুনের মতই লেলিহান। একটি মাত্র মেয়ে, তারই উপর তার যাবজ্জীবনের ভালোবাসা। সেও এসেছে মায়ের সঙ্গে। একদিন, কেন কে জানে, অপেরায় যেতে তার মন উঠছে না—সন্ধে থেকেই মনে কেমন বিষাদের ছায়া। কারণ কি? কোনো কারণই তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অকারণে খারাপ হয় না মন? তা হোক, তাই বলে গান গাইবে না থিয়েটারে? সেদিন প্রথম অঙ্কে কী অপরূপ সুন্দর গান গাইল কালভে। প্রথম অংকটা দারুণ জমল। যেন একটা জ্বলন্ত আনন্দের বন্যা খেলে গেল। হাততালি আর থামতে চায় না।

বিরতির সময় কালভের মনে হল বুক কাঁপছে, চোখে ঝাপসা দেখছে, দেহে-মনে নেমে এসেছে অকাল ক্লান্তির মালিন্য। ঠিক করলে নামবে না আর দ্বিতীয় অঙ্কে। ম্যানেজার বিপদ দেখল। কী হয়েছে তোমার? কারণ কিছু বলা যায় এমন তো দেখি না চোখের উপর। তবে গাইবে না কেন? গাইব, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুবে তো! সত্যি, আমার কী হয়েছে, কেন আওয়াজ বেরুবে না? দ্বিতীয় অঙ্কেও নামল কালভে। পরিপূর্ণ কণ্ঠে গান গাইল। গান শেষে নিজের সাজঘরের দিকে ছুটে গেল, মূর্ছিতের মত ভেঙে পড়ল চেয়ারে। ম্যানেজারকে বললে, ঘোষণা করে দিন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, নামব না শেষ অঙ্কে। কী সর্বনাশ, একটা না হয় ডাক্তার ডাকি। না, ডাক্তার ডাকতে হবে না, ডাক্তার কী করবে। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল কালভে, অন্যের কাঁধ ধরে-ধরে এগুলো রঙ্গমঞ্চের দিকে। হ্যাঁ, তৃতীয় অঙ্কেও গাইল সে, আর এমন গাইল যেমনটি কোনোদিন শোনেনি শিকাগো। উত্তাল জয়ধ্বনি করতে লাগল সবাই। জয়ধ্বনির প্রত্যাভিবাদন করবার জন্যে দাঁড়াল না কালভে। চোখে মুখে অন্ধকার দেখছে সে, কষ্ট হচ্ছে নিশ্বাস নিতে—তার জন্যে যেন আর আলো নেই হাওয়া নেই। তাড়াতাড়ি সে ছুটে এল তার সাজঘরে—কিন্তু এ কি, ঘরে এরা সব কারা দাঁড়িয়ে আছে ভিড় করে। ম্যানেজার নিজে, আর আরো সব তার থিয়েটারের লোক। সকলের মুখ গম্ভীর, শোকচ্ছায়াচ্ছন্ন। যা কালভের মনে ডাক দিয়েছিল, নিশ্চয়ই কোনো দুর্বিপাক উপস্থিত।

তোমার মেয়েটি মারা গেছে। তোমার যে বন্ধুর বাড়িতে তাকে রেখে তুমি এখানে এসেছিলে গান করতে, সেই বন্ধুর বাড়িতে আগুনে পুড়ে মারা গেছে সে। সে পুড়েছে

আর তখন তুমি গান গাইছ, গেয়ে চলেছ। কালভে মাটিতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। তারপর কালভের জীবনে এল এক উন্মাদ পরিচ্ছেদ। স্থির করল আত্মহত্যা করবে। তার অন্তরঙ্গ বান্ধবীর কাছে জানালে তার সংকল্প।

বান্ধবী বললে ব্যাকুল হয়ে, 'তুমি স্বামীজির সঙ্গে দেখা করবে?'

'কে স্বামীজি?'

'শোননি তাঁর কথা? পড়োনি কাগজে? সেই এক কল্যাণবন্ধু হিরণ্ময় পুরুষ। দেখবে চলো তাঁকে। তাঁর কাছে বলবে তোমার দুঃখের কথা।' বান্ধবী গাঢ় হল নিভৃতিতে: 'তিনি আমার বাড়িতেই আছেন।'

'না, ওসবে আমার স্পৃহা নেই।' যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখে কালভে বললে, 'আমি নদীর জলে ঝাঁপ দেব। জলে ডুবে না মরলে আমার গায়ের জ্বালা, আমার মেয়ের গায়ের অগ্নিদাহের জ্বালা নিভবে না।'

বারে-বারে অনুরোধ করছে বান্ধবী, বারে-বারে প্রত্যাখ্যান করছে কালভে। তিন-তিনবার নদীর দিকে চলল কালভে, আশ্চর্য, তিন-তিনবারই পথ ভুল করল। এ কি, এ সে কোন পথে এসে পড়েছে। এ যে তার বান্ধবীর বাড়ির দিকের রাস্তা। তিন-তিনবারই নদীর বদলে বান্ধবীর বাড়ি। বারে-বারেই সে একটা মোহের থেকে উঠে আসছে বুঝি। তবে কি স্বামীজিই তাকে ডাকছেন? কোথাকার কে স্বামীজি! প্রতিবারেই ব্যর্থের মত বাড়ি ফিরে এল কালভে। এবার, চতুর্থবার, ঠিক-ঠিক সে নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছুবে। একেবারে নদীর অভ্যন্তরে। এবার আর সে পথ ভুল করবে না। ভুল করলেও পথের মাঝেই সংশোধন করে নেবে। আর ফিরবে না বাড়ি। এবার একেবারে বান্ধবীর বাড়ির সদরদরজায় গিয়ে পৌঁছুল। বাটলার খুলে দিল দরজা। মন্ত্রচালিতের মত কালভে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে, ডুবে গেল চেয়ারে।

বান্ধবী এসে বললে, 'পাশের ঘরে স্বামীজি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। চলো। তাঁর সামনে দাঁড়াও গিয়ে নীরবে। তিনি যতক্ষণ কথা না বলেন স্তব্ধ হয়ে থেকো। দেখো সেই মহিমাময়ের সান্নিধ্যে, স্তব্ধতায়, কী শান্তি, কী সুধা!'

'না' করতে পারল না কালভে। পাশের ঘরে ঢুকল সে। ধীর পায়ে নম্র নির্মল মুখে স্বামীজির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কেবল দেখল নতচক্ষে ধ্যানের মৌনে বসে আছেন এক প্রশান্ত পুরুষ। মাথায় পাগড়ি, গায়ে গেরুয়ার ঢেউ। সমস্ত ইন্ধন দগ্ধ করে ফেলা নির্ধূম আগুন। আগুন হয়েও অমৃতের সেতু।

কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন স্বামীজি। কালভের মুখেও কথা নেই।

চোখ তুললেন স্বামীজি। বললেন, 'বৎসে, দুরন্ত ঝড়ের মধ্যে তুমি আছ। কিন্তু ঝড়ের মধ্য থেকেই তোমাকে তোমার শান্তি কুড়িয়ে নিতে হবে। শান্ত হও। শান্ত হওয়াই জীবনের সমস্ত প্রশ্নের যথার্থ প্রত্যুত্তর। বোসো।'

সামনে টেবিল রেখে বসেছিলেন স্বামীজি, টেবিলের ও-পারে বসল কালভে।

স্নেহভরা স্বরে স্বামীজি বলতে লাগলেন কালভের অতীত জীবনের কথা। এমন সব খুঁটিনাটি ব্যাপার যা তার নিভৃততম বন্ধুরও জানবার কথা নয়। কী ভীষণ, এ যে প্রায় অলৌকিক কাণ্ড।

'সে কি, আমার সম্বন্ধে এত কথা আপনি জানলেন কোত্থেকে?' কালভে বিস্ময়ে প্রায় পাথর হয়ে গেল: 'আমার এ বান্ধবীরও তো এসব জানবার কথা নয়। আর তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া—' স্বামীজি মৃদু-মৃদু হাসলেন।

'তা ছাড়া এই সব গোপন কথা, লোকচক্ষুর আড়ালে ব্যক্তিগত কথা, এ সবই বা আপনার সঙ্গে কে আলোচনা করতে যাবে—'

আমি না জানি তো আর কে জানবে—এমনি উদার সহানুভূতির চোখে তাকালেন স্বামীজি। যারা আর্ত, যারা শান্তির পিপাসু, তাদের সমস্ত ইতিহাস, যন্ত্রণার ইতিহাস, আঘাত-অপমানের ইতিহাস, সব আমাকে জেনে নিতে হবে—তারা যদি দুঃখে বা লজ্জায় তা প্রকাশ করতে না চায়, আমাকেই ডুব দিতে হবে অতীতের সমুদ্রে, চিকিৎসক যদি রুগীকে না জানে তা হলে সত্যিকার উপশম দেবে কোত্থেকে?

'কেউ আমাকে কিছু বলেনি, কারু সঙ্গে আলোচনাও হয়নি এ নিয়ে।' স্বামীজি সান্ত্বনাপরিপূর্ণ চোখে তাকালেন কালভের দিকে : 'আমি তোমাকে, তোমার জীবনকে, আগাগোড়া উম্ঘাটিত দেখতে পাচ্ছি। খোলা বইয়ের মত পড়তে পাচ্ছি সমস্ত পৃষ্ঠা তুমি চঞ্চল হয়ো না। স্থির হয়ে বোসো তোমার আসনে।'

স্থির হয়ে বোসো তোমার আসনে—সমস্ত সমস্যার কী নিটোল সমাধান!

অন্ধকারের পরপারে এ কে উন্নত-উজ্জ্বল পুরুষ। ক্ষমা স্নেহ ও সমত্ববুদ্ধির ঔদার্য—কে এ মাধুর্যের অখণ্ড-ভাণ্ডার। কোলের উপর দুখানি হাত রেখে স্থির হয়ে বসে রইল কালভে। বিরাটের সান্নিধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতেও জীবনের জ্বর চলে যায়। শোক চলে যায়, পাপ চলে যায়, পিপাসাও চলে যায়। এ কে আনন্দঘন বিজ্ঞানঘন নির্লেপ-নিরাময় পুরুষ! বিরজ, বিশোক, বিজর, বিমৃত্যু। মালিন্যরহিত, শোকরহিত, জরারহিত, মৃত্যুরহিত আকাশাত্মা। এমন এক আনন্দ আছে যা জানলে আর ভয় থাকে না, স্বামীজি যেন সেই আনন্দ। স্বপ্রকাশ সৎ-বস্তু। অতলগহন শান্তি পেল কালভে। পেল শেষ সদুত্তর। বলিষ্ঠ আশ্রয়। অভয় প্রতিষ্ঠা। আত্মহত্যার ইচ্ছা মুছে গেল মন থেকে।

ফিরে যাবার সময় আবার তাকে মনে করিয়ে দিলেন স্বামীজি : 'ভুলো না কী বললাম। প্রফুল্ল থাকো, সর্বদা ও সর্বত্র আনন্দ বিকিরণ করো। স্বাস্থ্য ভালো করো, ভালো রাখো। নিজের দুঃখ নিয়ে ঘরের কোণে অন্ধকারে বসে থেকো না। তোমার কল্পনা ও আবেগকে একটা শাশ্বত প্রকাশের আবেগে রূপায়িত করো। তোমার আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের জন্যে তা দরকার। দরকার তোমার আর্ট, তোমার শিল্পসাধনার জন্যে।'

সমস্ত অস্তিত্বের ক্ষত যেন আরোগ্যরসায়নে প্রক্ষালিত হয়ে গেল। নিশ্চেতন উজ্জীবিত হয়ে উঠল উৎসাহে। জীবনই সেই অমিত উৎসাহ। কোনোরকম মন্ত্রমোহ বা ইন্দ্রজাল রচনা করে নয়, শুধু তাঁর বীর্যবান ব্যক্তিত্বের পবিত্রতায় তাঁর জ্বলন্ত জ্ঞানের উচ্চারণে কালভেকে স্বামীজি অভিভূত করে ফেললেন। হাসতে খেলতে নাচতে গাইতে আবার শুরু করল কালভে, আবার হয়ে উঠল সে জীবনানন্দিনী নির্মল নদী! কিন্তু এবার, এখন, এ জীবনে তার কত শান্তি কত স্থৈর্য কত নম্রতা। কত অসঙ্গ স্পর্শ। কত সুবিশাল উন্মোচন!

গরিবের ঘরে জন্ম কালভের। কী অমানুষিক পরিশ্রমে দুর্ভাগ্যের সঙ্গে দুর্দিনের সঙ্গে লড়াই করে নিজেকে প্রস্ফুটিত করেছে। কঠিন শিলা থেকে মুক্তি দিয়েছে শিল্পকে। যেমন রূপ তেমনি যৌবন তেমনি দৈব কণ্ঠের মাধুরী। সমস্ত পশ্চিমের

গায়িকাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা বর্ণনা করছেন স্বামীজি। আরো কত গায়ক-গায়িকা আছে কিন্তু কালভের মত কেউ নয়, না বিত্তে না বিদ্যায়। শুধু সংগীতে নয়, ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে সে অগ্রগণ্য। দুঃখ ও দারিদ্র্যের মত কেউ নেই এমন শিক্ষাদাতা। দুঃখ ও দারিদ্র্যই খুলে দিয়েছে জীবনের দুই বাতায়ন। এক মৈত্রী, দুই অনহঙ্কার। দুই খোলা জানলা দিয়ে এসেছে মাধুর্যের হাওয়া। মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। তাকিয়ে দেখ বাইরে। নিরবচ্ছিন্ন মুক্তাকাশ। ঐ আকাশ না থাকলে কে প্রাণধারণ করত সংসারে! সমস্ত আকাশই মধু।

মঠে ফিরে এলে স্বামীজিকে চিঠি লিখল কালভে। স্নেহোৎসুকা কন্যার প্রশ্ন, সামান্য প্রশ্ন: বাবা, তুমি কেমন আছ, কোথায় আছ, কি করছ, কি করবে ভাবছ।

স্বামীজি লিখছেন কালভেকে: 'আমি অনেকটা ভালো আছি। যতটা আশা করেছিলাম তার তুলনায় অবশ্যি কিছু নয়। নিরিবিলি থাকবার একটা প্রবল আগ্রহ আমার হয়েছে। আমি চিরকালের মত অবসর নেব! আর কোনো কাজ আমার থাকবে না। যদি সম্ভব হয় তো আবার আমার পুরোনো ভিক্ষাবৃত্তি শুরু হবে।'

চরকির মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন স্বামীজি। এ শহর থেকে ও শহর, এ প্রতিষ্ঠান থেকে ও-প্রতিষ্ঠান। একটা লেকচার-ব্যুরোর সঙ্গে তাঁর চুক্তি হল, তাঁকে সারা আমেরিকা বক্তৃতা দেবার জন্যে ঘোরানো হবে যার বিনিময়ে তাঁকে দেওয়া হবে দক্ষিণা—উপযুক্ত দক্ষিণা। টাকা পেলে কত লোকহিতকর কাজ করা যায় ভারতবর্ষে। কত বিভব বিলাস, বিত্ত-প্রতিপত্তির দেশ এই আমেরিকা, আর ভারতবর্ষে শুধু নিঃস্ব-নিরন্নের ভিড়। কত বড়-বড় প্রাসাদ এখানে আর ভারতবর্ষে পর্ণকুটির নয়তো গাছতলা। কিন্তু যাই বলো, ভারতবর্ষের ছাইমাখা কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর যে আত্মিক মহত্ত্ব, যে প্রদীপ্ত সভ্যতা, তার লেশমাত্রও এখানে নেই। এদের বাহ্যিক সভ্যতার বিস্তীর্ণ আচ্ছাদনের নিচে যা আছে তাইই ছাই। অন্তরে এরাই নিঃস্ব, অমৃতাম্নহীন।

ফরমায়েস-মত লৌকিক বিষয় কী বলব, ভারতবর্ষের নারী, হিন্দুর প্রথা-পদ্ধতি বা বর্ণবৈষম্য—আমাকে ধর্মের কথা বলতে দাও, বলতে দাও আমার গুরুর কথা।

মাস্টার মশায়ের কথা মনে পড়ল বুঝি স্বামীজির। ঠাকুরের ঘরে ঠিক বিকেল-বেলাটিতে এসে হাজির হয়েছে। নরেন ঠাকুরের কাছে বসে, এক পাশে ভবনাথ। ঠাকুর হেসে বলছেন, একটা ময়ূরকে বেলা চারটের সময় আফিং খাইয়ে দিয়েছিল। তারপর দিন ঠিক চারটের সময় ময়ূরটা এসে উপস্থিত। আফিঙের মৌতাত ধরেছিল, ঠিক সময়ে আফিং খেতে এসেছে।'

ঈশ্বর-কথার মত কথা নেই। ঈশ্বর-প্রেম 'কলসে-কলসে ঢালে তবু না ফুরায়।' কে তোমার গুরু?

গ্রাম্যভাষায় কথা বলা সে এক পরমসুন্দর সদানন্দ পুরুষ। দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁকে দেখে আক্ষেপ করে বলছেন, আমরা কেবল পড়েছি, আর ইনি না পড়েই সেই বেদ-বেদান্তের ফল। আমরা কেবল ঘোল খেয়েছি আর ইনি মাখন খেয়েছেন।

তোমাদের যীশু পিতা-পিতা করে পাগল। আর আমার গুরু মা-মা করেন। বলেন, বাপের চেয়ে মায়ের টান বেশি। বাপের চেয়ে মায়ের উপর বেশি জোর খাটে। মায়ে-পোয়ে মোকদ্দমা হলে মা মামলা ছেড়ে দেয়, হেরে যায়।

ঈশ্বর কি একটা ভাবের বুদ্বুদ? নাকি দুর্বল মানুষের কল্পনার রামধনু? ঈশ্বর

এক বিজ্ঞানের ব্যাপার, এক বিজ্ঞানসম্মত প্রতিপাদিত্য সত্য। আমাদের জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ের অগ্রে ও পশ্চাতে এক অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে। আমাদের এই ব্যক্ত জগৎ এক অব্যক্তের অংশ মাত্র। বলবে, অনন্ত অজ্ঞাতকে জানবার চেষ্টা কেন? যেটুকু জ্ঞাত সেটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেই তো চলে। তাই বা চলে কই? জানব না-জানব না করেও দিনে দিনে আমরা জেনেই ফেলেছি, কিছুতেই অল্পকে নিয়ে পরিমিতকে নিয়ে স্থির থাকতে পারছি না। জ্ঞানের চরম বিষয়ই যে সেই অনন্ত অজ্ঞাত, অনন্ত অব্যক্ত, আমাদের জ্ঞানের অগ্রগমনে তাই ইঙ্গিত করছি অহরহ। যে অব্যক্তের অংশ এই ব্যক্ত জগৎ, যে অনন্ত সত্তার ক্ষুদ্র প্রকাশ এই জীবসত্তা, তাকে না জানলে এই জীব-জগতের ব্যাখ্যা হবে কি করে? সুতরাং জগদতীত সত্তার তত্ত্বানুসন্ধান না করে উপায় নেই।

বলছেন স্বামীজি: এথেন্সে বক্তৃতা করছেন সক্রেটিস। ভারত থেকে এক ব্রাহ্মণ এসেছে গ্রীসে, তাকে বলছেন সক্রেটিস, মানুষকে জানাই মানুষের সেরা কাজ। মানুষই মানুষের সর্বোচ্চ আলোচনার বস্তু।

ব্রাহ্মণ বললে, 'ঈশ্বরকে না জানলে মানুষকে জানবেন কি করে? যতক্ষণ ঈশ্বর অজানা ততক্ষণ মানুষও অজানা।'

সেই অনন্ত অজ্ঞাত বা নিরপেক্ষ সত্তা এবং অনন্ত অব্যক্ত বা নামাতীত বস্তুই ঈশ্বর। যে কোনো জড়বস্তু নিয়ে বিচার করো, তার তত্ত্বানুসন্ধানে অগ্রসর হও, দেখবে স্থূলে ক্রমশঃ সূক্ষ্মে এসে পৌঁছুচ্ছে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতরে, অণু অণীয়ানে। সর্বশেষে সূক্ষ্মতমে, অণিষ্ঠে। তখন আর জড় নেই, চলে গিয়েছে চেতনে। এবং চেতন থেকে মহত্তম পরতম শক্তিতে। আর তখন পদার্থবিদ্যা নেই। পদার্থবিদ্যা উপনীত হয়েছে দর্শনে।

জগদতীত সত্তার অনুসন্ধানই ধর্ম। আর এই ধর্মই মানুষকে পশুর থেকে আলাদা করে রেখেছে। যদি ধর্ম চলে যায়, যদি শুধু বর্তমান অস্তিত্বের মুহূর্ত-মাত্রকেই নিয়ে আমরা তৃপ্ত থাকতে চাই, তা হলে মানুষকে পশুর ভূমিতে নেমে পশুর সংজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। এই ধর্মই মানুষকে নেমে যেতে দিচ্ছে না, উচ্চে, উচ্চতরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। তাই সত্যিকার উন্নয়ন। মানুষের সমস্ত ভৌতিক ও মানসিক উন্নতির মূলে ওই ঊর্ধ্বপ্রেরণা। ওই প্ররোচক শক্তি।

কিন্তু ধর্ম কি দারিদ্র্য দূর করতে পারে? পারে না। বলছেন স্বামীজি, কত কিছু দিয়েই তো কত কিছু হয় না। মনে করো, তুমি একটা জ্যোতিষিক সিদ্ধান্ত প্রমাণ করতে চেষ্টা করছ, একটি শিশু হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে জিগগেস করল, এতে কি কিছু খাবার পাওয়া যায়? তুমি উত্তর দিলে, না, তা পাওয়া যায় না। তখন শিশু বললে, তবে ও দিয়ে কী লাভ হবে? শিশু তার নিজের দৃষ্টি দিয়ে সমগ্র জগতের লাভালাভের বিচার করে। তেমনি যারা অল্পদৃষ্টি, অজ্ঞানাচ্ছন্ন, তাদের বিচারও ঐ শিশুর বিচার। হীরে কিনতে গিয়ে বেগুনওয়ালার ছ আনা সের দাম দেওয়ার মত। প্রত্যেক বিষয়কে তার নিজ-নিজ ওজনে বিচার করতে হবে। অনন্তকে বিচার করতে হবে তাই অনন্তের ওজনে। ধর্ম মানুষের সর্বাংশ, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ—সমস্তকে নিয়ে, সমস্তকে আশ্রয় করে। তাই শুধু ক্ষণকালের ভিত্তিতে তার মূল্যনির্ণয় ন্যায়সংগত হবে না।

ধর্ম তো অনেক কিছুই পারে না। কিন্তু, বলতে গেলে, পারে কী? মনুষ্য

নামক প্রাণীকে দেবতা করতে পারে। তাকে দিতে পারে অনন্ত আনন্দময় মহাজীবন-লাভের অধিকার। আর এই ধর্মই হিন্দুর।

ভারতবর্ষ তো বর্বরের দেশ, স্বামীজিকে দেখে-শুনে এ আর কেউ বলতে পারছে না। কারু সাহস নেই বলে হিন্দুধর্ম অকিঞ্চিৎকর কিংবা ভারতবাসীরা অসভ্য। স্বামীজির সামনে প্রখরতম, মুখরতম শত্রুও ক্ষুদ্র হয়ে যায়। তবু হীনমতি কেউ-কেউ পত্র-পত্রিকায় তাঁর অযথা নিন্দা করে। ভক্তের দল রুষ্ট হয়ে ওঠে। স্বামীজিকে বলে, লিখিত প্রবন্ধে এর প্রতিবাদ করুন, যোগ্য প্রত্যুত্তর দিন। স্বামীজি হেসে বলেন, 'কে নিন্দুক কে বা নিন্দিত? কে বা প্রশংসক, কার বা প্রশংসা? সব বাক্যের বুদ্বুদ, আসল যা সত্য, তাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না, রোধ করতে পারবে না, পারবে না গোপন করতে। তারপর বললেন স্বগতোক্তির মত. সকলেই যদি তোমার যশোগান করে তা হলে তোমার অক্ষমতা তুমি বুঝবে কি করে? ধৈর্য, ক্ষমা, তিতিক্ষা, প্রসন্নতা—এ সব তোমার মধ্যে প্রকাশ পাবার সুযোগ পাবে কি করে, যদি তোমার প্রতিপক্ষ তোমার বিরুদ্ধবাদী কেউ না থাকে? যদি তুমি সন্তাপের ক্রুশ বহন না করো তা হলে তুমি ঈশ্বরের চিহ্নিত হলে কি করে?

কিন্তু স্বামীজি বিরক্ত হলেন লেকচার-ব্যুরোর উপর, যারা তাঁকে ঠকিয়ে টাকা লুটছে পকেট পুরে। প্রথম-প্রথম একেকটা বক্তৃতার জন্যে তাঁকে নশো ডলার করে দিচ্ছিল, এখন ক্রমশই, কমাচ্ছে টাকার পরিমাণ। ব্যাপার কি? প্রতি সভাতেই তো উদ্বেল জনতা, তবে গেট-মানি কম হচ্ছে বলে তো অনুমান হয় না। দৃষ্টি একটু সজাগ করলেন স্বামীজি। দেখলেন, সেদিন এক ঘণ্টার এক বক্তৃতায় আদায় হল আড়াই হাজার ডলার কিন্তু তাঁকে দেওয়া হল মাত্র দুশো। দরকার নেই আমার টাকায়! আমি এমনই ঘুরে-ঘুরে বেড়াব। বলে বেড়াব ধর্মের কথা, ঈশ্বরের কথা। লেকচার-ব্যুরোর সংগে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন স্বামীজি।

যিনি অনাদি কিন্তু জগতের আদিভূত, যাঁকে আশ্রয় করে এই সংসারচক্র বিঘূর্ণিত হচ্ছে, যাঁকে দর্শন করলেই এই সংসারচক্র নিবৃত্ত হয়, সেই সংসার-তিমিরহারী শ্রীহরির স্তব করি। যাঁর অংশাবিশেষ থেকে এই অশেষ বিশ্ব আবির্ভূত, আবার যিনি বিশ্বকে আবদ্ধ করে রেখেছেন, পরিব্যাপ্ত করে রেখেছেন, যাঁর সান্নিধ্যহেতুই জীবের সুখদুঃখের অনুভব, সেই সংসারতিমিরহারী শ্রীহরির স্তব করি। যিনি সর্বজ্ঞ সর্বময় হয়েও অগণন বিভক্তরূপে প্রতীয়মান, যিনি অন্তত আনন্দময় কল্যাণগুণধাম, যিনি অব্যক্ত হয়েও ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে প্রতিভাত, যিনি সদসৎ সমস্ত পদার্থস্বরূপ, যিনি ছাড়া পৃথিবীতে কোনো বস্তুরই অর্থ নেই, যাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো পরামার্থ সত্তা উপলব্ধ হয় না সেই সংসারতিমিরহারী শ্রীহরির উপাসনা করি।

৫৩

টমাস কুক্ এণ্ড সন্সের ক্যাশিয়ার কালীকৃষ্ণ দত্ত হেড অফিসে চিঠি লিখছে। লিখছে, দয়া করে স্বামী বিবেকানন্দের গতিবিধির খবর পাঠান কলকাতায়, তার বন্ধু-বান্ধবরা, তার সন্ন্যাসী ভাইয়েরা সকলেই তাঁর জন্যে উৎকণ্ঠিত। শুনতে পাওয়া যাচ্ছে

আমেরিকায় তিনি ঝড় তুলে দিয়েছেন। যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই বক্তৃতা দিয়ে মাতিয়েছেন জনগণকে। সে সব ভ্রমণ ও বক্তৃতার বিস্তৃত বিবরণ কিছুই আসছে না এদেশে। ধর্মমহাসভার তুমুল কাণ্ডটাও আগাগোড়া জানা যাচ্ছে না। আপনারা ছাড়া আর কেউ নেই যার উপর পুরোপুরি নির্ভর করা চলে। আপনাদের জাহাজেই উনি গিয়েছিলেন এখান থেকে। সুতরাং আপনারা যদি একটু কষ্ট স্বীকার করে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে পাঠান তা হলে তাঁর স্বদেশবাসীরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবে আপনাদের কাছে।

সমগ্র বিবরণ ধীরে-ধীরে এসে পেঁছুতে লাগল। বরানগরের মঠের সন্ন্যাসীরা আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠল। আমাদের সেই নরেন। আমাদের সেই বীরেশ্বর।

'কেন, ঠাকুর বলেননি নরেন সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়ে দেবে? বলেননি, লালজ্যোতির মধ্যে বসে আছে নরেন্দ্র। বলেননি, ওর মন্দের ভাব, ওর উঁচু ঘর, অনন্তের ঘর। ও একটা তোলপাড় করে ছাড়বে।'

আর নরেন কী বলছে? হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখছে শিকাগো থেকে: 'শুধু মানুষের মধ্য দিয়েই ভগবানকে জানা সম্ভব। যদিও ভগবান সর্বত্র বিরাজিত তবুও তাঁকে আমরা শুধু এক বিরাট মানুষরূপেই কল্পনা করতে পারি। যদি খৃষ্ট, কৃষ্ণ কিংবা বুদ্ধকে পুজো করলে কোনো ক্ষতি না হয় তবে যে পুরুষোত্তম জীবনে চিন্তায় বা কাজে লেশমাত্র অপবিত্র কিছু করেন নি, তাঁকে পুজো করলে কি ক্ষতি হতে পারে? এই মহাপুরুষই জগতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই তথ্য প্রচার করলেন যে সকল ধর্মই সত্য, সব মতই এক পথে, সব পথই এক ঈশ্বরে।'

আবার লিখছেন এক আমেরিকান বন্ধুকে: 'বিশ্বাসে যে অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয় এতে আমি তোমার সঙ্গে একমত। একমাত্র বিশ্বাসই যে মানুষের ত্রাণ করতে পারে তাও আমি মানতে প্রস্তুত। কিন্তু এতে আবার গোঁড়ামি আসবার সম্ভাবনা আছে। আর গোঁড়ামি এলেই ভবিষ্যতের দ্বার রুদ্ধ। জ্ঞান? জ্ঞান ঠিক পথ, কিন্তু এখানেও ভয়। জ্ঞান যেন না দাঁড়ায় শুধু শুকনো পাণ্ডিত্যে। আর ভক্তি? ভক্তি খুব বড় জিনিস কিন্তু এও ভয়শূন্য নয়। এতে আসতে পারে নিরর্থক ভাবপ্রবণতা। আর বিহ্বলতাই নষ্ট করে দিতে পারে খাঁটি শস্যটুকু। এ তিনির সামঞ্জস্য যে করতে পারে সেই আসল পুরুষ। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেই এই তিনের সমন্বয়।

যার যা খুশি বলুক, শ্রীরামকৃষ্ণের মত এমন উন্নত চরিত্র কারু কোনো কালে দেখিনি। যে তাঁকে যেভাবে নিক কিছু এসে যায় না। যা খুশি বলুক তাঁকে আচার্য, বা আদর্শপুরুষ বা মহাপুরুষ, যে আরো এগুতে চায় বলুক তাঁকে পরিত্রাতা বা ঈশ্বর, কিছু বাধা দিতে যেও না। শুধু এইটুকু জেনো যে তাঁকেই কেন্দ্রস্বরূপ করে ধরে চলতে হবে ঘুরতে হবে দুনিয়ায়। আয় তোরা যে যেখানে আছিস, সবাই চলব একসঙ্গে, রামকৃষ্ণরাজ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সকলের সমান অধিকার। অদ্বৈতবাদী অজ্ঞেয়বাদী অভেদবাদী প্রভেদবাদী সব এক জোট।'

কেশব সেনের চেলা অমৃত বসুর কথা মনে পড়ে। কেশবের সঙ্গে প্রায়ই আসত দক্ষিণেশ্বর আর নিশ্চল ভক্তি করত রামকৃষ্ণকে। তাকে খেপাবার জন্যে তার আসল মনোভাব জানবার জন্যে বিপরীত ভাব ধারণ করত নরেন।

'কী এমন ছিল ঐ লোকটা।' নরেন বলত গম্ভীর মুখে: 'পুতুল পুজো করত, আর থেকে-থেকে ভিরমি যেত।' ওতে আবার ছিল কী! মাথার ব্যামো আর চোখের ভ্রান্তি।'

'তোমার মুখে এই কথা ?' অমৃত তেড়েফুঁড়ে উঠত।

'কেন, আমাকে রেখে-ঢেকে বলতে হবে নাকি ? সত্য কথা বলতে পারব না ?' বিস্ময়ের ভান করত নরেন।

'তোমাকে তিনি কত ভালোবাসতেন, কত সন্দেশ খাওয়াতেন নিজের হাতে—তোমার শেষে এই প্রতিদান ! তাঁকে অবজ্ঞা করে কথা কইছ ?'

'সন্দেশ খাওয়াতেন বলে মিষ্টি কথাই বলতে হবে ? সত্যি কথা বলা চলবে না ?'

'সত্যি কথা ? পরমহংস মশায়ের মত কটা লোক হয়েছে জগতে ? তুমি যে এত অপদার্থ হয়েছ তা জানতাম না। তাঁরই খেয়ে-পরে তাঁরই নিন্দে করছ ?' রাগে গরগর করতে লাগল অমৃত।

নরেন তবু ছাড়ল না কটূক্তি। যতই সে মৌচাকে খোঁচা মারে ততই মধু ঝরে অনর্গল, অমৃত অমৃত হয়ে ওঠে।

'যাও, তোমার সঙ্গে তাঁর কথা কইতে নেই। তোমার দর্শনও দুর্ভাগ্য।' উঠে পড়ল অমৃত, দুর্জনসংসর্গ দ্রুত ত্যাগ করল।

শ্রদ্ধাভক্তির একটা অগ্নিস্রাবী পর্বত। যতই ধুলোবালি ছুঁড়ি ততই সে নির্মলনীল আকাশ হয়ে থাকে। জানতুম না আগে, অমৃতের এমন ঊর্জিত ভক্তি। এমন ধনুকটঙ্কার।

অমৃত রাগ করে চলে গেলে বাবুরামকে নরেন বললে, 'একটা লোককে সারা জীবনের মত চটিয়ে রাখলাম।'

আহিরিটোলার স্থরেন বসু স্বামীজির কাছে সন্ন্যাস নেবে ঠিক করেছে। অমৃতের সঙ্গে দেখা স্থরেনের। অমৃত একেবারে মুখিয়ে উঠল : 'কি হে স্থরেন, গুরু কি আর খুঁজে পেলে না ? শেষকালে একটা কায়েত ছোঁড়ার কাছে সন্ন্যাস নিলে ?'

'আপনারও কি আর শহরে গুরু জুটল না,' পাল্টা জবাব দিল স্থরেন, উত্তরকালে স্বামী স্থরেশ্বরানন্দ : 'শেষকালে একটা বদ্যির চেলা হলেন ?'

বদ্যির চেলা মানে কেশব সেনের চেলা।

সেই ঠাকুর আর রাখালের সামনে গান গাওয়া মনে পড়ছে। গান গাইছে নরেন আর ঠাকুর কাঁদছেন। রাখালও কাঁদছে।

নরেন গাইছে : 'কাহে সই জীয়ত মরত কি বিধান।'

আরো গাইছে, আবার গাইছে মাতোয়ারা হয়ে : 'তুমি হাতকি দর্পণ, মাথকি ফুল, তুমি নয়নের অঞ্জন, বয়ানের তাম্বুল। তুমি অঙ্গকি মৃগমদ, গীমকি হার, তুমি দেহকি সর্বস্ব গেহকি সার। পাখিকো পাখ, মীনকো পানি, তৈসি হাম বঁধু তুয়া মানি ॥'

সেই একবার মৃত্যুভয় এসেছিল, চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল নরেন, ওগো, আমার তুমি এ কী করলে ? আদ্যোপান্ত অন্ধকার, এ কী বিভীষিকা ! সে যে রামপ্রসাদের 'কালো হতেও অধিক কালো।' তাতে সব ডুবছে, সব তলিয়ে যাচ্ছে, ধীরে মন্থরে, অনিবার্যরূপে—দেশ, কাল, অনুভূতি, অভিজ্ঞান, মূল পল্লব—নিঃসীম, নিস্তল। কিন্তু এ কী, এ কী রূপ অন্ধকারের, অন্ধকারে অন্ধকারই লুক্কায়িত, এ যে অকথিত স্থখ, অস্পন্দিত প্রাণ, অহংশিখাহীন নিরুপাধিক দীপ্তি। ওগো, তুমি আমার এ কী করলে, কোথায় নিয়ে এলে, কোন গম্ভীর নির্বাণে—

'মিস্টার—' ট্র্যামের কন্ডাকটর এসে দাঁড়াল কুণ্ঠিত হয়ে।

স্বামীজি চোখ মেললেন।

'ট্র্যাম টার্মিনাস ঘুরে আবার ফিরে চলেছে।' বললে কণ্ডাকটার। 'কোথায় আপনার নামবার কথা?'

লজ্জিত হলেন স্বামীজি। একটুও খেয়াল ছিল না, ধ্যানস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাড়াতাড়ি ভাড়া চুকিয়ে দিলেন। স্থির করলেন এবার ঠিক নজর রাখবেন কোথায় তাঁর নামবার স্টপ।

এত ব্যস্ততা এত মুখরতা, তবু অবকাশ পেলেই আত্মভাবে তন্ময় হয়ে যান স্বামীজি। যত ভাবেন হবেন না, তবু চারদিকের ছুটোছুটি কলকোলাহলের মধ্যেও কি করে কে জানে জুটে যায় অবকাশ আর ক্ষণেকের মধ্যেই বাহ্যজ্ঞান লোপ হয়ে যায়। তোমার প্রকৃতিগত যে ধ্যানধারণার ভাব, কিছুতেই তার থেকে তোমার বিচ্যুতি নেই। লৌকিক জগতে যতই তোমার কাজ থাক না, ভুলো না তুমি আবার আলোকলোকের।

যে বাড়িতে শিকাগোতে আছেন স্বামীজি সে বাড়ির ভদ্রমহিলার কোন এক ব্যবসাতে শরিক রকফেলার। হ্যাঁ, সেই ধনকুবের রকফেলার। একবার দেখা করবে স্বামীজির সঙ্গে? আমার বাড়িতেই আছেন। রকফেলার গ্রাহ্য করে না। কে না কে এক হিন্দু সাধু। কী এমন ঠেকা তাকে দেখে আসার! চলো না। তার বন্ধুরাও তাকে টানাটানি করে। দেখবে সাধারণের বাইরে, তোমার সাধুত্বের কল্পনার ঊর্ধ্বে। দেখবে আর চলে আসবে এ হবার নয়। দেখবে আর থমকে দাঁড়াবে ক্ষণকাল।

যদিও রকফেলার তখনো এক ডাকের রকফেলার নয়, তখনো ছোঁয়নি সে সৌভাগ্যের কাঞ্চনজঙ্ঘা, তবু সে তখনো একজন কঠিন ব্যক্তিত্বের ব্যবসায়ী, আর যা ব্যবসায়ের বাইরে তাতে তার স্পৃহা নেই। যদি ডলার থাকে তবেই কিছু বলার থাকতে পারে। সাধ্য নেই তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ নড়ায়-টলায়।

কিন্তু সেদিন হল কী? সেদিন কে তাকে ঠেলতে লাগল রাস্তায়। কেউ তাড়া করলে যেমন লোকে ছোটে তেমনি। আর আশ্রয়ের জন্যে আয় তো আয়, সোজা তার সেই বান্ধবীর বাড়িতে। সামনেই পড়ল বাটলার, তার গায়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কাকে চাই? এইখানে এই বাড়িতে একজন হিন্দু সাধু আছেন না? তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বাটলার স্বামীজির ঘরের দিকে ইঙ্গিত করল। কিন্তু কে এসেছে না এসেছে, তার সঙ্গে দেখা করবার তাঁর এখন সময় হবে কিনা এসব হদিস জানবার জন্যে ক্ষণমাত্র অপেক্ষা করল না রকফেলার। সবলে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল অনাহূত।

কিন্তু, আশ্চর্য, সহসা দাঁড়াল সে এক আশ্চর্যের মুখোমুখি।

যে সমস্ত নিয়ম-কানুন ভদ্রতা-শিষ্টতা অস্বীকার করে বন্যের মত অসভ্যের মত ঢুকে পড়েছে তার দিকে স্বামীজি ফিরেও তাকালেন না। একটা টেবিলের সামনে বসে তিনি লিখছিলেন, চোখও তুললেন না। এত দৌড়ঝাঁপ গোলমাল একটা আঁচড়ও টানতে পারল না তাঁর স্তব্ধতায়, তাঁর অভিনিবেশে।

'আমি রকফেলার।'

যেন তার সব তিনি জানেন, সব তিনি দেখে নিয়েছেন এমনি উদাসীন মুখে স্বামীজি বললেন, 'বোসো।'

রকফেলার বসল। চুপ করে রইল। সেই স্তব্ধতা তার সমস্ত সত্তায় শান্তি ঢেলে দিতে লাগল। একটি-একটি করে স্বামীজি তাকে তার অতীত দিনের কথা বলতে লাগলেন।

'এ কি, এ তুমি কী করে জানলে ?' রকফেলার লাফিয়ে উঠল।

'শোনো আমি আরো জানি। জানি তোমার ভবিষ্যৎ।'

'ভবিষ্যৎ ?'

'হ্যাঁ, অদূর-সুদূরে, সমস্ত, সমস্ত দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে।'

'কী দেখছ ?'

'দেখছি তোমার অনেক-অনেক টাকা। কিন্তু দেখছি এ টাকা তোমার নয়।'

'আমার নয় ?'

'না, দেখছি এ ঈশ্বরের টাকা। তোমার কাছে গচ্ছিত আছে। তুমি এ টাকা ঈশ্বরের সন্তানদের জন্যে, দুঃস্থ ও দুর্বল সন্তানদের জন্যে বিতরণ করছ অকাতরে।'

'তোমার কী স্পর্ধা, তুমি এ কথা বলো।' দারুণ বিরক্ত হল রকফেলার। 'পরের টাকা লোকে এমনি বেশি দেখে! পরের টাকা নর্দমার জলে ভাসিয়ে দিতে কারু গায়ে লাগে না। যত সব বাজে কথা।'

সামান্য মৌখিক বিদায়-অভিবাদন না জানিয়েই বেরিয়ে গেল রকফেলার।

'হিন্দুস্থানী কবি তুলসীদাস কী বলছে ?' চিঠি লিখছেন স্বামীজি: 'বলছে, আমি সাধু অসাধু দুজনেরই বন্দনা করি। কিন্তু হায়, দুজনেই সমান দুঃখদাতা। অসাধু লোক কাছে এলেই আমার যন্ত্রণা আর সাধু লোক আমাকে ছেড়ে যখন চলে যায় তখন আমার প্রাণহরণ করে নিয়ে যায়। আমার সুখের আর কী আছে? ভালোবাসবারই বা কী আছে? ভগবানের যারা প্রিয়, ভক্ত আর সাধু, তাদেরকে ভালোবাসাই আমার অনন্ত সুখ অনন্ত প্রেম। হে আমার প্রিয়তম, হে আমার প্রিয়তমের বংশীধ্বনি, তুমি বাজো, বাজতে থাকো। তুমি যেদিকে চালাও যেদিকে আকর্ষণ করো আমি সেই দিকেই যাব। যিনি আমাদের প্রিয়তম, তাঁর কত শক্তি কত গুণ, তার কে লেখাজোখা করবে? আমাদের কল্যাণ একবারও তাঁর কত শক্তি। কিন্তু চিরদিনের জন্যে বলে রাখছি, আমরা কিছু পাবার জন্যে ভালোবাসি না। আমরা প্রেমের দোকানদার নই। আমরা প্রতিদান চাই না, আমরা কেবল দিয়ে দিয়েই ভরে উঠতে চাই। চলতে-চলতেই পেতে চাই অমৃত।

মূর্খ, তুমি কার সামনে নতজানু হয়ে ভয়ে প্রার্থনা করছ? চেয়ে দেখ, আমি তাকে সরু একগাছি সুতো দিয়ে গলায় হারের মত করে বেঁধে নিয়ে চলেছি। ঐ হার প্রেমের হার, ভাবের সুতো। যিনি অসীমস্বরূপ তিনি আমার ভালোবাসায় বাঁধা পড়ে আমার মুঠোর মধ্যে চলে এসেছেন। যিনি এত বড় জগৎটাকে চালাচ্ছেন তাঁর এরকমভাবে ধরা পড়তে এতটুকুও বাধছে না।'

কদিন পরে আবার স্বামীজির কাছে ছুটে এল রকফেলার। তেমনি অঘোষিত ঢুকে পড়ল স্বামীজির ঘরে। সেই দিনের সেই মূর্তি। স্বামীজি এতটুকু চঞ্চল হলেন না। যেমন ছিলেন তেমনি বসে রইলেন নত নেত্রে।

'কী, হল? এখন খুশি?' টেবিলের উপর একতাড়া কাগজ ফেলল রকফেলার। কোথায় কোন জনহিতের প্রতিষ্ঠানে বিপুল দান করছে তার পরিকল্পনা। শুধু পরিকল্পনা নয়, সঙ্গে প্রকাণ্ড টাকার একটা চেক।

'আশ্চর্য, আপনার কথাই ফলল।' বললে রকফেলার, 'দুঃস্থ-দুর্বলের জন্যেই দান করছি—এই সর্বপ্রথম। কী, আমাকে ধন্যবাদ দেবেন না ?'

তবু স্বামীজি তাকালেন না চোখ তুলে। টেবিলের উপর থেকে কাগজগুলি টেনে নিলেন নিজের কাছে। পড়তে লাগলেন।

বললেন, 'ধন্যবাদ তো তোমারই আমাকে দেওয়া উচিত।'

কোনো উত্তপ্ত অভিনন্দন নয়, নয় বা কোনো উদ্বেল প্রশংসা। যেন এ অনেক দিনের জানা কথা। এ হবেই। এ হতে বাধ্য।

ভারতবর্ষের দিকে-দিকে স্বামীজির উদ্দেশে জয়ধ্বনি উঠল। তিনি আমেরিকাতে হিন্দুধর্মের গৌরবপতাকা উড্ডীন করেছেন। মুখোজ্জ্বল করেছেন হিন্দুর, তার দেশের, তার ধর্মের, তার ঐতিহ্যের।

রামনাদের রাজা, ভাস্কর সেতুপতি, পাঠালেন জয়পত্র। খেত্রীর রাজা অজিত সিং দরবার বসালেন। সংবর্ধনা করলেন স্বামীজির। মাদ্রাজের গণ্যমান্যরাও সভা করলেন। পাঠালেন সানন্দ অভ্যর্থনা। সব খবর পৌঁছুতে লাগল স্বামীজির কাছে। তিনি বুঝলেন এ তাঁর নিজের স্তুতি নয়, তাঁর দেশের স্তুতি, এ তাঁর নিজের মর্যাদা নয়, তাঁর ধর্মের মর্যাদা। কিন্তু কলকাতা, তাঁর জন্মস্থান কী করল?

জয়ের উৎফুল্লতায় কলকাতাও প্রমত্ত হয়ে উঠল। টাউনহলে প্রকাণ্ড সভা বসল। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতি হলেন। ১৮৯৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর, লোকে লোকারণ্য সভা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান বক্তা। যে শোনে যে দেখে সেই রোমাঞ্চিত হয়, নিজেকে হিন্দু বলে ভাবতে গর্বে মাথা উঁচু হয়ে ওঠে। অভিনন্দনপত্র পাঠানো হল স্বামীজিকে। শ্রীমৎ বিবেকানন্দকে।

'হিন্দুত্বের মহিমার প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে তোমার এই শ্রম ও ত্যাগ, উৎসাহ ও ঔদার্য আমাদের, হিন্দুদের, তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ করে রাখবে। তুমি আমাদের সম্মানিত করেছ, গৌরবমুকুটে ভূষিত করে হিন্দুত্বকে বসিয়েছ রাজোত্তম সিংহাসনে। তুমি ছাড়া আর কে পারত ব্যাখ্যা করতে! তোমার ছাড়া কার ঐ বেদোজ্জ্বলা বাণী বেদান্তস্নিগ্ধ ভাষা। অল্পক্ষণের বক্তৃতার মধ্যে তুমি ছাড়া আর কে অত স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল হতে পারত! চিরকাল আমাদের হিন্দুধর্মকে ঘরে-বাইরে অপব্যাখ্যায় বিড়ম্বিত হতে হয়েছে, তুমি সর্বপ্রথম মোচন করলে অজ্ঞান ও অবজ্ঞার কুয়াশা। অপরিচিত দেশের প্রতিকূল জনগণ তোমাকে শুনে মুগ্ধ হল আশ্বস্ত হল, লুটিয়ে পড়ল বশ্যতায়। তারা বাধ্য হল তোমার প্রতি সদয় হতে তোমাকে মাথায় করে রাখতে। তোমার ধর্মের মর্মবাণী শুনতে। তুমি আমাদের সক্ষম সারথি হও, আমাদের সনাতন ধর্মের নিহিতার্থকে উদ্ঘাটিত করো। ঈশ্বর তোমাকে শক্তি দিন, নিরন্ত উৎসাহে উদ্দীপ্ত করে রাখুন।'

শুধু কলকাতার নয় ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে বেজে উঠল এক মন্ত্র: বিবেকানন্দ। ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা বিবেকানন্দ। বেদান্তনিষ্ঠ ব্রহ্মবাদী জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধার্থ নির্মল-নিরাময় বিবেকানন্দ।

হে তপোজ্জ্বল দৃপ্ত সন্ন্যাসী, তোমার অভিঃমন্ত্র হৃদয়ে স্ফুরিত হোক। অখিল ধর্মের অধীশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের তুমি কর্মমূর্তি, তুমি আমাদের উদ্বুদ্ধ করো। আমাদের উত্তাল জীবনসমুদ্রের পারে অনির্বাণ আলোকস্তম্ভ হয়ে বিরাজ করো সর্বক্ষণ।

'দিনরাত বলো, ঈশ্বর, তুমিই আমার পিতা, আমার মাতা, আমার স্বামী, আমার দয়িত, আমার প্রভু, আমার সর্বস্ব। তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছু চাই না, কিছুমাত্র না। তুমি আমাতে, আমি তোমাতে। আর জানি তুমিই আমি আমিই তুমি।' মিস

ছেলেকে চিঠি লিখছেন স্বামীজি : 'ধন চলে যায় রূপ চলে যায় আয়ু চলে যায় কিন্তু প্রভু চিরদিন থাকেন, প্রেমও বাসি হয় না তেতো হয় না একঘেয়ে হয় না। যদি ঈশ্বরে লেগে থাকতে পারো তবে দেহের কোথায় কী হচ্ছে কে গ্রাহ্য করে? যখন নানা দুঃখ বিঘ্ন এসে ভয় দেখাতে থাকে, যখন মৃত্যুযন্ত্রণা দেখা দেয়, তখনো বলো, হে আমার ভগবান, হে আমার প্রিয়তম, তুমি আমার কাছেই রয়েছ, তুমি আমাকে একলা ফেলে রেখে সরে যাওনি। আমার দুঃখ হোক, তুমি সুখে থাকো। আমার মরুভূমিতে তুমি নিত্য আনন্দের কালিন্দী।'

৫৪

তদানীন্তন আমেরিকায় সবচেয়ে বড় বক্তা রবার্ট ইঙ্গারসোল। প্রতি বক্তৃতায় তাঁর ফি পাঁচ থেকে পাঁচশো ডলারের মধ্যে। তেমন বুঝলে কখনো বা ছ শো। ইঙ্গারসোল অজ্ঞেয়বাদী। যাকে স্পষ্ট করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে জানা যাবে না তার সম্বন্ধে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? ঈশ্বর থাকলে আছেন না থাকলে নেই, তাতে আমার কী ক্ষতিবৃদ্ধি? আমি ভালো হয়ে বাঁচি, ভালো করে থাকি, ভালো পথে গাড়ি চালাই। ধর্ম আবার কিসের? সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে জানা, থাকতে পারাই ধর্ম।

'তুমি অমন দুর্ধর্ষ স্পষ্ট করে কথা বলো কেন?' ইঙ্গারসোলের সঙ্গে দেখা হতে একদিন বললে স্বামীজিকে। 'আমার মত ধোঁয়াটে রাখতে পারো না?'

স্বামীজি হাসলেন। বললেন, 'কথা যে মুখের থেকে আসে না, প্রাণের থেকে আসে।'

'তবে যে রকম কথা শ্রোতারা পছন্দ করবে সেই দিকে একটু চোখ রাখবে বৈ কি। শ্রোতাদের সমাজ বা রীতিনীতি নিয়ে সমালোচনা করতে সতর্ক হওয়া দরকার।'

'আমার বলার মূলে সত্য, সত্যের প্রেরণা, তাই কার কী পছন্দ হচ্ছে না হচ্ছে আমি গ্রাহ্য করি না।'

'কিছুকাল আগে এসে এরকম ভাবে প্রচার করলে ওরা তোমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিত, নয়তো গাছে বেঁধে মারত পুড়িয়ে।'

'বলো কি, এত ধর্মান্ধ ছিল আমেরিকা?' স্বামীজি অবাক হলেন।

'অন্তত ঢিলিয়ে বার করে দিত দেশ থেকে।'

'বিশ্বাস করি না। তোমাকে দিলেও আমাকে দিত না, পারত না দিতে।'

'কেন?' ইঙ্গারসোল দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করল। 'তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ কি? তুমিও প্রচারক আমিও প্রচারক। বরং আমি এদেশের লোক, আমার প্রতিই এদের আনুকূল্য স্বাভাবিক। আর তুমি তো বিদেশী, কালা আদমি, পুত্তলপূজক।'

হাসলেন স্বামীজি : 'কিন্তু, জানবে, আমি প্রেমপ্রেরিত। তোমার মত কাউকে ক্ষুব্ধ করে, রুদ্ধ করে, কাউকে বা শঙ্কিত করে রাখে। আর আমার ধর্মে কোথাও বিরোধ নেই, অস্বীকৃতি নেই, প্রত্যাখ্যান নেই, কাউকে ঠেলে বার করে দেয় না, কাউকে বা রাখে না দূরস্থ করে। সবাইকে বুকের কাছে টেনে আনে, তুমিই সেই বলে সম্ভাষণ করে, মানুষকে মহত্তম পদবীর ভূষণ পরায়। তা ছাড়া যীশুখৃষ্টকে আমি ভালোবাসি, আর তার মা মেরী মাধুর্যের প্রতিমা, আমাদের গণেশ-জননী, অখিলতৃপ্তিস্বরূপা জগন্মাতা ভগবতী।'

'তোমার ভয় করে না এসব বলতে ?'

'যার অন্তরে ভালোবাসা আছে তার আবার ভয় কী ? জানো পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তার চেয়েও আমার ভালোবাসা বেশি। এক-এক করে সকলকে পরিপূর্ণ বিলিয়ে দিয়েও ভাণ্ডার বেশি থাকে, কিছুতেই ক্ষয়ব্যয় হয় না।' উজ্জ্বল চোখের প্রসন্ন প্রেমাভা চারদিকে বিস্তার করলেন স্বামীজি।

বক্তৃতার টানে ঘুরতে-ঘুরতে প্রায়ই দুজনের দেখা হয়। সেদিনও, দেখা হলে আবার কথা উঠল কে বেশি উপভোগ করছে, ইঙ্গারসোল না স্বামীজি।

'ইন্দ্রিয়চেতনার বাইরে আর সমস্তই যখন অজ্ঞেয়', বলছে ইঙ্গারসোল, 'তখন যা জ্ঞেয় গ্রাহ্য আস্বাদ্য তাই লুটেপুটে ভোগ করে নিচ্ছি। আমিই বেশি করে নিংড়ে রস বার করে নিচ্ছি লেবুর থেকে।'

'বেশি করে নিংড়োলে তেতো হয়ে যাবে। অত তাড়াহুড়োর দরকার কী ?'

'তাড়াহুড়ো করব না ? দুদিন পরে মরে যাব যে।'

কিন্তু আমি জানি, আমার মৃত্যু নেই। আমি জানি কোথাও ভয় নেই, শেষ নেই, বিচ্ছেদ নেই। তাই আমি ধীরে-সুস্থে নিংড়োই, প্রত্যেকটি বিন্দু, প্রত্যেকটি মুহূর্ত পুরোপুরি সম্ভোগ করি। আমার রসও বেশি স্বাদও বেশি।'

'কোন অর্থে ?'

'আমি সন্ন্যাসী যে। আমার কোনই পার্থিব বন্ধন নেই, না স্ত্রী-পুত্র না বা বিষয়-আশয়। আমি তাই শত্রু-মিত্র বিমুখ-উৎসুক সমস্ত নরনারীকে ভালোবাসতে পারি। নিকটতম থেকে দূরতম পর্যন্ত।'

'পারো ?'

'পারি। যেহেতু প্রত্যেকেই আমার কাছে ঈশ্বর—ঈশ্বরপ্রতিচ্ছায়া। মানুষকে ঈশ্বর ভেবে ভালোবাসার আনন্দ একবার ভাবো দেখি। এ কি লেবুর প্রত্যেকটি বিন্দুকে পরিপূর্ণ আস্বাদ করা নয় ? আর, বলো তো, এ রস কি ফুরোয় কোনদিন ?'

নানা শহর ঘুরে বেড়াতে লাগলেন স্বামীজি। শিকাগোকে কেন্দ্র করে যেতে লাগলেন এখানে-ওখানে। হেলের বাড়ি, ৫৪১ ডিয়ারবর্ন এভিনিয়ু, তাঁর স্থায়ী ঠিকানা। কোথায় না যাচ্ছেন। ম্যাডিসন, উইসকোনসিন, মিনিয়াপোলিস, মিনেসোটা, ডিসময়েনিস, মেমফিস, টেনেসি, আইওয়া, সেন্টলুই, ইণ্ডিয়ানা পোলিস, ডেট্রয়েট হার্টফোর্ড, বাফেলো, বস্টন, কেম্ব্রিজ, বাল্টিমোর, ওয়াশিংটন, ব্রুকলিন আর নিউইয়র্ক। কিন্তু তাঁর বক্তব্য কী ? তাঁর বক্তব্য ধর্ম। তাঁর বক্তব্য ঈশ্বর। মানুষই ঈশ্বর।

তাঁর ম্যাডিসনের বক্তৃতা সম্বন্ধে লিখছে উইসকোনসিন স্টেট জার্নাল : 'কাল এখানকার গির্জায় প্রখ্যাত হিন্দু সন্ন্যাসী, বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। কী অপূর্ব বললেন তিনি। পৌত্তলিক, কিন্তু তাঁর অনেক কথাই খৃষ্টধর্ম মেনে নিতে পারে। তাঁর ধর্ম বিশ্বের মত বিস্তীর্ণ, কাউকে তা প্রত্যাখ্যান করে না, বরং সত্য যেখানেই থাক, নির্বিশেষে তা গ্রহণ করতে সমুৎসুক। অন্ধতা বা কুসংস্কার বা অলস অনুষ্ঠান ধর্ম নয়। ভারতীয় ধর্মে তার স্বীকৃতি নেই।'

মিনিয়াপোলিসে এলে সেখানকার পত্রিকা লিখছে : 'তাঁর কথায় কী প্রগাঢ় আন্তরিকতা ! ধীরে ধীরে বলেন, বলেন স্পষ্ট স্বচ্ছ কণ্ঠে। প্রতিটি শব্দ সুনির্বাচিত, পর্যাপ্ত-অর্থ, হৃদয়স্পর্শী। যে শুনবে সেই কথার শান্তিতে ও শক্তিতে কৃতনিশ্চয় হবে।

হিন্দুধর্মের সার কথা কী? আত্মা, প্রতিদেহে যা বাস করছে, তাই ঈশ্বর। আর যে ঈশ্বরত্ব মানুষের মধ্যে আগে থেকেই রয়েছে সুপ্ত হয়ে তার উদ্বোধনই ধর্ম। মানুষের মধ্যে দুটো বিরুদ্ধ স্রোত কাজ করছে, ভালো আর মন্দ। ভালো যদি প্রবল হয় মানুষ যাবে ঊর্ধ্বতর উন্নততর চেতনায়, আর মন্দ প্রবল হলে যাবে প্রতিকূলে। এই ভালোর বিকাশে ধর্মই প্রধান সহায়ক।'

স্বামীজিকে কেউ বলে ব্রাহ্মণ পুরোত, কেউ বা রাজামহারাজা। তবে উনি যে সব বিষয়ব্যাপার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন তা কারু বুঝতে কষ্ট হয়নি। কিন্তু তার সন্ন্যাসনাম কারু কাছেই যথার্থ স্পষ্ট নয়। সবাই তাকে ডাকে কানন্দ বলে। বিবে-টা নাম আর কানন্দ-টা উপাধি। এহ বাহ্য, আগে কহ আর। কী উচ্চারিত ব্যক্তিত্ব, চক্ষুভরা কী সে উজ্জ্বলতা, সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যেন কারু থেকে অনুমতি চেয়ে নয়, নিজের সহজাত দৈবাদিষ্ট অধিকারে। শুধু কথার কথা বলছে না, বলছে মুক্তাত্মার অন্তরের কথা। আর কী সুন্দর আলখাল্লা আর পাগড়ি আর কোট। তুমি কি দেখবে না শুনবে? দেখাই শোনা আর শোনাই দেখা।

'হিন্দু ধর্ম ছাড়া আর কিছু বোঝে না। তারা শিক্ষা বলতেও বোঝে শুধু ধর্মই। যা দিয়ে আমি অমৃত হব না তা নিয়ে আমি কী করব? সব জাতের কেবল একটাই মাত্র কর্তব্য নেই। প্রত্যেককেই কি দোকানদার হতে হবে? না, প্রত্যেককেই করতে হবে মাস্টারি? না, সব জাতই কেবল লড়াই করবে পরস্পর? পৃথিবীর সব জাতির কর্মের সমন্বয় দরকার। ভগবান মানবজীবনের অর্কেস্ট্রাতে ভারতবর্ষকে কেবল আধ্যাত্মিক সুরটাই বাজাবার ভার দিয়েছেন।'

আরো বলছেন স্বামীজি: 'তোমাদের ধর্ম কী? দোকানদারি, স্রেফ দোকানদারি। কেবল ঈশ্বরের কাছে ভিক্ষা করা: আমাকে এটা দাও ওটা দাও, আমার জন্যে এটা করো ওটা করো। শুধু আমার সম্ভোগের পথ সুগম করে দাও। হিন্দুরা মনে করে এই ভিক্ষে চাওয়াটা হীনকর। মাঙনেসে ছোটা হো যাতা। আমি স্বভাবে আছি আমার আবার অভাব কী! হিন্দুরা নিতে চায় না, তারা দিতে চায়। তারা দিতে পারে। তাদের দেবার জিনিস ভালোবাসা। আর, ভালোবাসা নেই কার? আর, কে বলবে, আমার ভালোবাসা ফুরিয়ে গিয়েছে? শোনো, হিন্দু বিশ্বাস করে ঈশ্বরকে ভালোবাসা যায়, শুধু মানুষকে ভালোবেসে। মানুষই ঈশ্বরের প্রতিনিধি।'

'আর তোমাদের ভঙ্গিটা কী? যতক্ষণ সুখে-স্বচ্ছন্দে আছ ততক্ষণই তোমরা ঈশ্বরের প্রতি সদয় আছ, আর যেই পড়বে দুঃখে-দুর্দিনে তখন ঈশ্বর নামঞ্জুর। হিন্দুর ওসব পাটোয়ারি নেই। হিন্দুর শুধু ভালোবাসার সম্বন্ধ। ঈশ্বর তার কাছে বাবা, মা, নয়তো সন্তান। সুখে রাখলেও বাবা, দুঃখে রাখলেও বাবা। কোলে রাখলেও মা, ফেলে রাখলেও মা। শান্ত হলেও সন্তান, দুরন্ত হলেও সন্তান। অঘটন ঘটলেও তার ঈশ্বর, না ঘটলেও ঈশ্বর। সপ্তাহভোর কাজ করছ ডলারের জন্যে, উপার্জনের মুহূর্তে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলে আর সমস্ত আয়টা রাখলে নিজের পকেটে। হিন্দুরা বলে, তুমি কৃপা করে আমাকে এ টাকা দিয়েছ, এ তোমার টাকা। তাই আমি এ টাকা তোমাকেই ফিরিয়ে দেব। যে মানুষ দুঃস্থ দুর্গত, তাদের সেবায় এ টাকা ব্যয় হলেই তোমার পাওয়া হবে, দেওয়া হবে তোমাকে। যেহেতু তোমরা শিক্ষিত, যেহেতু তোমরা ধনী, শক্তিমান, সেহেতু তোমরা ভাবছ ঈশ্বরকে পাবার হলে তোমরাই পেয়েছ, তোমরাই বুঝেছ পুরোপুরি। তাই যদি

হবে তবে তোমাদের মধ্যে এত পাপ কেন, কেন এত কাপট্য ? ঈশ্বরকে ছোঁয়া মানেই সোনা হয়ে যাওয়া, সরল হয়ে যাওয়া। আমৃত্যুকাল আনন্দসুন্দর হয়ে থাকা।'

স্বর্ণকুণ্ডল আগুনে পুড়লে সোনাই হয়ে যায়, দুধে দুধ ঢাললে যোগফল দুধেই হয়, জলে জল মেশালে জলের বেশি আর কিছু হয় না—সেইরূপ ত্বং, তুমি-পদার্থ জীব তার উপাধি ছেড়ে দিয়ে তৎ, সে-পদার্থ পরব্রহ্মে মিশলে একই থাকে, একই হয়ে যায়। তা হলে আর বিধি কী, নিষেধ কী !

'হ্যাঁ, ভারতবর্ষে আছে কুসংস্কার—কোন দেশে না আছে ?' বলছেন আরো স্বামীজি : 'তা নিয়ে কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে ঈশ্বরের জন্যে চাই তীব্র লিপ্সা, জ্বলন্ত আকুতি। ঈশ্বরকে কামনা করা ছাড়া আর জীবন কী ! জীবন থেকে জীবনে এক অফুরন্ত কান্নাই ঈশ্বর।'

কোন একটা পশ্চিমি শহরে এসেছেন স্বামীজি, কতকগুলি যুবক এসে তাঁর কাছে ভারতীয় দর্শনের কথা শুনতে চাইল।

'কে তোমরা ?'

'আমরা ফেলনা নই। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরিয়েছি।' হাসল ছেলেরা : 'পাশের গাঁয়ে আমরা থাকি।'

'ওখানে কী করছ ?'

'কৃষি ও পশু পালন করছি। খেটেখুটে আসছি ফার্ম থেকে। তাই পোশাক আর চেহারার এই চেহারা।' ছেলেরা ঘিরে ধরল স্বামীজিকে : 'সর্বত্র আপনার নামে ঢাক বাজছে—এমন বক্তা আর হয় না। আমাদের গাঁয়ে, যেখানে আমাদের ফার্ম, সেখানে গিয়ে কিছু বলুন না, আমরা একটু শুনি।'

'কী বলব ?'

'ভারতীয় যোগের কথাই বলুন।'

'বুঝতে পারবে ?'

'কেন পারব না ? আপনি বললে সব বোধগম্য হবে।'

'বেশ, যাব একদিন।' স্বামীজি রাজি হলেন।

দলের ভিতর থেকে কে একজন বলে উঠল : 'ভারতীয় যোগের মূল কথা কী ?'

'নির্বিচলতা।' বললেন স্বামীজি : 'সর্ব অবস্থায় অনুদ্বিগ্ন থাকা।'

বিষয় বিপণিতেই হোক, সংসারের কর্মকোলাহলেই হোক, হোক বা যুদ্ধক্ষেত্রে, যোগীর কিছুতেই বিক্ষেপ-বিচ্যুতি নেই। সে সমাধিনিষ্ঠ, সে অভ্রান্তচিত্ত। এ সমাধি ধ্যান-মুদ্রিতনেত্রে নিশ্ছিদ্র স্তব্ধতার অবস্থা নয়, এ সমাধি ভগবৎসত্তার সমুদ্রে নিজের সত্তাকে ডুবিয়ে দেওয়া—ভগবানের প্রেমের আনন্দে নিজের সমস্ত কামনাকে বিসর্জন দেওয়া—তিনি যে দেহ দিয়েছেন তা দিয়ে তাঁরই কর্ম করা, আর অন্তরে সর্বথা তাঁতেই বর্তমান থাকা। 'সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে।' এ যোগী নিত্যসমাহিত নিত্যযুক্ত নিত্যমুক্ত, যুদ্ধ তার কী করবে, কী করবে তার সুখ দুঃখ, জয় পরাজয় ? সে ঈশ্বরে অনন্যমন।

পাশের গাঁয়ে গেলেন স্বামীজি। ছেলেরা এল চারদিক থেকে। জুটল গাঁয়ের আরো মোড়ল-মাতব্বর।

কোথায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবেন ? আমাদের এখানে মঞ্চ নেই, বেদী নেই, কিছু নেই।

খালি একটা পিপে ছিল পড়ে। তাই উলটিয়ে দিয়ে বললে, 'এখানে দাঁড়ান, এখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিন।'

তাই সই। ওলটানো পিপের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে লাগলেন স্বামীজি। কিছুক্ষণ পরেই বক্তব্যে তন্ময় হয়ে গেলেন। দেখি কেমন তোমার ভারতীয় যোগ। দেখি কেমন তোমার ঈশ্বরস্থিতি। বন্দুকের গুলি ছুঁড়তে লাগল ছেলেগুলি—প্রায় স্বামীজিকে লক্ষ্য করে। তাঁকে আঘাত না করে অথচ ঠিক তাঁর পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে যায় শুধু এইটুকু সতর্ক থাকো। দেখি কী করে। দেখি বক্তৃতা থামায় কিনা। হাত তোলে কিনা সমর্পণের বা পরাভবের ভঙ্গিতে। নয় তো বা পালায় ঊর্ধ্বশ্বাসে। কানের পাশ দিয়ে প্রায় মাথা ছুঁয়ে শাঁ শাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে গুলি, তবু এক চুল নড়লেন না স্বামীজি। এক বিন্দু চাঞ্চল্যকৌতূহল দেখালেন না। থামলেন না এক নিশ্বাস। কী ব্যাপার ঘটছে, কেন এই আকস্মিক যুদ্ধোদ্যম, জানতে চাইলেন না, দৃকপাত দূরের কথা হৃক্ষেপও করলেন না। ভয় নেই চিন্তা নেই, বিক্ষেপ নেই বিক্ষোভ নেই, আসক্তি নেই অভিমান নেই, নিজের কর্তব্য নিজের বক্তব্য শেষ করলেন।

আনন্দে মহাকলরব তুলে ছুটে এল ছেলেরা। স্বামীজিকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। এই না হলে খাঁটি লোক, এই না হলে পুরুষোত্তম। বন্দুকের গুলিকে যে ভয় করে না, এই বর্বরোচিত দুর্ব্যবহারেও যার স্খলনপতন নেই, সেই তো মহাযোগী। কাকে যোগ বলে বুঝে নিয়েছি।

সর্ববিষয়ে সমচিত্ততাই যোগ। যোগীই যতচিত্ত, নিরাশী, নির্দ্বন্দ্ব, নির্ভয়-নিঃসংশয়। ঈশ্বরেই তার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। ঈশ্বর ছাড়া তার কেউ নেই, কিছু নেই। 'তস্মাৎ যোগী ভবার্জুন।' যোগই সমস্ত কর্মের কৌশল। যোগেই অনাময় পদলাভ।

৫৫

ট্রেন থেকে নামছেন, এক নিগ্রো কুলি এগিয়ে এল স্বামীজির কাছে। কি এক অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যেরা হাজির স্টেশনে, কুলিও ভাবলে আমিও ভিড়ে যাই সে দলে। আমিই তো বেশি করে সংবর্ধনা করব। উনি যে আমার দেশের লোক, আমারই জাতভাই।

করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল কুলি। বললে, 'শুনেছি আমাদের জাতির মধ্যে আপনি একজন মস্তবড় হয়েছেন, সর্বত্র আপনার জয়, তাই আমরা খুব গর্বিত আপনার জন্যে, আপনাকে তাই অভ্যর্থনা জানাতে এসেছি।'

স্বামীজি একটুও প্রতিবাদ করলেন না। ভুল ভাঙালেন না। নিজেকে ছোট ভাবলেন না। ক্ষোভ বা বিরক্তির রেখা আঁকলেন না মুখে। রসিকতা করেও বললেন না, আমার গায়ের রঙ কি তোমার মতই কালো? আর আমার নাক চোখ মুখ? কী করলেন? বদান্য হাতের উত্তপ্ত আত্মীয়তার মধ্যে কুলির হাতখানি টেনে নিলেন। ডাকলেন ভাই বলে। বললেন, 'ভাই, ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ তোমাকে।'

এ রকম ঘটনা আরো ঘটেছে। দক্ষিণাঞ্চলে, হোটেলে উঠতে যাচ্ছেন, হোটেলের কর্তা বাধা দিয়েছে, এখানে হবে না।

'কেন ?'

'আমাদের এখানে নিগ্রোদের জায়গা নেই।'

'কেন, নিগ্রোরা কী দোষ করল ?'

'তাদের গায়ের রঙ।'

কিন্তু আমি তো নিগ্রো নই, আমি ভারতীয়, প্রাচ্যদেশের অধিবাসী—এ সব কিছু বললেন না স্বামীজি। ফিরে চললেন।

সে কি ? তাঁর বক্তৃতা-ভ্রমণের আমেরিকান ম্যানেজার বললে, 'ফিরে যাবেন কেন ? আমি সব বুঝিয়ে বলছি এদের। নিগ্রোদের সম্বন্ধেই তো ওদের আপত্তি। আপনি তো নিগ্রো নন।'

'না, কিছু বলতে হবে না। আপনি অন্য ব্যবস্থা করুন।'

সন্ধ্যায় বক্তৃতা হল স্বামীজির। পরদিন সকালে খবরের কাগজে ফলাও করে তার বিবরণ বেরুল। বেরুল স্বামীজির ছবি। তাঁর প্রদীপ্ত প্রশংসা। সেই কাগজ হোটেলের কর্তারও হাতে এসে পড়ল। একি! এ যে সেই লোকটির ছবি যাকে নিগ্রো বলে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। কি আশ্চর্য, তিনি তো নিগ্রো নন। কই সে কথা তো বললেন না মুখ ফুটে। দেখ দেখ কত বড় মহাপুরুষ! চলো যাই ক্ষমা চেয়ে আসি।

দাড়ি কামাবার সেলুনেও ঐ রকম।

'এখানে হবে না।'

'কেন ?'

'আমরা কালো চামড়ার নিগ্রোকে কামাই না।'

চলে এলেন স্বামীজি।

'সে কী কথা ?' তাঁর এক পাশ্চাত্ত্য ভক্ত রেগে উঠল: 'কেন ওদের বললেন না আপনি কে ? কার সাধ্য আপনাকে ফেরায় ?'

'তার মানে', হাসলেন স্বামীজি, 'ওদের আমি বোঝাব যে আমি নিগ্রো নই, আমি নিগ্রোর চেয়ে উঁচু, নিগ্রোর চেয়ে মানী। অন্যকে ছোট করে আমি বড় হব ? আমি কি তারই জন্যে এসেছি পৃথিবীতে ?'

'তখনই মানুষ যথার্থ ভালোবাসতে পারে যখন সে দেখতে পায় তার ভালোবাসার জিনিস কোনো ক্ষুদ্র মর্ত জীব নয়, খানিকটা মৃত্তিকাখণ্ড নয়, স্বয়ং ভগবান।' বলছেন স্বামীজি: 'স্ত্রী স্বামীকে আরো বেশি ভালোবাসেন যদি তিনি ভাবেন স্বামী সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। স্বামীও স্ত্রীকে অধিকতর ভালোবাসবেন যদি তিনি জানতে পারেন স্ত্রী স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ। সেই মাও সন্তানদের বেশি ভালোবাসবেন যিনি তাদের ব্রহ্মস্বরূপে দেখবেন। সেই ব্যক্তি তার মহাশত্রুকেও ভালোবাসবে যে জানবে ঐ শত্রুও সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ। সেই ব্যক্তি সাধুব্যক্তিকে ভালোবাসবে যে জানবে ঐ সাধুব্যক্তি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ। সেই লোকই আবার অসাধু ব্যক্তিকেও ভালোবাসবে যে জানবে সেই অসাধু পুরুষের পিছনেও প্রভু রয়েছেন। যাঁর কাছে এই ক্ষুদ্র অহং একেবারে মরে গিয়েছে এবং তার জায়গা ঈশ্বর এসে অধিকার করে বসেছে সে জগৎকে চালাতে পারে ইঙ্গিতে। তার কাছে কোথায় দুঃখ কোথায় ক্লেশ, কিসের দ্বন্দ্ব কিসের বিরোধ। তখনই সে বলবার অধিকারী হবে, জগৎ কী সুন্দর! আর চারদিকে যা দেখছি সবই মঙ্গলস্বরূপ। তখন

ঘৃণা ঈর্ষা অশুভ অশান্তি চিরকালের জন্য বিদায় নেবে। তখন দেবতায় দেবতায় খেলা, দেবতায় দেবতায় কাজ, দেবতায় দেবতায় ভালোবাসা। তখন কে কাকে আর দরিদ্র বলে ঘৃণা করবে, কে কাকে অপরাধী বলে চাইবে শাস্তি দিতে? চার দিকে ঘৃণার বীজ, ঈর্ষা ও অসৎ চিন্তার বীজ না ছড়িয়ে শুধু একবার ভাবো যা দেখছ যা অনুভব করছ সবই তিনি। যখন তোমার মধ্যে আর অশুভ থাকবে না তখন তুমি আর অন্যায় দেখবে কি করে? তোমার মধ্যে থেকে যদি চোরই চলে যায় তা হলে কাকে আর তুমি চোর বলবে? যে বায়ু শ্বাসে প্রশ্বাসে গ্রহণ করছি তার তালে-তালে বলো, তত্ত্বমসি, চন্দ্রে-সূর্যে অণুতে-রেণুতে সমস্ত পদার্থে এই ধ্বনি উচ্চারণ করো, তুমিই সেই, সে ছাড়া আর কিছু নেই। জগতে নরনারীদের লক্ষ ভাগের এক ভাগও যদি স্থির হয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে খানিকক্ষণের জন্যেও বলে, হে মানুষ হে পশু-পাখি, হে সকল জন্মের জীবিত প্রাণী, তোমরা সকলেই এক জীবন্ত ঈশ্বরের প্রকাশ, তা হলে আধ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত পৃথিবী বদলে যাবে।

হ্যাঁ, আমি ভারতীয়। এ বলতে আমি গর্বিত। তোমার গায়ের চামড়া কটা বলেই তুমি শ্রেষ্ঠ এ অভিমান ত্যাগ করো। আমার মধ্যে শাদা পীত আর কালো তিন রঙই রয়েছে। শাদা বলতে ইংরেজ, পীত বলতে চীন, আর কালো বলতে নিগ্রো। এই দেখ আমার মঙ্গোলীয় চোয়াল, যাতে বুলডগের গোঁ, আর আমার রক্তে তাতারী বর্মশক্তি। হ্যাঁ, আমিই তো যথার্থ আর্য।'

ডেট্রয়েট ফ্রি প্রেস কাগজ লিখছে : শ্রোতারা সবাই অবাক, একজন কালো চুল ও কালো চামড়ার লোক কী সম্ভ্রান্ত ঋজুতায় দাঁড়িয়েছে তাদের সামনে, অদ্ভুত পোশাকে, কিন্তু সে পোশাকের কী বিস্তীর্ণ সমারোহ, আর তাদেরই ভাষায় অনর্গল কথা বলে তাদেরকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে। আর বিষয় কী বিচিত্র। 'মানুষের ঈশ্বরত্ব'। আবহাওয়া বিশ্রী অথচ বক্তৃতা আরম্ভ হবার আধঘণ্টা আগে থেকেই সমস্ত হল্ লোকে লোকারণ্য। একটি তিল ধারণেরও স্থান নেই। কে না গিয়ে ভিড় করেছে! যাকেই গণনা করতে পারো শিক্ষিত বলে, তাকেই খুঁজে পাবে এখানে। আর মেয়েদের তো কথাই নেই। দলে-দলে এসেছে। ড্রয়িংরুমে যেমন সাধারণ বক্তৃতামঞ্চেও তেমনি, সমান দুর্ধর্ষ। চলো দেখে আসি সেই রাজাকে, শুনে আসি তার সমুদ্রনির্ঘোষ। কখনো কখনো বা সেই স্বরে মৃদুমধুর বিষণ্ণতার সুর। শঙ্খ আর বাঁশি বাজাচ্ছেন একসঙ্গে। আর সমস্ত জনতা এক নিদারুণ স্তব্ধতায় একসঙ্গে একটি নিশ্বাস ফেলছে। আর কী সত্য যে তিনি বলছেন তা যেন প্রত্যক্ষ প্রদীপের মত জ্বলছে। তাকে দেখতে কারু ভুল হচ্ছে না।

'যা কিছু দেখছ, স্থাবর জঙ্গম, সমস্তই সেই এক বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের প্রকাশ। সেই চৈতন্যস্বরূপই আমাদের প্রভু। যা কিছু সৃষ্টি সবই প্রভুর পরিণাম আরো যথার্থ বলতে গেলে প্রভু স্বয়ং। তিনিই সূর্যে চন্দ্রে তারায় দীপ্তি পাচ্ছেন, দীপ্তি পাচ্ছেন অন্ধকারে, ঝঞ্ঝাবিদীর্ণ আকাশে। তিনিই জননী ধরণী, তিনিই মহোদধি। তিনিই শীতল বৃষ্টি, স্নিগ্ধ আকাশ, আমাদের রক্তের মধ্যে শক্তি। তিনিই বক্তৃতা, তিনিই বক্তা, তিনিই এই শ্রোতৃমণ্ডলী। যার ওপরে আমি দাঁড়িয়ে আছি সেই বেদীও তিনি, যে আলো দিয়ে আপনাদের মুখ দেখছি সেই আলোও তিনি। তিনি সঙ্কুচিত হতে-হতে অণু হন আবার বিকশিত হতে-হতে আকাশ হন। যে পরমাণু সেই ঈশ্বর। 'তুমিই পুরুষ তুমিই স্ত্রী, তুমিই যৌবনগর্বে ভ্রমণশীল যুবক। তুমিই আবার বৃদ্ধ, দণ্ড ছাড়া চলতে পারো

না এক পা। হে প্রভু, তুমিই সকল, তুমিই খণ্ডে খণ্ডে অখণ্ড। জগৎ প্রপঞ্চের এই ব্যাখ্যাতেই শুধু মানববুদ্ধি মানবযুক্তি পরিতৃপ্ত। এক কথায় বলতে গেলে, আমরা তাঁর থেকেই জন্মাই, তাঁতেই বাঁচি, আবার তাঁতেই ফিরে যাই।'

খৃস্টান মিশনারিরা হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করছে—এর মানে কী? এ একটা প্রত্যক্ষ অপমান। যেখানেই পারছেন সেখানেই তীক্ষ্ণধার হচ্ছেন স্বামীজি। ধরো একজন পাপী হিন্দু আছে, কাল সে তোমার হাতে ধর্মান্তরিত হল, আর তুমি বলবে, তক্ষুণি-তক্ষুণি, এমনি সে ইন্দ্রজাল সে পাপমুক্ত হয়ে গেল, উদ্ধারিত হল পবিত্রতায়। এ পরিবর্তন আসে কি করে? কি করে তা দাবি করতে পারো? তার কি নতুন দেহ হল না নতুন আত্মা হল? তোমরা বলো ঈশ্বর তার পরিবর্তন ঘটালেন। ঈশ্বরই তো পরিপূর্ণ পবিত্রতা। আর মানুষই তো ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। তবে মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে? দাঁড়াচ্ছে, যাকে তোমরা ধর্মান্তরিত করলে, সেই লোক ঈশ্বর যদিও বটে কিন্তু অপবিত্র ঈশ্বর। তোমার ধর্মে নিয়ে এসে তুমিই ঈশ্বরকে পবিত্রতা দিলে। এ বিশুদ্ধ পাগলামি ছাড়া আর কী!

আমাদের দেশে আমরা সব সহ্য করি, শুধু সইতে পারি না অসহিষ্ণুতা। তুমি আমার ধর্ম নিয়ে বা আর কারু বিশ্বাস নিয়ে অসহিষ্ণু হবে এই আমাদের দুঃসহ। 'তুমি ভুল আমিই ঠিক'—এ কথা বলার স্পর্ধা তোমার হয় কি করে? শুধু তরবারির জোরে, রাজদণ্ডের ঔদ্ধত্যে। তুমি কী জানো আমার কথা, আমার বিশ্বব্যাপ্ত ব্রহ্মবাদের কথা! সেই দুই ব্যাঙের গল্প মনে পড়ছে। এক ব্যাঙ কুয়োতে থাকে, সেই কুয়োতে এক সমুদ্রের ব্যাঙ এসে লাফিয়ে পড়ল। বললে, ভাই, সমুদ্র দেখে এলুম। কুয়োর ব্যাঙ বললে, সে কত বড়? সমুদ্রের ব্যাঙ বললে, সে ভাই বোঝাতে পারি আমার এমন বিদ্যে নেই, হয়তো তোমারও তেমন বুদ্ধি নেই। বটে? কুয়োর ব্যাঙ কুয়োর মধ্যে লাফ দিয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে পড়ল। বললে—এতটা? সমুদ্রের ব্যাঙ বললে, তা হবে। কুয়োর ব্যাঙ তখন আগের চেয়ে আরো খানিকটা বেশি দূরে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল। বললে, এতটা? সমুদ্রের ব্যাঙ বললে, তা হবে। তখন কুয়োর ব্যাঙ কুয়োর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত লাফ দিল। বললে, কি, এতটা হবে? সমুদ্রের ব্যাঙ বললে, তা হবে। সমুদ্রের ব্যাঙ তো ভারি মিথ্যুক, কথা কেবল বাড়িয়েই চলছে। সমুদ্রের ব্যাঙকে কুয়ো থেকে তাই তাড়িয়ে দিল কুয়োর ব্যাঙ।

আর স্বামীজি যখনই দেশের কথা বলেন, বলেন, আমার দেশ, আমার মা। এ যেন সন্ন্যাসীর সুর নয়, এ এক সন্তানের সুর।

নরেন বিদেশে গিয়ে দিগ্বিজয় করছে শ্রীশ্রীমার এ আনন্দ আর ধরে না।

'আহা যখন গান গাইতেন ঠাকুর, যেন মধু ভরা, যেন ভাসতেন গানের উপর। সে গানে কান ভরে আছে। আর আমার নরেনের কী পঞ্চমেই সুর ছিল! আমেরিকা যাবার আগে আমাকে গান শুনিয়ে গেল ঘুসুড়ির বাড়িতে। বললে, মা, যদি মানুষ হয়ে ফিরতে পারি তবেই আবার আসব, নতুবা এই শেষ। আমি বললুম, সে কি? তখন বললে, না, না, আপনার আশীর্বাদে শিগগিরই ফিরব।'

আমার মা, আমার দেশ! তুমিই সংসারসুখপ্রহননী, সর্বগ্রন্থিবিভেদিনী, ব্রহ্মজ্ঞানবিনোদিনী। তুমি আমাকে উদ্ধার করো। তুমিই বেদবদনা সম্ভাবনাভাবনা কুলকুঠারঘাতিনী। তুমি আমাকে পথ দেখাও।

যে ধর্ম স্বামীজির মত প্রতিনিধির জন্ম দিতে পারে সে না জানি কত মহনীয়! এখন এই কথাই আমেরিকাবাসীদের মুখে-মুখে।

'সব প্রাণীই ব্রহ্মস্বরূপ।' চিঠি লিখছেন স্বামীজি: 'প্রত্যেক আত্মাই যেন মেঘে ঢাকা সূর্যের মত। একজনের সঙ্গে আরেকজনের তফাৎ মাত্র এই, কোথাও আবরণ ঘন কোথাও তরল। সূর্য কোথাও স্ফুট কোথাও অস্ফুট। বিভিন্ন উপাধির মধ্যে সেই এক আত্মারই প্রকাশ। সেই এক আত্মারই পরিচয়। তাই মানুষের প্রত্যেকে প্রত্যেককে ঈশ্বর বলে চিন্তা করা ও প্রত্যেকের সঙ্গে ঈশ্বরের মত ব্যবহার করা উচিত। ঘৃণা নিন্দা অনিষ্টচেষ্টা নয়, কোনো কিছুতেই নয়।'

কী বলছে উপনিষদ? সমস্ত অণুতে-পরমাণুতে সমস্ত রন্ধ্রে-ছিদ্রে, সমস্ত রূপে-স্তূপে অনুরূপে হয়ে স্রষ্টা প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। সমগ্র সৃষ্টিই তাঁর বিগ্রহ। তাঁর প্রকট লীলা। কিন্তু কই, স্বয়ং তিনি কই? তাঁকে তো দেখতে পাচ্ছি না। কী করে দেখি তাঁকে?

ক্ষুর কোশে বা আধারে ঢাকা আছে, আগুন যেমন কাঠে। অগ্রভাগ থেকে অন্তভাগ পর্যন্ত প্রচ্ছন্ন। খাপ দেখে তুমি ক্ষুর দেখছ না, কাঠ দেখে তুমি দেখছ না আগুন। কিন্তু ক্ষুর আর আগুন দুইই আছে। খাপের যতটা ব্যাপ্তি ক্ষুরেরও তাই। কাঠের যতটা আয়তন আগুনেরও তাই। নেনেন কিং নানাবৃতং, নেনেন কিং চ নাসংবৃতম। এমন কিছুই নেই যা তাঁর দ্বারা আচ্ছাদিত নয়, এমন কিছুই নেই যা তাঁর দ্বারা নয় অনুপ্রবিষ্ট। অন্তর্বহিঃ ভেতরে তিনি ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। কোশের আবরণ খোলো, দেখতে পাবে ক্ষুর। কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করো, দেখতে পাবে আগুন। আবরণই বাধা, উন্মোচন বা ঘর্ষণই সাধক। অভ্যাস বা প্রযত্নই সাধন। সেই সাধনে যখন আবরণ সরে যাবে তখন মনশ্চক্ষে বা তৃতীয় নেত্রে দেখতে পাবে তাঁকে।

সেই পূর্ণের উপাসনা করো। যখন কথা বলছ তখন তিনি বাকরূপে, যখন দেখছ তখন চক্ষুরূপে, যখন শুনছ তখন কর্ণরূপে, যখন চিন্তা করছ তখন তিনি মনরূপে প্রতিভাত। তাঁর আংশিক প্রতীতিতে তৃপ্তি নেই। সমস্ত ক্রিয়া বা সত্তার একীভূত যে অভিব্যক্তি, যে সর্বভূতগত সর্বাশ্রয়, সেই পূর্ণের সন্ধান করো, সেই এক ও অদ্বিতীয়ের সন্ধান। কী করে সন্ধান করবে? পদেনানুবিন্দেৎ। তোমার গৃহপালিত প্রিয় পশুটি কোন দূর গভীর অরণ্যে পালিয়ে গেছে। তাকে তুমি কী করে খুঁজবে? মাটিতে তার পদচিহ্ন অনুসরণ করবে। তেমনি রূপে-রূপে খুঁজবে তুমি সেই অরূপকে, সেই অপরূপকে। রূপে-রূপেই তাঁর সুস্পষ্ট পদচিহ্ন। রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। প্রতি রূপে তিনি অনুরূপ হয়ে রইলেন। কিন্তু কেন? শুধু স্ব-রূপ প্রকাশ করবার জন্যে। 'পূর্বে ওঁর এই রূপ ছিল' বা 'পরে এঁর এইরূপ হল'— এসব কথা তাঁর সম্বন্ধে খাটে না। অন্তর ও বাহ্য এরকম ভেদবাচক ভিন্ন-ভিন্ন সত্তাও তাঁর নেই। এই আত্মাই ব্রহ্ম, আত্মাই সর্বাত্মক।

সপ্তাহে বারো থেকে চৌদ্দ, কি তারও বেশি, বক্তৃতা দিচ্ছেন স্বামীজি। শরীর-মন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে তবু নিস্তার নেই। আবার ডাক, আবার নিমন্ত্রণ। কিন্তু কী আর বলব, বক্তৃতার আর বিষয় কই? যা বলবার ছিল সবই তো বলেছি এখানে-ওখানে। শুধু একই কথা বারে বারে বলব, বলব ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে?

নিস্তেজের মত শুয়ে পড়েছেন স্বামীজি। ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুমের মধ্যে শুনতে

পেলেন দূর থেকে তাঁকে কে ডাকছে। ডাকতে-ডাকতে এগিয়ে আসছে তাঁর কাছে। একেবারে তাঁর ঘরে তাঁর শয্যাপার্শ্বে। এ কি, কী বলছ? কী বলছি শোনো কান পেতে, শোনো মন দিয়ে। এ কি, বক্তৃতা দিচ্ছ? হ্যাঁ, অবহিত হয়ে শোনো, পরে তুমি কী বলবে, কী তোমার বক্তব্য, জেনে রাখো।

হ্যাঁ, কথা তো একই। যখন একের কথা তখন এক কথাই তো হবে। কিন্তু বিচিত্ররূপে পরিবেশন। এক ছানার ছাঁচ থেকে নানান রকম মেঠাই। মূল এক, বৃক্ষ এক, কিন্তু শাখাপ্রশাখা বিচিত্র। অন্তহীন এককে অন্তহীন বিচিত্রের মধ্যে প্রকাশ করো।

কখনো কখনো দুজন আসছে। কী বক্তৃতা দেওয়া যায় তাই নিয়ে তারা তর্ক করছে, আলোচনা করছে। বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তুলছে। কখনো এমন সব কথা উঠছে যা স্বামীজি কখনো শোনেননি। এমন সব ভাব যা কখনো আসেনি চিন্তায়। এ কী অভিনব! হ্যাঁ, মনের মধ্যে গেঁথে নাও। কালকের বক্তৃতার জন্যে প্রস্তুত করো নিজেকে। 'স্বামীজি, কাল অত রাত্রে কার সঙ্গে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কথা কইছিলেন?' পাশের ঘরের লোক জিগগেস করল প্রভাতে।

সে কী? এ ঘরে এসে স্বপ্নে যে দুজন লোক তর্ক করছিল তাদের কথা শুনতে পেয়েছে পাশের ঘর?

'হয়তো ঘুমের মধ্যে আমিই বকছিলাম।' স্বামীজি পাশ কাটাতে চাইলেন।

'না, না, আপনি একা নন তো। আরো একজন ছিলেন। তাঁর সঙ্গে তুমুল কথা কাটাকাটি করছিলেন আপনি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, এক স্বর আপনার আরেক স্বর আরেকজনের।'

'কই আর কেউ আসেনি তো ঘরে। আমি তো কিছুই টের পাইনি।'

কী ব্যাপার? ব্যাপার সরল। এ হচ্ছে যোগশক্তির খেলা। ইচ্ছাশক্তির প্রতিফলন। তীব্রভাবে ইচ্ছা করেছি আমার বক্তব্য উদ্ঘাটিত হোক, সেই বক্তব্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। গভীরে মনোনিবেশ করে খুঁজেছি তার স্বচ্ছতা, তার স্পষ্টতা। তা ক্রমে স্পষ্ট, স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। তবেই দেখ মনের শক্তি মনের ব্যাপ্তি কত দূর। এই মনই তোমার গুরু। এই মনকেই সেবা করো শ্রদ্ধা করো একমনে। যদি কোনো বিস্ময় কোনো রহস্য এখনো থেকে থাকে তা এই মনে। মনেই সমস্ত রহস্যের সমাধান, সমস্ত বিস্ময়ের সমাপন।

পঞ্চবটীতে ধুনির সামনে নিশ্চল সমাধি উপভোগ করছে তোতাপুরী। ঠাকুর বললেন, 'তুমি তো ব্রহ্মদর্শন করেছ তবু রোজ-রোজ ধ্যান অভ্যাস করো কেন?'

তোতাপুরী তাঁর লোটার দিকে ইঙ্গিত করল। বললে, 'দেখছ কেমন ঝকঝক করছে আমার লোটাটা? নিত্য ওকে মাজি বলেই তো ওর এমন ঔজ্জ্বল্য। যদি না মাজি, ফেলে রাখি, তাহলে ওর দশা কী হবে? তখন কি থাকবে ওর এই চাকচিক্য? তাই মনেরও প্রতি দিনের মার্জনা চাই। ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে মনের বারেবারেই সংস্পর্শ হচ্ছে। সেই সংস্পর্শ থেকে ময়লা জমছে তার মধ্যে। তাই প্রত্যহ চিত্ত-মন ব্রহ্মধ্যানের দ্বারা মার্জিত করতে হয়। নইলে মনও অকর্মণ্য হয়ে পড়ে।

'ঠিক, ঠিক, খাঁটি কথা বলেছ।' বললেন ঠাকুর: 'কিন্তু তোমার এ কথা খাটবে শুধু তখুনিই যখন ঘটিটা পেতলের। ঘটি যদি পেতলের হয় তাকে রোজ মাজা

দরকার। না মাজলে তার জেল্লাজৌলুস কিছু থাকবে না। কিন্তু ঘটি যদি সোনার হয় ?'

চমকে ঠাকুরের দিকে তাকাল তোতাপুরী।

'ঘটি যদি সোনার হয় তাহলে কি আর মাজা দরকার ? না মাজলে কি সোনার ঘটিতে ময়লা জমে ?'

তোতাপুরী শিষ্যের কথা শুনে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল। গুরু মিলে তো লাখ, চেলা মিলে তো এক। বললে, 'পেতলের লোটা যদি সোনা হয়ে যায় তখন তাকে আর কে মাজে ? ব্রহ্মস্পর্শে চিত্ত যদি চিৎ হয়ে যায় তখন আর কিসের সাধন-ভজন ?'

আমি নিঃসংগচিত্ত। প্রকৃতির বিকার দশবিধ, শতবিধ, সহস্রবিধ হোক, তাতে আমার কী! মেঘ কখনো মহাকাশকে স্পর্শ করে না। তবে প্রকৃতি-বিকৃতি আমাকে স্পর্শ করবে কেন ? আমি সকলের আধার, আমার থেকেই সকলের প্রকাশ, আমি সর্ব বস্তুতে অবস্থিত অথচ আমাতে কিছু নেই। আমি শুদ্ধ শাশ্বত অটল অখণ্ড অদ্বয়ব্রহ্ম।

'আমার মধ্যে অষ্টৈশ্বর্যের আবির্ভাব হয়েছে।' নরেনকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন ঠাকুর : 'আমি তোকে তা দিয়ে যেতে চাই।'

নরেন শুধিয়েছিল : 'ও দিয়ে কি আমার ঈশ্বর দর্শন হবে ?'

'না, তা হবে না।'

'তবে ও ছাইপাঁশ দিয়ে আমি কী করব ?'

'জগৎসংসারকে তাক লাগিয়ে দিবি। সমস্ত বিশ্ব তোর পায়ের কাছে প্রণত হবে।'

'ঈশ্বরকে দেখে আমিই বিস্মিত হতে চাই। আমিই চাই প্রণত হতে।' দান প্রত্যাখ্যান করে দিল নরেন।

তারপর অপ্রকট হবার আগে ঠাকুর তাঁর সমস্ত শক্তি নরেনকে সঁপে দিয়ে ফকির হয়ে গেলেন ফতুর হয়ে গেলেন। দেবার আগে জিগগেসও করলেন না সে নিতে প্রস্তুত আছে কিনা, করলেন না তার সমর্থনের অপেক্ষা। এ নরেনের ন্যায্য প্রাপ্য। স্বপ্নদৃষ্ট সেই ঋষির কাছে শিশুর সমর্পণ।

এখন স্বামীজি দেখলেন তাঁর মধ্যে যোগজ-শক্তির বহুবিস্তীর্ণ আবির্ভাব হয়েছে। সূচনা অনেক আগে থেকেই হয়েছিল, এখন যেন দুর্দাম দীপ্তিতে ঘটেছে তার বিস্ফারণ। কাউকে দেখা মাত্রেই তার সমগ্র অতীতকাল স্পষ্ট হচ্ছে তাঁর চোখের সামনে। লোকটার মনের মধ্যে কী তা পড়ে নিতে পারছেন নিমেষে। দেখতে পাচ্ছেন যা তার ভবিষ্যৎ জীবনের চেহারা। এ শক্তি অর্জন করার জন্যে তাঁর কোনো প্রয়াস ছিল না। যোগস্থ হবার শক্তি আয়ত্ত করবার সংগে সংগেই এ বিভূতি নিজের থেকে এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু এ শক্তি দেখতে বা প্রয়োগ করতে তিনি ব্যস্ত নন, যদিও তিনি জানেন কিছু একটা ম্যাজিক না দেখাতে পারলে সাধারণত লোক অভিভূত হতে জানে না।

কিন্তু সেদিন এক ধনী আমেরিকান খুব প্রগলভতা করছিল। ব্যংগ করছিল হিন্দুর যোগকে। বলেছিল স্বামীজিকে, 'আমার মনে এখন কী ভাবনা বলতে পারেন ? দিতে পারেন তার ফোটোগ্রাফ ? আঁকতে পারেন আমার অতীতের চিত্র ?'

এ সব ব্যাপারে স্বামীজির ঔৎসুক্য নেই। কিন্তু এ লোকটার চাপল্য ও লঘুতার শাসন দরকার। লোকটার দু চোখের মধ্যে স্বামীজি তাঁর দু চোখ নিবদ্ধ করলেন। লোকটা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। মনে হল তপ্ত দুই অগ্নিশলাকা তার শরীরের অস্থি-

মাংস ভেদ করে অন্তস্তলে গিয়ে ঢুকছে। কোনো অবরোধ কোনো আবরণ দিয়ে তাকে ঠেকানো যাচ্ছে না। দেখে নিচ্ছে জেনে নিচ্ছে তার সমস্ত প্রচ্ছন্নকে।

ভয় পেয়ে করুণকণ্ঠে লোকটা চিৎকার করতে লাগল : 'আর না, আর না। স্বামীজি, আপনার ঐ অগ্নিশর ফিরিয়ে নিন। আমার সমস্ত গোপন কথা বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নিজেকে আর কিছুতেই ঢাকতে পারছি না, লুকোতে পারছি না—'

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন স্বামীজি। চাইলেন স্নেহের চোখে, করুণার চোখে।

৫৬

মেমফিস্ শহরে মিস গ্রিনি মুন-এর বোর্ডিং হাউসে আছেন স্বামীজি। সেখানে এক প্রসিদ্ধ খবরের কাগজের রিপোর্টার দেখা করতে এসেছে তাঁর সঙ্গে। ঘরে ঢুকেই তো ভদ্রলোক অবাক। সুন্দর সুপুরুষ। বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত ললাট, সহানুভূতিতে আলোকিত চক্ষু। কালো চুল ও কালো চোখে মানুষ এত জ্যোতির্ময় হতে পারে এ প্রায় ভাবনাতীত।

'আমেরিকায় কী তোমার সব চেয়ে ভালো লাগল ?' জিগগেস করল রিপোর্টার।

'এ দেশের মেয়েরা। যেমন শ্রী তেমনি শক্তি। আর কত দয়া ! যদ্দিন এখানে এসেছি মেয়েরাই বাড়িতে আশ্রয় দিচ্ছে, খেতে দিচ্ছে, লেকচার দেবার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে। এমন কি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে বাজারে। কত ভাবে যে সাহায্য করছে বলে শেষ করতে পারব না।'

'আর কী ভালো লাগল ?'

'এ দেশে দারিদ্র নেই। ইংরেজেরাও ধনী বটে কিন্তু দরিদ্রের সংখ্যাও সেখানে অল্প নয়। এখানে একটা কুলি ছ-টাকা রোজের কম খাটে না। চাকর রাখতে গেলে খাওয়া-পরা বাদ সেই ছ-টাকা মাইনে। এখানে যেমন রোজগার তেমনি খরচ। আর আমাদের দেশ ? গড়ে ভারতবাসীর মাসিক আয় দু-টাকা।'

পরে আরো বলেছেন স্বামীজি : 'আমাদের দেশে যদি কারু নীচু কুলে জন্ম হয়, তার আর আশা-ভরসা নেই, সে গেল। কেন হে বাপু ? কী অত্যাচার ! এ দেশের সকলের আশা আছে, সুযোগ-সুবিধা আছে—আজ গরিব, কাল সে ধনী হবে বিদ্বান হবে জগজ্জয়ী হবে। কিন্তু আমাদের দেশে একবার যে গরিব সে চিরজন্মই গরিব। এ দেশেও দোষ আছে বৈ কি। ধর্ম বিষয়ে এরা আমাদের চেয়ে অনেক নিচে, কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে এদের আমরা নাগাল পাবার মধ্যেই নেই। এদের সামাজিক ভাবটা আমরা নেব, আর দেব এদের আমাদের অপূর্ব ধর্মের শিক্ষা। আমি এদেশে এসেছি বেড়াতে নয়, স্ফূর্তি করতে নয়, নাম করতে নয়—শুধু দরিদ্রের উপায় দেখতে। সে উপায় কি, পরে জানতে পারবে, যদি ভগবান সহায় হন।'

রিপোর্টার জিগগেস করলে, 'যে খৃষ্টধর্ম মানে, মৃত্যুর পর, তোমাদের ধর্মমত অনুসারে, তার কী হবে ?'

'যদি সে ভালো লোক হয় মুক্ত হবে। শুধু সে কেন, যে ঘোর নাস্তিক, সেও যদি ভালো হয়, আমরা বিশ্বাস করি, তারও মুক্তি অনিবার্য। তাই শেখাচ্ছে আমাদের ধর্ম।

তার শুধু এক কথা। শুধু ভালো হতে বলা। আমাদের মতে তাই সব ধর্মই ভালো। ধর্মে-ধর্মে যারা ঝগড়া করে তারাই মন্দ।'

'তোমাদের দেশের লোকেরা নাকি নানা রকম ম্যাজিক করতে পারে?'

'কী রকম ম্যাজিক?'

'শূন্যে উঠে বসতে পারে, নিশ্বাস বন্ধ করে থাকতে পারে মাটির নিচে?'

'আমরা অলৌকিকে বিশ্বাস করি না।' বললেন স্বামীজি, 'কিন্তু বিশ্বাস করি, প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনেই ঘটতে পারে লোকাতীত। আমি নিজের চোখে এখনো দেখিনি যে কেউ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকে পরাস্ত করতে পেরেছে। কিন্তু আমি দেখেছি বহু হঠযোগী, যারা এই সাধনায় তৎপর। এই সাধনায় তারা দীর্ঘদিন রয়েছে অনশনে। এত তারা কৃশ করেছে নিজেদের যে যদি তাদের পেটের উপর হাত রাখো, তৎক্ষণাৎ ছুঁতে পারবে তাদের মেরুদণ্ড। কিন্তু নিশ্বাস রোধ করে থাকার কথা যা বলছ আমি স্বচক্ষে দেখেছি তার উদাহরণ।'

'স্বচক্ষে?' উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী আলোড়িত হয়ে উঠল।

'হ্যাঁ, তাতে আর ভুল নেই। দেখেছি মাটির নিচে, গর্ত করে, একটা লোক গিয়ে বসল, তার মাথার উপর মাটি চাপা দিয়ে সমস্ত রন্ধ্র অবরুদ্ধ করে দিল। মাটির নিচে লোকটার সঙ্গে এতটুকু খাদ্য নেই, পানীয় নেই, শুধু নিরেট মাটি আর নিরবকাশ অন্ধকার। মাথার উপরে ক্রমে-ক্রমে ঘাস গজাল, শস্য গজাল, সবাই ঠিক করল লোকটাই মাটি হয়ে গিয়েছে। কত দিন পরে খুঁড়ে তোলা হল লোকটাকে। দিব্যি চেয়ে আছে, বেঁচে আছে, শ্বাস ফেলছে পরিষ্কার।'

সবাই একেবারে অভিভূত।

'আর তোমাদের দেশের রোপট্রিক? সেই দড়ির খেলা?' আরেকজন বলে উঠল, 'সেই যে শুনেছি শূন্যে দড়ি ছুঁড়ে মারলে দড়ি খাড়া হয়ে দাঁড়ায় আর সেই দড়ি বেয়ে একটা লোক উপরে উঠতে থাকে, আর উঠতে-উঠতে অদৃশ্য হয়ে যায় শূন্যে—'

'শুনেছি কিন্তু দেখিনি।' বললেন স্বামীজি।

'তুমি একটা কিছু জাদু দেখাও না।' একজন খুব পিড়াপিড়ি করতে লাগল: 'সন্ন্যাসী হবার আগে তোমাকেও নিশ্চয়ই থাকতে হয়েছিল মাটির নিচে—'

'না, ওসব কিছুই করতে হয়নি।' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন স্বামীজি, 'ও সবের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কী? ওতে কি মানুষ ভালো হয়, না, সাধু হয়, না, পবিত্র হয়? তোমাদের বাইবেলের শয়তান তো অমিতশক্তি কিন্তু সে কি ঈশ্বরের মতো ভালো, ঈশ্বরের মতো মধুর?'

স্বামীজি তখন মঠে, ঠিক শয্যাশায়ী না হলেও অসুস্থ। কবরেজি ওষুধ খাচ্ছেন আর তার কঠোর নিয়ম পালন করতে গিয়ে আহার-নিদ্রা ছেড়েছেন। খেতে পাচ্ছেন না কিছু, চোখের দু পাতাও একত্র হচ্ছে না ঘুমে। তবু তারই মধ্যে কাজ করে চলেছেন, পড়াশোনায়ও ছেদ টানছেন না।

নতুন এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা কেনা হয়েছে মঠে, সার-সার কেমন ঝকঝক করছে বইগুলো। শরৎ চক্রবর্তী, স্বামীজির শিষ্য, বলছেন, 'এত বই এক জীবনে পড়া, পড়ে ওঠা অসম্ভব।'

'বলিস কিরে?' হাসলেন স্বামীজি: 'আমি তো দশ খণ্ড সেরে এখন একাদশ খণ্ড ধরেছি।'

'বলেন কী?' শিষ্য তো অবাক: 'দশ খণ্ড পড়ে ফেলেছেন এরই মধ্যে? প্রথম থেকে শেষ—প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা?'

'প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা না পড়লে বই পড়া হয় কী করে?' স্নেহময় প্রশ্রয়ের সুরে বললেন, 'কি রে, অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে?'

কথার ভাবেই তো সে সন্দেহ প্রকাশ করেছে শিষ্য। মুখ ফুটে এখন 'না' বলবার উপায় কোথায়?

'বেশ তো জিগগেস কর না যে কোনো প্রশ্ন যে কোনো বই থেকে।' অভয় দিলেন স্বামীজি।

এ-খণ্ড ছেড়ে ও-খণ্ড, বেছে-বেছে কঠিন-কঠিন প্রশ্ন জিগগেস করতে লাগল শিষ্য। স্বামীজি অবলীলাক্রমে তাদের ঠিক-ঠিক উত্তর দিতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, স্থানে-স্থানে বইয়ের ঠিক-ঠিক ভাষা পর্যন্ত উদ্ধৃত করতে লাগলেন। দেখি এবার এ-খণ্ড, এবার আরেক পরিচ্ছেদ। সব ক্ষেত্রেই সমান ফসল। কোথাও বিচ্যুতি নেই, স্খলন-পতন নেই।

'এ কী করে সম্ভব হতে পারে?' শিষ্য অভিভূত হয়ে পড়ল: 'এ মানুষের সাধ্য নয়।'

স্বামীজি বললেন, 'দ্যাখ একেই বলে ব্রহ্মচর্যের শক্তি। কোথায় কী ম্যাজিক লাগে এর কাছে? একমাত্র ঠিক-ঠিক ব্রহ্মচর্য পালন করতে পারলেই সমস্ত বিদ্যা মুহূর্তে আয়ত্ত হয়। স্মৃতিধর, শ্রুতিধর হয়ে যাওয়া যায়। ব্রহ্মচর্যের অভাবেই আমাদের দেশ যেতে বসেছে ছারেখারে।'

'শুধু ব্রহ্মচর্য?' এতেও যেন সম্পূর্ণ স্বস্থ হতে পারছে না শিষ্য: 'শুধু ব্রহ্মচর্য রক্ষার ফলেই এই অমানুষিক শক্তি? দেশে তো আরো কত আছে ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী। পারবে, পারবে তারা এই কীর্তিতে অধিষ্ঠিত হতে? যাই বলুন মশায়, ব্রহ্মচর্য ছাড়াও আরো কিছু আছে। আরো কিছু আছে।'

স্বামীজি চুপ করে রইলেন।

ব্রহ্মানন্দ স্বামী ঘরে ঢুকলেন, শরৎকে উঠলেন শাসিয়ে: 'তুই তো বেশ লোক। দেখতে পাচ্ছিস স্বামীজি অসুস্থ, খেতে-ঘুমতে পাচ্ছেন না। কই গল্প-সল্প করে তাঁর মন প্রফুল্ল রাখবি, তা নয়, যত দুরূহ বিষয় তুলে তাঁকে ক্লান্ত করছিস। কবরেজ কী বলেছে? বলেছে চুপচাপ থাকতে।'

শিষ্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

কিন্তু স্বামীজি গর্জন করে উঠলেন: 'নে, রেখে দে তোর কবরেজ। এরা আমার সন্তান, এদের উপদেশ দিতে দিতে যদি আমার দেহটা যায় তো যাক, বয়ে গেল।'

বেলগাঁওয়ে হরিপদ মিত্রের বাড়ি যখন ছিলেন তখন একদিন হঠাৎ ডিকেন্সের পিকউইক পেপারস থেকে মুখস্থ বলতে শুরু করলেন। এক নাগাড়ে প্রায় দু-তিন পাতা। বইটা হরিপদর বহুবার পড়া তাই সে অনায়াসে বুঝতে পারল কোন্ জায়গাটা উদ্ধৃত করছেন স্বামীজি। কিন্তু হরিপদর বিস্ময়ের অন্ত নেই। পিকউইক পেপারস তো একটা সামাজিক বই। সন্ন্যাসী মানুষ, সে বই পড়লেনই বা কোথায় আর পড়লেনই বা কেন?

কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য, মুখস্থ রাখলেন কি করে ?

তাই জিগগেস করলে হরিপদ, 'কবার পড়েছেন বইটা ?'

'দু-বার।' বললেন স্বামীজি, 'একবার ছেলেবেলায়, ইস্কুলে, আরেকবার এই মাস পাঁচেক আগে।'

'পাঁচ মাস আগে ! পড়তেই মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল ?' হরিপদর চোখ প্রায় কপালে উঠল : 'আর পাঁচ মাস পরেও সে স্মৃতি ম্লান হল না ?'

'তার কী করি বলো ?'

'কিন্তু আমাদের কেন মনে থাকে না ?'

'একান্ত মনে পড়ো না বলে। ব্রহ্মচর্যে সমারূঢ় নও বলে।'

হরিপদর বাসায় দুপুরে একাকী ঘরে বিছানায় শুয়ে বই পড়ছেন স্বামীজি। হঠাৎ তিনি আপন মনে অট্টহাস্য করে উঠলেন। কিছু একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে, সেটা দেখা দরকার, এই ভেবে পাশের ঘর থেকে ছুটে এল হরিপদ। কই, কিছুই বিশেষ হয়নি তো। যেমন একা ছিলেন তেমনি একা আছেন স্বামীজি। যেমন পড়ছিলেন তেমনি শান্ত ভঙ্গিতে পড়ছেন নিবিষ্ট হয়ে। তবে কি হাসিটা স্তব্ধতারই বিস্ফোরণ ? আবার হাসেন কিনা, কখন হাসেন, শোনবার জন্যে আকুল ও অনড় প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল হরিপদ।

প্রায় পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে রইল ঘরের মধ্যে। অথচ স্বামীজি তাঁকে দেখছেন না, চঞ্চল হচ্ছেন না। সমস্ত মন বইয়ে সমর্পিত, বইয়ের বাইরে আর তাঁর মননচিন্তনের অবকাশ নেই। চুম্বক যেন লোহাকে ধরে আছে নিবিড় করে।

অগত্যা একটা শব্দ করল হরিপদ। স্বামীজি চোখ চাইলেন। বললেন, 'অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ বুঝি ?'

'অনেকক্ষণ।'

'কিছু বলবে ?'

'না। দেখছিলাম কাকে বলে তন্ময়তা।'

'হ্যাঁ, যখন যে কাজ করবে, একমনে একপ্রাণে, সমস্ত ক্ষমতাকে একাগ্র করে তন্নিষ্ঠ হয়ে করবে।' মৃদু হাসলেন স্বামীজি : 'পওহারী বাবাকে দেখেছ ? যে অনন্যচিত্ততা নিয়ে ধ্যান জপ পুজো পাঠ করছেন, ঠিক সেই অভিনিবেশে মাজছেন তাঁর পিতলের ঘটিটি। ঘটিটি মাজছেন, কাছে দাঁড়িয়ে করো না কেন বাক্যালাপ, একটিও উত্তর পাবে না। হয়তো বা সেই বাসন-মাজার মধ্যেও তিনি তন্ময় ব্রহ্মচিন্তায়।'

যে কর্ম করেও তার মধ্যে চিত্তকে প্রশান্ত রাখতে পারে আর বাইরে কোনো কর্ম না করলেও অন্তরে যার ব্রহ্মচিন্তারূপ নিরন্তর কর্মের প্রবাহ চলতে থাকে সেই মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান, সেই যোগী, সেই কৃৎস্নকর্মকৃৎ—তারই সমস্ত কর্ম করা হয়েছে।

মঞ্চের অমিতবিক্রম বীর, পরাক্রান্ত কেশরী, দৈবাধিকারে বক্তা, তাঁর ধর্মের উজ্জ্বলতম প্রতিনিধি—এমনিতরো আরও অনেক বিশেষণে আমেরিকার পত্র পত্রিকা স্বামীজিকে বিভূষিত করতে লাগল। একবার তাঁর কাছে গিয়ে বোসো, শুধু মুগ্ধ নয়, স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। এমন সুন্দর করে আর কে কথা কইতে পারে ? এমন সুন্দর করে কে আর পারে তর্কে জিততে ? আর, ইংরেজি ভাষার উপরে কী অনবদ্য দখল। শুধু স্পষ্টতা আর দ্রুততাই নয় তার সঙ্গে অলংকরণের কারুকার্য। ভাষা যদি হৃদ্য না হয় তবে বক্তব্যই বা রুচ্য হবে কী করে ?

বোর্ডিং হাউস ছেড়ে অতিথি হয়েছেন রিৎকলির বাড়িতে। শুধু বক্তৃতা আর বক্তৃতা। বাক্য আর বাক্য। ঈশ্বর বাক্যের অতীত, কিন্তু এমন রহস্য, বাক্যই আবার তাঁর বিভূতি, তাঁর জ্ঞানৈশ্বর্য!

নাইনটিনথ সেঞ্চুরি ক্লাবে "হিন্দুধর্ম" নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। আদিম পাপের জন্যেই মনুষ্যজীবনের পতন—এ আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি প্রত্যেকটি মানুষই ঈশ্বরের মন্দির। তার আদিম পাপ নয়, তার আদিম শুদ্ধতা। মানুষের আত্মিক উন্নতির উদ্দেশ্যই হচ্ছে সেই আদিম শুদ্ধতায় ফিরে যাওয়া। আর এই ফিরে যাওয়ার পথ হচ্ছে পবিত্রতা আর প্রেম।

যদি পূর্ণ ঈশ্বর এই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে থাকেন তবে এখানে অপূর্ণতা কেন? আমরা কতটুকু দেখছি? যতটুকু দেখছি তাকেই জগৎ বলছি স্পর্ধাভরে। জ্ঞানের ক্ষুদ্র ভূমির বাইরে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, তবু ঐ অসম্ভব প্রশ্ন করতে ছাড়ি না। আমরা যদি ক্ষুদ্র ও ভগ্ন এক অংশমাত্রই সব সময়ে দেখি তাহলে আমাদের বোধও অসম্পূর্ণ। সর্বত্যাগী ঈশ্বর এত বৃহৎ যে এই জগৎই তাঁর অংশমাত্র। যতই বিজ্ঞান বাড়বে ততই আবার বিস্ময় বাড়বে। পূর্ণতা পাবে কোথায়, কখন? যখন শ্রুত ও শ্রবণ, চিন্তিত ও চিন্তার বাইরে যেতে পারবে, তখন। তাকে পাবে যুক্তিবিচারের অতীতে, অহংজ্ঞানের ওপারে, প্রকৃতিতত্ত্বের বাইরে। সেই বাইরেই সাম্য আর সামঞ্জস্য। আর ঐ সাম্যে আর সামঞ্জস্যেই পূর্ণতা। আর পূর্ণই সত্যস্বরূপ। কী সুন্দর বলছেন! বলছেন, ঈশ্বরের ভয় থেকেই যদি ধর্মের আরম্ভ, ঈশ্বরের প্রেমেই ধর্মের পরিণাম। যীশুখৃষ্ট আসুন, আমি তাঁকে প্রণাম করব। আর সেই সঙ্গে প্রণাম করব বুদ্ধকে। আর কৃষ্ণকে। এই সর্বদেবনমস্কারই হিন্দুত্ব। পারবে তোমরা মেনে নিতে সবাইকে?

"মানুষ ও তার নিয়তি"—এ নিয়ে আবার বক্তৃতা দিলেন ওয়্যানস কাউন্সিলে। কেন ও-কথা ভাবছ যে আমাদের পাপের শাস্তি দেবার জন্যে ঈশ্বর দুর্ধর্ষ রাজার মত বসে আছেন চাবুক হাতে? কিংবা আরেক হাতে তাঁর ফুলের মালা, পুণ্যবানকে পুরস্কৃত করবার জন্যে? কে পাপী, কে পুণ্যবান? উঠে দাঁড়াও, বলো, আমি জেনেছি আমার নিজের সম্বন্ধে চরম সত্য কথা। আমি নিজেই ঈশ্বর। আমাদের প্রকৃত সত্তাই ঈশ্বরত্ব। তাই আদিম পাপ নয়, আদিম পবিত্রতা। কাকে তুমি পাপী বলছ? ও আসলে হীরে, শুধু ধুলোর মধ্যে পড়ে আছে। ওর গা থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলে দাও, ও আবার হীরে, প্রথম থেকেই হীরে। এক মুঠো বালি নিংড়ে তেল বের করবে এ বরং বিশ্বাস করব কিন্তু একজন অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসীতে পরিবর্তন করতে পারবে না এ কিছুতেই স্বীকার করব না।

ছাগলের পালে একটা বাঘিনী পড়েছিল। এক ব্যাধ দূর থেকে দেখে তাকে মেরে ফেললে। বাঘিনীর পেটে বাচ্চা ছিল তখুনি সেটা প্রসব হয়ে গেল। বাচ্চাটা প্রথমে ছাগলের মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়ে পরে ছাগলের দলে মিশে ঘাস খেতে লাগল। শুধু তাই নয়, ছাগলের মত লাগল ভ্যা-ভ্যা করতে। অন্য জানোয়ার দেখে ছাগলেরা যেমন পালায় বাঘের বাচ্চাটাও পালাতে লাগল দেখাদেখি। একদিন সেই পালে সত্যি-সত্যি একটা বাঘ এসে পড়ল। ছাগলের সঙ্গে সেই বাঘের বাচ্চাটাও দৌড়ে পালাল। তখন বাঘটা ছাগলদের পিছু না গিয়ে সেই ঘাসখেকো ব্যাঘ্রশাবকটাকে ধরলে। যতই কেননা ভ্যা-ভ্যা করুক তার আজ ত্রাণ নেই কিছুতেই। তাকে টেনে হিঁচড়ে জলের কাছে নিয়ে

এল সেই বাঘ। বললে, এই জলের মধ্যে তাকা, নিজেকে দ্যাখ স্বচক্ষে। কী দেখছিস? আমার যেমন হাঁড়ির মত মুখ তোরও ঠিক তেমনি। এই নে, খা। ঘাস নয়, যা তোর খাদ্য, মাংস খা। তার মুখে খানিকটা মাংস গুঁজে দিল বাঘ। ঘাসখেকোটা কোনো মতেই খাবে না, কেবল ভ্যা-ভ্যা করে। পরে রক্তের গন্ধ পেয়ে আস্তে আস্তে এগুলো, মাংসের টুকরোটা মুখে পুরে লাগল চিবোতে। বা, খেতে-খেতে বেশ লাগছে। তখন বাঘ জিগগেস করলে, কী বুঝছিস? বাঘের বাচ্চা বললে, বুঝেছি তুমিও যা আমিও তাই। বেশ, তবে এখন কী করবি, কোথায় যাবি? বাঘের বাচ্চা বললে, স্ববাসে—স্বধামে যাব। বলে বাঘের সংগ ধরে বনে চলে গেল।

গর্জন করো, ভ্যা-ভ্যা কোরো না। স্বরূপকে চেনো। বলো আমি ছাগল নই আমি বাঘ। আমি চিনেছি নিজেকে। আমি আর ঘাস খাবার দলে নই।

এমনি কত কথা বলছেন স্বামীজি। বিদেশীদের কাছে নতুন সব কাহিনী। কতকগুলো অন্ধ হাতির কাছে এসে পড়েছিল। একজন লোক বলে দিলে, এ বস্তুটার নাম হাতি। চোখে তো দেখতে পায় না, হাত বুলিয়ে যে যেখানটা পেল বর্ণনা করতে লাগল। কেউ দিল শুঁড়ে হাত, কেউ পায়ে, কেউ ল্যাজে, কেউ কানে। কেউ বললে হাতি অজগর সাপের মত, কেউ বললে থামের মত, কেউ দড়ির মত, কেউ বা কুলোর মত। ঝগড়া লেগে গেল, ঝগড়া থেকে শুরু হ'ল মারামারি। এ বললে, তুই মিথ্যেবাদী। ও বললে, তুই। তখন সেই আগের লোকটা এসে বললে, তোমরা সকলেই মিথ্যেবাদী, কেউই তোমরা দেখনি হাতিকে। আমাদের ধর্ম নিয়ে যে ঝগড়া এও শুধু অন্ধের হস্তি-দর্শন।

আবার বক্তৃতা। এবার পুনর্জন্ম নিয়ে।

কর্ম দিয়েই জন্ম নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এ একটা খুব সুস্থ কল্পনা। আমার কাজ যদি ভালো হয় উন্নততর জীবন পাব এ বিশ্বাস তো মহত্ত্বের প্রতি প্রেরণা। এ বিশ্বাসের পিছনে, আর যাই হোক, জাগ্রত থাকে সদবুদ্ধি। যা গেছে তা গেছে। যদি আরো একটু ভালোভাবে যেত। যা করে ফেলেছি তো ফেলেছি। আহা, যদি আরো একটু ভালো করে করতাম! তা কী হয়েছে। এখনো অনেক দিন যাবার বাকি। অনেক কাজ না-করা। বেশ তো, আর আগুনে হাত দিও না। তোমার প্রত্যেকটি মুহূর্তেই নতুনতরো সম্ভাবনা।

ঠাকুরকে নরেন একবার বললেন, 'ভগবান তিনটি বড়-বড় জিনিস আমাদের দিয়েছেন। মনুষ্যজন্ম, ঈশ্বরকে জানবার জন্যে ব্যাকুলতা আর মহাপুরুষের সংগ। মনুষ্যত্বং, মুমুক্ষুত্বং, মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ।'

'ঠিক বলেছিস।' বললেন ঠাকুর: 'আমার তো বেশ বোধহয় ভিতরে একজন আছেন।' আবার বললেন, 'ব্রহ্ম অলেপ। তাঁতে তিন গুণ বর্তমান অথচ তিনি নির্লিপ্ত। যেমন হাওয়া। হাওয়াতে সুগন্ধ দুর্গন্ধ দুইই আছে কিন্তু হাওয়া নির্লিপ্ত। কাশীতে শঙ্করাচার্য যাচ্ছেন পথ দিয়ে। চণ্ডাল তাঁকে হঠাৎ ছুঁয়ে ফেললে। শঙ্কর বললেন, ছুঁয়ে ফেললি? চণ্ডাল বললে, ঠাকুর তুমিও আমায় ছোঁওনি, আমিও তোমায় ছুঁইনি। আত্মা নির্লিপ্ত। তুমি সেই শুদ্ধ আত্মা। আমিও তাই। জ্ঞানী মায়া ফেলে দেয়। মায়া আবরণস্বরূপ। এই দেখ এই গামছা আড়াল করলাম—' ঠাকুর গামছাটি নিজের মুখের কাছে ধরলেন: 'আমার মুখ আর দেখা যাচ্ছে না। রামপ্রসাদ যেমন বলেছে—মশারি তুলিয়া দেখ—'

'আর ভক্ত?' জিগগেস করল নরেন।

'ভক্ত মায়া ছেড়ে দেয় না। মহামায়ার পূজা করে। শরণাগত হয়ে বলে, মা, পথ ছেড়ে দাও। তুমি পথ ছেড়ে দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হবে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থাই জ্ঞানীরা উড়িয়ে দেয়। ভক্তেরা সব অবস্থাই নেয়, যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ সবই আছে। মায়াবাদ শুকনো। কী বললাম বল দেখি।' নরেনের দিকে তাকালেন।

'শুকনো।' নরেন বললে।

নরেনের হাত-মুখ স্পর্শ করতে লাগলেন ঠাকুর। বললেন, 'তোর এসব ভক্তের লক্ষণ। জ্ঞানীর লক্ষণ আলাদা। তার মুখের চেহারা শুকনো হয়।'

নরেনের পেটের অসুখ হয়েছে। বলছে মাস্টারকে, 'প্রেমভক্তির পথে থাকলেই দেহে মন আসে। তা না হলে আমি কে? আমি মানুষও নই দেবতাও নই, আমার সুখও নেই, দুঃখও নেই।'

আমেরিকার জনতা, মেয়ে-পুরুষ, প্রশ্নের পর প্রশ্ন হানছে স্বামীজিকে। ধর্মে বিজ্ঞানে দর্শনে সাহিত্যে সব দিকেই তিনি এমন সুরক্ষিত, কেউ কোনো দেয়ালেই বিন্দু ছিদ্র করতে পারছে না। যে কোনো অবস্থাতেই নিজেকে উঁচু করে তুলে রাখতে পারছেন। আর সব চেয়ে যা আকর্ষণীয় কিছুতেই বিরক্ত হচ্ছেন না, বিনয় থেকে বিচ্যুতি ঘটছে না একটুও। সব সময়েই এমন একটি বালকের সারল্যের ভাব, এমন অপ্রগলভ আন্তরিকতা যে, যে দেখছে যে শুনছে যে প্রশ্ন করছে সবাই সমান তন্ময়।

'বাঙলাদেশে আমার জন্ম, নিজের ইচ্ছায় আমি সন্ন্যাসী, অকৃতদার।' বলছেন স্বামীজি, 'আমার জন্মের পর আমার বাবা আমার এক কুষ্ঠি তৈরি করিয়েছিলেন কিন্তু আমাকে তিনি ঘুণাক্ষরেও বলেন নি তাতে কী লেখা আছে। কয়েক বছর আগে বাবা মারা যাবার পর যখন আমি বাড়ি গিয়েছিলাম, তখন আমার মার কাছে দেখেছিলাম সেই কুষ্ঠি। সেই কুষ্ঠিতে কী লেখা ছিল জানো? লেখা ছিল আমি গৃহহীন সন্ন্যাসী হয়ে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াব।'

হাতের সিগারের ছাই ঝেড়ে ফেলে এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন স্বামীজি। কি রকম উদাস এক বিষাদের সুর বাজল ঘরের মধ্যে। শ্রোতৃমণ্ডলী সেই স্পর্শে বিধুর, স্নেহাতুর হয়ে উঠল।

'কিন্তু তোমার ধর্ম যদি এতই ভালো তবে তোমাদের দেশ এত দরিদ্র কেন, অধোগত কেন?' তারই মধ্যে প্রশ্ন করে ওঠে একজন।

'তাতে ধর্মের কী? তাই বলে আমার ধর্ম কি দরিদ্র, আমার ধর্ম কি অধোগত?' স্বামীজি গম্ভীর হয়ে বললেন।

'কিন্তু আধ্যাত্মিকতার পিছনে ছুটতে গিয়ে তোমরা পার্থিবতাকে হারিয়েছ। তাতে কী লাভ হয়েছে?' প্রশ্নকর্তা শ্লেষের সুর আনল: 'ফাঁকা ভবিষ্যৎকে খুঁজতে বর্তমানকে খুইয়েছ। তোমাদের এই নীতি মানুষকে বাঁচাতে শেখায়নি—'

'মরতে শিখিয়েছে।' স্বামীজির উদাত্ত উত্তর।

'আমরা বর্তমান সম্বন্ধে নিশ্চিত।'

'তোমরা কোনো কিছুর সম্বন্ধেই নিশ্চিত নও।'

'আদর্শ ধর্ম তাকেই বলব যা বাঁচতেও শেখায় মরতেও শেখায়—'

'ঠিক বলেছ। আমরা তাই প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে প্রতীচ্যের পার্থিবতাকে মেলাতে চাচ্ছি—'

'তুমি কি মনে করো না এই পার্থিব সমৃদ্ধিতে পৌঁছুতে গেলে ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থায় মহাবিপ্লব ঘটাতে হবে ?'

'হয়তো হবে কিন্তু ভারতবর্ষের ধর্ম নড়বে না, টলবে না, হেলবে না একচুল। সে সনাতন ধর্ম অব্যাহত থাকবে।'

'থাকুক। কিন্তু তোমরা মূর্তি পুজো কর কেন ?' আরেকজনের প্রশ্ন।

'আর তোমরা ? তোমরা কার পুজো কর ?'

'আমরা ভাবের পুজো করি।'

'কী ভাব ? ভাব কাকে বলে ? সে কি শুধু বাইবেলের কথা না কি তারও কিছু অতিরিক্ত ? আমরা মূর্তির পুজো করি না। মূর্তির মাধ্যমে আমরা অমর্তের পুজো করি। আর তোমরা ? ভাব কী ? ভাব কোথায় ? ভাবকে কী বলে ভাববে ? কী, কথা কইছ না কেন ?'

এক গ্লাশ জলে ছোট এক কণা বাতাস ঢুকিয়ে দাও, দেখবে অন্তরীক্ষে অনন্তের আয়তন পাবার জন্যে সে কী প্রাণপণ সংগ্রাম করছে। তেমনি আমরাও সংসারপঙ্কে এসে ডুবেছি কিন্তু আমাদেরও প্রতিনিয়ত সংগ্রাম, কী করে বেরিয়ে এসে আমাদের পবিত্রতম সত্তায় আমরা বিস্তার লাভ করব। এই বিস্তার লাভের উপায়ই ধর্ম সংগ্রামই একমাত্র অস্ত্র—অমোঘ অস্ত্র।

৫৭

শিকাগোতে মিসেস হেলের দুটি মেয়ে মেরি আর হ্যারিয়েট, আর দুটি বোনঝি হ্যারিয়েট আর ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলি এক সঙ্গে থাকে। কারু বিয়ে হয়নি, স্বামীজিকে ভাই বলে আর স্বামীজির থেকে ব্রহ্মচিন্তার পাঠ নেয়।

চারটি মেয়ের মুখেই ঈশ্বরের অদৃশ্য স্বাক্ষর। আনন্দের লিপিতে পবিত্রতার পত্র। সর্বোত্তম বোধ প্রার্থনা কী ? মৃত্তিকার ধূলিতে যা কিছু পবিত্র, তার কাছেই আমি মাথা নোয়াব। তোমরা ফুলের মত নিশ্বাস ফেল বাতাসে, তোমাদের পা যেন এই ভয়াল পৃথিবীর ধুলোকাদা না ছোঁয়। ডেট্রয়েট থেকে ইসাবেলকে চিঠি লিখেছেন স্বামীজি : যেমন ফুল হয়ে জন্মেছ তেমনি ফুল হয়ে বেঁচে থেকে ফুলের মতই ঝরে পড়ো, এই তোমাদের ভায়ের নিরন্তর প্রার্থনা।

'এ দেশের মেয়ের মত মেয়ে জগতে নেই।' লিখছেন স্বামীজি : 'কি পবিত্র, স্বাধীন, স্বাপেক্ষ আর দয়ালু। মেয়েরাই এদেশের সব। পুণ্যবানের গৃহে লক্ষ্মী-স্বরূপিণী। যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু। আর আমাদের দেশে ? পাপাত্মার হৃদয়ে অলক্ষ্মীস্বরূপিণী। পাপাত্মানাং হৃদয়েষ্বলক্ষ্মীঃ। হরে হরে, এদের মেয়েদের দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম। এদের মেয়েদের দেখেই বলতে হয়, তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই ঈশ্বরী, তুমিই লজ্জাস্বরূপিণী। ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরীস্ত্বং হ্রীঃ। যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা—এ শুধু এদের দেখেই মনে পড়ে। প্রভু কি গাঁপবাজিতে ভোলেন ? প্রভু বলেছেন, ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী। তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই বালক, তুমিই বালিকা। আর আমরা বলছি, দূরমপসর রে চণ্ডাল, ওরে চণ্ডাল,

দূরে সরে যা। আমরা বলছি, কেনৈষা নির্মিতা নারী মোহিনী, কে এই মোহিনী নারীকে সৃষ্টি করেছে?'

মা, সংসারসমুদ্রে আমার তরী বুঝি এবার ডোবে। প্রার্থনা করছেন স্বামীজি। ভ্রান্তির ঘূর্ণি উঠেছে, ছুটেছে আসক্তির ঝড়। আমার দাঁড় পাঁচজন বোকা আর মাঝিটা স্বয়ং দুর্বল। এদিকে আমার ধৈর্যের পাল ছেঁড়া, এবার তরী বুঝি ডোবে। মা, রক্ষা করো, রক্ষা করো!

তোমার করুণার সমীরণ পাপী-পুণ্যাত্মার অপেক্ষা করে না, তা চিরকাল প্রবাহিত। তোমার করুণায় প্রেমিক আর ঘাতক দুইই বেঁচে আছে। মায়ের করুণাতেই সকলে সিক্ত —যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। প্রকাশ্যের দ্বারা কি প্রকাশিকা কলুষিত হয়, না কি প্রকাশিকা প্রকাশ্যের অপেক্ষা রাখে? সচ্চিদানন্দময়ী চিরপবিত্রা, চির-অপরিবর্তনীয়া মা, তুমি সকলের সত্তারূপে বর্তমান—নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। শিশু স্তন্যপান করে, মধুকর মধুপান করে। মা, তুমিই তাদের পান করাও। তুমিই দুধ, তুমিই মধু। তুমিই জননী। তুমিই পুষ্প।

'পশ্চিমের শক্তির সঙ্গে কি ভারতবর্ষের শান্তির সংমিশ্রণ হতে পারে?' কে একজন সন্দেহ প্রকাশ করল।

'নিশ্চয়ই পারে।' গর্জে উঠলেন স্বামীজি, 'সিংহের বিক্রমের সঙ্গে মিলতে পারে হরিণের মৃদুতা। এবং দেখো, একদিন তাই ঘটবে। তাই ঘটলেই পৃথিবীর উদ্ধার।'

মিস মার্গারিট কুক ডেট্রয়টের ইস্কুলে জার্মান পড়ায়। একদিন শুনতে গিয়েছে স্বামীজির বক্তৃতা। নীরেট নীরস মানুষ, এই তার নিজের সম্বন্ধে ধারণা ছিল, কোনো কিছুতেই সে অভিভূত হতে জানে না। কিন্তু স্বামীজির বক্তৃতা শুনে তার কী রকম ভাবান্তর হল। ইচ্ছে হল বক্তাকে অভিনন্দিত করে। জীবনে এমন ইচ্ছা এর আগে আর কোনোদিন হয়নি, কিন্তু সাধ্য নেই এই অদ্ভুত ইচ্ছাকে সে দাবিয়ে রাখে। সেই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ বুঝি অপ্রতিরোধ্য। এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল মার্গারিট। স্বামীজি কতক্ষণ তার হাতখানি ধরে রইলেন। মার্গারিটের মুখে কথা নেই। কথা কোনো আছে কিনা সংসারে তাও সে ভেবে পেল না, খুঁজে পেল না। নিষ্কম্প দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

'কোনোদিন ভুলব না তাঁর সেই অগাধ অমিয় দৃষ্টি।' পরে একদিন বলছে মার্গারিট, 'আর জানো, কী পেলাম সেই স্পর্শে?'

'কী?' তার বন্ধু মিসেস উড জিগগেস করল।

'সেই স্পর্শে বুঝলাম কাকে বলে পবিত্রতা, কাকে বলে মহত্ত্ব। যেন আকাশকে ছুঁলাম, না, সমুদ্রের হৃদয়কে। জানো, পাছে সেই স্পর্শের স্বাদ চলে যায় সেই ভয়ে হাত ধুইনি তিন দিন।'

'বলো কি, তিন দিন হাত ধোওনি?'

'না, যেদিন ধুলাম সেদিন আমি আবার সাধারণ মানুষ হয়ে গেলাম। আমার মধ্যে যে চেতনার ঝঙ্কার চলছিল তা থেমে গেল।'

মিসেস উড আর কেউ নন আমেরিকার কবি সারা বার্ড ফিল্ড। তখন সে বালিকা মাত্র যখন স্বামীজি ডেট্রয়টে। বালিকা হলেও খবরের কাগজ ওলটানো তার অভ্যেস, কিন্তু দিনের পর দিন যে খবরের কাগজই না খোলো, দেখতে পাবে শুধু একজনের

ছবি—যার নাম স্বামী বিবেকানন্দ। আর এমন একটা ছবি যার দিকে চোখ পড়লে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। আর তোমার সাধ্য কি সে ছবিকে তোমার চোখ উপেক্ষা করে। তুমি জানতেও পারবে না কখন সে ছবির চোখ তোমাকে গ্রাস করে বসেছে।

সারা-র বাপ গোঁড়া ব্যাপটিস্ট, স্বামীজির অভ্যুদয়ে ভীষণ বিরক্ত। ঐ পৌত্তলিকটাকে নিয়ে কেন সকলে এত মাতামাতি করছে, কী এমন আছে ওর কথায়! সমস্ত শহর একেবারে উৎসবের সাজে সেজেছে। দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে তার উত্তেজনা। যেন এসেছে কোন এক রহস্যরাজ্যের অধীশ্বর! আর আহা, কী তার পোশাকআশাক, কী তার বলার কায়দা! ব্রেকফাস্টের টেবিলে সারা-র বাপ একদিন মাথায় একটা তোয়ালে জড়িয়ে উপস্থিত হল—আহা, এই তার পাগড়ি—আর কথা বলতে লাগল নাকী সুরে—সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করবার চেষ্টায়—আহা, এই তার বচনভঙ্গি।

ছোট মেয়ে সারা এর কোনো প্রতিবাদ করতে পেল না। কিন্তু উত্তর জীবনে সে তার প্রত্যুত্তর দিলে। কী প্রত্যুত্তর? সে সারাজীবন স্বামীজির ভক্ত হয়ে রইল, হয়ে রইল, বেদান্তবাদিনী।

আর ডেট্রয়েটের মিসেস মেরি ফাঙ্ক। বলছে, স্বামীজিকে জানা মানেই জীবনের মূল্যবোধ বদলে যাওয়া। নিজেকে ধিক্কার দেওয়া, ইতিপূর্বে কী সব তুচ্ছ জিনিসকেই দামী ভেবে এসেছি! স্বামীজিকে শুনে আর সন্দেহ থাকে না, মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি কেন? সে শুধু ঈশ্বর পাওয়া, ঈশ্বর হওয়ার জন্যে।

সমস্ত ঘর লোকে লোকারণ্য, তিলধারণের স্থান নেই, আমি দেখতে পাচ্ছি, স্বামীজি উঠেছেন রংগমঞ্চে। আনন্দমুখর হয়ে সমস্ত জনতা অভিনন্দন জানাচ্ছে। রংগমঞ্চে উঠছেন যেন কোন এক রাজা না দেবতা—একটা জবলন্ত প্রাণের মশাল—যেদিকে তাকাচ্ছেন সেইদিকই আলোকিত, বশীভূত হয়ে যাচ্ছে। তারপর শুনতে পাচ্ছি, শুরু করেছেন বলতে। সে স্বর নয়, গীতধ্বনি, যেন ইওলিয়ান বীণা বাজছে, কখনো করুণ আর্তি, কখনো ভয়াল গর্জন—কখনো বা প্রগাঢ় স্তব্ধতা। এত প্রগাঢ় যেন হাত দিয়ে ধরা যায়, যেন বা শোনা যায় তার অব্যক্ত মর্মোচ্ছ্বাস। সমস্ত জনতার এক চক্ষু, এক কান এক নিশ্বাস। এক পিণ্ড অখণ্ড অনুভূতি।

সেই মিসেস ফাঙ্ক কলকাতায় স্বামীজির সন্ন্যাসী-সখাদের কাছে খবরের কাগজের কাটিংস পাঠাচ্ছেন যাতে, যতটা সম্ভব, একটা পূর্ণাবয়ব চিত্র পাওয়া যায় স্বামীজির। 'কত কষ্ট করে ঘুরে-ঘুরে আমি এসব যোগাড় করেছি। কত তিল-তিল পরিশ্রমে। তাই এসব কাটিংস আমার কাছে অমূল্য বস্তু। অনুরোধ করছি, এগুলির কাজ হয়ে গেলে দয়া করে এগুলি আবার আমাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন। স্বামীজির স্মৃতিচিহ্ন আমার কাছে আর কিছু নেই। আপনাদের কাছে তো কত আছে, মঠ আছে, তাঁর ঘর আছে, আছে সেই পবিত্র বেলগাছ। আমার কাছে শুধু এই কটি কাগজের টুকরো।'

পাদ্রীর দল অনেকদিন থেকেই খেপে আছে স্বামীজির বিরুদ্ধে, এবার তাদের রাগ চরমে উঠল। জুটল আরো নতুন শত্রু। তাঁর বিরুদ্ধে শুধু কুৎসাই প্রচার করতে লাগল না, চাইল তাঁকে সশরীরে সরিয়ে দিতে। শুধু এ দেশ থেকে নয়, পৃথিবী থেকে। পাকিয়ে তুলল হত্যার ষড়যন্ত্র।

ডেট্রয়েটে ডিনার খাচ্ছেন স্বামীজি। খাবার শেষে কফি নিয়ে বসেছেন। গল্প চলছে। কফির কাপ তুলেছেন মুখের কাছে। চুমুক দেবেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন কফিতে

শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়া। চমকে তাকালেন ব্যাকুল চোখে, এ কি, ঠাকুর একেবারে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। চোখেমুখে দুশ্চিন্তা—উদ্বেগ।

'ও রে, ও কফি খাসনে—' বললেন ঠাকুর।

'কেন ?' স্বামীজির পেয়ালা-ধরা হাত কেঁপে-কেঁপে উঠল।

'ঐ পেয়ালাতে বিষ—কফিতে ওরা বিষ মিশিয়ে দিয়েছে—'

স্বামীজি পেয়ালা নামিয়ে রাখলেন। খেলেন না।

প্রসন্ন চোখে তাকালেন ঠাকুর। অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

'আমাকে কে মারে ?' বলছেন স্বামীজি, 'প্রভু আমার সঙ্গে-সঙ্গে চলেছেন, অনিমেষে দেখছেন অহর্নিশ। আর কেউ নয়, আমার প্রভু, আর্তত্রাণপরায়ণ নারায়ণই আমার একমাত্র গতি।'

যাঁর পাদপদ্মের নখনিঃসৃত জল ত্রিভুবনের পাতক নাশ করে, যাঁর নামামৃত পানে সর্বসন্তাপ দূরে যায়, যাঁর চরণস্পর্শে পাষাণময়ী অহল্যা প্রাণময়ী হয়ে ওঠে, সেই আর্তত্রাণপরায়ণ নারায়ণই আমার একমাত্র গতি।

হে বিষয়পাশসংহারিণী রাজপদপ্রদা, আমাকে অভয়ে প্রতিষ্ঠিত করো। হে সর্বশত্রু-বশংকরী সঙ্কটনাশিনী সর্বশ্রমহরা, আমাকে, নতজনকে, রক্ষা করো। হে মন্দজনোদ্ধারিণী বীরসাধনবাসিনী, সমস্তদোষঘাতিকে, তোমাকে নমস্কার।

গ্রীনএকারে এসেছেন স্বামীজি। কতগুলি ছাত্র এসে জুটেছে। বেদান্ত শিখতে চায় স্বামীজির কাছে। স্বামীজি সমধিক উৎসাহী। তবে, বেশ, বসে পড়ো এই পাইন গাছের নিচে, ভারতীয় রীতিতে, শ্রদ্ধাবিনম্র ভঙ্গিতে। আমিও বসছি, শোনাচ্ছি বেদান্ত।

তাঁকে কেউ দেখতে পায় না, শুনতে পায় না, মনন করতে পারে না, কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারাই তিনি সম্পূর্ণ গ্রাহ্য নন, অপূর্ণ ও অন্তর্বিশিষ্টের পক্ষে কী করে পূর্ণ ও অনন্তকে ধারণ করবে ? তিনি ছাড়া আর কেউ দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বা বিজ্ঞাতা নেই। তিনি কেবল অন্তর্যামী নন, তিনি অমৃত, নিত্যসুখদ। তাঁর থেকে পৃথক বা বিযুক্ত হয়ে আমরা যা করি বা ভাবি তাতেই আমাদের আর্তি। তিনি ছাড়া আর সমস্তই দুঃখের। শোনো, তিনিই তোমার আত্মা, তোমার প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, মনের মন, তিনিই পুরাণপুরুষ, আদিমপুরুষ।

গ্রীনএকার থেকে মেরী হেল আর হ্যারিয়েট হেলকে চিঠি লিখছেন স্বামীজি :

'এখানে একটি যুবক রোজ গান করে। তার ভাবী পত্নী ও বোনের সঙ্গে সে এখানে আছে। এই সেদিন রাত্রিতে ছাউনির সকলে একটা পাইন গাছের তলায় শুতে গিয়েছিল —জানো, আমি রোজ সকালে ঐ গাছের নিচে হিন্দুধরণে বসে ওদের সকলকে উপদেশ দিই। ওদের সঙ্গে আমিও সেদিন গেছলাম—তারকাখচিত আকাশের নিচে মাতা বসুন্ধরার কোলে শুয়ে রাতটা কী আনন্দেই যে কেটেছে। মাটিতে শোওয়া, বনে গাছতলায় বসে ধ্যান—সে আনন্দের আর তুলনা নেই। যারা সরাইয়ে রয়েছে তারা কমবেশি অবস্থাপন্ন, আর তাঁবুর লোকেরা সুস্থ সবল কাপট্যলেশহীন। তারা একটু খেয়ালী কিন্তু শুদ্ধাত্মা। জানো, সকলকে শিবোঽহং শিবোঽহং করতে শেখাই আর ওরা সমস্বরে তাই আবৃত্তি করতে থাকে, সকলেই কি সরল, কি অসীমসাহসী। এদের শিক্ষা দিয়ে আমিও পরম আনন্দ ও গৌরব বোধ করছি।'

ভিতরকার একটা বাণী আমাদের সর্বদা বলছে, আমরা চিরন্তন ক্রীতদাস নই, আমরা

নিত্যস্বাধীন। বাণী শোনো আর না শোনো, প্রভুর বাণী চিরজাগ্রত : হে ভারগ্রস্ত, শ্রান্ত, আমার কাছে এস, তোমার ভার অপনোদন করব। বন্ধন আর মুক্তির এই সংগ্রাম, এই হল জীবনের চিহ্ন। এ না থাকলে বুঝবে জীবের আর জীবন নেই। আখেরে জানবে মুক্তিই জয়ী হবে। মুক্তিই সর্ববরেশ্বরী।

শোনো বেদান্তের কথা। কী এই জগৎ? স্বামীজি বলছেন, নামরূপায়ত ব্রহ্মই জগৎ। এই ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয় করেই নামরূপাত্মক ভ্রান্তি অভিব্যক্ত থাকে যতক্ষণ তার অধিষ্ঠানের জ্ঞান না হয়। ব্রহ্মই নিঃসীমসুখসাগর। নুনের পুতুল হয়ে ডুবে যাও নুনের সমুদ্রে।

'কী শিখিয়েছেন আমাদের বিবেকানন্দ?' ডক্টর গ্রসম্যান বক্তৃতা দিচ্ছেন : 'শিখিয়েছেন ধর্ম শুধু চিন্তা নয়, ধর্ম কর্ম, ধর্ম জীবন্ত কর্ম।' আমাদের ভাব আছে, কিন্তু যে কর্ম ভাবেরই রক্তমাংস সেই কর্ম নেই। আমরা ভ্রাতৃত্বের কথা বলি কিন্তু প্রাচ্য দেশের লোক হলে তাকে প্রত্যক্ষ অপমান করতে পেছপা হই না। আমাদের ঈশ্বর আকাশে কিন্তু বিবেকানন্দের ঈশ্বর মাটিতে। আমাদের ঈশ্বর সিংহাসনে বসে আছেন, কিন্তু বিবেকানন্দের ঈশ্বর চাষ করছেন, মাটি কাটছেন, পাথর ভাঙছেন, ধুলো পায়ে হাঁটছেন মেঠো পথ ধরে। প্রতিটি চুলে ঈশ্বর, প্রতিটি তৃণখণ্ডে, প্রতিটি সমীরমর্মরে, প্রতিটি রক্তচাঞ্চল্যে, হৃদয়স্পন্দে। এই তো শেখালেন স্বামীজি।'

'আমি তোমাদের যীশুখৃস্টকে টেনে নিতে পারি বুকের মধ্যে, টেনে নিতে পারি কি, টেনে নিয়েছি, কিন্তু তুমি আমার কৃষ্ণকে বুকে টেনে নিতে পারো? পারো না, পারবে না। নেই তোমার সেই হৃদয়প্রসার। কিন্তু আশ্চর্য, তুমিই সভ্য আমি বর্বর, আমিই পৌত্তলিক আর তুমি ধর্মপ্রাণ!' বলছেন বিবেকানন্দ। আর তা প্রহারের মত আমাদের গায়ে এসে লাগছে।

'আর, তাকিয়ে দেখ, হিন্দু যাকে অতিথি বলে সেই অতিথির দিকে। দরিদ্র সংসার, কিন্তু দ্বারে অতিথি এসেছে, ছোট শিশু মহোল্লাসে তাই ঘোষণা করছে বাপ-মায়ের কাছে। অতিথিই তো স্বয়মাগত ঈশ্বর হিন্দুর কাছে। অতিথিকে পাওয়া মানেই তো সেবাচর্যা করবার সুযোগ পাওয়া। আর এই সেবাচার্য কাকে? মানুষকে নয়, মানুষবেশী ঈশ্বরকে।'

'আমাদের ধর্ম কবে, কোথায় ও কতক্ষণ?' বলছেন আবার গ্রসম্যান। 'আমাদের ধর্ম রবিবারে, গির্জেয়, সকালে দু-ঘণ্টা। আর হিন্দুর ধর্ম প্রত্যহ, সর্বত্র ও সর্বক্ষণ। নিখিল বিশ্বের অণুতে-রেণুতে, প্রতিটি নিশ্বাসে, প্রতিটি মুহূর্তের ভ্রমরগুঞ্জনে।'

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ কি শুধু কথাই কইবেন? কাজে কিছু দেখাবেন না? আরেক দল লোক আন্দোলন শুরু করে দিল। কাজে আবার কী দেখাবেন? কেন, ইন্দ্রজাল? যাকে বলে ফকিরের কেরামতি? যদি ভেলকিই না দেখাতে পারল তাহলে আর হিন্দু হবার কৃতিত্ব কী! দশ হাজার লোকের চোখের সামনে খোলা মাঠে একটা পাইন গাছ গজিয়ে দিতে পারো তবেই তো বুঝি কেমন বাহাদুর! নইলে কথা আর কথা, ঢের-ঢের অমন শুনেছি আমরা। তোমার চেয়েও লম্বা বক্তৃতা দেবার লোক কম নেই আমেরিকায়। তোমার ধর্ম যদি এতই তেজী তবে দেখাও সেই দড়ির খেলা। দাঁড়ানো দড়ি বেয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কসরৎ!

এর আবার পালটা গাইছে স্বামীজির অনুরাগীর দল।

ধর্ম মানে কি ভোজবাজি? অলৌকিক বলে কিছু নেই এ বলবার সাহস কার আছে? সেই অতিপ্রাকৃতিক প্রচ্ছন্নশক্তির কী রহস্য তাই হিন্দু ঋষিদের অনুধাবনের বিষয়, কিন্তু তার সঙ্গে ধর্মের কী সম্পর্ক? যে ঐন্দ্রজালিক সেই তাহলে ধার্মিক? যীশুর কাছেও সেই দাবিই করেছিল সেদিন: 'আমাদের ভেলকি দেখাও।' 'তবু কি তোমরা বিশ্বাস করবে?' বলেছিলেন যীশু: 'মৃত লোক উঠে এলেও তোমরা বিশ্বাস করবে না।' যারা অজ্ঞানী তারাই কুহকের খোঁজ করে।

স্বামী বিবেকানন্দ যদি কিছু শান্তির বাণী নিয়ে এসে থাকেন, পবিত্রতার বাণী, বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী, তাহলেই তিনি কৃতকৃত্য। যদি ধর্মান্ধের তিনি চোখ ফোটাতে পেরে থাকেন আর অসহিষ্ণুর বধিরতাকে দূর করতে, তাহলেই তাঁর এ দেশে আসা সার্থক হয়েছে। আর তিনি তো প্রত্যহই প্রমাণ করছেন যাঁকে আমরা পৌত্তলিক বলছি তাঁর মধ্যে এমন সব গুণ আছে যা পরিচ্ছন্নতম খৃস্টানের মধ্যেও নেই। আর কে পেরেছে মানুষের মধ্যে দিব্য উদ্দীপনা জাগাতে, সমস্ত বিদ্বেষকে প্রেমে বিশুদ্ধ করতে, পরিপূর্ণের উপলব্ধিতে দাঁড়াতে স্থির হয়ে। আর কার ললাটে লেখা নির্ভুল ঈশ্বরের ঠিকানা?

আমার ধর্মের মহত্ত্বের প্রমাণে আমি কোনো ম্যাজিক দেখাতে প্রস্তুত নই। বলছেন স্বামীজি। প্রথমত আমি বাজিকর নই, দ্বিতীয়ত আমার ধর্ম, হিন্দুধর্ম, ইন্দ্রজালের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ধর্মে আমরা ভেলকি বলে কোনো কিছুকে স্বীকার করি না। তবে এ আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের আয়ত্তির বাইরে আছে আরো রহস্য যা আরো কোনো গহন শক্তির অধীন, কিন্তু তার সঙ্গে ধর্মের সংশ্রব কী। ধর্ম দৃঢ় সত্যের উপর দাঁড়িয়ে, হাতসাফাইয়ের চালাকির উপরে নয়। অলৌকিকের এলেকায় না গিয়েও ধর্ম—ধর্ম। আর যদি কেউ কখনো পৌঁছয়ও সেইখানে তাই বলে সঙ্গে সঙ্গে তার ধর্মও সেখানে পৌঁছয় না।

মিসেস ব্যাগলির বাড়িতে আছেন স্বামীজি, বাড়ির এককোণে পড়ার ঘরে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে। তালা দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে দরজা। বাড়ির আরেক প্রান্তে বৈঠকখানায় বহু লোক জমায়েত হয়েছে। হঠাৎ দেখা গেল তাদের মধ্যে স্বামীজি বসে! সে কী কথা? তাঁকে না ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে? কী করে নিমেষের মধ্যে এলেন তবে তিনি এখানে! তবে কি কেউ তাঁকে খুলে দিয়েছে দরজা? তাই বা কী করে সম্ভব? বা, চাবি তো এইখানে, এই একজন গণ্যমান্যের পকেটে। পকেট থেকে চাবি হাওয়া হয় কী করে? চলো গিয়ে দেখে আসি। কী করে খোলা হল দরজা! কী ভাবে বেরিয়ে এলেন!

সকলে সেই পড়ার ঘরের কাছে গিয়ে ভিড় করল। একী, দরজা খোলা নয় তো! যেমনটি তালাবন্ধ ছিল তেমনি তালাবন্ধই আছে। তবে কি স্বামীজি জানলা দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন? তাই বা সম্ভব হয় কী করে? জানলায় শিক ছিল না? জানলা দিয়ে বেরিয়েই বা বাড়ির এ প্রান্তে আসেন কী করে সহসা? অত গবেষণার দরকার কী! তালা খুলে দেখলেই তো হয়। তালা খুলে দেখা গেল যেমন বসে ছিলেন তেমনি বসে আছেন স্বামীজি! বই পড়ছেন তন্ময় হয়ে।

নিউইয়র্কে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে শিষ্যদের রাজযোগ শেখাতে লাগলেন স্বামীজি। বিনামূল্যে শেখাব। আর যা যা খরচ হবে সব আমার। বক্তৃতা দিয়ে-দিয়ে পয়সা কিছু জমেছে হাতে। দরকার হলে আরো বক্তৃতা দেব। রোজগার বাড়াব। কিন্তু পড়িয়ে পয়সা নেব না। তোমরা কে আছ উৎসাহী সত্যসন্ধিৎসু ছাত্র, এগিয়ে এস। ধ্যান ধারণা শেখ। শুধু ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্ম নয়, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুভূতিই ধর্ম। এই অনুভূতি পেতে হলে সর্বাগ্রে শরীর ও মনের সংযমসাধন করা চাই। যে নিয়ম অভ্যাস করলে এই সংযম সহজ হয় তারই নাম রাজযোগ।

যোগ কী? চিত্তবৃত্তির নিরোধের নামই যোগ। চিত্তকে নানা প্রকার বৃত্তি বা আকার বা পরিণাম গ্রহণ করতে না দেওয়াই যোগ। যোগ দু রকম। অভাবযোগ আর মহাযোগ। যখন নিজেকে শূন্য ও সর্বগুণবিরহিত ভাবে চিন্তা করবে তখন সেটা অভাবযোগ। আর যখন আত্মাকে আনন্দময় বলে, পবিত্র বলে, ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন বলে চিন্তা করবে তখন সেটা মহাযোগ। এই দুই যোগেই আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভব। নিজেকে ও সমুদয় জগৎকে সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপে অবলোকন করাই আত্মসাক্ষাৎকার। আর তারই নাম রাজযোগ। রাজযোগের আট অঙ্গ বা সোপান। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান আর সমাধি।

যমে চিত্তশুদ্ধি। যমের আবার পঞ্চ প্রদীপ—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য আর অপরিগ্রহ। অহিংসা কী? শরীর মন ও বাক্য দিয়ে কোনো প্রাণীর হিংসা না করা বা ক্লেশোৎপাদন না করাই অহিংসা। সত্য কী? যথার্থকথনই সত্য। চৌর্য বা বলপূর্বক অন্যের দ্রব্য গ্রহণ না করার নাম অস্তেয়। কায়মনোবাক্যে বীর্যধারণই ব্রহ্মচর্য। অতি কষ্টের সময়েও কারু কাছ থেকে দান বা উপহার না নেওয়ার নাম অপরিগ্রহ।

তারপরে নিয়ম। নিয়মের অর্থ নিয়মিত অভ্যাস ও ব্রতপালন। নিয়মেরও পঞ্চ প্রদীপ—তপ, স্বাধ্যায়, সন্তোষ, শৌচ আর ঈশ্বরপ্রণিধান। উপবাসে বা অন্য উপায়ে শরীরকে সংযত করার নাম তপ।

বেদপাঠ বা অন্য কোনো মন্ত্র উচ্চারণই স্বাধ্যায়। মন্ত্র উচ্চারণের আবার তিন রীতি। বাচিক, উপাংশু ও মানস। যে উচ্চস্বর জপ করলে সকলে শুনতে পায় তার নাম বাচিক। যে জপে কেবল ঠোঁট নড়ে কিন্তু কাছের মানুষও কোনো শব্দ শুনতে পায় না তার নাম উপাংশু। যে জপে কোনো শব্দ-উচ্চারণ হয় না, শুধু মনে-মনে যা স্ফুরিত হয়, স্ফুরণের সঙ্গে মন্ত্রের অর্থও স্মরণ করা হয় তার নাম মানস। বাচিকের চেয়ে উপাংশু শ্রেষ্ঠ, আর মানস শ্রেষ্ঠ উপাংশুর চেয়ে।

সন্তোষ মানে যদৃচ্ছালাভে ভরপুর সুখ।

শৌচ দুরকম। বাহ্য আর আভ্যন্তর। যা দিয়ে শরীর শুদ্ধ করা হয়, যেমন স্নান, তাই বাহ্য। আর যা দিয়ে মন শুদ্ধ করা হয়, যেমন সত্য, তাই আভ্যন্তর। দুরকম শুচিতাই দরকার। আর যখন এমন হয় দুরকম শুচিতাই সম্পন্ন করা যাচ্ছে না একসঙ্গে, তখন বাহ্য ফেলে আভ্যন্তর নেবে।

আর ঈশ্বরপ্রণিধান? ঈশ্বরের স্মরণ-মনন স্তুতি-প্রীতি ভজন-পূজনই ঈশ্বরপ্রণিধান।

এবার তৃতীয়ে এস। তৃতীয় আসন। শির, গ্রীবা ও বক্ষ সমান রেখে শরীরকে স্বচ্ছন্দে ও সুখে বসিয়ে রাখার নাম আসন।

তারপরে প্রাণায়াম। প্রাণ হচ্ছে শরীরের ভিতরকার চঞ্চল জীবনীশক্তি। আর, আয়াম মানে হচ্ছে সংযম। প্রাণায়াম তিনরকম ঃ অধম, মধ্যম আর উত্তম। প্রত্যেকে আবার তিন ভাগে বিভক্ত। পূরক কুম্ভক রেচক। পূরক মানে শ্বাসগ্রহণ, কুম্ভক মানে শ্বাসের স্থিতি, মানে, শ্বাসকে ভিতরে ধরে রাখা, আর রেচক মানে, শ্বাস ত্যাগ। যে প্রাণায়ামে বারো সেকেণ্ড বায়ু পূরণ করা যায় তা অধম। চব্বিশ সেকেণ্ড বায়ু পূরণ করলে মধ্যম। আর যদি ছত্রিশ সেকেণ্ড বায়ু পূরণ সম্ভব হয়, তাহলে তা উত্তম। অধমে ঘর্ম, মধ্যমে কম্পন আর উত্তমে আসন থেকে উত্থান ঘটে। আর প্রাণায়ামের সময় গায়ত্রী তিনবার মনে মনে উচ্চারণ করা বিধেয়।

গায়ত্রী কী? গায়ত্রী বেদের পবিত্রতম মন্ত্র। তার মানে কী? যিনি আমাদের এই জগতের প্রসবিতা, পরম দেবতার যিনি প্রিয় সেই তেজঃপুঞ্জকে আমরা ধ্যান করি। আমাদের বুদ্ধিতে তিনি জ্ঞান বিকশিত করুন। এই মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণব সংযুক্ত আছে। দুয়ে মিলে এক পরিপূর্ণতার গান।

আর প্রত্যাহার? বহির্মুখী ইন্দ্রিয়দের অন্তর্মুখী করা অর্থাৎ নিজেদের অধীনে নিয়ে রাখার নাম প্রত্যাহার। নিজের দিকে আহরণ বা সংগ্রহের কৌশলই প্রত্যাহারের আরেক নাম।

মনকে এক জায়গায় সংলগ্ন করে রাখাই ধারণা। সংলগ্ন করবার প্রশস্ত স্থান কোথায়? হৃদপদ্মে বা মাথার মধ্যদেশে। বেশ তো, নাই বা খোঁজ পেলে জায়গা দুটোর, দেহের যে কোনো জায়গায় খুশি মনকে অভিনিবিষ্ট করো। তারপর ভাবতরঙ্গ তোলো। বহুবিরুদ্ধ প্রবাহ উঠে ঐ তরঙ্গকে নষ্ট করতে না পারে তার চেষ্টা করতে থাকো। শুধু তাই নয়, প্রথম ভাবতরঙ্গকে এমন প্রবল করো যাতে বিরুদ্ধ প্রবাহ গুলি ক্রমে-ক্রমে নিস্তেজ হয়ে মিলিয়ে যায়। তখন শুধু এক তরঙ্গ, সমস্ত তরঙ্গ—আর তারই নাম ধ্যান।

আর যখন এই অবলম্বনেরও প্রয়োজন হয় না, সমস্ত মনই যখন একরূপ, তখন সেই একরূপতাই সমাধি।

অতি গোপন ও নির্জন স্থানে, যেখানে কোলাহল নেই, বিপদের আশঙ্কা নেই, যেখানে কেউ তোমাকে বিরক্ত করতে আসবে না, তেমন জায়গায় গিয়ে সাধনা করো। নয় তো বা সুন্দর দৃশ্য পরিবেশে বা নিজ গৃহের সুন্দর একটি নিভৃতিতে। সাধনে প্রবৃত্ত হবার আগে প্রাচীন যোগীদের নমস্কার করো। নমস্কার করো তোমার গুরুদেবের ভগবানকে।

সরলভাবে বসে নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন করো। দেখবে এই নাসিকাগ্রে দৃষ্টিস্থাপনই মনঃস্থৈর্যের সহায়ক। এগিয়ে যাও। সতত সচেষ্ট থাকো।

যদি মনকে কোনো স্থানে বারো সেকেণ্ড ধরে রাখা যায়, তাতে একটি ধারণা হয়। এই ধারণা বারো গুণ হলে একটি ধ্যান হয়। আর ধ্যান বারো গুণ হলেই এক সমাধি। ধ্যানের উপরই বেশী জোর দিচ্ছেন স্বামীজি। বিষয়বিশেষে অবিচ্ছিন্ন মনঃসংযমই ধ্যান। মনের উপর বলপ্রয়োগের দরকার নেই। শুধু অভ্যাসেই মনকে তন্ময় করা যায় ধ্যেয়বস্তুতে। শুধু অভ্যাস, শুধু সংযম, শুধু একনিষ্ঠতা। মধ্যযুগে ইউরোপেও

অনেক সাধক জানতেন এই ধ্যান, এই সমাধি, যা ধ্যানেরই পরিপক্ব অবস্থা। কিন্তু ভারতবর্ষেই এর পথ ও প্রণালী বৈজ্ঞানিক রীতিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ভারতবর্ষেই যোগকে দিয়েছে বিজ্ঞানের যথার্থ রূপায়ণ। দেখ, শেখ, আয়ত্ত করো এই বিজ্ঞানের বিভূতি। তারপরে আসনে বসে প্রাণায়াম করো। প্রাণায়ামেই মনের মল ক্ষয় হয়, আর সেই নির্মলীকৃত মনই স্থির হয় ব্রহ্মে।

ধ্যান শেখাতে গিয়ে নিজেই সমাধিস্থ হয়ে যান স্বামীজি। যখন বাহ্যচেতনা ফিরে আসে তখন নিজের উপরেই বিরক্ত হন। এতক্ষণ সবাইকে তা হলে হাঁ করিয়ে বসিয়ে রেখেছি। এতক্ষণ আমার নিমজ্জিত থাকবার কী হয়েছিল! এদের কাছে, আমি তো এখন যোগী নই, আমি শিক্ষক। তাই আমার নিজের তলিয়ে যাওয়াটা ঠিক হয়নি। কিন্তু সাধ্য কী, মনকে শান্ত করতে গেলে তুমি তলিয়ে না যাও! সেই কত দিনের কথা, মনে পড়ল স্বামীজির। বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করে এসেছে নরেন। ঠাকুর বললেন, 'যাও বটতলায় গিয়ে ধ্যান করোগে।'

বেলা প্রায় সাড়ে দশটা, নরেন পঞ্চবটীতে বসেছে ধ্যান করতে। কী রকম হচ্ছে সরজমিনে তদন্ত করতে এসেছেন ঠাকুর। বললেন, 'ধ্যান করবার সময় তাঁতে মগ্ন হতে হয়। ডুব দিতে হয়। উপর-উপর ভাসলে বা সাঁতার দিলে কি রত্ন পাওয়া যায়?' এই বলে গান ধরলেন ভরা গলায় :

> ডুব দে মন কালী বলে, হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে,
> রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু চার ডুবে ধন না পেলে।
> তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।।

আবার বললেন, 'ডুব দিলে অবশ্য কুমির ধরতে পারে কিন্তু গায়ে হলুদ মেখে নিলে কুমির ছোঁয় না। হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে ছয়টি কুমির আছে। কিন্তু বিবেকবৈরাগ্যরূপ হলুদ মাখলে তারা আর তোমায় ছোঁবে না। আগে ডুব দাও, ডুব দিয়ে রত্ন তোলো, তার পরে অন্য কাজ। কেউ ডুব দিতে চায় না। সাধন নেই, ভজন নেই, বিবেকবৈরাগ্য নেই, দু-চারটে কথা শিখেই অমনি লেকচার।'

বিবেক কি? ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু এর নাম বিবেক। আর ঈশ্বরের প্রতি নিবিড় ও একাগ্র অনুরাগই বৈরাগ্য।

পড়াতে-পড়াতে ধ্যানস্থ হয়ে পড়া কাজের কথা নয়। তাই অন্তরঙ্গ শিষ্যদের স্বামীজি শিখিয়ে দিলেন ওরকম অবস্থায় কি করে তাঁর ধ্যান ভাঙবে। এই একটি নাম তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি। যদি দেখ সমাহিত হয়ে গিয়েছি তখন আমার কানে এই নামটি অনুচ্চে উচ্চারণ করবে আর আমি অমনি স্বাভাবিক হয়ে যাব।

কখনো বা বেদ ও উপনিষদের মন্ত্র উচ্চারণ করেন, কখনো বা আবৃত্তি করেন সংস্কৃত শ্লোক—চারদিকের জল-স্থল-আকাশ শান্তিতে ও শক্তিতে ভরে ওঠে। বাতাসে আনন্দক্ষরণ হতে থাকে। আধ্যাত্মিক শ্রীতে সকলকে তখন আশ্চর্যসুন্দর দেখায়। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ। বহু বিদ্যায় নয় মেধায় নয় শ্রবণেও নয়—পরমাত্মাকে সেই লাভ করতে পারে যার প্রতি তিনি অনুগ্রাহী। অর্থাৎ তাঁর কৃপা ছাড়া তাঁকে পাওয়া যাবে না। অন্য অর্থও করতে পারো। সাধক যে পরমাত্মাকে বরণ করেন সেই আত্মবরণের দ্বারাই তিনি লভ্য। এই একই শ্লোক দুই উপনিষদে আছে—কঠে আর মুণ্ডকে। কঠোপনিষদের মন্ত্রে পরমাত্মার কৃপার প্রতি ইঙ্গিত আর মুণ্ডকোপনিষদে সাধনভূত বরণের প্রতি ইঙ্গিত। আবার

শোনো। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। বলহীন কে? যার আত্মনিষ্ঠাজনিত বীর্য নেই, যে মিথ্যাজ্ঞানে অভিভূত, সেই বলহীন। সেই বলহীনের দ্বারা আত্মা লভ্য নন। প্রমাদের দ্বারা বা সন্ন্যাসরহিত জ্ঞানের দ্বারাও লভ্য নন। সন্ন্যাস কাকে বলে? সর্বত্যাগের নাম সন্ন্যাস। যে বিবেকী বল ও অপ্রমাদ, জ্ঞান ও সন্ন্যাস সাধন করতে তৎপর সেই সর্বাশ্রয় আত্মায় প্রবেশ করে।

মিসেস ব্যাগলির বাড়িতে বক্তৃতা দেয়ার দরুন দুশো ডলার পাওয়া গিয়েছে শ্রোতাদের থেকে। স্বামীজি জানেনও না, মিস্টার ফ্রিয়ার নামে এক ভদ্রলোক তা আদায় করেছেন। সে টাকা মিসেস ব্যাগলির বড় মেয়ে ফ্লোরেন্স পাঠিয়ে দিল স্বামীজিকে। লিখে পাঠাল, স্বামীজি, ফ্রিয়ারের মত লোককে যখন মুগ্ধ করতে পেরেছ আর সে যখন তোমার বক্তব্যে আকৃষ্ট হয়েছে, তখন আর চিন্তা নেই, তোমার কাজ সুসম্পূর্ণ হবেই হবে। তুমি এখুনি ভারতবর্ষে ফিরে যেও না। তোমার ধর্মের বিদ্যালয়ের ভিত্তিকে এখানে, এ দেশে, দৃঢ়ীভূত করো। মিস্টার ফ্রিয়ারের সাহায্যেরই বা প্রয়োজন কী? অসাধ্যসাধন করবে তোমার ব্যক্তিক আবেদন, তোমার চক্ষু তোমার কণ্ঠস্বর তোমার দিব্যদীপ্ত উপস্থিতি। স্বামীজি, তুমি থেকে যাও। আমাদের ফেলে চলে যেও না।

ধর্ম কি শুধু একটা খেয়াল, হুজুগ, একটা ফ্যাশান? ঢং? শুধু গির্জেয় গিয়ে বাজনা শোনা, লেকচার শোনা? বক্তৃতা দিচ্ছেন স্বামীজি। কী বোঝ তোমরা ধর্ম বলতে? হ্যাঁ, বলো, ধর্ম মানে ঈশ্বরে বিশ্বাস আর তাকে ভালোবাসা। তোমরা ভালোবাসো ঈশ্বরকে? কী মতলব করে ভালোবাসো? যদি কিছু জুটে যায় ফুল-ফল, কেক-বিস্কুট? আমরা হিন্দুরা ঈশ্বরকে দেনেওয়ালা রাজা বলে মানি না, ঈশ্বরকে পিতা বলতে আমরা ভয় পাই, দূর-দূর মনে হয়, কেননা হিন্দু পিতারা ছেলেদের শাস্তি দেয়, প্রহার করে। ঈশ্বর আমাদের মা। তোমাদের যীশুর যেমন ম্যাডোনা। আমরা ঈশ্বরকে মা বলে ডাকি, মায়ের মত ভালোবাসি। সে আমাদের অহেতুক ভালোবাসা। মায়ের কাছে আমাদের কিছু চাইবার নেই। যে মা গরিব, কিছু দেবার-থোবার যার সাধ্য নেই সঙ্গতি নেই তাকেও তার ছেলে প্রাণ ঢেলে ভালোবাসে। কিছু চায় না কিছু পায় না তবুও ভালোবাসে। এ রকম ভালোবাসা বাসতে পারো? ভাবতে পারো? বলো ভালোবাসা যদি ফলাভিসন্ধিহীন না হয় তা হলে কি তাতে সুখ আছে?

কাউকে এমন বলতে শুনিনি—যে শোনে সেই বলে। কঠিন কথা বললেও কাউকে ব্যথা দেন না, বিমুখ-বিরুদ্ধ করে তোলেন না, মুহূর্তে তাকে ঊর্ধ্বতর চেতনার স্তরে নিয়ে যান যেখানে জাতি ধর্ম সম্প্রদায়ের বাইরে শুধু এক ভালোবাসার রাজ্য।

কে বলে তোমরা খৃস্টান? জাতি হিসাবে তোমরা খৃস্টান নও। বলছেন স্বামীজি। যদি খৃস্টান হতে চাও, ফিরে যাও তাঁর কাছে, যীশুর কাছে, যাঁর কোথাও মাথা রাখবার ঠাঁই নেই। পাখিদের নীড় আছে, পশুদের গুহা আছে কিন্তু সেই ঈশ্বরপুত্রের আশ্রয় নেই। আর তোমরা কিনা প্রাসাদ বানিয়ে বিলাসের স্তূপ করে রেখেছ। এ সব, বলছ, প্রভু তোমাদের দিয়েছেন? যা ক্ষণজীবী যা দু দিনে ধুলো হয়ে যাবে তা প্রভু দেন না। এ সব অর্থপিশাচের অট্টহাসি। সেই অর্থপিশাচকে প্রভুর চরণতলে স্থান দিও। সেই শক্তিকে ভক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করো। প্রাসাদকে প্রসাদের সঙ্গে। যদি তা না পারো, পিশাচকে ছেড়ে প্রভুর সঙ্গে চলে যাও। প্রাসাদে প্রভুহীন হয়ে থাকার চেয়ে প্রভুর সঙ্গে চীর পরে থাকাও ভালো।

মূলত, সব ধর্মের সারকথা এক। তার বদল নেই। কী সুন্দর বলছেন স্বামীজি। একটা বনচর অসভ্য লোক কতগুলি মুক্তো কুড়িয়ে পেয়েছিল। তার চাবুকের চামড়া ছিঁড়ে তা দিয়ে মুক্তোগুলি গেঁথে নিয়ে গলায় পরল। পরে যখন সে একটু সভ্য হল তখন চাবুকের চামড়া ফেলে দিয়ে একগাছি দড়ি কুড়িয়ে নিল। দড়িতেই গাঁথল মুক্তোগুলো। গলায় দোলালো। পরে আরো যখন সভ্য হল তখন দড়িগাছের বদলে সিল্কের সুতো নিল। পরে যখন সুসভ্য হয়ে উঠল তখন বললে সিল্কের সুতোর বদলে সোনা চাই। সোনার পাতেই বসাব মুক্তোগুলো। সোনার ভিত্তি ছাড়া মুক্তোর সৌধ তৈরি হয় কি করে? দেখলে তো মুক্তোগুলোর বাহন কতবার বদলাল কিন্তু মুক্তোগুলো একই থাকল। তার শাশ্বত মূল্য। তার অদলবদল নেই। তেমনি সমস্ত ধর্মের কথাই শাশ্বত। তার খোলস শুধু বদলায় কিন্তু তার রক্তমাংস অটুট থাকে।

নিউইয়র্ক ফ্রেনলজিক্যাল জার্নালে স্বামীজির বর্ণনা বেরিয়েছে। কবে ও কে তাঁর মাথা নিয়ে এত মাথা ঘামিয়েছে তা কে জানে। ওজনে একশো সত্তর পাউণ্ড আর দৈর্ঘ্যে পাঁচফুট সাড়ে আট ইঞ্চি। এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত মাথার পরিধি পৌনে বাইশ ইঞ্চি। অর্থাৎ শরীরে আর মাথায় তাঁর সমীচীন অনুপাত। মনোবৃত্তি এত কোমল যে দাম্পত্যভাবের প্রশ্রয় লেশ নেই। আজ পর্যন্ত কোনো নারীকে প্রণয়ীর চোখে দেখেননি। তিনি যুদ্ধের বিরোধী ও বিশুদ্ধ অহিংসার প্রচারক। সে ক্ষেত্রে আশা করেছিলাম কানের কাছে তাঁর মাথাটা কিছু সংকীর্ণ হবে। লক্ষ্য করে দেখলাম ঠিক তাই। কিছু উপরের জায়গাটা অর্থোপার্জন ও সঞ্চয়ের স্থান। সেখানে আশা করেছিলাম সংকীর্ণতা দেখব। ঠিক তাই দেখলাম। তিনি বিষয়-সম্পত্তির ধার দিয়েও হাঁটেন না। তাঁর সঞ্চিত ধন বলে কিছু নেই। টাকা পয়সার ঝামেলা থেকে দূরে থাকেন। আমেরিকানদের কাছে এ খুব অদ্ভুত শোনাবে। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, তাঁর মুখে যে শান্তি ও সন্তোষ দেখলাম তা আমাদের ক্রোরপতি রাসেল সেজ বা হেটি গ্রিনের মুখে নেই। টাকা দিয়ে কি ঐ আশ্চর্য শান্তি কেনা যায়? আরো দেখলাম তাঁর দৃঢ়তা ও বিবেকবুদ্ধি পূর্ণমাত্রায় বিকশিত। পরোপচিকীর্ষাও পরিস্ফুট। ললাটপ্রান্তের বিস্তৃতি তাঁর সংগীতানুরাগ সূচিত করছে। বিশালোজ্জ্বল চক্ষু থেকে বোঝা যায় তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি আর বাগ্মিতা। কপালের উপর দিকে লেখা রয়েছে তাঁর তীব্র অনুসন্ধিৎসা, লোক চেনবার সহজ শক্তি আর মধুর সৌহার্দ্য। সর্বসাকুল্যে এই বোঝা যাচ্ছে তাঁর মাথা দেখে, যে, তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দয়া, সহানুভূতি, দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি আর জয়ী হবার প্রতিজ্ঞা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট কিন্তু এমন নিখুঁত ইংরিজি বলেন যে শুনলে মনে হয় ইংলণ্ডেই তাঁর বসবাস। তাঁর এদেশে আসার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে বাধ্য।

'মনে করে দেখ দেশ থেকে পনেরো হাজার মাইল দূরে একলা আছি।' স্বামীজি চিঠি লিখছেন: 'বিরুদ্ধবাদী খৃস্টানদের সঙ্গে সমান তালে লড়াই করে যেতে হচ্ছে। তারা কতগুলো আধা-সত্য কপচাচ্ছে। কিন্তু জানবে আমার স্বপক্ষবাদী খৃস্টানই আমেরিকায় বেশি।

একটা ছোটখাট সমিতি প্রতিষ্ঠা কর, তার মুখপত্রস্বরূপ বার কর একখানি সাময়িক পত্র, তুমি তার সম্পাদক হও। সমস্ত জিনিসটার ভার নেবে সর্দার হিসেবে নয়, সেবক হিসেবে। এতটুকু কর্তাত্তির ভাব রাখবে না। ওরকম ভাব রাখলেই ঈর্ষা আর ঈর্ষাতেই সমস্ত মাটি।

আমার হাতে এখন ন হাজার টাকা আছে। তার কতক তোমাকে পাঠাব ভারতে কাজ আরম্ভ করবার জন্যে। তুমি তো জানো টাকা রাখা, এমন কি টাকা ছোঁয়া পর্যন্ত আমার পক্ষে কঠিন। টাকা মনকে ভীষণ নীচু করে দেয়। সেই কারণে কাজের সঙ্গে-সঙ্গে টাকাকড়ির ব্যবস্থা করবার জন্যে তোমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একটা সমিতি স্থাপন করতেই হবে। এখানে আমার যে সব বন্ধু আছেন তাঁরাই আমার টাকাকড়ি বন্দোবস্ত করছেন। টাকাকড়ির এই ভয়ানক হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেলে আমি বাঁচি।

আরো কথা। সমিতির একটা অসাম্প্রদায়িক নাম দিও। "প্রবুদ্ধ ভারত" নামটা মন্দ নয়। ঐ নামে হিন্দুদের মনে আঘাত তো লাগবেই না, বৌদ্ধরাও আকৃষ্ট হবে। "প্রবুদ্ধ ভারত" বললেই বুদ্ধের সঙ্গে ভারত আছে বোঝা যাবে, অর্থাৎ হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মিলন হয়ে আছে।

আমরা নগণ্য অবস্থা থেকে উঠেছি। এখন সমগ্র জগৎ আমাদের দিকে আশা-বিশাল-নেত্রে চেয়ে আছে। নির্বোধ মিশনারিরা সত্য, প্রেম ও অকাপট্যের শক্তিকে বাধা দিতে পারবে না—কেউই পারবে না। তোমার কি মন-মুখ এক হয়েছে? তুমি কি মৃত্যুভয় পর্যন্ত তুচ্ছ করতে পেরেছ? তোমার হৃদয়ে ভালোবাসা আছে তো? ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা?

সমগ্র জগৎ জ্ঞানালোক চাইছে, চেয়ে আছে ভারতবর্ষের দিকে। ভারতবর্ষে যে জ্ঞানালোক আছে তা ইন্দ্রজালে নয়, ভেলকি বা বুজরুকি নয়, তা উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যের সার কথা। জগৎকে সেই শিক্ষার ভাগী করবার জন্যেই প্রভু এই জাতটাকে নানা দুঃখ দুর্বিপাকের মধ্য দিয়েও বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখন তা দেবার সময় হয়েছে। বিশ্বাস কর তোমরা বড় কাজ করবার জন্যে জন্ম নিয়েছ। কুকুর ঘেউ ঘেউ করুক, ভয় পেয়ো না। আকাশ থেকে বাজ পড়লেও নির্ভয়ে থেকো। জেনে রাখো প্রভু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তাঁর শক্তি তোমাদের সকলের মধ্যে আসুক। তৃণখণ্ডগুলিকে গুচ্ছীকৃত করে রজ্জু করতে পারলে মত্ত হস্তীকেও বাঁধা যাবে। বেদমন্ত্র স্মরণ করো। নিবৃত্ত হয়ো না, যতদিন না লক্ষ্যে পৌঁছুচ্ছ, এগিয়ে চলো। জাগো, দীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। ধর্মের বন্যা এসেছে, সকলে হাত লাগিয়ে ওর পথের যতটুকু যেখানে বাধা আছে সরিয়ে দাও। সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ ভয়। সর্বাপেক্ষা মহত্তর পুণ্য—উৎসাহ, বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা। সর্বোপরি ভালোবাসা। চিত্তনির্মাল্য। প্রভুর আজ্ঞা—বিশ্বাস করো—ভারতের উন্নতি হবেই হবে। সাধারণ লোক সুখী হবে। দারিদ্র্যমোচন হবে। আর আনন্দিত হও তোমরা তাঁর কাজ করবার জন্যে নির্বাচিত যন্ত্র।'

৫৯

নিউইয়র্কে ক্লাস করে স্বামীজি যা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তা থেকেই তাঁর "রাজযোগ"।

জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় একাগ্রতা, মনোনিবেশ। মানুষের মনের শক্তির কোনো সীমা নেই। একাগ্রতাই সেই শক্তির জনয়িতা। আর সেই শক্তির সাহায্যেই জানা যাবে কী রহস্য। তুমি আস্তিক হও নাস্তিক হও, ইহুদী কি বৌদ্ধ, হিন্দু খৃস্টান, কিছু এসে যায় না। তুমি মননশীল মানুষ, তাই যথেষ্ট। প্রত্যেক মানুষের আত্মতত্ত্ব

অনুসন্ধান করবার শক্তি আছে, অধিকারও আছে। যে বিষয়েই হোক না, তার কারণ কী, সত্য কোথায়, এ প্রশ্নের উত্তর না নিয়ে যাবার আগে তার ছুটি নেই। রাজযোগই সেই সত্যপ্রতিষ্ঠার সহায়। সংক্ষেপে শরীর ও মনঃসংযমই রাজযোগ। নিয়ত সংযম প্রশান্ত প্রবাহের মত দেহে-মনে স্থির হয়ে থাকে। আর অভ্যাসেই সেই প্রশান্তবাহিতা।

মাঝে মাঝে, যা বলছেন স্বামীজি, তাঁর ছাত্রী মিস ওয়ালডো লিখে নিচ্ছে। সূত্র ব্যাখ্যা করতে-করতে, মাঝপথে, হঠাৎ তন্ময় হয়ে পড়ছেন, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। ওয়ালডো তাকিয়ে দেখছে, অনন্তের চিন্তায় স্থির হয়ে গিয়েছেন স্বামীজি। কতক্ষণ পরে হঠাৎ উঠে আসছেন সেই ধ্যান সমুদ্র থেকে, নতুন ব্যাখ্যার উজ্জ্বলতর রত্ন নিয়ে। দোয়াতে কলম ডুবিয়ে বসে থাকছে ওয়ালডো, কেননা, কখন উঠে এসেই অনর্গল বলতে সুরু করবেন তার ঠিক নেই।

এই ধ্যান যেন স্বামীজির সংগী হয়ে আছে। ঘরের মধ্যে উচ্চকলহাস্যের কোলাহল হচ্ছে, সবাই অবাক হয়ে দেখছে, স্বামীজি স্থির, তাঁর দুচোখ নিষ্পলক, আর ক্রমে-ক্রমে মৃদু হতে মৃদুতর হতে-হতে তাঁর নিশ্বাস স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। আবার কতক্ষণ পরেই ফিরে আসছেন তার বাহ্য চেতনায়, পরিবেশের সমক্ষে। কখনো ঘরে ঢুকছেন কারু সংগে দেখা করতে, কথা বলতেই ভুলে গেছেন। কেউ বা ঘরে ঢুকেছে দেখা করতে, দেখছে নিথর নিস্পন্দ হয়ে বসে আছেন, উঠে শিষ্টাচারটুকুও করছেন না। থেকে থেকেই চলে যাচ্ছেন অন্যচিন্তায়, পরাচিন্তায়।

ঈশ্বরের চিন্তা করতে করতে কেউ কাঁদে কেউ হাসে কেউ গায় কেউ নাচে কেউ অদ্ভুত-অদ্ভুত সব কথা কয়, কেউ শুধু স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। যে যাই করুক, সবই সেই ঈশ্বরকে নিয়ে। সব কিছুরই উৎস ভক্তি, ঈশ্বরে অমৃতপ্রেম। যা পেলে মানুষ সিদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, মৃত্যুত্তীর্ণ হয়। যা পেলে আর কিছু আকাঙ্ক্ষা করে না, আর কিছুর জন্যে শোক করে না, কারু প্রতি দ্বেষ করে না, অন্য কোন বিষয়ে সুখ পায় না, আর যাবতীয় সংসারব্যাপারেই নিরুৎসাহ থাকে। আর যাতে মানুষ মত্ত হয় স্তব্ধ হয় আত্মারাম হয়।

এ সবই বলছেন ছাত্রদের।

দু জন ছাত্র যথারীতি দীক্ষা পর্যন্ত নিয়েছে। একজন ফরাসী মহিলা, নাম মেরী লুই আর একজন রুষ ইহুদী, নাম লিও ল্যান্ডসবার্গ। দীক্ষান্তে একজনের নাম হল স্বামী অভয়ানন্দ, আরেকজন স্বামী কৃপানন্দ।

লুই ছিল জড়বাদী আর ল্যান্ডসবার্গ ছিল খবরের কাগজের লোক।

কাকে কখন কী ভাবে ঈশ্বর ডেকে নেন ঈশ্বরই জানেন। শুধু জবাবদিহিই দিতে জানেন না। বুড়ির ইচ্ছায় বুড়ি খেলে।

কী করে বুঝব ভক্তিলাভ হয়েছে?

যখন দেখবে অন্য সমস্ত আশ্রয় ত্যাগ করে চিত্ত ঈশ্বরে আসক্ত হয়েছে—আর তাঁর বিরোধী যাবতীয় বিষয়ে এসেছে ঔদাসীন্য, তখনই বুঝবে ভক্তিমান হয়েছ। ও তস্মিন অনন্যতা তদ্বিরোধিষু উদাসীনতা।

আরো সব ভক্ত হয়েছে স্বামীজির। নরওয়ের বিখ্যাত বেহালাবাজিয়ের স্ত্রী মিসেস ওলি বুল, আর বরেণ্য ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্ণার্ড। ডক্টর এলান ডে, ডক্টর স্ট্রিট, প্রফেসর ওয়াইম্যান, প্রফেসর রাইট—আরো অনেকে।

এই মিসেস ওলি বুলকেই স্বামীজি লিখছেন লন্ডন থেকে :

'গত পরশু অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি একজন ঋষিকল্প লোক। তাঁর বয়েস সত্তর হলেও দেখতে যুবকের মত। মুখে একটিও রেখা নেই বার্ধক্যের। ভারতবর্ষ ও বেদান্তের প্রতি তাঁর যা ভালবাসা তার অর্ধেক যদি আমার থাকত! তিনি যোগশাস্ত্রের প্রতি অনুকূল ভাব পোষণ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি যোগে বিশ্বাসী। তবে বুজরুকদের একদম দেখতে পারেন না।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপর তাঁর ভক্তি অগাধ। 'নাইনটিনথ সেঞ্চুরি' কাগজে রামকৃষ্ণকে নিয়ে তিনি এক প্রবন্ধ লিখেছেন। আমাকে জিগগেস করলেন, 'তাঁকে জগতের সামনে প্রচারিত করবার জন্যে আপনি কী করছেন?'

'অনেক বছর ধরে', বললেন, 'রামকৃষ্ণ তাঁকে মুগ্ধ করে আছেন। বলুন, এ কি একটা সুখবর নয়?'

'স্মৃতি-পুরাণ সামান্যবুদ্ধি মানুষের রচনা, ভ্রম প্রমাদ ভেদবুদ্ধি ও দ্বেষবুদ্ধিতে পরিপূর্ণ', লিখছেন স্বামীজি : 'তার যেটুকু উদার ও সহৃদয় সেটুকুই গ্রাহ্য, বাকি সব ত্যাজ্য। গীতা ও উপনিষদ যথার্থ শাস্ত্র—রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কবীর যথার্থই অবতার। আকাশের মত অনন্ত এদের হৃদয়। কিন্তু সকলের উপর রামকৃষ্ণ। রামানুজ শঙ্কর সংকীর্ণহৃদয় পণ্ডিতমাত্র। সে প্রীতি নেই, পরের দুঃখে কাঁদা নেই—শুধু পাণ্ডিত্যই—আর শুধু নিজের মুক্তি। তা কি হয় মশাই? কখনো হয়েছে, না, হবে? 'আমি'র লেশমাত্র থাকতে কি কিছু হতে পারে?'

নিউইয়র্কের উঁচুতলার বড়লোক ফ্যান্সিস লেগেট ও তার স্ত্রীও স্বামীজির অনুরক্ত হলেন। তা ছাড়া শিষ্যত্ব নিল প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক নিকোল তেসলা। ব্যবসায়ী টমাস পামার আর তার স্ত্রী।

খবর রাষ্ট্র হল, "সাইক্লোনিক হিন্দু"—তুফানতোলা হিন্দু—স্বামী বিবেকানন্দ এসেছে আর অতিথি হয়েছে পামারের। আর তার সংস্পর্শে এসে পামারও হিন্দু হয়ে গিয়েছে—চলেছে ভারতবর্ষে। 'কিন্তু দুই সর্তে' পামার খুব রসিক, বলছে হাসতে-হাসতে, 'আমার ঘোড়া তোমাদের জগন্নাথের রথ টানবে আর আমার গরু তোমাদের গো-দেবতাদের দলে গিয়ে ভিড়বে।' এক পাল ঘোড়া আর গরুর মালিক পামার।

ডেট্রয়টে আবার স্বামীজি এসেছেন, ক্লাস খুলেছেন পড়াবেন বলে। কিন্তু এত ছাত্র-ছাত্রী, ধরছে না ক্লাসে। আর, যখন তাঁর বলার বিষয় 'ভারতীয় নারী'। 'পশ্চিমে নারী কী? পশ্চিমে নারী স্ত্রী। আর ভারতবর্ষে? ভারতবর্ষে নারী মা। যে সন্ন্যাসী তাকেও তার মায়ের সামনে এসে মাটিতে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করতে হয়। হ্যাঁ, সন্ন্যাসী। তোমরা জাতিভেদের কথা তুলছ? হ্যাঁ, ব্রাহ্মণ শূদ্রকে প্রণাম করবে না, কিন্তু সেই শূদ্র সন্ন্যাসী হোক, তখন সেই ব্রাহ্মণই তার প্যায়ে পড়বে। দ্বিধা করবে না।'

মেরী ফ্রাঙ্ক, ছাত্রী, লিখছে : 'তাঁর বিশ্বস্ত স্টেনোগ্রাফার গুডউইনকে নিয়ে এসেছেন স্বামীজি, উঠেছেন হোটেলে। প্রশস্ত ড্রয়িংরুমে ক্লাস নিচ্ছেন। কিন্তু এত ভিড় হচ্ছে যে সিঁড়িতে-বারান্দায়ও জায়গা না পেয়ে লোক ফিরে যাচ্ছে। আর তখন তিনি বলছেন ভক্তির কথা, ঈশ্বরপ্রেম যেন এক তপ্ত ক্ষুধা এক তীব্র পিপাসা তাঁর কাছে—এক অবিচ্ছিন্ন আর্তনাদ। মাকে দেখবার জন্যে মাকে পাবার জন্যে এক দিব্য আহুপ্রতির মত তিনি জ্বলছেন। তখন তাঁকে দেখতে কী সুন্দর, কী সুন্দর!'

মা নামের মত মধুর আর কিছু নেই। ক্লাসে বলছেন স্বামীজি। ভারতে মাতাই স্ত্রী চরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ। ভগবানকে মাতৃরূপে, প্রেমের উচ্চতম বিকাশরূপে পূজা করাই হিন্দুর দক্ষিণাচার। বামাচারীরা রুদ্রমূর্তির উপাসনা করে সাংসারিক উন্নতি খুঁজুক,—সাংসারিকতাই ধ্বংসের বীজ, কিন্তু আমরা দক্ষিণাচারীরা খুঁজি শুধু আধ্যাত্মিক জাগরণ। জগজ্জননী ভগবতীই আমাদের অভ্যন্তরে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী, মা মা বলে ডেকে তাকে জাগাতে পারলেই আমরা ঈশ্বর-শক্তিমান।

ভয়েতেই মানুষের ধর্মের আরম্ভ। কিন্তু যতক্ষণ ভয় ততক্ষণ ঈশ্বর নেই। মা-ই এ ভয় মোচন করতে পারেন। ভয় বা ভয়মিশ্র ভক্তির কোনো ভাবনা থাকে তারই জন্যে হিন্দুরা কেউ-কেউ ঈশ্বরকে নিজের ছেলে বলে উপাসনা করে। একমাত্র মা বলতে পারলেই ঈশ্বরের কাছে কিছু আর চাইতে হয় না। উষিত্বা জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্মতিঃ। শুধু মূর্খই গঙ্গাতীরে বাস করে জলের জন্যে কুয়ো খোঁড়ে। মায়ের কোলে যে বসতে পেরেছে তার আর অকূল কোথায়? অকুলান কোথায়?'

সেণ্ট লরেন্স নদীর উপরে বৃহত্তম দ্বীপ, থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক, সহস্র দ্বীপোদ্যান। তাতে স্বামীজির ছাত্রী মিস ডাচার-এর ছোট একখানা বাড়ি আছে। সে স্বামীজিকে বললে, আপনি সেখানে গিয়ে ক্লাস করুন। যত ছাত্র ধরে আর আপনি থাকুন সেই নির্জনে—বিশ্রান্তিতে।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন স্বামীজি। হা ঈশ্বর, কত আর তোমার প্রচার করব, আর কত নামকোলাহল! আর কত আমায় বিদেশে ঘুরিয়ে মারবে? এ কী কর্মভার তুমি আমার উপরে চাপিয়ে দিয়েছ, এবার হালকা করে দাও। ফিরিয়ে দাও আমার সেই চীরবাস, সেই মুণ্ডিত মস্তক, সেই গাছের তলায় ঘুম আর সেই বিশুদ্ধ ভিক্ষান্ন!

কিন্তু এই ভাব আবার কেটে যায়। অনুভব করেন অন্তরে বসে ভগবান তাঁকে আদেশ করছেন। তখুনি আবার উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। বলেন, তারই জন্যে, ঈশ্বরনির্ধারিত কর্মসমাপনের জন্যে, একটা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান দরকার। প্রতিষ্ঠানের দোষ আছে সন্দেহ নেই কিন্তু প্রতিষ্ঠান ছাড়া কাজ করাও অসম্ভব। যদি কাজের প্রেরণা অন্তর থেকে আসে আর কাজ যদি সত্য হয় শুদ্ধ হয় তা হলে একদিন না একদিন সমাজ সংসার তার দিকে আকৃষ্ট হবেই, তা সে কর্মীর জীবিতকালেই হোক বা তার মৃত্যুর একশো বছর পরেই হোক।

কী ছিল স্বামীজির! গোটা আমেরিকাকে এক নতুন ভাব দেওয়া আর সেই ভাবে বোধিত করে তোলা চারটিখানি মুখের কথা নয়। তাঁর মধ্যে ছিল ঐশী শক্তি এ কে অস্বীকার করবে? অনম্য প্রতিজ্ঞার সঙ্গে ছিল অদম্য উৎসাহ। নিষ্ঠা আর দার্ঢ্য, দুঃখে সুখে নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য। সব চেয়ে বড় কথা, ঈশ্বরোপলব্ধি। আর সেই উপলব্ধিই সমস্ত আকর্ষণের রহস্য।

মৃত্যুর সময়েও সোঽহং বলে মরো। লোক ছেলেবেলা থেকে ই শিক্ষা পাচ্ছে সে দুর্বল সে পাপী। পৃথিবীও তাই দিন দিন দুর্বল হচ্ছে নেমে যাচ্ছে কলুষে। শেখাও, সকলেই আমরা অমৃতের সন্তান, সেই সৎ চিন্তার স্রোতে গা ঢেলে দাও। কেন কাঁদছ? তোমারও জন্মমৃত্যু নেই আমারও নেই। রোগশোক শুধু দু দণ্ডের মেঘের খেলা। তুমি অনন্ত আকাশস্বরূপ। নানা রঙের মেঘ তার উপরে আসছে, এক মুহূর্ত খেলা করে আবার কোথায় চলে যাচ্ছে, কিন্তু তোমার নীলিমার ক্ষয় নেই। আমরা নিজেরাই অসৎ, তাই

জগতে শুধু পাপ-তাপ দেখি। পথের ধারে একটা প্রস্তরপিণ্ড রয়েছে। চোর ভাবছে ও বুঝি পাহারাওয়ালা। নায়ক ভাবছে ঐ বুঝি নায়িকা। শিশু ভাবছে ও ভূত ছাড়া আর কিছু নয়। পাপের জন্যে কেঁদো না। তোমাকে যে সর্বত্র পাপ দেখতে হচ্ছে তার জন্যে কাঁদো।

কেউ-কেউ আবার স্বামীজিকে পরামর্শ দিচ্ছে, পাশ্চাত্ত্য বক্তৃতার রীতিটা প্রচলিত স্কুলে-কলেজে গিয়ে শিখে নিন, তা হলে আরো বেশি কাজ হবে, আপনার বক্তৃতা পর্যাপ্ত ফলপ্রসূ হবে। আবার কেউ-কেউ বললে, দামী জায়গায় বিলাসী পরিবেশে আপনার থাকা উচিত, তা হলেই সমাজের উঁচুস্তরের লোকদের কাছে আপনি পেঁছুতে পারবেন।

'তার মানে?' খেপে উঠলেন স্বামীজি: 'আমি ওসব রীতিনীতির বন্ধনের মধ্যে যাব? আমি সন্ন্যাসী, সমস্ত দৈন্যবন্ধন সঙ্কোচকার্পণ্য থেকে আমি মুক্ত। পার্থিব সঞ্চয় যে কী পরিমাণ অসার তা আমার জানা আছে। আমি আমার বাক্যে পালিশ লাগাতে প্রস্তুত নই। বাক্য যে ভাবে আসে সে ভাবেই বলব, লোকে নিক বা না নিক, সে ভাবেই তাদের শুনতে হবে। আমি কারু হুকুমবরদার নই। আমার জবাবদিহি শুধু ঈশ্বরের কাছে, যিনি আমার হৃদয়ে আমার মস্তিষ্কে আমার কণ্ঠে সমাসীন। তোমরা যাকে সাফল্য বলো তাতে আমার স্পৃহা নেই। নাই বা হল আমার সেই ফরমাস-করা সাফল্য। তোমাদের ফরমায়েসী জীবনের সঙ্গে আমি থাপ খাওয়াতে বিদেশে আসিনি। লোকে কী বলে না বলে আমার বয়ে গেল।'

'নরেন, তুই কী বলিস?' একবার জিগগেস করেছিলেন ঠাকুর। 'যারা ঈশ্বর-ঈশ্বর করে সংসারী লোকেরা তার নিন্দে করে, কত কী বলে! কিন্তু দ্যাখ হাতি যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চিৎকার করে। কিন্তু হাতি ফিরেও চায় না। তোকে যদি নিন্দা করে, তুই কি মনে করবি?'

'মনে করব, কুকুর ঘেউ-ঘেউ করছে।' নরেন পিঠ-পিঠ জবাব দিয়েছিল।

'ওরা চায় আমি ঠিক-ঠিক লোকের সঙ্গে পরিচিত হই।' চিঠি লিখছেন স্বামীজি: 'ঠিক-ঠিক লোক কী বুঝতে পাচ্ছ তো? সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীর লোকই নাকি ঠিক-ঠিক লোক। ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন। যারা আমার কাছে আসছে, যাদের ঈশ্বর পাঠিয়ে দিচ্ছেন আমার কাছে, তারাই আমার কাছে যথার্থ লোক। তারাই আমার যথার্থ সহায়ক। আর সব যারা অনির্বাচিত তাদের থেকে আমাকে ত্রাণ করুন ঈশ্বর।'

তারপর স্বামীজি মহাদেব শিবকে আহ্বান করলেন নিজের মধ্যে। 'হে প্রভু, শিশুকাল থেকেই আমি তোমার শরণাগত। তুমি সব সময়েই আমার সঙ্গে আছ, অরণ্যে পর্বতে সমুদ্রে প্রান্তরে—শত্রুনিলয়ে। তুমিই আমার সূর্যে দীপ্তি, চন্দ্রে তনু, শৈলে স্থৈর্য, বাতাসে বল, অগ্নিতে দাহ, সলিলে শৈত্য, অম্বরে শব্দ, তুমিই আমার সর্ববেদের ওঙ্কার, আমার মরণশোকজরা-অটবীর দাবানল, তুমিই আমাকে রক্ষা করো।'

নিজেই শিবস্তোত্র রচনা করলেন স্বামীজি।

'সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থৈর্য বা স্থিতি, ভঙ্গ বা নাশ যাঁর বিভূতি, যিনি সুবিমল গগনাভ, যিনি অনীশ, যার কোনো নিয়ন্তা নেই, সেই শিবশম্ভুর সঙ্গে আমার উজ্জ্বল ভাববন্ধ, প্রেমবন্ধ হোক। যিনি সমস্ত নিখিলমোহ বিনাশ করেছেন, যাঁতে ঈশবরত্ব রূঢ়, অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাবে অবস্থিত, যিনি হলাহল পান করে সমস্ত জীবজগতের

কৃতজ্ঞতার পাত্র, যাঁর পরিরম্ভ অর্থাৎ আলিঙ্গন অশিথিল, তিনিই আমার প্রাণবন্ধু মহাদেব। আমার মন চঞ্চল বিকল, পূর্ব-পূর্ব সংস্কারের প্রবল বাত্যায় আন্দোলিত, আমার মধ্যে এখনো যুষ্মদ-অস্মদ, অর্থাৎ তুমি-আমির দ্বন্দ্ব চলছে, সেই মন আমি তোমাতে স্থাপন করে শান্ত হতে চাই। বিকারবায়ু স্তব্ধ হলে যেমন অন্তর-বাহির থাকে না সেই চিত্তবৃত্তির নিরোধস্বরূপ মহাদেবকে আমি প্রণাম করি। যিনি গলিততিমিরমাল, অর্থাৎ যিনি সমস্ত অজ্ঞান-অন্ধকার দূরে করেছেন, যিনি শুভ্রতেজঃপ্রকাশ, ধবলকমলশোভ, জ্ঞানপুঞ্জাট্টহাস যিনি সংযমীর হৃদয়প্রাপ্য যিনি অখণ্ড নিরংশ অর্থাৎ যাঁর খণ্ড নেই অংশ নেই, সেই মানসরাজহংস শিবকে প্রণাম করি। যিনি দুরিতদলনদক্ষ অর্থাৎ যিনি পাপনাশনে সমর্থ, যিনি কলিতকলিকলঙ্ক, যিনি কলিকালের দোষ হরণ করেছেন, যিনি পরকল্যাণে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, প্রণতজনের প্রীতির জন্যে যাঁর নয়ন নর্তনিযুক্ত, সেই নীলকণ্ঠ মহাদেবই আমার নমস্য।'

আরো লিখছেন : 'আমার ভয় কী? প্রভু রামকৃষ্ণের কৃপায় আমি মানুষের মুখের দিকের একবার মাত্র তাকিয়ে বুঝতে পারি কে কেমনতরো লোক। ঠিক না বেঠিক।'

'দেখলাম অখণ্ড লোকে নরেন্দ্র সমাধিস্থ।' ঠাকুর বলছেন। 'ধ্যানস্থ দেখে বললুম, নরেন, একটু চোখ চা। নরেন একটু চোখ চাইল। বুঝলুম ওই একরূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে। তখন বললুম, মা, ওকে মায়ায় বন্ধ কর। তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।'

এক ভক্ত স্বপ্নে চৈতন্যদেবকে দর্শন করেছে বলছে।

ঠাকুর বলছেন, 'আহা, আহা।'

ভক্ত বললে, 'আজ্ঞে ও স্বপনে।'

ঠাকুরের চোখে জল, কণ্ঠস্বর গদগদ। বলছে, 'স্বপন কি কম? আমার নরেন কিন্তু জেগেই আজকাল ঈশ্বররূপ দেখছে।'

এক পাঞ্জাবী সাধু পঞ্চবটীর দিকে যাচ্ছে। ঠাকুর বললেন, 'ওকে আমি টানি না।'

'কেন?'

'ওর কেবল জ্ঞানীর ভাব। দেখি যেন শুকনো কাঠ। আমার নরেন শুধু জ্ঞানী নয়, ও আমার ভক্ত।'

স্বামীজি বক্তৃতা দিচ্ছেন : 'ভগবান ছাড়া আর যে কোনো জিনিসই চাও, ভক্তি নয়। একমাত্র ভগবানকে চাওয়াই ভক্তি। আমি এ বলছি না যে, যা প্রার্থনা করা যায় তা পাওয়া যায় না। যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। কিন্তু সে অতি হীনবুদ্ধির, ক্ষুদ্রাত্মা ভিক্ষুকের ধর্ম। এ দেহ একদিন নষ্ট হবেই, তবে আর বার বার এর স্বাস্থ্যের জন্যে, ঐশ্বর্যের জন্যে প্রার্থনা করা কেন? স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্যে আছে কী? যে মহৎ ধনী সে শুধু তার সঞ্চিত বিত্তের অত্যল্প অংশমাত্র ভোগ করতে পারে। দিনে চার-পাঁচবার করে ভোজ খেতে পারে না, কখানা কাপড় সে পরবে একসঙ্গে? যা তার ফুসফুসে ধরে, নিশ্বাসে তার বেশি সে বাতাস নেবে কোনখানে? শোবার জন্যে যেটুকু তার পরিমিত জায়গা সেটুকুতেই তাকে আবদ্ধ থাকতে হবে। সব জিনিসই কি সবাই পায়? যদি কিছু আসে আসুক, যদি কিছু চলে যায় যাক। এলেও ভালো, না এলেও ভালো। কিন্তু গায়ে পড়ে চাইতে যাব কেন? কেন ভিক্ষুকের চীর পরব? রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলে কি ছেঁড়া নোংরা কাপড়ে যাওয়া যাবে? ওভাবে গেলে গেট থেকেই দারোয়ান তাড়িয়ে

দেবে আমাদের। রাজার রাজা ভগবানের রাজ্যে দোকানদারের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আপনারা বাইবেলে পড়েছেন যে যীশু ভগবানের মন্দির থেকে ক্রেতা-বিক্রেতাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সকামীদের ভাব কী? ভাব এই, তোমাকে এতক্ষণ ডাকলাম, তুমি এবারে আমাকে একটা পোশাক দাও। ভগবান, আমার বড্ড মাথা ধরেছে, আমার মাথাধরাটা সারিয়ে দাও, আমি কাল আরো দু ঘন্টা তোমাকে বেশি ডাকব।'

ঠাকুর বলছেন, 'একটুও কামনা থাকলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। সুতোর মধ্যে একটু আঁশ থাকলে যাবে না ছুঁচের মধ্যে।'

পরে থেমে আবার বলছেন, 'একজন বাবু এসেছিলেন—ট্যারা। বলে আপনি পরমহংস, একটু স্বস্ত্যয়ন করে দিতে হবে। দেখ, কী পাটোয়ারী! কী হীনবুদ্ধি! পরমহংস! স্বস্ত্যয়ন! স্বস্ত্যয়ন করে ভালো করা—এ সিদ্ধাই, এ অহঙ্কার। অহঙ্কারে ঈশ্বর লাভ হয় না। অহংকার কেমন জান? যেন উঁচু ঢিপি, বৃষ্টির জল জমে না, গড়িয়ে যায়। নিচু জমিতে জল জমে, তবে অঙ্কুর হয়, তারপর গাছ হয়, তারপর ফল হয়।

শ্যামাপদ ভটচাজ্জ মস্ত লোক। তার বুকে পা রেখেছেন ঠাকুর, কিন্তু তার বড় আপসোস নরেনের যেমন ভাবাবেশ হয়েছিল তার তেমন হল না। বলছে, 'নরেনের বুকে পা দিতে যেমন ভাবেবেশ হয়েছিল, কই আমার তো তা হল না।'

ঠাকুর বললেন, 'মন ছড়ানো থাকলে মন কুড়োনো দায়। তোমার মন অনেক দিকে ছড়ানো। নরেনের মন ছড়ানো নয়, একত্র করে এক জায়গায় আঁট করা। আমার নরেনের যেমন বিদ্যা তেমনি বুদ্ধি।'

যেখান থেকে যা পাচ্ছেন উপহার, স্বামীজি তাঁর আমেরিকার ভক্তদের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছেন। জুনাগড়ের প্রধানমন্ত্রী বা মহীশূরের মহারানা হয়তো কোনো দামী জিনিস পাঠিয়েছেন, কাশ্মীরী শাল কি কার্পেট, নয়তো রেশম বা মসলিন, বাসন বা বাক্স, স্বামীজি তাই ফের উপহার দিচ্ছেন শিষ্যদের। ভারতবর্ষের বন্ধুদের লিখে পাঠাচ্ছেন, এ সব কি দিচ্ছেন আমাকে। আমাকে রুদ্রাক্ষ আর কুশাসন পাঠান। তাই আমার দীক্ষিত ভক্তদের বিতরণ করি। ওরা রুদ্রাক্ষশোভিত হয়ে কুশাসনে বসে ধ্যান করুক।

দেশেও অনেক জায়গায় টাকা পাঠাচ্ছেন স্বামীজি, অনেক প্রতিষ্ঠানে। এমন কি বরানগরে হিন্দু বিধবা বিদ্যালয়ে পর্যন্ত। 'হিন্দু নারীর আদর্শ' বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার থেকে যত টাকা উঠেছে সব গিয়েছে সেই বিদ্যালয়ে। সেই বিদ্যালয় যে ব্রাহ্মরা চালাচ্ছেন, যাঁরা তাঁর প্রতি প্রসন্ন নন, সেটা কোনো বিবেচ্য বিষয়ই নয়। হিন্দু নারীর যদি কিছু উপকার হয় তা হলেই যথেষ্ট।

ঠাকুর বলছেন, 'সন্ন্যাসী যদি কাউকে কিছু দেয়, সে নিজে দেয় মনে করে না। দয়া ঈশ্বরের, মানুষে আবার কী দয়া করবে? দানটান সবই রামের ইচ্ছে। ঠিক সন্ন্যাসী মনেও ত্যাগ করে, বাইরেও ত্যাগ করে। সে গুড়ের পাটালি নিজের কাছে রাখেও না, খায়ও না। কিন্তু সংসারী লোকের টাকার দরকার, তাই তাদের সঞ্চয় করাও দরকার। সঞ্চয় করবে না কেবল পঞ্ছী আউর দরবেশ—পাখি আর সন্ন্যাসী।'

খাবার টেবিলে এক ভদ্রলোক স্বামীজিকে বিব্রত করার উদ্দেশে জিজ্ঞেস করলেন, 'স্বামীজি, কেমিস্ট্রি সম্বন্ধে কি কি বই পড়ব একটু বলতে পারেন?'

কী অদ্ভুত প্রশ্ন। আর বিষয় নেই, কেমিস্ট্রি! আর এ বিষয়ে পণ্ডিত ঠাউরেছে স্বামীজিকে। তা হলে কী হবে! স্বামীজি গড়গড় করে এক গাদা ইংরিজি কেমিস্ট্রির

বইয়ের নাম করে যেতে লাগলেন। কী টুকে নিচ্ছেন না নামগুলো ? আরো চান তো আরো বলছি। সকলে বিমূঢ়।

আরেকজন বললে, 'আমাকে কিছু য়্যাস্ট্রোনমির বইয়ের নাম দিতে পারেন ? অবশ্যি ইংরিজি ভাষায় লেখা ?'

'পারি।' বললেন স্বামীজি, 'কাগজ কলম নিয়ে বসুন। মনে রাখতে পারবেন না। ওকে জিগগেস করুন না কেমিস্ট্রির বইয়ের যে লিস্ট দিলুম সব মনে আছে ? কাগজে কলমে লিখে নিতেও হাত ব্যথা হয়ে যাবে।' বলে অনর্গল স্রোতে নাম বলে যেতে লাগলেন। সবাই হতবাক।

আরেকজন জিগগেস করল, 'স্বামীজি, সংসারে দুঃখ কেন ?'

'দুঃখ ?' হাসলেন স্বামীজি : 'দুঃখ আছে আগে তাই প্রমাণ করুন, আমি পরে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব।'

বাইশ বাজারে হরিদাসকে বেত মারা হচ্ছে, তবু আনন্দে সে হরিনাম করে যাচ্ছে। শ্রীবাসের বাড়ির উঠোনে তার শিশু পুত্রের মৃতদেহ নাবানো, তারই পাশে শ্রীবাস কীর্তনানন্দে বিভোর। রাজরাণী মীরা ভোগবিলাস তৃণাদপি তুচ্ছ করে পায়ে হেঁটে চলেছে সুদূরে বৃন্দাবনে আর আনন্দে গান গাইছে, 'হরিসে লাগি রহরে ভাই, বনত বনত বনি যাই।'

কোথায় দুঃখ ?

৬০

'নিজের জন্যে নয়, দেশে কিছু কাজ করবার জন্যে টাকা তোলবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু পারলাম না।' লিখছেন স্বামীজি : 'ডেট্রয়টে এক বক্তৃতায় একঘণ্টায় সাড়ে সাত হাজার টাকা উপার্জন করেছিলাম, কিন্তু সত্যি-সত্যি আমার হাতে এল মোটে ছশো টাকা। লেকচার ব্যুরো যার আওতায় বক্তৃতা হচ্ছিল বাকি টাকা বেমালুম মেরে দিয়েছে। গড়ে বক্তৃতায় পঁচাত্তর ডলারের মত আয় হচ্ছে, তা থেকে থাকা-খাওয়ার খরচ বাদ দিয়ে কিছুই থাকে না। এ বছর আমেরিকার দুঃসময়, হাজার-হাজার গরিব লোক বেকার হয়ে বসে আছে। তাছাড়া খৃস্টান মিশনারি আর ব্রাহ্মসমাজ সমানে আমার বিরুদ্ধতা করে চলেছে। এক বছর চলে গেল, অথচ আমার দেশ আমেরিকানদের কাছে এ কথাটা পেঁছে দিতে পারল না যে আমি খাঁটি সন্ন্যাসী, আমিই প্রতিনিধি হিন্দুধর্মের—আর আমি ভণ্ড নই, প্রতারক নই।'

কে এক প্রাচ্য পৌত্তলিক পশ্চিমে এসে ধর্মের কথা কইবে আর তাকেই প্রতীচ্যবাসীরা শুনবে, মানবে, অনুসরণ করবে—এ পাদ্রীর দল সহ্য করবে কী করে ? আগে-আগে হিন্দুধর্মের, ভারতবর্ষের নিন্দে করেছে, এখন ব্যক্তিগতভাবে স্বামীজির নিন্দে করতে লাগল। এবং তাদের চাঁই হল রবার্ট হিউম। যেহেতু হিউম ভারতবর্ষে জন্মেছে সে সব জানে স্বামীজির হাঁড়ির কথা। স্বামীজি লোকটা নিতান্ত বাজে, দেশের লোক কেউ ওকে পোঁছে না, ও কপট, ও অসৎ—দেশে-বিদেশে এমনি বলে বেড়াতে লাগল হিউম।

আলাসিঙ্গাকে লিখছেন স্বামীজি : 'কেউ বলুক আমি সন্ন্যাসীর দুই প্রধান ব্রত

পবিত্রতা ও অকিঞ্চনতা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি। কেউ বলুক আমি কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিনি। মিশনারি হিউমকে স্পষ্ট জিগগেস করবে আমার কী অসদাচরণ তিনি দেখেছেন? নিজে দেখেন নি তো, কার কাছ থেকে শুনেছেন তাদের নাম যেন লিখে পাঠান। কিছুতেই ছেড়ে দেবে না, প্রশ্নের প্রত্যক্ষ সমাধান করে নেবে। মিথ্যেকে হাওয়ায়ও ভেসে থাকতে দেবে না।'

'জানি.' আরো লিখছেন : 'আমার দেশবাসীরা, হিন্দুরাও, আমাকে ছেড়ে কথা কইছে না। আমি কি হিন্দুদের ধার ধারি? না কি তাদের স্তুতি-নিন্দার তোয়াক্কা রাখি? আমি অসাধারণ, সাধ্য নেই তোমরা আমাকে বোঝ। আমার পিছনে আমি এমন এক শক্তি দেখছি যা মানুষ, দেবতা ও শয়তানের একত্রীকৃত শক্তির চেয়ে বড়। শোনো, কারো সাহায্যের আমি প্রত্যাশী নই। আমিই বরং সারাজীবন সাহায্য করেছি অপরকে। আমাকে সাহায্য করেছে এমন লোক তো কই দেখতে পাইনি এখনো।'

'আমার সম্বন্ধে এইটুকু জেনে রেখো, কারো কথায় আমি চলব না। আমি জানি আমার জীবনের ব্রত কী। আমি কোনো জাতিবিশেষের ক্রীতদাস নই। আমি যেমন ভারতের তেমনি সমগ্র জগতের। তোমরা কি মনে করো তোমরা যাদের হিন্দু বলে থাকো, জাতিভেদচক্রে নিষ্পিষ্ট, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দয়ালেশশূন্য, কপট, নাস্তিক, কাপুরুষদের মধ্যে একজন হয়ে জীবনধারণ করবার ও মরবার জন্যে আমি এসেছি? আমি কাপুরুষতাকে ঘৃণা করি। আমি কাপুরুষদের সঙ্গে বা রাজনৈতিক আহাম্মকির সঙ্গে কোনো সংস্রব রাখতে চাইনি। কোনো রকম রাজনীতিতেই আমি বিশ্বাসী নই। ঈশ্বর আর সত্যই জগতে একমাত্র রাজনীতি, আর সব অসার।'

অনাগারিক ধর্মপাল কলকাতা মহাবোধি সোসাইটি ও সারনাথ মহাবোধি মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। শিকাগোর ধর্মমহাসভায় বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধি। তাঁকেও লিখছেন স্বামীজি, পাদ্রী হিউমের সম্পর্কে।·

'উনি গোপনে আমার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করেছেন, চেষ্টা করেছেন যাতে তারা আমার উপর বিরূপ হয়, আমাকে কোনো সাহায্য না করে। কিন্তু এমনি মজা, সবাই পাদ্রীসাহেবকে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছে। দেখ পাদ্রীগিরির নমুনা। কাপট্যের আবর্জনা ছাড়া কিছু নয়। ধর্মপাল, তুমি শুনে আশ্চর্য হবে এখানকার এপিস্কোপ্যাল ও প্রেসবিটেরিয়ান দুরকম চার্চের আচার্যদের মধ্যে আমার অনেক বন্ধু আছেন। তাঁরা তোমারই মত উদার, অথচ তাঁদের নিজের ধর্মে অকপট বিশ্বাস। যে সত্যিকার ধার্মিক সে সর্বত্রই উদার। তার ভিতরে যে প্রেম আছে তাইতেই তাকে বাধ্য হয়ে উদার হতে হয়। যাদের কাছে ধর্ম শুধু একটা ব্যবসা মাত্র তারাই ধর্মের মধ্যে সংসারের কলহ কলুষ নিয়ে আসে, ব্যবসার খাতিরেই তারা সংকীর্ণ ও স্বার্থপর হয়ে ওঠে।'

ভারতবর্ষ কী করল স্বামীজির জন্যে? আর ভারতবর্ষে হিন্দুরা?

এক মাদ্রাজী শিষ্যকে লিখছেন স্বামীজি : 'তোমাদের পত্রে ক্রমাগত শুনছি দেশের সবাই আমার প্রশংসা করছে, সে তুমি জানছ আর আমি জানছি—আমেরিকা জানবে কী করে? ভারতীয় কোনো খবরের কাগজে আমার সম্বন্ধে জমকালো কিছু বেরিয়েছে তা দেখিনি। ওদিকে ভারতে খৃস্টানেরা যা কিছু বলছে বিরুদ্ধ কথা, মিশনারিরা সযত্নে ছাপাচ্ছে আর বাড়ি-বাড়ি গিয়ে আমার বন্ধুদের তাই পড়াচ্ছে আর তাদের বলছে আমাকে ত্যাগ করতে। তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়ে আর যায় না। দেশের একটা

প্রশংসার কথাও আমেরিকায় এসে পেঁছিুচ্ছে না। সুতরাং এদেশের অনেকেই মনে করছে আমি একটা জুয়াচোর।

আমি কোনো নিদর্শনপত্র নিয়ে আসিনি। তাই আমি যে জুয়োচোর নই, মিশনারি ও ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধাচরণের সামনে কী করে প্রমাণ করব। ভেবেছিলাম গোটাকতক বাক্য ব্যয় করা ভারতের পক্ষে বিশেষ কঠিন হবে না। কিন্তু কই এক বছরের মধ্যে ভারত থেকে কেউ আমার জন্যে একটা টু শব্দ পর্যন্ত করলে না। আমিই আহম্মক, কোনো নিদর্শনপত্র ছাড়াই চলে এসেছিলাম। আশা করেছিলাম, অনেক কিছু আসবে। কিন্তু আশা শূন্যাকৃতি। যাই হোক, আমাকে একাই কাজ করতে হবে। আর কর্ম করেই ক্ষয় করতে হবে প্রারব্ধ। আমেরিকানরা হিন্দুদের চেয়ে লাখোগুণে ভালো আর আমি অকৃতজ্ঞ ও হৃদয়হীনের দেশের চেয়ে এখানে অনেক বেশি ভালো কাজ করতে পারছি।

তাই এবার বিদায়, অনেক দেখলাম হিন্দুদের। এখন প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হোক, যা আসুক, নেব নতমস্তকে। আমাকে অকৃতজ্ঞ ভেবো না, মাদ্রাজীরা আমার জন্যে যা করেছে তা আমার পাওনার চেয়ে বেশি—প্রভু তাদের নিরন্তর আশীর্বাদ করবেন। কোনো ভাব প্রচার করবার পক্ষে আমেরিকাই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র, তাই শিগগির আমেরিকা ছেড়ে দেশে যাবার কথা কল্পনাও করছি না। কী করতে যাব? এখানে খেতে-পরতে পাচ্ছি, অনেকেই সহৃদয় ব্যবহার করছেন, আর এটুকু পাচ্ছি দুটো ভালো কথার বিনিময়ে। এমন উদার উন্নতমনা জাতকে ছেড়ে পশুপ্রকৃতি, অকৃতজ্ঞ, মস্তিষ্কহীন, অসভ্যযুগের কুসংস্কারে আবদ্ধ, দয়াহীন, মমতাহীন হতভাগ্যদের দেশে আর কে যায়! অতএব, আবার বলি, বিদায়।

শোনো, ভালো কথা, তুমি প্রতাপ মজুমদারের লেখা রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত বইখানার খানকয়েক কপি আমাকে সত্বর পাঠিয়ে দিয়ো।'

জুনাগড়ের দেওয়ান, হরিদাস বিহারীদাসকে লিখছেন: 'আমার নিন্দুকের দল এখানে আমার যথেষ্ট ক্ষতি করছে যেহেতু আমার দেশের হিন্দুরা ঘুণাক্ষরেও জানাচ্ছে না আমেরিকাকে যে আমি তাদের প্রতিনিধি। আর এদিকে প্রতাপ মজুমদার, বম্বের নাগারকার আর সোরাবজি নামে এক ভদ্রমহিলা অনবরত বলছে আমেরিকানদের, যে আমি আমেরিকায় আসবার পর প্রথম গেরুয়া ধরেছি, আমি একজন জলজ্যান্ত প্রতারক।'

'এই ভদ্রলোককে, প্রতাপ মজুমদারকে, আমি ছেলেবেলা থেকেই জানি। বিদেশে প্রথম যখন তাঁকে দেখি, আনন্দে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম।' বলছেন স্বামীজি, 'কিন্তু যেদিন ধর্মমহাসভায় হাততালি পেলাম, ঘরে-বাইরে জনপ্রিয় হয়ে উঠলাম, সেই দিন থেকে মজুমদারের সুর বদলাল আর আমার ক্ষতি করবার চেষ্টায় মেতে উঠল।'

কলকাতায় নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রধানস্থল প্রতাপ মজুমদার "ইউনিটি য্যাণ্ড দি মিনিস্টার"-এর সম্পাদক গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তি, আর একজন উদ্দীপ্ত বক্তা। শিকাগোর ধর্মমহাসভার বছর দশেক আগে এসেছিলেন একবার আমেরিকায়, বক্তৃতা দিয়ে প্রচুর নাম কিনেছিলেন। বর্তমান ধর্মমহাসভাতেও তাঁর বক্তৃতা পেয়েছে বিপুল সম্বর্ধনা। তাঁর ভাষণ এত চমৎকার হয়েছিল যে প্রকাণ্ড জনতা একসঙ্গে লাফিয়ে উঠেছিল আর একসুরে গেয়ে উঠেছিল স্তোত্র—'নিয়ারার মাই গড টু দি'—হে প্রভু, তোমারে আরো কাছে, তোমার আরো কাছে। সুতরাং প্রতাপ মজুমদার আমেরিকার জানা লোক, তাঁর মতামত মানবার

মত। তা ছাড়া তিনি 'ওরিয়েণ্টেল ক্রাইস্ট" নামে যে বই লিখেছেন তাও তাঁকে দিয়েছে জয়মাল্য। এ হেন প্রতাপ মজুমদার স্বামীজির অপযশ গাইছেন।

কারণ কী? কারণ স্পষ্ট। ধর্মমহাসভার সমস্ত পাদপ্রদীপের আলো একা স্বামীজি নিয়ে নিয়েছেন। ধর্মমহাসভার পর ম্লান হয়ে গিয়েছেন প্রতাপ মজুমদার। তাঁর সব জেল্লাজমক খসে গিয়েছে। প্রকৃত হিন্দু বলতে কাকে বোঝায় আমেরিকা তার প্রতিভাস পেয়েছে স্বামীজিতে। আর, শুধু হিন্দু? প্রিন্স ওল্স্কনস্কির ভাষায়, প্রকৃত "মানুষের" প্রতিভাস।

শশী মহারাজকে লিখছেন স্বামীজি: 'এখানে এসে প্রভুর ইচ্ছায় দেখা হল মজুমদারের সঙ্গে। প্রথম প্রথম মজুমদাব আমার উপর খুব সদয় ছিলেন, কিন্তু ধর্মমহাসভার পর যখন শিকাগোতে দলে দলে লোক আমার কাছে আসতে লাগল তখন তাঁর আর সহ্য হল না, বিদ্বেষের আগুনে পুড়তে লাগলেন। দেখেশুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি। মিশনারিদের কাছে তিনি এই বলে প্রচার করতে লাগলেন যে আমি ঠক, আমি প্রবঞ্চক; ধর্মমহাসভায় যোগ দেবার মত আমি কেউ নই, আমি আমেরিকায় এসে সাধু সেজেছি। আমার বিরুদ্ধে অনেক আমেরিকানের মন তিনি বিষিয়ে দিয়েছেন, তাঁর পূর্ব প্রভাবের দরুন পেরেছেন বিষিয়ে দিতে। সভাপতি ব্যারোজ পর্যন্ত আমার উপরে বিমুখ হয়েছেন। ওদের প্রচার-পুস্তিকায় আমাকে ছোট করে দেখানো হয়েছে। কিন্তু, ভাই, প্রভু যার সহায় তাকে মজুমদার কী করবে?'

ধর্মমহাসভার পর দেশে ফিরে গিয়েও মজুমদার অপপ্রচার থেকে নিবৃত্ত হল না। বিবেকানন্দ শুধু ভণ্ডই নয়, সে চরিত্রহীন—এমনি ধরনের কুকথা। মিস্টার হেল-এর কাছে বেনামী চিঠি এল, স্বামীজিকে যেন তার বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া না হয়, কেননা ভদ্রপরিবারের লোকেদের সঙ্গে মেলামেশার সে উপযুক্ত নয়। চিঠি পেয়ে করল কী মিস্টার হেল? অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল।

আমি কী—বলছেন স্বামীজি—তা আমার ললাটেই উদ্ভাসিত। তাকিয়ে দেখ আমাব মুখের দিকে, আমার দুই চোখের দিকে—দেখি কতক্ষণ চোখে চোখ রেখে পারো তাকিয়ে থাকতে—তারপরে বলো আমি শঠ কিনা প্রতারক কিনা।

নমঃ শিবায়। তুমি নগ্ন, নিঃসঙ্গ, শুদ্ধ, ত্রিগুণবিরহিত, অজ্ঞানান্ধকারপরিশূন্য। উন্মত্তাবস্থায় থেকেও কলিকলুষহীন। তোমার মস্তক চন্দ্রকলায় উদ্ভাসিত, তুমি কামদেবকে ভস্ম করেছ, তোমার জটায় পতিতপাবনী গঙ্গা, নয়নে প্রলয়ংকরী বহ্নি, সদামঙ্গলকারী, তুমি ত্রিলোকের সারভূত, তোমাকে সর্বচিত্তবৃত্তি সমর্পণ করেছি—আমার অন্য কর্মে কী প্রয়োজন? আমার ভয় নেই বন্ধন নেই, জুগুপ্সা নেই। আমি শক্তিশ্বর। আমি বীতশোক। সর্বকামনামুক্ত।

'আমার সম্বন্ধে কে কী বলছে তাতে আমি ঘাবড়াচ্ছি না, কিন্তু আমি শুধু একজনের কথা ভেবে বেদনা পাচ্ছি।' ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলকে লিখছেন স্বামীজি: 'তিনি আমার বৃদ্ধ মা। সারাজীবন তিনি অশেষ কষ্ট সয়েছেন—তাঁর শুধু এক গৌরব ছিল তিনি তাঁর প্রিয়তম পুত্রকে ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় সমর্পণ করেছেন—এমন গৌরব কজনই বা করতে পারে। কিন্তু সেই মা যদি এখন শোনেন—কোলকাতায় এখন মজুমদার যা বলে বেড়াচ্ছে—যে, তাঁর সেই প্রিয়তম পুত্র বিদেশে পশুবৎ জীবন যাপন করছে—তাহলে, ইসাবেল, আমার মা আর বাঁচবেন না।'

শুধু স্বামীজি নয়, স্বামীজির গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্বন্ধেও অকথা বলতে পেছপা ছিলেন না মজুমদার। ধর্মমহাসভার পর এক সান্ধ্য-মজলিশে এমনি নিন্দে করছিলেন রামকৃষ্ণকে, শ্রোতাদের থেকে একজন বলে উঠল, 'আপনি আপনার বইয়ে কী লিখেছেন?'

'বই? আমার বই? সে আবার কী!' ইতস্তত করতে লাগলেন মজুমদার।

'এই যে দেখুন। ছাপানো বই। আপনার লেখা। বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে।'

গুরুভাইকে লিখে কলকাতা থেকে আনিয়ে নিয়েছেন স্বামীজি। উদার হাতে বিলিয়েছেন সর্বত্র। এই যে সব লিখেছেন আপনি: 'এমনটি আর হয় না। যখন যেখানেই যান রামকৃষ্ণ, সেই এক আশ্চর্য পুরুষ, জ্যোতির সমুদ্র উথলিয়ে দেন। আজও আমার মন সেই সমুদ্রে ভাসছে। হিন্দুধর্মের সমস্ত গাম্ভীর্য আর মাধুর্য এই একটি সংশুদ্ধ লোকের জীবনে সাক্ষীভূত হয়ে রয়েছে। সমস্ত জৈব আকাঙ্ক্ষাকে তিনি জয় করেছেন। আনন্দে পূর্ণ, পবিত্রতায় পূর্ণ, ধর্মের সারভূত বিগ্রহ, দেহ নেই যেন শুধু আত্মার প্রতিমূর্তি। তাঁর চিত্তের অকলঙ্ক শুভ্রতা, তাঁর গভীর আনন্দ, অপঠিত অপার জ্ঞান, শিশুসুলভ শান্তি, সকলের প্রতি ইয়ত্তাহীন স্নেহ আর ঈশ্বরের সর্বপ্লাবী তীব্র প্রেম—এই সবই সেই মহাপুরুষের বৈশিষ্ট্য। ধর্মীয় জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের অন্যরূপ ধারণা, কিন্তু যতদিন রামকৃষ্ণ বেঁচে থাকবেন ততদিন তাঁর পদচ্ছায়ায় আমরা নিঃসঙ্কোচে আশ্রয় নেব আর শিখব পবিত্রতা, অপার্থিবতা, অতীন্দ্রিয়তা আর ঈশ্বর-নিমজ্জন।'

'কী, লেখেন নি আপনি?'

ম্লান মূক মুখে তাকিয়ে রইলেন মজুমদার।

ডক্টর রাইটকে লিখছেন স্বামীজি: 'সন্ন্যাসীকে আত্মপক্ষ সমর্থন করে কিছু বলতে হয় না, একবার তার প্রয়োজন নেই। পৃথিবী আমাকে কী ভাবে তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না, তুমি আমার বন্ধু, তোমাকে আমি প্রমাণে সন্তুষ্ট করব। মিশনারিরা শত্রুতা করছে এ তবু সহ্য হয়, কিন্তু মজুমদার, সমস্ত জীবন যে সৎ কাজ করতেই সচেষ্ট, সে আমাকে হিংসে করছে এ ভাবতেই মর্মাহত হচ্ছি। স্নানের পর হাতী যদি ফের ধুলোয় গড়াগড়ি দেয় তাব স্নান নিরর্থক হয়। আমার প্রভু ঠিকই বলেছেন, কাজলের ঘরে থাকলে যত সেয়ানাই হও না কেন, কালো দাগ লাগবেই লাগবে।

যে দিকে ঈশ্বরের পথ, পৃথিবীর পথ তার উল্টো দিকে। পার্থিব প্রতিষ্ঠা আর ঈশ্বর এক সঙ্গে করায়ত্ত এমন লোক আর ক জন!

আমি ধর্মপ্রচারক নই। আমার সত্যিকার স্থান হিমালয়। কিন্তু আমি সংগ্রামে বদ্ধপরিকর। আর এ সংগ্রামে আমার দেশব্যাপী দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। এ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কী করে লড়তে হয় তার পথ খুঁজতে এসেছিলাম এখানে, পেয়েওছি সে পথ, কিন্তু হায়, আমার দেশবাসীরাই এ পথে কণ্টক আরোপ করছে। কিন্তু তবু, আমার সেই দেশবাসীদেরই আমি ভালোবাসি। আমাকে কেউ স্বপ্নবিলাসী বলতে পারে, কিন্তু আমার ঐকান্তিকতা অকপট। আমার চরিত্রের যদি কোনো ত্রুটি থেকে থাকে, তবে সে আমার দেশপ্রীতি—গভীর দেশপ্রীতি।'

মহর্ষি বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে কী বলছে? বলছে, আমি রুগ্ন, আমি বদ্ধ, আমি দুঃখী, আমি হস্তপদাদিমান জীব—এরকম ভাবনা করলেই মোহের উদ্রেক, মানুষ বাঁধা পড়ে।

আমার দেহই নেই, দুঃখই নেই এ ভাবনা যার, তার কোথায় বন্ধন ? আমি মাংস নই অস্থি নই, আমি দেহ থেকে ভিন্ন, আমি আত্মা, এই নিশ্চয়বোধ যার হয়েছে সেই মুক্ত। হে রাঘব, অনাত্মবস্তুতে আত্মভাবনা দ্বারা অজ্ঞান ব্যক্তি অবিদ্যার কল্পনা করে, কিন্তু যে জ্ঞানী যে প্রবুদ্ধ সে করে না।

বাসনার ক্ষয় হলে চিত্তবিকার দূরে যায়, উড়ে যায় সংসারমোহের মিহিকা। তখন শরতের আকাশের মত হৃদয় স্বচ্ছ হয়ে ওঠে আর তাতে চিৎস্বরূপ, আদ্য, অনন্ত, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রতিভাত হন। কিন্তু এ নয়, যেহেতু মোহ চলে গিয়েছে সংসারের কাজে ইস্তফা দি। যে মোহমুক্ত তাকেই বেশি করে লোকসমাজের রক্ষা ও উন্নতির জন্যে কাজ করতে হবে। লোকশিক্ষার জন্যে।

হে রাম, বলছে বশিষ্ঠ, সংত্যক্তসর্বাশ হও, হও বীতরাগ বিবাসন। অন্তরের সকল আশা, আসক্তি ও বাসনা বিসর্জন দিয়ে বাইরে সংসারের যাবতীয় কাজ করো। বাইরে কর্তা ভিতরে অকর্তা, বাইরে আবেগ অন্তরে অনাসক্তি—এই ভাবে উদ্দীপ্ত হও। অগৃহীতকলঙ্কাঙ্ক আকাশের মত নির্মল থাকো। পৃথিবীর ধোঁয়া মানুষের বাড়ির ছাদদেয়ালই কালো করতে পারে, সাধ্য কী সে আকাশকে স্পর্শ করে!

এ আমার বন্ধু এ আমার বন্ধু নয় এ হিসেব ক্ষুদ্রাত্মার। যে উদারচরিত তার সমস্ত বসুন্ধরাই কুটুম্ব। সুতরাং কেশবচন্দ্র সেন বা শিবনাথ শাস্ত্রী যেমন আমার বন্ধু তেমনি প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও আমার পরমাত্মীয়।

খেতড়ির রাজা অজিত সিংহ চিঠি লিখছে স্বামীজিকে :

'দেশে বা বিদেশে আপনার নিন্দে করছে যে অভাজনেরা তাদের আমি কী বলব ? কিন্তু যে যাই বলুক, কেনা-বেচার সময়েই ঠিক বোঝা যায় কাচ কাচ, মণি মণি। বেগুনে-ওয়ালা হীরের দাম ছ আনা দিতে চাইলে হীরের দাম কমে না। এ সময়ে আমি, ক্ষুদ্র-ব্যক্তি, আমি আপনাকে কি পরামর্শ দেব ? যদিও, গুরুদেব, আমার প্রাণ সব সময়ে আপনার সঙ্গলাভের জন্যে কাতর, তবুও আমি অনুরোধ করি আপনি আরো কিছু-কাল ঐ দেশে থাকুন আর আমাদের দেশের দারিদ্র্যমোচনের ব্রতে ঐ দেশের বলিষ্ঠ সাহচর্য সংগ্রহ করুন। আপনি ছাড়া আর কেউ নেই যে এই মহৎ ব্রত উদযাপন করতে পারে। আপনার মত কে আছে আর ঈশ্বরমাতোয়ারা ? আর, ঈশ্বর ছাড়া শেষ পর্যন্ত আর কার কথায় মানুষে কান পাতে ?

জগমোহনকে মনে আছে ? সে এখন জয়পুরে। তাকে না জানিয়েই তার অশেষ দণ্ডবৎ প্রণাম আপনাকে পাঠাচ্ছি। এ কথা যখন সে জানতে পাবে তখন তার আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকবে না।

খেতড়ি পাহাড়ের এক দুর্দান্ত বাঘ কদিন ধরে খুব উৎপাত করছিল। কম-সে-কম পঞ্চাশটা মোষ সে খেয়েছে। আপনি শুনে আনন্দিত হবেন সেই দুর্দান্তকে আমরা ধরেছি। যদি বাঘ বাঁধা পড়ে থাকে নিন্দুকও বাঁধা পড়বে।'

ডক্টর রাইট, আমার দেশের সকলেই আমার নিন্দে করে না।

বাইরে যদিও অনেক বিক্ষোভ আর বিপর্যয়, স্বামীজির অন্তরের গভীরে অতলান্ত শান্তি। এক দিব্য আনন্দের আভা। হেল-ভগ্নীরা, মেরি হেল আর হ্যারিয়েট হেল ছুটিতে গ্রামে গিয়েছে, তাদেরকে লিখছেন স্বামীজি। এই চিঠিতেই বোঝা যায় তাঁর মন কেমন ঈশ্বরসৌরভে ভরপুর।

লিখছেন : 'প্রিয় বোনেরা, আমাদের হিন্দি কবি তুলসীদাসের নাম শুনেছ ? তিনি রামায়ণ অনুবাদ করেছেন। তাঁর ভূমিকায় তিনি যা বলেছেন আমারও সেই কথা। তিনি বলেছেন, সাধু আর অসাধু দুজনকেই আমি প্রণাম করি, কিন্তু, আমার দুর্ভাগ্য, দুজনেই আমার উৎপীড়ক। যে অসাধু সে আমার সংস্পর্শে আসামাত্রই আমার যন্ত্রণা সুরু হয় ; আর যে সাধু সে আমাকে ছেড়ে চলে গেলে। আমি বলি, তাই হোক। যারা সাধু, ভগবানের প্রিয়, তাদেরকে ভালোবাসা ছাড়া পৃথিবীতে আমার আর কোনো আনন্দ নেই, কোনো আসক্তি নেই। তাই তাদের থেকে বিচ্ছেদ আমার মরণসমান।

কিন্তু এ সব অনিবার্য। ওগো আমার প্রিয়তমের বংশীধ্বনি, যে দিকে আমাকে ডাকো, আমি সেই দিকেই চলেছি। তোমরা মহৎ আর মধুর, সহৃদয় আর পবিত্র—তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে আমার যে কী কষ্ট হচ্ছে তা কী করে বোঝাই ! আমি যদি 'স্টোয়িক' হয়ে যেতে পারতাম, সেই সুখে-দুঃখে নির্বিচল, সঙ্গে-অসঙ্গে নির্বিকার। পারলাম কই হতে ?

গ্রাম কেমন লাগছে তোমাদের ? নিশ্চয়ই তার নয়নজুড়ানো দৃশ্য তোমাদের মনে প্রশান্তি এনে দিচ্ছে।

একটু গীতা শোনাই তোমাদের। "পৃথিবী যেখানে জেগে সেখানে সংযমী নিদ্রিত, আর যেখানে পৃথিবী নিদ্রিত সেখানে সংযমীর প্রখর জাগরণ।' যতই কবিরা বলুক জগৎ হচ্ছে ফুলের মালায় ঢাকা পঙ্কিল আবর্জনা, তবু এর এক কণা ধুলোও যেন তোমাদের না ছোঁয়। যদি পারো ওর ধার দিয়েও যেও না। তোমরা স্বর্গবিহঙ্গের শাবক, তোমাদের পা এই পঙ্ককুণ্ডে ঠেকবার আগেই তোমরা আবার আকাশের দিকে উড়ে যেয়ো।

আহা, যারা জেগে আছ তারা যেন আর ঘুমিয়ে পোড়ো না।

সংসারের অনেক আছে, সে তার অনেককে ভালোবাসুক। আমাদের শুধু একজন আছেন, আমাদের প্রভু, আমরা শুধু তাঁকেই ভালোবাসব। যে যাই বলুক, আমরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনব না, প্রভুই আমাদের একমাত্র প্রেমাস্পদ। একমাত্র প্রিয়তম।

তাঁর কত শক্তি আছে, কত গুণ তিনি ধরেন, কত কী আমাদের কল্যাণ তিনি করতে পারেন, কে তা জানতে চায়, কে তার হিসাব রাখে ? আমরা অবিনশ্বর কাল ধরে বলব, বলে আসছি, আমরা কিছু পাবার জন্যে ভালোবাসি না। আমরা প্রেম নিয়ে ব্যবসা করতে বসিনি। আমরা শুধু দিই, নিই, চাইও না।

যারা দার্শনিক তারা প্রভুর স্বরূপের কথা বলতে আসে আমাদের কাছে, তাঁর গুণের কথা, ঐশ্বর্যের কথা। মূর্খেরা জানে না আমরা তাঁর একটি চুম্বনের জন্যে পিপাসিত।

মূর্খ, তুমি কার সামনে কম্পিত জানু নত করে ভয়ে-ভয়ে প্রার্থনা করছ ? তিনি কি ভয়ের, না, সম্ভ্রমের ? আমার গলার হার দিয়ে তাঁর গলায় ফাঁস পরিয়েছি আর তাতে এক গাছ সুতো বেঁধে তাঁকে টেনে নিয়ে চলেছি সঙ্গে করে। যাতে ক্ষণকালের জন্যেও আমাকে ফেলে না পালিয়ে যান-একা-একা। ঐ হার প্রেমের হার আর ঐ সুতো আনন্দের সুতো। মূর্খ, তুমি তো গোপন তত্ত্ব জানো না, প্রেমের টানে ঐ অনন্ত আমার মুঠোর মধ্যে ধরা পড়েছেন। যিনি বিশ্বভুবনের রাজা তিনি প্রেমের ক্রীতদাস। সমস্ত গতির যিনি গতি, চালকের যিনি চালক, তিনি বৃন্দাবনের গোপীদের কঙ্কনধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে নাচছেন তালে-তালে।

আমার এ সব উন্মত্ত প্রলাপ মার্জনা কোরো। অব্যক্তকে ব্যক্ত করবার এই দুশ্চেষ্টাকেও। এ কি বর্ণনার জিনিস ? এ শুধু অনুভবের। আমার নিরন্তর আশীর্বাদ নাও ইতি—

তোমাদের ভাই
বিবেকানন্দ'

মাদ্রাজে বিরাট সভা হল, তারপর কলকাতায়। উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করা হল, বিবেকানন্দ ভাঁওতা নয়, বিবেকানন্দ খাঁটি সন্ন্যাসী, হিন্দুধর্মের যোগ্যতম প্রতিনিধি। তার মুখ দিয়ে ভারতবর্ষের সেই পুরাণী বাণী পুরাণী প্রজ্ঞা পুনর্বার বিঘোষিত হচ্ছে —পার্থিবতার দেশ আমেরিকাকে দিচ্ছে আধ্যাত্মিকতার খাদ্য যা ছাড়া তরে পুষ্টি-তুষ্টি নেই, যথার্থ ক্ষুন্নিবৃত্তিও হবার নয়। জয় হোক বিবেকানন্দের। জয় হোক হিন্দুর।

হেল-ভগ্নীদ্বয়কে আবার চিঠি লিখছেন স্বামীজি :

'আমার বোনেরা,

জগদম্বার জয় হোক। আশাতীতরূপে আমি সিদ্ধিকাম। এত সম্মান পাব স্বপ্নেও ভাবিনি। প্রভুর কৃপার কথা ভেবে কাঁদছি, শিশুর মত কাঁদছি। প্রভু কখনো তাঁর সেবককে ত্যাগ করেন না। এই সঙ্গে যে চিঠি তোমাদের পাঠাচ্ছি, যে সমস্ত কাগজপত্র, তা পড়েই সব বুঝতে পারবে। যে সমস্ত নাম দেখছ তারা আমাদের দেশের বরেণ্য মনীষী। যিনি সভাপতি হয়েছিলেন তিনি কলকাতার অভিজাতদের মধ্যে প্রধানতম, আরেকজন যাঁকে দেখছ তিনি মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, স্বয়ং গভর্নমেণ্ট কর্তৃক স্বীকৃত, সমাদৃত। সঙ্গের কাগজপত্র দেখলেই সব বুঝতে পারবে। আমি একেবারে কেউকেটা নই।

কিন্তু, সত্যি আমি কী পাষণ্ড, যে এত করুণা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে আমার বিশ্বাস টলে—যদিও দেখতে পাচ্ছি সর্বসময়েই আমি তাঁর হাতের মধ্যে।

তবু মাঝে মাঝে মন অবসন্ন হয়ে পড়ে, সুর ধরে হতাশায়। একজন ঈশ্বর আছেন, একজন পিতা—কিংবা বলো মা, যে কখনো তার সন্তানদের ফেলে না, কখনো না কখনো না। যত সব অদ্ভুত বা অলৌকিক তত্ত্বকথা আছে দূর করে দাও। সন্তান হয়ে তাঁতে আশ্রয় নাও। আর লিখতে পাচ্ছি না। মেয়ের মত আমি কাঁদছি।

তোমাদের স্নেহের
বিবেকানন্দ'

যখন আমরা ভগবানকে ভালোবাসি, তখন আমরা নিজেকে যেন দু ভাগ করে ফেলি। বলছেন বিবেকানন্দ। তার মানে আমিই আমার অন্তরাত্মাকে ভালোবাসি। ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আবার আমিও ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছি। ঈশ্বর আমাকে দাস করেননি, আমিই তাঁকে প্রভু করে সৃষ্টি করেছি, তাঁর দাস হবার জন্যে। যখন জানতে পারব আমি তাঁর সঙ্গে এক, তিনি আমা·· বন্ধু, আমার অন্তরতম, তখনই প্রকৃত সাম্যাবস্থা, তখনই আমার মুক্তি। সেই অনন্ত পুরুষ থেকে যতদিন তুমি নিজেকে একচুলও তফাৎ করবে, ভয় যাবে না। জীবনের সমগ্র রহস্যই হচ্ছে নির্ভীক হওয়া।

ভগবানকে ভালোবেসে জগতের কী কল্যাণ হবে আহাম্মকের মত এই প্রশ্ন কখনো কোরো না। একবার ভালোবেসে দেখ না কী হয়। ঈশ্বর মানেই তো ভালোবাসা। জীবন মানেই তো অনন্ত আনন্দাবকাশ। প্রেমের পেয়ালায় চুমুক দাও, দেখ, শেষ করতে পারো কিনা।

দেখ পাগল না হয়ে পারো কিনা। একটা বেড়াল তার বাচ্চাদের আদর করছে, ঐখানে দাঁড়াও, ভগবানকে দেখ, তাঁর উপাসনা করো যেখানে ভালোবাসা সেখানেই ভগবান। সেই ভালোবাসার চোখ হলে সর্বত্রই দেখতে পাব ভগবানকে, তাঁকে যত্র-তত্র খুঁজে বেড়াতে হবে না। বিশ্বাত্মা জগজ্জ্যোতি প্রভু প্রত্যক্ষ রয়েছেন সামনে, শুধু তাঁকে দেখবারই চোখ নেই, ভালোবাসার চোখ।

৬১

শিকাগোতে যেমন হেল-রা, ডেট্রয়টে ব্যাগলি-রা, তেমনি ফিসকিল ল্যাণ্ডিং-এ গার্নসিরা —ডক্টর গার্নসি আর তার স্ত্রী—স্বামীজিকে বাড়ির মধ্যে আশ্রয় দিয়েছিল, নিয়েছিল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে। এবার ডাক এসেছে সোয়াম্পস্কট থেকে। সোয়াম্পস্কট থেকে গ্রীনএকার। গ্রীনএকার থেকে আনিসকোয়াম।

ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্টিস্ট নামে এক প্রতিষ্ঠান আছে গ্রীনএকার-এ। অলৌকিক উপায়ে রোগ সারাতে পারে বলে দাবি করে, এমনকি অন্ধকেও দিতে পারে চক্ষু। এক মিস্টার কলভিল আছেন, তিনি নাকি ভূতাবিষ্ট হয়ে বক্তৃতা দেন। আর একজন আছেন মিস্টার উড, তিনি নাকি মনের শক্তিতে ব্যাধি সারান। আমেরিকার মতন জায়গাতেও কত কী অদ্ভুত দেখতে পাব !

কিন্তু যাই বলো, নদীর কোলে এই জায়গাটি ভারি মনোরম। স্নান করার ভারি সুবিধে। মেরী ও হ্যারিয়েট হেলকে লিখছেন স্বামীজি : 'কোরা স্টকহাম আমাকে একটি স্নানের পোশাক তৈরি করে দিয়েছে। হাঁসের মত জলে নেমে আমি বিভোর হয়ে স্নান করছি। কী আনন্দ এই অবগাহনে ! কী আনন্দ !'

গ্রীনএকার রিলিজিয়স কনফারেন্সেস বলে একটা প্রতিষ্ঠান খাড়া হয়েছে। সেটা মিস সারা ফার্মারের কীর্তি। সেইখানে বক্তৃতা দেবার জন্যেই স্বামীজিকে ডেকেছে ফার্মার। প্রতিষ্ঠানের কাজ দেখে স্বামীজি খুব খুশি, মিসেস ওলি বুলকে লিখছেন, 'তুমি আমার ভারতীয় ফণ্ডে টাকা দিতে চাও ? দরকার নেই ওখানে দিয়ে। তুমি মিস ফার্মারের প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করো। মিস ফার্মারের বৈশিষ্ট্য কী জানো ? সে আমার বিশ্বাসের উপর কাজ করছে। কী আমার বিশ্বাস ? মানুষ মন্দ থেকে ভালো হচ্ছে নয়, মানুষ ভালো থেকে ক্রমশ আরো ভালো হচ্ছে।'

'ধর্ম আমাদের কী শেখাচ্ছে ? আমরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছি না ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি না, আমরা ঊর্ধ্বে উঠছি, আরো ঊর্ধ্বে।' সারা ফার্মারকে নিউইয়র্ক থেকে চিঠি লিখছেন স্বামীজি : 'ভালো আর মন্দ, পৃথিবীর দুটো চেহারা, এ ঠিক নয়। পৃথিবীর শুধু এক চেহারা। ভালো, হয়তো বা আরো ভালো। ভালোর চেয়েও ভালো। কোনো অবস্থাতেই হাল ছেড়ে দেবার কারণ নেই এখানে। যদি কোনো চেষ্টা থাকে, তা হচ্ছে ভালোর থেকেও আরো ভালো করার, ভালো হবার চেষ্টা। যদি আমাদের পাবার ইচ্ছে থাকে, দেখব, স্বর্গরাজ্য আগের থেকেই বর্তমান। যদি নিজেকে দেখবার সাধ থাকে তবে মানুষ দেখবে সে আগের থেকেই পূর্ণ। এই ভাবকে জীবনায়িত করবার জন্যে তুমি ঈশ্বরেরই সেবা করবে। আমাদের গীতাতে বলেছে যারা ঈশ্বরের ভক্তদের ভক্ত তারাই

ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তুমি প্রভুর সেবিকা। যেখানেই থাকি না কেন, আমি শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস, তোমার মহৎ ব্রতোদ্‌যাপনে সহায়তা করতে আমি কুণ্ঠিত হব না। আর, তোমাকে সাহায্য করা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করা হবে।'

ঈশ্বর শুধু শক্তির উচ্ছ্বাস নন, নন শুধু জ্ঞানের উৎস, তিনি আবার সমস্ত আনন্দেরও প্রস্রবণ। তাঁর অনুভব শুধু আনন্দের অনুভব। কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ। শুধু আমাতে চিত্ত রাখো, আমাকে ভালোবাসো, নানা মত-পথ বিধিনিষেধ ত্যাগ করে একমাত্র আমাতে শরণ নাও, বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, আমিই তোমাকে পাপতাপ শোক দুঃখ থেকে মুক্ত করব। আমাতে মন রাখলেই মনের সমস্ত অবসাদ সমস্ত অশুদ্ধি দূর হয়ে যাবে। ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করলে যেমন আত্যন্তিক চিত্তশুদ্ধি হয়, তেমন আর কিছুতে হয় না। না উপাসনায়, না তপে-জপে, না দানে-ব্রতে, না বা মৈত্রীতে, তীর্থস্নানে। ভগবানকে হৃদয়ে রাখলেই অনন্ত আনন্দ, আর আনন্দই সমস্ত ব্যাধির নিরাকরণ।

প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্ততাই হৃদয়ে-ধরা ভগবানের মূর্তি। তুমি প্রসন্ন, তুমি উজ্জ্বল, তার অর্থই ভগবান তোমাকে ছুঁয়ে আছেন।

'শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায়', মিসেস ওলি বুলকে লিখছেন স্বামীজি: 'মানুষের মুখ দেখামাত্রই আমার মন সহজেই বলে দিতে পারে মানুষটা কী রকম। তার ফলে, আর কারু মুখের দিকে নয়, সৎপরামর্শের জন্যে আমি মিস ফার্মারের দিকেই চেয়ে আছি। আমার বিষয় নিয়ে আর যে যাই বলুক, যতক্ষণ মিস ফার্মার আছে আমাকে পরামর্শ দিতে, যতই সে ভূত-প্রেত মানুক, আমি বিন্দুবিসর্গ চিন্তা করি না। সমস্ত ভূত-প্রেতের আড়ালে আমি অসীম ভালোবাসা-ভরা একটি মানবহৃদয় দেখতে পাচ্ছি, সেই আমার মহত্তম সম্পদ। তবে সত্য কথা বলতে কি, মিস ফার্মারের মনে একটি উচ্চাশা আছে—সেটি অবশ্যি প্রশংসনীয়, যদিও, আমি নিশ্চিত জানি, কয়েক বছরের মধ্যেই তার এই অভিলাষটা কেটে যাবে।'

গ্রীনএকার-এ নামজাদা হোটেল আছে, আর তার চারপাশে অনেক কটেজ। একটার নাম নাইটিংগেল-নিবাস, যেহেতু সেখানে প্রসিদ্ধ গায়িকা মিস এমা থার্সবি থাকে। এই থার্সবির সঙ্গে স্বামীজির আলাপ হয়েছিল নিউইয়র্কে, সেই থেকেই সে স্বামীজির শিষ্যা। কিন্তু সবচেয়ে দর্শনীয় হচ্ছে নদী থেকে মাইলখানেক দূরে বিস্তীর্ণ পাইন-বন, আর এই পাইন-বনে নির্জনে, প্রত্যহ ধর্মালোচনার ক্লাস বসে। বক্তা কে? বক্তা স্বামীজি।

ঈশ্বর নিয়ে কথা কইবার এমন জায়গা আর হতে নেই। সমস্ত কোলাহলের বাইরে অতলান্ত শান্তির মধ্যে ঈশ্বরসান্নিধান। শব্দের মধ্যে পাখির ডাক, পাতার মর্মর আর তারই সঙ্গে মিলিয়ে বক্তার মেদুরমধুর কণ্ঠস্বর। সবুজ ঘাসে বা ঝরা পাতার বিছানায় কেউ বসে কেউ বা শুয়ে কেউ বা আধখানা গা এলিয়ে দিয়ে শুনছে। যারা বুড়ো তাদের জন্যেই চেয়ার আনা হয়েছে। কোথাও কোনো দেশাচারের বন্ধন নেই। যার যেমন খুশি প্রকৃতির সঙ্গে মিতালি পাতাও, আত্মীয়তা করো ঈশ্বরের সঙ্গে। যে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে স্বামীজি বক্তৃতা দেন তার নাম "স্বামীজি পাইন," স্বামীজির পাইন গাছ। এই গাছের নিচেই স্বামীজির প্রথম বেদান্ত-ভাষণ, অদ্বৈতবাদের প্রথম ঝঙ্কার।

আমি মনোবুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত নই, না বা শ্রোত্রজিহ্বা, না বা ঘ্রাণচক্ষু। ব্যোম নই ভূমি নই তেজ নই মরুৎ নই, আমিই চিদানন্দরূপ শিব। আমাতে দ্বেষরাগ নেই, লোভ মোহ নেই, মদও নেই, মাৎসর্যও নেই, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ কিছু নেই, আমিই

চিদানন্দরূপ শিব। পাপপুণ্যহীন সুখদুঃখহীন, মন্ত্রহীন, দেবযজ্ঞবিরহিত আমি—আমি ভোজ্যও নই ভোক্তাও নই আমি শুধু ভোজন—আমিই শিব চিদানন্দরূপ। আমার মৃত্যু নেই, ভয় নেই, পিতা নেই, মাতা নেই, জন্ম নেই, জাতিভেদ নেই, আমি নিরাকার, অবিকল্প, সর্বত্র আমার বিভূতি, আমার না আছে মুক্তি, না বা পরিমাপ—আমিই চিদানন্দরূপ শিব।

শ্রোতারা সকলে সমস্বরে বলে, শিবোহহং, শিবোহহং।

'হে মাধব, অনেকেই তোমাকে অনেক জিনিস দেয়, আমি গরিব, নিঃস্ব, আমি তোমাকে কী দিতে পারি?' মেরী আর হ্যারিয়েটকে আরো লিখছেন স্বামীজি : 'এই শরীর মন আর আত্মা ছাড়া আমার আর কী আছে ? তাই আমি সমর্পণ করলাম তোমার পাদপদ্মে। হে জগদীশ্বর, তোমাকে দীনহীনের এ পুজাঞ্জলি গ্রহণ করতেই হবে, ফিরিয়ে দিলে শুনব না কিছুতেই। ফিরিয়ে দেননি তিনি, আমার সর্বস্ব তিনি নিয়ে নিয়েছেন চিরকালের জন্যে। আমরা যারা শ্রোতা, বেশির ভাগই শুষ্কচিত্ত। মাধব, ভগবান যে রসস্বরূপ, তা একেবারেই কেউ বোঝে না, চায় না বুঝতে। তারা ডাল-চচ্চড়ির ভক্ত। তাদের কাছে ঈশ্বর ভয়ের ব্যাপার, বড় জোর রোগ সারানো শক্তি, বা কোনো স্পন্দন-কম্পন। তাই তারা ঈশ্বরের নামে ঝাড়ফুঁক করে, টেবিলে ভুত নামায়, ডাইনির সঙ্গে মোলাকাত করে। অথচ তোতাপাখির শেখানো বুলির মত প্রেম-প্রেম করতেও ছাড়ে না।

শোনো, তোমরা সৎভাবা, উন্নতচিত্তা। তোমাদের শুভ-চিন্তা ও সৎকল্পনার খোরাক কিছু দিই। চৈতন্যকে জড়ের ভুমিতে টেনে না এনে জড়কে চৈতন্যে পরিণত করো। প্রত্যহ অন্তত একবার করে সেই অনন্ত সৌন্দর্য শান্তি ও পবিত্রতার রাজ্য ঘুরে এস, দেখে এস সেই ভাবভুমি। অস্বাভাবিক অলৌকিক কিছু খুঁজো না। হৃদয়সিংহাসনে অধিষ্ঠিত প্রিয়তমের পাদপদ্মে মন সংলগ্ন করে রাখো, দেহ আর যা কিছু দেহের তাদের যা হবার হোক গে।'

নির্দিষ্ট পাইন-গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আবার বলছেন স্বামীজি : আমি যোগী নই ভোগী নই মোক্ষাকাঙ্ক্ষী নই, আমি না শৈব না শাক্ত না বৈষ্ণব, বনে ও গৃহে আমার সমান-অনুরাগ, আমিই অবধূত দ্বিতীয় মহেশ। আমি নিরস্তপ্রপঞ্চ, পরিচ্ছেদশূন্য, অবস্থাত্রয়াতীত পূর্ণব্রহ্ম। আমি বিশুদ্ধ বিমুক্ত একগম্য সর্ববেদান্তসিদ্ধ শাশ্বত। আমি অংশ নই, আমিই সমগ্র। শুধু আমি নয়, তুমিও সমগ্র। যা কিছু দেখছি খণ্ড করে, সব কিছুই একত্রীকৃত। প্রত্যক্ষ অনুভব করো। প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম।

মাসাচুসেটস, প্লিমাউথ থেকে কর্নেল হিগিনসন নেমন্তন্ন করে পাঠাল স্বামীজিকে। গোঁড়া খৃস্টান, অন্য সব ধর্মকে বিশেষ পাত্তা দিতে রাজি নন, বরং বলেন, বিদেশ থেকে যারা ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা করতে এসেছিল, আমাদের সানডে স্কুলে নিয়মিত পড়তে পেলেই মানুষ হতে পারত—তিনিও ঠেকাতে পারলেন না স্বামীজিকে। সরে দাঁড়ালেন।

স্বামীজি যেন শুধু মানুষ নন, মানুষের চেয়ে বেশি। তাঁর সাধনা যেন শুধু মানুষ হওয়া নয়, যে বৃহত্তম সত্তায় সে প্রেরিত সেই ঈশ্বর হয়ে ওঠা। মানুষের মধ্যে একটা রক্ষণশীল প্রবৃত্তি আছে, বলছেন স্বামীজি, আমরা তাই এক পাও অগ্রসর হতে চাই না। যে মানুষ বরফে জমে যাচ্ছে সে শুধু ঘুমোতে চায়। যদি কেউ তাকে টেনে তুলতেও চায়, সে ওঠে না, বলে আমাকে ঘুমুতে দাও, বরফে ঘুমুতে বড় আরাম।

সে নিদ্রাই তার মহানিদ্রা। আমাদেরও সেই দশা। পা থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত বরফে জমে যাচ্ছে, তবুও আমরা ঘুমুতে চাইছি। একমাত্র ধর্মই পারে আমাদের টেনে তুলতে। কালনিদ্রায় যেন আমাদের পেয়ে না বসে। মানুষ যেখানে পড়ে আছে সেখানে পড়ে থাকলে চলবে না, তাকে ঈশ্বর হতে হবে।

প্লিমাউথ ছেড়ে স্বামীজি গেলেন গার্নসিদের কাছে, ফিসকিল ল্যান্ডিং-এ। সেখান থেকে আনিসকোয়াম। আনিসকোয়ামে স্বামীজি ব্যাগলিদের অতিথি হলেন। 'সেই এক মহান বলিষ্ঠ পুরুষ যে ঈশ্বরের সঙ্গে হাঁটে।' স্বামীজি সম্বন্ধে মিসেস ব্যাগলির অভিমত: 'সরল আর শিশুর মত বিশ্বাসী। পবিত্রতার প্রতীক। বিষদিগ্ধ নিন্দা বা সুধা-স্নিগ্ধ প্রশংসা কিছুতেই বিচলিত বা অভিভূত হবার নন। শীতে উষ্ণে সুখে দুঃখে সমবুদ্ধিসম্পন্ন ও নিন্দাস্তুতিতেও অনাসক্ত। শুধু ঈশ্বরে স্থিরচিত্ত।'

ইসাবেল ম্যাককিন্ডলিকে চিঠি লিখছেন স্বামীজি

প্রিয় বোন,

আবার ব্যাগলিদের সঙ্গে আছি, ওরা কী ভীষণ সহৃদয়! প্রফেসর রাইট এসেছেন, এসেছেন এভানস্টোন-এর ব্র্যাডলি। কী আনন্দে কাটছে ওদের সঙ্গে। এক ভদ্রমহিলা আমার ছবি আঁকছেন। কদিন খুব নৌকা করে বেড়ালাম। একদিন তো ভরাডুবি, জামাকাপড় ভিজে একাকার।

গ্রীনএকার-এ কী সুন্দর কাটল! গাছের তলায় বসলাম, গাছের তলায় ঘুম, গাছের তলায় ঈশ্বরের কথা, যেন ঈশ্বরকে পাশে বসিয়ে গল্প বলা। কটা দিন মনে হয়েছিল যেন স্বর্গের কাছাকাছি আছি।

এর পরে আবার নিউইয়র্কে যাবার ইচ্ছে। কিংবা জানি না বোস্টনে মিসেস ওল বুলের কাছে যেতে পারি। ওল বুলের নাম শুনেছ? সে আমেরিকার এক নম্বর বেহালা-বাজিয়ে। মিসেস তারই বিধবা স্ত্রী—কিন্তু অসাধারণ ধর্মপ্রাণ! ভারতবর্ষ থেকে আনা কাজ-করা কাঠে তৈরি তার বৈঠকখানা, আর আমাকে বারে বারে বলছে ঐ বৈঠকখানায় বক্তৃতা করতে। বলো আর কত বক্তৃতা করব! টাকা করবার সমস্ত মতলব আমি বিসর্জন দিয়েছি। শুধু মাথা গোঁজার একটু আচ্ছাদন, একখানি রুটির আর আমার কাজ—এই পেলেই আমি পরিতৃপ্ত। আমার স্বাস্থ্য? আমার স্বাস্থ্য একরকম ভালোই আছে, আর ভগবান করুন, ভালোই হয়তো থাকবে।

এদেশে কতদিন থাকব কিছুই জানি না, কেউই পারে না বলতে। একমাত্র ভগবান জানেন। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন এই নিরন্তর প্রার্থনা।

ভাই বিবেকানন্দ

'মাকে বোলো আমার আর কোট লাগবে না।' মেরি হেলকে লিখছেন স্বামীজি: 'আমার পোশাক অনেক জমে গিয়েছে। যা ভদ্রভাবে বইতে পারা যায় তার চেয়েও বেশি। জানো যখন আমি জলে পড়ে গিয়েছিলাম আমার গায়ে সেই কালো স্যুটটা ছিল, যে স্যুটটা আমাকে খুব মানাত বলে তোমরা পছন্দ করতে। কতদিন ওটা পরে ধ্যানের সমুদ্রে ডুবে গিয়েছি, জলের সমুদ্র এর কী ক্ষতি করবে?'

মিসেস হেলকে মা আর তার মেয়েদের বোন বলেন স্বামীজি। মাদ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গাকে লিখছেন, 'মিসেস জি. ডবলিউ হেল আমার পরম বন্ধু, তাঁকে আমি মা বলি আর তাঁর মেয়েরা আমার বোনের মত। আমি এখন ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু

কত আর বক্তৃতা দেব ? আমাকে এবার কলম ধরতে হবে। কিন্তু স্থির হয়ে দু দণ্ড যে বসব একজায়গায় তার সুবিধে কই ?

বোস্টনে এসে মিসেস বুলকেও লিখছেন সেই কথা : 'বক্তৃতা যথেষ্ট হল, এখন আমি লিখতে চাই। কত আমার উত্তাল ভাব, আমি চাই তা লিপিবন্ধ করতে। কিন্তু আমার জন্যে নির্জনতা কোথায় ?'

মিসেস বুল স্বামীজির কাছ থেকে কটা ডলার নিয়েছিলেন, এখন চাইছেন তা ফিরিয়ে দিতে।

লিখছেন স্বামীজি : 'মা, আমি হিন্দু। হিন্দু সন্তান কখনো মাকে টাকা ধার দেয় না। সন্তানের উপর মার সর্ববিধ অধিকার, তেমনি মার উপর সন্তানের। সেই তুচ্ছ কটা ডলার ফিরিয়ে দেবার কথা বলছ শুনে তোমার উপর আমার খুব রাগ হয়েছে। যেন তোমার ধারই আমি শুধতে পারব ইহজন্মে !'

সত্যি-সত্যি দোকানে ঢুকে লেখবার সব সাজসরঞ্জাম কিনে নিলেন একদিন। সুন্দর দেখে একটা পোর্টফোলিও পর্যন্ত। কিন্তু লেখা হচ্ছে কই ? মাদ্রাজ স্বামীজিকে অভিনন্দনপত্র পাঠিয়েছে, তারই একটা উত্তর শুধু লিখে উঠতে পেরেছেন স্বামীজি। কিন্তু আরো কত কথা কত চিন্তা কত অভিজ্ঞতা স্থায়ী অক্ষরে বন্দী করবার বাসনা। কই অবকাশ, কই শান্তি, কই পবিত্রনির্জন পরিবেশ ?

'আমি যে বই লেখবার সংকল্প করেছিলাম তার এক পঙক্তিও লিখতে পারিনি। কেবল বক্তৃতা দিচ্ছি, ক্লাস করছি, বেদান্ত শেখাচ্ছি আর ঘুরে বেড়াচ্ছি এখানে-ওখানে।' আলাসিংগাকে আবার লিখছেন : 'আর কী হবে এ দেশে থেকে ? অনবরত ঘোরাঘুরি করে বকে-বকে আমার শরীর খারাপ হয়ে গেছে। সুতরাং বুঝতে পারছ, আমি শিগগিরই ফিরছি। এখানে আমার বন্ধুর সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে আর তাদের ইচ্ছে, আমি বরাবরই এখানে থেকে যাই। কিন্তু শুধু খবরের কাগজে নাম বেরুনো ও জনসাধারণের কাছে ভুয়োলোকমান্য—এ নিয়ে আমার হবে কী ? আমি কি নাম-যশের ভিখারী ?'

মিসেস বুল লিখে পাঠালেন : 'আমার কাছে এস। আমার বাড়িতেই তোমার জন্যে শান্তি অপেক্ষা করে আছে। আমি ছাড়া আর কে আছে তোমার পথ চেয়ে ? ভুলো যেও না, আমি তোমার মা।'

পাতানো মা নয়, সত্যিকার মা। মিসেস হেলকে বরং বলা যায় পাতানো মা, কিন্তু মিসেস বুলকে সমস্ত নিগূঢ় সত্তা থেকে স্বামীজির মা ডাকা। 'শুধু তুমি আমাকে নানা-ভাবে রক্ষা করেছ বলে নয়, সাহায্য করেছ বলে নয়, অন্তরস্থ দৈবী প্রেরণায় তোমাকে আমি আমার মা বলে চিনেছি। বলতে পারো, হয়তো বা আমার প্রভুর নির্দেশে।'

সর্বদা ঈশ্বরের কাছে আছে এমন একজন উজ্জ্বল পুরুষের সান্নিধ্য পাওয়া, মিসেস ব্যাগলি স্বামীজি সম্বন্ধে লিখছেন, এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে চলে আসা। তাঁর চরিত্রের দীপ্তি ও তাঁর ব্যক্তিত্বের দার্ঢ্য দেখে অভিভূত হবে না এমন মানুষ দেখলাম না কোথাও। শ্রীতে ও ধী-তে অখণ্ডমণ্ডিত অথচ কত নম্র, কত আলাপকুশল। যেন সহজ-সুচির বন্ধু। বোস্টন থেকে এলেন আমার বাড়ি আনিসকোয়ামে, আমারই নিমন্ত্রণে। শুধু আমার নয়, আমার পরিবারের নয়, আমার সমস্ত প্রতিবেশীদের সে কী এক মহোৎসব, যতদিন ছিলেন তিনি আমার অতিথি হয়ে। তিনি চলে গেলেন আমাদের সমস্ত বিলাসরসেরও শেষ হল। দিন অন্ধকার হয়ে গেল।

'কুছ পরোয়া নেই। ওয়া গুরুকা ফতে।' ব্রহ্মানন্দকে লিখছেন স্বামীজি : 'আরে দাদা, শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি। মিশনারি-ফিসনারির কী কর্ম এ ধাক্কা সামলায়? মোগল পাঠান হদ্দ হল, এখন কি তাঁতির কর্ম ফার্সি পড়া? ও সব চলবে না ভায়া, কিছু চিন্তা কোরো না। সব কাজেই একদল বাহবা দেবে, আরেক দল দুষমনি করবে। নীরবে নিজের কাজ করে যাও, কারুর কথায় জবাব দেবার কী দরকার?

ঐ যে জি. ডবলিউ হেলের ঠিকানায় চিঠি দাও, তাদের কথা কিছু বলি। সে আর তার স্ত্রী, বুড়ো-বুড়ি। আর দুই মেয়ে, দুই ভাইঝি, এক ছেলে। ছেলে জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র থাকে, মেয়েরা এখনো ঘরে। চারজনেই যুবতী, বে-থা করেনি। রূপসী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, নাচতে গাইতে পিয়ানো বাজাতে ওস্তাদ। ওদের জন্যে অনেক ছেলে ফ্যা-ফ্যা করছে, কিন্তু ওদের ওদিকে বিশেষ মন নেই। ওরা বোধহয় বিয়ে করবে না। তার উপর আমার সংস্রবে এসে ওদের ঘোর বৈরাগ্য উপস্থিত। ওরা এখন ব্রহ্ম-চিন্তায় ব্যস্ত।

মেয়ে দুটি, ব্লন্ড, অর্থাৎ ওদের চুল সোনালি, আর ভাইঝি দুটি ব্রুনেট, অর্থাৎ তাদের চুল কালো। জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—ওরা সব জানে। মেয়েরা আমাকে দাদা বলে, আমি ওদের মাকে মা বলি। আমি যেখানেই কেন যাই না, থাকি না, আমার জিনিসপত্র সব ওদের বাড়িতে। তারাই সব ঠিকানা করে। খোঁজ-খবর নেয়।

কী মেয়েরা বাবা, এদেশে। এদের মেয়ে দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম। আমাকে শিশুটির মত হাত ধরে পথ দেখিয়ে মাঠে ঘাটে দোকানে নিয়ে যায়। সব কাজ করে, আমি তার সিকির সিকিও করতে পারি না। এরা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—এরাই সাক্ষাৎ জগন্মাতা, এদের পুজো করলেই সর্বসিদ্ধি করায়ত্ত। আরে, রাম বল, আমরা কি মানুষের মধ্যে? এই রকম মা জগদম্বা যদি এক হাজার আমাদের দেশে তৈরি করতে পারি, তবে নিশ্চিন্ত হয়ে মরব। আমাদের পুরুষগুলোই এদের মেয়েদের কাছ ঘেঁষবার যুগ্যি নয়, মেয়েদের কথা কী বলব! হরে হরে, কী মহাপাপী, দশ বছরের মেয়ের বিয়ে দেয়! হে প্রভু—'

আরো লিখছেন ব্রহ্মানন্দকে : 'এ দেশে ভুতুড়ে অনেক। যে ভূত আনে তাকে বলে মিডিয়ম। মিডিয়ম একটা পরদার আড়ালে যায় আর পরদার ওপার থেকে ভূত বেরোতে আরম্ভ করে, বড় ছোট হরেকরকমের ভূত। আমি গোটাকতক দেখলাম বটে কিন্তু ঠগবাজি বলেই মনে হল। আরো গোটাকতক দেখে তবে সিদ্ধান্ত করব। যাই বলো ভুতুড়েরা আমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে।

আরেক দল হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স—এরাই হচ্ছে আজকালকার বড় দল। গোঁড়াদের বুকে শেল বিঁধছে। এরা হচ্ছে বেদান্তী, গোটাকতক অদ্বৈতবাদের মত জোগাড় করে বাইবেলের মধ্যে ঢুকিয়েছে আর সোঽহং সোঽহং বলে মনের জোরে রোগ সারিয়ে দিচ্ছে। এরা ঠিক আমাদের কর্তাভজা। বলু রোগ নেই, ব্যস্, ভালো হয়ে গেল, আর বলু সোঽহং, ব্যস্, ছুটি, চরে খা গে। এরা ঘোর জড়বাদী, রোগ ভালো করে, আজগুবি করে, তবে ধর্ম মানে। এরা কিন্তু আমাকে খুব খাতির করে। কেন করবে না? ব্রহ্মচর্যের মত আর কী বল আছে! আর কী আছে কৌশল!

গোঁড়াদের ত্রাহি-ত্রাহি এদেশে। আর ভূত-উপাসক বলে হিন্দুকে পারছে না ঘৃণা করতে। আমিই তাদের যম। বলে, কোথা থেকে এ ব্যাটা এল! রাজ্যির মেয়ে-মদ্দ এর

পিছু-পিছু ফিরছে, গোঁড়ামির জড় মারবার জোগাড়ে আছে। আগুন ধরে গেছে বাবা। গুরুর কৃপায় যে আগুন ধরে গেছে তা নেববার নয়। কিছুতে নয়।

এদেশের লোক ভালোমানুষ, দয়ালু, সত্যবাদী। সব ভালো, কিন্তু ঐ যে ভোগ, ঐ ওদের ভগবান। টাকার-নদী, রূপের তরঙ্গ, বিদ্যের পাহাড়, বিলাসের হরিহরছত্র। কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥ কর্মের সিদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করেই ইহলোকে দেবতা যজন করে, কারণ, মনুষ্য-লোকে কর্মজনিত সিদ্ধিই শীঘ্র লাভ করা যায়।

অদ্ভুত তেজ আর বলের সমুচ্ছ্বাস। কী শক্তি, কী কুশলতা, কী ওজস্বিতা! হাতির মত ঘোড়া বড় বাড়ির মত গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মহাশক্তির সন্তান, এরা বামাচারী। তারই জয়জয়কার এখানে।'

'আমাদের দেশে একজনকে আমি চিনতাম', স্বামীজি বক্তৃতা দিচ্ছেন, 'সে চিরকেলে অজ্ঞ আর অলস, পশুর মত জীবনযাপন করত। আমার সঙ্গে দেখা হলে সে জিগ্‌গেস করল, ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য আমাকে কী করতে হবে?'

আমি তাকে বললাম, 'তুমি মিথ্যে কথা বলতে পারো?'

সে বললে, 'না।'

তখন আমি বললাম, 'তবে তোমাকে মিথ্যে বলা শিখতে হবে। একটা পশুর মত বা কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের মত জড়বৎ জীবনযাপন অপেক্ষা মিথ্যে বলা ভালো। তুমি অকর্মণ্য, নিষ্ক্রিয় অবস্থা অর্থাৎ যে অবস্থায় মন সম্পূর্ণ শান্তভাবে অবলম্বন করে ও যা সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা, তা তোমার লাভ হয়নি। তুমি এতদূর জড় যে তোমার একটা অন্যায় কাজ করবারও ক্ষমতা নেই।' উপহাসের মত বলেছিলাম বটে কথাটা, কিন্তু আমার ভাব ছিল এই, সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থা বা শান্তভাব লাভ করতে হলে কর্মশীলতার মধ্য দিয়েই যেতে হবে।'

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্ম-পত্রমিবাম্ভসা ॥ যে ব্রহ্মে সমুদয় কর্ম স্থাপন করে ফলাসক্ত ও কর্তৃত্বাভিমানবর্জিত হয়ে কাজ করে সে পাপে লিপ্ত হয় না, যেমন পদ্মপত্র জলস্পৃষ্ট হয়েও জল দ্বারা লিপ্ত হয় না।

৬২

সপ্তাহখানেক মিসেস বুলের সঙ্গে কাটিয়ে স্বামীজি গেলেন বালটিমোর। খবরের কাগজের লোক তড়িঘড়ি এসে দেখা করে গেছে। লিখছে: একটা দেখবার মতন চেহারা। মাথাভরা কালো চুল, ঢেউখেলানো, মাঝে মাঝে উড়ে এসে পড়ছে কপালে, প্রায় ভুরু ঘেঁষে। তেমনি কালো দুই চোখ। অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করছে। আর যখনই হাসে মুক্তোর মত সার-বাঁধা সুগঠিত দাঁত ঝিলকিয়ে ওঠে। সমস্ত অস্তিত্ব থেকে আনন্দ যেন উথলে পড়ছে। এমন লোককে দেখে কে না একটু থমকে দাঁড়াবে? কত বয়েস হবে? বত্রিশ-তেত্রিশ। দৈর্ঘ্য? সাড়ে পাঁচ ফিট। ওজন? প্রায় দুশো পঁচিশ পাউণ্ড। দীর্ঘায়ত দেহে অতি প্রিয়দর্শন। এই অল্প বয়সেই বহু বিদ্যা করায়ত্ত করেছে। সাত সাতটা ভাষায় নিরর্গল বক্তৃতা দিতে পারে। আর ইংরিজী যা বলে একেবারে নিখুঁত। আর আলাপ

করে দেখ, কী যে নখাগ্রে নেই বুঝে ওঠা যায় না। মিল, ডারউইন, স্পেন্সার আরো কত কত দার্শনিকের লেখা এক নিশ্বাসে বলতে পারে মুখস্থ। ধর্ম সম্বন্ধে অবিশ্বাস্যরূপে উদার। একই সত্য প্রত্যেক ধর্মের লক্ষ্য ও প্রতিপাদ্য। একই গন্তব্যে যাবার বিচিত্র রাস্তা। কিন্তু যাই বলি, ভারতবর্ষে যেমন ধর্মের জন্য টান তেমনি আমেরিকায় কোথায়? আমেরিকায় টান বিষয়ের দিকে। ভারতবর্ষের উদ্বৃত্ত ধর্ম আমেরিকায় কিছু পাঠিয়ে আমেরিকার উদ্বৃত্ত বিষয় যদি কিছু পাঠানো যেত ভারতবর্ষে। স্বামীজি বলছেন, তা হলেই সমন্বয় হত পুরোপুরি। কাল বক্তৃতা দেবেন এখানে। শুনবে সে এক গম্ভীর সুন্দর কণ্ঠস্বর। আর তিনি দাঁড়াবেন তাঁর ভারতীয় সন্ন্যাসীর পোশাকে। সে এক আশ্চর্য পোশাক।

সভার উদ্যোক্তারা স্বামীজিকে নিয়ে গেল এক সস্তা হোটেলে। হোটেলওয়ালা স্থান দিলে না। গায়ের রঙ যার কালো তার অধিকার নেই ঢোকবার।

এ হোটেল নয় তো আরেক হোটেল। সেখানেও সেই দৌর্জন্য। না, মিলবে না জায়গা। কালা আদমি ঘেঁষতে পারবে না এখানে।

আরেক হোটেলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, স্বামীজি গর্জে উঠলেন, 'কী কেবল সস্তা হোটেলের দিকে যাচ্ছ, এখানে কোনো বড়, সম্ভ্রান্ত হোটেল নেই?'

'তা আছে বৈকি।'

'সেখানে নিয়ে চলো।'

'সেখানে তো ব্যবহার আরো রূঢ় হবে। ঢুকতে দিলেও পরে তাড়িয়ে দেবে।'

'দিক, তবু সেখানে নিয়ে চলো।'

উদ্যোক্তারা তবু দ্বিধা করতে লাগল।

'কী নাম সেই বৃহত্তম হোটেলের?'

'হোটেল রেনার্ট।'

'সেখানে গিয়েই উঠব। চলো সেই দিকে।' স্বামীজি অস্থির হয়ে উঠলেন।

'সেখানে আপনার দায়িত্ব কে নেবে?' উদ্যোক্তারা পাশ কাটাতে চাইল।

'আমার দায়িত্ব আমি নেব। ঈশ্বর নেবেন।' আবার তাড়া দিলেন স্বামীজি: 'তোমরা আগে একবার আমাকে নিয়ে চলো তো সেখানে।'

হোটেল রেনার্টের একটা গোটা ঘর ভাড়া নেওয়া হল। কে স্বামী বিবেকানন্দ, হোটেলের কেরানি খেয়াল করল না। খালি ঘরে দিব্যি ঢুকে পড়লেন স্বামীজি। উদ্যোক্তারা বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। কতক্ষণে টের পেয়ে ম্যানেজার এসে তাড়িয়ে দেন বিদেশীকে। কিন্তু কই, কিছুই তো হচ্ছে না। স্বামীজি তো আসছেন না বেরিয়ে। কোথাও তো বিরোধ-বচসা নেই। দিব্যি টিকে আছেন স্বামীজি।

'চলে এস।' উদ্যোক্তারা বলাবলি করতে লাগল। 'ও হিন্দু সাধু, কত কী কৌশল জানে হয়তো। চোখে কি ধুলো দিয়ে থাকতে পারবে লুকিয়ে!'

উদ্যোক্তারা চলে গেল। কিন্তু আমার আবার কৌশল কী। স্বামীজি ভাবছেন মনে-মনে। স্পষ্টতা, নির্ভীকতা, প্রশান্তচিত্ততাই আমার কৌশল। আমার কৌশল ব্রাহ্মী স্থিতি। না, লুকিয়ে থাকব কেন? কেন ছদ্মরূপ ধরে থাকব অন্তরালে? আমি যা তাই লোকে দেখুক আমাকে।

পর দিন লবিতে চেয়ার টেনে প্রকাশ্যে বসেছেন স্বামীজি। গায়ে গেরুয়া রঙের ড্রেসিং

গাউন, কোমরে চওড়া লাল ফিতে। যে দেখতে চাও দেখ আমাকে। যে আলাপ করতে চাও মুখোমুখি বোসো আরেকটা চেয়ারে। আলাপ করো।

কে এই বিরাট প্রাণপুরুষ! পরিপূর্ণতার পুরোহিত! যে দেখে সেই চেয়ে থাকে মুগ্ধ হয়ে। যে শোনে সে আর উঠতে চায় না। এমন জোরদার উপস্থিতি যেন সকল কুণ্ঠা ও দ্বিধার পারে নিয়ে যাবে সহসা। হিসেবে এতটুকু গরমিল রাখবে না।

লিশিরাম থিয়েটার লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। স্বামীজি বক্তৃতা দিচ্ছেন :

'নীতিকথা অনেক হয়েছে এখন রুটির দরকার, রুটি চাই। পেটে যার ভাত নেই বাহুতে যার বল নেই বুকে যার সাহস নেই, তার আবার নীতি কী? আমরা আর মিশনারী চাই না, আমরা টাকা চাই, চাই শিল্পে অগ্রগতি। মন্দির অনেক হয়েছে এখন হোক কলকারখানা। নীতি-অনুসারে জীবন গঠন করবার পার্থিব উপায় ও উপকরণ আমাদের হাতে আসুক। ঠোঁটের প্রার্থনার চাইতে হাতের প্রার্থনা বেশি কার্যকর। কর্মেই আসল ধর্ম। পরোপকারই কর্মের লক্ষ্য। ধর্ম মানেই তো বিস্তার। আর পরোপকার ছাড়া কিসে জীবনের বিস্তার ঘটবে? সুতরাং কাজ করবার হাতিয়ার দাও ভারতবর্ষকে, অনর্থক ধর্মকথা শোনাতে এস না।'

বাল্টিমোর থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখছেন স্বামীজি : 'লোহা গরম থাকতে-থাকতেই ঘা মারো। মহাশক্তিতে কাজে নামো। কুড়েমির কর্ম নয়। ঈর্ষা অহমিকা জন্মের মত বিসর্জন দাও গঙ্গাজলে। তুমি শুধু বলভরে কাজে লাগো, বাকি সব প্রভু দেখিয়ে দেবেন। মহাবন্যায় সমস্ত পৃথিবী ভেসে যাবে। ওয়ার্ক, ওয়ার্ক, ওয়ার্ক—এই মূল মন্ত্র। আমি তো আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। এদেশে কাজের বিরাম নেই। সমস্ত দেশ দাবড়ে বেড়াচ্ছি। যেখানে প্রভুর তেজের বীজ পড়বে সেখানেই ফল ফলবে, অদ্য বাব্দশতান্তে বা। জগতের হিত করা আমাদের উদ্দেশ্য, নিজেদের নাম বাজানো নয়। নিরঞ্জন সিলোনে পালি ভাষা কেন শেখে না, কেন পড়ে না বৌদ্ধগ্রন্থ? অনর্থক ভ্রমণে কী ফল? প্রভুর যারা শরণাগত, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সমস্ত তাদের পদতলে। হামবড়া ও দলাদলি ছাড়ো, পৃথিবীর মত সর্বংসহ হও। তা হলে দুনিয়া তোমাদের পায়ের তলায় আসবে। মহোৎসবাদিতে পেটে খাওয়া কম করে মস্তিষ্কের খাওয়া কিছু দিতে চেষ্টা কোরো।'

উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়, আবার বলছেন স্বামীজি, আমাদের হাতে সমূহ যে কর্তব্য আছে তারই অনুষ্ঠানে শক্তিসঞ্চয় করে ক্রমাগত উচ্চপথে অগ্রসর হওয়া, যতদিন না সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হতে পারি। কোনো কর্তব্যকেই ঘৃণা করলে চলবে না। যে অপেক্ষাকৃত নিম্ন কাজ করে, সে নিম্নদরের লোক হয়ে যায় না। কর্তব্যের প্রকার দেখে মানুষের বিচার নয়, কর্তব্য-সম্পাদনের প্রকার দেখে মানুষের বিচার। প্রত্যহ আবোল-তাবোল বকে এমন একজন অধ্যাপকের চেয়ে একজন মুচি শ্রেষ্ঠ, যে অল্পসময়ের মধ্যে একজোড়া শক্ত সুন্দর জুতো তৈরি করে। বচনের থেকে রচন শ্রেষ্ঠ।

পরোপকারই আত্মোপকার। এ কথা মনে রাখতে হবে, আমরাই জগতের কাছে ঋণী, জগৎ আমাদের কাছে ঋণী নয়। আরো মনে রাখতে হবে জগতের একজন অধীশ্বর আছেন। তিনি অবিশ্রান্ত কাজ করে চলেছেন। তুমি-আমি ঘুমুই কিন্তু তাঁর ঘুম নেই। তিনি সব সময়ে জাগরিত, সব সময়ে অবহিত। জগতে যা কিছু বিবর্তন ঘটছে সব তাঁর কাজ। তা হলে প্রশ্ন করতে পারো, আমরা কাজ করব কেন? ঈশ্বর কাজ করছেন বলে, তাঁকে দেখেই তাঁর থেকে শিখেই আমাদের কাজ করতে হবে। আমাদের কাজ করতে

হবে আধ্যাত্মিক বললাভের জন্যে, ক্রমে ক্রমে ঈশ্বর হবার জন্যে। এ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে জগতের জন্যে কিছু কাজ করবার আমরা সুযোগ পেয়েছি। জগতের সাহায্য ? না, না, নিজেদের কল্যাণ। নিজেদের অভ্যুদয়।

লিশিয়াম থিয়েটারে আবার আরেক দিন বক্তৃতা দিলেন স্বামীজি। এবারকার বিষয় বুদ্ধ। সে কী ভিড় আর বক্তৃতান্তে সে কী হর্ষধ্বনি।

'চক্রের ভিতরে চক্র—এ এক ভয়ানক যন্ত্র।' বক্তৃতা দিচ্ছেন স্বামীজি : 'প্রত্যেকেই আমরা ভাবি যে হাতের কাছের এ কর্তব্যটা সমাধা হয়ে গেলেই বিশ্রাম লাভ করব, কিন্তু কর্তব্যটা শেষ হবার আগেই আর এক কর্তব্য মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে দেখতে পাই। এ যন্ত্রের থেকে উদ্ধার হবে কিসে ? দুটি উপায় আছে। এক, এই যন্ত্রের সঙ্গে সম্রব একেবারে ছেড়ে দেওয়া—যন্ত্র চলুক, তুমি এক পাশে সরে দাঁড়াও। সমস্ত বাসনার উচ্ছেদ করো। এ কোটিতে গুটিক পারে কিনা সন্দেহ। নয়তো যন্ত্রের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ো পালিয়ে যেও না, ঝাঁপ দিয়ে পড়ে যন্ত্রের কর্মের রহস্য আয়ত্ত করো। কর্মের দ্বারাই আমরা যাব কর্মের বাইরে। এই যন্ত্রের মধ্য দিয়েই যন্ত্রের বাইরে যাবার পথ।

সমুদয় কর্মের ফল ত্যাগ করো, অনাসক্ত হও। কর্ম করবার জন্যে অভিসন্ধির দরকার কী! ভালো কাজ করো যেহেতু ভালো কাজ করাই ভালো, ভালো কাজ করতেই আমার ভালো লাগে। গীতার বিরুদ্ধে আমি অনেক তর্ক পড়েছি—অভিসন্ধি ছাড়া কাজ হতে পারে না। কিন্তু ভেবে দেখ অভিসন্ধিই তো বন্ধন। আমাদের চরম লক্ষ্য মুক্তি, চরণে শৃঙ্খল জড়ানো নয়। যদি আমরা মনে করি এই কর্মের ফলে আমরা স্বর্গ পাব তা হলে আবার স্বর্গ নামক একটা স্থানে আমাদের আবদ্ধ হতে হবে। ও তো আরেক ক্লেশ, আরেক যন্ত্রণা।

আমি অল্প কথায় তোমাদের কাছে এমন একজনের কথা বলব যিনি এই শিক্ষাকে জীবনায়িত করেছিলেন। তিনিই বুদ্ধ, কর্মযোগিশ্রেষ্ঠ। অন্য মহাপুরুষদের কর্মের প্রেরণার মূলে ছিল বাইরের অভিসন্ধি। কেউ-কেউ বলেছেন, আমরা ঈশ্বর, জগতে অবতীর্ণ হয়েছি, কেউ-কেউ বা বলেছেন আমরা ঈশ্বরপ্রেরিত—কিন্তু দু দলেরই কার্যের প্রেরণাশক্তি বহির্বাসী। যাই আধ্যাত্মিক ভাষা ব্যবহার করুন না, তাঁরা বহির্জগৎ থেকেই পুরস্কার আশা করেন। কিন্তু বুদ্ধ কী বললেন ? বললেন, আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু নই—ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মতে আমার প্রয়োজন কী ? আত্মা সম্বন্ধে সূক্ষ্ম তত্ত্বানুসন্ধানে আমার সময় কোথায় ? আমি শুধু এই বুঝি, সৎ হও আর সৎ কাজ করো। তোমার সত্য যাই হোক না, এই সততাই তোমাকে পৌঁছে দেবে সেখানে।

বুদ্ধই সম্পূর্ণরূপে অভিসন্ধিবর্জিত ছিলেন, অথচ তাঁর মত কে অত কাজ করেছে ? সব কাজ অন্যের জন্যে, নিজের জন্যে কিছু নয়। ইতিহাসে এমন একটি চরিত্র দেখাও যিনি তাঁর মত উঠেছেন, গিয়েছেন, পৌঁচেছেন। এত উন্নত দর্শন ও সেই সঙ্গে এত নির্মল করুণা কার! অথচ উচ্চ-নীচ কারু কাছে কোনো দাবি-দাওয়া নেই। বুদ্ধের সঙ্গে আর কারু তুলনা হয় না—বুদ্ধই আত্মশক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ, হৃদয় ও মস্তিষ্কের সমীকরণের জ্বলন্ত উদাহরণ। বুদ্ধই সর্বপ্রথম সাহস করে পেরেছিলেন বলতে, কোনো প্রাচীন পুঁথিতে কোনো বিষয় লেখা আছে বলে বা তোমার জাতীয় বিশ্বাস বলে অথবা শিশুকাল থেকে কোনো বিশেষ বিশ্বাসে

গঠিত হয়েছ বলেই কোনো বিষয় বিশ্বাস কোরো না। বিচার করো, তারপর বিশ্লেষণ করে দেখ, সকলের পক্ষে কী উপকারী। যদি তা বুঝিতে পাও তবেই তাকে বিশ্বাস করো, সেই মত জীবনযাপন করো ও অন্যকে বলো সেই মত জীবনযাপন করতে।'

বালটিমোর থেকে ওয়াশিংটনে এলেন স্বামীজি। সেখান থেকে চিঠি লিখছেন মিসেস বুলকে: 'বালটিমোরে এক ছোটলোক হোটেলওয়ালার কাছে যে দুর্ব্যবহার পেয়েছি তার জন্যে আপনি দুঃখিত হবেন না। যেমন সর্বত্র হয়েছে, এখানেও আমেরিকার মেয়েরাই আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিল। এখানে মিসেস ই. টটেনের বাড়িতে আছি। ইনি আমার শিকাগোর বন্ধুদের আত্মীয়।'

শিকাগোর বন্ধুদের মানে হেলদের।

'হাজার হাজার লোক সাগ্রহে আমার কথা শুনছে।' রাজপুতানার বিহিমিয়া চাঁদকে লিখছেন স্বামীজি: 'এদেশে থাকা খুব ব্যয়সাধ্য কিন্তু প্রভু সর্বত্রই আমার সংস্থান করে চলেছেন।'

'আমার জন্যে মার কাছে কত বলেছেন—' মাস্টারমশাইকে বলছে নরেন, 'যখন খেতে পাচ্ছি না, নিদেন কাল হয়েছে, বাড়িতে খুব কষ্ট, তখন আমার জন্যে মার কাছে টাকা চেয়েছিলেন ঠাকুর। টাকা হল না। বললেন, মা বলেছেন মোটা ভাত মোটা কাপড় হতে পারে। ভাত-ডাল হতে পারে। এত আমাকে ভালোবাসা—কিন্তু যখনই কোনো অপবিত্র ভাব এসেছে অমনি টের পেয়েছেন। অন্নদার সংগে যখন বেড়াতাম, অসৎ সংগে গিয়ে পড়েছিলাম। তাঁর কাছে এলে আমার হাতে আর খেলেন না, খানিকটা হাত উঠে আর উঠল না—'

মাস্টারমশাই বললেন, 'তুমি ধন্য। রাত দিন তাঁকে চিন্তা করছ।'

কাতরস্বরে নরেন বললে, 'কই তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না বলে শরীর ত্যাগ করতে ইচ্ছে হচ্ছে কই?'

বুদ্ধগয়া থেকে ফিরেছে নরেন, ঠাকুরের কাছে এসেছে। মাস্টার জিগগেস করলে, 'বুদ্ধদেবের কী মত?'

নরেন বললে, 'তপস্যার পর বুদ্ধ কী পেলেন মুখে বলতে পারেন নি। তাই সকলে তাঁকে নাস্তিক বলে।'

'নাস্তিক কেন?' বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'শুধু মুখে বলতে পারেনি এই যা। বুদ্ধ কী জানো? বোধস্বরূপকে চিন্তা করে তাই হওয়া—বোধস্বরূপ হওয়া। যেখানে স্বরূপের বোধ সেখানে অস্তি-নাস্তির মধ্যের অবস্থা।'

'সে অবস্থায় কন্ট্রাডিকশনস্ মিট করে।' মাস্টারকে লক্ষ্য করল নরেন: 'সে অবস্থায় কর্ম আর কর্মত্যাগ দুইই সম্ভব।'

'অর্থাৎ সে অবস্থায়ই নিষ্কাম কর্ম।' ঠাকুর তাকালেন নরেনের দিকে: 'বুদ্ধদেবের কী মত?'

'ঈশ্বর আছে কি নেই এ নিয়ে মাথা ঘামাননি বুদ্ধ। তিনি শুধু দয়া নিয়ে ছিলেন। একটা বাজ পাখি শিকার ধরে খেতে যাচ্ছিল, তাকে বাঁচাবার জন্যে বুদ্ধ বাজ পাখিকে তাঁর গায়ের মাংস কেটে দিয়েছিলেন।' নরেন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, 'কী বৈরাগ্য! রাজার ছেলে হয়ে সব ত্যাগ করলেন। যাদের কিছু নেই, ঐশ্বর্য নেই, তারা কী ত্যাগ করবে?'

'আর কী করলেন ?' করুণোজ্জ্বল চোখে তাকালেন রামকৃষ্ণ।

'তপস্যায় সিদ্ধ হয়ে নির্বাণ লাভ করে বুদ্ধ তাঁর বাড়িতে এলেন।' সমান উৎসাহে বলতে লাগল নরেন, 'ছেলেকে, স্ত্রীকে, রাজবংশের অনেককে, বললেন বৈরাগ্য নিতে। দেখুন কী মহৎ বিত্তের রাজভাণ্ডার এনেছেন বুদ্ধ। আর এদিকে ব্যাসদেবের কাণ্ড দেখুন। শুকদেবকে বারণ করলে বৈরাগ্য নিতে। বললে, পুত্র, সংসারে থেকে ধর্ম করো।'

শ্রীরামকৃষ্ণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

'শক্তি-ফক্তি কিছু মানতেন না বুদ্ধ। তাঁর শুধু নির্বাণ। গাছতলায় তপস্যায় বসলেন, বসলেন একাসনে, আর বললেন, ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং। যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্বাণ লাভ করি ততক্ষণ, শরীর শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে যাক, উঠব না আসন ছেড়ে। আসলে,' নরেন তাকাল শশীর দিকে: 'শরীরই বদমায়েস। ওকে জব্দ না করলে কিছু হবার নয়।'

'তবে তুমি যে বলো মাংস খেলে সত্ত্বগুণ হয়।' শশী হাসল: 'খেতে বলো মাংস।'

'মাংস যেমন খেতে পারি তেমনি ছাড়তেও পারি।' বললে নরেন, 'নুন না দিয়েও খেতে পারি শুধু ভাত।'

ওয়াশিংটন থেকে স্বামীজি চিঠি লিখলেন আলাসিঙ্গাকে। আঠারোশ চুরানব্বুইয়ের সাতাশে অক্টোবর।

'গঠনমূলক কাজে আমি দক্ষ নই। ধ্যানধারণা ও স্বাধ্যায়, এসবই আমার স্বভাবের উপযোগী। আমার মনে হয় যথেষ্ট কাজ করেছি, এখন একটু বিশ্রাম চাই। আমার গুরুদেবের কাছ থেকে যা পেয়েছি, ইচ্ছে করে, তাই সবাইকে শেখাই। যে ধর্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করতে পারে না, বাপ-মা-হারা অনাথের মুখে একটুকরো রুটি দিতে পারে না, আমি সে ধর্ম সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। তত্ত্ব যত গভীর হোক, মতবাদ যত সুন্দর, যতক্ষণ তা পুঁথিতে আবদ্ধ ততক্ষণ তাকে আমি ধর্ম বলতে রাজি নই। আমাদের চোখ পিঠের দিকে নয়, সামনের দিকে। অতএব সামনে চলেও, যে উপদেশগুলো ধর্ম বলে মনে করো, তাদের জীবনে মূর্তিমন্ত করে তোলো।

আমার উপর নির্ভর কোরো না। নিজের নিজের উপর নির্ভর করতে শেখ। আমি যে সর্বসাধারণের মধ্যে উৎসাহসঞ্চারের উপলক্ষস্বরূপ হয়েছি তার জন্যে আমার মত আর সুখী কে ? তুমিও এই উৎসাহস্রোতে গা ঢালো, কোথাও ভয়ের লেশমাত্র থাকবে না।

হে বৎস, যথার্থ ভালোবাসা কখনো ব্যর্থ হবার নয়। আজ হোক, কাল হোক, পরে হোক, সত্যের জয় হবেই, প্রেমের জয় হবেই। কোথায় চলেছ ঈশ্বরকে খুঁজতে ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—এরা কি তোমার ঈশ্বর নয় ? আগে তাদের উপাসনা করো, পরে আর সব। গঙ্গাতীরে বাস করে কেন অকারণ কুয়ো খুঁড়ছ ? প্রেমের সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস-সম্পন্ন হও। নামযশের ফাঁকা চাকচিক্যে কী হবে ? খবরের কাগজ কী বলে আমি তার দিকে চোখ মেলে থাকি না। তোমার হৃদয়ে আছে তো ভালোবাসা ? তুমি সম্পূর্ণ নিষ্কাম তো ? তবে কারু সাধ্য নেই তোমার শক্তিকে রোধ করতে পারে। মানুষের জয় কিসে ? মানুষের জয় চরিত্রবলে। ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের সমুদ্রগর্ভেও রক্ষা করে থাকেন। তোমাদের মাতৃভূমি বীর সন্তান চান—তোমরা বীর হও। ঈশ্বরের সন্তান হও।

আমি ভগবানের দাস। এখানে একজন যদি আমার বিরুদ্ধে লাগে শত শত লোক আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। এখানে মানুষ মানুষের জন্যে ভাবে, কাঁদে আর এখানকার মেয়েরা দেবীস্বরূপা। যদি প্রশংসা করা যায় মূর্খরাও কাজে অগ্রসর হয়। যদি সব দিক থেকে সুবিধে হয় অতি কাপুরুষও বীরের ভাব ধারণ করে। কিন্তু প্রকৃত বীর নীরবে কাজ করে, কিছুতে আকৃষ্ট বা বিচলিত হয় না। শত শত বুদ্ধ নীরবে কাজ করে গিয়েছে বলেই জগজ্জ্যোতি বুদ্ধের প্রকাশ। প্রিয় বৎস আলাসিংগা, আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, মানুষকে বিশ্বাস করি। দীন-দরিদ্রকে সাহায্য করা, পরের সেবার জন্যে নরকে যেতে প্রস্তুত হওয়া আমি খুব বড় কাজ বলে বিশ্বাস করি। পশ্চিমের লোকেদের কথা আর কী বলব, এরা আমাকে খেতে-পরতে দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে, দিয়েছে নিবিড় বন্ধুতা। খুব গোঁড়া খৃস্টানকেও পেয়েছি সুহৃদরূপে। কিন্তু একজন পাদ্রী যদি ভারতে যায়, আমাদের লোকেরা তার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করবে? তোমরা তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করো না সে ম্লেচ্ছ। বৎস, কোনো ব্যক্তি, কোনো জাতি অপরের প্রতি ঘৃণা পোষণ করলে বেঁচে থাকতে পারে না। যখনই ভারতবাসীরা ম্লেচ্ছ কথাটা আবিষ্কার করল ও অপর জাতির সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করল তখন থেকেই ভারতের ঘোর দুর্দিনের সূত্রপাত।'

আমেরিকাতে হাজার হাজার মন্ত্রশিষ্য করেছেন স্বামীজি, আর সকলকেই প্রণবযুক্ত মন্ত্র দিয়েছেন।

'লোকে বলে প্রণবে শূদ্রের অধিকার নেই।' কে একজন বলে উঠল: 'ওরা তো ম্লেচ্ছ, ওদের প্রণব কেমন করে দিলেন? ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারু অধিকার নেই প্রণবে।'

'যাদের মন্ত্র দিয়েছি তারা যে ব্রাহ্মণ নয় তা তুই কেমন করে জানলি?' রুখে উঠলেন স্বামীজি।

'না, ভারত ছাড়া আর ব্রাহ্মণ কোথায়? ভারত ছাড়া আর সবই তো যবন আর ম্লেচ্ছের দেশ।'

'আমি যাকে যাকে মন্ত্র দিয়েছি সকলেই ব্রাহ্মণ।' গম্ভীর হলেন স্বামীজি। 'ব্রাহ্মণের ছেলেই যে ব্রাহ্মণ হয় তার মানে নেই। বাগবাজারে অঘোর চক্রবর্তির ভাইপো যে মেথর হয়েছে। মাথায় করে ময়লার হাঁড়ি নিয়ে যায়। সেও তো বামুনের ছেলে।'

'কিন্তু আমেরিকা-ইংলণ্ডে ব্রাহ্মণ কই?'

'ব্রাহ্মণ জাতি আর ব্রাহ্মণ্যগুণ দুটো আলাদা বস্তু। এদেশে সব জাতিতে ব্রাহ্মণ, ওদেশে গুণে। যেমন সত্ত্ব, রজ, তম তিনটে গুণ আছে তেমনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বলে গণ্য হবারও গুণ আছে।'

'তাহলে সাত্ত্বিক ভাবের লোকদের আপনি ব্রাহ্মণ বলছেন?'

'হ্যাঁ, তাই। যখন কেউ ভগবৎচিন্তায় বা ভগবৎপ্রসঙ্গে অবস্থান করে তখনই সে সাত্ত্বিক, তখনই সে ব্রাহ্মণ।'

'কিন্তু আমাদের কুলগুরুরা সেরকম দীক্ষাশিক্ষা দেন না কেন?'

হাসলেন স্বামীজি। বললেন, 'আমাদের গুরুঠাকুর যে মন্ত্র দেন সেটা তো তার একটা ব্যবসা। আর গুরু শিষ্যের সম্বন্ধটা কি রকম? ঠাকুর মশায়ের ঘরে চাল নেই। গিন্নি বললেন, ওগো একবার শিষ্যবাড়িটাড়ি যাও, পাশা খেললে কী আর পেট ভরবে? গুরু বললেন, হ্যাঁগো, কাল মনে করিয়ে দিও, অমুকের বেশ ভাল সময় হয়েছে শুনেছি।'

ওয়াশিংটন থেকে মেরি হেলকে স্বামীজি লিখছেন : 'কদিনের মধ্যেই ফিলাডেলফিয়াতে যাচ্ছি প্রফেসর রাইটের সঙ্গে দেখা করতে। সেখান থেকে নিউইয়র্ক। তারপর কবার বোস্টনে যাওয়া আসা। তারপর আবার ডেট্রয়েট হয়ে শিকাগো। তারপর ? তারপর ইংলণ্ডে।'

নিউইয়র্ক থেকে এলেন কেমব্রিজে, মিসেস বুলের বাড়িতে থেকে গেলেন কদিন। সেখানে মিসেস বুলের বৈঠকখানায় প্রথম ছাত্র পড়াতে শুরু করলেন। কত ছাত্রের কত দার্শনিক সমস্যার মীমাংসা হতে লাগল। কোথাও ধূম্রজাল নেই, সর্বত্র স্বচ্ছ, নির্মুক্ত নীলাকাশ।

'রোজ সকালে বেদান্ত পড়াই ছাত্রদের। বেদান্ত থেকে অন্য সব বিষয়ও এসে পড়ে।' মেরি হেলকে লিখছেন স্বামীজি : 'সকাল গড়িয়ে যায় দুপুরে, প্রায় বারোটা-একটা হয়ে যায়। একদিন স্প্যালডিংসদের ওখানে খেতে বলেছিল। গিয়েছিলাম। সেদিন আমাকে ওরা কী বিপদে ফেলেছিল, জানো ? বললে, আমেরিকানদের সমালোচনা করে বক্তৃতা দাও, তাদের বিরুদ্ধে কী বলবার আছে বলো। আমি প্রথমটা রাজি হইনি, কিন্তু আমার কোনো প্রতিবাদেই ওরা কর্ণপাত করল না। বললে, তোমার চোখে যা দোষের বলে ঠেকেছে তা তুমি কেন দেখাবে না, কেন সুযোগ দেবে না সংশোধনের ? ওদের অনুরোধের আতিশয্যে বললাম তারপর। নিশ্চয়ই আমার কথা ওদের ভালো লাগেনি, লাগতে পারে না। কেউ কি নিজের নিন্দা শুনে আনন্দিত হয়, নাকি নিজের দোষকে অবিমিশ্র দোষ বলে স্বীকার করে ? তবু বললাম, ভয় পেলাম না। আমার অনুভবে যা সত্য তা স্পষ্ট ব্যক্ত করতে পিছু হটি না কোনোদিন।'

ভারতীয় নারীর আদর্শ—এর উপর আরেক দিন বক্তৃতা দিলেন স্বামীজি। মেয়েদের অনুরোধে মেয়েদের সামনে বক্তৃতা। হিন্দু মেয়েদের চরিত্রের সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব—তিতিক্ষা ও পবিত্রতার কথা জেনে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। কী সব হীন কথাই না এতদিন প্রচার করেছে মিশনারিরা। 'আর আমার যেটুকু উজ্জ্বলতা যেটুকু উন্নতি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন', বললেন স্বামীজি, 'সব আমার মার জন্যে।'

বলে ভাষণের শেষে তাঁর মার উদ্দেশে প্রণাম করলেন স্বামীজি। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, অথচ নিজের মার প্রতি এত ভক্তি এত কাতর্য—বিদেশিনীর দল অভিভূত হল। স্বামীজির অগোচরে তারা স্বামীজির মাকে একখানা মাতা মেরী ও একখানা যীশুর ছবি পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে দিল একখানি পত্র। সে পত্র তাদের প্রণাম আর শ্রদ্ধার বাহন।

তুমিই বিশ্বজনীন মেরী আর বিবেকানন্দ তোমারই নিষ্কিঞ্চন শিশু।

৬৩

নিউইয়র্ক ব্রুকলিনে পৌঁছুলেন স্বামীজি। এথিক্যাল কালচার সোসাইটির নিমন্ত্রণে, যার সভাপতি হলেন ডক্টর লুইস জেনস, আলাপ হবার পর থেকে যিনি স্বামীজির আজীবন বন্ধু।

পাউচ ম্যানসনে বক্তৃতা দিলেন স্বামীজি। মিস্টার হিগিনস যাকে স্বামীজি 'কাজের লোক' বলে আখ্যাত করেছেন, বক্তৃতার আগে স্বামীজি সম্বন্ধে এক পুস্তিকা বিলিয়ে-

ছিলেন শ্রোতাদের মধ্যে—দেখ, দেশে-বিদেশে বক্তার সম্পর্কে কী মহৎ ধারণা, বোঝো কে দাঁড়িয়েছে তোমাদের সামনে।

'ভারতের ধর্ম' এই বিষয় নিয়ে বলছেন স্বামীজি। লাল আলখাল্লা গায়ে, মাথায় হলদে পাগড়ি, পাগড়ির বাঁধন পেরিয়ে একগুচ্ছ কালো চুল বেরিয়ে এসেছে কপালে, ভরাট মুখমণ্ডল ভাবমহিমায় প্রদীপ্ত, দুই ভাষাভরা চোখে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার উৎসাহ, বক্তৃতামঞ্চে স্বামীজিকে দেখাচ্ছিল দৈবপ্রেরিতের মত, যেন কোন পুরাণ-পুরুষ—আর কী গম্ভীরঝঙ্কৃত তাঁর কণ্ঠস্বর। কে বলবে ইংরিজি ভাষা তাঁর বিদেশী, যেমন নিখুঁত টান তেমনি নির্ভুল উচ্চারণ। অনর্গলতায় নির্ঝরপ্রপাতের মত। আর কথা শুধু কথা নয়, প্রেম আর প্রেম—শুধু প্রেমের নিরন্তর প্রস্রবণ। সম্ভ্রান্ত অথচ সরল, উত্তুঙ্গ অথচ কোমলতায় ভরা। কে না বুঝবে, কে না মানবে, কে না আমূল শিহরিত হবে!

বিষয়টা কী? বিষয়টা জলের মত সোজা। এক ধর্ম যদি সত্য হয় সব ধর্ম সত্য। এক পথ যদি পরমগন্তব্যে নিয়ে যেতে পারে সব পথই পারবে। দেশকাল নিমিত্তের জাল সরিয়ে দেখলে সবই এক বলে মনে হয়। বলছেন স্বামীজি। ওই সমগ্র জগৎ এক অখণ্ড সত্তা, সেই অখণ্ডস্বরূপই বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যখন ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাদ্দেশে আছে বলে প্রতীত হয় তখন সে ঈশ্বর। আবার যখন ধারণা হয় এই দেহ বা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে তার অবস্থান তখন সে আত্মা। এই আত্মাই মানুষের অভ্যন্তরস্থ ঈশ্বর। ঈশ্বরই একমাত্র পুরুষ, সে পুরুষ স্বয়ং সমস্ত সৃষ্টি, সমগ্র ও অবিভক্ত। সকল হাতে সে কাজ করছে, সকল মুখে খাচ্ছে, সকল নাকে শ্বাস নিচ্ছে, সকল মনে চিন্তা করছে। এই ব্রহ্মাণ্ডই তার শরীর, ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমস্ত জগতই সে। সেই দেবতা, সেই মানুষ, সেই পশু, সেই উদ্ভিদ। যে অনন্ত পুরুষ তাকে কেন খণ্ড-খণ্ড দেখাচ্ছে এ যদি প্রশ্ন করো তো বলি এ সব বিভাগ আপাতপ্রতীয়মান মাত্র। অনন্তের বিভাগ হয় কী করে! অতএব আমি তুমি অংশ মাত্র এ ভাবনা সত্য নয়। আমি মনও নই দেহও নই, আমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ। আমিই সেই আমিই সেই। এ জ্ঞানই জ্ঞান, আর বাকি সব অজ্ঞান, অজ্ঞানের ফল। আমি আবার কী জ্ঞান লাভ করব! আমিই স্বয়ং জ্ঞান-স্বরূপ। আমি আবার কী জীবন লাভ করব? আমিই স্বয়ং প্রাণস্বরূপ। জীবন আমার স্বরূপের গৌণ প্রকাশ মাত্র। আমি জীবিত, কারণ আমিই জীবনস্বরূপ সেই এক পুরুষ। এমন কোনো বস্তু নেই যা আমার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত নয়। কে মুক্তি চায়? কেউ-ই মুক্তি চায় না। আমি স্বয়ং মুক্তিস্বরূপ।

ধর্মের ক্লাশ প্রথম খোলা হল নিউইয়র্কে, একটা বাড়ির যে তেতলার ঘরে স্বামীজি থাকতেন সেই ঘরে। ব্রুকলিনে তাঁর বক্তৃতা শোনা মেয়ে-পুরুষেরাই তাঁর প্রথম ছাত্র। আর তাদের মধ্যে মিস ওয়ালডো, যার হিন্দু নাম হল হরিদাসী, সকলের অগ্রণী। মেঝেতে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছেন স্বামীজি, ছাত্র-ছাত্রীরাও তথৈবচ। ঘরের দরজা অবারিত খোলা, যে কেউ চলে আসতে পারো নির্ভয়ে। দলে-দলে আসতে লাগল জিজ্ঞাসু-পিপাসুরা, কিন্তু ঘরে যে আর তিল ধারণের স্থান নেই। না থাক, আমরা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে শুনব।

'ধর্ম কি আর ভারতে আছে?' পত্রে লিখছেন স্বামীজি: 'জ্ঞানমার্গ ভক্তিমার্গ যোগমার্গ সব পলায়ন। এখন আছেন কেবল ছুঁৎ-মার্গ, আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না। দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র। সহজ ব্রহ্মজ্ঞান। এখন ব্রহ্ম হৃদয়ে নেই গোলোকে

নেই সর্বভূতেও নেই, এখন তিনি ভাতের হাঁড়িতে। আগে মহতের লক্ষণ ছিল 'ত্রিভুবন-মুপকারশ্রেণীভিঃ প্রীয়মানঃ', এখন হচ্ছে আমি পবিত্র আর দুনিয়া অপবিত্র — লাও রুপেয়া ধরো হামারা পায়েরকা নিচে।

'ঘরে ফিরে এস।' কোথায় ঘর? আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই না, আমি লাখ নরকে যাব। বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ, বসন্তের মত লোকের কল্যাণ আচরণই আমার ধর্ম। অলস নিষ্ঠুর নির্দয় স্বার্থপর ব্যক্তিদের সঙ্গে আমি কোনো সংস্রব রাখতে চাই না। না, কিছুতে না। টাকায় কিছু হয় না, নামযশে কিছু হয় না, বিদ্যায়ও তথৈবচ, একমাত্র চরিত্রই বাধাবিঘ্নর বজ্রদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করতে পারে।'

স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ারকে লিখছেন : 'প্রত্যেক জাতির জীবনে একটি করে মূল প্রবাহ থাকে। ভারতের মূল স্রোত ধর্ম। সেই স্রোতকে প্রবল করা হোক, তবেই পার্শ্ববর্তী শাখাস্রোতগুলোও সঙ্গে সঙ্গে বহমান হবে।

এই দেশে আমার অনেক কাজ আছে। কেবল এদেশেই সাহায্যের প্রত্যাশা করতে পারি। কিন্তু এ পর্যন্ত আমার ভাববিস্তার ছাড়া আর কিছুই করতে পারিনি এখানে। এখন আমার ইচ্ছে ভাবতেও একটা চেষ্টা হোক। যা দেখছি একমাত্র মাদ্রাজেই কৃতকার্য হবার সম্ভাবনা। অনেক উৎসাহী যুবক আছে সেখানে, সকলকে আপনার কাছে সমর্পণ করছি। যদি আপনি এদের পরিচালক হন, আমার নিশ্চিত ধারণা, ওরা সফলকাম হবে। আমি জানি না কবে আমি ভারতে ফিরব। প্রভু যেমন চালাচ্ছেন তেমনি চলছি। আমি তাঁর হাতে।

এ জগতে ধন খুঁজতে গিয়ে, হে প্রভু, তোমাকেই একমাত্র ধন পেলুম। হে প্রভু, তোমার কাছে আমি নিজেকে বলি দিচ্ছি। ভালোবাসার পাত্র খুঁজতে গিয়ে তোমাকেই পেয়েছি একমাত্র ভালোবাসার পাত্র। আমি নিজেকে বলি দিলুম তোমার কাছে।'

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন স্বামীজি : 'বৌদ্ধধর্ম হিন্দু ধর্মেরই পূর্ণ পরিণতি। যীশুখৃষ্ট ইহুদি ছিলেন আর সিদ্ধার্থ ছিলেন হিন্দু। ইহুদিরা যীশুকে পরিত্যাগ করেছিল, শুধু তাই নই, ক্রুশবিদ্ধও করেছিল। আর হিন্দুরা? সিদ্ধার্থকে গ্রহণ করল, শুধু তাই নয়, তাকে পুজো করল অবতাররূপে। বুদ্ধ পূর্ণ করতে এসেছিলেন ধ্বংস করতে আসেননি। তিনি ছিলেন মহাবৈদান্তিক, কারণ, আসলে বৌদ্ধ ধর্ম বেদান্তের শাখা বা প্রশাখা মাত্র। তাই শঙ্করকে প্রায়ই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা হয়। বুদ্ধ বিশ্লেষণ করলেন আর শঙ্কর করলেন সমন্বয়। বেদ, বর্ণ, পুরোহিত বা প্রথা কোনো কিছুর কাছেই মাথা নোয়াননি বুদ্ধ। যতদূর যুক্তি নিয়ে যেতে পারে ততদূর তিনি গিয়েছেন নির্ভয়ে। এরূপ নির্ভীক যুক্তিনিষ্ঠ সত্যসন্ধানী, এরূপ জীবপ্রেমিক আর কোথায় পৃথিবীতে!'

বুদ্ধের হৃদয়ের দিকে তাকাও। একটা ছাগশিশুর প্রাণ বাঁচাতে তিনি অকাতরে নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত। দেখ কী তাঁর বিশালপ্রাণতা, তাঁর অমেয় করুণা! কয়েকটি ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন বুদ্ধ। 'আপনারা কেউ কি ব্রহ্মকে দেখেছেন?'

ব্রাহ্মণেরা উত্তর দিলেন, না। আপনাদের পিতারা দেখেছেন? তারাও না। কিংবা আপনাদের পিতামহেরা? না, সম্ভবত, তারাও না। যাকে আপনারা বা আপনাদের পিতারা বা পিতামহরা দেখেননি তার স্বরূপ-নির্ধারণে আপনারা এত ব্যস্ত কেন? প্রশ্ন করলেন বুদ্ধ। সকলে চুপ করে রইল।

এত বড় নীতিমান মানুষ আর আসেনি। সাকার ঈশ্বরে বা জীবাত্মায় বিশ্বাসী নন, সে বিষয়ে প্রশ্নও করেননি, সম্পূর্ণ সংশয়বাদী ছিলেন, কিন্তু প্রত্যেকের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, সারা জীবন অপরের কল্যাণচিন্তায় অভিভূত। বহুজনসুখায় বহুজনহিতায় তাঁর জন্ম। নিজের মুক্তির জন্যে ধ্যান করতে বসেননি, নিজের জন্যে তাঁর কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না,—জগতে এত দুঃখ কেন তারই আবিষ্কারে, তারই প্রতিকারে তাঁর সাধনা। কী অপূর্ব তাঁর বাণী। সমস্ত স্বার্থপরতা পরিহার করো। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হও। তা'হলেই আত্মজয়ে সমর্থ হবে। জগৎজয়ের চেয়ে আত্মজয় বড়। ভালো হও আর ভালো করো এই হল বুদ্ধের মর্মকথা। মৃত্যুকালে বললেন, মানুষ নিজেই নিজের উদ্ধারক। আর অন্য কেউ উদ্ধারক নেই। কী অভয়সংবাদ! মহত্তম কর্মযোগী বুদ্ধ। যেন একই কৃষ্ণ নিজের নিজের শিষ্যরূপ দেখাতে এলেন, কী ভাবে তাঁর বাণী জীবনে কর্মায়িত করতে হয়। একমাত্র সেই ধার্মিক হতে পারে, যে সাহস করে বলতে পারে, যা শক্তিশালী বুদ্ধ একদা বোধিবৃক্ষ তলে বলেছিলেন, ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং—

সামাজিক সাম্যই বুদ্ধের অসামান্য অবদান। সংস্কৃতে নয় জনগণের ভাষায় কথা বলেছেন। চতুর্দিকে শুধু মৈত্রী প্রচার করলেন। দুনিয়ার তিন-চতুর্থাংশ শুধু মৈত্রীতে ধর্মান্তরিত করলেন। বুদ্ধ-বাণীতে আছে কী ভাবে উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে ঊর্ধ্বে নিম্নে মৈত্রীধারা প্রেরণ করলেন বুদ্ধ, যতক্ষণ না সমগ্র বিশ্ব এই মৈত্রীতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। শুধু মৈত্রীতেই ব্যক্তিত্বের চরম প্রকাশ।

'কোনো ধর্মগ্রন্থে আস্থা রেখো না।' বললেন বুদ্ধ, 'বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড অমূলক। যজ্ঞ ও প্রার্থনা নিরর্থক। প্রপঞ্চাতীত নিত্য সত্তা বলে কিছু নেই। শুধু পরিবর্তন-শীল বিশ্বপ্রপঞ্চই আমরা দেখতে ও জানতে পারি। তদতিরিক্ত সত্তাস্বীকৃতি নিষ্প্রয়োজন।' যে কোনো ধর্মগুরুর চেয়ে বুদ্ধ সাহসী ও একনিষ্ঠ। বুদ্ধই প্রথম মানুষ যিনি জগৎকে সম্পূর্ণ নীতিবিজ্ঞান শিক্ষা দিলেন। বুদ্ধ ভালোর জন্যেই ভালো ছিলেন, ভালোবাসার জন্যেই ভালোবাসতেন সকলকে, সমস্ত প্রাণিলোককে।'

আরো-আরো বলছেন স্বামীজি : 'গোতম বুদ্ধের শিষ্যেরা বেদের সনাতন ভিত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন, কিন্তু পারলেন না ভাঙতে। অন্য দিকে তাঁরা ধর্ম থেকে শাশ্বত ঈশ্বর তুলে ফেলে দিলেন। সেই ঈশ্বরকে প্রত্যেক হিন্দু নরনারী প্রাণপণে আঁকড়ে ধরল। তার ফল হল এই যে বৌদ্ধধর্ম ভারতে স্বাভাবিক ভাবেই মৃত্যুবরণ করল। বেদান্তের নৈতিবাদকেই অবলম্বন করল বৌদ্ধধর্ম। কিন্তু তার শেষ সীমা পর্যন্ত গেল না। মহাযানী বৌদ্ধদের অধিকাংশই মুক্তিবাদী এবং বস্তুত বেদান্তী। হীনযানীরা শূন্যোবাদের ভক্ত। যদি বৌদ্ধরা ঈশ্বরে বা আত্মায় বিশ্বাস না করে তা'হলে কি করে তাদের ধর্ম ইন্দ্রিয়াতীত নির্বাণাবস্থা থেকে উৎপন্ন হয়? তারাও তাই এক সনাতন নৈতিক নিয়ম বা ধর্ম মানতে বাধ্য হয়েছে। সেই নৈতিক নিয়ম যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। বুদ্ধ সেই নিয়ম প্রত্যক্ষ করলেন, আবিষ্কার করলেন। তুরীয় ইন্দ্রিয়া-তীত অবস্থাই নির্বাণ। বোধিবৃক্ষ তলে সমাধিমগ্ন অবস্থায় বুদ্ধদেব সাধারণত চিত্রিত হন। ইন্দ্রিয়মনাতীত অবস্থায় পৌঁছে তিনি স্বধর্ম প্রত্যক্ষ করলেন, শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি বিচার দিয়ে নয়। বুদ্ধই বেদান্তকে অরণ্য সমাজে নিয়ে এলেন আর জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করলেন। বেদান্তের নীতি-অংশের উপরই তিনি জোর দিলেন আর শঙ্কর দার্শনিক অংশ সমৃদ্ধ করলেন। ধর্ম ব্যতীত ঐহিক বিদ্যা বিপজ্জনক। বৃহৎ বৌদ্ধ

আন্দোলনও অংশত এই জন্যে নিষ্ফল হল। ধর্মজীবনে ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ তা স্বীকার করল না, প্রাচীন ধর্মের সঙ্গে করল না সমন্বয়। কিন্তু ভারতে উপনিষদকে অমান্য করে কোনো ধর্ম টিকতে পারে না। উপনিষদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করায় ভারতভূমি থেকে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম বহিষ্কৃত হল। সাকার ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বুদ্ধ যে নিরন্তর প্রতিবাদ করলেন তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ভারতে সৃষ্টি হল মূর্তিপূজা। বেদে মূর্তিপূজা নেই। কারণ ঋষিরা সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন করতেন। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুদ্ধ কর্তৃক অস্বীকৃত হওয়ায় ভীষণ প্রতিক্রিয়া সুরু হল আর তার ফলে দেখা দিল অসংখ্য মূর্তি। যে বুদ্ধ ও যীশু ঈশ্বরের মূর্তি মানলেন না তাঁদেরই মূর্তি পূজিত হতে লাগল। মূর্তি-পূজার সীমা কাষ্ঠ ও প্রস্তর থেকে যীশু ও বুদ্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত হল। ধর্মজগতে মূর্তিপূজা থাকবেই থাকবে।'

মিস জোসেফাইন ম্যাকলিয়ড এসেছে স্বামীজির ক্লাসে। এক-আধদিন নয়, নিয়মিত।

'কোত্থেকে আস তুমি ?' একদিন জিগগেস করলেন স্বামীজি।

'হাডসন থেকে।'

'সে তো অনেক দূর তাই নয় ?'

'হ্যাঁ, প্রায় মাইল তিরিশ।'

'এত দূর থেকে আস ?'

হাসল ম্যাকলিয়ড। বললে, 'আপনাকে দেখতে আপনাকে শুনতে আরো অনেক দূর থেকে আসতে পারি।'

মিসেস রোয়েথলিস বার্জার অধ্যাত্মবাদী মানুষ, মিস ম্যাকলিয়ডের সঙ্গী। একদিন দু'জনে স্বামীজির কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল : 'একটা জিনিস শেখাবেন আমাদের ?'

'কী—?'

'কী করে ধ্যান করতে হয় ? কী প্রতীক অবলম্বন করব ?'

'ও' চিন্তা করো।' বললেন স্বামীজি, 'সাত দিন পরে আবার এস।'

সাত দিন পরে হাজির দুজনে।

'কী, কেমন দেখছ ?' জিগগেস করলেন স্বামীজি।

'একটা জ্যোতি দেখছি।' বললে মিসেস বার্জার।

স্বামীজি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন : 'খুব ভালো কথা। কোথায় দেখছ সেই জ্যোতি ?'

'বুকের মধ্যে। হৃদয়ের মধ্যে।'

'খুব ভালো। লেগে থাকো, লেগে থাকো।' অভয় আশ্বাস স্বামীজির কণ্ঠে।

ম্লান-মুখে দাঁড়িয়ে ছিল ম্যাকলিয়ড। মৃদুস্বরে বললে, 'আমার কী হবে ? আমি অত্যন্ত পার্থিব, অধ্যাত্মভাব নেই বোধহয় আমাতে।'

'বাজে কথা। পৃথিবীতে সব কিছুই আধ্যাত্মিক।' সাহসে উদ্ভাসিত হলেন স্বামীজি : 'সব সময়ে ভাববে তুমি দৈবাৎ আমেরিকান, তুমি দৈবাৎ স্ত্রীলোক, আসলে, অপরিবর্তনীয়রূপে তুমি ঈশ্বরের সন্তান, তুমি ঈশ্বর। দিনরাত নিজেকে তাই বলো, নিজেকে তাই বোঝাও। কখনো, একমুহূর্তের জন্যেও তোমার স্বরূপ ভুলে যেও না, ভুলে যেও না তুমি কে, তোমার পরিচয় কী।'

স্বামীজির সমস্ত উপস্থিতিই এক মহান উদ্দীপনা —ম্যাকলিয়ডের মধ্যে জাগল সেই

স্বরূপবোধের শক্তি। লিখছেন ম্যাকলিয়ড : 'একমাত্র শক্তিমানই সঞ্চার করতে পারেন সেই চেতনা, যেমন একমাত্র ধনীই দিতে পারে টাকা। নইলে দান তুমি শুধু কল্পনা করতে পারো, কাজে দেখাতে পারো না।'

'আধ্যাত্মিক সত্যের একমাত্র প্রমাণ প্রত্যক্ষীকরণ।' বলছেন স্বামীজি, 'প্রত্যেককে নিজে নিজে পরীক্ষা করে দেখতে হবে সেটা সত্য কিনা। যদি কোনো ধর্মাচার্য বলে, আমি এই সত্য দর্শন করেছি, কিন্তু তোমরা কোনোকালে পারবে না, তার কথা বিশ্বাস কোরো না। কিন্তু যে বলে, তোমরাও চেষ্টা করলে দর্শন করতে পারবে, কেবল তার কথা বিশ্বাস করবে।'

'যেমন ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করতে পারা যায়, তেমনি ব্রহ্মকেও মন্থনের দ্বারা প্রকাশ করতে পারা যায়। দেহটা নিম্ন অরণি, প্রণব বা ওঙ্কার উত্তর-অরণি আর ধ্যান মন্থনস্বরূপ। তা হলেই আত্মার মধ্যে যে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অগ্নি আছে তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তপস্যা দ্বারা এইটে করতে হয়। দেহকে সরলভাবে রেখে ইন্দ্রিয়গুলিকে মনে আহুতি দাও। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিকে জোর করে মনে ঢুকিয়ে দাও। তারপর ধারণার সাহায্যে মনকে ধ্যানে স্থির করো। যেমন দুধের মধ্যে সর্বত্র ঘি রয়েছে, ব্রহ্মও তদ্রূপ জগতের সর্বত্র রয়েছেন। কিন্তু মন্থন দ্বারা তিনি এক বিশেষ স্থানে প্রকাশ পান। যেমন মন্থন করলে দুধের মাখন উঠে পড়ে তেমনি ধ্যানের দ্বারা আত্মার মধ্যে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার ঘটে।'

নারসিংহাচারিয়ারকে চিঠি লিখছেন স্বামীজি : 'আমার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কে কি বলে সে দিকে আর কান দিও না। সিংহবিক্রমে কাজ করে যাও, প্রভু তোমাদের আশীর্বাদ করুন। আমার যত দিন না দেহত্যাগ হচ্ছে নিরন্তর কাজ করে যাব—আর মৃত্যুর পরেও জগতের কল্যাণের জন্যে কাজ করতে থাকব। অসত্যের চেয়ে সত্য অনন্তগুণে গুরুত্বপূর্ণ। তেমনি অসাধুতার চেয়ে সাধুতা। খবরের কাগজে হুজুগ করে ওরা আমাকে কতটা বাড়াবে? এদের উপর আমার প্রভাব এমনিতেই বেড়ে চলেছে দিন দিন। গোঁড়ারা অবশ্য চেষ্টা করেছে আমার প্রভাব কমাতে, কিন্তু, প্রভু বলছেন, তারা পেরে উঠবে না। কী করে পারবে? এ যে চরিত্রের প্রভাব, ব্যক্তিত্বের প্রভাব, সত্যের প্রভাব, পবিত্রতার প্রভাব। যতদিন ওগুলো আমার থাকবে ততদিন কোনো চিন্তা নেই, ততদিন তোমরা নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোও গে, কেউ আমার মাথার একটি চুলও স্পর্শ করতে পারবে না। বইপত্র বাজে জঞ্জাল লিখে কী হবে? লোকের অন্তর স্পর্শ করতে হলে জ্যান্ত লোকের মুখ থেকে যে জ্যান্ত ভাষা বেরোয় সেইটিই হচ্ছে প্রধান উপায়—সেই ভাষার ভিতর দিয়েই সেই ব্যক্তির ভাববিদ্যুৎপ্রবাহ অপরের প্রাণে সহজেই সঞ্চারিত হয়ে যায়। তোমরা তো এখনো ছেলেমানুষ। প্রভু আমাকে প্রতিদিনই গভীর হতে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দিচ্ছেন। কাজ করো, কাজ করো, কাজ করো। বাজে বকুনি ছেড়ে দিয়ে শুধু প্রভুর কথা কও। শত-শত ব্যক্তি এসে প্রভুর আশ্রয় নেবে—কোথায় তারা? আমি তাদের চাই, তাদের দেখতে চাই। তোমরা তো ওরকম কাউকে আমার কাছে এনে দিতে পারোনি—শুধু আমাকে নাম-যশ এনে দিয়েছ। নাম-যশ আমার কী হবে? নাম-যশ চুলোয় যাক, শুধু কাজে লাগো। সাহসী যুবকের দল, শুধু কাজে লাগো। আমার মধ্যে যে আগুন জ্বলছে তার সংস্পর্শে তোমাদের হৃদয় এখনো অগ্নিময় হয়ে ওঠেনি? এখনো আলস্য ও ভোগের পুরোনো পথেই চলেছ? দূর করে দাও আলস্য, দূর করে দাও ইহ-

লোক ও পরলোকে ভোগের বাসনা, আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ো আর যত পারো মানুষকে নিয়ে এস ভগবানের দিকে। যে আগুনে আমি জ্বলছি সে আগুনে তোমরাও জ্বলো, তোমাদের মন-মুখ এক হোক, ভাবের ঘরে ভুলেও যেন চুরি না করো, আর জগতের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে মরো বীরের মত—অহর্নিশ এই বিবেকানন্দের প্রার্থনা।'

পরে আবার লিখছেন আলাসিংগাকে : 'আমাকে ধন্যবাদ দেবার জন্যে কলকাতায় পাঁচ হাজার লোক সমবেত হয়েছিল, ভালো কথা ; কিন্তু তাদের প্রত্যেককে একটা করে পয়সা সাহায্য করতে বলো তো, বেমালুম সরে পড়বে। বালকের মত পরের উপর নির্ভর করে থাকাই আমাদের সমগ্র জাতীয় চরিত্রের লক্ষণ। যদি কেউ তাদের মুখের কাছে খাবার এনে দেয় তারা খুব খেতে প্রস্তুত, আবার কাউকে সেই খাবাব গিলিয়ে দিতে পারলে আরো ভালো হয়। আমেরিকা তোমাদের কোনো টাকা পাঠাতে পারবে না, কেনই বা পাঠাবে ? যদি তোমরা নিজেরা নিজেদের সাহায্য করতে না পারো তবে তো তোমরা বাঁচবারই যোগ্য নও। তুমি যে লিখেছ, আমেরিকার কাছ থেকে বছরে কয়েক হাজার টাকার নিশ্চিন্ত ভরসা করা যেতে পারে কিনা তাই পড়ে আমি একেবারে নিরাশ হয়েছি। তোমরা এক পয়সাও পাবে না। সব টাকা তোমাদের নিজেদেরই যোগাড় করতে হবে। জনসাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে আমার যে কল্পনা ছিল আমি উপস্থিত তা ছেড়ে দিয়েছি। এ আস্তে আস্তে হবে। এখন আমি চাই এক অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত প্রচারকের দল। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা, সংস্কৃত ও কয়েকটি পাশ্চাত্য ভাষা এবং বেদান্তের বিভিন্ন মতবাদ শেখাবার জন্যে মাদ্রাজে একটি কলেজ করতেই হবে। কলেজের মুখপত্র-স্বরূপ ইংরিজি ও দিশি ভাষায় কাগজ হবে, সংগে সংগে ছাপাখানা। এর মধ্যে একটা কিছু করো—তা'হলে জানব তোমরা কিছু করেছ—শুধু আমাকে আকাশে তুলে দিয়ে প্রশংসা করলে কিছু হবে না। আমি দেখতে চাই আমার ভাবগুলি কাজে পরিণত হয়। সকল মহাপুরুষের চেলারাই চিরকাল গুরুর উপদেশের সংগে গুরুটিকে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ফেলেছে—শেষকালে গুরুটিকে রেখে তার ভাবগুলোকে নষ্ট করে দিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের এ রকম কাজ না করে সর্বক্ষণ থাকতে হবে সতর্ক।'

৬৪

মিসেস বুলের বাবার খুব অসুখ।

মিসেস বুলকে লিখছেন স্বামীজি : 'সবাই ভেবেছিল ব্রুকলিনের অধিবাসীরা প্রাচ্য দর্শন কিছু বুঝতে পারবে না। তোমায় কী-বলব, ব্রুকলিনের প্রায় আটশো লোক, সবাই সম্ভ্রান্ত ও বিদগ্ধ, আমার গত রবিবারের বক্তৃতায় উপস্থিত ছিল, আর যারা ফল সম্বন্ধে আগে সন্দিহান ছিল, এখন তারাই আমাকে নিউইয়র্কে নিয়ে গিয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেওয়ার কথা ভাবছে। যা সম্বর্ধনা পেলাম ব্রুকলিনে তা আশাতীত। এ আমার প্রভুর আশীর্বাদ ছাড়া আর কী ! কিন্তু মিস থার্সবির নিউইয়র্কে ফিরে না আসা পর্যন্ত সেখানে আমার যাওয়ার তারিখ ঠিক হতে পাচ্ছে না। যিনি এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী তিনি মিস ফিলিপস, আর তাঁর সমস্ত কাজে মিস থার্সবিই দক্ষিণহস্ত। সবচেয়ে বড় কথা, ডক্টর জেনস যোগ দিয়েছেন সম্বর্ধনায়। আমি এখানে একটা নতুন গাউন কেনবার

চেষ্টায় আছি। বারে বারে ধোয়ানোতে পুরোনো গাউনটা কুঁচকে গেছে, ওটা পরে আর বেরুনো যায় না। আশা করি আপনার বাবা ভালো হয়ে উঠছেন। মিস্টার ও মিসেস গিবনসকে, মিস ফার্মার আর মিস কুরিংকে আমার ভালোবাসা দেবেন। ব্রুকলিনে দেখা হয়েছিল মিস কুরিং-এর সঙ্গে। ইতি। স্নেহের বিবেকানন্দ।'

মিসেস বুলের বাবা মারা গেলেন। খবর পেয়ে স্বামীজি লিখছেন মিসেস বুলকে : 'আসা যাওয়া ভ্রম মাত্র। আত্মা কখনো আসেও না, যায়ও না। যখন সমস্ত দেশ আত্মার মধ্যেই রয়েছে তখন আর জায়গা কোথায় যে আত্মা সেখানে যাবে? যখন সমস্ত কাল আত্মাতেই রয়েছে তখন ওর মধ্যে ঢোকবার বা ওকে ছাড়বার সময়ই বা কোথায়! পৃথিবী ঘুরছে আর তার ঘোরাতেই এই ভুল হচ্ছে যে সূর্য ঘুরছে। কিন্তু আসলে সূর্য ঘুরছে না। তেমনি প্রকৃতি বা মায়া বা স্বভাব ঘুরছে, পরিণামপ্রাপ্ত হচ্ছে, আবরণের পর উন্মোচন করছে আবরণ, মহান গ্রন্থের পাতা উলটে যাচ্ছে ক্রমাগত, কিন্তু সাক্ষিস্বরূপ আত্মা অবিচলিত ও অপরিণামী হয়ে বিরাজ করছেন, বিভোর হয়ে আছেন আত্মজ্ঞানের অমৃত পান করে।'

আরো লিখছেন : ঈশ্বর প্রত্যেক জীবাত্মার মূলস্বরূপ, যথার্থস্বরূপ, প্রত্যেকের প্রকৃতব্যক্তিত্ব। কতগুলো জীবাত্মারূপে তারা আমাদের দৃষ্টির অতীত দেশে চলে গিয়েছে, তাঁদের খুঁজতে গিয়েই আমাদের ধর্মের আরম্ভ হয়েছে। আর এই খোঁজ তখুনি শেষ হল যখন তাঁদের সকলকে ভগবানের মধ্যেই পেলাম। শুধু তাঁদের নয় আমাদেরকেও পেলাম। সুতরাং আসল কথা হচ্ছে যে, আপনার বাবা যে জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করেছিলেন তা ত্যাগ করেছেন আর অনন্ত কাল যেখানে ছিলেন সেখানেই রয়ে গেছেন।'

ক্যাটসকিল অঞ্চলে একশো এক একর জমি পাওয়া যায়, মাত্র দুশো ডলারে। স্বামীজির ইচ্ছে সে জমিটা কিনে নেন। নিজের নামে তো কিনতে পারেন না, তাই মিসেস বুল যদি রাজি হন, কেনা যায় তাঁর বেনামিতে। মিসেস বুলের মত আর কে আছেন বন্ধু?

লিখছেন নিউইয়র্ক থেকে : 'প্রাণ ঢেলে খেটেছি। যদি আমার কাজের মধ্যে সত্যের বীজ কিছু থেকে থাকে তবে কালে তা অঙ্কুরিত হবেই। অতএব আমি সর্বভাবেই নিশ্চিন্ত। বক্তৃতা আর অধ্যাপনাতেও আমার বিতৃষ্ণা এসে যাচ্ছে। এপ্রিলের শেষাশেষি আমি ইংলণ্ডে যাব ভাবছি। সেখানে কয়েক মাস কাজ করবার পর ভারতে ফিরে গিয়ে কয়েক বছর—কে জানে, হয়তো বা চিরতরে—গা-ঢাকা দেব। আমি যে নিষ্কর্মা সাধু হয়ে থাকিনি এই আমার তৃপ্তি। আমার একটি খাতা আছে, আমার সঙ্গেই সে ঘুরছে, কখনো-কখনো ও আমার মনের কথা ধরে রাখে। দেখতে পাচ্ছি, সাত বছর আগে সে-খাতায় লেখা রয়েছে—'এবার একটি একান্ত স্থান খুঁজে নিয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পড়ে থাকব।' তা আর হল কই, এ সব কর্মভোগ যে বাকি ছিল। আমার বিশ্বাস, এবার কর্মক্ষয় হয়েছে, ভগবান আমাকে প্রচারকার্য তথা শুভ-কর্মের বন্ধনবুদ্ধি থেকে অব্যাহতি দেবেন। আত্মাই এক, অখণ্ড সত্তাস্বরূপ, আর সব অসৎ—এই জ্ঞান হয়ে গেলে আর কি কোনো যুক্তি বা বাসনা মানসিক চাঞ্চল্যের কারণ হতে পারে? মায়ার প্রভাবেই পরোপকার করা ইত্যাদি খেয়ালগুলো আমার মাথায় ঢুকেছিল, এখন আবার সরে যাচ্ছে। চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তকে জ্ঞানলাভের উপযোগী করা ছাড়া কর্মের যে আর কোনো সার্থকতা নেই এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস এখন দৃঢ়ীভূত।'

একাকী বিচরণ করো, একাকী বিচরণ করো। স্বামীজির এখন আবার সেই আকুতি। 'নিরবচ্ছিন্ন চিরপ্রশান্তি আর বিশ্রামের জন্যে আমার হৃদয় তৃষিত।' সেই তো ভগবানের প্রিয় যে কাউকে উদ্বিগ্ন করে না, যাকে কেউ বা পারে না উদ্বিগ্ন করতে। যে একাকী থাকে তার সঙ্গে কারু বিরোধ নেই। 'হায় যদি পেতাম আবার সেই কৌপীন আর কমণ্ডলু, সেই মুণ্ডিত মস্তক, সেই তরুতলে শয়ন আর ভিক্ষান্নে জীবিকা।' লিখছেন ওলি বুলকে : 'আসলে ও সবই এখন আমার আকাঙ্ক্ষার বস্তু। শত অপূর্ণতা সত্ত্বেও সেই ভারতবর্ষই একমাত্র স্থান যেখানে মানুষ মুক্তির সন্ধান ভগবানের সন্ধান পায়। পাশ্চাত্যের আড়ম্বর অন্তঃসারশূন্য ও আত্মার বন্ধনস্বরূপ। জীবনে আর কখনো এর চেয়ে তীব্রভাবে জগতের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিনি। ভগবান সকলের বন্ধন ছিন্ন করে দিন, সকলেই মায়ামুক্ত হোন, এই বিবেকানন্দের চিরন্তন প্রার্থনা।'

নিউইয়র্কে ল্যাণ্ডসবার্গের বাড়িতে আছেন স্বামীজি, ৩৩ নং রাস্তা, পশ্চিমে ৫৪ নং বাড়ি। কখনো বা গার্নিদের বাড়িতে শুতে যান। কখনো বা নিজের হাতেই রান্না করে খান। যদি কেউ দেখা করতে আসে তবেই কিছু বলেন ঈশ্বরকথা। 'এইরকম ভাবে থেকে বোধ হচ্ছে আমি যেন বেশ সন্ন্যাসীর ভাবে দিন কাটাচ্ছি, আমেরিকায় এসে পর্যন্ত এমনটি আর অনুভব করিনি।'

লিওন ল্যাণ্ডসবার্গ, রাশিয়ান ইহুদী, নিউইয়র্কের প্রসিদ্ধ দৈনিকপত্রের সহকারী সম্পাদক, স্বামীজির শিষ্যত্ব নিয়ে নাম নিল কৃপানন্দ স্বামী আর ফরাসিনী মারি লুইস নাম নিল স্বামী অভয়ানন্দ। তা ছাড়া ঠিক সন্ন্যাস না নিলেও স্বামীজির ভক্ত হয়ে দাঁড়াল অগণন গুণী-জ্ঞানী, ডক্টর আলান ডে, ডক্টর স্ট্রিট, প্রফেসর ওয়াইম্যান আর রাইট আর জেমস, মিঃ আর মিসেস ফ্রান্সিস লেগেট, মিস ম্যাকলিয়ড, বৈজ্ঞানিক নিকোলাস টেসলা, গায়িকা মাদাম কালভে আর অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ড—'ডিভাইন সারা'। আরো কত ভক্ত মুগ্ধ অনুরক্ত।

বিরুদ্ধকারীরাও নির্মূল হচ্ছে না। সেদিন মিস থার্সবির বাড়িতে এক প্রেসবিটেরিয়ান ভদ্রলোকের সঙ্গে তুমুল তর্ক হল স্বামীজির। শেষকালে ভদ্রলোক গালাগাল দিতে শুরু করল। স্বামীজিও ক্রুদ্ধ-কর্কশ হয়ে উঠলেন। দীন-হীনের মত হার স্বীকার করলেন না।

মিসেস বুল ভর্ৎসনা করলেন স্বামীজিকে। তর্ক করা কি তোমার কাজ? না কি উদ্ধতকে শাসন করা? এ সব বিবাদ-বিরোধ তোমার পক্ষে তোমার কাজের পক্ষে হানিকর। যখন হাতি বাজারের মধ্য দিয়ে চলে যায় পিছু-পিছু কুকুর চেঁচায় কিন্তু হাতি ফিরেও তাকায় না।

'সেই তর্ক ও ভর্ৎসনার ফলে আমি স্পষ্ট বুঝেছি প্রভু কেন সন্ন্যাসীদের একা থাকতে একা চলতে বলে গেছেন।' মিস মেরি হেলকে লিখছেন স্বামীজি : 'বন্ধুত্ব বা ভালোবাসা মাত্রই বন্ধন—বন্ধুত্বে, বিশেষত স্ত্রীলোকদের বন্ধুত্বে চিরকালই দেহি-দেহি ভাব। যাকে কোনো বিশেষ ব্যক্তির দিকে বারে বারে ফিরে-ফিরে তাকাতে হয়, সে কি করে সত্যরূপ ঈশ্বরের সেবা করবে? হৃদয়, শান্ত হও, নিঃসঙ্গ হও, তা হলেই প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন। জীবন কিছুই নয়, মৃত্যুও ভ্রমমাত্র। এই সব যা কিছু দেখছ কারুই কোনো অস্তিত্ব নেই, আছেন বলতে একমাত্র ঈশ্বরই আছেন। হৃদয়, ভয় পেয়ো না, নিঃসঙ্গ হও। বিবিক্তসেবী হও। বোন, পথ দীর্ঘ, সময় অল্প, আবার সন্ধেও আসছে

ঘনিয়ে। আমাকে শিগগিরই ঘরে ফিরতে হবে। আমার আর আদবকায়দা পরিপাটি করবার সময় নেই। আমি যা বলতে এসেছি তাই যেন বলে যেতে পারি।'

আরো লিখছেন: 'ধর্মের নামে দোকানদারিকে আমি ঘৃণা করি। সংসারের ক্রীতদাসেরা কী বলছে তা দিয়ে আমি আমার বিচার করব? বোন, তুমি সন্ন্যাসীকে চেন না। বেদ বলেন, সন্ন্যাসী বেদশীর্ষ, কারণ সে মন্দির, ধর্মমত, ঋষি বা শাস্ত্র কারুরই ধার ধারে না। তাই মিশনারিরা যথাসাধ্য চেঁচাক, যথাসাধ্য কাদা ছুঁড়ুক, আমি তাদের গ্রাহ্য করি না। আমাদের ভর্তৃহরি বৈরাগ্যশতকে কী বলছেন? বলছেন, এ কি চণ্ডাল, না ব্রাহ্মণ, না শূদ্র, না তপস্বী, না বা তত্ত্বজ্ঞানী কোনো যোগীশ্বর? নানা জনে নানা কল্পনা-জল্পনা করছে, কিন্তু যে যাই বলুক আর ভাবুক, যোগীরা আপনমনে চলে যায়, তারা রুষ্টও হয় না। তুষ্টও হয় না।'

চিঠি শেষ করছেন এই বলে: 'ঈশ্বর তোমাদের কৃপা করুন। এই জগৎ নামক বৃহৎ ভুয়োবাজির থেকে রক্ষা করুন তোমাদের। তোমরা যেন এই জগৎরূপ জীর্ণ ডাইনির কুহকে না পড়ো। শঙ্কর তোমাদের সহায় হোন। উমা তোমাদের সামনে সত্যের দুয়ার খুলে দিন। তোমাদের সকল মোহ অপনোদন করুন।'

হে শিব, হে জগদ্দীপাকার, হে নৃকরোটিপরিকর, তোমার আট নাম। ভব, শর্ব, রুদ্র, উগ্র, পশুপতি, মহাদেব, ভীম আর ঈশান। প্রত্যেকটি নামের তাৎপর্য বোঝবার জন্যে বিভিন্ন বেদের প্রয়োজন। হে সকলগুণবরিষ্ঠ, তোমাকে নমস্কার। তুমি নেদিষ্ঠ, নিকটস্থ, তোমাকে নমস্কার। তুমি দবিষ্ঠ, দূরস্থ, তোমাকে নমস্কার। হে স্মরহর, তুমি ক্ষোদিষ্ঠ, ক্ষুদ্রতম; তুমি মহিষ্ঠ, তুমি মহত্তম, তোমাকে নমস্কার। হে প্রচণ্ডতাণ্ডব, তুমি বহিষ্ঠ, বৃদ্ধতম, তুমি যবিষ্ঠ, যুবতম, তোমাকে নমস্কার। হে শবভস্মবিলেপন, দারিদ্র্যদুঃখদহন, তোমাকে নমস্কার। হে মা উমা, আমি মন্ত্র জানি না, যন্ত্র জানি না, স্তব জানি না, আহ্বান জানি না, স্তুতিকথা জানি না, মুদ্রাবিধি জানি না, বিলাপ করতেও জানি না, শুধু এইটুকু জানি তোমার অনুসরণই আমার ক্লেশহরণ। হে সকলোদ্ধারিণি শিবে, আমি অর্চনা জানি না। শুধু তাই নয়, আমি নিরর্থক আলস্যহেতু কর্তব্যানুষ্ঠানেও অশক্ত, মা, আমাকে ক্ষমা করো। কুপুত্র হতে পারে কুমাতা হয় না। হে শশিমুখি, আমার মোক্ষকামনা নেই, বিভববাঞ্ছা নেই, নেই সুখেচ্ছা বা বিজ্ঞানাপেক্ষা। হে জননী, মৃড়ানী রুদ্রানী শিবানী ভবানী—তোমার এই সব নাম করেই যেন এ জন্ম চলে যায়। হে করুণার্ণবেশ্বরী, আমি বিপদ সাগরে মগ্ন হয়ে তোমাকে স্মরণ করছি। ক্ষুধাতৃষ্ণার্ত সন্তানই মাকে স্মরণ করে।

মাতর্মাতর্নমস্তে দহ দহ জড়তাং দেহি বুদ্ধিং প্রশস্তাং।

হে বিশ্বমূর্তে, আত্মন, তুমি কাঁদছ কেন? কিন্নাম রোদিষি ত্বয়ি বিশ্বমূর্তে। তোমাতেই তো সর্বশক্তি বর্তমান। তোমাকে কোন সীমা আবদ্ধ করবে? ভগবন অখিল তোমার পাদমূলে। নির্গচ্ছতু জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী। সংসারজাল ছিঁড়ে পিঞ্জরমুক্ত কেশরীর মত বেরিয়ে এস।

বৈকুণ্ঠ সান্ন্যালকে লিখছেন স্বামীজি নিউইয়র্ক থেকে: পরমহংসদেব আমার গুরু ছিলেন, আমি তাঁকে যাই ভাবি, দুনিয়া তা ভাববে কেন? এবং সেটা চাপাচাপি করলে সব ফেঁসে যাবে। গুরুপূজার ভাব বাঙলা দেশ ছাড়া অন্যত্র আর নেই, অন্য লোকে সে ভাব নেবার জন্য প্রস্তুত নয়।

সে সব দিনের কথা মনে পড়ে। গিরিশ ঘোষকে বললে ডাক্তার সরকার, 'আর সব করো কিন্তু দয়া করে ঈশ্বর বলে পূজো কোরো না। এমন ভালো লোকটার মাথা খাচ্ছ তোমরা।'

'কিন্তু কি করি?' গিরিশ বললে তন্ময়স্বরে, 'যিনি সংসারসমুদ্র ও সন্দেহসাগর থেকে পার করলেন তাঁকে আর কি করব বলুন।'

'বা, আমি কি আর এঁর পায়ের ধুলো নিতে পারি না? খুব পারি। এই দেখ নিচ্ছি।' বলে নত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ের ধুলো নিল ডাক্তার।

'দেবতারা এই মুহূর্তে স্বর্গ থেকে ধন্য ধন্য করছেন।' গিরিশ বললে উদ্বেল হয়ে।

'তা পায়ের ধুলো নেওয়া, এ আর বেশি কি কথা! আমি সকলেরই পায়ের ধুলো নিতে পারি। এই দাও। এই দাও' সকলের পায়ের কাছে প্রণত হতে লাগল ডাক্তার।

নরেন বললে, 'এঁকে আমরা ঈশ্বরের মত মনে করি। নরলোক ও দেবলোক এ দুয়ের মধ্যে একটি স্থান আছে যেখানে বলা কঠিন ইনি মানুষ না ঈশ্বর।'

'ঈশ্বরের কথায় উপমা চলে না।'

'আমি ঈশ্বর বলছি না, ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তি বলছি।' নরেন বললে দৃঢ়স্বরে।

'ও সব নিজের নিজের ভাব চাপতে হয়।' বললে ডাক্তার, 'প্রকাশ করা ভালো নয়। আমার ভাব কেউ বুঝলে না। সবাই আমাকে কঠোর নির্দয় মনে করে। এই তোমরা হয়তো আমাকে জুতো মেরে তাড়াবে।'

'সে কি?' শ্রীরামকৃষ্ণ অস্থির হয়ে উঠলেন: 'তোমাকে এরা কত ভালোবাসে। তুমি আসবে বলে বাসক-সজ্জা করে জেগে থাকে।'

'সকলেই প্রাণ দিয়ে শ্রদ্ধা করে আপনাকে।' বললে গিরিশ।

'কিন্তু আমার ছেলে, আমার স্ত্রী পর্যন্ত, আমাকে মনে করে, হার্ড-হার্টেড, দয়ামায়াশূন্য।' বললে ডাক্তার, 'কেননা আমার দোষ এই যে আমি কারু কাছে ভাব প্রকাশ করি না।'

'তবেই বুঝুন একটু-আধটু প্রকাশ করা ভালো, নইলে দেখছেন তো, লোকে ভুল বোঝে।' গিরিশ টিপ্পনী ঝাড়ল।

'বলবো কি।' ডাক্তার প্রায় বিহ্বল হলেন: 'তোমাদের চেয়েও বেশী আমার ভাব হয়।' নরেনকে লক্ষ্য করল ডাক্তার: 'একলা একলা বসে কাঁদি। আই শেড টিয়ার্স ইন সলিটিউড।'

কতক্ষণ চুপচাপ বসে রইল সবাই।

ডাক্তার শ্রীরামকৃষ্ণকে বললে, 'ভাব হলে তুমি লোকের গায়ে পা দাও এটা ভালো নয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসলেন। বললেন, 'আমি কি জানতে পারি গা কারু গায়ে পা দিচ্ছি কিনা।'

'না, ওটা যে ভালো নয় এটা তো অন্তত বোঝ।'

'ঈশ্বরের ভাবে আমার উন্মাদ হয়।' বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'কি হয় তোমাকে কি বলব। সে অবস্থার পর মনে হয়, বুঝি রোগ হচ্ছে ঐ জন্যে।'

'যাক, মেনেছেন।' যেন আশ্বস্ত হল ডাক্তার: 'কাজটা যে অন্যায় এ জ্ঞান আছে। দুঃখ প্রকাশ করছেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। নরেনকে বললেন, 'তুই তো খুব বুদ্ধিমান, তুই বল না, একে দে না বুঝিয়ে।'

নরেনের আগে গিরিশই এগিয়ে এল। বললে, 'আপনার ভুল হচ্ছে মশাই। মোটেই উনি তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছেন না। এঁর দেহ শুদ্ধ, পাপস্পর্শহীন। ইনি জীবের মঙ্গলের জন্যে জীবকে স্পর্শ করেন। তাদের পাপ গ্রহণ করে এঁর রোগ হবার সম্ভাবনা, কখনো কখনো সেই কথাটা ভাবেন। আপনার যখন কলিক হয়েছিল তখন কি আপনার দুঃখ হয়নি কেন রাত জেগে অত পড়তুম! তা বলে রাত জেগে পড়াটা কি অন্যায় কাজ? রোগের জন্যে দুঃখ-কষ্ট হতে পারে, তাই বলে জীবের মঙ্গল করবার জন্যে স্পর্শ করাকে অন্যায় কাজ বলবেন না।'

ডাক্তার অপ্রতিভ হয়ে গেল। বললে, 'তোমার কাছে হেরে গেলুম। দাও পায়ের ধুলো দাও।' গিরিশের পা ছুঁলো ডাক্তার: 'আর যাই হোক, তোমার বুদ্ধিকে মানতে হবে।'

'আর এক কথা দেখুন।' বললে নরেন, 'একটা বৈজ্ঞানিক সত্যকে আবিষ্কার করবার জন্যে আপনি আপনার জীবন উৎসর্গ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে শরীরের অসুখ-বিসুখ কিছুই মানেন না। তেমনি ঈশ্বরকে জানা শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞান, গ্র্যাণ্ডেস্ট অফ অল সায়েন্সেস, তার জন্য ইনি হেলথ রিস্ক করবেন না? শরীর নষ্ট হয় হোক এমনি ভাব করবেন না?'

'যত ধর্মাচার্য হয়েছে', বললে ডাক্তার, 'যীশু চৈতন্য বুদ্ধ মহম্মদ, শেষকালে সবাই অহঙ্কারে পূর্ণ, বলে, আমি যা বললুম তাই ঠিক। এ কি কথা!'

'সে দোষ আপনারও হচ্ছে।' গিরিশ বললে, 'তাঁদের সকলের অহংকার হচ্ছে আপনি একলা তাঁদের এই দোষ ধরাতে, ঠিক সেই দোষ আপনারও হচ্ছে।'

শান্ত গাঢ় স্বরে নরেন বললে, 'এঁকে আমরা পূজা করি। সে পূজা ঈশ্বরপূজার কাছাকাছি।'

আনন্দময় বালকের মত হাসছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

কদিন পরে আলাসিংগাকে আবার লিখছেন স্বামীজি: 'তোমরা লোককে পিড়াপিড়ি করে রামকৃষ্ণের নাম প্রচার করতে যেও না। আগে ভাবটা দাও, ঐ ভাবটা গ্রহণ করলেই লোকে যার ভাব সেই লোকটাকে মানবে, যদিও আমি জানি জগৎ চিরকালই আগে মানুষটাকে মানে তারপর তার ভাবটা নেয়। প্রভুকে প্রচার করে যাও, সামাজিক কুসংস্কার বা গলদ সম্বন্ধে ভালোমন্দ কিছু বোলো না। হতাশ হয়ো না, গুরুর উপর বিশ্বাস হারিও না, ভগবানের উপর বিশ্বাস হারিও না। হে বৎস, যতক্ষণ তোমার এই তিনটি জিনিস আছে কেউই তোমার অনিষ্ট করতে পারবে না। কাজ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকুক। রোম নগর একদিনে নির্মিত হয়নি। মহীশূরের মহারাজার দেহত্যাগ হল, তিনি আমাদের অন্যতম আশার স্থল ছিলেন। যাই হোক, প্রভুই মহান, তিনি আবার লোক পাঠাবেন আমাদের সাহায্য করতে।'

৬৫

ম্যাডিসন এভিনিউ দিয়ে হাঁটছিল একটি মেয়ে। একটা বাড়ির জানলায় ছোট একটা বিজ্ঞাপন ঝুলছে, তার দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। আগামী রবিবার বেলা তিনটের

সময় স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দেবেন—বিষয় : বেদান্ত কী। পরের রবিবার আবার একটা বক্তৃতা। বিষয় : যোগ কী!

বাড়িটার নাম হল্‌ অফ দি ইউনিভার্সাল ব্রাদারহুড। হল্‌ বলতে দোতলায় ছোট একটা ঘর, যাতে পৌঁছুতে একটা মাত্র সিঁড়ি, শ্রোতা আর বক্তার আগম-নির্গমের ওই একটাই মোটে রাস্তা। নির্ধারিত সময়ের প্রায় আধঘণ্টা আগেই পৌঁছুল সেই মেয়ে। ঘরজোড়া বেঞ্চি পাতা, পিছনের দিকে ছোট মঞ্চ, তাতে একটা ডেস্ক আর চেয়ার বসানো। তিনটে বাজতে না বাজতে সমস্ত ঘর বোঝাই হয়ে গেল, সিঁড়িতে পর্যন্ত দাঁড়িয়ে গেল লোক,—সিঁড়িতে কী—নিচের তলায়ও ভিড় জমল। না দেখি, যদি শুনতে পাই সে মেঘমন্দ্রের আভাস! যদি সমীরের একটু কম্পন এসে প্রাণে লাগে!

হঠাৎ দশদিক স্তব্ধ হয়ে গেল। সিঁড়িতে শোনা যাচ্ছে কার ধীর পায়ের শব্দ। স্বামীজি আসছেন। ঋজুতার মহিমান্বিত মূর্তি, স্বামীজি এসে দাঁড়ালেন মঞ্চে। রুদ্ধনিশ্বাসে কক্ষে তার কণ্ঠস্বর বেজে উঠল গম্ভীরে। তিনি বলতে লাগলেন, বলতে লাগলেন আর জনতার মধ্যে থেকেও সেই একাকিনী মেয়ে অনুভব করল, সময় বলে কিছু নেই, স্থান বলে কিছু নেই, অতীত-ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই—শুধু শূন্যের প্রান্তরে এক শব্দ-স্রোত বয়ে চলেছে, আকাশে উড়ে চলেছে এক মহাসংগীতের বিহঙ্গম। আমি কে, কোথায় আমার দেশ, কী আমার ধর্ম, কী আমার ভাষা, সব হিসেব লুপ্ত হয়ে গিয়েছে সহসা। যেন কোন রহস্যপুরীর লৌহদ্বার সেই শব্দঝঙ্কারে খুলে গিয়েছে, যেন কোন অশেষের দেশের দিগন্তকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যেন আরম্ভ আছে শেষ নেই, যেন পথ আছে প্রান্ত নেই। চারিদিকে শুধু অনন্তের উৎসব, অনন্তের নিমন্ত্রণ।

আর স্বামীজি অনন্তের ঋষি। আবার কখন স্তব্ধ হয়ে গেল চারিদিক। কোথায় তলিয়ে গিয়েছিল মেয়ে, চম্‌কে উঠে চোখ চাইল। বক্তৃতা কখন সাঙ্গ হয়ে গেছে। ঘর শূন্য। কখন সব চলে গিয়েছে লোকজন। না, শুধু তিনজন আছেন। সভার যিনি উদ্যোক্তা সেই গুডইয়ার আর তার স্ত্রী। আর স্বয়ং স্বামীজি। না, আরো একজন আছে। সে সেই মেয়ে। উত্তরকালে সিস্টার দেবমাতা। স্বামীজির পদমূলে একটি প্রফুল্ল প্রণতি।

বেদান্ত কী? আমিই সেই, এক কথায় তাই বেদান্ত। আত্মার সম্বন্ধে জন্ম বা মৃত্যুর কথা বলা পাগলামি। আত্মা কখনো জন্মায়নি, কখনো মরেও না। তাই আমি মরব, আমি মরতে ভীত, এ সব কুসংস্কারমাত্র। এ আমি করতে পারি বা পারি না এও কুসংস্কার। আমি সব করতে পারি। বেদান্ত মানুষকে প্রথমে আপনাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলে। যে ব্যক্তি নিজেকে নিজে বিশ্বাস না করে, বেদান্ত মতে সেই নাস্তিক। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শক্তি আগে থেকেই রয়েছে আমাদের মধ্যে। আমরা নিজেরাই নিজেদের চোখে হাত চাপা দিয়ে 'অন্ধকার', 'অন্ধকার' বলে চেঁচিয়ে মরছি। হাত সরিয়ে নাও, দেখবে প্রথম থেকেই ওখানে আলো ছিল। কখনোই অন্ধকার ছিল না, কখনোই দুর্বলতা ছিল না, আমরা নির্বোধ বলেই চিৎকার করেছি, আমরা দুর্বল, আমরা অপবিত্র। যখনই আমরা নিজেদের ক্ষুদ্র মর্ত্য জীব বলি তখনই মিথ্যা বলি, তখনই যেন জাদুবলে নিজেকে অসৎ, দুর্বল, দুর্ভাগ্য বানিয়ে ফেলি।

এককথায় বেদান্তের আদর্শ—জগতে মনুষ্যোপাসনা। যদি তুমি ব্যক্ত ঈশ্বর-স্বরূপ তোমার ভাইকে উপাসনা করতে না পারো তবে বেদান্ত তোমার উপাসনায় বিশ্বাস করে

না। যে ভাইকে তুমি দেখছ তাকে যদি ভালো না বাসতে পারো তবে যাকে কখনো দেখনি তাকে কি করে ভালোবাসবে? যদি ঈশ্বরকে মানুষের মুখে না দেখতে পাও তবে তাকে মেঘে বা কোনো মৃত জড়ে বা তোমার নিজ মস্তিষ্কের কল্পিত গল্পে কি করে দেখবে? যখন সর্বভূতকে ঈশ্বররূপে দেখবে তখন যা কিছু তোমার কাছে আসবে, দেখবে সেই অনন্ত আনন্দময় প্রভুই নানারূপে আসছেন। আমাদের আপন আত্মাই খেলা করছে আমাদের সঙ্গে।

আর যোগ কী? আমরা হ্রদের তলদেশ দেখতে পাই না কারণ তার উপরিভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে আবৃত। যখন সমস্ত তরঙ্গ শান্ত হয়ে জল স্থির হয় তখনই কেবল তার তলদেশের ক্ষণিক দর্শন পাওয়া সম্ভব। যদি জল ঘোলা থাকে বা চঞ্চল থাকে তখন তলদেশ দেখা যাবে না কিছুতেই। যদি জল নির্মল হয় প্রশান্ত হয় তবেই দেখতে পাব তলদেশ। হ্রদের তলদেশই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ. হ্রদ চিত্ত আর তার তরঙ্গই বৃত্তি। চিত্তকে নানা প্রকার বৃত্তি বা আকার বা পরিণাম গ্রহণ করতে না দেওয়াই যোগ।

তাছাড়া, দেখা যাচ্ছে, মন তিনভাবে অবস্থান করে। প্রথম অবস্থা, অন্ধকার, তমঃ, যেমন পশু বা মূর্খ-মূঢ়ের মন। সে মনের কাজ শুধু অন্যের অনিষ্ট করা। দ্বিতীয় ক্রিয়াশীল অবস্থা, রজঃ, এ অবস্থায় কেবল প্রভুত্ব ও ভোগের ইচ্ছাই বলবান। আমি ক্ষমতাশালী হব ও অন্যের উপরে প্রভুত্ব করব—শুধু এই ভাব। তৃতীয়, যখন সমস্ত প্রবাহ স্থির, হ্রদের জল অনাবিল, তখন সে অবস্থার নাম সত্ত্ব বা শান্ত। সেটা জড়াবস্থা নয়, সেটা অত্যন্ত ক্রিয়াশীল অবস্থা। শান্ত হওয়াই শক্তির সর্বাপেক্ষা উচ্চতম বিকাশ। লাগাম ছেড়ে দিয়ে ঘোড়াকে সবাই ছোটাতে পারে কিন্তু যে দ্রুতধাবনশীল ঘোড়াকে থামাতে পারে সেই মহাশক্তিধর। ছেড়ে দেওয়া আর বেগ ধারণ করা—কোনটা কঠিন, কোনটাতে বেশি শক্তির প্রয়োজন? শান্ত ব্যক্তি আর অলস ব্যক্তি এক নয়। সত্ত্বকে যেন অলসতা মনে কোরো না, অলসতাকে সত্ত্ব। যে মনের তরঙ্গগুলোকে নিজের অধীনে নিয়ে আসতে পেরেছে সেই শান্ত পুরুষ।

একদিকে যেমন ভক্ত-শিষ্য জুটেছে, তেমনি আবার নিন্দুকের দল। আর তাদের অগ্রণী রমাবাই। মিসেস বুলকে লিখছেন স্বামীজি: 'রমাবাই এর দল আমার বিরুদ্ধে যে সকল নিন্দা প্রচার করছে তা শুনে আমি আশ্চর্য হলাম। তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই যে আমার অসচ্চরিত্রতার দরুন ডেট্রয়টের মিসেস ব্যাগলিকে তাঁর একটি অল্পবয়স্কা দাসীকে তাড়াতে হয়েছিল! মিসেস বুল, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না, একজন যে ভাবেই চলুক না কেন, এমন কতগুলো লোক চিরদিনই থাকবে যারা তার সম্বন্ধে ঘোরতর মিথ্যা রচনা করে প্রচার করবেই। শিকাগোতেও আমার বিরুদ্ধে কেউ না কেউ এইরকম লেগে থাকত। আর, সর্বদা দেখবেন, এই মহিলাগুলিই সেরা খৃস্টান। হিন্দুরা যে এদের অস্পৃশ্য বলে, আর বিধিমত স্নান না করলে যে তাদের স্পর্শদোষ থেকে শুদ্ধ হওয়া যায় না বিশ্বাস করে, এটা কি আর আশ্চর্যের ব্যাপার? প্রাচীনেরা যা বলে গেছেন তা খুব ঠিক, আমি তাই এখন দিন-দিন হৃদয়ঙ্গম করছি।'

আরো লিখছেন: 'আমার গুরুদেব বলতেন, হিন্দু, খৃস্টান প্রভৃতি বিভিন্ন নাম মানুষের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃভাবের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে আমাদের ঐগুলোকে ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করতে হবে। সম্প্রদায়গত নামের শুভকারিণী শক্তি আর নেই, এখন ওসব নাম চারদিকে কেবল অশুভ বিস্তার করছে। আমাদের মধ্যে যাঁরা গুণী তাঁরা

পর্যন্ত দলীয় নামের কুহকে পড়ে অসুরবৎ ব্যবহার করতে পেছপা হচ্ছে না। ঐসব বাধার প্রাচীর ভেঙে ফেলবার জন্যে কঠোর চেষ্টা করতে হবে আমাদের। আর আমি বলছি, আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য হব।'

'চাই অকপট সরলতা, পবিত্রতা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা আর দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি। এসব যাদের আছে এমনি মুষ্টিমেয় লোক যদি কাজে লাগে তবে দুনিয়া ওলট-পালট করে দিতে পারে।' ই. টি. স্টার্ডিকে লিখছেন স্বামীজি : 'গত বছর এ দেশে আমি যথেষ্ট বক্তৃতা দিয়েছিলাম এবং প্রশংসাও পেয়েছিলাম প্রচুর। কিন্তু পরে দেখলাম সে সব কাজ যেন আমি নিছক নিজের জন্যেই করেছিলাম। চরিত্র গঠনের জন্যে ধীর ও অবিচলিত যত্ন আর সত্যোপলব্ধির জন্যে প্রবল প্রচেষ্টাই মনুষ্যসমাজের ভবিষ্যৎ জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আর আপনি আমার সঙ্গে একমত যে অদ্বৈতবেদান্তই মানুষকে তার স্ব-স্ব ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে শক্তিমান করে তুলতে সমর্থ। গুটি কয়েক বাছা-বাছা স্ত্রী-পুরুষকে অদ্বৈত বেদান্তের উপলব্ধি সম্বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে আমি চেষ্টা করব, কতদূর সফল হব জানি না। প্রভুই আমাকে সাহায্য করবেন, প্রয়োজনমত তিনিই কর্মী পাঠাবেন আমাকে। আমি শুধু এই চাই আমি যেন কায়মনোবাক্যে পবিত্র নিঃস্বার্থ ও অকপট হতে পারি। সত্যমেব জয়তে নানৃতম। সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ। বৃহত্তর জগতের কল্যাণে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ যে বিসর্জন দিতে পারে সমগ্র জগৎই তার আপনার হয়ে যায়।'

স্টার্ডিকে আবার লিখছেন স্বামীজি : 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম। মিথ্যার কিঞ্চিৎ প্রলেপ থাকলে সত্য প্রচার সহজ হয় বলে যাঁরা ধারণা করেন তাঁরা ভ্রান্ত। কালে তাঁরা বুঝতে পারেন যে বিষ এক ফোঁটা মিশলে সমস্ত খাদ্য দূষিত করে ফেলে। যে পবিত্র ও সাহসী সেই সব করতে পারে জীবনে। প্রভু আপনাকে সর্বদা মায়ামোহের হাত থেকে রক্ষা করুন। আমি আপনার সঙ্গে কাজ করতে সর্বদাই প্রস্তুত আর আমরা নিজেরা যদি খাঁটি থাকি তবে প্রভুও আমাদের শত শত বন্ধু প্রেরণ করবেন, 'আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধঃ'। কত নতুন পরিকল্পনার উদ্ভব ও বিলয় হবে, কিন্তু একমাত্র যোগ্যতমেরই প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত—আর, সত্য ও শিবের মত যোগ্যতম আর কী হতে পারে?'

কত জায়গায় যে বহিরঙ্গদের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছেন আর ছোটখাটো ক্লাশ করছেন অন্তরঙ্গদের নিয়ে তার লেখাজোখা নেই। বস্টনের মিসেস বার্বারের কর্তৃত্বে 'বার্বার লেকচারস' দিয়ে এলেন, তারপর ভিক্টন সোসাইটিতে, মেস মেমোরিয়াল বিল্ডিং-এর উপরতলায়। আর এইখানেই তাঁর বক্তৃতার বিষয় 'ধর্ম বিজ্ঞান'।

বেদান্তী বলে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে এক চৈতন্যবান পুরুষ আছে, তাঁকেই আমরা ঈশ্বর বলি সুতরাং এই জগৎ তাঁর থেকে পৃথক নয়। তিনি জগতের শুধু নিমিত্তকারণ নন, তিনি আবার উপাদানকারণ। কার্য থেকে কারণ কখনো আলাদা নয়। কার্য কারণেরই রূপান্তর। জগতে যা কিছু আছে সবই ঈশ্বর। বেদান্তীর দ্বিতীয় কথা, এই যে আত্মাগণ, এরাও ঈশ্বরেরই অংশ স্বরূপ, সেই অনন্ত বহ্নির এক-এক স্ফুলিঙ্গ মাত্র। অর্থাৎ যেমন এক বৃহৎ অগ্নিপিণ্ড থেকে সহস্র স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয় তেমনি সেই পুরাতন পুরুষ থেকে এই সমুদয় আত্মা বিস্ফুরিত হয়েছে। কিন্তু অনন্তের অংশ, এ কথার অর্থ কী? বোঝাচ্ছেন স্বামীজি : অনন্তের কখনো অংশ হতে পারে না। পূর্ণ বস্তুর বিভাজন নেই। তবে এই যে স্ফুলিঙ্গের কথা বলা হল এর অর্থ কী? বেদান্তের

মীমাংসা এই, প্রত্যেক আত্মা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের অংশ নয়, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকেই সেই অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ। তবে প্রশ্ন, এত আত্মা কোত্থেকে এল? লক্ষ লক্ষ জলকণার উপর সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে লক্ষ লক্ষ সূর্য দেখাচ্ছে আর প্রত্যেক জলকণাতেই ক্ষুদ্রাকারে সূর্যের মূর্তি। তেমনি এ সকল আত্মা প্রতিবিম্বস্বরূপে, সত্য নয়। প্রকৃতির উপর মায়াময় প্রতিবিম্ব। জগতে একমাত্র অনন্ত পুরুষ আছেন, আর সেই পুরুষই আমি-তুমি রূপে প্রতীয়মান হচ্ছে, এই ভেদপ্রতীতি মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি বিভক্ত হননি, বিভক্ত হয়েছেন বলে বোধ হচ্ছে মাত্র। যখন ঈশ্বরকে দেশ-কাল-নিমিত্তের জালের মধ্য দিয়ে দেখি, জড়জগৎ বলে দেখি। যখন আরো একটু উচ্চতর ভূমি থেকে অথচ সেই জালের মধ্য দিয়ে তাঁকে দেখি, তখন দেখি বা প্রাণীরূপে, আরো উঁচুতে উঠলে মানুষরূপে, আরো উঁচুতে গেলে দেবতারূপে। কিন্তু তবুও তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেব এক অখণ্ড অনন্ত সত্তা আর আমরাই সেই সত্তাস্বরূপ। আমিও তা আপনিও তা, অংশ নয়, সমগ্র। তিনিই অনন্ত জ্ঞাতারূপে সমুদয় প্রপঞ্চের পশ্চাতে দণ্ডায়মান, আবার তিনিই স্বয়ং সমুদয় প্রপঞ্চ। তিনিই বিষয় তিনিই বিষয়ী। আমি-তুমি সব তিনি।

মিস এ্যাণ্ডরুজ-এর বাড়িতেও ক্লাশ নিলেন স্বামীজি, আবার মিস কর্বিনের বাড়ি। মিস কর্বিন বিত্তবতী মহিলা, তার সংস্রব ভালো লাগল না স্বামীজির। ওলি বুলকে লিখছেন: 'আমি গত শনিবার মিস কর্বিনের কাছে গিয়েছিলাম, তাঁকে বলে এসেছি আব তাঁর ওখানে যেতে পারব না। জগতের ইতিহাসে এমনি কি কখনো দেখেছেন যে বড় লোকের দ্বারা কোনো বড় কাজ হয়েছে? হয়নি, কখনো হয়নি। চিরকাল হৃদয় ও মস্তিষ্ক থেকেই বড় কাজ হয়েছে, টাকা থেকে নয়।

আমার ভাবকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্যে আমি আমার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছি। ভগবান আমাকে সাহায্য করবেন, আমি আব কারু সাহায্য চাই না। এই সিদ্ধির একমাত্র রহস্য। এর বাইরে আর কিছু রহস্য নেই।'

'ধর্মবিজ্ঞানে' আবার বলছেন স্বামীজি জ্ঞাতাকে কী করে জানা যাবে? জ্ঞাতা কখনো নিজেকে জানতে পারে না। আমি সবই দেখতে পাই, কিন্তু নিজেকে পাই না। আরশি ছাড়া তুমি তোমার নিজের মুখ দেখতে পাও না। তেমনি আত্মাও প্রতিবিম্বিত না হলে পায় না নিজেব স্বরূপ দেখতে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই আত্মার নিজেকে উপলব্ধি করবার চেষ্টাস্বরূপ। বিষয় ও বিষয়ী উভয়স্বরূপ সেই পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবিম্ব, পূর্ণ মানব। যেমন খৃষ্ট, যেমন বুদ্ধ। তারা অনন্ত আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ। মুখে যাই বলুন, এঁদের উপাসনা না করে মানুষের উপায় নেই।

আমি যদি চিরকালই সেই পূর্ণ পুরুষ তবে কেন আমার এই অপূর্ণ স্বভাব? যে মুক্ত সে আবার বদ্ধ হয় কী করে? বেদান্তী বললে, তুমি কোনো কালেই বদ্ধ হওনি, তুমি নিত্যমুক্ত। আকাশে নানা রঙের মেঘের আনাগোনা কিন্তু নীল আকাশ বরাবর অব্যাহত। তার পরিবর্তন নেই, পরিবর্তন শুধু মেঘের। আমিও তেমনি আকাশের মত অক্ষুণ্ণ। আমি পূর্ব হতেই পূর্ণ, অনন্ত কাল ধরে পূর্ণ। আমি অপূর্ণ, আমি আংশিক, আমি নর, আমি নারী, আমি পাপী, আমি দুর্জন, আমি মন, আমি দেহ, আমি চিন্তা করেছি, আবার চিন্তা করব—সমস্ত ভ্রমমাত্র। তুমি কখনই চিন্তা করো না, তোমার কোনো কালে দেহ ছিল না, কোনো কালেই তুমি অপূর্ণ নও। তুমিই এই ব্রহ্মাণ্ডের আনন্দময় প্রভু। তোমার শক্তিতেই সূর্য আলো দিচ্ছে, সমীরণ প্রবাহিত হচ্ছে,

পৃথিবী সুন্দর হয়ে উঠেছে। তোমার আনন্দেই পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসছে, পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। তুমি সকলের মধ্যে আছ, তুমিই সর্বস্বরূপ। কাকে ত্যাগ করবে কাকে গ্রহণ করবে? তুমিই যে সমুদয়। যখন এই জ্ঞানের উদয় হয় তখন আর ভয় কোথায়, কোথায় মায়ামোহ? তখন সেখানে কে বা কাকে দেখে? কে বা কার উপাসনা করে? কার সঙ্গে বা কার আলাপন? যেখানে একজন আরেকজনকে দেখে, কথা বলে, তা নিয়মের রাজ্য। যেখানে কেউ কাউকে দেখে না, কথা বলে না, তাই সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই ভূমা, তাই ব্রহ্ম।

৬৬

গুরুভক্তির মূর্ত প্রতীক শশিভূষণ—রামকৃষ্ণানন্দ। রামকৃষ্ণময়। জীবনে কখনো তীর্থদর্শনে যায়নি, বলত, ঠাকুরই আমার তীর্থ। ঠাকুরের অসুখের সময় কাশীপুরের বাড়িতে ভক্তরা যদি কেউ সাধন-ভজনে বসত, শশী বলত, প্রত্যক্ষ দেবতা ছেড়ে অদৃশ্য দেবতার পূজায় কী ফল?

বরানগরের বাজার থেকে ঠাকুরের জন্য বরফ কিনে চাদরের খুঁটে বেঁধে ছুটতে ছুটতে এসেছিল দক্ষিণেশ্বর। জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর, রোদে তেতে-পুড়ে লাল হয়ে গিয়েছে। তালপাতার পাখায় ঠাকুর তাকে নিজ হাতে হাওয়া করতে লাগলেন। 'আপনার জন্যে এনেছি।' চাদরের প্রান্ত থেকে বরফের টুকরো বার করল শশী। ঠাকুরের খুশি আর ধরে না। বললেন, 'এই গরমে মানুষ গলে যায় কিন্তু শশীর ভক্তি-হিমে বরফ গলেনি।'

সেই থেকে, ঠাকুরের অসুখের সময়, সর্বক্ষণ শশীর হাতে পাখা। আর সকলে পর্যায়ক্রমে পরিচর্যা করছে, শশীর সেবা অবিচ্ছিন্ন। সামান্য ক্ষণ ছুটি নিয়ে স্নানাহার সেরে নিত। আর বাকি সময় দিন-রাত ঠায় দাঁড়িয়ে পাখা চালাচ্ছে একটানা। আমি হাওয়া করি, তুমি ঘুমোও, তুমি শীতল হও।

ঠাকুর লীলা-দেহ সম্বরণ করেছেন তবু সেই দেহকে জীবন্ত ভেবে হাওয়া করছে শশী। হোমের সময় দেখতে পেল আগুনের মধ্যে ঠাকুর বসে। মুহূর্তে পাখা তুলে নিয়ে শশী তাঁকে, প্রদীপ্ত অগ্নিকে হাওয়া করতে লাগল।

এই নাও ঘোড়ার ডিম! ঠাকুর যে ফুল ভালোবাসতেন তাই কষ্টসাধ্য হলেও শশী জোগাড় করে আনত—সেই নাগকেশর চাঁপা, গোলাপ আর কুর্চি। একবার কুকুরে কামড়াল, তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই। কী করে ঠিক সময়ে ঠাকুরকে জলযোগ করাব, আবার তাঁর সন্তানদেরও প্রসাদ দেব, এতেই সর্বক্ষণ শশব্যস্ত, সর্বদিকে ত্বরান্বিত। ইচ্ছে করছে বটে ঠাকুরকে বিচিত্র ফুলে সাজাই, ওদিকে আবার জলপান দেবার সময় হয়ে এল। দেখ দেখি এদিকে এই ইয়ারিং জবাফুলটা কিছুতেই আলাদা করতে পারছি না। মালা পরবার সখ এদিকে অথচ একটার পর একটা করে ফুল সাজাতে কী ভীষণ দেরি হয়ে যাচ্ছে। তবে কি আদা ছোলা বাতাসা মিষ্টি, আজ আর কিছু খাবে না? না, তা কী করে হয়! আরে, এদিকে বেলাও তো বেড়ে চলেছে। দুত্তোর ছাই মালা। এই নাও ঘোড়ার ডিম। বলে সবগুলি ফুল একসঙ্গে ঠাকুরের পায়ের কাছে ঢেলে দিল। সেই অন্তরঢালা ব্যাকুলতাই শশীর পরাপূজা।

তুমুল তাণ্ডবে ঝড় জল বৃষ্টি সুরু হয়েছে, মাদ্রাজ মঠের মন্দির ভেঙে পড়েছে, শশী ঠাকুরের পটের উপর ছাতা ধরে বসে আছে নির্নিমেষ।

সেই রামকৃষ্ণানন্দকে চিঠি লিখছেন স্বামীজী, এপ্রিল ১৮৯৫-এ।

'কল্যাণবরেষু, সমস্ত কাজের সাফল্য তোমাদের পরস্পরের ভালোবাসার উপরে নির্ভর করছে। দ্বেষ ঈর্ষা অহমিকাবুদ্ধি যতদিন থাকবে ততদিন কল্যাণ নেই। ঐ যে কানে কানে গুজোগুজি করা ওটা মহাপাপ, ওটাকে একেবারে ত্যাগ দিও। মনে অনেক জিনিস আসে, তা মুখ ফুটে বলতে গেলেই ক্রমে তিল থেকে তাল হয়ে দাঁড়ায়। গিলে ফেললেই ফুরিয়ে যায়। মহোৎসব খুব ধুমধামের সঙ্গে হয়ে গেছে, ভালো কথা। আসছে বারে যাতে এক লাখ লোক হয় তার চেষ্টা করতে হবে। অনন্ত ধৈর্য, অনন্ত উদ্যোগ যার সহায় সেই সিদ্ধকাম হবে। পড়াশুনোটা বিশেষ করা চাই, মেলা মুখ্যু ফুখ্যু জড়ো করিসনি বাপু। দুটো চারটে মানুষের মত মানুষ এককাট্টা কর দেখি। একটা মিউও তো শুনতে পাইনে। তোমরা তো মহোৎসবে লুচি সন্দেশ বাঁটলে আর কতগুলো নিষ্কর্মার দল গান করলে, তোমরা কী আধ্যাত্মিক খোরাক দিলে তা তো শুনলাম না। সেই যে পুরোনো ভাব—কেউ-কিছুই-জানিনা-ভাব—যতদিন না দূরে হবে ততদিন কারু সাহস হবে না। বুলিজ আর অলওয়েজ কাওয়ার্ডস। যারা কেবল লোককে দাবড়ে বেড়ায় তারা চিরকালকার কাপুরুষ।

সকলকে সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করবে, রামকৃষ্ণ পরমহংসকে মানুক বা না মানুক। মিথ্যা তর্ক করতে এলে ভদ্রতার সঙ্গে নিরস্ত করবে। সকল মতের লোকের সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করবে। এই সকল মহৎ গুণ যখন তোমাদের মধ্যে আসবে তখন তোমরা মহাতেজে কাজ করতে পারবে, অন্যথা জয়গুরু ফুরু কিছুই চলবে না। শরৎ কী করছে? আমি কী জানি, আমি কী জানি—ওরকম বুদ্ধিতে তিনকালেও কিছু জানতে পারবে না। খালি খোলবাজানো হাঙ্গামার কী কাজ? সব ধীরে ধীরে হবে। তবে সময়ে সময়ে আই গ্রেট য়্যাণ্ড স্ট্যাম্প লাইক এ লিশ্‌ড্‌ হাউণ্ড—একটা শিকারী কুকুর শিকারের সামনে ছাড়া না পেলে যেমন করে তেমনি ছটফট করি। এগিয়ে পড়ো, এগিয়ে পড়ো, উঠে পড়ে লেগে যাও।'

মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক, সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়রকে স্বামীজি কিডি বলে ডাকেন। তাকে লিখছেন: 'অলৌকিক ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করতে পারলেই তো ধর্মের সত্যতা প্রমাণ হয় না। জড়ের দ্বারা তো আর চৈতন্যের প্রমাণ হয় না। ঈশ্বর বা আত্মার অস্তিত্ব বা অমরত্বের সঙ্গে অলৌকিক ক্রিয়ার কী সম্বন্ধ? তুমি ও সব নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। তুমি তোমার ভক্তি নিয়ে থাকো। আর রামকৃষ্ণকে প্রচার করো। যে পানীয় পান করে তোমার তৃষ্ণা মিটেছে তা অপরকে পান করাও। বাজে দার্শনিক চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত কোরো না নিজেকে, বা, তোমার গোঁড়ামি দিয়ে অন্যকেও বিরক্ত কোরো না। একটা কাজই তোমার পক্ষে যথেষ্ট—রামকৃষ্ণকে প্রচার করা, ভক্তি প্রচার করা। তোমার প্রতি আমার আশীর্বাদ—সিদ্ধি তোমার করতলগত হোক।'

এই কথাই আবার লিখছেন মায়লাপুরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার নাঞ্জুণ্ডা রাওকে: 'প্রেমাস্পদেষু, দেহ মন প্রাণ অর্পণ করে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশের প্রচারকার্যে লেগে যাও, কারণ সাধনার প্রথম সোপান হচ্ছে কর্ম। খুব মনোযোগ দিয়ে সংস্কৃত অধ্যয়ন করো আর খুব সাধনভাজনের অভ্যাস করো। কারণ, তোমাকে একজন শ্রেষ্ঠ আচার্য

হতে হবে। আমার গুরু মহারাজ বলতেন, নিজেকে মারতে হলে একটি নরুন দিয়ে হয়, কিন্তু অন্যকে মারতে গেলে ঢাল-তলোয়ারের দরকার। তেমনি লোকশিক্ষা দিতে হলে অনেক শাস্ত্র পড়তে হয় ও অনেক তর্ক-যুক্তি করে বোঝাতে হয়। কিন্তু কেবল একটি কথায় বিশ্বাস করলেই নিজের ধর্মলাভ। ভারত দীর্ঘকাল ধরে যন্ত্রণা সয়েছে, সনাতন ধর্মের উপর বহুকালের অত্যাচার। কিন্তু প্রভু দয়াময়, তিনি আবার তাঁর সন্তানদের পরিত্রাণের জন্যে এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদতলে বসে শিক্ষা গ্রহণ করলেই কেবল ভারত উঠতে পারবে। তাঁর জীবন, তাঁর উপদেশ চারদিকে প্রচার করতে হবে, যেন হিন্দুসমাজের সর্বাংশে, প্রতি অণুতে-পরমাণুতে তা ব্যাপ্ত হয়ে যায়। কে এ কাজ করবে? শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পতাকা বহন করে কে সমগ্র জগতের উদ্ধারের জন্যে যাত্রা করবে? আমি আনন্দিত যে তুমি একজন পতাকাবাহী হতে ইচ্ছে করেছ, তোমার মধ্যে প্রভুই জাগিয়েছেন ইচ্ছে। প্রভু যাকে মনোনীত করবেন সেই ধন্য, সেই মহা গৌরবের অধিকারী।'

দুই শত্রু স্বামীজির—এক, রমাবাই সরস্বতী, আরেক মিশনারির দল। দুই শত্রুই এখন পরাস্ত। কারু সাধ্য নেই আমাকে বিপর্যস্ত করে, লক্ষ্যভ্রষ্ট করে। আমি বরাবরই প্রভুর উপর নির্ভর করেছি, দিব্যালোকের মত উজ্জ্বল সত্যের উপর নির্ভর করেছি। যেন আমার বিবেকের উপর এই কলঙ্ক নিয়ে মরতে না হয় যে আমি নামের জন্যে, এমন কি, পরের উপকারের ছলে লুকোচুরি খেলেছি। এক বিন্দু দুর্নীতি, এক বিন্দু বদ মতলবের দাগ পর্যন্ত যেন আমাতে না থাকে। তাই যদি হয়, আমাকে পায় কে। কে আমাকে পরাভূত করে!

রমাবাই হিন্দু ছিল খৃস্টান হয়েছে, আর খৃস্টান হয়ে মিশনারিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হিন্দু নিন্দা শুরু করেছে। এর জন্যে ওরেও সাঙ্গোপাঙ্গ কম জোটেনি। আর স্বামীজি যখন হিন্দুধর্মের ধারক-বাহক তখন স্বামীজিও তার চক্ষুশূল। রমাবাইকে মিশনারিরা খুব সাহায্য করছে। তা করুক, যেখানে যে মহিলা-সভায় রমাবাই হিন্দু-ধর্মের বিরুদ্ধতা করছে সেখানে সেই সভায় গিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন স্বামীজি। শুধু তাই নয়, আক্রমণকারীকে মুখের উপর জবাব দিয়ে দিচ্ছেন। আর যাই হোক, কাপুরুষতা কারু ধর্ম হতে পারে না।

এখন স্বামীজির আমেরিকান ভক্তরাই রমাবাইয়ের দলকে নাকাল করছে, মিশনারিদের তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না। পরের ধর্ম মন্দ, আমার ধর্মটাই মহৎ, এই নীতিটাই গর্হিত, আর যে স্বধর্ম ছেড়ে পরধর্মকে আশ্রয় করে তাকে অজ্ঞান ছাড়া আর কী বলব!

আর যাই করুক, আমেরিকানরা যেন আমাদের জাতিভেদের না সমালোচনা করে! তাদের জাতিভেদ আরো জঘন্য। এদের ধনীতে-গরিবে জাতিভেদ। আর এদের নিগ্রোদের প্রতি ব্যবহার? এ বর্বরতা কল্পনাতীত। সামান্য অপরাধে বিনা বিচারে জীবিত অবস্থায় চামড়া ছাড়িয়ে মেরে ফেলে। এরা যেন না পরের চরকায় তেল দিতে আসে।

আমেরিকানদের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা কী? ঈশ্বর স্বর্গ নামক স্থানে সিংহাসনে বসা এক মহাক্রুর ও অত্যাচারী সম্রাট। আর শূন্য থেকেই সৃষ্টির উদ্ভব। আর, আত্মাও সৃষ্ট এক পৃথক পদার্থ। আমাদের হিন্দুদের মতে, সৃষ্টি ও আত্মা অনাদি, আর আত্মাতেই পরমাত্মার অবস্থান। আর ঈশ্বর আত্মারই সর্বোচ্চ পূর্ণ অবস্থা। বেদের এই মহান ব্যাখ্যাই ক্রমশ গ্রহণ করছে আমেরিকা। মিশনারিরা দাঁড়াতে পাচ্ছে না। মিশনারিরা যার

বিপক্ষে, শিক্ষিত আমেরিকানরা তারই অনুকূলে। আর রমাবাইকে তো ডক্টর লুইস জেনস নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন।

'হিন্দুধর্মকে হিন্দুধর্মের মধ্য দিয়েই সংস্কার করতে হবে, নব্যতান্ত্রিক মতবাদের মধ্য দিয়ে নয়।' জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখছেন স্বামীজি : 'আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে সংস্কারকদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দু দেশেরই সংস্কৃতিধারাকে নিজ জীবনে গ্রহণ করতে হবে। সেই মহা-আন্দোলনের সূত্রপাত প্রত্যক্ষ করছেন বলে মনে হচ্ছে কি ? ঐ তরঙ্গ-আঘাতের মৃদু গুঞ্জরন শুনতে পাচ্ছেন কি ? সেই শক্তিকেন্দ্র সেই দেবমানব ভারতবর্ষেই জন্মেছিলেন, তিনি সেই মহান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস আর তাঁকে কেন্দ্র করেই এক যুবকদল ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠছে। ওরাই এ মহাব্রত উদযাপিত করবে। এ কাজের জন্যে সঙ্ঘের দরকার আর সূচনায় সামান্য কিছু অর্থের। কিন্তু ভারতবর্ষে কে আমাদের টাকা দেবে ? আমি তো সে জন্যেই আমেরিকায় এসেছি। যা কিছু টাকা, আপনি জানেন, গরিবদের থেকেই এনেছি, বড়লোকদের থেকে নয়, যেহেতু ধনীরা আমার ভাব বোঝে না, পারে না বুঝতে। এদেশে ক্রমান্বয় বক্তৃতা করেও বিশেষ কিছু করতে পারিনি। তার প্রধান কারণ, আমেরিকায় এবার বড় দুর্বৎসর, হাজার হাজার গরিব বেকার হয়ে আছে। দ্বিতীয় কারণ, মিশনারিরা আমার মতবাদ ধ্বংস করতে চেষ্টা করছে। তৃতীয়ত, আমি যে সত্যিই সন্ন্যাসী, হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি, আমি প্রতারক নই, এ কথাটা আমাদের দেশের গণ্যমান্য কেউ বলতে পারল না বোঝাতে পারল না আমেরিকাকে। আমার দেশবাসীদের এ জন্যে বাহবা দিতে হয়। তবু, দেওয়ানজি সাহেব, আমি তাদেরকে ভালোবাসি।'

বরং দেশে আছেন রেভারেণ্ড কালীচরণ বাড়ুয্যে। মিশনারিদের বলে বেড়াচ্ছেন বিবেকানন্দ হচ্ছেন রাজনৈতিক পতাকাবাহী।

লিখছেন আলাসিঙ্গাকে : 'শুনলাম, রেভারেণ্ড কালীচরণ বাড়ুয্যে খৃস্টীয় মিশনারিদের সামনে বক্তৃতায় বলেছেন, আমি একজন রাজনৈতিক প্রচারক। আমার তরফ থেকে তাঁকে প্রকাশ্যে বলবে, হয় তিনি কলকাতার কোনো সংবাদপত্রে লিখে তা প্রমাণ করুন, নয়তো প্রত্যাহার করুন ভিত্তিহীন মূর্খ উক্তি। এটা আর কিছু নয়, অন্য ধর্মাবলম্বীকে অপদস্থ করবার অপকৌশল। কোনো রাজনীতির সঙ্গে আমার সংস্রব নেই, আমার সংস্পর্শ একমাত্র সত্যের সঙ্গে। আমার বন্ধুদের বলবে যারা আমার নিন্দা করছে তাদেরকে একমাত্র আমার উত্তর—স্তব্ধতা। তাঁদের ঢিল খেয়ে আমি যদি পাটকেল মারতে যাই তবে তো আমি তাদেরই দলে গিয়ে পড়লুম, তাদেরই সঙ্গে হয়ে গেলুম একদরের। তাদের বলবে, সত্য নিজের প্রতিষ্ঠা নিজেই করবে, কারু কোনো আনুকূল্য বা বিরুদ্ধতাকে সে গ্রাহ্য করবে না। সত্যি, সাধারণ সংসারীদের সঙ্গে জড়িত এই বাজে জীবনে আর খবরের কাগজের হুজুগে আমি একেবারে দিক্ হয়ে গিয়েছি। এখন প্রাণের মধ্যে শুধু এই আকুল আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে হিমালয়ের শান্তির কোলে ফিরে যাই।'

যাদের হৃদয়ে ভগবান মঙ্গলায়তন হরি বাস করেন তাদের কোনো কার্যে অমঙ্গল নেই। সমাহিত চিত্তে ভগবচ্চিন্তাই পরা রক্ষা। যে ভগবানের আশ্রিত তাকে কে হিংসা করতে পারে ? যে বিমলবুদ্ধি, যাতে মাৎসর্য নেই, যে প্রশান্ত পবিত্রস্বভাব, সর্বজীবের মিত্র, প্রিয় ও হিতভাষী, যার অন্তরে মান ও মায়া নেই, তারই হৃদয়ে ভগবান বাসুদেব নিত্য অধিষ্ঠিত।

আমি দেহ—এই সঙ্কল্পই মহৎ সংসার। এই সঙ্কল্পই বন্ধন, হৃদয়গ্রন্থি। আমি দেহ—এই জ্ঞানই অজ্ঞান, এই বুদ্ধিই অবিদ্যা। এই বুদ্ধিই তৃষ্ণাদুষ্ট। যা কিছু সঙ্কল্প তাকেই তাপত্রয় বলে। কাম, ক্রোধ, দুঃখ, শোক, বিশ্ব, দেশ, কাল, রূপ, সব মনঃপ্রসূত। এই মনই মহারিপু। এই মনই জন্ম-মৃত্যু জরা-ব্যাধি, বিরহ ও অপ্রিয়সংযোগ। মনই জীব, মনই চিত্ত, মনই অহঙ্কার। মনই মহাবন্ধ, মনই ভূমি জল তেজ বায়ু আকাশ। মনই শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ। অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় আনন্দময়, এই পঞ্চকোষই মনোভব। জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি—অবস্থাত্রয়ও মনোরূপ। সমস্ত দৃশ্যই মানস। যতক্ষণ সঙ্কল্প আছে ততক্ষণ এই সমস্তই আছে, যেই সংকল্প ত্যাগ হল তখন আর কিছুই নেই। আমিও নেই তুমিও নেই গুরুও নেই শিষ্যও নেই—এক সচ্চিদানন্দে অনির্বাচ্য চমৎকারিণী মহামায়া পুরুষ-প্রকৃতিরূপে খেলা করছে।

'লোকে কী বলল তাতে আমি ভ্রূক্ষেপ করি না।' হরিদাস বিহারীদাসকে আবার লিখছেন স্বামীজি : 'আমার ভগবানকে আমার ধর্মকে আমার দেশকে আমি ভালোবাসি। ভালোবাসি নিপীড়িত অশিক্ষিত ও দীনহীনকে। তাদের বেদনা কত তীব্রভাবে অনুভব করি তা প্রভুই জানেন। তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। মানুষের স্তুতি-নিন্দায় আমি দৃকপাত করি না।

প্রভুর কাজ চিরদিন দীনদরিদ্রেরাই সম্পন্ন করেছে। আশীর্বাদ করবেন যেন ঈশ্বরের প্রতি গুরুর প্রতি আর নিজের প্রতি আমার বিশ্বাস অটুট থাকে। প্রেম আর সহানুভূতিই একমাত্র পথ। ভালোবাসাই একমাত্র উপাসনা।'

যে ধর্ম গরিবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না তা কি আবার ধর্ম ? আমাদের খালি 'ছুঁয়ো না' 'ছুঁয়ো না'।' লিখছেন ব্রহ্মানন্দকে : 'যে দেশের বড়-বড় মাথাগুলো আজ দু হাজার বছর খালি বিচার করছে ডান হাতে খাব না বাঁ হাতে, ডান দিক থেকে জল নেব না বাঁ দিক থেকে, তাদের অধোগতি হবে না তো কার হবে ? কালঃ সুপ্তেষু জাগর্তি কালোহি দুরতিক্রমঃ। কাল চিরজাগ্রত, তাকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। তার চোখে কে ধুলো দেবে ?

যে দেশে কোটি-কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে আর দশ-বিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরিবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে না, সে কি দেশ, না, নরক ? সে কি ধর্ম, না, পিশাচনৃত্য ? দাদা, এইটি তলিয়ে বোঝ। ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে দেখেছি, দেখছি এ দেশ। কারণ ছাড়া কি কার্য হয় ? পাপ বিনে কি সাজা মেলে ? সমুদয় শাস্ত্রে ও পুরাণে ব্যাসের দুটি বচন আছে। এক, পরোপকার করলে পুণ্য আর, দুই, পরপীড়ন করলে পাপ।

গুরুদেব বলতেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না। সে কথা ভুললে চলবে কেন ? ঐ যে গরিবগুলো পশুর মত জীবনযাপন করছে তার কারণ মূর্খতা। আমরা আজ চার যুগ ধরে কী করেছি ? ওদের রক্ত চুষে খেয়েছি, আর দু পা দিয়ে দলেছি। ওদের ওঠবার শক্তি আমাদেরই জোগাতে হবে প্রাণপণে। আমাদের ধর্মের দোষ নেই, দোষ আমাদের। ধর্ম ঠিক ঠিক পালন না করবার দোষ।

কিন্নাম রোদিষি সখে ত্বয়ি সর্বশক্তিঃ ? তুমিই তো নিজে সমস্ত শক্তির আধার, তবে, বন্ধু, কেন কাঁদছ ? জড়ের কী ক্ষমতা, আত্মার শক্তিই প্রবলতর। আমরা রামকৃষ্ণের দাস, আমাদের আবার ভয় কিসের ? দেহকেই যারা আত্মা বলে জানে, তারাই কাতর হয়ে

সকরুণ কাঁদে, আমরা ক্ষীণ, আমরা দীনহীন—এরই নাম নাস্তিক্য। আমরা যখন অভয়পদে প্রতিষ্ঠিত, তখন আমরা বীর, আমরা বিগতভী—এরই নাম আস্তিক্য। আমরা রামকৃষ্ণদাস।

বীতসংসাররাগ হয়ে সকল কলহের মূল স্বার্থসিদ্ধিকে দূর করে পরমামৃত পান করতে করতে সর্বকল্যাণস্বরূপ শ্রীগুরুর চরণ ধ্যান করছি। প্রণাম করছি সমগ্র পৃথিবীকে, সকলকে আমন্ত্রণ করছি সেই অমৃতভোগের উৎসবে। অনাদিনিধন বেদ-সমুদ্র মন্থন করে যে অমৃত পাওয়া গিয়েছে, যার প্রকরণে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বল সঞ্চার করেছে, যা পার্থিব নারায়ণদের প্রাণসারে পরিপূর্ণ, সেই অমৃতের পূর্ণপাত্ররূপ দেহ ধারণ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আমরা সেই রামকৃষ্ণের দাস।'

'আমরা সেই পরমপুরুষের দাস।' আলাসিংগাকে লিখছেন স্বামীজি : 'যার যা খুশি বকুক, প্রভুই জানেন কী হবে। আমরা কারু সাহায্য খুঁজে বেড়াই না, সাহায্য অনাহূত এসে পড়লেও দিই না ছেড়ে। বৎস, দৃঢ়ভাবে ধরে থাকো, কেউ তোমাকে সাহায্য করবে তার ভরসা রেখো না। সমগ্র মানুষের সাহায্যের চেয়েও প্রভুর শক্তি কি বেশি নয়? সত্যে প্রতিষ্ঠিত একটা কথাও নষ্ট হবে না। সত্যের মৃত্যু নেই, ধর্মের মৃত্যু নেই, পবিত্রতাও অবিনশ্বর। তোমরা সিংহতুল্য হও। মৃত্যু পর্যন্ত অবিচলিত ভাবে লেগে পড়ে থাকো। আসল কথা গুরুভক্তি। মৃত্যু পর্যন্ত গুরুর উপর বিশ্বাস। তা হলেই নিশ্চিতসিদ্ধি। সকলের সঙ্গে ব্যবহারে পরম সহিষ্ণু হও। কারু সঙ্গে বিবাদ কোরো না। কারু বিরুদ্ধে লেগো না। রামা শ্যামা খৃস্টান হয়ে যাচ্ছে, এতে আমার কী এসে যায়? তারা যা খুশি তাই হোক না। কেন বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে যাবে? যার যে ভাবই হোক না, সকলের কথা সহ্য করো ধীর ভাবে। চাই ধৈর্য চাই পবিত্রতা চাই অধ্যবসায়। আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না আমি সাধুও নই। আমি গরিব, গরিবদের আমি ভালোবাসি, কিন্তু এদের উদ্ধারের উপায় কী? তাদের জন্যে কার হৃদয় কাঁদে বলো? তারা অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে পাচ্ছে না, শিক্ষা পাচ্ছে না, কে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে? কে দ্বারে দ্বারে ঘুরবে তাদের পথ দেখাবে? [illegible] এরাই তোমাদের ইষ্ট, এরাই তোমাদের ঈশ্বর। তাদের জন্যে ভাবো, তাদের জন্যে কাজ করো, নিরন্তর প্রার্থনা করো তাদের জন্যে। দরিদ্রের জন্যে যার হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণ হয় তাকেই আমি মহাত্মা বলি আর যারা দরিদ্রের পয়সায় শিক্ষিত হয়ে দরিদ্রের দিকে চেয়েও দেখছে না, দূর করছে না তাদের অন্ধকার—অভাবের অন্ধকার, অজ্ঞানের অন্ধকার—তাদের বলি দেশদ্রোহী। যারা ভারতের অগণন ক্ষুধার্ত মানুষকে পেষণ করে টাকা কামিয়ে জাঁকজমক করে বেড়াচ্ছে তারা দেশদ্রোহী ছাড়া আর কী—আমরা গরিব, আমরা নগণ্য, কিন্তু গরিবেরাই চিরকাল পরমপুরুষের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে কাজ করেছে। প্রভু আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন।'

জাতি নীতি কুল গোত্র, এ সমস্ত থেকে যিনি দূরে অবস্থিত যিনি নামহীন রূপহীন গুণহীন ও দোষাদিহীন, যিনি দেশকালসম্বন্ধাতীত ব্রহ্ম, তা তুমিই, তাঁকে তোমার আত্মাতেই ভাবনা করো। যিনি বাক্যের অগোচর, বিমল জ্ঞানচক্ষুতে যিনি প্রত্যক্ষ, যিনি শুদ্ধ চিদঘনস্বরূপ অনাদিবস্তু ব্রহ্ম, নিষ্কল ও বুদ্ধির অবিষয়, তা তুমিই, তাঁকে তোমার আত্মাতেই ভাবনা করো। যাঁর জন্ম নেই, বৃদ্ধি নেই, পরিণাম নেই, ক্ষয় নেই, ব্যাধি নেই, বিনাশ নেই, যিনি অব্যয়, যিনি নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত অচল, যিনি প্রত্যক্ষ

চৈতন্য, যিনি অখণ্ড সুখস্বরূপ নিরঞ্জন ব্রহ্ম, তা তুমিই, তাঁকে তোমার আত্মাতেই ভাবনা করো।

৬৭

পঁচিশে এপ্রিল, ১৮৯৫ স্বামীজি লিখছেন মিসেস বুলকে, নিউইয়র্ক থেকে: 'আমি সহস্রদ্বীপোদ্যানে (থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক) যাবার বন্দোবস্ত করেছি। সেখানে আমার ছাত্রী মিস ডাচারের একটি কুটির আছে। আমরা কয়েকজন সেখানে নির্জনে, শান্তিতে ও বিশ্রামে কাটাব মনে করেছি। আমার ক্লাশে যাঁরা আসেন তাঁদের মধ্যে জনকয়েককে যোগী তৈরি করতে চাই। গ্রীনএকারের মত কর্মচাঞ্চল্যপূর্ণ জায়গা এ সাধনার অনুপযোগী। আর সহস্রদ্বীপোদ্যান লোকালয় থেকে দূরে বলে, যারা শুধু মজা চায়, তারা সেখানে যেতে বিশেষ সাহস করবে না।

জুন মাসের গোড়ার দিকে গেলেন পার্সিতে, নিউ হ্যাম্পসায়ারে। লিখছেন: 'অবশেষে আমি এখানে মিঃ লেগেটের কাছে এসে পৌঁচেছি। অনেক সুন্দর জায়গার মধ্যে এ একটা নিঃসন্দেহ। কল্পনা করো, চারদিকে ঘন বনে ঢাকা পাহাড়ের সার তার মধ্যে একটি হ্রদ, আর সেখানে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। কি মধুর কি নিস্তব্ধ কি শান্তিময়! শহরের কোলাহলের পর আমি যে এখানে কী আনন্দ পাচ্ছি এ আমি কেমন করে বোঝাবে! আমার বোধহয় নবজীবন এসেছে! আমি একলা বনের মধ্যে যাই, আমার গীতাখানি খুলে পড়ি আর চুপচাপ বসে থাকি। এর বেশী আর কী চাই! দিন দশেকের মধ্যে এ জায়গা ছেড়ে সহস্রদ্বীপোদ্যানে যাব। সেখানে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন ভগবানের ধ্যান করব আর নির্জনবাস করব। এই কল্পনাটাই, কি বলব, সহসা মনকে উঁচু করে দেয়।'

সেন্ট লরেন্স নদীর উপরে সব চেয়ে যেটা বড় দ্বীপ তারই নাম থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক। তাতে পাহাড়ের গায়ে ছোট একটি বাড়ি, পিছনের দিকে তেতলা হয়ে সামনের দিকে দোতলা। চার পাশে ঘন বন, লোকালয় দেখা যায় না। কিছু দূরে মূল নদী কিন্তু তার একটা জলধারা পাহাড়ের ঢাল ছুঁয়ে বাড়ির পিছনে এসে থেমেছে। নদীর বুকে এখানে-ওখানে আরো সব দ্বীপ, হোটেল-বাজারে আলোর মালা পরে ঝিকমিক করছে। দূরে ক্লেটনের আভাস জাগছে, কাছেই ক্যানাডার উপকূল। দোতলার প্রশস্ত ঘরে ক্লাস বসে। তেতলার ঘরে স্বামীজি থাকেন। এই বাড়ি যার, মিস ডাচার, স্বামীজির জন্যে আলাদা সিঁড়ি তৈরি করে দিয়েছে। যাতে স্বামীজির বসবাস সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব হয়।

দোতলার ক্লাশঘরের সঙ্গেই লাগোয়া বারান্দা, ছাদ-দেওয়া। ক্লাশের পর আবার সেই বারান্দায় বসে স্বামীজি কথা কন ছাত্রদের সঙ্গে। স্বামীজির কথাই যেন ঈশ্বরের কথা। ঠিক বারো জন ছাত্রছাত্রীই জুটল স্বামীজির, বাসিন্দে হল সে বাড়ির। স্বামীজির সঙ্গে বাস করাই, লিখছে অন্যতম শিষ্যা, এস. ই. ওয়ালডো, অবিশ্রান্ত উচ্চ থেকে উচ্চতর অনুভূতিতে আরোহণ করা। প্রভাত থেকে রাত্রি পর্যন্ত এক ভাব, এক ঘনীভূত ধর্মভাবের মধ্যে নিশ্বাস নেওয়া। ছেলেমানুষের মত ক্রীড়া-কৌতুকও না করছেন এমন নয়, পরিহাস তো তাঁর স্বচ্ছচিত্রেরই পরিভাষা, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও ঈশ্বরই যে

জীবনের মূলমন্ত্র এ সত্য থেকে স্খলিত হচ্ছেন না। নিটুট আছেন তাঁর ব্রাহ্মীস্থিতিতে। চারদিকে প্রশান্ত স্তব্ধতা, হঠাৎ কোথাও বা পাখির কাকলি, কীটপতঙ্গের গুঞ্জন, নয়তো বা পত্রপুঞ্জে সমীরমর্মর। তার মধ্যে বেজে উঠেছে স্বামীজির কণ্ঠ—শব্দ নয়, সংগীত।

'মোটামুটি বলতে গেলে বলা যায়, ভয়েতেই মানুষের ধর্মের আরম্ভ। ঈশ্বরভীতিই জ্ঞানের আরম্ভ। কিন্তু পরে তা থেকে এই উচ্চতর ভাব আসে যে পূর্ণপ্রেমের উদয়েই ভয় দূরে হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ঈশ্বর কী বস্তু জানতে পারছি ততক্ষণ কিছু না কিছু ভয় থাকবেই। যীশুখৃষ্ট মানুষ ছিলেন, তাই তিনি জগতে অপবিত্রতা দেখতে পেতেন—আর তার খুব নিন্দেও করে গেছেন। কিন্তু ঈশ্বর অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ, তিনি জগতে কিছু অন্যায় দেখতে পান না, তাই তাঁর ক্রোধেরও কোনো কারণ নেই। অন্যায়ের প্রতিবাদ বা নিন্দাবাদ কখনো সর্বোচ্চ ভাব হতে পারে না। ডেভিডের হাত রক্তে কলঙ্কিত ছিল তাই তিনি মন্দির তৈরি করতে পারেননি।

আমাদের হৃদয়ে প্রেম ধর্ম ও পবিত্রতা যত জাগবে ততই আমরা বাইরে প্রেম ধর্ম ও পবিত্রতা দেখতে পাব। আমরা অপরের কাজের যে নিন্দে করি তা আসলে আমাদের নিজেদেরই নিন্দে। তোমার হাতের মধ্যে রয়েছে তোমার যে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড তা ঠিক করো, দেখবে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও তোমার পক্ষে আপনা আপনি ঠিক হয়ে গেছে। আমাদের ভিতরে যা নেই বাইরেও তা দেখতে পাইনে। জগতে যথার্থ যা কিছু উন্নতি হয়েছে প্রেমের শক্তিতেই হয়েছে। দোষ দেখিয়ে দেখিয়ে কোনো কালে ভাল কাজ করা যায় না। হাজার বছর ধরে সেটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে। কোনোই ফল হয় না নিন্দাবাদে।'

মিসেস ফাঙ্কি ও তার বন্ধু স্বামীজিকে খুঁজছে, কোথায় স্বামীজি? ডেট্রয়েটে দেখেছিল একবার, ইচ্ছে থাকলেও মিশতে পারেনি ঘনিষ্ঠ হয়ে। শুধু তাঁর কথাগুলিই প্রাণের মধ্যে তরঙ্গ তুলছে—আর একবার দেখতে পাইনে তাঁকে? ধন্য হতে পাইনে সে উপস্থিতিতে? কোথায় স্বামীজি? কেউ-কেউ বললে ভারতে ফিরে গিয়েছেন। সমুদ্র পেরিয়ে চলো তবে ভারতবর্ষ। শুধু সমুদ্র কী, স্বামীজির জন্যে পৃথিবী অতিক্রম করতে পারি। যেতে পারি গহনে-দুর্গমে।

'স্বামীজি কোথায় বলতে পারো?' এক সন্ধ্যায় এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা, উৎসুক হয়ে জিগগেস করল ফাঙ্কি। 'দেশে ফিরে গিয়েছেন?'

'না, না, এখানেই আছেন।' বললে বন্ধু।

'এখানে? বলো কী?'

'হ্যাঁ, গ্রীষ্মকালটা থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কে কাটাবেন।'

পরদিনই যাত্রা করল ফাঙ্কি, কালহরণ করার মত সময় নেই। দুই চোখে দেখবার পিপাসা, দুই কানে শোনবার। অনেক খোঁজাখুঁজি করে বার করল স্বামীজিকে। জনকোলাহল থেকে দূরে সরে এসেছেন, এখন তাঁর শান্তিভঙ্গ করা কি ঠিক হবে? কিন্তু কী করবে ফাঙ্কি, তার প্রাণের মধ্যে স্বামীজি যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন তা কি আর নেববার? অন্ধকার রাত, ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। পথের শ্রমে মুহ্যমান দুজনে, ফাঙ্কি আর তার বন্ধু, কিন্তু স্বামীজিকে না দেখতে পেলেই বা বিশ্রাম কোথায়? তিনি কি তাদের শিষ্য বলে গ্রহণ করবেন? আর, যদি না করেন, তাহলে তারা কোথায় যাবে, কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে? কী আহম্মক তারা, যিনি তাঁদের অস্তিত্ব পর্যন্ত জানেন না,

তাঁকে দেখবার পিপাসায় তারা বহুশত ক্রোশ চলে এসেছে। কী তাদের স্পর্ধা যে তারা তাঁর সময়ের উপর হস্তক্ষেপ করে, তাঁর নিভৃতিতে চাঞ্চল্য আনে? পথ দেখাবার জন্যে তারা একটা লোককে ভাড়া করেছিল, লণ্ঠন হাতে সে আগে-আগে চলেছে। চড়াই ধরে উঠছে সকলে কষ্টে, আলোতে কতটুকু বা তরল হচ্ছে অন্ধকার, মাথার উপরে অনাবৃত দুর্যোগ—তবু কে বলবে কার এই দুর্দম আহ্বান, কিসের এ দুর্নিবার পিপাসা? সমস্ত হিসেবের বাইরে কার এই দুঃসহ আকর্ষণ? যদি দেখা করেন তা হলে কী বলবে আগে থেকে ঠিক করে নিয়েছিল দুজনে, কিন্তু, আশ্চর্য, যখন সত্যিই দেখা গেল তখন ও-সব পোশাকী কথা আর কিছুই মনে হল না। গম্ভীর যেন সহসা সরল হয়ে গেল। উত্তুঙ্গ যেন হয়ে গেল সমতল।

'আমরা ডেট্রয়েট থেকে আসছি।' একজন বললে মামুলি ভাবে। 'মিসেস পি আমাদের পাঠিয়েছেন।'

'যদি ভগবান যীশু এখন বেঁচে থাকতেন, তাহলে তাঁর কাছেও আমরা এমনি আসতাম।' আরেকজন বললে, 'শুধু আসতাম না তাঁর কাছ থেকে উপদেশ ভিক্ষে করে নিতাম।'

স্বামীজি হাসলেন। বললেন, 'হায় আমার যদি যীশুর মত ক্ষমতা থাকত!' স্নেহ-নয়নে তাকালেন মহিলাদুটির দিকে 'যদি আমি পারতাম তোমাদের এই মুহূর্তে মুক্ত করে দিতে!'

কিছুক্ষণ ভাবলেন নীরবে। ঘরের বক্তী কাছেই ছিল, তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এঁদেরকে উপরে নিয়ে যাও। এঁরা এখানেই থাকবেন।'

এ আনন্দ প্রত্যাশার অতীত। স্বর্গসুখের চেয়েও বেশি।

'বারোজন ছিল্যম আমরা সেই বাড়িতে, আর সমস্ত গ্রীষ্মটাই আমরা কাটালাম একটানা। মনে হত যেন এক জ্বালাময়ী ঐশী শক্তি উর্ধ্ব থেকে অবতরণ করে আমাদের সব সময়েই অধিকার করে আছে। আর এখানেই এক দিন সন্ধ্যায় চকিতে স্বামীজি তাঁর বিখ্যাত কবিতা "সঙ্গ অফ দি সন্ন্যাসিন"—সন্ন্যাসীগীতা—রচনা করলেন আর তৎক্ষণাৎ-তৎক্ষণাৎ শোনালেন আমাদের :'

> ধরো সেই গান! যে গানের জন্ম দূরদূরান্তে,
> যেখানে পার্থিব মালিন্য পৌঁছুতে পারে না,
> পর্বতগুহায়, গহন বনের বিস্তারে,
> কামনা বা বৈভব বা নামাকাঙ্ক্ষার দীর্ঘশ্বাস
> ছুঁতে পারে না যার শান্তির গাম্ভীর্য,
> যেখানে বয়ে চলেছে নিত্য জ্ঞানের নির্ঝর,
> যার সহচর দুই শাখা, সত্য আর আনন্দ—
> সেই গান তোলো এবার উচ্চ রোলে, হে দৃপ্ত সন্ন্যাসী,
> আর বলো, ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ।
> ছিন্ন করো শৃঙ্খলজঞ্জাল—যা তোমাকে বেঁধে রাখছে নিচে,
> জ্বলন্ত সোনার শৃঙ্খল কিংবা দীনম্লান লোহার
> ভালো মন্দ, ঘৃণা প্রেম, যত সব দ্বন্দ্বের কৌটিল্য;
> আপ্যায়িতই হোক বা বেত্রাহতই হোক

দাস সব সময়েই দাস, সব সময়েই অধীনস্থ,
সোনার হলেও শৃঙ্খল বাঁধতে ঠিক সমান সমর্থ—
দূর করে দাও সেই আবর্জনা, হে দৃপ্ত সন্ন্যাসী,
আর বলো, ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ ॥
দূর হও তমসা ! যে আলেয়া ক্ষীণায়ু স্ফুলিঙ্গের আকর্ষণে
টেনে নিয়ে চলেছে এক অন্ধকারের উপর আরেক অন্ধকারের
ভাব জমাতে— দূর হও সেই আলেয়া ।
নিবে যাও জীবনতৃষ্ণা, যে শুধু আত্মাকে
জন্ম থেকে মৃত্যু ও মৃত্যু থেকে জন্মের আবর্তে নিক্ষেপ করছে,
নিয়ে যাও শেষ বাসনার শিখা ।
যে আত্মজয়ী সে সর্বজয়ী
এই তুমি জেনে রাখো আর কখনো হার মেনো না, হে দৃপ্ত সন্ন্যাসী,
শুধু বলো, ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ ॥
"যার যেমন বোনা তার তেমনি ফসল তোলা"
লোকে বলে । বলে "কর্মই নিয়ে আসে তার ফল
ভালো ভালো, মন্দ মন্দ । কারু ত্রাণ নেই সেই নিয়ম থেকে,
যে-ই কায়া নিয়েছে সেই শিকল পরেছে ।"
কিন্তু, নাম ও রূপের বাইরে বিরাজ করছে আত্মা
অনামী, অপরবশ ।
জেনে রাখো তুমি সেই অসঙ্গ, হে দৃপ্ত সন্ন্যাসী,
আর বলো, ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ ॥
যারা পিতা মাতা পত্নী পুত্র বন্ধুবান্ধব বলে
তারা অসার স্বপ্নে আচ্ছন্ন ।
অলিঙ্গ যে আত্মা, সে কার পিতা, কার সন্তান,
কার বন্ধু ? আর সে যখন একাকী, একমাত্র,
তখন কার সঙ্গে তার শত্রুতা ?
আত্মাই একেশ্বর, সে ছাড়া আর কেউ নেই সংসারে,
আর তুমিই সেই, তুমিই সেই, হে দৃপ্ত সন্ন্যাসী,
শুধু বলো, ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ ॥
কেবলই একজন, একচ্ছত্র—সর্বস্বাধীন, সর্বজ্ঞাতা,
অনাখ্য, অকায়, অকলঙ্ক ।
তার মধ্যেই বাস করছে মায়া, স্বপ্নদর্শিনী প্রকৃতিরূপিণী,
দাঁড়িয়ে তাই দেখছে সর্বসাক্ষী, প্রশান্ত ও নির্বিচল ।
জেনো তুমিই সেই সাক্ষীস্বরূপ, হে দৃপ্ত সন্ন্যাসী,
আর বলো, ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ ॥
কী তুমি খুঁজছ ? ইহ বা পর কোনো লোকই
তোমাকে দিতে পারবে না সেই স্বাধীনতা ।
তা নেই শাস্ত্রে বা মন্দিরে, পূজায় বা উপাসনায়,

হায়, নিরর্থক তোমার অন্বেষণ।
যে রজ্জু তোমাকে টেনে নিয়ে চলেছে
তাতে মাত্র তোমার মুক্তি এনে রাখা।
তবে আর কিসের জন্যে শোক,
হাতের মুঠ ছেড়ে দাও, হে দৃপ্ত সন্ন্যাসী,
শুধু বলো, ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ ॥
বলো, শান্তি, শান্তি হোক সকলের।
আমার থেকে কোনো প্রাণীর ভয় নেই,
যে উচ্চে বিচরণ করছে যে বা ধূলিপঙ্কে
আমিই সকলের আত্মা, সকলধারক,
ইহ বা পর সমস্ত জীবন তাই আমি বিসর্জন দিচ্ছি,
সমস্ত স্বর্গ আর মর্ত আর নরক, সমস্ত আশঙ্কা আর আশা—
এমনি করে কাটো তোমার পাশগুচ্ছ, হে দৃপ্ত সন্ন্যাসী,
আর বলো, ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ ॥
এই দেহ যেমন খুশি থাক বা চলে যাক
দেখো না তাকিয়ে। ভাসিয়ে নিয়ে যাক
ওকে ওর কর্মস্রোত। ওর দিন ফুরোবে একদিন।
কেউ ওকে মালা দেবে, কেউ দেবে লাথি
ওকে, এই কাঠামোকে। কিছু বোলো না।
নিন্দা বা স্তুতির অর্থ কী,
যখন স্তুত ও স্তাবক নিন্দক ও নিন্দিত একই ব্যক্তি।
সুতরাং প্রশান্ত হও, হে দৃপ্ত সন্ন্যাসী,
আর বলো, ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ ॥
সত্য সেখানে ফোটেনা যেখানে যশোলিপ্সা
গৃধ্নুতা বা কামের বসবাস।
যে নারীকে স্ত্রী বলে দেখতে চায়
সে সমস্তসম্পূর্ণ হতে পারে না।
নয় বা সে যার সামান্যতমও বিত্ত আছে, স্বার্থ আছে,
যে ক্রোধে বশংবদ,
মায়ার তোরণ সে পারে না উত্তীর্ণ হতে।
সুতরাং ও সব জলাঞ্জলি দাও, হে দৃপ্ত সন্ন্যাসী
আর বলো, ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ ॥
ঘর বেঁধো না। হে বন্ধু, কোন ঘর তোমাকে বাঁধবে?
আকাশই তোমার আচ্ছাদ, তৃণাস্তরণ তোমার শয্যা,
আর যা খাদ্য তোমার জোটে, সুপক্ব বা বিস্বাদ,
বিচার কোরো না, তাই তোমার আহার্য।
যে নিজেকে জানে, কোনো ভোজ্য বা পানীয়ই
পারে না তার মহৎ স্বরূপকে কলুষিত করতে।

তুমি হও সেই চিরপ্রবহমান তরঙ্গবান তরঙ্গ, হে দৃপ্ত সন্ন্যাসী,
আর বলো, ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ ॥
অল্পজনই সত্যকে মূল্য দেয়। বাকি লোক, বেশি লোক,
ধিক্কার দেবে তোমাকে, উপহাস করবে।
তবু হে মহান, তাতে কান দিও না।
বিমুক্তের মত এগিয়ে চলো, দেশ থেকে দেশে,
দুঃখে নিঃশঙ্ক, সুখে স্পৃহাহীন—
আর অন্ধকার থেকে, মায়ার আবরণ থেকে
উদ্ধার করো ওদের।
সুখ-দুঃখের ওপারে চলে যাও, হে দৃপ্ত সন্ন্যাসী,
আর বলো, ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ ॥
এই ভাবে, দিনে দিনে, যতক্ষণ না কর্মশক্তি
চিরতরে তোমার আত্মাকে না ছুটি দেয়।
অপুনর্ভব, আর জন্ম নেই,
না আমি না তুমি, না, মানুষ না ঈশ্বর।
অহংই আত্মা আত্মাই অহং আর পরিপূর্ণ আনন্দ।
জেনো তুমিই সেই আনন্দ, হে দৃপ্ত সন্ন্যাসী,
বলো, বলো উচ্চঘোষে, ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ ।

কী কোমলতা, কী ধৈর্য স্বামীজির! তিনি বয়সে কত ছোট কিন্তু মহিলা দুটির মনে হত তিনি যেন তাদের স্নেহাতুর পিতা, সব সময়ে লক্ষ্য কী ভাবে তাদের যত্ন করবেন, সেবা করবেন। আবো মনে হত যেন ব্রহ্মকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তবু সহজের সঙ্গে সামান্যের সঙ্গে তাঁর কী অন্তরঙ্গ সম্পর্ক।

'চলো তোমাদের জন্যে কিছু রান্না করি।'

স্বামীজি রান্নাঘরে ঢুকলেন। উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে রাঁধতে লাগলেন একমনে। একটা ভারতীয় খাদ্য খাওয়াবেনই তাঁর শিষ্যদের।

কী অগাধ করুণা, কী অপার ভালোবাসা।

'স্বর্গে গেলে একটা বীণা পাবে, আর তাই বাজিয়ে বিশ্রামসুখ অনুভব করবে—এর জন্যে বসে থেকো না।' স্বামীজি শিষ্যদের উপদেশ করছেন: 'এইখানেই একটা বীণা নিয়ে সুরু করে দাও না কেন? স্বর্গে যাবার জন্যে কেন মিছে অপেক্ষা করা? ইহলোকটাকেই স্বর্গ করে ফেল।'

আবার বলছেন: 'যদচ্যুত-কথালাপ-রস-পীযূষ-বর্জিতম।
তদ্দিনং দুর্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দিনম ॥

সেই দিনই দুর্দিন যেদিন ভগবৎপ্রসঙ্গ না করি। সেদিন মেঘাচ্ছন্ন সেদিন দুর্দিন নয়।

সব সময়ে ঈশ্বরের চিন্তা করো। অন্যের সঙ্গে বলো শুধু ঈশ্বরকথা। তুমি যদি যীশুর উপর তোমার ভার দাও তা হলে তোমাকে নিরন্তর যীশুকেই চিন্তা করতে হবে। এই চিন্তার ফলে তুমি তদভাবাপন্ন হবে। সকল কাজই মনে হবে যীশুর কাজ। এই অবিচ্ছিন্ন চিন্তার নামই ভক্তি বা প্রেম। অনাস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ। ভক্তিই সবচেয়ে

সহজ সাধন। ভক্তি স্বাভাবিক, এতে কোনো যুক্তিতর্কের স্থান নেই। ভক্তি স্বয়ং প্রমাণ, এতে অন্য কোনো প্রমাণের অপেক্ষা নেই। যুক্তিতর্ক কাকে বলে? কোনো বিষয়কে আমাদের মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ করা। অর্থাৎ মনের জাল ফেলে কোনো বস্তুকে ধরে ফেলা আর বলা, প্রমাণ করেছি। সাধ্য নেই কোনো কালে জাল ফেলে ঈশ্বরকে ধরি। তিনি যে মন বুদ্ধি অহংকারের বাইরে।

ভক্তিযোগের প্রথম কথা, ঈশ্বরের জন্যে প্রবল অভাববোধ। আমরা ঈশ্বর ছাড়া আর সবই চাই যেহেতু জড়জগৎ থেকেই আমাদের সব বাসনার পূরণ হয়ে থাকে। যতদিন আমাদের প্রয়োজন জড়জগতেই সীমাবদ্ধ ততদিন আমাদের ঈশ্বরের জন্যে অভাববোধ নেই। কিন্তু যখন আমরা চারদিক থেকে ঘা খেতে থাকি, ইহজগতের সকল বিষয়েই নিরাশ হই, তখনই উচ্চতর কোনো বস্তুর জন্যে আমাদের প্রয়োজনবোধ জাগ্রত হয়। তখনই সুরু হয় আমাদের ঈশ্বরসন্ধান। ভক্তি আমাদের কোনো প্রবৃত্তিকেই ভেঙে-চুরে নষ্ট করে দেয় না, বরং ভক্তিযোগের এই শিক্ষা যে আমাদের সকল প্রবৃত্তিই মুক্তির উপায়স্বরূপ হতে পারে। ঐ সব প্রকৃতিকে ঈশ্বরাভিমুখী করো। যে ভালোবাসা অনিত্যে দিয়ে রেখেছ, ইন্দ্রিয়বিষয়ে দিয়ে রেখেছ, সেই ভালোবাসাই দাও এবার ঈশ্বরকে। যদি ভগবানকে ভালোবাসতে চাও, ভক্ত হতে চাও, তোমার বাসনাগুলো পুঁটলি করে বেঁধে দরজার বাইরে ফেলে দিয়ে ভিতরে গিয়ে ঢোকো। ভগবান রাজার রাজা, আমরা তাঁর কাছে ভিক্ষুকের বেশে যাব কেন? দোকানদারদের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই, কেনা-বেচা চলবে না সেখানে। বাইবেলে পড়নি যীশু ক্রেতা-বিক্রেতাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন মন্দির থেকে। ভক্তি বা প্রেমের পথে বিনা চেষ্টায় মানুষের সমস্ত ইচ্ছাশক্তি একমুখী হয়ে পড়ে যেমন ধরো স্ত্রী-পুরুষের প্রেম। ভক্তিই স্বাভাবিক পথ আর সে পথে যেতেও বেশি আরাম। জ্ঞানমার্গ কী রকম? যেন একটা প্রবলবেগশালিনী পার্বত্য নদীকে জোর করে ঠেলে তার উৎপত্তিস্থানে নিয়ে যাওয়া। এতে সত্বর বস্তু লাভ হয় বটে কিন্তু বড় কঠিন। জ্ঞানমার্গ বলে, সমুদয় প্রবৃত্তিকে নিরোধ করো। ভক্তিমার্গ বলে, স্রোতে গা ভাসিয়ে দাও, চিরদিনের জন্যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করো। এ পথ দীর্ঘ বটে কিন্তু অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুখকর।

ঈশ্বর বলে কেউ যদি নাও থাকেন তবুও প্রেমের ভাবকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকো। কুকুরের মত পচা মড়া খুঁজে খুঁজে মরার চেয়ে ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে করতে মরা ভালো। সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শই ঈশ্বর, তাই বেছে নাও, আর সেই আদর্শে পেঁছুবার জন্যে সারা জীবন নিয়োজিত করো। মৃত্যু যখন এত নিশ্চিত, তখন একটা মহান উদ্দেশ্যের জন্যে জীবনপাত করার চেয়ে আর বড় জিনিস কিছু নেই, পারে না হতে। সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।

বাইবেলে মার্থা-মেরীর কথা মনে পড়ে? তারা দু বোন, প্রভু যীশু একবার গিয়েছিলেন তাদের বাড়ি। তাঁকে সামনে দেখে এক বোন তো ভাবানন্দে বিহ্বল হয়ে উঠল, আরেক বোন ব্যস্তসমস্ত হয়ে যোগাড় করতে লাগল খাবার-দাবার। যীশুকে বললে, প্রভু, বিচার করো, আমার বোনের কাণ্ডটা দেখ। আমি তোমার জন্যে ছোটাছুটি করে খেটে-খেটে মরছি আর ও দিব্যি তোমার সামনে চুপচাপ বসে আছে।

যীশু বললেন, তোমার বোনই ধন্য, সে সব ছেড়ে দিয়ে একমাত্র ভক্তিকে আশ্রয় করেছে।

গৌরাঙ্গকে দেখে একজনের তাই হয়েছিল। কাঁদছে আর বলছে, সংসার আর আমার দেখা হবে না। আমার চোখ গৌরকে যেই একবার দেখেছে অমনি ডুবে মরেছে। আর তা ফিরে আসবে না আমার কাছে, দেখাবে না আর জগৎশোভা। আমার পোড়া মনও ডুবেছে, হায় সে ভুলে গেছে সাঁতার দিতে, ভুলে গেছে কূলে ফিরতে।

দুটো পথ—নেতিমার্গে জ্ঞানের আর ইতিমার্গে ভক্তির। জ্ঞান বড় দুর্গম স্থান। 'সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই।' ব্রহ্মজ্ঞানে গুরুশিষ্যের ভেদ বোঝা যায় না। ভক্তিতে তুমি প্রভু আমি দাস, তুমি মা আমি সন্তান, তুমি প্রিয়তম আমি সেবিকা। ভালোবেসে কী হবে? এ নির্বোধের প্রশ্ন আর কোরো না। আনন্দ পেতে এসেছ, একমাত্র ভালোবাসাতেই তো আনন্দ। শুধু ভালোবাসো, আর কিছু চেয়ো না, প্রেমপাত্র নিঃশেষ হবার নয়। কেন তীরে দাঁড়িয়ে আছ? প্রেমযমুনায় ঝাঁপিয়ে পড়ো, ডুবে যাও, মিশে যাও, তলিয়ে যাও।

নারদ রামকে বললে, প্রভু, তোমার পাদপদ্মে যেন শুদ্ধা ভক্তি থাকে। রাম বললে, নারদ, আর কিছু বর নাও। নারদ বললে, প্রভু আর কিছুই চাই না, শুধু অবিচলা স্থনির্মলা ভক্তিই আমার প্রার্থনা।

ভক্তেরই সম্পূর্ণ জগদেব নন্দনবনং।

হে স্রোতস্বিনী, তোমার অন্তরের জলভারই তোমাকে সমুদ্রের দিকে নিয়ে যাবে। প্রেমই তোমার পথ যে-পথ ঈশ্বরে গিয়ে পৌঁচেছে। ধারে চলছ তাতে ক্ষতি কী। যে নদী ধীরে চলে সে মানুষের দিক আর ঈশ্বরের দিক দুই দিকই সিক্ত করে উর্বর করে চলে। শুধু চলো, শুধু চলো, রূপসাগর পেরিয়ে অরূপের বন্দরে।

৬৮

বেড়াতে বেরিয়েছেন স্বামীজি। শিষ্য-শিষ্যারা যারা সঙ্গ নিয়েছে তাদের থেকে খানিক এগিয়ে গিয়েছেন বোধহয়। এ-পথ ও-পথ করে এ কোন পথে ঢুকে পড়লেন। সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। 'ছি ছি কী হবে?'

'ও'কে ধরে নিয়ে এস।' অস্ফুট স্বরে বলাবলি করতে লাগল সবাই, 'অন্য পথে নিয়ে চলো।'

কিন্তু এই আত্মভোলাকে কে নিবৃত্ত করবে? যে নিস্ত্রৈগুণ্য হয়ে পথ চলে তার বিধিই বা কী, নিষেধই বা কী! রাস্তার দুপাশে সারবন্দী ঘর, দুয়ারে সাজসজ্জা-করা কতগুলি মেয়ে দাঁড়িয়ে। স্বামীজি তাদের লক্ষ্যের মধ্যেই আনছেন না, ভাবাবেশে চলেছেন আপন মনে। মেয়ের দল দূর থেকে দেখতে পেয়েছে স্বামীজিকে। কে এই উন্নতদর্শন সুন্দর যুবাপুরুষ! হুতাশনে যাদের পতঙ্গবৃত্তি তারা স্বভাবতই চঞ্চল হয়ে উঠল। যদি এই রাজপুত্র আমার আলয়ে পদার্পণ করেন! যদি পারি এ'কে অভিনন্দন করতে। ব্রহ্মচর্যপ্রদীপ্ত নেত্রে সেই উদারধী উদাসীন চললেন এগিয়ে। মেয়েগুলো নানা রকম অঙ্গভঙ্গি সুরু করল। ঢেউ তুলল লাস্য-লালিত্যের। কলহাস্যের।

স্বামীজি দাঁড়িয়ে পড়লেন। প্রশ্ন করলেন শিষ্যদের, 'এরা কারা?'

'আপনি চলে আসুন।' লজ্জিত শিষ্যের দল উপরোধ করল।

'চলে যাব কেন ? ওরা যে আমাকে ডাকছে ইশারা করে। এস-এস বলছে।' স্বামীজি সরল শিশুর মুখে জিগগেস করলেন, 'ওরা কারা ?'

শিষ্য-শিষ্যারা মাথা নোয়াল। বললে, 'এটা পতিতার পল্লী।'

স্বামীজি ফিরলেন। ধীর পায়ে মেয়েদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, কারুণ্যপরিপূর্ণ চোখে তাকালেন মুখগুলির দিকে। স্নেহস্বরে বললেন, 'আহা, দুখিনী বাছারা আমার!'

এমনটি শুনতে পাবে এ কখনো কেউ ভাবেনি। সন্তান বলে সম্বোধন করছে ? ঘৃণা নয়, ক্রোধ নয়, শৃঙ্গারচেষ্টা নয়—জানাচ্ছে আত্মীয়ের মমতা! এ কে অভিনব! যে মুহূর্তে কলুষপরিবেশে নিয়ে আসতে পাবে শুচিস্পর্শ সমীরণ! এ যেন এক রাতের অতিথি নয়, এ অখণ্ড জীবনের অধীশ্বর।

মেয়েগুলি পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। না থাকল বিলোল অঙ্গ-ভঙ্গি, না বা কামকটাক্ষের কুটিলতা। এ যেন তাদের সামনে এক মহিমান্বিত আবির্ভাব, আর তার সামনে তাদের ভাষা একমাত্র প্রার্থনার ভাষা।

'এ তোমরা কী করছ ?' গভীর শান্তির সুরে বললেন স্বামীজি, 'তোমাদের এ দেহ ঈশ্বরের মন্দির, তাকে কেন পঙ্কে ফেলে রেখেছ ? আরো কত বড় সম্ভোগের সংবাদ দিতে পারে দেহ, আরো কত প্রসাদস্বাদের সম্ভাবনা! এই দেহ তো অমৃতপাত্র, তাকে কেন মদিরার ভাণ্ড করে তুলছ ? এই মদিরার আয়ু কতটুকু, তীব্রতা কতক্ষণ ? নিঃসীম-মহিমা মহামায়া তোমরা, যদি নাও একবার সেই মুক্তির স্পর্শ অমৃতের স্পর্শ, দেখবে তাতে ইতি নেই, বিরতি নেই, আসক্তি-বিরক্তি নেই, জীবনমরণের সীমানা ছাড়িয়ে তা অফুরন্ত ঝরে পড়ছে।'

মেয়ের দল, কোথায় হাত ধরে টানাটানি করবে, স্বামীজির পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। এ যেন তাদের সামনে স্বয়ং যীশুখৃস্ট এসে দাঁড়িয়েছেন। সমস্ত পাপ আর লজ্জার যেন স্খালন হয়ে গেল মুহূর্তে। শূন্যতা শুষ্কতা ও শ্রীহীনতার লেশমাত্র রইল না। উড়ে গেল অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপ। সকলে অন্তরে শুনতে পেল দিব্যকণ্ঠের সম্ভাষণ। তোমার এখনও সময় আছে, সব সময়েই সময় আছে। একবার অভিমুখী হও, নাও তোমার অমেয় সম্ভাবনার সংবাদ। সুযোগে-দুর্যোগে যে-কোন অবস্থায় যদি একবার শরণাগত হও তা হলেই তুমি আর প্রত্যাখ্যাত নও।

'শুকের কখনো মনে করে না সে অশুচি বস্তু খাচ্ছে, ঐ তার স্বর্গ।' বলছেন স্বামীজি, 'আর যদি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তার নিকটে এসে দাঁড়ায় সে তাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। ভোজনেই তার সমস্ত সত্তা, সমস্ত মনপ্রাণ নিয়োজিত। মানুষের সম্বন্ধেও তাই। ঐ শুকরশাবকের মতই তারা গভীর বিষয়পঙ্কে লুটোপুটি খাচ্ছে, তার বাইরে আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ইন্দ্রিয়সুখভোগের অপ্রাপ্তিই তাদের কাছে স্বর্গবিচ্যুতির মত। তারা কেবল লুচিমণ্ডারই স্বপ্ন দেখছে, তাদের স্বর্গের স্বপ্নও ঐ লুচিমণ্ডার স্বপ্ন। আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের ধারণা, স্বর্গ একটা ভালো মৃগয়ার জায়গা। আমাদের নিজ-নিজ বাসনার অনুরূপই স্বর্গের ধারণা। কিন্তু কে যেতে চায় স্বর্গে ? নাস্তিক চায় না, যেহেতু সে স্বর্গের অস্তিত্বই মানে না। ভক্তও চায় না যেহেতু স্বর্গ তার কাছে একটা ছেলেখেলামাত্র। ভক্ত কেবল চায় ঈশ্বরকে। ঈশ্বর ছাড়া জীবনের শ্রেষ্ঠতর লক্ষ্য আর কী হতে পারে ? ঈশ্বরই মানুষের সর্বোচ্চ লক্ষ্য সর্বোত্তম আদর্শ। সেই ঈশ্বরকেই

দেখ, ঈশ্বরকেই সম্ভোগ করো। ঈশ্বরই পূর্ণস্বরূপ। তেমনি প্রেমের চেয়েও উচ্চতর সুখ আমরা ধারণা করতে পারিনা। প্রেমই আনন্দস্বরূপ।

সংসারের সাধারণ স্বার্থপর যে ভালোবাসা তা অন্তঃসারশূন্য, অল্পস্থায়ী। স্ত্রী স্বামীকে খুব ভালোবাসে, যেই একটি ছেলে হল অমনি অর্ধেক বা তারও বেশি ছেলেটির প্রতি গেল। স্ত্রী নিজেই টের পাবে যে স্বামীর প্রতি তার আর সেই পূর্বের আকর্ষণ নেই। অহরহই আমরা দেখছি, যখনই অধিক ভালোবাসার বস্তু আমাদের কাছে উপস্থিত হয় তখন আগের ভালোবাসা ম্লান হয়ে যায়, অন্তর্হিতও হয় বা ধীরে ধীরে। স্বামীও স্ত্রীকে খুব ভালোবাসে, কিন্তু স্ত্রী রোগে বিধ্বস্ত হলে, রূপযৌবন হারিয়ে বিকৃতাকৃতি হলে অথবা সামান্য দোষ করলে তার দিকে আর চেয়েও দেখে না। ঈশ্বরের ভালোবাসার কোনো পরিবর্তন নেই। আর তিনি সর্বদাই সর্বাবস্থায়ই আমাদের গ্রহণ করতে প্রস্তুত। বলো এমন জনকে ভালোবাসব না? যার মনে ক্রোধ নেই ঘৃণা নেই, যার সাম্যভাব কখনও নষ্ট হয় না, যিনি অজ অবিনাশী—তাঁকে ছাড়া আর কাকে ভালোবেসে আমরা পরিপূর্ণ হব?

কী বলছেন যীশু? বলছেন, 'চাও, তবেই তোমাদের দেওয়া হবে। ঘা দাও, তবেই খুলে যাবে দরজা। খোঁজো তবেই পাবে মনোনীতকে।' চায় কে? খোঁজে কে? আমাদের চলতি কথায় বলে, মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার। গরীবের ঘর লুট করে বা পিঁপড়ে মেরে কী হবে? যদি নিতে হয় ভগবানটাকেই নেব। তাই ভক্তিই সর্বোচ্চ আদর্শ। লক্ষ লক্ষ বছরেও আমরা এই আদর্শ অবস্থায় উপনীত হতে পারি কিনা জানি না, কিন্তু একেই সর্বোচ্চ আদর্শ করতে হবে, ইন্দ্রিয়গুলিকে উচ্চতম বস্তু লাভের চেষ্টায় নিযুক্ত করতে হবে। যদি একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছানো নাও যায়, কিছু দূর পর্যন্ত তো যাওয়া যাবে। এই জগৎ ও ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন করেই ধীরে ধীরে এগুতে হবে ঈশ্বরের কাছে, যে প্রচ্ছন্নতম হয়েও প্রস্ফুটতম।

'শ্রীরামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে কারু-কারু অভিযোগ এই যে তিনি গণিকাদের অত্যন্ত ঘৃণা করতেন না।' বলছেন স্বামীজি, 'এ সম্পর্কে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের উক্তিটি মনোরম: শুধু রামকৃষ্ণ নয়, অন্যান্য ধর্মগুরুরাও এই অপরাধে অপরাধী। আহা, কী মধুর কথা! বুদ্ধদেবের কৃপাপাত্রী আম্রপালী ও হজরতের দয়াপ্রাপ্তা সামারিয়া নারীর কথা মনে পড়ে। দারুণ অভিযোগই বটে—মাতাল, বেশ্যা, চোর দুষ্টদের মহাপুরুষেরা কেন দূরদূর করে তাড়াতেন না, আর চোখ বুজে কেন ছেঁদো ভাষায় সানাইয়ের পোঁ-র সুরে কথা বলতেন না! আক্ষেপকারীর এই অপূর্ব পবিত্রতা ও সদাচারের আদর্শে জীবন গড়তে না পারলেই ভারত রসাতলে যাবে। যাক রসাতলে যদি ঐ রকম নীতির সহায়ে উঠতে হয়!'

'গণিকারা যদি দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে যেতে না পারে তো কোথায় যাবে?' আরো বলছেন স্বামীজি, 'পাপীদের জন্যেই প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবানের জন্যে তত নয়। মেয়েপুরুষ-ভেদ, জাতিভেদ, ধনভেদ, বিদ্যাভেদ—নরকের দ্বার এ সমস্ত ভেদ সংসারের মধ্যে থাকুক। পবিত্র তীর্থস্থানেও যদি ঐরূপ ভেদ হয়, তাহলে তীর্থ আর নরকে ভেদ কী? আমাদের মহাজগন্নাথপুরী—যেখানে পাপী, অপাপী, সাধু, অসাধু, আবালবৃদ্ধ-বনিতা নরনারী সকলের অধিকার—বছরের মধ্যে একদিন অন্তত হাজার-হাজার নরনারী পাপবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধির হাত থেকে নিস্তার পেয়ে হরিনাম করে ও শোনে, এইই পরম মঙ্গল।

যারা ঠাকুর ঘরে গিয়েও ঐ পতিত পাপী ঐ নীচ জাতি ঐ গরিব ঐ ছোটলোক ভাবে, তাদের, অর্থাৎ যাদের তোমরা ভদ্রলোক বলো, সংখ্যা যত কম হয় ততই মঙ্গল। যারা ভক্তের জাতি বা ব্যবসা দেখে তারা আমাদের ঠাকুরকে কী বুঝবে? প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি, শতশত বেশ্যা আসুক তাঁর পায়ে মাথা নোয়াতে। বরং একজনও ভদ্রলোক না আসে তো নাই আসুক। বেশ্যা আসুক, মাতাল আসুক, চোর-ডাকাত আসুক—তাঁর অবারিত দ্বার। 'বরং একটি উট ছুঁচের গর্তের ভিতর দিয়ে চলে যেতে পারে কিন্তু ধনীব্যক্তি ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।'

যিনি তাঁর বুদ্ধ-অবতারে রাজপুরুষের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে এক গণিকার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন, যাও, তাঁর পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হও আর তাঁকে এক মহাবলি প্রদান কর, জীবনবলি, যাদের তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন সেই সব দীন-দরিদ্র পতিত-উৎপীড়িতের জন্যে।'

আর বলো, মেয়েমাত্রই মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা। ভারতে আমরা যখন আদর্শ রমণীর কথা ভাবি তখন একমাত্র মাতৃভাবের কথাই আমাদের মনে আসে -মাতৃত্বেই তার আরম্ভ, মাতৃত্বেই তার শেষ। ভগবানকে তাই আমরা মা বলে ডাকি। পাশ্চাত্যে নারী স্ত্রীশক্তি। নারীত্বের ধারণা সেখানে স্ত্রীশক্তিতে কেন্দ্রীভূত। এদেশে আমি এমন পুত্র দেখিনি যে মাকে সর্বোচ্চ স্থান দিতে প্রস্তুত নয়। বলছেন বিবেকানন্দ : মৃত্যুসময়েও আমরা স্ত্রী-পুত্রকে মায়ের স্থান অধিকার করতে দিই না। যদি আগে মরি তবে তাঁর কোলেই মাথা রেখে মরতে চাই। নারীর নারীত্ব কি শুধু এই রক্তমাংসের শরীরের সঙ্গে জড়িত? দৈহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকতে হবে এমন আদর্শ কল্পনা করতেও হিন্দু ভয় পায়। মা এই একটি শব্দ ছাড়া আর দ্বিতীয় এমন কোন শব্দ আছে যার সম্মুখীন হতে কাম সাহস করে না, যাকে কোনো পশুত্বই পারে না স্পর্শ করতে। সেই অপূর্ব স্বার্থ-লেশহীনা সর্বংসহা ক্ষমাস্বরূপিণী মা-ই আমাদের আদর্শ। স্ত্রী তার পশ্চাদনুসারিণী ছায়া মাত্র।

বিবেকানন্দের আরো কথা। পশ্চিমে যে নারীপূজার কথা শুনে থাকি সাধারণত তা নারীর সৌন্দর্য ও যৌবনের পূজা। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু নারীপূজা বলতে বুঝতেন সকল নারীই সেই আনন্দময়ী মা, তাঁর পূজা। আমি নিজে দেখেছি, সমাজ যাদের ছোঁয় না, তিনি সেই পতিতাদের সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন, শেষে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পদতলে পড়ে অর্ধবাহ্য অবস্থায় বলছেন, মা, একরূপে তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছ আর একরূপে তুমি সমগ্র জগৎ হয়ে আছ। তোমাকে প্রণাম করি মা, তোমাকে প্রণাম করি। ভেবে দেখ সেই জীবন কত ধন্য যার থেকে সমস্ত রকম পশুভাব চলে গিয়েছে, যিনি প্রত্যেক রমণীকে ভক্তিভাবে দর্শন করেছেন, যাঁর কাছে সকল নারীর মুখই জগদ্ধাত্রীর মুখ। এই আমাদের চাই। রমণীর মধ্যে যে ঈশ্বরত্ব আছে তা তোমরা কী করে ঠেকাবে? কী করে ঠকাবে?

'ঈশ্বরে বিদ্যা-অবিদ্যা দুইই আছে।' বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ : 'বিদ্যামায়া ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায় অবিদ্যা মায়া মানুষকে ঈশ্বর থেকে তফাৎ করে। ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে আরেক ধাপ উপরে উঠবেই ব্রহ্মজ্ঞান। এ অবস্থায় ঠিক বোধ হচ্ছে ঠিক দেখছি তিনিই সব হয়েছেন। ত্যাজ্য গ্রাহ্য থাকে না। কারু উপর রাগ করবার যো নেই। গাড়ি করে যাচ্ছি, দেখলাম বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই বেশ্যা। দেখলাম সাক্ষাৎ ভগবতী—দেখে প্রণাম

করলাম। যখন এই অবস্থা প্রথম হল তখন মা কালীকে পুজো করতে বা ভোগ দিতে পারলাম না। হৃদে আর হলধারী বললে, খাজাঞ্চী বলেছে ভটচায্যি ভোগ দেবে না তো কী করবে? সঙ্গে কুবাক্য উচ্চারণ করেছে খাজাঞ্চী। কুবাক্য বলেছে শুনেও হাসতে লাগলাম, একটুও রাগ হল না। আবার বলছেন খানিক পর: 'ব্রহ্মজ্ঞান কি সহজে হয় গা? মনের নাশ না হলে হয় না। গুরু শিষ্যকে বলেছিল, তুমি আমায় মন দাও, আমি তোমাকে জ্ঞান দিচ্ছি। ওষুধ রক্তের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেলেই তো কাজ হবে। তখন, সে অবস্থায়, অন্তরে-বাহিরে ঈশ্বর। দেখবে তিনিই দেহ, তিনিই মন, তিনিই প্রাণ, তিনিই আত্মা।'

'তখন মানুষ যথার্থ ভালোবাসতে পারে যখন সে দেখতে পায় তার ভালোবাসার পাত্র কোন মর্ত জীব নয়, খানিকটা মৃৎখণ্ড নয়, স্বয়ং ভগবান।' বলছেন স্বামীজি, 'স্ত্রী স্বামীকে আরো বেশি ভালোবাসবে যদি সে ভাবে, স্বামী সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। স্বামীও স্ত্রীকে আরও বেশি ভালোবাসবে যদি সে জানে, স্ত্রী স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপা। তিনিই স্ত্রীতে তিনিই স্বামীতে বর্তমান। তোমার স্ত্রী থাক তাতে ক্ষতি নেই। তাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে এর কোন অর্থ নেই, কিন্তু ঐ স্ত্রীর মধ্যে ঈশ্বরকে দেখ। আর তুমি স্ত্রী, তোমার স্বামীর মধ্যে দেখ নারায়ণকে।'

'তিনিই মানুষ হয়ে লীলা করছেন।' বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ: 'আমি দেখি সাক্ষাৎ নারায়ণ। কাঠ ঘসতে ঘসতে যেমন আগুন বেরোয়, ভক্তির জোর থাকলে মানুষেও ঈশ্বরদর্শন হয়। তেমন টোপ হলে বড় রুইকাতলা কপ করে খায়। প্রেমোন্মাদ হলে সর্বভূতে সাক্ষাৎকার ঘটে। গোপীরা সর্বভূতে কৃষ্ণময় দেখেছিল। গাছ দেখে বললে, এরা তপস্বী, কৃষ্ণের ধ্যান করছে। তৃণ দেখে বললে, কৃষ্ণের পদস্পর্শে এ হচ্ছে পৃথিবীর রোমাঞ্চ। পতিব্রতাধর্মে স্বামী দেবতা। তা হবে না কেন? প্রতিমায় পুজো হয় আর জীবন্ত মানুষে কি হয় না?'

'ঘরে একলা বসে আছি, এমন সময় যদি কোন মেয়ে এসে পড়ে,' বলছেন আবার ঠাকুর: 'তাহলে একেবারে বালকের অবস্থা হয়ে যাবে। আর সেই মেয়েকে মা বলে জ্ঞান হবে। জানো, স্ত্রীলোক গায়ে ঠেকলে অসুখ হয়, যেখানে ঠেকে সেখানটা ঝনঝন করে, যেন শিঙি মাছের কাঁটা বিঁধলো। স্ত্রীসম্ভোগ স্বপনেও হল না।'

তেইশ-চব্বিশ বছরের যুবক ভবনাথ বিয়ে করে সংসারে পড়েছে। তার জন্যে ঠাকুর খুব চিন্তিত। নরেন তার বন্ধু, তাকে বলছেন বারে-বারে, ওরে ওকে খুব সাহস দে। ভবনাথ বলছেন, 'খুব বীর পুরুষ হবি। ঘোমটা দিয়ে কান্না, তাতে ভুলিসনে। শিকনি ফেলতে ফেলতে কান্না! ভগবানে ঠিক মন রাখবে। পরিবারের সঙ্গে কেবল ঈশ্বরীয় কথা কইবি।'

'জাতির জীবনে পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রথমে বৈবাহিক সম্বন্ধকে পবিত্র ও অবিচ্ছেদ্য করতে হবে' বলছেন স্বামীজি, 'আর তারই সাহায্যে মাতৃপুজার উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। ভারতীয় রমণীদের যে রকম হওয়া উচিত সীতা তার আদর্শ। সীতা শুদ্ধ হতেও শুদ্ধতরা, সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠামূর্তি। বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করে যিনি মহাদুঃখের জীবন যাপন করেছিলেন, সেই সাধ্বী সেই সদাশুদ্ধা শুধু নরলোকের নয় দেবলোকেরও আদর্শভূতা। সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবতারূপে বিরাজ করবেন। তিনি আমাদের জাতির মজ্জায়-মজ্জায় প্রবিষ্ট হয়েছেন,

আমাদের প্রতি শোণিতকণায়। আমরা সকলেই সীতার সন্তান। তিতিক্ষার প্রতিমূর্তিই সীতা, সর্বংসহা, সদাপতিপরায়ণা। এত দুঃখ এত অবিচার, তবুও চিত্তে বিন্দুমাত্র বিরক্তি নেই। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, আঘাতের পরিবর্তে আঘাত করলে সেই আঘাতের কোনো প্রতিকার হল না, তাতে কেবল জগতে আরেকটি পাপের বৃদ্ধিমাত্র হল। ভারতের এই বিষয়ে ভাবটিই সীতার প্রকৃতিগত।'

আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে অনেকের আক্ষেপ এই যে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুরতা করেছেন। তাতে কী বলছেন ম্যাক্সমুলার? বলছেন, 'তিনি স্ত্রীর অনুমতি নিয়েই সন্ন্যাসব্রত ধারণ করেন। আর যতদিন তিনি মর্তকায়ায় ছিলেন, তাঁকে গুরুভাবে গ্রহণ করে স্বেচ্ছায় পরমানন্দে ব্রহ্মচারিণীরূপে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত ছিলেন।' আরো বলছেন অধ্যাপক: 'শরীর সম্বন্ধ না থাকলে কি বিবাহে এতই অসুখ? শরীর সম্বন্ধ না রেখে ব্রহ্মচারিণী পত্নীকে অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মানন্দের ভাগিনী করে ব্রহ্মচারী পতি যে পরম পবিত্রভাবে জীবন কাটাতে পারে এ বিষয়ে ইউরোপীয়ানরা সফলকাম হয়নি বটে কিন্তু হিন্দুরা যে অনায়াসে কামজিৎ অবস্থায় থাকতে পারে এ আমি বিশ্বাস করি।'

'অধ্যাপকের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।' স্বামীজি বলছেন উল্লসিত হয়ে: 'ব্রহ্মচর্যই ধর্মলাভের একমাত্র উপায় বিজাতি বিদেশী হয়েও ম্যাক্সমুলার তা বোঝেন আর ভারতে যে সে রকম ব্রহ্মচারী বিরল নয় এও তিনি বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমাদের ঘরের মহাবীরেরা বিবাহে শরীর সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছুই পান না খুঁজে।'

যিনি বরসুধা ভক্তগণদীপিকা, ধারাধরশ্যামলা, কুমারীপূজনপ্রসন্না, গগনগা, গায়ত্রী-স্বরূপা, ধরিত্রীরূপিণী সেই শিবসতী কারুণ্যবারিনিধি জননী ভগবতীকে ভাবনা করি। যিনি অরুণকমলসংস্থা, রজঃপুঞ্জবর্ণা, চতুর্ভুজা, দু করে দুটি কমল আর দু করে বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা, প্রকোষ্ঠে মণিময় বলয়, সেই বিচিত্রালঙ্কৃতা ভুবনমাতা পদ্মাক্ষী মহালক্ষ্মী আমাদের শ্রীমন্ত করুন। হে পরম ব্রহ্মমহিষী, আগমবিদ জ্ঞানীরা ব্রহ্মার পত্নীকে বাগদেবী ক্রিয়াশক্তি বলে, হরিপত্নীকে পদ্মা জ্ঞানশক্তি বলে, অদ্রিতনয়াকে হরসচরী ইচ্ছা-শক্তি বলে। কিন্তু হে মহামায়ে, ত্রিশক্তির অতীত ত্রিগুণাতীতা চতুর্থী চিতিশক্তি তুমি কে? হে দুর্বিজ্ঞগম্যা, নিঃসীমমহিমা তুমি এই বিশ্বকে ভ্রামিত করছ। হে নিধে, নিত্যস্মরে, নিরবধিগুণে—হে বিশ্ব-আধারভূতে, নিত্যহাস্যাননা, অসীমগুণশালিনি, হে নীতিনিপুণে বেদান্তবেত্তাচিত্তবাসিনি, নির্মতিনির্মুক্তে, নিখিলবেদান্তস্তুতপদে, নিত্য নিবাতস্কে, আমার এই স্তবকে বেদতুল্য প্রামাণ্য করে দাও।

৬৯

'এখন এখানে ভারতের খুব সুনাম বেজে গেছে।' আলাসিঙ্গাকে লিখছেন স্বামীজি: 'যদিও আমার বিরুদ্ধে মিশনারিদের গালিগালাজের কমতি নেই। আমার সম্বন্ধে যে সমস্ত কুৎসিত গল্প তৈরি করে প্রচার করছে তা যদি শোনো অবাক হয়ে যাবে। এখন তোমরা কি বলতে চাও যে সন্ন্যাসী হয়ে আমি ক্রমাগত ও-সমস্ত কুৎসিত আক্রমণের প্রতিবাদ করে বেড়াব? আত্মসমর্থনে ছড়িয়ে বেড়াব প্রশংসার চিঠি? আর তোমরা নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমুবে? লড়াই করবার ভারটা তোমরা নিতে পারো না? তাহলে

আমি নিশ্চিন্তে আমার প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতে পারি প্রাণপণে। এখানে আমি দিনরাত অচেনাদের মধ্যে কাজ করছি, প্রথমত, অন্নের জন্যে, দ্বিতীয়ত, যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করে ভারতীয় বন্ধুদের সাহায্য করবার জন্যে। কিন্তু ভারত কী সাহায্য পাঠাচ্ছে জিগগেস করি? এদেশের অনেকে তোমাদের অর্ধনগ্ন বর্বর জাতি বলে মনে করে, সেই কারণে ভাবে যে চাবুক মেরে তোমাদের মধ্যে সভ্যতা ঢোকাতে হবে। এর উলটো দিক তোমরা দেখাও না কেন? তোমরা কিছুই করতে পারো না, শুধু কুকুর বেড়ালের মত বংশবৃদ্ধি করতে পারো। যদি তোমরা বিশ কোটি লোক দুষ্টু মিশনারিদের ভয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকো, একটা কথাও না বলো, তাহলে এই সুদূর দেশে আমি একা লোক কী করব বলো? তোমরা আমেরিকার কাগজে হিন্দুধর্মের সমর্থনে কেন লিখে পাঠাও না? কে তোমাদের ধরে রাখছে? বোস্টনের এরিনা মাসিক পত্র তোমাদের লেখা সানন্দে ছাপবে আর যথেষ্ট টাকা দেবে। তোমরা তা করবে কেন? দৈহিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সব বিষয়ে তোমরা কাপুরুষ। তোমরা শুধু একজন সন্ন্যাসীকে খুঁচিয়ে তুলে দিনরাত লড়াই করাতে চাও, আর তোমরা নিজেরা সাহেব দেখলেই ভয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকবে। কথাটি কইবে না। তোমরা জানো, আমি এ দেশে নাম-যশ খুঁজতে আসিনি, যদি তা এসে পড়ে থাকে সেটা আমার অনিচ্ছাসত্ত্বে। এ পর্যন্ত যে সব হতভাগ্য হিন্দু এ দেশে এসেছে তারা অর্থ ও সম্মানের জন্যে নিজের দেশ ও ধর্মের কেবল কুৎসা করেছে। আমি সে দলের নই। আমি যদি বিষয়ী হতাম, কপট হতাম, তবে এখানে একটা বড় সঙ্ঘ ফেঁদে বেশ গুছিয়ে নিতে পারতাম। হায়, হায়, এখানে ধর্ম বলতে এর বেশি কিছু বোঝায় না। টাকার সঙ্গে নামযশ এই হল পুরোতের দল। আর টাকার সঙ্গে কাম এই হল সাধারণ গৃহস্থ। আমাকে এখানে একদল নতুন মানুষ সৃষ্টি করতে হবে, যারা ঈশ্বরে অকপট বিশ্বাসী আর যারা সংসার-উদাসীন। ভয় নেই, আমি কারু সাহায্য চাইনে। আমি নিজের মস্তিষ্ক ও দৃঢ় দক্ষিণ বাহুর সাহায্যেই সব করব।

ভারতে গিয়ে আমি কী করব? মাদ্রাজে তেমন লোক কোথায় যে ধর্মপ্রচারের জন্যে সংসার ত্যাগ করবে? দিবারাত্র বংশবৃদ্ধি ও ঈশ্বরানুভূতি একসঙ্গে একদিনও চলতে পারে না। আমিই একমাত্র লোক যে সাহস করে নিজের দেশকে সমর্থন করেছি এদেশে, আর এদেশের নিন্দুকের দল হিন্দুদের কাছ থেকে যা আশা করেনি তাই আমি তাদের দিয়েছি—তারা যেমন ইঁট মেরেছে তার বদলে আমি তেমনি পাটকেল মেরেছি—সুদে-আসলে। কখনো আমি তোমাদের মত কাপুরুষ হব না, কাজ করতে-করতেই মরব, করব না পলায়ন। না, কখনো না।'

মানুষের মন রেখে কথা বলতে নারাজ স্বামীজি। তাঁর আমেরিকান বন্ধুরা কত তাঁকে উপদেশ দিচ্ছেন বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে একটু নরম হয়ে কথা বলতে, কিন্তু সিংহকে তিনি মেষশাবকের অনুপাতে নিয়ে আসতে রাজি নন। তাঁর এই অনমনীয় মনোভাবে হেল-পরিবারের লোকেরাও যেন বিব্রত বোধ করছে। তাঁর দৃঢ়তাকে মনে করছে বা নম্রতার অভাব। মিস হেল অভিযোগ করে চিঠি লিখল স্বামীজিকে। তাতে একটু বুঝি বা তিরস্কারের ছোঁয়াচ।

উত্তরে লিখছেন স্বামীজি: 'তোমার সমালোচনার জন্যে আমি আনন্দিত। সেদিন মিস থার্সবির বাড়িতে এক প্রেসবিটেরিয়ান ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার তর্ক হয়েছিল,

আর যেমন রেওয়াজ, সেই ভদ্রলোক ভীষণ তপ্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। আমিও বিশেষ ঠাণ্ডা ছিলাম না। এর জন্যে মিসেস বুল আমাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন, বলেছিলেন ও রকম বাদানুবাদে আমার কাজ ব্যাহত হয়। এখন দেখছি তোমারও সেই মত। আমিও এ বিষয় ভেবে দেখেছি। শোনো, এসবের জন্যে আমি মোটেও দুঃখিত নই, আমার এক বিন্দু অনুতাপ নেই। হয়তো এ শুনে তুমি বিরক্ত হবে কিন্তু আমি অনুপায়। আমি জানি যার পার্থিব বিষয়ে লক্ষ্য তার পক্ষে মধুর হওয়া কত সুবিধে, কিন্তু যখন অন্তরস্থ সত্যের সঙ্গে মীমাংসার প্রশ্ন আসে তখন আর মাধুর্যে আমি সম্মত নই। আমি নম্রতায় বিশ্বাস করি না, আমার বিশ্বাস সমদর্শিতায় সকলের প্রতি মনোভাবের সমত্বে। সাধারণ লোকের কর্তব্যই হচ্ছে তার সমাজরূপী দেবতার তাঁবেদারি করা—যারা জ্যোতির তনয় তাদের তা ধর্ম নয়। সাধারণ লোক কী করে ? তারা তাদের পারিপার্শ্বের নিয়মকানুনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলে। আর যা আকাঙ্ক্ষিত তাই আদায় করে নেয়। যে জ্যোতির তনয় সে ও-সব সঙ্কীর্ণ হিসেবের ধার ধারে না। সে একা দাঁড়ায়, দূরে দাঁড়ায় আর সমস্ত সমাজকে তার কাছে তুলে নিয়ে আসে। সাধারণ সুবিধাবাদী লোক গোলাপ-বিছানো রাস্তা বাছে আর সত্যের সন্তানেরা কণ্টকাকীর্ণ পথেই যাত্রা করে। জনমত-সেবীরা অচিরে ধ্বংস হয় আর যারা সত্যের সন্তান তাদেরই অমেয় পরমায়ু।

প্রেসবিটেরিয়ান পুরোতের সঙ্গে ও পরে মিসেস বুলের সঙ্গে আমার তীব্র সংঘর্ষ আমাকে আমাদের মনুর সেই কথাটাই সবলে মনে করিয়ে দিচ্ছে : অবস্থান করো একাকী, বিচরণ করো একাকী। ভগিনী, পথ দীর্ঘায়ত, সময় স্বল্প, সন্ধ্যা সমাসন্ন—শিগগিরই আমাকে ফিরে যেতে হবে গৃহে। আমার আদবকায়দায় পালিশ বুলোবার আমার আর সময় নেই—আমার পরমবক্তব্যকেও হয়তো সম্পূর্ণ বলে যেতে পারব না। তুমি কত ভালো, কত তোমার দয়া, রাগ কোরো না, তোমরা শিশু, শিশু ছাড়া কিছু নও।

মিসেস বুল-এর মত যদি তুমি ভেবে থাকো আমার কোনো কাজ আছে, তাহলে বলব, তোমার ভীষণ ভুল হচ্ছে। পৃথিবীতে বা পৃথিবীর বাইরে আমার কিছুই করণীয় নেই। শুধু আমার এক বক্তব্য আছে—তা আমি নিজের ধরনে প্রচার করব, তা আমি হিন্দুত্বের ছাঁচে ঢালব না, না বা খৃস্টিয়ানির ধাঁচে—আমার বক্তব্য, শুধু তা আমারই ধাঁচে হবে। ব্যস, এই কথা। মুক্তি—মুক্তিই আমার ধর্ম, আর যা কিছু তাকে প্রতিহত করতে চায় তাকে আমি পরাভূত করব, হয় প্রহারে নয় পরিহারে। পুরোতদের ঠাণ্ডা করতে হবে, তাদের সঙ্গে মিটমাট আর তারই জন্যে নরম হওয়া, মধুর হওয়া অসম্ভব, ভগিনী, অসম্ভব!'

সকলের চেয়ে বেশি পাপ হচ্ছে, নিজেকে দুর্বল ভাবা। বলছেন স্বামীজি : তোমার চেয়ে বড় আর কে আছে ? উপলব্ধি করো যে তুমি ব্রহ্মস্বরূপ। যেখানে যা শক্তির বিকাশ দেখছ, ভাবো, সে শক্তি তোমারই দেওয়া। আমরা সূর্য চন্দ্র তারা, সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চের ঊর্ধ্বে। মন্দ বলে কিছু আছে এটি স্বীকার কোরো না, যা নেই তাকে আর সৃষ্টি কোরো না নতুন করে। সদর্পে বলো আমিই আমার প্রভু, সকলের প্রভু। আমরাই নিজের-নিজের শৃঙ্খল গড়েছি, আর আমরাই ইচ্ছা করলে ভাঙতে পারি সে শৃঙ্খল। স্বাধীনতার অপূর্ব মুক্তবায়ু সম্ভোগ করো। তুমি তো মুক্ত, মুক্ত, মুক্ত। অবিরত বলো আমি সদানন্দস্বভাব, মুক্তস্বভাব, আমি অনন্ত স্বরূপ। আমার আত্মাতে আদি-অন্ত নেই। চিত্ত শুদ্ধ করো, ধর্মের এই হচ্ছে সার কথা। অপবিত্র চিন্তা অপবিত্র ক্রিয়ার মতই দোষাবহ। কামেচ্ছাকে

দমন করলে তা থেকে উচ্চতম ফল পাওয়া যায়। কামশক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত করো। নিজেকে পুরুষত্বহীন কোরো না, কারণ তাতে কেবল শক্তির অপচয় হবে। এই শক্তিটা যত প্রবল থাকবে এর দ্বারা তত বেশি কাজ হবে। প্রবল জলের স্রোত পেলেই তার সাহায্যে খনির কাজ করা যেতে পারে।

যদি আমরা নিজেরা পবিত্র হই তবে বাইরে অপবিত্রতা দেখতে পাব না। আমার নিজের ভিতরে দোষ আছে বলেই তো অপরের ভিতরে দোষ দেখি। প্রত্যেক নরনারী বালকবালিকার মধ্যে ব্রহ্মকে দর্শন করো, অন্তর্জ্যোতি দিয়ে তাঁকে দেখ। যে যা চায় সে তাই পাবে, সুতরাং সংসারকে চেয়ো না, ভগবান, একমাত্র ভগবানকেই চাও। ভগবানকেই অন্বেষণ করো। যত অধিক শক্তি লাভ হবে ততই বন্ধন আসবে ভয় আসবে। একটা সামান্য পিঁপড়ের চেয়ে আমরা কত বেশি ভীতু আর দুঃখী। এই সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চের বাইরে ভগবানের কাছে যাও। স্রষ্টার তত্ত্ব জানবার চেষ্টা করো, সৃষ্টের তত্ত্ব জেনে কী হবে?

স্বামীজি সাত সপ্তাহ ছিলেন সহস্র দ্বীপোদ্যানে। আর, একদিন নির্জনে, সেন্ট লরেন্সের পাড়ে, তাঁর নির্বিকল্প সমাধি হল।

তেলাপোকা যেমন অন্য বিষয়ে আসক্তি ছেড়ে সর্বদা কাঁচপোকার চিন্তা করে তার স্বরূপ্য লাভ করে, তেমনি নিয়তনিষ্ঠায় পরমাত্মতত্ত্ব ধ্যান করে ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। স্থূল প্রত্যক্ষের দ্বারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাত্ম তত্ত্ব জানা অসাধ্য। অতি বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা যোগ ও সমাধিবলেই তা জানা যায়। আগুনে সংস্কৃত হলে সোনা যেমন ময়লা ছেড়ে তার নিজ বিশুদ্ধ রূপ লাভ করে, তেমনি মনও ধ্যানের সাহায্যে সত্ত্বরজতম মল ত্যাগ করে চিৎস্বরূপ ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। নিরন্তর অভ্যাসবলেই পরিপক্ব মনে ব্রহ্মে বিলীন হতে পারে। এই নির্বিকল্প সমাধিতেই যাবতীয় বাসনার বিনাশ হয়, অখিলকর্ম নষ্ট হয়ে যায়, অন্তরে বাহিরে যত্ন ছাড়াই স্বরূপস্ফূর্তি ঘটে। শ্রবণের চেয়ে মনন শতগুণে শ্রেষ্ঠ, মননের চেয়ে নিদিধ্যাসন বা অনন্যচিত্ততা লক্ষ গুণে শ্রেষ্ঠ। নিদিধ্যাসনের চেয়ে নির্বিকল্প ভাব অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। তাই, হে বৎস, গুরু বলছেন শিষ্যকে, তুমি ইন্দ্রিয় সংযম করে প্রশান্তভাবে নিরন্তর পরমাত্মাতে সমাধি-অভ্যাসে প্রবৃত্ত হও ও ব্রহ্ম সঙ্গে তাদাত্ম্য অনুভূতি দ্বারা অবিদ্যাজনিত তিমিররাশি দূর করে দাও।

সহস্রদ্বীপোদ্যান থেকে স্বামীজি ফিরে এলেন নিউইয়র্কে। খেতড়ির মহারাজাকে লিখছেন: 'অগাস্টের শেষে লন্ডনে যাব মনে করেছি, সেখানে আমার কয়েকটি বন্ধু জুটেছে। দেখি ওদিকের পাদ্রীদের কেমন হৈ-চৈ। আগামী শীতকাল খানিকটা লন্ডনে খানিকটা নিউইয়র্কে কাটাতে হবে, তার পরেই আর দেশে ফেরবার আমার বাধা থাকবে না। যদি প্রভুর কৃপা হয়, এই শীতের পরে এখানকার কাজ চালাবার জন্যে যথেষ্ট লোক পাওয়া যাবে। প্রত্যেক কাজকেই তিনটে অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয়—উপহাস, বিরোধ ও শেষে স্বীকৃতি। যদি কেউ চলতি ভাবের বাইরে উচ্চতর তত্ত্ব প্রকাশ করে তাকে নিশ্চিত লোকে ভুল বুঝবে। সুতরাং বাধা অত্যাচার আসুক, আসতে দিন, সুস্বাগতম—কেবল আমাকে দৃঢ় ও পবিত্র হতে হবে আর ভগবানে প্রবল বিশ্বাস রাখতে হবে, তবেই উড়ে যাবে কুয়াশা।'

আলাসিঙ্গাকে লিখছেন: 'আলাসিঙ্গা, শুধু কাজে লাগো, কাজ করো। আর মনে রেখো, মানুষ দুবার মরে না, একবার মাত্রই মরে।

একটা পুরোনো গল্প শোনো। এক বুড়ো তার দরজার গোড়ায় চুপচাপ বসে আছে। পথচলতি একটা লোক তাকে জিগগেস করলে, ভাই, অমুক গাঁটা এখান থেকে কত দূরে? প্রশ্নটা বুড়ো কানেও তুলল না। পথিক আবার জিগগেস করল। বুড়ো আগের মতই রইল নীরবে। সে কী, কানে শুনতে পান না, না কি বোবা? পথিক কণ্ঠ কটু করে আবার জিগগেস করল। এবারও বুড়ো নির্বাক। পথিক বিরক্ত হয়ে পথ ধরে চলতে আরম্ভ করল। তখন বুড়ো চেঁচিয়ে তাকে ডাকল, বললে, আপনি অমুক গাঁয়ের কথা জিগগেস করছিলেন না? সেটা মাইলখানেক হবে এখান থেকে। পথিক বললে, এতক্ষণ এত অনুরোধ-উপরোধ করছিলাম, কই একটা শব্দও তো করেননি, এখন জানাবার দরকার কী? বুড়ো হাসল। বললে, যতক্ষণ জিগগেস করছিলেন, নিষ্ক্রিয়ের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন নিঃশব্দে। তাই সাহায্য করিনি। এখন দেখছি নিজের বুদ্ধিতেই হাঁটতে সুরু করেছেন, তাই জানিয়ে দিলাম কথাটা।

আলাসিংগা, গল্পটা মনে রেখো। যে কাজ করে যে কাজে লাগে তাকেই ভগবান পথ দেখান। তারই সব কিছু যুগিয়ে যেন অকাতরে।

'কেবল মানুষই ঈশ্বর হতে পারে।' মিসেস বুলকে লিখছেন স্বামীজি। আবার ই. টি. স্টার্ডিকে লিখছেন: 'বাকসর্বস্ব ধর্মপ্রচারক দেখে আমার যে ভয় পাবার কিছু নেই তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষেরা কখনো অন্যের শত্রুতা করতে পারে না। বনবাগীশরা বক্তৃতা করুক। তার চেয়ে বেশি আর তারা কী দেবে? নামযশ কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে তারা বিভোর থাক। কিন্তু আমরা যেন ধর্মোপলব্ধিতে আরূঢ় হই, ব্রহ্ম হওয়ার জন্যে হই দৃঢ়ব্রত। যেন মৃত্যু পর্যন্ত আঁকড়ে থাকতে পারি সত্যকে। অন্যের কথায় যেন কান না দিই।

ভারতকে আমি সত্যিই ভালোবাসি। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, ইংল্যান্ড বা আমেরিকা কী। ভুলে লোকে যাকে মানুষ বলে আমরা তো সেই নারায়ণেরই সেবক। যে বৃক্ষমূলে জল সেচন করে সে কি আরেকভাবে সমস্ত বৃক্ষেরই সেবা করে না?'

লেগেট ইংলণ্ড থেকে নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে এসেছে। অগাস্টের শেষাশেষি প্যারিসে রওনা হলেন স্বামীজি। রওনা হবার আগে শিকাগোতে গেলেন হেল-দের সংগে দেখা করতে। প্যারিস থেকে পাড়ি দেবেন লণ্ডন।

যাবার আগে লিখছেন আলাসিঙ্গাকে: 'মিশনারিদের নিয়ে মাথা ঘামিও না। তারা যে চেঁচাবে এ তো স্বাভাবিক। অন্ন মারা গেলে কে না চেঁচায়? গত দুবছরে মিশ-নারিদের ট্যাঁকে প্রকাণ্ড ফাঁক পড়েছে, তাদের অস্থির না হয়ে উপায় কী। যতদিন তোমাদের ঈশ্বর ও গুরুর উপর বিশ্বাস থাকবে আর সত্যে নিঃসংশয় মতি, ততদিন, হে বৎস, কোনো কিছুতেই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তবে ঐ তিনটের একটা যদি চলে যায় বা টলে যায় তাহলেই বিপদ। তাহলেই পতন।

আমি সত্যে বিশ্বাসী। যেখানেই যাই না কেন প্রভু আমার জন্যে দলে-দলে কর্মী পাঠান। আর তারা ভারতীয় শিষ্যের মতন নয়, তারা তাদের গুরুর জন্য প্রাণত্যাগ করতে প্রস্তুত। সত্যই আমার ঈশ্বর, সমগ্র জগৎ আমার দেশ। আমি কর্তব্যে বিশ্বাসী নই। কর্তব্য হচ্ছে সংসারীর অভিশাপ, সন্ন্যাসীর কর্তব্য বলে কিছু নেই। আমি মুক্ত, আমার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে—আমার আবার কর্তব্য কী! এ শরীর কোথায় যায় না যায় তা আমি গ্রাহ্য করি না।

তোমাদেরই বা ঠিক-ঠিক ধর্মভাব কোথায় ? তোমাদের ঈশ্বর হচ্ছেন রান্নাঘর, তোমাদের শাস্ত্র ভাতের হাঁড়ি। আর তোমাদের শক্তির পরিচয় নিজেদের মত রাশি-রাশি সন্তান-জন্মদান। তোমরা যেন সেই প্রাচীন কালের ইহুদী—সেই গল্পের কুকুরের মত নিজেরাও খাবে না অন্যকেও খেতে দেবে না। তোমরা কয়েকটি ছেলে, সন্দেহ নেই, খুব সাহসী, কিন্তু মাঝে-মাঝে মনে হয় তোমরাও বিশ্বাস হারাচ্ছ। কিন্তু আমি বিশ্বাসে নির্বিচল। আমি ঈশ্বরের সন্তান, আমার এক সত্য জগৎকে শেখাবার আছে। আর যিনি আমাকে ঐ সত্য দিয়েছেন তিনিই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ। আর তিনিই আমাকে বীর্যবত্তম সহকর্মী জুটিয়ে দেন। অপেক্ষা করো, দেখবে কয়েক বছরের মধ্যেই প্রভু পাশ্চাত্ত্য দেশে কী কাণ্ড করেন !'

৭০

'যাঁর প্রেমপ্রবাহ আচণ্ডাল বহমান, অপ্রতিহতগতি, যিনি লোকাতীত হয়েও লোক-কল্যাণমার্গ ত্যাগ করেন নি, ত্রৈলোক্যেও যিনি মহিমায় অপ্রতিম, যিনি জানকীপ্রাণবন্ধ, যাঁর জ্ঞানস্বরূপ রামদেহ ভক্তিস্বরূপিণী সীতা দ্বারা আবৃত ; আর যিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কোলাহল স্তব্ধ করে অজ্ঞানরজনীর অন্ধকার দূর করে সীতারূপ সিংহনাদ তুলে-ছিলেন, দুজনে এখন একত্র হয়ে প্রথিতপুরুষ রামকৃষ্ণরূপে প্রকট হয়েছেন।'

তাঁকে প্রণাম।

স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥

স্টার্ডিকে লিখছেন স্বামীজি : 'আমার নিজের জীবনের একটু অভিজ্ঞতা তোমাকে জানাই। যখন আমার গুরুদেব দেহত্যাগ করলেন তখন আমরা বারোজন অজ্ঞাত অখ্যাত কপর্দকহীন যুবক তাঁকে ঘিরে ছিলাম। আর বহু শক্তিশালী সঙ্ঘ আমাদের পিষে মারবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের থেকে পেয়েছিলাম আমরা এক অতুল ঐশ্বর্য, শুধু বাকসর্বস্ব না হয়ে যথার্থ জীবনযাপনের জন্যে একটা দুর্নিবার ইচ্ছা ও বিরামবিহীন সাধনার অনুপ্রেরণা। আজ সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁকে জানে, শ্রদ্ধায় তাঁর পায়ে মাথা নোয়ায়। তিনি যে সত্য প্রচার করেছেন তা দাবানলের মত দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। দশ বছর আগে তাঁর জন্মতিথি উৎসবে একশো লোক একত্র করতে পারিনি, আর গত বৎসর তাঁর উৎসবে পঞ্চাশ হাজার লোক সমবেত হয়েছিল।'

'রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার এসব প্রচার করবার আবশ্যক নেই।' শশী মহারাজকে লিখছেন স্বামীজি : 'তিনি পরোপকার করতে এসেছিলেন, নিজের নাম প্রচার করতে নয়। রামকৃষ্ণ কোনো নতুন তত্ত্ব চালাতে আসেন নি, তিনি ভারতবর্ষের সমগ্র অতীত ধর্মচিন্তার সাকার বিগ্রহ। প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের প্রকৃত তাৎপর্যের উদ্ঘাটনই তাঁর জীবন।'

'তাঁর জন ছাড়া কোথাও আর পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা দেখতে পাই না। সকল জায়গাতেই যে ভাবের ঘরে চুরি, কেবল তাঁর ঘর ছাড়া। দেখতে পাচ্ছি তিনিই রক্ষে করছেন। ওরে পাগল, পরীর মত মেয়ে সব, লাখ লাখ টাকা—সব তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে। এ কি আমার জোরে ? না। তিনি রক্ষা করছেন, তিনি।'

অধর সেনের বাড়িতে, বৈঠকখানায়, ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসে আছেন। নরেন গান গাইবে তার আয়োজন চলছে। তানপুরা বাঁধতে গিয়ে তার ছিঁড়ে গেল হঠাৎ। ওরে কী করলি ? ঠাকুর প্রায় কেঁদে উঠলেন। নরেন বাঁয়া তবলা বাঁধছে। ঠাকুর বললেন, 'তোর বাঁয়া যেন গালে চড় মারছে।'

কীর্তনাঙ্গের কথা উঠল। নরেন বললে, কীর্তনে তাল সম নেই, তাই অত জনপ্রিয়।

'তুই এটা কী বললি !' বললেন ঠাকুর, 'করুণ বলে লোকে এত ভালোবাসে।' নরেন গান ধরল : যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে

আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে॥
তুমি ত্রিভুবননাথ, আমি ভিখারী অনাথ
কেমনে বলিব তোমায় এস হে মম হৃদয়ে॥

হাজরার দিকে তাকিয়ে ঠাকুর হাসলেন। 'প্রথম দিনে এই গানটাই গেয়েছিল। ওরে, সেই গানটা গা ? আমায় দে মা পাগল করে।'

নরেন গান ধরল : 'আমায় দে মা পাগল করে। আর কাজ নেই জ্ঞানবিচারে॥'

ঠাকুর বলছেন, 'জ্ঞানী রূপও চায় না অবতারও চায় না। বনে যেতে যেতে রামচন্দ্র কতগুলি ঋষি দেখতে পেলেন। ঋষিরা বললে, রাম, তোমাকে দেখে আমাদের নয়ন সফল হল। কিন্তু আমরা জানি তুমি শুধু দশরথের বেটা। ভরদ্বাজ তোমাকে অবতার বলে। কিন্তু আমরা তা বলি না। আমরা শুধু সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দের চিন্তা করি। রাম হাসতে লাগলেন। আমার সে কী অবস্থাই গেছে ! মন অখণ্ডে লয় হয়ে গেল। জড় হয়ে গেলুম। ঘরে ছবিটবি যা ছিল ফেললুম সরিয়ে। কিন্তু আবার যখন হুঁশ এল, মন নেমে আসবার সময় আঁকু-পাঁকু করতে লাগল। তখন ধরি কী, তখন কী নিয়ে থাকি ! তখন আমার ভক্তি-ভক্তের উপর মন এল। সমাধিস্থ লোক যখন সমাধি থেকে ফিরবে তখন কী নিয়ে থাকবে ? কাজেই ভক্তি-ভক্ত চই। তা না হলে মন দাঁড়ায় কোথায় !

'প্রহ্লাদ, নারদ, হনুমান এরাও সমাধির পর রেখেছিল ভক্তি।'

'জ্ঞান ভক্তি দুটোই পথ।' বললেন আবার ঠাকুর, 'যে পথ দিয়ে যাবে তাঁকেই পাবে। জ্ঞানী একভাবে তাঁকে দেখে, ভক্ত আরেকভাবে। জ্ঞানীর ঈশ্বর তেজোময়, ভক্তের রসময়।'

ঠাকুরের যেমন দুই পথ, জ্ঞান আর ভক্তি, স্বামীজিরও তেমনি।

পরাবিদ্যা ও পরাভক্তি এক। যা দিয়ে ব্রহ্মকে জানতে পারা যায় তাই পরাবিদ্যা। অবিচ্ছিন্ন আসক্তিতে ভগবানে হৃদয়ের নিত্যস্থৈর্যই পরাভক্তি। পাত্র থেকে পাত্রান্তরে ঢালবার সময় তেল যেমন অবিচ্ছিন্ন ধারায় পড়ে তেমনি অবিচ্ছিন্ন ভাবেই ভগবানে লগ্ন হয়ে থাকাই পরাভক্তি। সে ভক্তি জাগলে ভগবানের চিন্তা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না জগতে। তখন কিসের বা অনুষ্ঠান, কিসের বা শাস্ত্র, কিসের বা প্রতিমা ! সাধারণ মানবীয় প্রেম সেখানেই যেখানে প্রতিদান আছে। যেখানে প্রতিদান নেই সেখানেই ঔদাসীন্য, সেখানেই বৈপরীত্য। ভগবানকে ভালোবাসা, ভালোবাসার জন্যেই ভালোবাসা, প্রতিদানের জন্যে নয়। যেমন অনলের জন্য পতঙ্গের ভালোবাসা। প্রাণত্যাগ জেনেও আত্মসমর্পণ। সে প্রেম আধ্যাত্মিক ভূমিতে কাজ করতে আরম্ভ করলেই পরাভক্তি।

'আমার গুরুদেবের থেকে আমি বুঝেছি,' আমেরিকাকে বলেছেন স্বামীজি : 'মানুষ এই দেহেই সিদ্ধাবস্থা লাভ করতে পারে। তাঁর মুখ থেকে কারু উপর কোনো অভিশাপ

বর্জিত হয়নি, এমনকি কারু সমালোচনা পর্যন্ত তিনি করতেন না। তাঁর চোখে এমন দৃষ্টি ছিল না যে কারু মন্দ দেখে। মন কুচিন্তায় অসমর্থ ছিল। ভালো ছাড়া কিছুই দেখতেন না তিনি। সেই মহাপবিত্রতা মহাত্যাগই ধর্মলাভের একমাত্র উপায়। বেদ বলে, ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ। ধন বা পুত্রোৎপাদনের দ্বারা নয়, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই মুক্তিলাভ করা যায়। যীশু বলেছেন, তোমার যা কিছু আছে, বিক্রয় করে গরিবদের দান করো ও আমার অনুসরণ করো।'

'আচ্ছা, রোগ হল কেন?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'আজ্ঞে মানুষের মতন সব না হলে জীবের সাহস হবে কেন?' বললে মাস্টার, 'তারা দেখছে দেহেব এত অসুখ তবু আপনি ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই জানেন না।'

বলরামেরও সেই কথা। 'আপনারই এই, তা আমরা তো কোন ছার!'

'সীতার শোকে রাম ধনুকে তুলতে পারল না' বললেন ঠাকুর, 'লক্ষ্মণ তো অবাক। কিন্তু উপায় কী, পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়ে ব্রহ্মকেও কাঁদতে হয়।'

'ভক্তের দুঃখ দেখে যীশুখৃষ্টও সাধারণ লোকের মত কেঁদেছিলেন।' বললে মাস্টার।

'বলো কী? কী হয়েছিল শুনি?'

'মার্থা আর মেরী দু বোন আর ল্যাজেরাস তাদের ভাই। সবাই যীশুখৃষ্টের ভক্ত। ল্যাজেরাস মারা যায়। যীশু যাচ্ছিলেন তাদের বাড়ি, পথে ছুটে গিয়ে মেরী তাঁর পায়ের তলে পড়ল কাঁদতে-কাঁদতে বললে, তুমি যদি আসতে তাহলে সে মরত না। যীশু তাই শুনে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন।'

'তারপর?'

'তারপর তিনি ল্যাজেরাসের কবরের কাছে গিয়ে নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। অমনি ল্যাজেরাস প্রাণ পেয়ে উঠে এল।' বললে মাস্টার।

'আমার কিন্তু ওগুলো হয় না।'

'সে আপনি ইচ্ছে করে করেন না। ও সব সিদ্ধাই, ও সব আপনি পোঁছেন না। ও সব করলে লোকের দেহেতেই মন যাবে, শুদ্ধা ভক্তির দিকে যাবে না। তাই আপনি করেন না। কিন্তু যীশুখৃষ্টের সঙ্গে আপনার অনেক মেলে।'

'আর কী মেলে?'

'আপনি ভক্তদের উপোস করতে কি আর কোনো কঠোর করতে বলেন না। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধেও কোনো কঠিন নেই। যীশুর শিষ্যেরা রবিবারে খেয়েছিল, তাই যারা শাস্ত্র মেনে চলত, তিরস্কার করেছিল। যীশু বললেন, ওরা খাবে খুব করবে, যতদিন বরের সঙ্গে আছে বরযাত্রীরা তো আনন্দ করবেই।'

'তার মানে কী?'

'মানে যতদিন অবতারের সঙ্গে আছে সাঙ্গোপাঙ্গরা নিরানন্দে থাকবে কেন? তারা সম্ভোগ করবে। অবতার যখন লীলাসম্বরণ করবেন তখনই আসবে তাদের নিরানন্দের দিন।'

ঠাকুর হাসলেন। 'আর কিছু মেলে?'

'মেলে।' মাস্টার বললে, 'আপনি বলেন, নতুন হাঁড়িতেই দুধ রাখা যায়, দই-পাতা হাঁড়িতে রাখতে গেলে নষ্ট হবার ভয়। যীশু বলেন, পুরোনো বোতলে নতুন মদ রাখলে

বোতল ফেটে যেতে পারে। পুরোনো কাপড়ে নতুন তালি দিলে ছিঁড়ে যায় শিগগির।'

'আর?'

'আপনি যেমন বলেন 'মা আর আমি এক' তেমনি যীশু বলেন, 'বাবা আর আমি এক।' আই য়্যাণ্ড মাই ফাদার আর ওয়ান।'

ঠাকুর শুনছেন তন্ময় হয়ে।

'আরো মেলে।' বললে মাস্টার, 'আপনি যেমন বলেন ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন, যীশু বলেন, দোরে ঘা মারো, খুলে যাবে দরজা। নক য়্যাণ্ড ইট শ্যাল বি ওপেনড আনটু ইউ।'

আমেরিকাকে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা আবার শোনাচ্ছেন স্বামীজি: 'এই ব্যক্তি ত্যাগের মূর্তিস্বরূপ ছিলেন। আমাদের দেশে যারা সন্ন্যাসী হয় তাদের সমস্ত ধন ঐশ্বর্য মান সম্ভ্রম ত্যাগ করতে হয়, আর আমার গুরুদেব তাই করেছিলেন অক্ষরে-অক্ষরে। তিনি টাকা-পয়সা ছুঁতেন না, পারতেন না ছুঁতে, ঘুমন্ত অবস্থায়ও কোন ধাতুদ্রব্য তাঁর গায়ে ঠেকালে তাঁর মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয়ে যেত তাঁর সমস্ত দেহ ঐ ধাতুদ্রব্যকে ছুঁতে অস্বীকার করত। অনেকে তাঁকে কিছু দিতে পারলে কৃতার্থ মনে করত, কেউ-কেউ বা হাজার হাজার টাকা, আর যদিও তাঁর উদার হৃদয় সকলকে নির্বিশেষে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত, তবুও তিনি ঐ সব লোকের থেকে দূরে সরে যেতেন। কাম-কাঞ্চন জয়ের তিনি জ্বলন্ত উদাহরণ।

জীবনে একরাতি বিশ্রাম পাননি—চাননি। জীবনের প্রথমাংশ গেছে ধর্ম উপার্জনে আর শেষাংশ গেছে ধর্ম-বিতরণে। দলে-দলে লোক আসত তাঁর উপদেশ শুনতে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি ঘণ্টা তিনি তাদের সঙ্গে কথা কইতেন, আর এমনি চলত হঠাৎ দু-একদিনের জন্যে নয়, মাসের পর মাস, বিচ্ছেদবিহীন। অবশেষে কঠোর পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ল। কিন্তু মানুষমাত্রকেই তিনি এত ভালোবাসতেন যে যারাই তাঁর করুণার জন্যে আসত, শুনে যেত কথামৃত। কাউকে তিনি বঞ্চিত করতেন না। ক্রমে তাঁর গলায় ঘা হল। তবু তাঁকে অনেক বুঝিয়েও তাঁর কথা বন্ধ করা গেল না। আমরা তাঁর কাছে থাকতাম, লোকজন তাঁর কাছে না যায় তারই চেষ্টা করতে চাইতাম, কিন্তু যেই তিনি শুনতেন লোক এসেছে, তাঁর কাছে যেতে দেবার জন্যে মিনতি করতেন। সে কি, কথা বলতে আপনার কষ্ট হবে না, শরীর অসুস্থ হবে না আরো? তিনি করুণ-নয়নে হাসতেন। কি, শরীর? শরীরের কষ্ট? আমার কত শরীর হল কত গেল। যদি একটি মানুষের ঠিক-ঠিক উপকারে আসতে পারি, হাজার হাজার শরীর আমি দিয়ে দিতে প্রস্তুত।

একদিন একজন তাঁকে বললে, আপনি তো প্রকাণ্ড যোগী, আপনার দেহের উপর মন স্থাপন করে ব্যাধিটা সারিয়ে ফেলুন না।

'আমি তোমাকে জ্ঞানী মনে করেছিলাম।' বললেন আমার আচার্যদেব, 'কিন্তু এখন দেখছি সাধারণ সাংসারিক লোকের মতই তোমার কথাবার্তা। যে মন ভগবানের পাদপদ্মে অর্পিত হয়েছে তা সেখান থেকে তুলে নিয়ে এই তুচ্ছ দেহটার উপর রাখি কি করে?'

কত দূর-দূর দেশ থেকে লোক আসত। তাদের প্রশ্নের উত্তর বলে না দিলে তাদের

সমস্যার সমাধান না করে দিলে তাঁর শান্তি কোথায়! 'যতক্ষণ আমার কথা বলার বিন্দুমাত্র শক্তি আছে ততক্ষণ আমি বলব ভগবানের কথা। ভগবানই তো সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সমস্ত সমস্যার সমাধান!'

যেদিন দেহত্যাগ করবেন ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন আমাদের। বেদের পবিত্রতম ওঁ বলতে বলতে মহাসমাধিতে লীন হলেন। পরদিন তাঁর মৃতদেহ দগ্ধ করলাম শ্মশানে।

হে আমেরিকাবাসী, তোমাদের মধ্যে যদি থাকে এমন কেউ পবিত্র ফুল, তাকে ভগবানের পাদপদ্মে উৎসর্গ হতে দাও। তোমাদের মধ্যে কে আছ নিষ্পাপ নবীন বীর্যবান যুবক, এগিয়ে এস, ত্যাগ করতে শেখ। ত্যাগই ধর্মলাভের একমাত্র রহস্য। প্রত্যেক রমনীকে জননী বলে চিন্তা করো আর কাঞ্চন পরিত্যাগ করো, পরিহার করো। কিসের ভয়? যেখানেই থাকো না কেন, প্রভু তোমাদের রক্ষা করবেন, তিনিই ভার নেবেন সন্তানদের।

দেখছ না জড়বাদের প্রবল স্রোতে পাশ্চাত্ত্যদেশ ভেসে যাচ্ছে? কতদিন আর থাকবে চোখে কাপড় বেঁধে? দেখছ না কাম আর অপবিত্রতা সমাজের অস্থিমজ্জা শোষণ করে নিচ্ছে? শুধু বক্তৃতায় বা সংস্কার-আন্দোলনে এ শোষণ বন্ধ হবে না, শুধু ত্যাগের দ্বারাই বন্ধ হবে। চারিদিকের ক্ষয় ও বিনাশের মধ্যে ধর্মাচলের মত অনড় অকম্প হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো, তাহলেই রুদ্ধ হবে অপচয়। বাক্যব্যয় কোরো না, তোমার দেহের প্রতি রোমকূপ থেকে ত্যাগের শক্তি, পবিত্রতার শক্তি, ব্রহ্মচর্যের শক্তি বিনির্গত হোক। যারা দিনরাত কামকাঞ্চনস্পৃহায় প্রধাবিত হচ্ছে, তাদেরকে ঐ শক্তি গিয়ে প্রবল আঘাত করুক, তোমাকে দেখে তারা আশ্চর্য হয়ে যাবে। উঠে পড়ে লেগে যাও, দাঁড়াও প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে। যদি কামকাঞ্চন ত্যাগ করো, দেখবে তোমাকে কিছু বলতে হবে না, তোমার হৃৎপদ্মের সৌরভ আপনা থেকেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। যেই আসবে তোমার কাছে নিয়ে যাবে সে সুগন্ধ।

তোমাদের ত্যাগের সময় এসেছে, হাত পা ছেড়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো। হে দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ যুবক, সত্যকে ধরে থাকো, অকামহত হও, মঙ্গলায়তন ভগবানকে হৃদয়স্থ করে জগতে জীবনে নিত্য উৎসবের আলো জ্বালাও।

দক্ষিণামূর্তিদেব গুরুদেবকে নমস্কার করি। যিনি বট বিটপী সমীপে ভূমিভাগে উপবিষ্ট, যিনি মুনিদেরও জ্ঞানদান করছেন, যিনি ত্রিভুবনের ঈশ্বর, জননমরণদুঃখচ্ছেদদক্ষ, সেই মঙ্গলময় গুরুমূর্তিকে নমস্কার।

কী আশ্চর্য! বটবৃক্ষমূলে শিষ্যেরা সব বৃদ্ধ আর গুরু হলেন যুবা, আর গুরু মৌনী হয়ে ব্যাখ্যা করছেন, আর তাতেই শিষ্যদের সংশয়ের নিরসন হচ্ছে।

যিনি প্রণবের অর্থস্বরূপ, শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্তি, যিনি নির্মল ও প্রশান্ত সেই ওঁকারকে, দক্ষিণামূর্তিকে নমস্কার। যিনি সর্ববিদ্যার আধার, ভবরোগের ভিষক, নরকার্ণবতারণ, সেই দক্ষিণামূর্তিকে নমস্কার।

বরানগর মঠের মোটে পাঁচ মাস বয়স, দুদিন পরে ঠাকুরের জন্মোৎসব হয়েছে, রাখালের বাবা এসেছে রাখালকে বাড়ি নিয়ে যেতে।

'কেন কষ্ট করে আসেন?' বললে রাখাল, 'আমি এখানে বেশ আছি। আমি আর ফিরব না বাড়ি। এখন শুধু আশীর্বাদ করুন, আপনাদের আমি যেন ভুলে যাই আর আপনারাও ভুলে যান আমাকে।'

সকলের তীব্র বৈরাগ্য। নিরন্তর সাধনভজন। সকলেরই এক আকুলতা, কিসে ভগবান দর্শন হয়।

তারক আনন্দে শিবের গান ধরেছে। নরেনের লেখা গান।

তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা,
বোম বব বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে দুলিছে কপাল-মাল।
গরজে গংগা জটামাঝে উগরে অনল ত্রিশূলরাজে,
ধক ধক ধক মৌলিবন্ধ জ্বলে শশাংক-ভাল ॥

নরেন তামাক খাচ্ছে আর বলছে, 'কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করলে হবে না। শক্তিকে শিব দাসী করে রেখেছিলেন আর শ্রীকৃষ্ণ সংসার করলেও একেবারে নির্লিপ্ত। ফস করে কেমন বৃন্দাবন ত্যাগ করলেন দেখ।'

রাখাল বললে, 'আবার শ্বারকা ত্যাগ করতেও তেমনি।'

কালী গীতা পড়ছে। পাঠের মধ্যে মধ্যে বিচার করছে নরেনের সংগে।

'আমিই সব।' বললে কালী, 'আমিই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছি।'

নরেন বললে, 'আমি সৃষ্টি করছি কই? আর-এক শক্তিতে আমাকে করাচ্ছে। এই নানা কার্য নানা চিন্তা সব তিনি করাচ্ছেন।'

খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে কালী বললে, 'কার্য যা বললে সব মিথ্যে। আর চিন্তা? চিন্তা আদপেই হয়নি।'

'সোঽহং বললে যে আমি বোঝায় সে এ আমি নয়।' বললে নরেন, 'মন দেহ সব বাদ দিলে যা থেকে সেই আমি।'

মাস্টার বললে, 'যতক্ষণ আমি ধ্যান করছি এই বোধ আছে ততক্ষণ তা আদ্যাশক্তির এলেকা। এ ঠাকুরের কথা! ঠাকুরের কথায় মানতেই হবে শক্তিকে।'

হ্যাঁ, ঠাকুরের কথা বলো।

'ভবিষ্যৎ ভারত প্রাচীন ভারতের চেয়ে অনেক বড় হবে।' লিখছেন স্বামীজি: 'যেদিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন সেদিন থেকে মডার্ন ইণ্ডিয়া, বর্তমান ভারতের জন্ম, সেদিন থেকে সত্যযুগের আবির্ভাব। এই বিশ্বাসেই অবতীর্ণ হও কার্যক্ষেত্রে।'

ঠাকুরের বন্দনা করো। স্বামীজিই স্তোত্র রচনা করলেন।

খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ গুণময় ॥
মোচন-অঘদূষণ জগভূষণ, চিদঘনকায়।
জ্ঞানাঞ্জন-বিমল নয়ন-বীক্ষণে মোহ চায় ॥
ভাস্বর ভাব-সাগর চির-উন্মাদ প্রেম-পাথর।
ভক্তার্জন-যুগলচরণ, তারণ ভব পার ॥
জৃম্ভিত-যুগ-ঈশ্বর, জগদীশ্বর, যোগসহায়।
নিরোধন, সমাহিত মন, নিরখি তব কৃপায় ॥

'যদি রামকৃষ্ণ পরমহংস সত্য হন, তোমরাও সত্য।' আরো লিখছেন স্বামীজি: 'তোমাদের সকলের মধ্যে মহাশক্তি আছে, নাস্তিকের মধ্যে ঘোড়ার ডিম আছে। যারা আস্তিক, তারা বীর, তাদের মধ্যেই মহাশক্তির বিকাশ হবে। রামকৃষ্ণাবতারেই জ্ঞান, ভক্তি

ও প্রেমের সমপ্রকাশ। অনন্ত জ্ঞান অনন্ত প্রেম অনন্ত কর্ম, অনন্ত জীবে দয়া। তোরা এখনো বুঝতে পারিসনি। শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ নচৈন কশ্চিৎ। কেউ-কেউ এঁর বিষয় শুনেও জানে না। হাজার হাজার বছর ধরে সমগ্র হিন্দু-জাতি যা চিন্তা করেছে শ্রীরামকৃষ্ণ তা এক জীবনেই আদ্যোপান্ত উপলব্ধি করেছেন। তাঁর জীবন সমস্ত জাতির শাস্ত্রসমুচ্চয়ের জীবন্ত টীকা। এখন লোকে বুঝবে। আমারও সেই পুরোনো বুলি—স্ট্রাগল, স্ট্রাগল আপ টু লাইট, অনওয়ার্ড। প্রাণপণে আলোকের দিকে অগ্রসর হও।'

এমনি কথা আরো আগে লিখেছিলেন রাখালকে: 'সম্প্রসারণই জীবন, সংকোচনই মৃত্যু। যে আত্মম্ভরী শুধু নিজের আয়েস খুঁজছে, কুঁড়েমি করছে, তার নরকেও জায়গা নেই। যে নিজে নরকে পর্যন্ত গিয়ে জীবের জন্যে কাতর হয়, তার উপকারের চেষ্টা করে সেই রামকৃষ্ণের ছেলে, ইতরে কৃপণাঃ। যে এই মহাসন্ধিপুজোর ক্ষণে কোমর বেঁধে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়ে তাঁর সন্দেশ বিতরণ করবে, সেই আমার ভাই, আমার ছেলে, বাকি যারা তা না পারো দূর হয়ে যাও ভালয়-ভালয়। যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে নিজের ভালো চায় না। প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণচিকীর্ষুঃ, প্রাণ ত্যাগ হলেও পরের কল্যাণকারী। ওঠো ওঠো, বিপুল বন্যা আসছে, বিপুল আধ্যাত্মিক বন্যা, তাঁর কৃপায় নীচ মহৎ হয়ে যাবে, মূর্খ পণ্ডিতের গুরু। প্রভুর চরিত্র, শিক্ষা আর ধর্ম ছড়াও চারদিকে—এই সাধন এই ভজন এই সিদ্ধি। অনওয়ার্ড। মেয়েমদ্দ আচণ্ডাল সব পবিত্র তাঁর কাছে, নামযশের সময় নেই, ভক্তি মুক্তিও পরে দেখা যাবে। এখন, এ জন্মে, শুধু তাঁর অনন্ত বিস্তার—তাঁর মহান চরিত্রের, তাঁর বিরাট জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কাজ নেই। যেখানে তাঁর নাম যাবে, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে, তা কি দেখেও দেখছ না? অনওয়ার্ড। তিনি পিছনে আছেন। হরে হরে, অনওয়ার্ড। আমার হাত ধরে কে লেখাচ্ছে। সব ভেসে যাবে। হুঁশিয়ার, আসছেন তিনি। যারা তাঁর সেবার জন্যে, তাঁর নয়, তাঁর ছেলেদের, গরিবগুর্বো পাপীতাপীদের সেবার জন্যে তৈরি হবে, তাদের মধ্যে তিনি আসবেন, তাদের মুখে সরস্বতী বসবেন, বক্ষে মহাশক্তি মহামায়া। আর যারা নাস্তিক, অবিশ্বাসী, নরাধম, তারা কী করতে আমাদের ঘরে এসেছে? তারা চলে যাক। তাদের চলে যেতে বলো।'

'খেলা মোর সাঙ্গ হল'—নিউইয়র্কে এসে কবিতা লিখছেন স্বামীজি:

কালের তরঙ্গে ভেসে চলেছি আমি
কখনো উঠছি, ডুবছি বা কখনো
জীবনের জোয়ারে-ভাটায়
চলেছি এক ক্ষণস্থায়ী দৃশ্য থেকে আরেক স্বল্পজীবী দৃশ্যে।
হায়, এই অনন্তহীন প্রহসনে আমি ক্লান্ত,
এই শুধু ধাওয়া আর না-পাওয়া
ধাওয়া আর না-পাওয়া।
দূরের তীরের ধূসর রেখাটিও অগোচর।
জন্ম থেকে জন্মান্তর দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি
খুলল না কপাট।
ঈপ্সিত একটি রশ্মির রেখার আশায় চেয়ে থেকে-থেকে
চোখ ক্ষয় হয়ে গেল

জাগল না আভার আভাসলেশ।
অতি ক্ষুদ্র জীবনের সংকীর্ণ সেতুর উপর দাঁড়িয়ে
দেখছি নিচে চেয়ে,
অগণ্য মানুষ হাসছে কাঁদছে খুঁজছে যুঝছে—
কেন, কার জন্যে, কেউ জানে না।
সামনের সেই রুদ্ধ কপাট ভ্রূকুটি করে বলছে,
আর এগিও না, ঐ পর্যন্তই তোমার সীমা,
তোমার ভাগ্যকে আর লুব্ধ কোরো না
যতদূর পারো সহ্য করে নাও নিঃশব্দে।
পেয়ালায় যা উঠেছে, সুধা না হলাহল,
পান করো নিঃশেষে, জনতার সঙ্গে তুমিও মত্ত হও।
জানতে চেও না।
যে জানতে চায় সেই শোকার্ত।
সুতরাং ঐখানেই স্থির হয়ে থাকো
হায়, আমি স্থির হতে জানি না,
নামে শূন্য রূপে শূন্য, এব জন্ম মৃত্যু সকলি শূন্য —
এই জলবুদ্বুদ পৃথিবী—
আমার কাছে এ এক অপূর্ব মিথ্যা।
আমি এর নাম আর রূপের আবরণ ছিন্ন করতে চাই,
চাই খুলতে ঐ অবরুদ্ধ দুর্ধর্ষ কপাট।
তোমার গৃহপ্রবেশাপিপাসু ক্লান্ত পুত্র দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে,
দরজা খুলে দাও, মা,
আলোকের দরজা—
আমার খেলাধুলো শেষ,
প্রত্যাবর্তনের সময় সন্নিহিত।
কী দারুণ খেলা তোমার, মা,
অন্ধকারে নিয়ে যাও খেলতে, ছেড়ে দাও,
তার পরে ভয় দেখাও, তলহীন অকূলের আতঙ্ক।
খেলার আনন্দ তাহলে কোথায়, কোথায় বা আশার উষ্ণতা!
শুধু গভীর দুঃখ আর আতীব্র কামনার সাগরে
মন্থিত আলোড়িত হওয়া।
জীবন্ত মরণই বুঝি জীবনের অর্থ।
নিয়তি-চক্রের সেই মামুলি আবর্তন
দুঃখ আর সুখ জন্ম আর মৃত্যু আলো আর অন্ধকার!
কোথায় সে অভিনব আবির্ভাব!
শিশুর স্বপ্ন, এখানে যতই কেননা তা স্বর্ণসমুজ্জ্বল,
ধূলিতে অবসিত।
পশ্চাতে তাকিয়ে দেখ, ভগ্ন ধ্বস্ত কত শত আশা

পুঞ্জীভূত জীবনের মালিন্য,
চক্রাবর্তন থেকে ত্রাণ নেই কারুর—
অবিরত বেগে ঘুরছে এই চক্র, এই মায়ার খেলনা,
কামনা এর কেন্দ্র, নিরর্থক আশা এর গতিশক্তি,
সুখ দুঃখ এর দণ্ড।
ঘুরছি, ঘুরছি, কোথায় চলেছি ঘুরতে-ঘুরতে
এ ঘোরাব আগুন থেকে বাঁচাও আমাকে, মা,
করুণাধারা মা—
তোমাব রুদ্র মুখ ফিবিও না আমার দিকে
এ আমার সহনাতীত।
আমাব দোষ আর ধোবো না, আমাকে মার্জনা করো
সদয় হযে অভয় দাও আমাকে,
সেই দূরে পবপারে নিয়ে যাও
যেখানে সকল দ্বন্দ্বের অবসান
সকল অশ্রুব শেষ, সকল দুঃখের নির্বাপণ,
সকল পার্থিব সুখেরও ওপার।
যার গরিমা সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রও পাবে না প্রকাশ কবতে
না বা বিদ্যুৎদীপ্তি,
সকলেই যার বিভার ক্ষীণশ্বাস প্রতিভাস।
মাগো, মিথ্যা মায়াব লুণ্ঠন যেন আমার নয়ন থেকে
তোমার মুখখানিকে না আড়াল কবে।
আমার খেলা আজ শেষ হল,
শৃঙ্খল ছিন্ন করো আমার
তোমার কোলের মাঝে আমাকে মুক্ত কবো।

অগাস্ট মাসের মাঝামাঝি স্বামীজি চললেন ইউরোপের দিকে। পৌঁছুলেন প্যারিস। সেখান থেকে লণ্ডন।

৭১

প্যারিস থেকে লণ্ডন যাবেন। এই ঠিক করলেন স্বামীজি। লণ্ডনে তাঁকে দুজনে নিমন্ত্রণ করেছে। এক মিস হেনরিয়েটা মুলার আর এক মিস্টার ই. টি. স্টার্ডি।

মুলার জার্মান মেয়ে, আমেরিকাতেই স্বামীজির সঙ্গে তার পরিচয়। স্টার্ডি এক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ, এখনো তার সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপ হয়নি। আলাপ-আমন্ত্রণ পত্রে চলেছে। স্টার্ডি ভারতবর্ষকে ভালোবাসে, ভারতবর্ষের বহু তীর্থ সে পর্যটন করেছে, আর সব চেয়ে অভিনব কথা, বন্ধুতা করেছে স্বামী শিবানন্দের সঙ্গে। স্বামী শিবানন্দ হৃদ্যতার সমুদ্র। তাঁর সেই হৃদয়ের কাছে দেশী-বিদেশী নেই, স্বধর্মী-বিধর্মী নেই, যাকেই তিনি কাছে পাবেন টেনে নেবেন গভীরে। নিবিড়ে-নিভৃতে।

শিবানন্দের সঙ্গে পরিচিত হয়েই স্বামীজিকে চিঠি লেখে স্টার্ডি। এবং অবশেষে ইংলণ্ডে নিমন্ত্রণ করে পাঠায়।

'আপনার নিমন্ত্রণ প্রভুর আহ্বান বলে মনে করি।' স্বামীজি উত্তর দিলেন।

প্রভু বলতে স্বামীজি কাকে সবিশেষ চিহ্নিত করছেন। তাঁকে জানে স্টার্ডি। শিবানন্দের কাছ থেকে সব সে শুনেছে, একান্ত মনে ভালোবেসেছে। আলমোড়ায় শিবানন্দের সঙ্গে বসে সাধন করেছে আর শিবানন্দ যখন মাদ্রাজে গেল তখনও সে তার সঙ্গ ছাড়ল না।

বারাসতের রামকানাই ঘোষাল রাণী রাসমণির মোক্তার। তারকেশ্বরের শরণ নিয়ে ছেলে পেয়েছিল বলে নাম রেখেছে তারক। সাত রাজার ধন এক মাণিক পেয়েছে অথচ তার যত্ন করে না রামকানাই। বলতে গেলে বলে, বাবা তারকনাথের ছেলে, আমার নয়। তিনি দয়া করে দিয়েছেন। তিনিই দেখবেন।

রামকানাই কালীভক্ত, তন্ত্রমতে পঞ্চমুণ্ডীর উপরে বসে সাধন করত। প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেত, গঙ্গাস্নান করে লাল চেলি পরে ভবতারিণীর মন্দিরে ঢুকত। প্রকাণ্ড দশাসই চেহারা, গৌর বর্ণ, বুকটা টকটকে লাল—ভৈরব বলে মনে হত। ঠাকুর তাকে খাতির করতেন। সাধনকালে তাঁর যখন প্রচণ্ড গাত্রদাহ হয়েছিল তখন রামকানাই বলেছিল ইষ্টকবচ ধারণ করো। ইষ্টকবচ ধারণ করতেই দূরে হল গাত্রদাহ।

ঠাকুর কালীঘর থেকে বেরিয়ে চাতালে ভূমিষ্ঠ হয়ে মাকে প্রণাম করলেন। দেখলেন, রাম, মাস্টার, কেদার আর তারক দাঁড়িয়ে আছে। তারককে দেখে ঠাকুর মহাখুশী। তার চিবুক ধরে সস্নেহে আদর করলেন। কেদারের বয়স প্রায় পঞ্চাশ, ঈশ্বরের কথা হলেই চোখ জলে ভরে আসে। ঠাকুরের পায়ের বুড়ো আঙুল ধরে বসে আছে। ভাবখানা এই, এই স্পর্শেই তার শরীরে শক্তি সঞ্চার হবে।

ঠাকুর বললেন, 'মা, আঙুল ধরে এ আমার কী করতে পারবে।' পরে কেদারকে লক্ষ্য করলেন 'কামিনীকাঞ্চনে মন টানে তোমার। মুখে বললে কী হবে, আমার ওতে মন নেই।'

কামিনীকাঞ্চনে মন নেই কার? মন নেই স্বামীজির। মন নেই শিবানন্দের। বীর্য নষ্ট হলেই চিত্ত অস্থির হয়। অস্থির হলেই ইষ্টের মূর্তি চিত্তে স্পষ্ট হয় না। 'আয়নার পারা ঠিক থাকলে তবে প্রতিবিম্ব ঠিক পড়ে।' বলছেন ঠাকুর, 'প্যারা একবার এধার-ওধার হয়ে গেলে প্রতিবিম্ব পড়ে না।'

চিত্ত কি? ভাবপট। যেখান থেকে ভাব ওঠে সেখানেই প্রথম ছাপ পড়ে। যেখান থেকে ভাব উঠবে সে পর্দাই যদি কাঁপে তবে আর স্থিরচ্ছবি ফুটবে কি করে? অসাবধান হাত থেকে ক্রীড়াকন্দুক সোপানশ্রেণীর প্রথম ধাপের উপর পড়ে গেলে যেমন তা লাফাতে লাফাতে নিচে পড়ে যায়, তেমনি যদি চিত্ত লক্ষ্যচ্যুত হয় তবে ক্রমশ পড়তে-পড়তে শেষে নেমে যায় অতল ধূলিতে। ওজঃশক্তিতে ব্রহ্মজ্ঞান খুলে যায়। ব্রহ্মজ্ঞান মানে কী? ব্রহ্মজ্ঞান তো আগে থেকেই রয়েছে, তাকে প্রকাশ করে দেওয়া। বারো বছর ব্রহ্মচর্য রক্ষা করতে পারলে চিত্ত সুস্থ হয় আর চিত্ত সুস্থ হলেই জ্ঞান প্রকাশিত হয়ে পড়ে। স্বস্থে চিত্তে বুদ্ধয়ঃ সম্ভবন্তি।

প্রথম যৌবনেই তারকের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল—সব সময়ে ভয়, কি করে কী হবে। একদিকে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য ওদিকে সংসারে বিতৃষ্ণা। ঠাকুরের কাছে গিয়ে বললে এ দ্বন্দ্বের কথা। ঠাকুর বললেন, ভয় কি রে, আমি আছি।

আমিই পথনেতা, জিতকাম, সর্বসংশয়রাক্ষসহন্তা।

'স্ত্রী যদ্দিন আছে তাকে ভরণপোষণ করতে হবে বৈকি।' বললেন ঠাকুর, 'একটু ধৈর্য ধর, মা সব ঠিক করে দেবেন। তাঁর কৃপায় স্ত্রী সঙ্গে থাকলেও কোনো ক্ষতি হবে না।' তারকের বুকে ও মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে দিলেন।

চিৎ হয়ে শো, চিন্তা কর মা কালী বুকের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন ঠাকুর, এ ভাবনার ফলে কামজয় হয়।

রক্তধারাসমাকীর্ণে করকাঞ্চীবিভূষিতে।
ঘোরদংষ্ট্রে কোটরাক্ষি নমস্তে ভৈরবীপ্রিয়ে॥
শবাস্থিকৃতকেয়ূরশঙ্খকঙ্কণমণ্ডিতে।
শববক্ষঃ সমারূঢ়ে নমস্তে শিববন্দিতে॥

'বিবাহিত জীবনে কামজিৎ পুরুষ আর কোথায়।' বললে নরেন, 'একমাত্র একজনকে, ঠাকুরকেই দেখেছি।'

'আরো একজনকে দেখ, সে এই আমি।' বললে তারক, 'ঠাকুর আমার মধ্যে এমন শক্তি সঞ্চার করেছিলেন যে আমিও পেরেছিলাম কাম জয় করতে। ঠাকুরের কৃপায় কী না হয়। অসাধ্য সুসাধ্য কর তুমি কৃপা কর যারে।'

সেই থেকে শিবানন্দের নাম হল 'মহাপুরুষ।' স্বামীজিই দিলেন সেই নাম।

জিতেন্দ্রিয় না হলে সেবা করবার অধিকার হবে কী করে? আর ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করতে হলে মার কাছে প্রার্থনা করো।

হে ভবানী, ভবমোচনী, সর্বাসুরবিনাশা সমস্তদোষঘাতিকে, আমাকে শক্তি দাও। হে অচিন্ত্যরূপগহনা কামাঙ্কুশে কামদুঘে, আমাকে শক্তি দাও। হে অভয়ে অনঘে অজিতে অমিতে অপরাজিতে, আমাকে শক্তি দাও।

ক্ষীর ভবানীকে দেখে স্বামীজি শিশুর মত কাঁদতে বসলেন। 'এবার ধরব চরণ লব জোরে।' এবার তোমার কোলে বসা ছেলে হব। তুমি নির্দোষা সর্বদুঃখহা দয়ার্দ্রহৃদয়, আর তোমাকে ছাড়ব না। আর নামব না কোল থেকে। 'ছাড় ছাড় যদি বল মা তবু না ছাড়িব। রতন নূপুর হয়ে চরণে বাজিব।

কালীকে সম্বোধন করে কবিতা লিখলেন স্বামীজি :

ঘোররূপা হাসিছে দামিনী, দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
কালি তুই প্রলয়রূপিনী, মৃত্যুরূপা, মা আমার আয়!
নির্ভীক যে দুঃখদৈন্য বরে, মৃত্যুর যে বাঁধে বাহুপাশে,
যোগ দেয় প্রলয়নর্তনে, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে॥

যদি দেহে-প্রাণে বলবান না হয়, যদি শক্তিমান সাহসী ভয়শূন্য না হয়, তবে সে সেবা করবে কী করে? যদি প্রাতিভ জ্যোতিতে তারকজ্ঞান লাভ না হয়, যদি ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞান বাধাপ্রাপ্ত হয় তা হলে সেবা করবে কী করে? যদি মহাশক্তি ভক্তি না প্রকাশিত হয়, যদি প্রতি পদে পরমবৈরাগ্যকে না নমস্কার করা যায়, তাহলে সেবা করবে কী করে?

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥

'এত তপস্যা করে সার বুঝেছি যে জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন। তাছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই।' বললেন স্বামীজি।

কী আবশ্যক? আবশ্যক চিত্তশুদ্ধি। আবশ্যক দোষদৃষ্টির উচ্ছেদ। অহং-এর উৎপাটন। 'পূজো কর—বিরাটের পূজো। তোমার সামনে তোমার চারদিকে যারা আছে, তাদের পূজো। পূজো করতে হবে, মনে রেখো, সেবা নয়। সেবা বললে আমার অভিপ্রেত ভাব বোঝা যাবে না, পূজো শব্দেই ঠিক বোঝা যাবে। এই সব মানুষ এই সব পশু—তোমার এই সব স্বদেশবাসী, এরাই তোমার ঈশ্বর, এরাই তোমার প্রথম উপাস্য।'

জীবঃ শিবঃ শিবোজীবঃ সজীবঃ কেবলঃ শিবঃ।

যোগী কে? যে নিঃসংগ যে বিসংগ, যে উপাধি ও বাসনাকে বিসর্জন দিয়েছে, যে নিজস্বরূপনিমগ্ন সেই যোগী। যার দেহ দেবালয়, জীবমাত্রই যার সদাশিব দেবতা, যে সোঽহং মন্ত্রে সর্বজীবকে পূজো করে সেই যোগী। যার অন্তর্বহিঃ সদা হরিঃ, যার ব্রহ্ম পশ্চাৎ ব্রহ্ম পুরস্তাৎ, সেই যোগী—সেই পরমতত্ত্বজ্ঞ।

'ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে।' বলছেন স্বামীজি: 'এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন নয়তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, নয়তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন—এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে। বোম্বাইয়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাসপাতাল বানাচ্ছে, মানুষগুলো মরে যাক।'

সর্বশাস্ত্রপুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ং।
পরোপকারস্য পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নং॥

পরোপকারই একমাত্র পুণ্য, পরপীড়নই একমাত্র পাপ।

এই মানব শরীর ব্রহ্মপুর। আর সমস্তই ওঙ্কার, সমস্তই ব্রহ্ম। এক দেবতা সর্বভূতে গূঢ়, সর্বভূতের অন্তরাত্মা, সর্ব কর্মের অধ্যক্ষ, সকল ভূতের অধিবাস। ভূত ও ভব্য সমস্ত কিছুর শাসক, সে-ই আজ, সে-ই আগামীকাল। নিরবদ্য, নিরঞ্জন, তিনিই অমৃতের পরম সেতু। আর জেনো সকলের আত্মা, বিশ্বের মহান আয়তন, সে তুমি, সে তুমি।

'দেশজোড়া এই দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না।' বলছেন স্বামীজি, 'আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর লোককে মেটাফিজিক্স শোনাচ্ছি এসব পাগলামি। খালি পেটে ধর্ম হয় না। ঐ যে গরিবগুলো পশুর মত জীবনযাপন করছে তার কারণ কী? তার কারণ মূর্খতা। ঐ মূর্খতা দূর করবার জন্যে কী করছি? দরিদ্রদেবতা, মূর্খদেবতার সেবায় লাগো।'

সর্বং তরন্তু দুর্গানি। সকল দুর্গতি সকলে পার হোক। ভদ্র দেখুক সংসার। স্বস্তিতে লালিত হোক। সর্বভূত সৌখ্যলাভ করুক। মেঘস্নেহ বর্ষিত হোক। শস্যোজ্জ্বল হোক বসুমতী। তাদের ক্ষয় কোথায় যাদের হৃদয়ে আনন্দাশ্রয় বাসুদেব বসে। যা কিছু করি বলি স্মরণ করি সব আমার বাসুদেবে সমর্পণ।

সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন হও, সর্বভূতে হিতপরায়ণ থাকো। যিনি জগন্ময় সর্বভূতে অধিষ্ঠিত তাঁর সেবা করবে কি করে? লোকসেবাই তাঁর সেবা। লোকপূজাই তাঁর পূজা। কৃষ্ণার্পণবুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম করো। ফলে স্পৃহা নেই, শুধু সেবা-পূজা করতে পারার মধ্যেই আনন্দ, প্রাণধারণের তাৎপর্য। সন্ন্যাস অর্থ কর্মত্যাগ নয়, ঈশ্বরে কর্মসমর্পণ।

'যদি ভালো চাও তো ঘণ্টা ফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান—মানবদেহী নারায়ণের—হরেক মানুষের পূজো করো গে—বিরাট আর স্বরাট। স্বরাট

মানুষ আর বিরাট এই জগৎ। পুজো মানে সেবা আর সেবা মানে কর্ম। কর্ম মানে ঘণ্টার উপর চামর চড়ানো নয় আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট বসব না আধঘণ্টা বসব এ বিচার নয়। এ সব পাগলাগারদের কাণ্ড।'

বিরাট পুরুষ সহস্রশির, সহস্রপদ, সহস্রলোচন। তিনি বিশ্বকে সর্বতোভাবে পরিবেষ্টন করে দশ আঙুল পরিমিত স্থান, অর্থাৎ দশদিক অতিক্রম করে অবস্থিত আছেন। দৃশ্যমান এই জগৎই সেই বিরাট পুরুষ, অতীত আর ভবিষ্যৎও তিনি। তিনি অমৃতত্বের ঈশ্বর। জীবদের অর্থাৎ কর্মফল দেবার জন্যে তিনি স্বীয় কারণ বা অব্যক্ত ভাব থেকে কার্যভাব বা ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হয়েছেন।

সেই বিরাটের পুজো করো। স্বরাট হয়ে বিরাটের পুজো। জীবকে জীবজ্ঞানে সেবা নয়, জীবকে শিবজ্ঞানে পুজো। যে পুজো করছে তার শুধু জ্ঞান নয় যে জীব শিব, যে পুজো পাচ্ছে তারও জ্ঞান যে সে মাত্র জীব নয় সে ঈশ্বরের প্রতিরূপ।

মাদাম কালভেকে তাই বললেন স্বামীজি, 'আমি আবার আসতে চাই, আবার জন্মাতে চাই, চাই আমার সমস্ত ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাঁচতে। আমি বৃষ্টিবিন্দুর মত সমুদ্রে ঝরে পড়ে লীন হয়ে যেতে চাই না।

'তার মানে আপনি সমুদ্র হয়ে যেতে চান না।' বললে মাদাম।

'না, আমি মোক্ষ চাই না বিলুপ্তি চাই না, আমি চাই বারে বারে জন্মাতে, পূর্ণ হতে পূর্ণতর হতে। কেবল এগিয়ে যেতে।'

> 'কাঠুরে তুই দূর বনে যা, দূর বনে যা এই বেলা।
> কেঠো বনে কাল কাটালি ঘুচলো না তোর জঠর জ্বালা॥
> শ্রীরামকৃষ্ণ দিলেন বলে, মিলো ধন দূর বনে গেলে,
> ও কাঠুরে—
> (ও তুই) এবার যা দূর বনে চলে, পাবি চন্দনের চালা॥
> আরও যদি যাস এগিয়ে, রজত খনি দেখবি গিয়ে
> ও কাঠুরে—
> (ওরে) তারও ধারে সোনা হীরে মণি মাণিক রত্ন মেলা॥
> দেহের মাঝে আছে সে বন, যদি না পাস তার অন্বেষণ,
> ও কাঠুরে—
> ধর ওরে রামকৃষ্ণচরণ, সেবন যার করেন কমলা॥'

'সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি। যখন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তখন সৎ বিষয়ের জন্যেই দেহত্যাগ শ্রেয়। আমি মরি আর বাঁচি, দেশে ফিরি বা নাই ফিরি, তোমরা প্রেম ছড়াও।' বন্ধুদের লিখছেন স্বামীজি: 'ঠাকুর যেমন তোমাদের ভালোবাসতেন, আমি যেমন তোমাদের ভালোবাসি, তোমরা তেমনি জগৎকে ভালোবাসো। জগতের কল্যাণ করা, অচণ্ডালের কল্যাণ করা, এই আমাদের ব্রত, তাতে মুক্তি আসে বা নরক আসে। রামকৃষ্ণ পরমহংস জগতের কল্যাণের জন্যে এসেছিলেন। তাঁকে মানুষ বলো, ঈশ্বর বলো, অবতার বলো, নিজের নিজের ভাবে নাও। যে তাঁকে নমস্কার করবে, সেই সে মুহূর্তে সোনা হয়ে যাবে। এই বার্তা নিয়ে ঘরে ঘরে যাও দিকি বাবাজী, অশান্তির লেশমাত্র থাকবে না।'

আবার লিখছেন: 'সত্য বটে আমার নিজের জীবন এক মহাপুরুষের অনুপ্রেরণায়

চলছে কিন্তু তাতে কী ? ঈশ্বরীয় ভাব শুধু একজনের মধ্যে দিয়েই জগতে প্রচারিত হয়নি। সত্য বটে আমি বিশ্বাস করি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস আপ্ত পুরুষ ছিলেন কিন্তু জেনে রাখো, আমিও একজন আপ্ত তুমিও একজন আপ্ত।'

এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড বাইরের কোনো ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্টি হয়নি না বা কোনো বাইরের দৈত্যদ্বারা। তা আপনা-আপনি সৃষ্ট হচ্ছে, আপনা-আপনি প্রকাশ পাচ্ছে, আপনা-আপনি বিলয় হয়ে যাচ্ছে। সেই এক অনন্ত সত্তাই ব্রহ্ম। 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।'—হে শ্বেতকেতু, তুমি তাহাই, তাহাই তুমি।

শিব হয়ে শিবকে পুজা করো। তুমি নিজে শুধু শিব হবে না, যার সেবা করবে তাকে বলো, তাকে বোঝাও যে সেও শিব। তাই জীবসাম্য নয় শিবসাম্য।

প্যারিসে অল্প কদিন ছিলেন স্বামীজি। তার মধ্যেই সেখানকার যা সব দর্শনীয়—গির্জে থেকে আর্টগ্যালারি সব দেখে নিলেন, শিখে নিলেন বিদ্যার্থীর মত। লিখলেন : 'পারি নগরী ইউরোপী সভ্যতাগঙ্গার গোমুখী। মর্তের অমরাবতী, সদানন্দনগরী। এ ভোগ এ বিলাস এ আনন্দ না লণ্ডনে, না বার্লিনে, না আর কোথায়। ইংরেজ তো ওলবাটা মুখ, অন্ধকার দেশের বাসিন্দে, সদা অর্ধখুশি। লণ্ডনে নিউইয়র্কে ধন আছে, বার্লিনে বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট, নেই সে ফরাসী মাটি আর সব চেয়ে নেই সে ফরাসী মানুষ। ধন থাক, বিদ্যা থাক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও থাক, মানুষ কোথায় ? প্রাচীন গ্রীক যেন মরে জন্মেছে তাই মনে হয় ফরাসীদের দেখে। তার সদা আনন্দ, সদা উৎসাহ, অতি চটুল আবার অতি গম্ভীর, তার সকল কাজে উত্তেজনা, আবার বাধা পেলেই নিরুৎসাহ। কিন্তু সে নৈরাশ্য ফরাসীমুখে বেশিক্ষণ থাকে না, আবার ফরাসী জেগে ওঠে।

স্বাধীনতার আবাস এই ফ্রাঁস। প্রজাশক্তি এই পারিনগরী থেকে পাঠ নিয়ে মহাবেগে ইউরোপ তোলপাড় করে ফেলেছে, সেই দিন থেকে ইউরোপের নতুন মূর্তি। কিন্তু সে 'এগালিতে, লিবার্তে, ফ্রাতের্নিতে' ধ্বনি চলে গিয়েছে ফ্রাঁস থেকে। ফ্রাঁস অন্যভাব, অন্য উদ্দেশ্য অনুসরণ করছে, কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশ এখনো সেই ফরাসী বিপ্লব মন্ত্র করছে। পারিতে যে ধ্বনি উঠবে তার প্রতিধ্বনি ইউরোপে। পারি হচ্ছে সমস্ত নতুনের পীঠস্থান।'

তুমি অপরকে, তোমার শত্রুকেও ভালোবাসবে কেন ? কারণ তুমি তোমার আত্মাকে অর্থাৎ নিজেকে ভালোবাসো বলে। তুমিই সেই—তত্ত্বমসি। এই তত্ত্বই হিন্দুর ধর্মনীতি। তাই হিন্দুধর্ম শুধু হিন্দুর ধর্ম নয়, বিশ্বমানবের ধর্ম।

কী বলে হিন্দুর উপনিষদ ? লোকসমূহের প্রতি অনুরাগবশতই লোকসমূহ প্রিয় হয় না, আত্মার প্রতি অর্থাৎ নিজের প্রতি অনুরাগবশতই লোকসমূহ প্রিয় হয়। সর্বভূতের প্রতি অনুরাগবশত সর্বভূত প্রিয় হয় না, আত্মার প্রতি অর্থাৎ নিজের প্রতি অনুরাগবশতই সর্বভূত প্রিয় হয়। মনুষ্যপ্রীতি ছাড়া ঈশ্বরভক্তি নেই, আবার ঈশ্বরভক্তি ছাড়া মনুষ্যপ্রীতি নেই। যতক্ষণ না বুঝব যে সকল জগৎই আমি, সর্বলোক আমাতে অধিষ্ঠিত, ততক্ষণ আমি জ্ঞানশূন্য ভক্তিশূন্য প্রীতিশূন্য। যেহেতু হিন্দুর ধারণায় সমস্ত মানুষই ঈশ্বর, মানুষকে না ছুঁয়ে ঈশ্বরকে ছোঁয়া যাবে না। বিশ্বপ্রেম বলে যদি কোনো বস্তু থাকে তা হলে তার মূলে হিন্দুর বেদান্তবুদ্ধি, আত্মদর্শনসম্ভূত সমত্ববুদ্ধি বর্তমান। একমাত্র বেদান্তবাদীই বলতে পারে বিশ্বপ্রেমের কথা।

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ। সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি

বর্ততে ॥ যে একত্বে স্থিত হয়ে অর্থাৎ সর্বভূতে ভগবান অধিষ্ঠিত এই বুদ্ধি অবলম্বন করে সর্বভূতের সেবা করে, অর্থাৎ নারায়ণজ্ঞানে সর্বভূতে প্রীতি করে, সে যে অবস্থায়ই থাকুক, সন্ন্যাসী কি সংসারী, শাস্ত্রজ্ঞ কি অশাস্ত্রজ্ঞ, সে ভগবানেই নিত্যযুক্ত থাকে। জ্ঞানে সে তদ্ভাবপ্রাপ্ত, কর্মে সে তৎকর্মকৃৎ, ভক্তিতে তদ্গতচিত্ত। সেই নিত্য সমাহিত। সমদর্শনই সমাধি।

যিনি তোমার অন্তরে ও বাইরে, যিনি সব হাত দিয়ে কাজ করেন, সব পায়ে চলেন, তুমি যাঁর একাংশ, তাঁরই উপাসনা করো, অন্য প্রতিমায় কী হবে? যিনি উচ্চ-নীচ সাধু-পাপী, দেবতা-কীটে সর্বব্যাপী সেই জ্ঞেয় গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ সত্যের উপাসনা করো। যাঁতে অবস্থিতিহেতু আমরা অখণ্ড অবিভাজ্য, যে সমস্ত জীবন্ত নারায়ণে, তাঁর অনন্ত প্রতিরূপে, তিনি প্রতীয়মান সেই নেত্রপথবর্তী সাক্ষাৎ দেবতাকে পূজা করো, অন্য প্রতীকে কী প্রয়োজন?

দেহকেই যারা আত্মা বলে জানে তারাই করুণকাতরস্বরে বলে, আমরা ক্ষীণ ও দীন, আমরা অবসন্ন। বলছেন স্বামীজি, একেই বলে নাস্তিক্যবুদ্ধি। আমরা যখন অভয়পদে অবস্থিত তখন আমরা বীর ও বিগতভী। একেই বলে আস্তিক্যবুদ্ধি। আমরা রামকৃষ্ণদাস। রামকৃষ্ণদাসা বয়ম।

অমৃতত্বে ডাক দিলেন স্বামীজি। বললেন, সংসারাসক্তিশূন্য হয়ে সকল কলহের মূল স্বার্থসিদ্ধি ত্যাগ করে সর্বকল্যাণমূর্তি শ্রীগুরুর চরণ ধ্যান করে সমস্ত পৃথিবীকে প্রণাম করে পরমামৃতের আস্বাদ নাও। অনাদিনিধন বেদসমুদ্র মন্থন করে যা পাওয়া গেছে, হরিহরব্রহ্মা যাতে বলাধান করেছেন, যা পার্থিব নারায়ণ অবতারসমূহের প্রাণসার দিয়ে পূর্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণই সেই অমৃতের পূর্ণপাত্র। সেই অমৃত আস্বাদ করো।

ইংলণ্ডে যাবার আগে রোমাঞ্চিত হচ্ছেন স্বামীজি। অধীন দেশের এক অখ্যাত হিন্দু —কে জানে ইংরেজরা তাঁকে কী ভেবে নেবে। কেউ কি শুনবে তাঁর কথা, শুনলেই বা মানবে কে? পদানত দেশের লোক তার আবার ধর্ম কী, কী শোনাতে এসেছে সে তত্ত্বকথা? তাই বলবে নাকি, মুখ ফিরিয়ে নেবে নাকি উপেক্ষায়? না, কি, বিপুল বদান্যতার সংবর্ধনা করবে, পরাবে জয়মালা?

কিন্তু ভয় কিসের? ভয় কোথায়? "মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ, মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।" আমি স্থির, আমি শান্ত, আমি নির্বিচল। আমিই চিদানন্দরূপ, আমিই সমস্ত ভীতিভ্রংশী, অখণ্ডচেতন। আর কিছু নয়, তিনি আমার চোখের উপর চোখ রেখেছেন।

আঠারোশ পঁচানব্বইয়ের নয়ুই সেপ্টেম্বর প্যারিস থেকে স্বামীজি লিখছেন আলাসিঙ্গাকে: 'কাল লণ্ডনে যাচ্ছি। আমার সেখানকার ঠিকানা হবে· কেয়ার অফ ই· টি স্টার্ডি, হাইভিউ, কেভারস্যাম, রেডিং, ইংলণ্ড।

· প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস। প্রসীদ রামকৃষ্ণ।

দেশকে এমন করে আর কে করে ভালোবেসেছে। দেশকে ভালো না বাসলে জগৎকে ভালোবাসবে কি করে? যে জানে তার মা পার্বতী পিতা মহেশ্বর সেই ত্রিভুবনকে স্বদেশ জ্ঞান করে। নিজের দেশও এই ত্রিভুবনের মধ্যে।

সমগ্র ভারতবর্ষ খালি পায়ে হেঁটেছেন স্বামীজি। দেশের ধূলিকে স্পর্শ করেছেন গায়ে মেখেছেন, আস্বাদ করেছেন মাটির সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা। কাশী অযোধ্যা, লখনউ, আগ্রা, বৃন্দাবন হাতরাস—হিমালয়। আবার রাজপুতানা আলোয়ার জয়পুর, আজমীর, খেতড়ি আহমেদাবাদ কাঠিয়াওয়াড় জুনাগড় পোরবন্দর দ্বারকা। তার পরে বরোদা, খাণ্ডোয়া, বোম্বাই, পুনা বেলগাঁও। দক্ষিণে বাঙ্গালোর কোচিন, মালাবার, ত্রিবান্দ্রুম, মাদুরা, রামেশ্বর, কন্যাকুমারী। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী। যত মানুষের যত সমাজ আছে, অভিজাত থেকে অধোগত যত ঘর আছে প্রাসাদ থেকে কুঁড়ে-ঘাওড়া, সর্বত্র তিনি অতিথি হবেন। প্রত্যক্ষ করবেন দেশের সমস্ত ঐশ্বর্য আর দৈন্য, প্রাচুর্য আর রিক্ততা, প্রত্যেক ধূলিকণাকে স্বীকার করবেন তীর্থ বলে। বাস্তবের রূঢ়তার মধ্যেই আবিষ্কার করবেন দৈবী সত্তার মহিমা।

দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন তিনি শাশ্বত ভারতের স্বরূপ। নিঃস্ব দরিদ্র অবহেলিত অস্পৃশ্য ভিক্ষুক আর গর্বিত মোগল সবই সেই এক-জন। সেই একজনকে যখন ভালোবাসি। তখন সকলকে ভালোবাসি। আস্তাবলে সহিসদের সঙ্গে শুই, কখনো ভিক্ষুকদের সঙ্গে গাছতলায়, আবার আতিথ্য নিই রাজার অট্টালিকায়। মধ্যভারতে একবার কদিন মেথরদের বস্তিতে কাটিয়ে এলাম। ভস্মস্তরের নিচে দেখে এলাম অমূল্য মাণিক্য। কোথাও ভেদ নেই ব্যবধান নেই। সমস্ত এক, সর্বত্র এক, এক ছাড়া দুই নেই কোনোখানে।

যখন স্বামীজি কন্যাকুমারিকায় এসে পৌঁছলেন, হাতে একটা পয়সা নেই যে নৌকো ভাড়া করে যান ওপারে। কী করলেন তিনি? সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হিংস্র জল-জন্তুদের গ্রাহ্য করলেন না। উত্তাল সমুদ্রকে সবল বাহুতে পরাস্ত করে উঠলেন তার শিলাখণ্ডে। ফিরে তাকালেন ভারতবর্ষের দিকে। যেন দুই বাহু বাড়িয়ে গোটা দেশটাকে তিনি বুকের মধ্যে আলিঙ্গন করে ধরেছেন। এক বাহুতে প্রেম আরেক বাহুতে পৌরুষ, এই তো বিবেকানন্দ। জ্ঞান আর প্রেমের দৃষ্টি দিয়ে কে আর এমন একাত্ম করে দেখেছে দেশকে।

সেই গুরুভাই গঙ্গাধরের সঙ্গে করে প্রব্রজ্যায় বেরিয়েছিলেন। বললেন স্বামীজি, 'দ্যাখ গ্যাঞ্জেস, কোথাও আর নাবা-টাবা নেই, একেবারে সিধে উত্তরাখণ্ড।' কিন্তু নামতে হল ভাগলপুর, পরে বৈদ্যনাথ, শেষে কাশী। এখন আবার গঙ্গাধরের ইচ্ছে অযোধ্যায় থামবে। স্বামীজি 'না' করলেন তাঁর মন হিমালয়ের জন্যে ব্যাকুল হিমালয়ের দুর্গম মৌনে একা বসে ধ্যান করবেন এই এখন তাঁর স্বপ্ন।

ট্রেনে উঠে দেখলেন গঙ্গাধরের হাতে দুখানা টিকিট আর দুখানাই অযোধ্যার। গম্ভীর হলেন স্বামীজি। গঙ্গাধরের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন।

অযোধ্যা স্টেশনে নেমে এক্কায় উঠলেন দুজনে। গঙ্গাধরের জানা জায়গা অযোধ্যা,

এক্কাকে বললে, সরযূতীরে লছমনঘাটের কাছে সীতারামের মন্দিরে চলো। মনে বড় সাধ সেখানকার মহান্ত জানকীবরশরণের সঙ্গে স্বামীজির দেখা হয়। সারা রাস্তা কথা কইলেন না স্বামীজি। মন্দিরে পৌঁছে মহান্তকে দেখেও মুখ বুজে রইলেন।

পরদিন সকালে মহান্ত জানকীবরশরণই আলাপ করলেন স্বামীজির সঙ্গে। বৈরাগ্য ও প্রেমের সমাহার, মহান্ত মঠাধীশ হয়েও সাধারণ অভ্যাগতদের সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসে শালপাতাতেই প্রসাদ পান। মঠের কিংবা অন্য সমস্ত বিষয় ব্যাপার অন্যের উপর ছেড়ে দিয়ে নিজে আছেন সাধন-ভজন নিয়ে, হরিপ্রেমমগ্ন হয়ে। স্বামীজি মুগ্ধ হলেন মহান্তকে দেখে আর মহান্তও স্বামীজিকে দেখে। অযোধ্যা ছেড়ে যেতে মন আর চায় না স্বামীজির। কিন্তু হিমালয়ের ডাক বুঝি আরো কঠিন, আরো বিশাল।

'তোরি জন্যে তো তোকে এত ভালোবাসি।' অযোধ্যা ছেড়ে উত্তরাখণ্ডের পথে যেতে ট্রেনে উঠে বলছেন স্বামীজি, 'আর কেউ হলে আমার রাগ দেখে আমাকে আনতই না এখানে। কিন্তু তুই কি জানতিস না মহৎ সঙ্গ পেলে আমি আনন্দিত হব। তাই জোর খাটাবার মত জোর পেলি। সত্যি, এমন সাধু খুব কম মেলে।'

আলমোড়ার পথে যাচ্ছেন দুজনে, স্বামীজি আর অখণ্ডানন্দ। স্বামীজি বললেন, 'গ্যাঞ্জেস, তুই হাঁটা পথ দিয়ে যা, আমি বনের মধ্য দিয়ে এগুই।'

'সে কী!' আপত্তি করতে চাইল গঙ্গাধর।

স্বামীজি আপত্তি অগ্রাহ্য করে চললেন একা-একা। গঙ্গাধর পৃথক হয়ে গেল। কিন্তু এ [illegible] মনে হল স্বামীজি কার সঙ্গে কথা কইছেন। কে তাঁর সঙ্গে পা মিলিয়ে মিলিয়ে চলছে [illegible] না [illegible] তাঁর সাথে মিলন কি করে? বনে প্রবেশ করল গঙ্গাধর। কিছুদূর এগিয়ে দেখতে পেল স্বর্ণচম্পক-গুচ্ছের অজস্র ফুল ফুটেছে। তারই একপাশে স্বামীজি দাঁড়িয়ে আছে। একা নয়, তাঁর কাছে কে আরেকজন সহচর। শুধু দাঁড়িয়ে নেই, আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে আছে দুজনে। কে সেই দ্বিতীয়? আর কে! স্বয়ং মূর্তিমান শ্রীরামকৃষ্ণ।

হে প্রভু, তোমার চরণদ্বন্দ্ব [illegible] আমাকে নিস্তার করবে তার জন্যে তোমাকে বন্দনা করছি না, কিংবা কুম্ভীপাক নরক থেকে ত্রাণ পেতে। রম্যা-রামা-মৃদুতনুলতানন্দনবিহারেও আমার প্রার্থনা নয়। আমার এই শুধু প্রার্থনা, জন্মে জন্মে হৃদয়ভবনে তোমার ভাবনা যেন করতে পারি নিরন্তর।

কোনো ধর্ম-কর্মে আমার স্পৃহা নেই, কোনো ঐশ্বর্যে মতি নেই, না বা কোনো কামভোগ। পূর্ব কর্মানুযায়ী যা হবার তা হোক। কিন্তু আমার এই একমাত্র প্রার্থনা, যেন জন্মজন্মান্তরে আমার শুধু তোমার পদযুগগতা নিশ্চলা ভক্তি থাকে।

স্বর্গে মর্তে নরকে যেখানেই আমার বাস হোক, হে নরকান্তক, আমার এই কেবল প্রার্থনা, মরণকালেও যেন তোমার শারদাসিতচরণারবিন্দ চিন্তা করতে না ভুলি। হে পরমসুখকন্দ গোবিন্দ, হে পৃথ্বীভারনাশ মুকুন্দ, হে বৃষ্ণিবংশপ্রদীপ, তোমার জয় হোক। হে মেঘশ্যামল কোমলাঙ্গ, হে নিখিলবনমাল, হে প্রাণশ্রেষ্ঠ, তোমার জয় হোক। আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি, হরিচরণস্মরণামৃতের তুল্য সুখতর আর কিছু নেই।

স্বামীজি লণ্ডনে এসে পৌঁছুলেন। এত ঘৃণা নিয়ে কে আর নেমেছে ঐ বিজেতার দেশে। আর কে এত শ্রদ্ধা নিয়ে ভালোবেসেছে ইংরেজদের।

'এরা বীরের জাত, এরা সত্যিকার ক্ষত্রিয়।' লিখেছেন স্বামীজি : 'এদের শিক্ষাই

হচ্ছে নিজের আবেগকে গোপন করে রাখা, বাইরে দেখাবার আড়ম্বর না করা। কিন্তু এদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে, যতই এদের বাইরের খোলস কঠোর হোক, আছে, আছে এক গভীরাবেগের উৎস। সেখানে কি করে পেঁছুতে হয় যদি তার কৌশল জানো, তুমি চিরকালের মত তাদের বন্ধু হয়ে যাবে। একটা জিনিস যদি তারা ধরে, কামড়ে ধরে, সিদ্ধ না করা পর্যন্ত ছাড়ে না। এরা সর্বাপেক্ষা কম ঈর্ষী। নিয়মের প্রতি শৃঙ্খলার প্রতি সর্বাপেক্ষা বেশি সশ্রদ্ধ। তাই এরা জগতের উপর প্রভুত্ব করে চলেছে। এদের জয়গান করব না তো কার করব।'

স্টার্ডির বাড়িতে এসে উঠলেন স্বামীজি।

রব উঠল ভারতবর্ষ থেকে এক হিন্দু যোগী এসেছে। চলো শুনে আসি কী বলে তার বেদান্ত। কেন তার মূর্তিপূজা! কী বা তার ধ্যানপদ্ধতি।

হিন্দুর মূর্তিপূজা রোম বা ব্যাবিলনের মূর্তিপূজার মত নয়। হিন্দু মূর্তিপূজা করে না, সে মূর্তির সামনে বসে জ্যোতির্ময় ব্রহ্মের অনুধ্যান করে। চিন্তা করে ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম সমস্ত বিলীন হয়ে গেছে, একমাত্র আমার আত্মা জ্যোতির্ময়ই বর্তমান। চিন্তা করে, সোঽহং, হংসঃ, স্বাহা—সেই ব্রহ্ম আমিই, আমিই সেই ব্রহ্ম শক্তি—সমস্ত বিশ্বের নামরূপ তাতে বিধৃত হয়ে আছে। যে এই পূজায় অসমর্থ, সে ক্ষমা প্রার্থনা করে, হে সচ্চিদানন্দ আমি তোমার যথার্থ ভাবনা করতে পারি না বলেই এই বিশিষ্ট নামজপের মধ্য দিয়ে তোমাকে ধরবার চেষ্টা করছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তুমি আমার সহায় হও। আমি জানি আমার নাথই জগন্নাথ, আমার আত্মাই জগদাত্মা, আমার গুরুই জগদগুরু।

আর ধ্যানপদ্ধতি?

'নরেন খুব উঁচু থাকের—অখণ্ডের ঘর।' বলতেন ঠাকুর, 'কেউ দশদল, কেউ ষোড়শদল, কেউ শতদল, নরেন সহস্রদল।'

সোজা হয়ে বোসো, নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখো। দুই চাক্ষুষ নাড়ীর সংযমে চিত্তবৃত্তির শাসন হবে। তারপর মাথার কিছু উপরে একটি পদ্ম কল্পনা করো। এর কেন্দ্র ধর্ম, বৃন্ত জ্ঞান, দলগুলি অনিমাদি অষ্ট সিদ্ধি, কোরক বৈরাগ্য। ঐ কেন্দ্রের উপরে অস্পর্শ, দুর্জ্ঞেয়, জ্যোতির্ময় পুরুষের ধ্যান করো। তার নামই ওঙ্কার।

দিনের বেলায় স্বামীজি শহরের দর্শনীয় জায়গাগুলি দেখেন আর সন্ধ্যায় আগন্তুকদের দর্শন দেন, আর যারা কৌতূহলী বা জিজ্ঞাসু তাদের সঙ্গে আলাপ করেন। যে দেখে সেই অভিভূত যে শোনে সেই আত্মহারা। ইংলণ্ডে দুজন ভারততত্ত্ববিৎ আছেন ম্যাক্সমুলার আর পল ডয়সন। কে জানে তাঁদের সঙ্গেও লড়তে হতে পারে। কে আসবে তাঁর সাহায্যে। যদিও তাঁর পাশে স্টার্ডি আছে আর আছে গুডউইন, মাথার উপরে আছেন রামকৃষ্ণ।

'তুমি কেন সন্ন্যাসী হয়েছ?' একজন জিগগেস করল স্বামীজিকে। 'কেন ছেড়েছ সংসার?'

'সংসারকে সন্ন্যাস বোঝাতে, আমার প্রভু রামকৃষ্ণের ভাব প্রচার করতে।'

'কী তোমার রামকৃষ্ণের ভাব?'

'ঈশ্বর অনন্ত তাঁর পথও অনন্ত। অনন্ত মত অনন্ত পথ। যত মত তত পথ। সকল ধর্মই সত্য। সকল মানুষই ভগবান। আর এই আমাদের বেদান্তের কথা। রামকৃষ্ণ সেই বেদান্ত মূর্তি। বনের বেদান্তকে তিনি ঘরে নিয়ে এসেছেন।'

'কী বলেন তিনি ?'

'তিনি সবরকম সাধন করেছেন, তারপর সব পথ হেঁটে সব মত ঘেঁটে বলতে পেরেছেন এক ছাড়া দুই নেই। যাকে শিব বলি সেই কৃষ্ণ, সেই আল্লা। এক ঈশ্বর তার হাজার নাম, হাজার চেহারা, সকলেই এক জিনিসকেই চাচ্ছে, তবে আলাদা জায়গা। আলাদা পাত্র, আলাদা নাম। সব চেয়ে বড় কথা, সকলেই আবার এক জিনিস। যাকে চাই সেই আমি নিজে।'

'নতুন রকম কথা বটে।'

'হ্যাঁ, এই এক নতুন বিশ্বমৈত্রী, বিশ্বৈকতত্ত্ব।' বলছেন স্বামীজি : 'রামকৃষ্ণ বলেন যার সাকারে বিশ্বাস সে সাকারই চিন্তা করুক যার নিরাকারে বিশ্বাস সে নিরাকারই চিন্তা করুক। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী—সকলেই তাঁকে, সেই একজনকে ডাকছে। দ্বেষাদ্বেষির দরকার নেই। বিরোধ বিসম্বাদের মানে হয় না। নানা নদী নানা দিক দিয়ে আসে কিন্তু সব নদীর লক্ষ্যই সমুদ্র, সব নদীই মেশে এসে সমুদ্রে।'

'তোমার দলের নাম কী ?'

'দল ? আমার কোনো দল নেই। আমি কোনো সাম্প্রদায়িক মত চালাতে আসিনি। আমার ভাব বিশ্বজনীন। আমি আমার গুরুদেবের সঙ্গে এই বলতে চাই যে তিনিই সব হয়েছেন, তিনিই চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, জল, মাটি, দিক, দেশ—সমস্ত। তিনি নর নারী কুমার কুমারী, তিনিই দণ্ড ধরে চলেছেন স্খলিত পদে, তিনিই দোলনায় দুলছেন শিশু হয়ে। তিনিই পাখি পতঙ্গ মেঘ বিদ্যুৎ সাগর পর্বত। সমস্ত বিশ্ব তাঁরই প্রতিচ্ছায়া। সমস্ত মানুষ তাঁরই প্রতিকৃতি। আর এই বলতে চাই মানুষ যখন জানবে সে ঈশ্বর থেকে অভিন্ন, এই বিশ্বব্যাপী মহিমা তাঁরই মহিমা তখনই সে আনন্দিত। তখনই সে বীতশোক।'

ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট পত্রিকার লোক দেখা করতে এসেছিল স্বামীজির সঙ্গে। যাবার সময় বলে গেল : 'এমন সর্বনবীন লোক আর দেখিনি।'

ত্রিগুণাতীতানন্দকে লিখছেন স্বামীজি : 'রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর, ভগবান —এ সব কি এদেশে চলে ? জোর করে সকলকে ঐ ভাবটা গেলাবার চেষ্টা উচিত নয়। তাতে আমাদেরকে একটা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে পরিণত করবে। এ রকম চেষ্টা থেকে বিমুক্ত থাকবে। তাই বলে কেউ যদি তাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পুজো করে ক্ষতি কী। তোমরা তাকে উৎসাহও দিও না, নিরুৎসাহও কোরো না। জনসাধারণ তো চিরকাল ব্যক্তিই চাইবে, উচ্চতর লোকেরাই ভাবটা গ্রহণ করবে। আমরা দুইই চাই। কিন্তু জানবে ভাবই সার্বভৌম, ব্যক্তি নয়। সুতরাং তাঁর প্রচারিত ভাবগুলোকে ধরে থাকো। তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যার যা খুশি ভাবুক, কিছু আসে যায় না। সমস্ত বিবাদ বিদ্বেষ ও গোঁড়ামির বিরাম হোক। যে প্রথমে আছে সে সর্বশেষে যাবে, আর যে সর্বশেষে আছে সে প্রথমে যাবে। মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ। আমার ভক্তগণের যারা ভক্ত তারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

পিকাডেলি, প্রিন্সেস হল-এ স্বামীজির বক্তৃতার ব্যবস্থা হল। বিষয় আত্মজ্ঞান।

লোকে লোকারণ্য সভা, তার মধ্যে অনেক বিদগ্ধ মনীষী বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন, দাঁড়ালেন বিবেকানন্দ। সেই উন্নতশীর্ষ অপরাভূত পুরুষসিংহ। রণে বনে দারুণে যে অকুতোভয়।

চরম সিদ্ধান্ত এই যে, আমিই সেই এক সত্তা। জগতে একাধিক সত্তা নেই। সেই এক সত্তাই মায়ার প্রভাবে বহুরূপে দৃষ্ট হচ্ছে। যেমন দড়িকে সাপ বলে দেখাচ্ছে। এখানে দড়ি আর সাপ দুটো পৃথক বস্তু নেই। সত্য ও মিথ্যা একসঙ্গে দেখা যায় না। আমরা সর্বদাই এক দেখে থাকি। যখন দড়ি দেখি তখন আর সাপ দেখি না আবার যখন সাপ দেখি তখন দড়ি অন্তর্হিত. যেহেতু আমরা একই দেখি, আমরা তাই জন্ম থেকেই অদ্বৈতবাদী, তা থেকে আর আমাদের পালাবার উপায় নেই। যখন কাউকে দেহরূপে দেখি তখন আমি দেহমাত্র, যখন আমার দেহবোধ নেই তখন কাউকে বা শুধু ভাবরূপে অনুভব করি। স্যর হাম্ফি ডেভি সম্বন্ধে গল্পটা জানেন বোধ হয়। তিনি যখন লাফিং গ্যাস নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন, একটা নল ফেটে যায়, নিঃশ্বাসে গ্যাস টেনে নিতেই তিনি কয়েক মিনিট পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন নিশ্চল হয়ে। সে অবস্থায় তিনি অনুভব করলেন যে সমগ্র জগৎ একটা ভাবসত্তা ছাড়া কিছু নয়। দেহজ্ঞানের বিস্মরণ ঘটাতেই তিনি দেখলেন যাকে তিনি এতদিন শরীর বলে জেনেছিলেন সে শুধু একতাল চিন্তা। তেমনি যখন আমার ক্ষুদ্র অহংজ্ঞানের বিস্মরণ ঘটবে দেখতে পাব আমিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—নিত্যবোধ, নিরুপম, নিত্যমুক্ত পূর্ণ ব্রহ্ম।

বিলিতি কাগজগুলো প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। স্ট্যাণ্ডার্ড লিখল: 'এমনটি আর হয় না। সেই রামমোহন রায়ের সময় থেকে আজ অবধি—অবশ্য এক কেশবচন্দ্র সেন ছাড়া—এমনটি আর কেউ দাঁড়ায়নি ইংরেজের সভামঞ্চে। বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি-লোলুপতাকে নিন্দা করে কী আশ্চর্য বক্তৃতা দিল এই হিন্দু. আর কী দ্বিধাশূন্য মধুর তার কণ্ঠস্বর!'

লণ্ডন ডেলি ক্রনিকেল লিখল: 'হিন্দুযোগী বিবেকানন্দের আননে সেই বুদ্ধের মহিমা। আর কী তার বজ্রঘোষ নিন্দা আমাদের রক্তাক্ত যুদ্ধকে, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতাকে, শূন্যগর্ভ অসার সভ্যতাকে।'

'কী শান্ত করুণাস্নাত তার চোখ দুটি!' লিখছে ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট: 'মাঝে মাঝে মুখখানি শিশুর হাসির মত অপার্থিব আলোতে ভরে যায়—এত সরল সহজ আর অকৃত্রিম। আর সবচেয়ে চিত্তাকর্ষী, কী সুন্দর তাঁকে দেখতে আর কী সুন্দর তাঁর মাথায় পাগড়ি বাঁধা।'

ইংরেজরা এমন করে মেতে উঠবে এ যেন ভাবনার অতীত ছিল।

আর এমনি এক ইংরেজ মেয়ে, লণ্ডনে এক স্কুলের হেডমিসট্রেস, মিস মার্গারেট নোবল ওয়েস্ট এণ্ডের এক ড্রয়িংরুমে প্রথম দেখল স্বামীজিকে।

লেডি ইসাবেল মার্জেসন তাঁর ড্রয়িংরুমে একদিন ডাকলেন হিন্দু যোগীকে, যদি কিছু বলেন অধ্যাত্মসংবাদ। খবরটা কানে গেল মার্গারেটের। যদিও তখন তাঁর আটাশ বছর বয়স, নানা সংশয় ও দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে তার জীবন কাটছিল। এক তরুণ ইঞ্জিনিয়রকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখেছিল, সে অতর্কিত রোগে মারা গেল। নোবলের মনে জাগল বিচিত্র জিজ্ঞাসা, কোথায় জীবনের সদুত্তর, কিন্তু হতাশা ছাড়া আর কিছু সে খুঁজে পাচ্ছিল না। এমন সময় মার্জেসনের নিমন্ত্রণ এসে পৌঁছুল।

'বেশ তো, যাও না', এক বন্ধু পরামর্শ দিল, 'কতই তো পড়লে আর শুনলে, এবার দেখে এস না এই হিন্দু যোগীকে। কে জানে হয়তো বা পেয়ে যেতে পারো পথ, তোমার রহস্যভেদের কৌশল।'

মন্দ কি, যাই না। কত জলাশয়ের কাছে গিয়েছি, কত বৃক্ষতলে, শান্তি বা শীতলতা পাইনি, পাইনি পূর্ণতার তৃপ্তি। দেখি না হিন্দু যোগী কি বলে!

নভেম্বরের এক রবিবারে সন্ধ্যায় সেই ড্রইংরুমের এক কোণে বসল নিবেদিতা। আর দেখল স্বামীজিকে। জাগ্রত ভারতাত্মাকে।

হে ওঙ্কারমূর্তি তোমাকে নমস্কার। হে সোমসূর্যাগ্নিচক্ষু প্রাণেশ জীবেশ তোমাকে নমস্কার। হে ভস্মভূষিতাঙ্গ ভাস্বর, পাপনাশপরেশ, প্রসন্ন হও। হে নিঃসঙ্গ নিরীহ, জগদ্দীপাকার, শাশ্বত, জগৎসংসৃতি থেকে রক্ষা করো আমাকে।

তুমি ভূমি নও জল নও বহ্নি নও বায়ু নও আকাশ নও, তোমার তন্দ্রা নেই, নিদ্রা নেই, গ্রীষ্ম নেই, শীত নেই, দেশ নেই, বেশ নেই, মূর্তি নেই, তুমি ত্র্যক্ষরাত্মক মহেশ্বর, তোমাকে নমস্কার। হে কলাতীত কল্যাণ, ভাসকের ভাসক, প্রকাশকের প্রকাশক, হে তমঃপারবর্তী অদ্বৈত, হে চিদানন্দমূর্তি পরমপাবন, তোমাকে নমস্কার। তোমার চেয়ে গণ্য কেউ নেই, মান্য কেউ নেই, বরেণ্য কেউ নেই, শুধু করুণায় এ জগৎকে হনন পালন করো, তোমাকে নমস্কার। হে জগন্নাথ, মন্নাথ, গৌরীনাথ, হে শরণানুকম্পী, বিপন্নার্তিহারী, হে সমস্তৈকবন্ধো, তোমাকে নমস্কার। হে স্মরশত্রু, ত্রিপুরশত্রু, শমনশত্রু হে অনাথনাথ, হে বন্দ্য সুন্দর, সর্বদাবিরুদ্ধদুঃখদহন, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

২০

মাত্র পনের ষোল জন লোক, বেশির ভাগই বিলাসিনী তরুণী ললনা, অর্ধবৃত্তাকারে বসেছে। আর তাদের মুখোমুখি বসেছেন স্বামীজি, পিছনে আগুন জ্বলছে চুল্লিতে। নভেম্বরের শীত। কী সুন্দর গেরুয়া পোশাক আর কোমরবন্ধ পরেছেন আর কী জ্যোতিঃ-পরিপূর্ণ বিশাল চক্ষু। বিস্ময়-উদ্বেল চোখে তাকিয়ে রইল নিবেদিতা। একটি ঘরোয়া বৈঠক। বক্তার সংস্পর্শে ঠিক একটি প্রাচ্য পরিবেশ গড়ে উঠেছে। যেন গ্রামাঞ্চলে দুয়োর ধারে বা গাছের নিচে বসেছে এক আত্মভোলা সাধু আর তাকে ঘিরে গ্রামের কটি নিরীহ প্রাণী জড়ো হয়েছে ঈশ্বরের কথা শুনতে। আত্মভোলা সাধুর মুখে ধ্যানীর তন্ময়তা আর হাসিটি দেখ! যেন শিশুর শুচিতা ও সরলতার ছবি। সেই র‍্যাফেলের আঁকা শিশু-যীশু।

কথা বলছেন স্বামীজি আর নিবেদিতার মনে হচ্ছে যেন কোন দূর দেশের সংবাদ অন্তরঙ্গ কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে। যেন কোন গোপন কথা শোনাচ্ছে আপন কথার মত। আর বক্তার কী সাহস, থেকে থেকে 'শিব' 'শিব' বলে উঠছে। শ্রোতারা যে ইংরেজ, পরিবেশ যে বিদেশী, লক্ষ্যের মধ্যেই আনছে না। আর এ শুধু একটা শব্দ নয়, যেন মৃতকে উত্থিত করার মন্ত্র। সমস্ত কল্লোলকোলাহলের ঊর্ধ্বে শাশ্বত শঙ্খস্বর।

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ব্যাখ্যা করছেন স্বামীজি। একই বহু হয়েছে, ব্রহ্মই সর্বাত্মক। সর্বব্যাপী বলে আবার বাইরে অবস্থিত। নাত্যেতি কশ্চন। কেউই তাকে অতিক্রম করতে পারে না। রূপে রূপে প্রতিরূপ হয়েও তদতিরিক্ত, অবিকৃত। ব্রহ্ম চেতনা দ্বারাই সকলে জ্যোতিষ্মান। ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং। এই বিশ্ব প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্ম। দূর হতে সুদূর হয়েও চেতনজীবের হৃদয়গুহাতেই নিহিত। ব্রহ্ম

দেহাধিষ্ঠিত আত্মা। আনন্দ আত্মা। সর্বজীবের অন্তর্যামী হয়েও সর্বতোমুখ। যিনি নিখিল জগতে অনুপ্রবিষ্ট সেই স্বয়ম্প্রকাশকে নমস্কার।

আবার বলছেন, গীতার কথা, ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগনা ইব। একটি নির্লক্ষ্য সুতোকে অবলম্বন করে যেমন মণিমালা গাঁথা হয় তেমনি আমাকে ধরেই এই বিশ্ব ঘুরছে, দুলছে, ওতপ্রোত হয়ে আছে।

কেমন নতুন বলে মনে হল। তারপর আবার যখন বললেন হিন্দুর মতে শুধু দেহ আর মনই মানুষ নয় তার অন্তরালে রয়েছে এক তৃতীয় বস্তু আত্মা, যে সমস্ত কিছুর চালক বাহক তখন মার্গারেটের চমক লাগল। এক অগ্নিপিণ্ড থেকে বিচিত্র স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে এসেছে। এক দুন্দুভিধ্বনি থেকে বিভিন্ন শব্দলহরী। আরো কত কথা যা মার্গারেট কোনদিন শোনেনি। 'মানুষ ভুল থেকে ভুলে অগ্রসর হচ্ছে না, সত্য থেকে সত্য উন্মোচিত হচ্ছে।' 'কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মানো ভালো, কিন্তু তার গণ্ডির মধ্যেই মরা ভালো নয়।'

তারপরে বললেন কাকে বলে ভালোবাসা। সকলেই নিজেকে, আত্মাকে ভালোবাসে। আমি নিজেকে ভালোবাসি বলেই অন্যকে ভালোবাসি। পরের জন্যে নয় নিজের জন্যেই ভালোবাসা। আত্মাকে ভালোবাসি বলেই সে আমার প্রিয়। অতএব কে সেই আত্মা জানা চাই। আত্মাকে না জেনে ভালোবাসাই স্বার্থপরতা। মনে করুন আমি কোনো স্ত্রীলোককে ভালোবাসছি। যদি আমি সেই স্ত্রীলোককে আত্মা থেকে আলাদা করে, বিশেষ ভাবে দৃষ্টি করি, তা আর নিত্যস্থায়ী প্রেম হল না। তা স্বার্থপর ভালোবাসা হল যার পরিণাম দুঃখ। কিন্তু আমি যদি সেই স্ত্রীলোককে আত্মারূপে দেখতে পারি তখনই সেই ভালোবাসা যথার্থ প্রেম হল, তাহলে আর তার বিনাশ নেই। তেমনি যদি কোন জাগতিক বস্তুকে আত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভালোবাসি তাহলেই প্রতিক্রিয়া। আত্মা ছাড়া যা কিছু আমরা ভালোবাসি তারই ফল শোক আর দুঃখ। কিন্তু যদি আমরা সমুদয় বস্তুকে আত্মার অন্তর্গত ভেবে ও আত্মস্বরূপে সম্ভোগ করি তাহলে কিছু হারাবার নেই। নেই কোনো প্রতিক্রিয়া। আর এরই নাম পূর্ণ আনন্দ।

'ভাবো সে সময়ে যদি স্বামীজি না আসতেন লণ্ডনে।' পরবর্তী কালে চিঠি লিখছে নিবেদিতা: 'তা হলে কী হত? এ জীবন নিরর্থক হয়ে যেত। আমি জানতাম আমি এক মহত্তম সম্ভাবনার প্রতীক্ষায় আছি। কে যেন বলত, আসবে, আহ্বান আসবে। আর সত্যি সত্যি এল সেই সমুদ্রের ডাক। কোন সংশয় জাগল না, পরম লগ্নকে অনিবার্য বলে চিনতে পারলাম। যদি তিনি না আসতেন! কত সময় গেছে, বুকের মধ্যে জ্বলন্ত আকৃতি নিয়ে বসে আছি, কিন্তু প্রকাশ করবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আর আজ মনে হচ্ছে কথার বুঝি অন্ত নেই। এ জগতে যে কাজের জন্যে ভগবান আমাকে যুক্ত করেছেন, যোগ্য করেছেন, সন্দেহ কী, সেই কাজে আমার প্রয়োজন আছে।'

আর নিবেদিতাকে লিখছেন স্বামীজি প্রিয় মিস নোবল, আমার আদর্শকে অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে। আর তা এই—মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী পৌঁছে দেওয়া আর সব কাজে এই দেবত্ব বিকাশের পথ নির্ধারণ করে দেওয়া। জগৎকে আলো দেবে কে? আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের কর্মরহস্য। যারা সর্বাধিক সাহসী ও বরেণ্য তাদেরকে চিরদিন বহুজনের সুখ আর হিতের জন্যে আত্মবিসর্জন করতে হবে। অনন্ত প্রেম আর করুণা বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রয়োজন আছে।

জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন ব্যঙ্গমাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। জগতের এখন যা একান্ত প্রয়োজন তা হচ্ছে চরিত্র। জগৎ এখন তাদের চায় যাদের জীবন প্রেমদীপ্ত, যারা স্বার্থহীন। সেই প্রেমই প্রত্যেকটি বাক্যকে বজ্রের মত শক্তিশালী করবে। তোমার মধ্যে এমন এক শক্তি আছে যা পৃথিবী নড়িয়ে দিতে পারে। আর আমি জানি, তোমার মতো আরো অনেকে আসবে। চাই জ্বালাময়ী বাণী আর তার চেয়েও জ্বালাময় কর্ম। হে মহাপ্রাণ, ওঠো, জাগো। সংসার দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে? এস আমরা ডাকতে থাকি যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন। তুমি আমার অশেষ আশীর্বাদ নাও ইতি। শুভাশীর্বাদক বিবেকানন্দ

দলে দলে লোক আসতে লাগল স্বামীজিকে শুনতে। ব্যক্তিত্বের দীপ্তি, কথার শক্তি, বাচনভঙ্গির স্পষ্টতা, উদাত্ত মদির কণ্ঠস্বর—সকলকে অপূর্বের আস্বাদ এনে দিল। শুধু তাই নয়, এত বড় উদার ধর্মের উদ্গাতা আর দেখিনি। আর কী দৃঢ়ধৃত পৌরুষ, কী দুশ্ছেদ্য সাহস। লোকে বশীভূত না হয়ে করবে কী।

ক্রমে ক্রমে আরো সব গণ্যমান্যদের ভিড়ে ডাক পড়ল স্বামীজির। খবরের কাগজ লুফে নিল। অভিজাতদের মধ্যেও জুটে গেল বন্ধু। ভেবেছিলেন স্বামীজি এবার শুধু ইংলণ্ডের মাটি ছুঁয়ে চলে যাবেন, দেখলেন একেবারে হৃদয়ের মধ্যস্থানটা ছুঁয়েছেন। ইংরেজ আমেরিকানের মত সহজে মানে না কিন্তু যদি একবার বোঝে এর মধ্যে পদার্থ আছে তাহলে তাকে আর ছাড়ে না, আঁকড়ে ধরে থাকে। সেই কথাই লণ্ডন থেকে লিখছেন আলাসিঙ্গাকে:

'আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছি ইংলণ্ডে আমার কাজের ফল দেখে। ইংরেজ খবরের কাগজে বেশি বকে না, নীরবে কাজ করে। আমেরিকার চেয়ে ইংলণ্ডেই বেশি কাজ হবে বলে আমার বিশ্বাস। দলে দলে লোক আসছে কিন্তু এত লোকের আমি জায়গা দিই কী করে? বড় বড় সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা মেঝের উপর আসন পিঁড়ি হয়ে বসেছে। শুধু মেয়েরা কেন, আপামর সকলেই। আমি তাদের কল্পনা করতে বলি, এ ভারতবর্ষের আকাশের নিচে ডালপালা মেলা বিস্তীর্ণ বটগাছ, তার নিচেই সকলে বসে আছে। তারাও এ ভাবটাই পছন্দ করে।

আমি আসছে সপ্তাহে আমেরিকা ফিরে যাব, তাই এরা ভারি দুঃখিত। আমি যদি এত শিগগির চলে যাই, কেউ কেউ ভাবছে, আমার এখানকার কাজের ক্ষতি হবে। আমি কিন্তু তা মনে করি না। আমি কোনো কিছুর উপর নির্ভর করি না, একমাত্র প্রভুই আমার ভরসা। কে কাজ করছে? আমার ভিতর দিয়ে প্রভুই কাজ করছেন।'

বোলই আর তেইশে নভেম্বর আরো দুটো বক্তৃতায় উপস্থিত হল মার্গারেট। সঙ্গে খাতা পেনসিল নিয়ে গিয়েছিল, টুকে নিল বক্তৃতার সারাংশ। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত মনে অলৌকিক আলোড়ন আনে। বক্তৃতাও তেমনি নিয়ে এল কম্পন-স্পন্দন। সেই অনুভূতির আশায় খাতা খুলে পড়তে লাগল বারে বারে।

বক্তৃতার মধ্যে কতবার সন্দেহবাদীর মত 'কেন' আর 'কিন্তু' ছুঁড়ে মেরেছে, কিন্তু নড়াতে পারেনি স্বামীজিকে। মানবে না বলেও মেনে নিয়েছেন। কিছুতেই বুঝি খণ্ডন বর্জন করা যায় না। কী নিদারুণ ভালোবাসেন গুরুকে, দেশকে, ঈশ্বরকে। এমন ভালোবাসা দেখিনি, শুনিনি, কোনোখানে। বাণী শুধু পুঁথি থেকে আহরণ করা নয়, নিজের উপলব্ধির থেকে ছেঁকে নেওয়া। তাই এই দুর্ভেদ্য বিশ্বাস এই অনম্য দৃঢ়তা।

মনে মনে আনুগত্য স্বীকার করল মার্গারেট। 'এ আনুগত্য আর কোথাও নয় শুধু তাঁর মহৎ চরিত্রের কাছে।'

তাঁর মহৎ চরিত্র গীতার জ্বলন্ত ভাষ্য। ইংলণ্ডের ক্লাসে গীতাই শেখাচ্ছেন, তারই তত্ত্বমূর্তি স্বামীজি।

ফলাকাঙ্ক্ষা নেই, কর্তৃত্বাভিমান নেই, আর আছে ঈশ্বরে সর্বকর্মসমর্পণ। যোগস্থ হয়ে কাজ করো। যোগ কী? সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যে সমত্ববুদ্ধি তাই যোগ। কর্মের কৌশলই এই যোগ। জল অবিশুদ্ধ বলে জলপান ত্যাগ করা যায় না, কৌশলে জল বিশুদ্ধ করে নিতে হয়। কামনাই কর্মের অশুদ্ধতার কারণ। যে কামনা ত্যাগ করেছে সেই স্থিতধী।

আর কী উপায়? অনভিস্নেহ, মমত্বশূন্য থাকো, পেলেও আনন্দিত হয়ো না, না পেলেও অসন্তুষ্ট হয়ো না। দুঃখে নিরুদ্বেগ, সুখে নিস্পৃহ, আসক্তি নেই, ভয়ও নেই, তারই প্রজ্ঞা স্থির। তারই প্রজ্ঞা স্থির যার বিষয়বাসনার নাশ হয়েছে। ঐ স্থিরত্ব পেতে হলে ঈশ্বরে চিত্ত স্থির করো, ঈশ্বরে সমাহিত হও। এরই নাম ব্রাহ্মী স্থিতি। ঈশ্বরে একনিষ্ঠা।

ষোলই নভেম্বরের বক্তৃতার সারাংশ: 'উপাসনায় প্রতীক আর আচার-বিচারের মধ্যে দিয়ে যাত্রা করাই বিধেয় যেহেতু সেই পথেই আত্মোপলব্ধির গভীরতায় পৌঁছুবার সম্ভাবনা। তাই আমরা বলি: গোষ্ঠীর মধ্যে জন্মানো ভালো, মরা ভালো নয়। চারাগাছকে বেড়া দিয়ে রাখতে হয় বাঁচিয়ে, কিন্তু সে যখন বড় হয় তখন বেড়াই বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। তাই প্রাচীন পন্থাগুলিকে নিন্দা করে লাভ নেই। কে না জানে ধর্মের জগতেও বর্ধন আছে বিবর্তন আছে।

প্রথমে বাহ্যিক ঈশ্বর ভাবনা করি, তাকে স্রষ্টা বলি, বলি সর্বজ্ঞ শক্তিমান। কিন্তু তারপরে যখন প্রেম আসে ঈশ্বর অর্থই প্রেম হয়ে ওঠে। প্রেমিক গ্রাহ্যও করে না ঈশ্বরের স্বরূপ কী, যেহেতু তার কাছে সে কিছু যাচ্ঞা করে না। 'আমি ভিখিরি নই।' এই ভারতের সাধুর সম্ভাষণ। আর তার ভয় বলতেও কিছু নেই। ঈশ্বরের কাছে তার অগ্রসর হবার চেষ্টা নয় ঈশ্বরের কাছে তার সরল চলে আসা।

প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত পাঁচ রকম উপায় আছে। শান্ত—ঈশ্বরে পিতৃত্ব আরোপ করে সর্বসমর্পণ। দাস্য—ঈশ্বরে সেবা, আনুগত্য, তার হাত থেকে পুরস্কার-তিরস্কার নেওয়া। বাৎসল্য—ঈশ্বরকে মা বা শিশু বলে মনে করা। ভারতবর্ষে মা কখনো তার শিশুকে তাড়ন তর্জন করে না। সখ্য—ঈশ্বরকে বন্ধু ভাবা, সমান ভাবা, একসঙ্গে খেলাধুলো করার সহচর ভাবা। তারপরে মধুর ভাবা—ঈশ্বরকে স্বামী বা স্ত্রী ভাবা। টেরেসা ও দিব্যভাবময় সাধুরা এর উদাহরণ। পার্শীদের মধ্যে ঈশ্বরকে স্ত্রী ও হিন্দুদের মধ্যে ঈশ্বরকে স্বামী বলে আরাধনাই বেশি প্রচলিত। আমাদের রানী মীরাবাঈকে মনে করুন, তার কাছে ঈশ্বর স্বামী, দেবতা স্বামী। এই মধুর ভাব থেকে অনেক অপচার ঘটেছে, কিন্তু এ ভাবের কত সাধু মহত্তম সিদ্ধি লাভ করেছে। ধর্মীয় কোন প্রতিষ্ঠানে নেই অপচার? ভিক্ষুক আছে বলে কি তুমি রান্নাই করবে না? চোর আছে বলে কি কোনো জিনিসই রাখবে না তোমার দখলে? 'হে প্রিয়তম তোমার ওষ্ঠাধরের একটি চুম্বন আস্বাদ করেই আমি পাগল হয়েছি।'

এই মধুর ভাবের ফল হচ্ছে এই উপাসক কোনো সম্প্রদায় মানবে না, সইবে না সে

কোনো আদেশবিধির কড়াকড়ি। ভারতীয় ধর্মের পরিণাম স্বাধীনতায়। এও বাহ্য যখন সমস্তই প্রেম, প্রেমের জন্যেই প্রেম, আর কোনো লাভক্ষতির জন্যে নয়।

প্রেমকে বর্ণনা করেছে সাধু: চারচোখে মিলন হোল। দুই প্রাণে অদল বদল হয়ে গেল। এখন বলতে পারছি না সে পুরুষ কিনা কিংবা আমি মেয়ে কিনা, কিংবা সে মেয়ে আমি পুরুষ। এই শুধু মনে আছে, শুধু দুই প্রাণ। কিন্তু প্রেম যখন এল তখন দুই প্রাণ এক হয়ে গেল।

ঝিনুক বালিকেই মুক্তো করে। তেমনি প্রেম মানুষকেই ঈশ্বর করে তোলে। এই প্রেমে কিছু নেওয়া নেই কেবল দেওয়া। কাকে দিচ্ছি তা দেখবার দরকার নেই, দিচ্ছি, দিতে যে পারছি, এতেই আমি কৃতার্থ। বলবে এমন ভাবে মানুষকে ভালোবাসা অসম্ভব, কিন্তু এমন ভাবে ভালোবাসা যায় ঈশ্বরকে, একমাত্র ঈশ্বরকে। আমাদের ছেলেরা রাস্তায় পরস্পর ঝগড়া করবার সময় যদি ঈশ্বরের নাম ধরে, অপরাধ হয় না। আমরা বলি, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই, তেমনি যে ভাবে হোক ঈশ্বরের নাম করলে হবেই হবে সুফল।

প্রেমের তিন কোণ: এক - প্রেম কিছু প্রার্থনা করে না। দুই—প্রেম ভয়শূন্য। তিন—প্রেম সব সময়েই আদর্শতমের উপাসনা। কে বাঁচত, কে নিশ্বাস ফেলতে পারত, যদি না ঈশ্বর তাঁর প্রেমে এই চরাচর বিশ্ব পরিপূর্ণ করে রাখতেন! নিজের হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত করো, মৌমাছি নিজের থেকেই ছুটে আসবে। আগে নিজেকে বিশ্বাস করো পরে ঈশ্বরকে। হৃদয়, মস্তিষ্ক আর বাহু এই তিন নিয়ে মানুষ। অনুভব করবার জন্যে হৃদয়, উদ্ভাবন করবার জন্যে মস্তিষ্ক আর সম্পাদন করবার জন্যে বাহু। হৃদয়ে আর মস্তিষ্কে যদি বিরোধ হয় হৃদয়কে অনুসরণ করো। তোমার মধ্যেই সমস্ত বিশ্ব, যেমন অণুর মধ্যেই সমস্ত শক্তি। কাজ করো কিন্তু মনে রেখো তোমার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরই কাজ করছেন। আগে ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এখন সহযোগিতাই বিশ্বনীতি। কাল দেখবে কোনো নীতি নেই—একমাত্র তুমি। নিন্দা স্তুতি শুনো না, সম্পদ-দারিদ্র্য দেখো না, ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ো না, শুধু নিজেকে অনুসরণ কোরো।'

আর তেইশে নভেম্বর বললেন, আরো অনেক কথার মধ্যে: 'পাওহারী বাবা চোরের পিছু ছুটল পুঁটলি নিয়ে তাকে ধরে তার পায়ে পড়ে বললে, প্রভু তোমাকে চিনতে পারিনি, আমার যা কিছু আছে সব তুমি নাও, আমাকে তোমার সেবা করতে দাও। আর এই সাধুকেই যখন বিষধর সাপে কামড়াল, আর সন্ধের দিকে সাধু যখন জ্ঞান ফিরে পেল, বললে, আমার প্রিয়তমের দূত এসেছিল।

অনন্তে যদি সরলরেখা নিক্ষেপ করো সেটা শেষ পর্যন্ত এক বৃত্ত রচনা করবে। ঈশ্বর সন্ধান তেমনি ফিরে আসবে আত্মসন্ধানে। ঈশ্বর নামক যে সমগ্র রহস্য সে আমি। প্রভাতে সূর্য যেমন একটা লাল থালা তেমনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই একটা বিভ্রান্তি। বিকৃত দেখা মানেই দৃষ্টি বিকৃত। পৃথিবীতে যে পাপ আর নীচাশয়তা দেখে সে নিজের দুর্বলতাকেই দেখে। ভালোকে বিকৃত করে দেখার নাম মিথ্যে।

কেন মানুষ সৎ হবে, পবিত্র হবে? শুধু শক্তিমান হবার জন্যে। যা সকলকে বলশালী করে তাই সৎ। যা তা না করে তাই অসৎ। এই পৃথিবীর ইতিহাস বুদ্ধ আর যীশুর ইতিহাস। যারা নিরাসক্ত নিরাকুল তারাই মহৎ কর্মের অধিকারী। দরিদ্রদের বস্তির মধ্যে যীশুকে কল্পনা করো। দারিদ্র্যের বাইরে সে তাকাতে জানে। সে বলে তোমরা আমার ভাই, তোমরা ঈশ্বরের।

মায়ার জগৎ পেরিয়ে চলো। শরীর হচ্ছে রথ, আত্মা আরোহী, বহিরিন্দ্রিয়গুলি ঘোড়া আর অন্তরিন্দ্রিয়ই সারথি। মায়ার জগতের বাইরেই ঈশ্বর দাঁড়িয়ে। যতক্ষণ মানুষ ইন্দ্রিয়ের বশে ততক্ষণ মানুষ মর্তের। যখন ইন্দ্রিয় তাঁর বশে তখনই সে ত্যাগী, ঈশ্বরাভিমুখী।

যুদ্ধ অনেক ভালো, ক্ষমার অর্থ যদি দৌর্বল্য হয়। যখন জয় করতলগত তখনই ক্ষমার মর্যাদা। তুমি কি জ্ঞানী? তুমি কাপুরুষ। এই কথাই অর্জুনকে বলেছিল কৃষ্ণ। জীবন যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া কিছু নয়। ত্যাগের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত যে সঙ্কল্প, জীবনকে তারই উচ্চারণ করে তোলো। জলের মধ্যে থেকেও পদ্মপাতায় যেমন জল লাগে না তেমনি করে থাকো পৃথিবীতে।

আনন্দ, আনন্দই লক্ষ্য। বৈরস্য-বৈরাগ্য অর্থহীন। প্রার্থনা করার চেয়েও উচ্চহাস্য মহত্তর। হাসো, গান গাও। বিষাদ খেদ উড়িয়ে দাও, নস্যাৎ করো। অন্যকে তোমার মালিন্যে সংস্পৃষ্ট কোরো না। ভেবো না ঈশ্বর দোকানদারের মত ঠোঙায় করে সুখ-দুঃখ বেচতে বসেছেন। কে বলে অল্প সুখ ও অল্প দুঃখ নিয়ে কারবার মানুষের। অনন্ত সুখ অনন্ত বৈভব। পাহাড়ের চূড়ায় এসে ওঠো যদি প্রকৃতিকে উপভোগ করতে চাও। ঈশ্বরই একমাত্র উপভোগ।

পবিত্র হও। যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে অসত্যকে খেদিয়ে দাও। দেখ চেয়ে, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য। একবার মনে করো তুমিই ঈশ্বর, দেখ তোমার কী শান্তি কী সুখ। আর যদি মনে করো তুমি ঈশ্বর নও, দেখবে তোমার কত ভয়! তুমি দুর্বল বলেই তোমার নিন্দক তোমার ঘাতকের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখতে পাচ্ছ না, তাই তোমার যন্ত্রণা। গরিবের যদি কখনো কোনো উপকার করে থাকো, জানবে তুমিই ধন্য, ঈশ্বরই কৃপা করে তোমাকে দয়ালু করে তাঁর সেবা করবার সুযোগ দিচ্ছেন।

কোনো আচার অনুষ্ঠান বা বিধিনিষেধ মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। মানুষের মধ্যে যদি এই দেবত্ব না থাকত তাহলে পৃথিবী এতদিনে ঈশ্বরের কাছে আবেদন ও অনুতাপের কোলাহলে পাগল হয়ে যেত।

কিছুই থাকবে না কিছুই যাবে না। সকলেই পূর্ণতম হবে। কে বলে তুমি শরীরী? শরীর কুসংস্কার। তুমি একমাত্র ঈশ্বরচেতনা। সেই চেতনা সকলকে দিয়ে বেড়াও, অজ্ঞানীকে, দরিদ্রকে, পদদলিতকে, নির্যাতিতকে। ধর্ম বিদ্যা নয় ধর্ম উপলব্ধি। যার বিদ্যা নেই সেও শুধু ভক্তি দ্বারা কর্ম দ্বারা প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বরে এসে পৌঁছুতে পারে।

তাই শুধু কাজ করো, কাজ করো। কাজ করা কেন? পরের হিত ও নিজের মুক্তি এরই জন্যে কর্মধর্ম। রাজা রন্তিদেবের কথা মনে করো। আটচল্লিশ দিন উপবাসের পর শেষ পানীয়টুকু খাবে, এক আর্ত চণ্ডাল এসে সেই জলটুকু প্রার্থনা করল। রন্তিদেব তা দিয়ে দিল অকাতরে। বললে, আমি ঈশ্বর সন্নিধানে অষ্টসিদ্ধিযুক্তা গতি বা মুক্তির কামনা করি না। আমার প্রার্থনা এই, আমি যেন অন্তঃস্থিত হয়ে সমস্ত দেহীর দুঃখ প্রাপ্ত হই, আমার থেকেই যেন সকল দেহীর দুঃখ দূরীভূত হয়। এই আর্ত জীবনধারণের বাসনা করছে। জীবিতকামী এই আর্তজীবের জীবন রক্ষার জন্য জলার্পণ করলেই আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি কাতর্য বিষাদ ও মোহ সমস্তই অপসৃত হবে। রন্তিদেব ঈশ্বরাতিরিক্ত আর কোনো ফলের প্রতীক্ষা না করে চিত্তকে ঈশ্বরাবলম্বী করল। চকিতে গুণময়ী মায়া স্বপ্নবৎ বিলীন হয়ে গেল।

এই ভারতের সনাতন ধর্ম। এই সনাতন ধর্মের কথা নারদ বলছে যুধিষ্ঠিরকে। যে ধর্মদ্বারা মনের প্রসন্নতা হয় তাই সমস্ত ধর্মের মূল। সত্য দয়া তপস্যা শৌচ তিতিক্ষা সদসৎবিচার শম দম অহিংসা ব্রহ্মচর্য দান স্বাধ্যায় আর্জব সন্তোষ সেবা নিবৃত্তি নিষ্ফলতাজ্ঞান, দেহে অনাত্মবুদ্ধি আর মানুষে মানুষে সর্বভূতে দেবতাবুদ্ধি। আর শ্রীকৃষ্ণের নামাদি শ্রবণ ও কীর্তন, তাঁর সেবা অর্চনা প্রণাম ও দাস্য, তাঁর সংগে বন্ধুতা ও তাঁতে আত্মসমর্পণ। এ সবই পরম ধর্ম। এ ধর্মে অধিষ্ঠিত হয়ে কর্ম করো। তারপর ক্রমে ক্রমে, কাষ্ঠ সম্পূর্ণ দগ্ধ হলে অগ্নি যেমন শান্ত হয়, সর্বকর্ম থেকে বিরত হয়ে নির্গুণত্ব লাভ করবে।

জ্ঞানদীপপ্রদ গুরু সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ। যে তাকে মানুষ মনে করে তার সকল শাস্ত্রশ্রবণ হস্তিস্নানের মত নিরর্থক। যে চিত্তবিজয়ে যত্নবান সে নিঃসংগ ও অপরিগ্রহ হবে। পবিত্র স্থানে স্থির সুখকর ও সমতল আসন স্থাপন করে ঋজুকায় হয়ে বসবে এবং ওম্ এই প্রণব উচ্চারণ করবে। পূরক কুম্ভক ও রেচক দ্বারা প্রাণ ও অপান বায়ুকে নিরুদ্ধ করবে আর নিজ নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির রাখবে যে পর্যন্ত না মন সকল কামনা পরিত্যাগ করে। তারপর কামহত ভ্রমণশীল মনকে হৃদয়মধ্যে কুড়িয়ে এনে বন্দী করে রাখবে। যে নিরন্তর এ প্রকার অভ্যাস করে তার চিত্ত অল্পকাল মধ্যেই কাষ্ঠহীন অগ্নির মত নির্বাণ বা শান্তিপ্রাপ্ত হয়। যে মন কামনা দ্বারা অক্ষুব্ধ তা আর বিক্ষিপ্ত হয় না, কারণ ব্রহ্মসুখ-সংস্পৃষ্ট হওয়াতে তার সমস্ত বৃত্তি প্রশান্ত হয়ে যায়। যে অচ্যুত-বিচ্যুত তাকে তার শরীর-রথের ইন্দ্রিয়-অশ্ব বিপথে নিয়ে বিষয়-দস্যু মধ্যে মৃত্যুময় সংসাররূপে নিক্ষেপ করে। প্রবৃত্তিতে পুনরাবৃত্তি, নিবৃত্তিতে বন্ধনমুক্তি। প্রবৃত্তিতে পিতৃযান, নিবৃত্তিতে দেবযান। কৈবল্যনির্বাণদাতা ব্রহ্মই একমাত্র লক্ষ্য একমাত্র লভ্য একমাত্র অন্বেষণীয়। আর, ভগবান ভক্তাধীন—মৌন ভক্তি আর উপশম দ্বারাই তিনি সুপ্রসন্ন।

সাতাশে নভেম্বর স্বামীজি ফিরে যাচ্ছেন আমেরিকা। আবার আসবেন ইংলণ্ডে। আবার আসবেন।

যা কিছু অদৃশ্য তাও পূর্ণ। যা কিছু দৃশ্য তাও পূর্ণ। পূর্ণ থেকেই পূর্ণের উৎপত্তি। পূর্ণ হতে পূর্ণ গ্রহণ করলে পূর্ণই বর্তমান থাকে।

আমরা যেন কর্ণ দ্বারা কল্যাণময় বাক্য শ্রবণ করি। যজ্ঞকর্মে সমর্থ হয়ে যেন নেত্রদ্বারা সর্বশুভ দর্শন করি। স্থির অংগে স্তুতিশীল আমরা দেবোপাসনার জন্যে যেন হিতকর আয়ু ভোগ করি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। আমাদের ত্রিবিধ তাপের শান্তি হোক।

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

॥ তৃতীয় খণ্ড ॥

অচিন্ত্য/৮/১২

'তত্ত্বমসি—তুমিই সেই। অহং ব্রহ্মাস্মি—আমিই ব্রহ্ম। যখন মানুষ এইটে উপলব্ধি করে তখন ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। তার সব হৃদয়গ্রন্থি কেটে যায়, সব সংশয় ছিন্ন হয়। যতদিন আমাদের উপরে কেউ, এমন কি ঈশ্বর পর্যন্ত থাকবেন, ততদিন অভয় অবস্থা লাভ হতে পারে না। আমাদের সেই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হয়ে যেতে হবে।'

বিবেকানন্দ

'জননীই শক্তির প্রথম বিকাশস্বরূপ। মা নাম করলেই শক্তির ভাব, সর্বশক্তিমত্তা, ঐশ্বরিক শক্তির ভাব এসে থাকে—শিশু যেমন আপনার মাকে সর্বশক্তিমতী মনে করে থাকে—মা সব করতে পারে। সেই জগজ্জননী ভগবতীই আমাদের অভ্যন্তরে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী, তাঁকে উপাসনা না করে আমরা কখনো নিজেদের জানতে পারি না।'

বিবেকানন্দ

'তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্যে হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।'

বিবেকানন্দ

ভূমিকা

জন্ম থেকে শুরু করে আমেরিকায় রওনা হওয়া পর্যন্ত প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ড আমেরিকা জয় করে ইংলণ্ডে প্রথম পাড়ি। এই তৃতীয় খণ্ডে লণ্ডনে প্রায় দুমাস থেকে ফের আমেরিকায় ফিরে এসে আবার ইংলণ্ড যাত্রা। ইংলণ্ডে চার মাস কাটিয়ে ইউরোপ ভ্রমণে বেরুনো। ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালি, জার্মানি, হল্যাণ্ড ঘুরে কলম্বোতে অবতরণ। পামবান রামনাদ মাদ্রাজ হয়ে ১৮৯৭-র ফেব্রুয়ারিতে কলকাতায় ফিরে আসা।

ভক্তবীর গিরিশচন্দ্র বলতেন, 'স্বামীজি একাধারে মহাজ্ঞানী এবং মহাভক্ত।' স্বামী যোগানন্দ বলতেন, 'স্বামীজির মধ্যে ঋষিদের সমাধি-তৃষ্ণা, শুকদেবের বৈরাগ্য, শঙ্করের জ্ঞান এবং নারদের ভক্তি একত্র মিলিত হয়েছিল।' আর নিবেদিতার ভাষায়, 'তাঁর আরাধনার সম্রাজ্ঞী ছিল তাঁর মাতৃভূমি। ত্যাগে অকৃপণ, কর্মে নির্বিরাম, জ্ঞানে-প্রেমে অশেষ-নিঃশেষ এমন ঋদ্ধিসমন্বিত ব্যক্তিত্ব আর কোথায় ?'

আর কী বলছেন স্বামীজি ? জগতে সর্বদাই দাতার আসন গ্রহণ করো। সর্বস্ব দিয়ে দাও, ফিরে কিছু চেও না। ভালবাসা দাও, সাহায্য দাও, সেবা দাও, যৎটুকু যা তোমার দেবার আছে দিয়ে দাও, বিনিময়ে কিছু চেও না। আমরা যেন আমাদের নিজেদের বদান্যতা থেকেই দিয়ে যাই—ঠিক যেমন ঈশ্বর আমাদের দিয়ে থাকেন।

বিবেকানন্দের সাধন মন্ত্রে ভারতবর্ষের তিন মহান নেতার অভিষেক হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ পেলেন অতিমানসের নির্দেশ, মহাত্মা গান্ধি পেলেন পতিতোদ্ধার ও গণ-উদ্বোধনের প্রেরণা। আর নেতাজী সুভাষচন্দ্র তো সেই সাধনমন্ত্রেরই জ্বলন্ত ভাষ্য।

'কেবল বিশ্বাসী হও, বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু। অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা, পশ্চাতে চেয়ো না, কে পড়ল দেখতে চেও না। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও সম্মুখে, সম্মুখে—'

অচিন্ত্যকুমার

তৃতীয় খণ্ড লিখতে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীর উপর নির্ভর করেছি ঃ

শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত
প্রমথনাথ বসু কৃত স্বামী বিবেকানন্দ
মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজির জীবনের ঘটনাবলী
স্বামী গম্ভীরানন্দ কৃত যুগনায়ক বিবেকানন্দ
The life of Swami Vivekananda (Advaita Ashrama)
Swami Vivekananda in America New Discoveries
by
Marie Louise Burke
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

লণ্ডনে প্রায় তিনমাস কাটিয়ে নিউইয়র্কে ফিরে এলেন স্বামীজি। আঠারো শ পঁচানব্বুইয়ের ছয়ই ডিসেম্বর।

স্বামী কৃপানন্দের সঙ্গে থার্টিনাইনথ স্ট্রিটে বাসা নিলেন। দুখানি ঘর, প্রায় দেড়শো লোক ধরে। মন্দ কি, ওতেই ক্লাস খুলব। শোনাব কর্মযোগ।

কৃপানন্দকে মনে আছে? রুশ য়িহুদি, নাম লিয়ন ল্যান্ডসবার্গ। স্বামীজির প্রথমতম শিষ্যদের একজন। শিষ্যত্ব নেবার আগে সাংবাদিক ছিল। এখন সন্ন্যাসী।

'আমাদের সব সময়েই কাজ করতে হচ্ছে, এক মিনিটও আমরা কাজ-ছুট নই। তবে মানুষের বিশ্রাম কোথায়? কোথায় মানুষের নিভৃতি?' বলছেন স্বামীজি: 'সে-ই আদর্শ পুরুষ যে গভীরতম নিস্তব্ধতার মধ্যেও তীব্র কর্মী আর প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা অনুভব করে। বাণিজ্যবহুল মহানগরীতে ভ্রমণ করলেও গুহাস্থিত যোগীর মত তার মন শান্ত থাকে অথচ তার মন তীব্রভাবে কর্মব্যস্ত। কর্মই কর্মের বিশ্রাম। আর, জেনো, এই কর্মযোগের রহস্য।'

নিজের নিজের আদর্শ নিজের নিজের জীবনে পরিণত করবার চেষ্টা করো। ওক গাছকে আপেল আর আপেল গাছকে ওক হতে বোলো না। যার-যার বিচারও তার-তার আদর্শের মাপকাঠিতে। ওকের নমুনা নিয়ে আপেলের বিচার চলবে না, বা আপেলের নমুনায় ওকের বিচার। রাজার বিচার ঝাড়ুদারকে দিয়ে নয়, ঝাড়ুদারের বিচার নয় রাজাকে দিয়ে। দেখ যার-যার আদর্শে সে-সে উপনীত কিনা।

তাই সংসারীর থেকে সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ এ বলা নিরর্থক। তেমনি সন্ন্যাসীর থেকে স্বধর্মপরায়ণ গৃহস্থ শ্রেষ্ঠ এ বলাও সমান অসার।

নিজ নিজ স্বত্বে উভয়েই শ্রেষ্ঠ, কেউই ন্যূন নয়।

এক রাজা এই প্রশ্নেরই মীমাংসা চেয়েছিল, কে বড়, সংসারী না সন্ন্যাসী? যে যার নিজের গুণ গায়। সন্ন্যাসীরা বলে, আমরা বড়। সংসারীরা বলে, আমরা। প্রমাণ কী? রাজা প্রমাণ দিতে বলে। শুধু মুখের কথা, বক্তৃতা, প্রমাণ দিতে পারে না কেউ।

এখন এক সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত। সে বললে, যার-যার আশ্রমে সে-সে মহৎ।

প্রমাণ দাও।

দেব। চলুন আমার সঙ্গে।

রাজা আর সেই সন্ন্যাসী পার্শ্ববর্তী এক রাজ্যের রাজধানীতে প্রবেশ করল। এত এখানে বাজনা আর কোলাহল কেন? এ দেশের রাজকন্যা স্বয়ম্বরা হবে।

চলুন দেখি তো। সন্ন্যাসী রাজাকে টেনে নিয়ে গেল।

বহু-বহু প্রার্থী রাজপুত্র সমবেত হয়েছে। এ কি, একজন তরুণ সন্ন্যাসীও দেখি উপস্থিত। সে এসেছে কেন? নিশ্চয়ই কৌতুহলে আকৃষ্ট হয়ে। দেখি কাকে বলে স্বয়ম্বরা?

সুন্দরতম পুরুষই তার স্বামী হবে এই ছিল রাজকুমারীর প্রতিজ্ঞা। এই রাজন্য-জনতায় সেই সর্বাঙ্গসুন্দর কোথায়? কিন্তু অদূরে ও কে দাঁড়িয়ে? এক তরুণ সন্ন্যাসীর দিকে দৃষ্টি পড়ল রাজকুমারীর।

কোথা থেকে কী হল কে জানে রাজকুমারী সেই তরুণ সন্ন্যাসীর গলায় মালা দিয়ে বসল।

'এ কী পাগলামি ! আমি সন্ন্যাসী, আমার আবার বিয়ে কী !'. তরুণ সন্ন্যাসী গলার মালা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

রাজ্যের রাজা ভাবল, বেচারা গরিব, হয়তো ভরসা পাচ্ছে না বিয়ে করতে। তাই অবস্থাটা সে বিশদ করতে চাইল। বললে, 'শোনো, তুমি শুধু রাজকন্যাকেই পাবে না, যৌতুকস্বরূপ অর্ধেক রাজ্যও পাবে, আর আমার দেহান্তে তুমিই তো আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী।'

তরুণ সন্ন্যাসীর গলায় রাজকন্যা আবার মালা দিল।

'এ কী অন্যায় কথা।' তরুণ সন্ন্যাসী ফের মালা ফেলে দিল। পরমাসুন্দরী রাজকুমারী বা রাজ্যধন কিছুই তাকে পারল না বাঁধতে। পাছে রাজশক্তি তাকে নিগৃহীত করে তরুণ সন্ন্যাসী সভা ছেড়ে ছুট দিল। আগন্তুক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ভিড়ের মধ্যে, সেইটেই অপরাধ হয়েছিল। সন্ন্যাসীর আবার কৌতূহলী হওয়া কী।

কিন্তু তরুণ সন্ন্যাসীর নিস্তার নেই। তার উপর এত মন পড়েছে যে রাজকন্যা তাকে ফিরিয়ে আনতে চলল। হয় ঐ প্রিয়দর্শনকে আমি বিয়ে করব নয়তো আত্মহত্যা করব। তাই, তরুণ সন্ন্যাসী গ্রাম অতিক্রম করে বনে ঢুকলেও রাজকুমারী নিবৃত্ত হল না, তাকে অনুসরণ করল। কিন্তু তরুণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে রাজকুমারী এঁটে উঠবে কী করে। বনের এক দুরূহ পথ ধরে চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেল তরুণ সন্ন্যাসী।

ভ্রষ্টলক্ষ্য রাজকুমারী বৃক্ষতলে বসে কাঁদতে লাগল। সন্ধে হয়ে গেল, বন থেকে বেরুবে কী করে ?

তখন আগের সেই রাজা আর সন্ন্যাসী, যারা আনুপূর্বিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করছিল, তারা এল রাজকুমারীর কাছে। জিজ্ঞেস করলে, কাঁদছ কেন ?

বন থেকে বেরুবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না, বললে রাজকুমারী।

'এখন অন্ধকার হয়ে গেছে, এখন পথ বার করা অসম্ভব।' বললে সেই সন্ন্যাসী, 'প্রভাত পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।'

'কিন্তু রাত কাটাব কোথায় ?'

'এই বৃক্ষতলে।'

বৃক্ষতলে বসল তিনজন—সেই পরিদর্শক রাজা আর সন্ন্যাসী আর এই পথহারা রাজকুমারী।

'কিন্তু এত শীত সহ্য করব কী করে ?' রাজকুমারী তাকাল করুণ চোখে : 'কোথাও একটু আগুন যোগাড় হয় না ?'

'এই দুর্গম বনে আগুন কোথায় ?'

সেই গাছের উপরে এক পক্ষী-পরিবারের বাসা। ছোট পাখি পাখিনী আর তাদের বাচ্চার সংসার। বৃক্ষতলের পথিকদের দেখতে পেয়ে পাখি বললে পাখিনীকে, 'আমাদের ঘরে এরা তো অতিথি, কিন্তু এই শীতে ওদের আরাম দিই কি করে ?'

পাখিনী বললে, 'কোত্থেকে ঠোঁটে করে এক টুকরো জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে এলে হয়। সেই কাঠ ওদের সামনে ফেলে দিলে ওরা সহজেই আগুন করে নিতে পারবে। আর একবার আগুন হলেই শীত পলাতক।'

'ঠিক বলেছ।' পাখি লোকালয়ের সন্ধানে ছুটল। কার উনুন থেকে এক টুকরো জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে এসে ফেলে দিল অতিথিদের সামনে।

কাঠ-পাতা কুড়িয়ে এনে সেই জ্বলন্ত কাঠের সংযোগে বিরাট আগুন করে তুলল অতিথিরা। শীতের পরিত্রাণ হল।

'কিন্তু ওদের খেতে দিই কী?'

'ঘরে তো ফলমূল কিছুই নেই।'

'কিন্তু দেখছ ওরা ক্ষুধার্ত।' বললে পাখি, 'আর আমরা গৃহবাসী গৃহস্থ। ক্ষুধার্ত অতিথিকে খেতে দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য।'

'তা তো ঠিক। কিন্তু করবে কী?'

'আমি আত্মাহুতি দেব।' বলে পাখি উড়ে গিয়ে সবেগে আগুনের মধ্যে পড়ল। পড়েই মরে গেল পলকে।

অতিথিরা চেষ্টা করল, বাঁচাতে পারল না।

'ঐ একটা ছোট পাখিতে তিনজনের খাওয়া হবে কী করে?' বললে পাখিনী, 'স্বামীর কোনো উদ্যমই বিফল হতে না দেওয়া স্ত্রীর কর্তব্য। সুতরাং আমিও আত্মোৎসর্গ করি।' বলে পাখিনীও আগুনে ঝাঁপ দিল।

'পিতামাতার কাজ সম্পূর্ণ করতে চেষ্টা করাই সন্তানের কাজ।' বললে বাচ্চা কটা: 'অতএব আমাদের শরীর শেষ হোক।' বলে তারাও ঝাঁপ দিল।

দগ্ধ পাখিগুলিকে কিন্তু খেল না অতিথিরা। শুধু তাদের কাণ্ড-কারখানাটাই দেখল আর অবাক মানল। কোনোরকমে রাত কাটাল অনাহারে। ভোর হলে সন্ন্যাসী আর রাজা সেই রাজকুমারীকে তার বাপের কাছে পৌঁছিয়ে দিল।

'এখন দেখলেন তো, নিজ-নিজ অধিকারে কেউ কারু থেকে ছোট নয়।' রাজাকে উদ্দেশ করে বললেন সন্ন্যাসী, 'যদি আপনি সংসারে থাকতে চান তবে ঐ পাখিগুলোর মত অন্যের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকুন, আর যদি সংসার ত্যাগ করতে চান তবে ঐ তরুণ সন্ন্যাসীর মত বীতস্পৃহ হোন, সুন্দরী যুবতী আর রাজ্যধন শূন্যবৎ নিরীক্ষণ করুন, সমস্ত প্রলোভনকে উপেক্ষা করতে শিখুন। গৃহস্থ হোন, পরহিতে জীবন বিসর্জন দিন আর সন্ন্যাসী হোন, সৌন্দর্য ঐশ্বর্য আর শক্তির প্রতি উদাসীন থাকুন। প্রত্যেকেই নিজের অধিকারে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু একজনের কাজ আরেকজনের করণীয় নয়।'

দু সপ্তাহে সতেরোটি বক্তৃতা দিলেন স্বামীজি।

কর্ম না করে অকর্মকৃৎ হয়ে, ক্ষণকালও কেউ টিকতে পারে না। নিশ্বাস-প্রশ্বাসও কর্ম। আর কোন কর্ম আছে যা সদসৎমিশ্রিত নয়, যা কিছুটা বা অনিষ্টকর নয়? তাই কিছুটা ভালো হয়ে, গীতা বলছে, নিরন্তর কর্ম করো কিন্তু ফলাফলে নিরাসক্ত হও। কর্ম বন্ধনের কারণ নয়, কামনাই বন্ধনের কারণ। সুখ-দুঃখ লাভ-অলাভ জয়-পরাজয় সমস্ত তুল্যজ্ঞান করো। যদি ফল ত্যাগ করে সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে সমান ভেবে কর্তৃত্বাভিমান বর্জন করে কর্ম করতে পারি তাহলে কোথায় ভয়, কোথায় বন্ধন!

আমাদের প্রধান শত্রু কী? প্রধান শত্রু বাসনা। এই বাসনাকে খর্ব করার একমাত্র উপায় বুদ্ধিকে ঈশ্বরমুখী করা। অর্থাৎ কর্মও তাঁর, ফলাফলও তাঁর, আমি যন্ত্র মাত্র এই ভাবনাকে আশ্রয় করা। তাহলেই বুদ্ধি শুদ্ধ হবে, কর্মই ধর্ম হয়ে যাবে। আর

এই ধর্মের অল্প আচরণও মহাভয় হতে ত্রাণ করবে তোমাকে। স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ।

'মোট কথা', বলছেন স্বামীজি, 'প্রভুর মত কাজ করবে, ক্রীতদাসের মত নয়। স্বাধীন হয়ে কাজ করো, ভালোবেসে কাজ করো। যে স্বাধীন নয় তার আবার প্রেম কী। একটা ক্রীতদাসকে শেকলে বেঁধে রেখে যদি কাজ করাও, কষ্টেসৃষ্টে কাজ সে করবে বটে, কিন্তু তার কাজে প্রেম কই আনন্দ কই ? প্রেমের সঙ্গে কাজ করতে পারলেই তো আনন্দ। প্রেমপ্রেরিত হয়ে পরের জন্য কাজ করো, কত সুখ কত শান্তি। আর স্বার্থপ্রেরিত হয়ে শুধু নিজের তুষ্টির জন্যে কাজ করো, পরিণামে শুধু যন্ত্রণা আর হাহাকার।'

'কর্মই তোমার উপাসনা।' বলছেন আবার স্বামীজি, 'সুতরাং সমস্ত কর্মফল ভগবানে অর্পণ করো। ফল কে আশা করে ? যারা ফলকামী তারা কৃপণ, তারাই কৃপার পাত্র। ভগবান স্বয়ং অবিশ্রান্ত কাজ করছেন কিন্তু তার কোনো আসক্তি নেই, ফলকামনা নেই। তেমনি তুমি যদি স্বার্থশূন্য অহংশূন্য হয়ে কাজ করতে পারো ফলাসক্তি তোমাকে বন্ধ করতে পারবে না, পাপসঙ্কুল জনসমাজে থেকেও তুমি পাপে লিপ্ত হবে না কোনোদিন।'

কর্মের তা হলে কৌশল কী ? কর্মের কৌশল যোগ—সমত্ববুদ্ধি। যে সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হয়ে কাজ করে, হার-জিত সমান করে নিতে পারে, সেই চতুর, সেই দুঃখমুক্ত। দুঃখ কর্ম থেকে নয়, দুঃখ আসক্তি থেকে। জল অবিশুদ্ধ বলে পান করা যায় না তা ঠিক কিন্তু তাকে ত্যাগও করা যায় না—পানের আর ব্যবস্থা কই ? জলকে কৌশলে বিশুদ্ধ করে নিয়ে পান করো। তেমনি কর্ম দোষাবহ বলে তাকে ত্যাগ করা যায় না, কৌশলে দোষ খণ্ডন করে তুমিও অনাময় হয়ে যাও।

এত সুন্দর ও মহৎ কথা বলছেন স্বামীজি, কেউ লিপিবদ্ধ করে রাখছে না। একজন স্টেনোগ্রাফার রাখা হল কিন্তু সাধ্য কি সে স্বামীজির সঙ্গে তাল রাখে। আর যে সব বিষয়ের উপর বক্তৃতা তা তার কাছে নিতান্ত দুর্বোধ্য, হাতি লিখতে পিঁপড়ে লিখে বসে আছে। তাকে সরিয়ে দিয়ে আরেকজনকে রাখা হল, তারও সেই হাল। তারপর তৃতীয় জন যাকে রাখা হল সে প্রায় ঈশ্বরপ্রেরিত।

তার নাম জে. জে. গুডউইন। ইংরেজ যুবক, নিউইয়র্কে এসেছে, অবিবাহিত। সে নিজের থেকেই চাইল কাজ করতে। আর কী আশ্চর্য, স্বামীজির বক্তৃতা আগাগোড়া নিখুঁত করে তুলল তার সঙ্কেত-লিপিতে। সমস্ত বিষয় যেন তার জানা। হৃদয় দিয়ে অনুভাবন করা। কিছুই তার আটকাল না, এমন কি সংস্কৃত উদ্ধৃতিও না। তার লেখার গতি দীপ্তি দেখে মনে হয় সেও যেন ঐ ভাবেরই ভাবুক।

হ্যাঁ, সন্ন্যাসী হবে গুডউইন। যে দিন থেকে সে স্বামীজির সংস্পর্শে এসেছে সেই দিন থেকেই সে যেন অন্যমনা হয়ে উঠেছে। সংসার সম্বন্ধে নেই তার আর সলোভ কৌতূহল। যেন ক্রমশই চলে আসছে নির্বেদে, অনাসক্তিতে।

একজন সংসারী যুবকের এ কী আত্মনিষ্ঠ নির্লিপ্ত অকথা। তার জন্যে কাজে এতটুকু শৈথিল্য নেই। স্বামীজির সমস্ত বক্তৃতা সে টুকছে, তারপর রাত জেগে তা টাইপ করে পরে ফের পাঠিয়ে দিচ্ছে খবরের কাগজে। সমস্ত দায়িত্ব পরম দক্ষতায় পালন করছে। স্বামীজি অসন্তুষ্ট হতে পারেন তার জন্যে এতটুকু ফাঁক রাখছে না। যেমন সমর্থ তেমনি বিশ্বাসী।

শুধু বক্তৃতার কাজ করেই ক্ষান্ত হতে চায় না, আরো কিছু করতে চায় স্বামীজির জন্যে। বন্ধুর মত, শিষ্যের মত, হয়তো বা ভৃত্যের মত। যেখানে স্বামীজি যান, বস্টনে বা ডেট্রয়টে, চলেছে তাঁর ছায়া হয়ে। এমন কি যখন ভারতে ফিরছেন স্বামীজি তখনো সে তাঁর সহচর।

আলাসিংগাকে লিখছেন স্বামীজি: 'খুব সম্ভব মিস্টার ও মিসেস সেভিয়ার আর মিস মুলার আর মিস্টার গুডউইনকে নিয়ে আমি ভারতে ফিরব। মিস মুলারকে তো তুমি জানোই—হেনরিয়েট মুলার, আমার ইংরেজ শিষ্যা। ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার কয়েক দিন আলমোড়ায় বাস করবার জন্যে যাচ্ছেন, আর গুডউইন—গুডউইন সন্ন্যাসী হবে। সে অবশ্য আমার সংগেই ঘোরাঘুরি করবে। আমাদের সমস্ত বইয়ের জন্যে আমরা তার কাছেই ঋণী। আমার বক্তৃতা সে শর্টহ্যাণ্ডে লিখে নিয়েছিল বলেই বই হয়েছে। দলের আর সকলে হোটেলে উঠবে কিন্তু গুডউইন থাকবে আমার সংগে। তোমার কি মনে হয় দেশের লোক এ নিয়ে খুব আপত্তি করবে? গুডউইন কিন্তু খাঁটি নিরামিষাশী।'

ইংরেজ-ভক্ত স্টার্ডিকে বলছেন স্বামীজি, 'আমেরিকায় প্রথম-প্রথম এমনিই বক্তৃতা দিতুম, কেই বা খোঁজ নেয়, কেই বা লিখে রাখে। কত কথা হাওয়া হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে, একজন লিপিলেখক নিযুক্ত করো। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল, রাখা হল একজনকে। তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে আরেক জনকে। দুজনই বাজেমার্কা। তৃতীয়জন নিজের থেকে এল। আগের দুজন আমেরিকান, এ ইংরেজ। বয়েস তেইশ চব্বিশ। প্রথম থেকেই মনে হল দক্ষ, তীক্ষ্ণ, দ্রুত অথচ বাধ্য ও বিনম্র। দিন সাতেক কাজ করার পর বললে, আমি মাইনে কিছু নেব না। শুধু আপনার কাছ থাকব আর আপনার কাজ করব। সেই থেকে গুডউইন আমার সংগে রয়েছে, ও না থাকলে আমার বড় অসুবিধে।'

সংসারে বিধবা মা আর দুটি অবিবাহিত বোন। তারা নিজেরা খাটাখাটনি করে পেট চালায়, গুডউইন দেশ-বিদেশে ঘোরে। যদি হাতে কিছু বাড়তি টাকা জোটে মাকে পাঠিয়ে দেয়। যদি কখনো সুযোগ আসে এক ফাঁকে দেখে আসে মাকে।

'যে দেশে ইংরিজি ভাষা চলে সেই দেশেই জীবিকা খুঁজেছি, ইংলণ্ডে, আমেরিকায়, অস্ট্রেলিয়ায়। কী করব, গরিব, মুরুব্বিহীন, অল্পবয়স থেকেই রোজগারের ধান্দায় ঘুরতে হয়েছে। কিন্তু যেখানেই যাই, লোকে শুধু কাজ করিয়ে নেয়, দামও দেয়, কিন্তু শুধু ঐটুকু—প্রাণের ভালোবাসাটা কেউ দেয় না।' বলতে বলতে গম্ভীর হল গুডউইন: 'শেষকালে ঘুরতে ঘুরতে আমেরিকায় স্বামীজির কাছে জুটলুম। আর বলব কী, ওখানেই প্রাণ থেকে বেরিয়ে আসা ভালোবাসাটা দেখতে পেলুম। তাই রোজগারপাতি হোক বা না হোক, ছেড়ে যেতে পাচ্ছি না, বাঁধা পড়ে গেছি। স্বামীজির মতন অমন আরেকটা লোক আছে? কেউ আর পারবে অমন আপনার বলে কাছে টানতে?'

'অনেক দেশ তো ঘুরলে, একবার ভারতবর্ষে যাবে না?' কে একজন জিজ্ঞেস করলে।

'যাব, স্বামীজির সংগে আমি যাব, নইলে স্বামীজির সেবা করবে কে?'

লণ্ডনে থাকতে স্বামীজি একদিন খেতে বসেছেন, দু চামচ খেয়েছেন, হঠাৎ কী মনে হল, গুডউইনকে জিগগেস করলেন, 'ডায়রিটা দেখ তো, আজ কোনো য়্যাপয়ণ্টমেণ্ট আছে কি না।'

সর্বনাশ, স্বামীজি যখন ওরকম ভাবছেন তখন হয়তো বা আছে। ডায়রি দেখে গুডউইনের মুখ শুকিয়ে গেল, বললে, 'আছে। পার্ক লেনে ডিউকের বাড়িতে নেমন্তন্ন।'

স্বামীজি ঘড়ি খুলে দেখলেন, হাতে আর মোটে দশ মিনিট সময়। টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন। ওরে কী হবে? সাজগোজ করে বেরুতে পারব তো ঠিকঠাক? পেঁছুতে পারব তো রে গাড়ি করে?

নিজের ঘরে গিয়ে স্বামীজি সার্ট কলার ভেস্ট ইত্যাদি পরে পায়ের জুতো ছেড়ে বুট জুতো পরলেন কিন্তু কিছুতেই পারছেন না ফিতে বাঁধতে।

'ওরে গুডউইন, ফিতে বাঁধতে পাচ্ছি না যে।'

'আমি দিচ্ছি ঠিক করে।' গুডউইন নিচু হয়ে জুতোর ফিতে বেঁধে দিল।

ফিতে এঁটে বেরিয়ে আসছেন, স্বামীজি আবার চেঁচিয়ে উঠলেন: 'ওরে মাথায় টুপি কই? টুপি এনে দে।'

গুডউইন একছুটে গিয়ে টুপি নিয়ে এল।

'তোর কী বুদ্ধি!' স্বামীজি রুখে উঠলেন: 'এই সঙ্গে ছড়িটা আনলি নে? ছড়ি ছাড়া যাব কোথায়?'

গুডউইন ছড়ি এনে দিল।

গুডউইন পকেট থেকে তামাক আর কাগজ বের করল। একটা সিগারেট পাকিয়ে থুতু দিয়ে ধারটা আঁটিতে যাচ্ছে, স্বামীজি বললেন, 'ওরে থুতু দিসনি, থুতু দিলে ব্যাধি হয়, অমনি দে।'

স্বামীজি নিজেই সিগারেট পাকালেন। দেশলাই বের করে কাঠি জ্বালিয়ে গুডউইন তা ধরিয়ে দিল।

'কিন্তু যাব কী করে?' এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন স্বামীজি। 'গাড়ি কই?'

গাড়ির সন্ধানে গুডউইন পড়ি-মরি করে রাস্তায় ছুটল।

ধরে নিয়ে এল একটা হ্যানসাম গাড়ি। স্বামীজি ঘড়ি খুলে দেখলেন, চার-পাঁচ মিনিট মোটে হাতে আছে। গাড়োয়ানকে বললেন, 'উড়িয়ে নিয়ে চলো। যদি ঠিক সময়ে পেঁছিয়ে দিতে পারো তোমার ধার্য ভাড়া তো পাবেই উপরন্তু বকশিস দেব।' বলেই পকেটে হাত দিলেন: 'ও গুডউইন, পকেট যে ফাঁকা।'

তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে পাঁচ পাউন্ড এনে দিল গুডউইন।

গাড়ি চলতে সুরু করেছে, মুখ বাড়িয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন স্বামীজি, 'ও গুডউইন, গাড়োয়ানকে পার্ক লেনের ঠিকানাটা বলেছিস তো?'

স্বামীজিকে রওনা করিয়ে দিয়ে গুডউইন আবার খাবার টেবিলে এসে বসল। দু চামচ মটরের ডাল নিল তার প্লেটে। বললে, 'কী আশ্চর্য স্বাদ! আমি শুধু এই ডাল খেয়েই সমস্ত জীবন কাটিয়ে দিতে পারি।'

আর স্বামীজি বলছেন সারদানন্দকে: 'দেখলি তো, তোর কলকাতার ঢের ঢের হোমরাচোমরা এখানে আসে, ডিউকেরা কে তাদের সঙ্গে খায় রে? অনেক সুপারিশ নিয়ে গেলে বড়জোর দেখা করে কিন্তু এ একেবারে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো।' শিশুর সারল্যে হাসতে লাগলেন স্বামীজি: 'আমি হচ্ছি টিচার-ক্লাশ তাই আমাকে এরা এত সম্মান করে। আমি ইংরেজগুলোর মাথায় পা দিয়ে চলি, তা ওরা যত ধনী-মানী-জ্ঞানী-গুণীই হোক না কেন। দেখছিস তো কেমন জুজু হয়ে থাকে আমার সামনে। এদের হাড়ে-হাড়ে বেদান্ত ঢুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। দেখিস এখন থেকে এরা ইন্ডিয়াকে অন্য চোখে দেখবে, সম্মান করে ইন্ডিয়ার কথা শুনবে। কী, তাই নয়?'

ভারতবর্ষই আধ্যাত্মিকতার জন্মভূমি, ললিতকলার ক্ষেত্রে পৃথিবীর গুরু। ধর্ম-চিন্তায় ভারতবাসীই সবচেয়ে বেশি সাহসী।

৭৫

ইংল্যান্ড থেকে স্বামীজি শশীকে, অর্থাৎ রামকৃষ্ণানন্দকে চিঠি লিখছেন :

'বিজনেস ইজ বিজনেস—ছেলেখেলা করলে কি হয় ? আমি ইংল্যান্ডে এবার একটু শুধু খবর নিতে এসেছি। আসছে গ্রীষ্মে কিছু বেশিরকম হুজুক করা যাবে। তারপর শীতে দেশে ফিরব। ততদিন আগ্রহ জাগিয়ে রাখো। স্টার্ডি সাহেবটি বড়ই ভালো, গোঁড়া, বৈদান্তিক, সংস্কৃত একটু-আধটু বোঝে। বহুৎ পরিশ্রম করলে তবে একটু-আধটু কাজ হয় এ দেশে—বড়ই শক্ত কাজ, বিশেষত শীতে-বাদলে। তার উপর এখানে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। ইংরেজরা লেকচার-ফেকচার শুনতে একটি পয়সাও দেয় না। যদি শুনতে আসে তো তোমার ভাগ্য, যেমন আমাদের দেশে। তার উপর এদেশে সাধারণে আমাকে জানেও না। আর, ভগবান-টগবান বললে ওরা পালিয়ে যায়, বলে, ঐ রে, পাদরি বুঝি।'

কিন্তু শিব-নাম তো বলবে। অন্তত ওঁ তো উচ্চারণ করবে।

ওঁ—এই পদের মধ্যে তিনটি বর্ণ—অ, উ আর ম। এরা হচ্ছে তিন বেদ—ঋক, যজুঃ, সাম। তিন অবস্থা—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। তিন ভুবন—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ। তিন দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। স্বরত্রয়ে এর উচ্চারণ—উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিৎ। আর স্তব সর্বাবস্থার অতীত, সর্ববিকারের ঊর্ধ্বে, চৈতন্যস্বরূপকেও।

অখণ্ডানন্দকে আবার লিখছেন স্বামীজি :

'খবরের কাগজে দেখে থাকবে যে ইংলন্ডে হুজুক ধীরে-ধীরে মাচছে। এদেশে সকল কাজই ধীরে-ধীরে হয়। কিন্তু ইংরেজ বাচ্চা কোনো কাজে হাত একবার দিলে আর ছাড়ে না। আমেরিকানরা চটপটে কিন্তু অনেকটা খড়ের আগুনের মত। রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার ইত্যাদি সাধারণে প্রচার করবে না। মহাশক্তি তোমাতে আসবে, ভয় নেই। বি পিওর, হ্যাভ ফেথ, বি ওবিডিয়েন্ট। পবিত্র হও, বিশ্বাস রাখো আর আদেশ পালন করো।'

কী বলছে বাইবেল ? বলছে, হে প্রিয় আত্মা, অধোমুখে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? স্তব্ধ হয়ে কেন দেহের মধ্যেই বন্দী হয়ে বসে আছ ? তাঁর কাছে কখনো আশা ছেড়ো না, কিছু না পেলেও তাঁর প্রশংসা করো। তিনিই তোমার স্বাস্থ্য, সম্পদ, তিনিই তোমার সর্বস্ব।

ধৈর্য হারাবার কী হয়েছে। কেনই বা ভগ্নমনোরথ হবে ? প্রতীক্ষার তো কোনো তামাদি নেই। এমন তো কেউ বলে দেয় নি, সময়ের একটা বিশিষ্ট সীমা পেরিয়ে গেলে আর তাঁকে ডাকা যাবে না, তাঁতে শরণাগত হবার দিন ফুরিয়ে গেল। এ নদীর শেষ নেই, তেমনি আমার দাঁড় টানাও নিরবধি। জীবনকালে তো তাঁকে ধরে থাকবেই, মরণকালেও ধরবে। আর বলবে, হে চিত্ত, শুধু প্রতীক্ষা করে থাকো। প্রতীক্ষাই তো তোমার সমস্ত জীবনের পরিতোষ, পরমতম পুরস্কার।

'বিজনেস ইজ বিজনেস', স্টার্ডির বাড়ি থেকে স্বামীজি লিখেছেন ব্রহ্মানন্দকে : 'গড়িমসির কাজ নয়। আসছে সপ্তাহের শেষে আমি যাচ্ছি। অতএব যদি কেউ আসে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের আশা নেই। গিরিশবাবু এদেশে বেড়িয়ে যান না, বেশ কথা। ইংলণ্ড ও আমেরিকা ঘুরে যেতে হাজার তিনেক টাকা মাত্র পড়বে। যত লোক এসব দেশে আসে ততই ভালো। তবে ঐ টুপি-পরা সাহেব হতভাগাদের দেখলে গা জ্বলে। ভূত কালো—আবার সাহেব! ভদ্রলোকের মত দিশি কাপড়চোপড় পর বাবা, তা না হয়ে ঐ জানোয়ারী রূপ! আর কেন, হরি বলো। এখানে সমস্তই ব্যয়, আয় এক পয়সাও নেই। স্টার্ডি আমার জন্যে অনেক টাকা খরচ করেছে। এখানে লেকচারে আমাদের দেশের মত উলটে ঘর থেকে খরচ করতে হয়। তবে অনেকদিন করলে ও খাতির জমে গেলে খরচটা পুষিয়ে যায়। টাকা-পয়সা প্রথম বৎসর আমেরিকায় যা করি—তার পর থেকে এক পয়সাও নিইনি—সব প্রায় ফুরিয়ে গেল, শুধু আমেরিকায় ফেরবার পথখরচটুকু আছে। ঘুরে ঘুরে লেকচার করে আমার শরীর নার্ভাস হয়ে পড়েছে, প্রায়ই ঘুম হয় না। তার উপর একলা। দেশের লোকের কথা আর বোলো না। না কেউ একটা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছে, না বা নিজে এগিয়ে এসেছে। এ সংসারে সকলেই সাহায্য চায়—এবং যত করো তত চায়। তারপর যদি আর না পারো তো তুমি চোর!'

হে জ্যোতিষ্মান, আমার ললাটে প্রাতিভ জ্যোতি প্রজ্বলিত করো। তার দীপ্তিতে আমার চিত্তের সমস্ত গুপ্ত অন্ধকার দূরীভূত হোক।

হে যোগীশ্বর, আমার বিষয়বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করো। পিশাচেরা আমার রক্ত-মাংসের লোভে দিনরাত চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হে মৃত্যুঞ্জয়, তাদের তুমি পর্যুদস্ত-পরাভূত করে দাও। আমার ইচ্ছা-বায়ুকে বলো, হে বায়ু, তুমি নিস্পন্দ হও, আমার চিত্ত-সমুদ্রকে বলো, হে সমুদ্র, তুমি স্থির হও। তোমার অস্তিত্বসমুদ্রের সুবিশাল মৌন আমাকে আচ্ছন্ন করুক।

'আমি কলকাতা থেকে একজন সন্ন্যাসীকে ডেকে পাঠিয়েছি,' আলাসিঙ্গাকে লিখছেন স্বামীজি : 'তাকে লণ্ডনের কাজের জন্যে রেখে যাব। আমেরিকার জন্যে আমার আরেকজনকে দরকার। তোমরা কি মাদ্রাজ থেকে কাউকে পাঠাতে পারো না? অবশ্য তার খরচপত্র সব আমি দেব। তার ইংরেজি ও সংস্কৃত দুই-ই ভালো জানা চাই, ইংরেজিটা একটু বেশি। আর তার খুব শক্ত হওয়াও প্রয়োজন। মেয়ে-টেয়ের পাল্লায় পড়ে না বিগড়ে যায়। তার উপর তার সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ও আজ্ঞাবহ হওয়া চাই। মোট কথা আমি আমার নিজ জন চাই। গুরুভক্তিই সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল।'

কী হবে পুত্র-কলত্রে, সুরূপ শরীরে, চারুচিত্র যশে বা মেরুতুল্য ধনে, যদি না গুরুপাদপদ্মে মন বিলগ্ন থাকে! কী হবে গদ্যে-পদ্যে কবিত্বে, কী বা শাস্ত্রবিদ্যায়, ষড়ঙ্গাদিবেদ কণ্ঠস্থ করে, যদি গুরুপাদপদ্মে লীনমানস না থাকি! কী হবে বিদেশে মান্য বা স্বদেশে ধন্য হয়ে, কী বা হবে যোগে-ভোগে, প্রিয়সুখে বা সদাচারে, যদি গুরুপাদপদ্মের মধুকর না হই।

গুরুতে মর্তবুদ্ধি কোরো না, না বা মনুষ্যবুদ্ধি। যেমন মন্ত্রে অক্ষরবুদ্ধি বা প্রতিমায় শিলাবুদ্ধি অবিহিত। একমাত্র গুরুশুশ্রূষাই সমস্ত পাপের নিস্তার, সমস্ত পুণ্যের আশ্রয়।

তারপরে নিউইয়র্কে পৌঁছুলেন স্বামীজি।

পৌঁছে মিসেস ওলি বুলকে লিখছেন : 'দশ দিন বিরক্তিকর দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর আমি গত শুক্রবার এখানে পৌঁচেছি। সমুদ্র ভীষণ উত্তাল ছিল এবং জীবনে এই প্রথম আমি সমুদ্রপীড়ায় কষ্ট পেয়েছি। আপনার একটি নাতি হয়েছে জেনে অভিনন্দন জানাচ্ছি. শিশুটির মঙ্গল হোক।

সাধারণের কাছে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দেওয়া আমি ছেড়ে দেব, কেন না ওতে টাকাকড়ির সংশ্রব থাকে, আর আমি ঠিক করেছি টাকাকড়ির সংশ্রব আদৌ রাখব না, যেহেতু ওতে কাজের ক্ষতি হয় আর দৃষ্টান্তটাও মহৎ দেখায় না। ইংলণ্ডে বক্তৃতার খরচ অধিকাংশ স্টার্ডিই বহন করত, বাকিটা আমি করতাম। ধর্মের হাটেও চাহিদার বেশি মাল সরবরাহ করা ঠিক নয়। চাহিদা অনুসারেই সরবরাহ করা উচিত। যদি লোকে আমাকে চায়, তবে তারাই বক্তৃতার সমস্ত বন্দোবস্ত করবে। এ সব নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। যদি আপনি মিসেস য়্যাডামস ও মিস লকির সঙ্গে পরামর্শ করে মনে করেন যে আমার পক্ষে শিকাগো গিয়ে ধারাবাহিক কতকগুলো বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব হবে, তবে আমাকে লিখবেন। অবশ্য টাকাকড়ির ব্যাপার একদম বাদ দিতে হবে।'

ক্রিসমাসে বস্টনে গেলেন স্বামীজি, ওলি বুলের নিমন্ত্রণে। সেখান থেকে নিউইয়র্কে ফিরে এসে হার্ডিম্যান হল্-এ প্রতি রবিবার বক্তৃতা সুরু করলেন। যার খুশি দেখতে ও শুনতে চলে এস, টিকিট লাগবে না।

হ্যাঁ, স্বামী বিবেকানন্দ শুধু শোনবার মানুষ নন, দেখবারও মানুষ।

আশাতীত ভিড় হতে লাগল। শুধু একটু দাঁড়িয়ে যে শুনবে তারও একতিল স্থান নেই। ব্রুকলিনে গিয়েছেন মেটাফিজিক্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতা দিতে, সেখানেও সেই ঠাসা জনতা। নিউইয়র্কে পিপলস চার্চেও তথৈব। তাছাড়া তাঁর নিজের কক্ষের বেদান্ত-ক্লাস তো আছেই। তাও দিনে দুবার। যারা রবিবারের সাধারণ বক্তৃতা শোনে, তাদের মধ্যে অনেকে আবার প্রাত্যহিক বেদান্ত-ক্লাসের ছাত্র হয়ে যায়।

এত লোকের স্থান সঙ্কুলান হয় কী করে ?

ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে একটা বড় হল আছে. প্রায় দেড় হাজার লোক বসতে পারে। সেটাই ভাড়া নেওয়া হল।

স্বামীজির নাম হল, 'লাইটনিং ওরেটর'—এককথায় বিদ্যুদ্বক্তা।

এইখানেই স্বামীজি 'ভক্তিযোগ' শোনালেন।

ভক্তি কী ? ভগবানে অনপায়িনী প্রীতিই ভক্তি। অবিবেকীর মনে যেমন ইন্দ্রিয়সুখের তৃষ্ণা তেমনি ভগবানে অবিচ্ছিন্না আসক্তি।

জীবনে ঈশ্বরাভিমুখী গতিই ভক্তির নামান্তর।

ভক্তির সাধন হবে কিসে ?

প্রথমত বিবেকসাধন। তার অর্থ খাদ্যাখাদ্যবিচার। বা আরো সংক্ষেপে আহারশুদ্ধি। আহার শুদ্ধ হলে মনও শুদ্ধ। আর শুদ্ধ মনেই ঈশ্বরধ্যান অব্যাহত। অতিরিক্ত বা গুরুপাক ভোজনের পর মনকে সংযত করা কঠিন। তাছাড়া আশ্রয়দোষও পরিহার করা উচিত। অর্থাৎ এমন লোকের সঙ্গে একত্র খাবে না খাদ্যের মধ্য দিয়ে যার অসদ্ভাব তোমাদের মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে। চোরের অন্ন খেয়ে চোর সাধুর অন্ন খেয়ে সাধু হবার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এ মত রামানুজের।

আহারকে শঙ্কর মনে করেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। তাই তাঁর মতে আহারশুদ্ধি অর্থ

রাগদ্বেষমোহ এই ত্রিবিধ দোষ বর্জন করে বিষয়কে গ্রহণ করা। এই আহারশুদ্ধিতেই সত্ত্বশুদ্ধি। আর সত্ত্বশুদ্ধি হলেই চিত্তে ঈশ্বরস্মৃতি বিরাজিত।

স্বামীজি বলছেন, আমাদের দুই মতই নিতে হবে। রামানুজের অনুসরণ করে আহার-পান সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে, আবার শঙ্করের অনুসরণ করে মানসিক খাদ্যের দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। তাহলেই অধ্যাত্ম-সত্তা সুস্থ সবল লাবণ্যময় হয়ে উঠবে।

ভক্তির দ্বিতীয় সাধন বিমোক। বিমোক অর্থ বাসনার দাসত্বমোচন। সর্বপ্রকার বাসনা ত্যাগ করে একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি লালসা। যা কিছু আমার ঈশ্বরলাভের সহায়ক তাই আমার গ্রাহ্য, আর বাকি সব কিছু অসার।

তৃতীয় সাধন অভ্যাস। মনে যেন অবিশ্রাম তৈলধারার মত ঈশ্বরচিন্তা জাগরূক থাকে। যাতে এই জাগ্রত অবস্থায় ব্যাঘাত না ঘটে তারই চর্চা-চেষ্টার নাম অভ্যাস। অনর্থকবাক্য না শুনে ঈশ্বরকথা শোনো, অনর্থকবাক্য না বলে ঈশ্বরবিষয়ে আলাপ করো, অনর্থকচিন্তায় ব্যাপৃত না হয়ে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকো।

ঈশ্বরকে স্মৃতিপথে রাখবার জন্যে এই অভ্যাসের সব চেয়ে বড় সহায়ক—সঙ্গীত। ভগবান নারদকে বলছেন, নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না, না বা যোগীহৃদয়ে। যেখানে আমার ভক্তরা গান করছেন সেখানেই আমার অধিষ্ঠান।

চতুর্থ সাধন ক্রিয়া—পরের হিতসাধন।

শাস্ত্রমতে ক্রিয়া পঞ্চবিধ। পঞ্চবিধ ক্রিয়ার আরেক নাম পঞ্চযজ্ঞ। ব্রহ্মযজ্ঞ, অর্থাৎ স্বাধ্যায়, শুভ ও পবিত্রভাবের কোনো কাজ করা। দেবযজ্ঞ, অর্থাৎ ঈশ্বর বা দেবতা বা সাধুদের পূজা বা উপাসনা। পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের তর্পণ করা। নৃযজ্ঞ অর্থাৎ মানুষসেবা। শেষ, ভূতযজ্ঞ অর্থাৎ পশুসেবা।

পঞ্চম সাধন কল্যাণ বা পবিত্রতা। কোন কোন গুণ কল্যাণ-পদবাচ্য? সত্য, আর্জব বা কাপট্যহীনতা বা সরলতা, দয়া, অহিংসা আর দান। দানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। হাত তৈরি হয়েছে শুধু দেবার জন্যে। যে তার হাত শুধু নিজের দিকে গুটিয়ে রেখেছে সে হীন আর যে তার হাত অন্যের দিকে বাড়িয়ে রেখেছে সেই মহৎ। আর কল্যাণের মধ্যে রয়েছে অনভিধ্যা। পরের দ্রব্যে লোভ পরিত্যাগ ও পরকৃত অপরাধ সম্বন্ধে চিন্তা পরিত্যাগের নামই অনভিধ্যা।

ষষ্ঠ সাধন অনবসাদ। তার মানে চুপ করে বসে না থাকা, হতাশ না হওয়া। কিম্বা অস্ত্যর্থে বলতে পারো, সন্তোষ। নৈরাশ্য কখনোই ধর্মের অঙ্গ নয়। সর্বদাই সন্তুষ্ট থাকলে প্রসন্ন থাকলেই ঈশ্বরসামীপ্য সহজ নয়। যে বিষণ্ণ তার হৃদয়ে প্রেম থাকবে কী করে? যে সব সময়েই অভিযোগ করছে সে কী করে ভালোবাসায় বাঙময় হবে? হায়, আমার কী কষ্ট—এ কখনো ধার্মিকের উক্তি নয়, এ পিশাচের ভাষা। দুঃখ থাকে, দুঃখকে জয় করবার চেষ্টা করো, চিন্তায় বা বিলাপে ডুবে থেকো না। যে দুর্বল সে কী করে পরমসুখ ভগবানকে লাভ করবে? সুতরাং বীর্যার্জন করো।

সঙ্গে সঙ্গে 'অনুদ্ধর্ষ' সাধনও দরকার। উদ্ধর্ষ অর্থে অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদ। এ পরিত্যাগ করবে। অতিরিক্ত আমোদে মাতলে মন চঞ্চল হয়ে থাকে। আর চাঞ্চল্যের প্রতিক্রিয়াই দুঃখ। মনকে শান্ত রাখা প্রসন্ন রাখা নিরন্ত উৎসাহের উৎস করে রাখাই আসল রহস্য।

আর তীব্র ব্যাকুলতাই ভক্তির প্রথম সোপান।

তারপর শোনালেন মানুষের কথা। প্রকৃত মানুষ ও প্রতীয়মান মানুষ।

অভিব্যক্ত হয়ে গেলে জীবে জীবে অনেক প্রভেদ। অভিব্যক্ত জীবরূপে তুমি কখনো খৃষ্ট হতে পারবে না। মাটি দিয়ে একটা হাতি গড়ো, আবার সেই মাটি দিয়েই গড়ো একটা ইঁদুর। তাদের জলে ডোবাও, দুটোই একাকার হয়ে যাবে। মৃত্তিকারূপে তাদের চিরন্তন ঐক্য, নির্মিত বস্তু হিসাবে তাদের চিরন্তন পার্থক্য। ঈশ্বর ও মানুষ—নিত্যই হল উভয়ের উপাদান। নিত্যরূপে, সর্বব্যাপী সত্তারূপে আমরা সকলে এক। বিশেষ জীবরূপে ঈশ্বর চিরন্তন প্রভু আর আমরা চিরন্তন ভৃত্য।

প্রত্যেক মানুষই দিব্য স্বভাব। পুরুষ বা স্ত্রী যতই জঘন্য চরিত্রের হোক না, অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিনাশ নেই। সেই দিব্য ভাবকে আহ্বান করবার জন্যেই সাধনা।

যাঁকে আমরা বহুরূপে দেখছি তিনিই ঈশ্বর। বহুবিধ ইন্দ্রিয়জাত ভাবাবেগ আমরা অনুভব করি বটে কিন্তু মাত্র একটি সত্তাই বিদ্যমান। আজ যে কীট কাল সে ঈশ্বর। স্বাতন্ত্র্য আর কিছুই নয় একই অনন্ত সত্তার অংশমাত্র। আর সে সবের ভেদ প্রকাশের মাত্রায়। শুধু অনন্তেই মুক্তিলাভ।

যে যে ভাবেই উপাসনা করি না কেন, আমাদের সকলেরই এই মুক্তির জন্যে চেষ্টা। মনে হয় আমরা সুখই বুঝি খুঁজে বেড়াচ্ছি আর তার সন্ধানে পাচ্ছি কেবল দুঃখ। আসলে আমরা সুখও খুঁজছি না দুঃখও খুঁজছি না—আমরা খুঁজছি শুধু মুক্তি। মানুষের সকল অতৃপ্ত তৃষ্ণার মূলে রহস্য ঐ এক লক্ষ্যেই নিহিত। তোমরা আমেরিকানরাও আরো সুখ আরো সম্ভোগের সন্ধান করছ কিন্তু বাইরে শত অর্জন-আহরণেও তোমরা তৃপ্ত হবে না কোনোদিন, যেহেতু তোমাদেরও আসল সন্ধানের বিষয় ভিতরে, আর তার নামই মুক্তি। এই বাসনার বিশালতাই মানুষের অনন্তত্বের প্রমাণ। মানুষ অনন্ত বলে তার বাসনা অনন্ত, তাই তার বাসনাপূর্তি অনন্ত হলেই সে পরিতৃপ্ত হবে। কাঞ্চনে নয় সম্ভোগে নয় সৌন্দর্যে নয়, একমাত্র অনন্তেই তার পরিপূর্ণ সন্তোষ। আর এই অনন্ত সে নিজে। এই অচ্ছিদ্র উপলব্ধিতেই তার মুক্তি।

আরো শোনো : এই জড়জগতে আত্মার চেতনাশক্তির—সীমার রাজ্যে অসীমের শক্তির অসংখ্য প্রকাশ ঘটেছে, কিন্তু অনন্ত স্বয়ং বিদ্যমান, শাশ্বত ও অপরিণামী। কালের গতি অনন্তের চক্রের গায়ে কোনো রেখাপাত করতে পারে না। মানববুদ্ধির অগোচর সেই অতীন্দ্রিয় রাজ্যে অতীত বা ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই।

মানবাত্মা অমর—এই বেদের শিক্ষা। দেহ ক্ষয়বৃদ্ধিরূপ নিয়মের অধীন, যার বৃদ্ধি আছে তা অবশ্যই ক্ষয় পাবে। কিন্তু দেহী আত্মা দেহমধ্যে অবস্থিত হলেও অনন্ত ও শাশ্বত জীবনের সঙ্গে যুক্ত। এর আদিও ছিল না অন্তও হবে না। খৃস্টধর্ম বলে, পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহই মানবাত্মার আদি, কিন্তু বৈদিক ধর্ম বলে, মানবাত্মা অনন্ত সত্তার অভিব্যক্তিমাত্র, ঈশ্বরের মতই তার কোনো আদি নেই। সেই শাশ্বত পূর্ণতা লাভ না করা পর্যন্ত আত্মা দেহ থেকে দেহান্তরে অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে বহুরূপে প্রকাশিত হয়েছে ও হবে। অবশেষে পরম পূর্ণতা-প্রাপ্তির পর তার আর অবস্থান্তর ঘটবে না।

৭৬

তারপর এবার শোনো আমার গুরুর কথা, যিনি আমার সকল গতির পরম গতি, আমার প্রভু আমার সাক্ষী আমার নিবাস আমার শরণ আমার সুহৃৎ। আমার আনন্দসিন্ধু।

বক্তৃতার বিষয় : মাই মাস্টার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

ভারতীয় জাতি ধ্বংস হবার নয়। মৃত্যুকে উপহাস করে সে নিজের মহিমায় বিরাজ করছে। আর যতদিন সে ঈশ্বরকে ধরে থাকবে, ধর্মভাব অক্ষুণ্ণ রাখবে, ধর্ম ছেড়ে বিষয়সুখে উন্মত্ত না হবে ততদিন তার মার নেই বিনাশ নেই। হয়তো সে দরিদ্র থাকবে, জীবন কাটবে তার ধুলোয় আর মলিনতায়, কিন্তু ঈশ্বর করুন, সে যেন ঈশ্বরকে না ত্যাগ করে। সে যেন ভুলে না যায় সে ঋষিদের বংশধর। পাশ্চাত্তা দেশে একটা মুটে-মজুর মধ্যযুগের কোনো দস্যু ব্যারনের বংশধররূপে আত্মপরিচয় দিতে ইচ্ছুক। ভারতে তেমনি সিংহাসনারূঢ় সম্রাট পর্যন্ত—অরণ্যবাসী বল্কলপরিহিত ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ অকিঞ্চন ঋষির বংশধররূপে নিজেকে প্রমাণিত করতে সচেষ্ট। আমরা এমনতরো লোকেরই বংশধর বলে পরিচিত হতে চাই, আর যতদিন পবিত্রতার উপর ঈশ্বরপ্রাণতার উপর গভীর শ্রদ্ধা থাকবে ততদিন ভারত মৃত্যুঞ্জয়।

সেই ভারতে, বাঙলাদেশের সুদূর পল্লীগ্রামে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ব্রাহ্মণকুলে একটি বালকের জন্ম হয়। তার বাপ-মা সেকেলে ধরনের নিষ্ঠাবান গৃহস্থ। প্রাচীন মতের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের জীবন ত্যাগ ও তপস্যার জীবন। জীবিকার্জনের জন্যে তাঁর কাছে অল্প পথই উন্মুক্ত, তার উপর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের পক্ষে কোনো প্রকার বিষয়কর্ম নিষিদ্ধ। আবার যার-তার কাছ থেকে দান নেবারও জো নেই। ভেবে দেখ, কী কঠোর জীবন! সুতরাং সামান্য পৌরোহিত্য করা ছাড়া উপায় কী। তোমরা এ ব্যবসাকে নিশ্চয়ই ভালো চোখে দেখ না। কিন্তু তাকিয়ে দেখ জনসাধারণের উপর পুরোহিতদের কী অসীম প্রভুত্ব। এই শক্তির রহস্য কী? তারা তো হীনতম দরিদ্র তবু কেন তাদের উপর লোকের এত শ্রদ্ধা? রহস্য আর কিছুই নয়, রহস্য তাদের ত্যাগ, তাদের পবিত্রতা। তাদের মধ্যে ধনের আকাঙ্ক্ষা নেই বলেই ধনীরাও তাদের বশীভূত।

দরিদ্র হলে কী হয় যদি কোনো দরিদ্র অতিথি তার দ্বারস্থ হয় ব্রাহ্মণগৃহিণী তাকে অভুক্ত চলে যেতে দেবে না। ভারতীয় মাতার এই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য—সকলকে খাইয়ে পরিতৃপ্ত করে তবে নিজে খেতে যাবেন। সেই কারণেই ভারতে জননীকে সাক্ষাৎ ভগবতী বলে। যাঁর কথা বলব বলে দাঁড়িয়েছি তাঁর মা ব্রাহ্মণী, এমনি আদর্শ হিন্দুজননী ছিলেন। আর তাঁর পিতা ছিলেন ন্যায়, সত্য ও পবিত্রতার বিগ্রহ।

এমনি বাবা-মার থেকে আমার গুরুদেবের জন্ম। অল্প বয়সেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয় এবং সংসারে ঘোরতর দারিদ্র্য দেখা দেয়। বালক পাঠশালায় ঢুকেছিল বটে কিন্তু তার উপলব্ধি হল, সমুদয় লৌকিক বিদ্যার উদ্দেশ্য শুধু সাংসারিক উন্নতি। তাতে তার মন আকৃষ্ট হল না। সে ঠিক করল আধ্যাত্মিক জ্ঞানান্বেষণেই জীবন সমর্পণ করতে হবে।

জীবিকার সন্ধানে গুরুদেব কলকাতায় এলেন এবং কলকাতার কাছাকাছি এক মন্দিরে পূজক নিযুক্ত হলেন। তোমরা চার্চ বলতে যা বোঝ আমাদের মন্দির সেরকম নয়। আমাদের মন্দির সাধারণ উপাসনার জায়গা নয়, বিশেষ কোনো ধনী ব্যক্তির পুণ্য সঞ্চয়ের নিজস্ব সম্পত্তি। তেমনি এক মন্দিরে মাইনে-করা পুরোত সাজাটা রামকৃষ্ণের মনঃপূত ছিল না, কিন্তু দেখা যাক এর মধ্য থেকে সারবস্তু কিছু বার করা যায় কিনা।

মন্দিরে আনন্দময়ী মায়ের একটি মূর্তি ছিল। বালক রামকৃষ্ণকে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় মায়ের পূজো করতে হত। পূজো করতে করতে একটা ভাব তাকে পেয়ে বসল, এই মূর্তির মধ্যে কিছু বস্তু আছে কি? এ কি শুধু মৃন্ময়ী, না, এর মধ্যে প্রাণ আছে?

কিংবা, জগতে সত্যি কেউ আনন্দময়ী অধিশ্বরী আছেন ? তিনি যদি আছেন তবে কোথায় ? এই মূর্তিতেই বা নয় কেন ?

না কি সমস্তই স্বপ্নের বুদ্বুদ ? ঈশ্বরের কল্পনাই একটা ধোঁকাবাজি ?

আমাদের দেশের অসংখ্য লোকের মনে প্রত্যক্ষানুভূতির আকাঙ্ক্ষা জেগে থাকে—যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকেন, আমি কি তাঁকে দেখতে পারি না ? কী করলে তাঁকে দেখতে পারি ? তোমরা হয়তো বলবে এ কোনো কাজের কথাই নয়, নিছক পণ্ডশ্রম, কিন্তু হিন্দুর কাছে, ভারতীয়ের কাছে, এটাই একমাত্র কাজের কথা। কত সহস্র হিন্দু এই তপস্যায় গৃহ ত্যাগ করে নিদারুণ ক্লেশ ভোগ করেছে, হাসিমুখে বরণ করেছে মৃত্যুকে, তার ফর্দ-ফিরিস্তি হয় না। মনুষ্যজীবন ঈশ্বরদর্শন ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্যে এই আমাদের ভারতীয় প্রতীতি।

বাপের চেয়েও মা বেশি অন্তরঙ্গ বেশি সন্নিহিত বলে আমরা ঈশ্বরকে মা বলে কল্পনা করি। এই মাকে কী করে দেখবেন, কী করে নাগালের মধ্যে পাবেন এই শুধু রামকৃষ্ণের ধ্যান-জ্ঞান। অতীতে কোনো কোনো মহাপুরুষ মাকে দেখেছেন এই শুনে তাঁর আরো বেশি ব্যাকুলতা। যদি আর কেউ পেয়ে থাকে আমিও পাব।

জীবনতো কয়েকদিনের জন্যে—তা তুমি রাস্তার মুটেই হও বা লক্ষ-লক্ষ লোকের দণ্ডমুণ্ডবিধাতা সম্রাটই হও। একদিন তো এ দেহ যাবেই - তা তুমি পালোয়ানই হও বা চিররুগ্নই হও। জীবন-সমস্যার মীমাংসা কী ? একমাত্র মীমাংসা ধর্মলাভ—ঈশ্বরলাভ। যদি ধর্ম সত্য হয়, ঈশ্বর সত্য হয়, তবেই জীবনরহস্যের ব্যাখ্যা চলে, জীবনভার দুর্বহ হয় না, জীবনটাকে সম্ভোগ করা যায়। নচেৎ জীবনটা একটা বৃথা ভারমাত্র। এই আমাদের ধারণা। কিন্তু, যাই বলি, শত শত যুক্তিদ্বারা ধর্ম ও ঈশ্বরকে প্রমাণ করা যায় না। যদি তা সত্য হয় সেই সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে। আর এই উপলব্ধি একমাত্র সাক্ষাৎকারে।

মা, সত্যিই কি তুমি আছ, না, সমস্তই কবিকল্পনা ? এই একমাত্র চিন্তা রামকৃষ্ণকে আচ্ছন্ন করে ধরল। তাঁর পুজোর আইনকানুনে ভুল হতে লাগল, কিন্তু তাঁর আন্তরিকতায় ভুল নেই। তিনি শুনেছিলেন যারা ব্যাকুলভাবে চায় তারাই পায় ভগবানকে। আমি কি তবে যথেষ্ট ব্যাকুল নই ? আমার কান্না কি কিছু কম ?

তাঁর সে-সব দিনের কথা আমাকে কতবার বলেছেন। কখন সূর্য উঠল কখন অস্ত গেল কিছুই জানতে পারতেন না। দেহভাব একেবারে চলে গিয়েছিল। খাবার কথাও মনে থাকত না। এ সময় তাঁর একজন আত্মীয় তাঁর যত্নশুশ্রূষা করত, সে-ই জোর করে মুখের মধ্যে খাবার গুঁজে দিত, কিছুটা হয়ত গলা দিয়ে নামত, তাতেই যা দেহরক্ষা। তাঁর শুধু দিবারাত্র এক কান্না, মা, তুই যদি সত্যিই আছিস তবে আমাকে জানতে দিচ্ছিস না কেন ? কেন আমাকে অজ্ঞানে, অন্ধকারে ফেলে রেখেছিস ? শাস্ত্র-ফাস্ত্র পড়ে আমার কী হবে ? তুই যদি সত্য হোস তবে সেই সত্যকে আমি দেখতে চাই, ধরতে ছুঁতে চাই।

সন্ধ্যায় মন্দিরে আরতির বাজনা বাজে আর রামকৃষ্ণ আকুল হয়ে কাঁদে, মা, আরো একদিন বৃথা চলে গেল, তুই এলিনে, দেখা দিলিনে। ক্ষণস্থায়ী জীবনের একটা দিন কি কম ? সে একটা দিন আমার শূন্য করে দিলি ?

দেয়ালে মাথা কুটছে রামকৃষ্ণ, মাটিতে পড়ে মুখ ঘষছে। ব্যাকুল হয়ে করাঘাত না

করলে দুয়ার খুলবে কেন ? আমাকে তিনি একটা সুন্দর উপমা দিয়ে বোঝাতেন, সেটা তোমাদের বলছি। ধরো, তিনি বলতেন আমাকে, একটা ঘরে এক থলে মোহর আছে, চোর রয়েছে তার পাশের ঘরে, মাঝে শুধু একটা ক্ষীণ দেয়ালের ব্যবধান। বলো, এ অবস্থায় চোর কি ঘুমুবে ? সে ভাবতে পারবে ঘুমের কথা ? অসম্ভব। সে সর্বক্ষণ চিন্তা করবে কী করে পাশের ঘরে ঢুকে মোহরের থলেটা হস্তগত করবে। হস্তগত করবার আগে তার শান্তি নেই, বিশ্রাম নেই, নেই অন্য চিন্তা।

যদি একবার তোমার ধারণা হয় এই আপাতপ্রতীয়মান দেয়ালের আড়ালে আছে কোনো অমূল্য সত্য, ঈশ্বর যার নাম, শাশ্বত ও অবিনাশী, অনন্ত আনন্দস্বরূপ, যে আনন্দের তুলনায় ইন্দ্রিয়সুখ বাজে ছেলেখেলা, তখন, বলো, তখন কি তাঁকে লাভ করবার জন্যে তোমার সমস্ত চেষ্টা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবেনা ? জেনে শুনেও তুমি পারবে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে ? না, কখনো না, অহোরাত্র চেষ্টা করবে ঐ দেয়ালে গর্ত করতে, শেষে দেয়ালকেই উড়িয়ে দিতে।

রামকৃষ্ণের মধ্যে উন্মত্ততা, ভগবৎ-উন্মত্ততা প্রবেশ করল। তাঁর কেউ গুরু ছিল না, পথপ্রদর্শক ছিল না। একমাত্র ব্যাকুলতাই তাঁর গুরু, ব্যাকুলতাই তাঁর পথপ্রদর্শক। সবাই ভাবলে তাঁর মাথা খারাপ হয়েছে। সাধারণ লোক এর বেশি আর কী ভাববে ? অথচ সংসারের অসার বিষয় যে ত্যাগ করেছে সেই উন্মাদই মহামানুষ। ওরকম পাগলামির থেকেই অতীতে জগৎ-টলানো শক্তির আবির্ভাব হয়েছে, আবারও হবে ভবিষ্যতে। এ শক্তিই আশ্চর্যের আশ্চর্য।

দিনের পর দিন মাসের পর মাস চলল এই সত্যসন্ধানের তপস্যা। ক্রমে ক্রমে রামকৃষ্ণ নানারূপে অলৌকিক দৃশ্য দেখতে লাগলেন, তার স্বরূপের রহস্য আর প্রচ্ছন্ন থাকতে চাইল না। আবরণের পর আবরণ অপসৃত হতে লাগল। জগন্মাতাই নিজে গুরু হয়ে দেখা দিলেন।

পরমাসুন্দরী এক বিদুষী এসে উপস্থিত হলেন। যেন দেবী সরস্বতীই মানবাকার ধারণ করেছেন। অজ্ঞানবাসী সাধারণ হিন্দুনারীদের মধ্যে এমন উচ্চ আধ্যাত্মিক বিদ্যা ও শক্তির পরাকাষ্ঠারূপিণী রমণীর অভ্যুদয়ও ভারতবর্ষেই সম্ভব। ভারতে কত স্ত্রীলোক বিষয়-সম্পদ পরিহার করে বিবাহিত সংসারে প্রবেশ না করে ঈশ্বরের উপাসনায় জীবন কাটায়। এ নবাগতা মহিলা সন্ন্যাসিনী, মোহমুক্তা। এসে শুনলেন মন্দিরে একটি বালক দিনরাত্রি ঈশ্বরের জন্যে কাঁদছে আর সকলে তাকে পাগল বলছে। রামকৃষ্ণকে দেখলেন সন্ন্যাসিনী ও চোখের প্রথম পলকেই বুঝলেন তাঁর এ কী অবস্থা ! বললেন, 'বৎস, তোমার মত যে উন্মত্ত হতে পেরেছে সেই ধন্য। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তো পাগল, কেউ ধনের জন্যে, কেউ নামের জন্যে, কেউ নিছক সুখের জন্যে আর তুমি পাগল ঈশ্বরের জন্যে। বলতে গেলে তুমিই একমাত্র সুস্থ, একমাত্র স্থির।'

এই মহিলা অনেক দিন সেখানে থাকলেন ও রামকৃষ্ণকে ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মের সাধনপ্রণালী শেখালেন। শেখালেন নানাপ্রকার যোগসাধন। তাঁর বেগবতী ধর্মনদীর গতিকে নিয়মিত ও প্রণালীবদ্ধ করলেন।

তারপরে এলেন এক মায়াবাদী সন্ন্যাসী, দর্শনশাস্ত্রে উচ্চচূড়। জগতের বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই, জগৎ ব্রহ্মের ছায়া মাত্র, এই মতই মায়াবাদ। এই মায়াবাদ বোঝাবার জন্যে সন্ন্যাসী গৃহে বাস করতেন না, ঝড়বর্ষায় বা রোদে সর্বক্ষণই বাইরে থাকতেন।

রামকৃষ্ণকে তিনি বেদান্তসাধনে দীক্ষিত করলেন আর দেখলেন, দেখে অবাক হয়ে গেলেন, শিষ্য গুরুর চেয়েও অগ্রসর। লক্ষ গুরু হয়তো মিলবে কিন্তু এমন এক শিষ্য পাওয়াই কঠিন।

রামকৃষ্ণের হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে, সন্ন্যাসী চলে গেল। কেউ জানেনা সে দেহ রেখেছে কিনা, না কি তখনো বেঁচে আছে। তিনি আর ফেরেন নি। কেউ আর দেখেনি তাঁকে।

রামকৃষ্ণের আত্মীয়েরা মানল না, তাঁরা তাঁকে দেশে নিয়ে একটি অল্পবয়স্কা বালিকার সংগে বিয়ে দিয়ে দিল। ভাবল এতেই রামকৃষ্ণের মন ফিরবে, মাথার গোলমাল ভালো হবে। কিন্তু এ কী রকম বিয়ে? বিয়ের পর স্বামী তো স্ত্রীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। কিন্তু রামকৃষ্ণ যে বিয়ে করেছে, তার যে স্ত্রী আছে, এ-ই যেন সে ভুলে গেল। একা ফিরে এল মন্দিরে। মাকে নিয়ে ঈশ্বরকে নিয়ে সে আরো মেতে উঠল।

দূর পল্লীতে বালিকাবধূর কানে খবর পেঁছুল যাকে সে বিয়ে করেছে সে বদ্ধ উন্মাদ, ধর্মোন্মাদ। ব্যাপারটা কী, নিজে জানবার জন্যে সে একদিন বেরিয়ে পড়ল। দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে চলে এল স্বামীর কাছে। ভারতে নরনারী ধর্মজীবন অবলম্বন করলে, যদি তারা বিবাহিত হয়, স্বামী-স্ত্রীর সংশ্রব বা কোনো বাধ্যবাধকতা রাখেনা। কিন্তু রামকৃষ্ণ ধর্মজীবন অবলম্বন করলেও তাঁর স্ত্রীকে ত্যাগ করলেন না। ত্যাগ তো করলেনই না, একটা বিস্ময়কর কাণ্ড করে বসলেন পূজারীর মত স্ত্রীর পদতলে পড়লেন, বললেন, যিনি মন্দিরে মহামায়া, তিনিই আমার কক্ষে সহধর্মিণী। সর্বত্রই আমার আনন্দময়ীর অধিষ্ঠান।

এই মহিলা শুদ্ধস্বভাবা ও উচ্চাশয়া। তিনি বুঝলেন স্বামীকে, কী তাঁর সাধনা এবং সেই সাধনপথে তিনি তাঁর সমর্থা সহায়িকা হলেন। বললেন, আমি তোমাকে সংসারী করতে চাই না, তোমার সাধন-ভজনের সংগিনী হতে চাই। তিনি শিষ্যা হয়ে স্বামীকে ঈশ্বর-জ্ঞানে সেবা-পূজা করতে লাগলেন।

এ হলে আর কথা কী, স্ত্রীর অনুমতি মিলে গেছে, রামকৃষ্ণ তাঁর সাধনায় বন্ধনমুক্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু সব চেয়ে বড় বন্ধন অভিমান। কী করে এই অভিমানকে নির্মূল করবেন তাই তাঁর এখন লক্ষ্য হয়ে উঠল। আমাদের দেশে যে জাতিভেদ প্রথা আছে তাতে ব্রাহ্মণ সর্বোচ্চ আর চণ্ডাল সর্বনিম্ন। আমার গুরুদেব ব্রাহ্মণ, যাতে সেই কারণে তাঁর মধ্যে অভিমান না থাকে, তিনি চণ্ডালের কাজ করতে লাগলেন। চণ্ডালের কাজ রাস্তা সাফ করা, ময়লা মুক্ত করা। যাতে লেশমাত্র ঘৃণাবুদ্ধি না থাকে এই উদ্দেশে তিনি গভীর রাত্রে উঠে তাদের ঝাড়ুবালতি নিয়ে তিনি মন্দিরের নর্দমা ও পায়খানা নিজের হাতে পরিষ্কার করতেন। শুধু তাই নয়, নিজের মাথার লম্বা চুল দিয়ে নোংরা জায়গাটা মুছে দিতেন। হীনতা স্বীকার করেই তিনি চাইতেন অভেদত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে।

মন্দিরে প্রত্যহ অনেক ভিক্ষুককে প্রসাদ দেওয়া হত, তাদের মধ্যে অনেক মুসলমান থাকত, থাকত পতিত ও দুশ্চরিত্র। তাদের খাওয়া হয়ে গেলে রামকৃষ্ণ তাদের পাতা কুড়োতেন, ভুক্তাবশিষ্ট জড়ো করতেন আর তার থেকে খেতেন তুলে-তুলে। শুধু তাই নয়, যেখানে এমনি ছত্রিশজাত বসে খেয়েছে সে জায়গা পরিষ্কার করতেন। এটা যে কী দারুণ অসাধারণ ব্যাপার, কী উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে তাঁর এই আচরণ, তা তোমরা হয়তো

বুঝতে পারবে না। ভারতে এ দৃষ্টান্ত অভূতপূর্ব। উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করা ভারতে নীচ অস্পৃশ্য জাতিরই কাজ। তারা যখন কোনো শহরে আসে নিজের পরিচয় দিয়ে লোকেদের সাবধান করে দেয়, দূরে যাও, আমাদের স্পর্শদোষ থেকে মুক্ত থাকো। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে, স্মৃতিতে লেখা আছে যদি কোনো ব্রাহ্মণ দৈবাৎ এমনি নীচ ও অস্পৃশ্য কারুর মুখ দেখে ফেলে তবে তাকে সারাদিন উপবাসী থেকে এক হাজার গায়ত্রী জপ করতে হবে। এসব শাস্ত্রীয় নিষেধ থাকা সত্ত্বেও এই ব্রাহ্মণোত্তম নীচ জাতির সঙ্গে নিজের সমত্ব স্থাপনের তপস্যা করতেন এ ভারতের ইতিহাসে অভিনব। তাঁর এই বিনম্র ভাব ছিল যে আমি সমগ্র মানবসমাজের সেবকস্বরূপ হয়েছি। এর আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে হলে আমাকে তোমার বাড়ির ঝাড়ুদার হতে হবে।

এ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ নিজের ধর্ম ছাড়া আর কিছুই জানেন না। অন্যান্য ধর্মপ্রণালীতে কী সত্য আছে তা জানবার জন্যে তাঁর প্রবল পিপাসা হল। তিনি একজন মুসলমান সাধু পেয়ে তার উপদেশমত মুসলমানী সাধন সুরু করলেন। পোশাকে ব্যবহারে পুরোদস্তুর মুসলমান হয়ে গেলেন। পরে আবার যীশুখৃস্টের সাধনপ্রণালী অনুসরণ করলেন। দেখলেন সব সাধনই একই গন্তব্যে এনে পৌঁছিয়ে দেয়। সকলেরই লক্ষ্য এক, পথ আলাদা। এক পুকুর, ঘাট আলাদা। একই জল, নাম নানারকম।

৭৭

স্বামীজি আরো বলছেন :

রামকৃষ্ণের দৃঢ় ধারণা হল, সিদ্ধিলাভ করতে হলে লিঙ্গজ্ঞান একেবারে বিসর্জন দেওয়া দরকার। কারণ আত্মার কোনো লিঙ্গ নেই, আত্মা পুরুষও নয়, স্ত্রীও নয়। লিঙ্গভেদ শুধু দেহে। যে আত্মাকে লাভ করতে চায় তার লিঙ্গভেদের চেতনা থাকলে চলবে না। রামকৃষ্ণ নিজে পুরুষদেহধারী ছিলেন, এখন তিনি সর্ববিষয়ে স্ত্রীভাব আনতে চাইলেন। তিনি ভাবতে সুরু করলেন তিনি নারী, নারীর মতই তাঁর বেশবাস, নারীর মতই তাঁর কথা বলার ধরন। মেয়েদের অন্তঃপুরে মেয়েদের মধ্যে তিনি বাস করতে লাগলেন। অনেকদিন ধরে তাঁর এই সাধন চলল, তাঁর লিঙ্গজ্ঞান ঘুচে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ঘুচে গেল কামবীজ।

তোমাদের নারীপূজা, যার এত প্রশস্তি, নারীর সৌন্দর্যের ও যৌবনের পূজো। রামকৃষ্ণের কাছে নারীমাত্রই আনন্দময়ী মা, তাই তাঁর নারীপূজো মাতৃপূজো। সমাজে যে সব মেয়ে পতিতা, অস্পৃশ্যা, আমি নিজের চোখে দেখেছি, তিনি তাদের সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন, কাঁদতে-কাঁদতে পড়ছেন পায়ের নিচে আর বলছেন, মা, একরূপে তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছ, আরেক রূপে তুমি জগৎ ব্যাপ্ত করে রয়েছ, তোমাকে প্রণাম করি—প্রণাম করি তোমাকে।

ভেবে দেখ এ জীবন কী মহিমময় যে জীবন থেকে সমস্ত পশুভাব চলে গেছে, যিনি রমণীর মুখের দিকে ভক্তিভাবে তাকাচ্ছেন আর প্রতি মুখে দেখছেন আনন্দময়ী জগদ্ধাত্রীকে। তোমরা কি বলতে চাও নারীর মধ্যে ঈশ্বরত্ব নেই ? যদি থাকে তাকে কি রাখা যাবে বন্দী করে ? কখনো না। তা আত্মপ্রকাশ করবেই করবে। পবিত্রতার মত দুর্দমনীয় শক্তি আর কার ?

রামকৃষ্ণের জীবনে এই কঠোর নির্মল পবিত্রতার আবির্ভাব হল। তাঁর দীর্ঘ সাধনায় যে ধর্ম-ধন সঞ্চয় করেছিলেন, এই পবিত্রতার অধিকারে তিনি তা জনসমাজে বিতরণ করতে সচেষ্ট হলেন। তাঁর কাছে লোকজন আসতে সুরু করল, তাঁকে ঘিরে বসল ভিড় করে, আর তিনি তাদের নানা কথায় উপদেশ দিতে লাগলেন। আমাদের দেশে গুরুর উত্তুংগ সম্মান, বাপ-মায়ের চেয়েও বেশি। বাপ-মা থেকে আমরা দেহ পেয়েছি কিন্তু গুরু আমাদের মুক্তির পথ দেখান। আমরা গুরুর সন্তান, মানসপুত্র। কিন্তু গুরুশ্রেষ্ঠ হয়েও রামকৃষ্ণ জানতেন না যে তিনি গুরু। লোকে তাকে সম্মান করল কি না করল তাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি জানতেন তাঁর মা-ই তাঁকে করাচ্ছেন, বলাচ্ছেন। 'যদি আমার মুখ দিয়ে কোনো ভালো কথা বেরোয় সে আমার মায়েরই কথা, আমার কথা নয়। সে-কথায় শুধু আমার মায়ের গৌরব, আমার কিছু নেই।'

তাঁর উপদেশের মূলমন্ত্র কী ছিল? আগে চরিত্র গঠন করে আধ্যাত্মিক ভাব উপার্জন করো, ফল নিজের থেকেই আসবে। যখন পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় তখন তার মধু খুঁজতে ভ্রমর নিজের থেকেই উড়ে আসে। কী মহৎ শিক্ষা! আমার গুরুদেব আমাকে এ কথা শত-শতবার শিখিয়েছেন তবু প্রায়ই আমি তা ভুলে যাই। চিন্তার কী অদ্ভুত শক্তি! যদি কেউ গুহায় দ্বার রুদ্ধ করে বসে যথার্থ একটি মহৎ চিন্তা করেও মরতে পারে, সেই চিন্তা একদিন গুহার প্রাচীর ভেদ করে হাওয়ায় ঘুরে বেড়াবে আর কালক্রমে মানুষের হৃদয়ে তা সংক্রামিত হবে। তাই তোমাদের যা ভাব তা অপরকে দিতে ব্যস্ত হয়ো না, জোর করেও চাপাতে পারবে না কিছু। প্রথমে দেবার মত কিছু সঞ্চয় করো। যার দেবার কিছু আছে সেই ঠিক-ঠিক শিক্ষা দিতে পারে। শিক্ষাদান অর্থ তো কটা বচন ঝাড়া নয়, শিক্ষাদান অর্থ ভাবসঞ্চার। আমার গুরুদেবের কথা, আগে সত্য কী জানো পরে অন্যকে জানাও। আগে নিজের চরিত্র গঠন করো পরে শিক্ষা-দান করতে বসো।

বছরের পর বছর আমি এই লোকটির সংগে থেকেছি কিন্তু তাঁর মুখে কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায়ের নিন্দাবাক্য উচ্চারিত হতে শুনিনি। সব সম্প্রদায়ের প্রতিই তাঁর সমান সহানুভূতি। সকলের মধ্যেই তিনি সামঞ্জস্য দেখেছেন, জ্ঞান কর্ম ভক্তি যোগ, সব তাঁর মধ্যে একত্রিত হতে পেরেছে। ভবিষ্যৎ মানুষের মধ্যেও পারবে এই তাঁর বিশ্বাস। তাঁর দৃষ্টি নির্মল, কুসংস্কারের একটুকু কুয়াশাও তাতে ছিল না। যিনি সকলের ভালো দেখেন তাঁর দৃষ্টি কত উদার চিত্ত কত মহৎ তোমরা বুঝে নাও।

আর তাঁর কথা কি জোরালো, কত প্রাণভরা। সরল গ্রাম্য ভাষায় তিনি উপদেশ দিতেন, তাদের মধ্যে এত তেজ এত দীপ্তি থাকত যে পলকে সকলের অন্তরের অন্ধকার দূর করে দিত। কথায় কিছু নেই, ভাষায় কিছু নেই, আসল হচ্ছে বক্তার ব্যক্তিত্ব। যে লোক কথা বলছে তার সত্তা যদি তাতে জড়িয়ে থাকে তবেই সে কথায় জোর হয়। নইলে আমরা সচরাচর যে সব বক্তৃতা শুনি তা যতই চমকপ্রদ হোক না যতই তাতে যুক্তি বা পাণ্ডিত্য থাক না, বাড়ি ফিরেই তা আর আমাদের মনে থাকে না। কিন্তু আমার গুরুদেবের সরল গ্রাম্য কথা শুনলেই প্রাণে বসে যায়, জীবনে অংগীভূত হয়ে ওঠে। যিনি তাঁর কথায় নিজের জীবন নিজের সত্তা মিশিয়ে দিতে পারেন তাঁর কথাই ফল ধরে।

ভারতের রাজধানী, দেশের শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র, কলকাতার কাছে তিনি বাস করতেন। এই কলকাতায়ই তখন শত শত সন্দেহবাদী ও জড়বাদীর সৃষ্টি হচ্ছিল। সে

সব নাস্তিক সংশয়বাদী উচ্চশিক্ষিত উপাধিধারীর দল আসতে লাগল তাঁর কাছে, শুনতে লাগল তাঁর কথা—হাজার বছরের অন্ধকার ঘর একটি মাত্র দেশলাইয়ের কাঠিতেই আলো হয়ে যেতে লাগল।

আমারও তখন নাস্তিক্যের অবস্থা। সত্যের খোঁজে বিভিন্ন ধর্মসভায় যেতাম আর বক্তৃতা শেষ হলে বক্তাকে জিগগেস করতাম এত যে আপনি সুন্দর-সুন্দর কথা বললেন তা কি আপনি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দ্বারা জেনেছেন না তা আপনার বিশ্বাসমাত্র ? আমার বিশ্বাস—এই বলে বক্তা পাশ কাটাত। আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন—কতজনকে প্রশ্ন করে ফিরেছি, কিন্তু কেউই সদুত্তর দিতে পারেনি। মনে হয়েছে সর্বত্রই একটা প্রবঞ্চনা চলেছে। বাগবিভূতি বা শাস্ত্রব্যাখ্যার কৌশল শুধু পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যভোগের জন্যে, তা দিয়ে কখনো মুক্তিলাভ হয় না।

আমার ভাগ্যের আকাশে আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ্কের উদয় হল। লোকের মুখের কথা শুনে তাঁর কাছে গিয়ে একদিন হাজির হলাম। সাদাসিধে নিরীহ মানুষ, এর মধ্যে অসাধারণত্ব কী থাকতে পারে ? যে প্রশ্ন ধর্মাচার্যদের কাছে চিরকাল করে এসেছি সেই প্রশ্নই আবার উচ্চারণ করলাম। আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন ? দেখেছি বৈ কি, উত্তর করলেন রামকৃষ্ণ, যেমন তোমাকে আমার সামনে দেখছি, তেমনি করে দেখেছি, আরো স্পষ্ট আরো উজ্জ্বল।

আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এই প্রথম আমি দেখলাম যিনি সাহস করে বলতে পারলেন, হ্যাঁ, আমি ঈশ্বরকে দেখেছি। ঈশ্বরকে দেখা যায়, ধর্ম যে সত্য তা প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়—এতে আর সন্দেহ রইল না। দিনের পর দিন এই লোকটির কাছে আমি আসা-যাওয়া করতে লাগলাম—সব কথা অবশ্য আমি এখন বলতে পারব না—তবে এটুকু বলতে পারি, ধর্ম একজন আরেকজনকে দিয়ে দিতে পারে, একটি দৃষ্টিতে একটি স্পর্শে একটা সমগ্র জীবন আমূল বদলে দেওয়া যায়।

তাই অন্যকে সুস্থ করবার আগে নিজে সুস্থ হও। আগে ধার্মিক হও পরে জগতের সামনে গিয়ে দাঁড়াও, ধর্ম বিতরণ করো। ধর্ম বাগাড়ম্বর নয়, মতবাদ নয়, সাম্প্রদায়িকতা নয়, আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্বন্ধ নিয়েই ধর্ম। সমিতি বা সঙ্ঘ করে ধর্মের প্রচার হয় না, ধর্মের ব্যবসাদারি হয়। শুধু ইউরোপেই সঙ্ঘের সাহায্যে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু তাতে আধ্যাত্মিক ভাবের প্লাবন আসেনি। শুধু ভোটের সংখ্যাধিক্য দিয়ে ধার্মিকের গণনা চলে না। চার্চ-নির্মাণে বা সমবেত উপাসনায়ও ধর্ম নেই, না বা গ্রন্থে বা বাচনে, না বা সঙ্ঘে বা প্রচারে। ধর্ম অর্থই হচ্ছে প্রত্যক্ষানুভূতি। যতক্ষণ নিজে না জানছি বা বুঝছি ততক্ষণ তৃপ্তি নেই। শুধু প্রত্যক্ষানুভূতিতেই সন্তোষ। আর এই সন্তোষের প্রথম সোপান—ত্যাগ। যতদূর পারো ত্যাগ করো। অন্ধকার আর আলো, বিষয়ানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ একসঙ্গে বাস করতে পারে না। ঈশ্বর আর শয়তানকে একসঙ্গে সেবা করবে কী করে ?

আমার গুরুদেব উপলব্ধি করেছিলেন একই সনাতন ধর্ম অনন্তকাল ধরে আছে, অনন্তকাল ধরে থাকবে, শুধু বিভিন্ন দেশে তার বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। গন্তব্য এক, পথ বিচিত্র। যদি গন্তব্য এক হয় পথে পথে বিরোধ থাকতে পারে না। তাই জগতের ধর্ম-সমূহ পরস্পর-বিরোধী নয়। সুতরাং সব ধর্মকে সম্মান করো, গ্রহণ করো তার সার-সত্তকে। বহুর মধ্যেই এক বর্তমান, সমস্ত আপাতদৃশ্যভেদের পশ্চাতে অনন্ত

অপরিণামী নিরপেক্ষ একত্ব সমাসীন। ব্যক্তি সম্বন্ধেও তাই—ব্যক্তি বা ব্যষ্টি ক্ষুদ্রাকারে সমষ্টিরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। তাই মূলেত কোথাও ভেদ নেই বিচ্ছেদ নেই, মানুষ হিসাবে সর্বত্র সমধর্মিতা। বলো এই উদারতম ভাবই কি আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় নয়?

তা হলে কী করে একজন বলে, আমার ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ যেহেতু তা সর্বপ্রাচীন, বা আমার ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ যেহেতু তা সর্বাধুনিক? আমরা স্বীকার করি প্রত্যেক ধর্মই সমান শক্তিমান, প্রত্যেক ধর্মই আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি এনে দিতে পারে। এদিকে নিজেদের তোমরা ঈশ্বর-বিশ্বাসী বলো আবার ওদিকে ভাবো তোমাদের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যেই ঈশ্বরের সমস্ত সত্য নিহিত, তোমরা অবশিষ্ট মানুষের রক্ষক! অবশিষ্ট মানুষ যেন ভেসে এসেছে, তারা যেন ঈশ্বরের কেউ নয়। শোনো কারু বিশ্বাস নষ্ট করবার চেষ্টা কোরো না। বরং যদি পারো তাকে ঠেলে উপরে তুলে দাও, যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে তার সেই ভিত্তিটুকু কেড়ে নিও না। আমার গুরুদেব কারু ভাব নষ্ট করেননি, তার ভাবের মধ্যেই পরম সত্যকে এনে ধরেছেন। প্রত্যেক ভাবেই রয়েছেন সেই অভাবনীয়।

এই দেহেই সিদ্ধাবস্থা লাভ হতে পারে, আমার গুরুদেবের এ আরেক আশ্চর্য শিক্ষা। তিনি ত্যাগের বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন। আমাদের দেশে যারা সন্ন্যাসী হয় তাদেরকে সমস্ত ধন ঐশ্বর্য মান সম্ভ্রম ত্যাগ করতে হয় আর আমার গুরুদেব ত্যাগের বাদশা, ত্যাগের রাজাধিরাজ ছিলেন। তিনি কাঞ্চন দূরের কথা কোনো ধাতুদ্রব্যই স্পর্শ করতে পারতেন না। নিদ্রিত অবস্থায় তাঁর দেহে কোনো ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করালে তাঁর মাংসপেশীও সঙ্কুচিত হয়ে যেত। উদার হৃদয়ে সকলকে তিনি আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত কিন্তু কেউ টাকা দিতে চাইলে তার থেকে তিনি দূরে সরে থাকতেন। কামকাঞ্চনজয়ের তিনি জীবন্ত উদাহরণ। আজকাল চারদিকে মানুষ শুধু তার 'প্রয়োজনীয় দ্রব্য' বাড়িয়েই চলেছে, তারা দেখুক ধনরত্ন মান যশের তন্তুমাত্র স্পৃহা না রেখে একটা লোক কী অমিত আনন্দে বাস করতে পারে।

জীবনে এতটুকুও বিশ্রাম ছিল না। প্রথমাংশ কেটেছে ধর্ম উপার্জনে শেষাংশ ধর্মবিতরণে। দিনে-রাত্রে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় কুড়ি ঘণ্টা তিনি সমবেত ভক্তদের উপদেশ দিতেন—মাসের পর মাস, অবিচ্ছিন্ন। অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ল, গলায় ঘা হল, তবু কথা বিরাম মানল না। অনেক বুঝিয়েও তাঁর কথা বন্ধ করা গেল না, অন্ধ মানুষকে পথ দেখাবেন, আর্ত মানুষকে আশ্বাস দেবেন, কে তাঁকে আটকাবে? আমরা যারা তাঁর কাছে থাকতাম, চেষ্টা করতাম লোক যাতে কম আসে, এলেও তাঁর সঙ্গে যেন কথা বলতে না চায়। তবু লোক আসত আর কী করে টের পেতেন আমরা তাদের পথরোধ করেছি। তিনি বলতেন, ওরে, ওদের আসতে দে। আমরা আপত্তি করতাম, এতে আপনার কষ্ট হবে না? তিনি হেসে উত্তর দিতেন: 'দেহের কষ্ট? আমার কত দেহ হল কত দেহ গেল, তার কথা কে ভাবে! যদি এ দেহ পরের সেবায় যায় তো এ দেহ ধন্য হল! একটা দেহ কেন, পরের যথার্থ মঙ্গলের জন্যে আমি হাজার হাজার দেহ দিয়ে দিতে রাজি আছি।'

কেউ তাঁকে বলেছিল, আপনি তো মস্ত যোগী, নিজের দেহের উপর মন রেখে অসুখটা সারিয়ে ফেলুন না। তিনি উত্তর করলেন: ভেবেছিলাম তুমি জ্ঞানী, কিন্তু এখন দেখছি তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি সাধারণ স্তরের। যে মন ভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করেছি, তুমি বলছ, তা আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসে এই দেহটার উপর রাখব?

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন—বলতেন, যতদিন আমার কথা বলার শক্তি আছে ততদিন শিক্ষা দিয়ে যাব। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর ক'জন যুবক শিষ্য তাঁর উপদেশ প্রচারের কাজে লাগল। তারা সবাই সন্ন্যাসী, সংসারত্যাগী—সহায়-সম্বলহীন। তাদের দাবিয়ে রাখবার জন্যে অনেক রকম চেষ্টা হত কিন্তু তাদের সামনে যে মহৎ জীবনাদর্শ ছিল তারই শক্তিতে তারা নির্বিচল থাকল। দীর্ঘকাল ধরে মহা-জীবনের সংস্পর্শে যে উৎসাহের আগুন জ্বলেছিল তা কিছুতেই নিষ্প্রভ হবার নয়। যদিও শিষ্যেরা সবাই শহরের লোক, সদ্বংশজাত, তারা রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করতে লাগল। প্রচার করতে লাগল রামকৃষ্ণকথা।

বাঙলাদেশের সুদূর পল্লীগ্রামের এক অশিক্ষিত বালক শুধু নিজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অন্তঃশক্তির বলে পরম সত্য উপলব্ধি করে অন্যকে দান করে গেল—আর সেকথা বলবার জন্যে রেখে গেল ক'জন যুবক শিষ্যকে।

আজ ভারতবর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে কে না চেনে! শুধু ভারতে কেন, তাঁর শক্তি ভারতের বাইরেও বিস্তৃত হচ্ছে।

যদি জগতের সত্য সম্বন্ধে আমি একটি কথাও বলে থাকি তা সমস্ত আমার গুরু-দেবের—আর যেখানে যা কিছু ভুল হয়েছে তা সমস্ত আমার।

আধুনিক জগতের সামনে কী তাঁর ঘোষণা? মতামত চার্চ বা মন্দিরের অপেক্ষা কোরো না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে সারবস্তু আছে তার তুলনায় ও সব তুচ্ছ। মানুষের মধ্যে এ ভাব যত বাড়বে ততই সে জগতের কল্যাণ করবার শক্তি অর্জন করবে। জীবন দিয়ে দেখাও ধর্ম অর্থ শুধু শব্দ বা নাম বা সম্প্রদায় নয়, ধর্ম অর্থ আধ্যাত্মিক সাক্ষাৎকার।

৭৮

নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড-এর রিপোর্টার লিখছে:

স্বামীজির বেদান্ত ক্লাসে গিয়ে দেখলাম সুসজ্জিত ভদ্রলোকেরা বসে আছে। ডাক্তার, উকিল, চাকুরে, সব বুদ্ধিজীবীর দল, আর কয়েকজন অভিজাত মহিলা। মাঝখানে, পরনে গেরুয়া, বিবেকানন্দ বসে আছেন; তাঁর শ্রোতা বা ছাত্রছাত্রীর দল, তাঁর দুদিকে ভাগ করা। পঞ্চাশ থেকে একশো জন হবে। বলবার বিষয় কর্মযোগ।

বক্তৃতা বা উপদেশের শেষে স্বামীজি উঠলেন সবার সঙ্গে পরিচিত হতে। তাঁর ব্যক্তিত্বের কী দুর্নিবার আকর্ষণ! সকলে ব্যস্ত হয়ে উঠল করমর্দনের জন্যে, কে কাকে ঠেলে এগিয়ে আসবে। সবাই চাইছিল স্বামীজি তাঁর নিজের পূর্বাশ্রমের কথা কিছু বলেন। কিন্তু সে অধ্যায় সম্পর্কে স্বামীজি নিঃশব্দ।

'আপনি কি হিন্দুসন্ন্যাসীদের পক্ষ থেকে এসেছেন?'

'না, আমি নিজে-নিজেই চলে এসেছি, কোনো দল বা সঙ্ঘ আমাকে পাঠায়নি।'

'আপনি যে সমুদ্র পার হয়ে এসেছেন, আপনার জাত যাবে না?'

'আমি সন্ন্যাসী, আমার আবার জাত কী!'

আর হেলেন হান্টিংটন কী লিখছে?

'ভগবানের কী কৃপা, ভারতবর্ষ থেকে এমন একজন অধ্যাত্মনেতা পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে। কী তাঁর অনন্যসাধারণ শক্তি, অনন্যসাধারণ পবিত্রতা। মর্তের মানুষ কত উচ্চতম অধ্যাত্মভূমিতে বাস করতে পারে তারই উজ্জ্বলন্ত প্রমাণ হয়ে তিনি বিরাজ করছেন, বিচরণ করছেন। এমন কল্যাণগুণাকর দেখিনি কোথাও। ত্যাগ আর প্রেম আর করুণা—মানুষের বুদ্ধি আর হৃদয় এর চেয়ে বৃহত্তর আর কী সৃষ্টি করতে পারে? আর স্বামীজি এই ত্যাগ, প্রেম আর করুণারই পরমপ্রতিভূ। তাঁর ধর্ম বিশ্বমানবতার ধর্ম, যে মানুষ ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হয়ে ঈশ্বরের দিকেই ধাবিত হচ্ছে—তাতে কোনো গণ্ডী নেই, আচার অনুষ্ঠান নেই, শুধু ঈশ্বরপ্রেম আর ঈশ্বরপ্রেমই মানবপ্রেমের নামান্তর। আর সেই প্রেমের নিশ্চয় ভিত্তি পবিত্রতা, নিবূঢ় পবিত্রতা।

কোনো প্রশংসা তাঁকে লুব্ধ করে না, কোনো নিন্দা তাঁকে ক্ষুব্ধ করে না। অর্থে তাঁর স্পৃহা নেই, মানেও সমান ঔদাসীন্য। মানুষ এত ঋজু ও দীপ্ত হতে পারে, এত মহিমময় শান্ত ও নির্দ্বন্দ্ব—তাকে চোখে না দেখলে, কানে না শুনলে, বিশ্বাস করতে পারতাম না। এই বুঝি সেই লোক যাকে অভিবাদন করতে পেলে রাজাধিরাজও ধন্য হয়ে যায়।'

স্বামী কৃপানন্দকে মনে আছে? সেই যে রুশ ইহুদী, লিয়ন ল্যান্ডসবার্গ, সাংবাদিক, পরে স্বামীজির দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্য—সে লিখছে:

'বেদান্তদর্শনের ছাত্রসংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে, আর কী আশ্চর্য, যাদের কোনো কালে কোনো সংস্কৃতের জ্ঞান নেই তাদের মুখে-মুখে আত্মা, পুরুষ, প্রকৃতি, মোক্ষ—এই সব কথা অনায়াসে ফিরছে। হাক্সলি আর স্পেন্সারের মতই পরিচিত সুরে রামানুজ আর শংকরাচার্যের নাম করছে। ভারতবর্ষকে জানবার জন্যে সকলে এখন নিদারুণ উৎসুক। লাইব্রেরিতে গিয়ে জিগগেস করছে, ভারতবর্ষের দর্শন সম্পর্কে কার কী বই আছে দেখান। ম্যাকসমুলারেরই বেশি চাহিদা। কোলব্রুক বা ডয়সনই বা কী লিখেছে? ওদের বই এন্তার বিক্রি হচ্ছে! শোপেনহায়ারের বই এমনিতে নীরস ও জটিল, কিন্তু যেহেতু তা বেদান্তদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে শোনা যাচ্ছে সে বইও কিনে নাও।

যেমন বুদ্ধিকে তৃপ্ত করে তেমনি হৃদয়কে—এই বেদান্তদর্শন। সকলের মধ্যে এক ঈশ্বরত্ব—বর্তমান ঈশ্বরত্বেই মানুষের সমত্ব—এই বিশ্বপ্রেম, বিশ্বাত্মবোধের ধর্ম কাকে না স্পর্শ করবে, পরিপূর্ণ করবে? মানুষই জীবিত ঈশ্বর—'দি লিভিং গড'—হিন্দুধর্ম ছাড়া কে আর মানুষকে এতখানি মর্যাদা দিয়েছে? পৃথিবী জুড়ে সমস্ত হস্তে ঈশ্বরেরই কর্ম, সমস্ত পদে ঈশ্বরেরই যাতায়াত। সমস্ত প্রাণে সেই ঈশ্বরেরই অনঞ্জন আনন্দ। এ ধর্ম কাকে না খুশি করবে?'

হার্টফোর্ডের মেটাফিজিক্যাল সোসাইটির আমন্ত্রণে স্বামীজি 'আত্মা ও ঈশ্বর' সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন।

ভারতীয় দর্শনে 'শয়তান' বলে কেউ নেই। তার কারণ কী? তার কারণ, ধর্মচিন্তায় ভারতবাসী নিদারুণ দুঃসাহসী। ধর্মের ক্ষেত্রে সে শিশুর মত নির্বোধ আচরণ করতে চায়নি। শিশুদের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়, তারা সবসময়েই অন্যের উপর দোষ চাপাতে চায়। আমরা একদিকে কামনা করছি প্রার্থনা করছি আবার অন্য দিকে বাসনার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে বলছি, আমি কিছু করিনি, শয়তান আমাকে প্রলুব্ধ করেছে।

সুতরাং আমার এ বিপাকের জন্যে একমাত্র শয়তানই দায়ী ! এ দুর্বল মানুষের ইতিহাস। এ কাপুরুষের পলায়ন।

মন্দের জন্যে কে দায়ী ? আমিই দায়ী। মন্দ এসেছে কেন ? কে এনেছে ? বলো, আমিই এনেছি। পৃথিবী কেন একটা ক্লেদকূপ ? আমরাই করেছি। আমরাই দোষী। আমাদের অপরাধ অন্য কারু উপর চাপাব না। আমরাই আগুনে হাত দিয়েছিলাম, তাই আমাদের হাত পুড়েছে। মানুষ যা পাবার যোগ্য তাই পায়। যদি সেই পোড়াব ব্যথা সারাতে চাই তবে একবার ভগবানকে বলে দেখি. তিনি নিশ্চয় আমাদের সাহায্য করবেন। তিনি তো আমাদের জন্যে সব সময়েই কিছু করবার জন্যে উৎসুক, শুধু উৎসুক নন—প্রস্তুত।

হ্যাঁ. আমরাই দায়ী। কেন আমরা দুঃখ পাই ? কেন আমরা দীনদরিদ্রের ঘরে এসে জন্মালাম ? সারা জীবন কী দুঃসাধ্য সংগ্রাম করছি তবু কেন এই পাষাণভারকে টলাতে পারছি না ? তুমি তো যুক্তিবাদী, যুক্তির খুব বড়াই করো। তবে আমাদের এই দীনহীন জন্মের পিছনে যুক্তি কী ? কেন সূচনাতেই এই দুরত্যয় দুর্ভোগের মধ্যে এসে পড়লাম ? বলো, কী কারণ, কোথায় যুক্তি ? দার্শনিক বলছে, এই দুঃখভোগের জন্যে তুমিই দায়ী। তোমার জীবনের সমস্ত ঘটনার মূল কারণ তুমিই। তুমিই তোমার জীবনের রচয়িতা, তোমার জীবনের নিয়ামক। অন্য কাউকে দোষ দিও না, কোনো শয়তানকে আসামী কোরো না। নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপানো নিরর্থক।

আমাদেব এই ভাবটি বুঝতে হবে—ঈশ্বরের মায়া দৈবী। এই মায়াই ঈশ্বরের ক্রিয়াশক্তি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছে, 'আমার এই দৈবী মায়া দুরতিক্রম্যা। কিন্তু যারা আমার শরণ নেয় তারাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারে।'

আমরা কী দেখি ? দেখি নিজের চেষ্টায় এই মায়ার মহাসাগর পার হওয়া অসম্ভব। সেই পুরোনো মুরগি আর তার ডিমের প্রশ্ন—কোনটা আগে ? যে কোনো কর্ম করো তা ফল প্রসব করবে। কর্ম কারণ, ফল কার্য। ফলটি আবার তোমাকে নতুন কর্মে প্রবৃত্ত করবে। এখন ফল কারণ, নতুন কর্ম কার্য ! এইভাবে চলছে কার্যকারণ পরম্পরা। একবার গতি শুরু হলে আর তার বিরতি নেই। কে তা থামাবে ? স্রোত থেকে কে আমাদের পারে তুলে দেবে ? কার্যকারণের নিয়মের চেয়ে বেশি শক্তিশালী যদি কেউ থাকে আর সে যদি প্রসন্ন হয় তবে সেই আমাদের কর্মচক্রের বাইরে টেনে নিতে পারে। আর কেউ নয়।

আমরা বলি এমনি একজন আছেন। তিনিই ঈশ্বর, অসীম করুণায় ভরা। তিনি আছেন বলেই আমাদের মুক্তি সম্ভব। নিজেদের ইচ্ছা আর শক্তির দৌড় তো দেখেছি—নিজের ইচ্ছায় ও শক্তিতে পারো তুমি মুক্ত হতে ? মুক্তির অর্থ কী ? মুক্তি অর্থে যদি প্রকৃতির বাইরে যাওয়া বোঝায় তবে কর্ম দ্বারা তুমি কী করে মুক্তি পাবে ? মুক্তির অর্থ ঈশ্বরে অবস্থান, ঈশ্বরে একত্ব। এ তখনই সম্ভব যখন তুমি নিজের আত্মার প্রকৃত স্বরূপ চিনতে পারো, যে আত্মা প্রকৃতি ও তার সমস্ত বিকৃতি থেকে পৃথক। আমরা বলি এই আত্মাই ঈশ্বর—সমস্ত প্রকৃতিতে ও প্রাণীতে যে ওতপ্রোত।

মুক্তি তাই ঈশ্বরের সঙ্গে তাদাত্ম্যে, যে ঈশ্বর প্রকৃতিতে বাঁধা পড়েন নি, যিনি প্রকৃতিরও অধিপতি। প্রকৃতি তাঁকে অভিভূত করতে পারে না, তিনিই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করেন। তাঁর ইচ্ছাতেই নিয়ম, নিয়মের ইচ্ছায় তিনি নন। তিনি সর্বস্বাধীন। আর তিনিই তোমার প্রকৃত স্বরূপ।

কিন্তু কেন তিনি আমাদের উদ্ধার করেন নি ? আমরা তাঁকে চাইনি বলে। তাঁকে ছাড়া আর সব কিছু আমরা চাই, চেয়ে বেড়াই। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চাই, সুখভোগের স্বাস্থ্য-শক্তি চাই, বিপন্মুক্তি চাই, শুধু ঈশ্বরকেই চাই না। মানুষ যা চায় তাই পায়। যদি শুধু শরীরের ধ্যান করো, আবার এই শরীরই ধারণ করতে হবে। নিষ্কৃতি কোথায় ? কোন পথে ?

কী বলছে আমাদের উপনিষদ ? বলছে, স্বতোবর্তমান পরমাত্মা মানুষের ইন্দ্রিয়নিচয়কে বহির্মুখ করে গড়েছে। যাদের দৃষ্টি বাইরে তারা আন্তর সত্যের সন্ধান পায় না। তবে এমন কেউ-কেউ আছেন যাঁরা সত্যকে জানবার ইচ্ছেয় নিজেদের দৃষ্টি ভিতরের দিকে ফিরিয়ে অন্তরের অন্তরে প্রত্যগাত্মার মহিমা উপলব্ধি করেছে।

আমাদের বেদের দু অংশ। প্রথম অংশের বিষয়বস্তু ইন্দ্রিয়বেদ্য জগৎ। বহির্জগতের আনন্ত্য, প্রকৃতি ও প্রকৃতির অধিকর্তা যে ঈশ্বর তাদের নিয়েই প্রথম অংশের ধর্মকর্ম। দ্বিতীয় অংশের নাম বেদান্ত। তার অন্বেষণ আলাদা, অন্বেষণের বিষয় আলাদা। সে ঈশ্বরকে অসম্পৃক্ত কোনো অস্তিত্ব বলে দেখে না, সে আত্মাকেই ঈশ্বর বলে ঘোষণা করে। বলে, ঈশ্বর আবার কোথায়, তুমি মানুষ, আত্মার অধিকারী, তুমিই ঈশ্বর।

আত্মার আনন্ত্য দেশকালগত আনন্ত্য নয়—তা দেশ কালের ঊর্ধ্বে। তোমরা পাশ্চাত্ত্যবাসীরা এই দেশকালাতীত অধ্যাত্মজগতের সন্ধান পাওনি। তোমাদের মন বহিঃপ্রকৃতি ও তার অধীশ্বরের দিকেই ধাবিত। যে সত্য তোমার অন্তরে প্রচ্ছন্ন আছে তাকে খুঁজে বার করো। করুণাময় ভগবানের কাছে গেলেই বা কী হবে ? কিছু না হয় কৃপার প্রসাদ পাবে কিন্তু চরম মুক্তি পাবে না। দাসত্ব সব সময়ে দাসত্ব। লোহার শেকলের মত সোনার শেকলও বিপজ্জনক। তোমাকেই প্রভু হতে হবে নিয়ন্তা হতে হবে ঈশ্বর হতে হবে।

ঈশ্বর বোলো না। 'তুমি' বোলো না। বলো 'আমি'। দ্বৈতবাদের ভাষা হল : হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের পিতা। অদ্বৈতবাদের ভাষা হল : আত্মাই আমার অন্তরতম সত্য। অন্তরতম সত্যের আমি কী নাম দেব ? যদি নিকটতম শব্দ কিছু থাকে, তা 'আমি'।

আমি চিরকালই মুক্ত ছিলাম, চিরকালই মুক্ত থাকব। মুক্তির জন্যে আমার আবার প্রার্থনা কী ? নিজের জন্যে নিজের কাছে কী চাইব ? কাকে আমার ভয় ? আমিই তো সেই এক। আমি কি নিজেকে ভয় করব ? অপর কে আছে যা হতে আমার ত্রাস হবে ? আমি যে পূজা করছি আমিই তার লক্ষ্য। আমিই আমাকে জানছি। ক্রমাগত জানছি। একমাত্র সত্তা আমিই। আমিই ভূমা। অন্য কিছু নেই। আমিই সমস্ত।

চাই শুধু নিজের চিরমুক্ত স্বরূপের স্মৃতি। কর্ম-সম্পাদ্য মুক্তি খুঁজো না, তেমন মুক্তি নেই কোথাও। তুমি তো চিরন্তন মুক্ত। তাই শুধু আবৃত্তি করে চলো, মুক্তোঽহম্। যদি পরমুহূর্তে মোহ আসে এবং বলতে হয় 'আমি বদ্ধ', তবু পিছু হটো না। এই গোটা সম্মোহনটাই দূর করে দাও।

'আমিই পরম সত্য। আমি বিশ্বের অধীশ্বর। মোহ বলে কিছু নেই, মোহ কখনো ছিলও না।' এই তত্ত্ব শোনো, এই ভাবনায় মন অহোরাত্র পরিপূর্ণ করে রাখো। এই ভাবনাকে ধ্যান করো যতক্ষণ না বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করছ এই দেয়াল ঘরবাড়ি চারদিকের সব কিছু গলে-গলে যাচ্ছে, শরীরকেও আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু একাকী আমিই দাঁড়িয়ে থাকব। আমিই একমাত্র চেতনা একমাত্র অস্তিত্ব।

এই সাধনায় সচেষ্ট হও। আমাদের কাম্য মুক্তি, শক্তি নয়, প্রতাপ নয়, ঐশ্বর্য নয়। সমস্ত পৃথিবী আমরা ত্যাগ করলাম, স্বর্গ নরক সব নস্যাৎ করে দিলাম, ক্ষমতা বা বিভূতি নিয়ে কে মাথা ঘামায়? মন বশীভূত হল কি হল না তাতে কী যায়-আসে? আমি তো মন নই, বুদ্ধি নই।

সৎ-অসৎ দুয়ের উপরেই সূর্য সমভাবে আলো দেয়। কারু চোখের দোষের জন্যে কি সূর্যের কোনো হানি হয়? মন যা কিছু করুক, তাতে আমাকে স্পর্শ করে না। অপরিচ্ছন্ন স্থানে সূর্যের আলো পড়লে সূর্য তাতে অপবিত্র হয় না। তেমনি আমিও সৎস্বরূপ। আমি অবিকার্য।

এই হল অদ্বৈতদর্শনের ধর্ম। এ কঠিন। কিন্তু সাধন করে চলো। সকল কুসংস্কার দূর করে দাও। গুরু বা শাস্ত্র বা দেবতা বিদায় হোন। মন্দির, পুরোহিত, প্রতিমা, অবতার—এমন কি ঈশ্বরকে পর্যন্ত বিদায় দাও। ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাকে সে আমিই। সত্যান্বেষী দার্শনিকগণ, উত্তিষ্ঠত। 'সত্যমেব জয়তে।' আর আমিই সত্য।

এই সাধনপ্রণালীকে জ্ঞানযোগ বলে। অন্যান্য পথ সহজ ও মন্থর, কিন্তু জ্ঞানপথে প্রচণ্ড মনোবল দরকার। দুর্বলের জন্যে এ নয়। তোমার বলা চাই: 'আমি আত্মা, নিত্যমুক্ত। আমার কখনো বন্ধন ছিল না। কাল আমাতে বিদ্যমান, আমি কালে বিধৃত নই। আমারই মনে ঈশ্বরের জন্ম। যাঁকে পিতা-ঈশ্বর বা বিশ্বস্রষ্টা-ঈশ্বর বলা হয় তিনি আমারই মানস-সৃষ্ট।

তোমরা যদি নিজেদের দার্শনিক বলো তো কাজে তা দেখাও। এই পরম সত্যের অনুধ্যান করো, আলোচনা করো, আর সমস্ত কুসংস্কার বর্জন করে পরস্পরের সাহায্যে অগ্রসর হও।

কজন যুবক-যুবতী স্বামীজির কাছ থেকে মন্ত্র নিল। তাদের মধ্যে একজন ডক্টর স্ট্রিট। তাঁর নাম হল যোগানন্দ।

ক্রমেই বহু গণ্যমান্য লোক স্বামীজিতে আকৃষ্ট হচ্ছেন। উপায় নেই, মানতে হচ্ছে কথার যৌক্তিকতা। গির্জের লোকেরাও এসে বক্তৃতা শুনে যাচ্ছে। বক্তব্যে পদার্থ নেই এ কথা কেউ বলতে পাচ্ছে না। ডিক্সন সোসাইটিতে ভাষণ দেবার জন্যে ডক্টর রাইট স্বামীজিকে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন। এলা হুইলার উইলকক্স আমেরিকার একজন বিখ্যাত কবি ও লেখিকা। সে স্বামীজির ছাত্রী। তেমনি ছাত্রী মিস এম্মা থার্সবি, ম্যাডাম এন্টয়নেট স্টার্লিং, মিসেস ফ্রান্সিস লেগেট। মিসেস ওলি বুল তো আছেই আগের থেকে। পুরুষ ছাত্রদের মধ্যে ডক্টর এলেন ডে, মিস্টার লেগেট আর প্রফেসর ওয়াইম্যান। এদের কাকে তুমি এক কথায় বাতিল করবে? সবাই নির্ভুল বলাবলি করতে লাগল স্বামীজি অতিমানবিক মহত্ত্বের আধার আর তাঁর সংস্পর্শে এলে কারু সাধ্য নেই তাঁর প্রভাবে না অভিভূত হয়!

কী বলছে হুইলার উইলকক্স?

'একদিন হঠাৎ শুনলাম ভারতবর্ষ থেকে এক দর্শনের অধ্যাপক এসেছে, কাছাকাছি কোন বাড়িতে বক্তৃতা দেবে? কী নাম অধ্যাপকের? কে বললে, বিবেকানন্দ।

সে আবার কে! তবু গেলাম শুনতে। দেখিনা কী এমন তার বলবার থাকতে পারে!

বলব কী, মিনিট দশেক শুনেছি, মনে হল যেন অন্য কোন জগতে উঠে এসেছি। যেন আরেকরকম চেতনায় ঝঙ্কৃত হচ্ছি। আরেকরকম জিজ্ঞাসায়।

আমি আর আমার স্বামী মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে রইলাম শেষ পর্যন্ত।

যখন সভান্তে বেরিয়ে এলাম মনে হল যেন অনেক সাহসী অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছি। জীবনে বিশ্বাস দৃঢ়তর ও আশা দীপ্ততর হয়ে উঠেছে। দিন-রাত্রির তরঙ্গে দুলতে, এক থেকে আরেক পৃষ্ঠার সম্মুখীন হতে আর আমাদের ভয় নেই।

'এই এতদিন খুঁজছিলাম।' বললে আমার স্বামী।

'কী খুজছিলে ?'

'এই ধর্ম, এই ঈশ্বরভাবনা।'

তারপর যেখানেই বিবেকানন্দের বক্তৃতা হচ্ছে আমার স্বামী আমার সঙ্গী হয়ে চললেন। আর সেসব বক্তৃতা থেকে সংগ্রহ করতে লাগলেন দীপ্ততেজ সত্যরত্ন—দুর্দম সাহস আর দুর্মর আশা।

সে বছর আমেরিকার দারুণ বিপর্যয় চলেছে, অর্থনৈতিক বিপর্যয়। ব্যাঙ্ক ফেল পড়ছে, ফাটা বেলুনের মত চুপসে যাচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যবসায়ী হতাশার অন্ধকারে পথ দেখতে পাচ্ছে না, চারদিকে চলেছে ওলোটপালোট। সমস্ত রাত দারুণ উদ্বেগ আর অনিদ্রায় কাটিয়ে আমার স্বামী বলছেন, চলো বিবেকানন্দকে শুনে আসি—আর শোনবার পর শীতের অন্ধকার রাত্রিতে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বলছেন হাসিমুখে, 'সব ঠিক আছে। দুর্ভাবনা করবার কিছু নেই।' কথা শুনে আমারও মনের জোর বেড়ে গেল, নেমে এল নিস্তল শান্তি, জীবনের অনেক দূর পর্যন্ত যেন দেখতে পেলাম।

যদি কোনো দর্শন, যদি কোনো ধর্ম, মানুষের ঘোর দুঃসময়ের এমন উপকার করতে পারে, যদি বাড়িয়ে দিতে পারে মানবপ্রীতি ও ঈশ্বরবিশ্বাস, যদি বুঝিয়ে দিতে পারে এ জীবনেরই সমস্ত শেষ নয়, আছে আরো-আরো জীবন, বৃহত্তর ও মহত্তর, তবে সে দর্শন সে ধর্ম নিশ্চয়ই উন্নত নিশ্চয়ই মঙ্গলকর।

আমি তোমাদের কাছে নতুন কোনো ধর্ম বা মত প্রচার করতে আসিনি, বলছেন বিবেকানন্দ, তোমরা আপন-আপন ধর্মে ও বিশ্বাসেই দৃঢ় থাকো, শুধু যে মেথডিস্ট সে আরো ভালো মেথডিস্ট হোক, যে প্রেসবিটেরিয়ান সে আরো ভালো প্রেসবিটেরিয়ান হোক, আর যে ইউনিটেরিয়ান সে আরো ভালো ইউনিটেরিয়ান হোক। আমি শুধু বলি নিজের জীবনের সত্যকে উপলব্ধি করো, প্রকাশ করো আত্মার অন্তর্জ্যোতি।

যে সামান্য ব্যবসায়ী তাকেও নবতর শক্তি দিচ্ছে, বিলাসে-লাস্যে চপলচঞ্চল মেয়েদেরও থামিয়ে দিচ্ছে, ভাবিয়ে তুলছে, শিল্পীকে স্রষ্টাকে দিচ্ছে নতুন উদ্দীপনা, স্ত্রীকে ও মাকে, স্বামীকে ও পিতাকে শেখাচ্ছে কর্তব্যের পবিত্রতর ব্যাখ্যা '

'তোমাদের সন্তানদের শেখাও', বলছেন স্বামীজি : 'ধর্ম প্রত্যক্ষ বস্তু, নেতিবাচক কিছু নয়। কোনো শেখানো বুলি নয়, ধর্ম মানে জীবনবিস্তার। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে একটি মহৎ সত্য প্রচ্ছন্ন আছে, সে অনবরত প্রকাশিত হতে চাইছে। এই প্রকাশের নামই ধর্ম।

শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় সে কতগুলো পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে। আর আমরা প্রত্যেকে যে একটা স্বতন্ত্রতার ভাব অনুভব করি তাতে বোঝা যায় আমাদের দেহ ও মন ছাড়া আরো একটা সত্তা আছে। আত্মাই তার আরেক নাম। দেহ ও মন পরাধীন

কিন্তু আত্মা স্বাধীন। এই আত্মাই আমাদের মধ্যে মুক্তির ইচ্ছা সৃষ্টি করছে। আমরা যদি স্বরূপতঃ মুক্ত না হতাম তাহলে এই জগৎকে সৎ ও সুন্দর করে তোলবার আশা পোষণ করতে পারতাম না। আমরা বিশ্বাস করি আমরাই আমাদের ভবিষ্যতের নির্মাতা। আর এই যে আমাদের বর্তমান এও আমাদের সৃষ্টি। ইচ্ছে করলে আমরা আমাদের ভেঙে নতুন করে গড়তে পারি। আমরাই আমাদের ভাগ্যবিধাতা।

হ্যাঁ, আমরা বিশ্বাস করি ভগবানকে। বিশ্বপিতা ভগবান, সর্বব্যাপী, সর্ববলী, সর্বানুভু। তোমাদের মত আমরাও ব্যক্তি-ঈশ্বরকে স্বীকার করি। কিন্তু আমরা ব্যক্তি-ঈশ্বরের পরেও যেতে চাই, যেতে চাই তাঁর নির্বিশেষে সত্তায়। আমরা বিশ্বাস করি ঈশ্বরের নির্বিশেষে সত্তার সঙ্গে আমরা স্বরূপত এক। অন্য ধর্ম অন্য ভাবে ঈশ্বরকে, মানুষকে ব্যাখ্যাবর্ণনা করুক, কারু সঙ্গে আমাদের বিরোধ নেই। প্রত্যেক ধর্মের সামনেই হিন্দু মাথা নত করে, কেননা জগতে কল্যাণকর আদর্শ হচ্ছে গ্রহণ, অবর্জন। নানা রঙের ফুল দিয়ে আমরা একটি বিচিত্রসুন্দর তোড়া তৈরি করে বিশ্বশিল্পী ভগবানকে উপহার দেব। তিনি যে আমাদের একান্ত আপনার জন। ভালোবাসার জন্যেই তাকে ভালোবাসব, কর্তব্যের জন্যেই তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্য সম্পন্ন করব, উপাসনার জন্যেই করব তাঁর উপাসনা।'

৭৯

নিইয়র্কে 'ইৎশীল' অভিনয় হচ্ছে।

ফরাসী ধাঁচে পরিবেশিত বুদ্ধজীবনী। ইৎশীল এক গণিকা, বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করতে সচেষ্ট আর বুদ্ধ তাকে জগতের অসারতা সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন, শরীরের নশ্বরতা সম্বন্ধে। ইৎশীল কিন্তু সারাক্ষণই বুদ্ধের কোলে বসে আছে। তবু কিছুতেই টলাতে পারছে না বুদ্ধকে। শেষপর্যন্ত বিফলকাম ইৎশীল বুদ্ধে শরণাগত হল।

ইৎশীলের ভূমিকায় ফরাসিনী অভিনেত্রী, বিশ্ববিজয়িনী সারা বার্নহার্ড।

স্বামীজি দেখতে এসেছেন।

সারা জানতে পেরেছে দর্শকদের মধ্যে কে আছে উপস্থিত।

গায়িকা মাদাম মোরেলকে ধরল সারা: 'আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও।'

লোকে সারার সঙ্গেই আলাপ করতে পেলে ধন্য হয়। এমন লোকও আছে যার সঙ্গে আলাপ করতে পেলে সারাই ধন্য হবে।

সাক্ষাতের ব্যবস্থা হল।

স্বামীজি বৈদান্তিক প্রাণ ও আকাশ, শক্তি ও জড়—এ সমস্তের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলেন। দেখলেন, সারা বেশ শিক্ষিত, দর্শনশাস্ত্রের অনেক কিছু তার পড়া আছে।

সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হল মিস্টার টেসলা, বিদ্যুৎবৈজ্ঞানিক।

'প্রাণ ও আকাশ,' বললেন স্বামীজি, 'জগদ্ব্যাপী সমষ্টি-মন ব্রহ্ম বা ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন হয়, আর শক্তি ও জড় আসছে আদ্যা সৃষ্টিশক্তি থেকে। একটা সর্বাতীত নিরপেক্ষ ভূমিতে এই ব্রহ্ম আর সৃষ্টিশক্তি এক।'

লাফিয়ে উঠল টেসলা। বললে, 'আমি অঙ্ক কষে দেখিতে দিতে পারব জড় ও শক্তি দুটোকেই একটা অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত করা যেতে পারে। আপনি আগামী সপ্তাহে আমার বাড়ি আসুন।' স্বামীজি লক্ষ্য করল টেসলাকে : 'আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব অঙ্ক কষে।'

স্টার্ডিকে লিখছেন স্বামীজি : 'আমি এখন বেদান্তের সৃষ্টিবিজ্ঞান ও পরলোকতত্ত্ব নিয়ে খুব খাটছি। আমি স্পষ্টই আধুনিক বিজ্ঞান ও বৈদান্তিক তত্ত্বের মধ্যে ঐক্য দেখছি। ভাবছি শিগগিরই এই সামঞ্জস্য নিয়ে বই লিখব। তবে আমি শুষ্ক সুকঠিন যুক্তিকে প্রেমের মধুরতম রসে কোমল করে কর্মের মশলাতে সুস্বাদু করে ও যোগের রান্নাঘরে রেঁধে এমন ভাবে পরিবেশন করতে চাই যাতে শিশুরা পর্যন্ত তা হজম করতে পারে।'

আমেরিকান সভ্যতার মর্মস্থল নিউইয়র্ককে জাগিয়ে দিলেন স্বামীজি। দলে দলে আমেরিকানরা বেদান্তবাদী হয়ে উঠতে লাগল। জিগগেস করলেই বলে, আমরা স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য, আমরা অদ্বৈতবাদী।

আলাসিঙ্গাকে লিখছেন স্বামীজি :

আমি মার্কিন সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ নিউইয়র্ককে জাগাতে পেরেছি। কিন্তু এর জন্যে আমাকে কী ভয়ানক খাটতে হয়েছে! গত দুবছর এক পয়সাও আসেনি। হাতে যা কিছু ছিল সবই এই নিউইয়র্ক আর ইংলণ্ডের কাজে ব্যয় হয়ে গিয়েছে। এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে কাজ একরকম চলে যাবে, ঠেকবে না।

সূক্ষ্ম অদ্বৈততত্ত্বকে প্রাত্যহিক জীবনের উপযোগী জীবন্ত ও কবিত্বময় করে তোলাই আমার জীবনের ব্রত। প্রভুই কেবল জানেন আমি কতদূর কৃতকার্য হব।

বৎস, কর্মেই আমাদের অধিকার, ফলে নয়। বড়ই কঠিন কাজ, খুবই কঠিন। যতদিন না প্রত্যক্ষানুভূতিসম্পন্ন ত্যাগব্রতী একদল শিষ্য তৈরি হচ্ছে ততদিন এই কামকাঞ্চনের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে নিজেকে স্থির রেখে নিজের আদর্শ ধরে থাকা খুবই কঠিন ব্যাপার। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এরই মধ্যে খানিকটা কৃতকার্য হতে পেরেছি। মিশনারি বা থিওসফিস্টদের আমি আর দোষ দিই না, এ ছাড়া তারা আর কী-ই বা করতে পারত! তারা তো জীবনে আগে কখনো এমন লোক দেখেনি যে কামিনীকাঞ্চনের মোটেই ধার ধারে না। প্রথমে যখন দেখল বিশ্বাসই করতে পারল না। পারবেই বা কী করে? এ কি কখনো বিশ্বাস্য?

তুমি যদি ভেবে থাকো ব্রহ্মচর্য ও পবিত্রতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্যবাসীদের ধারণা ভারতীয়দেরই অনুরূপ তাহলে তুমি ভুল করবে। তাদের অনুরূপ শব্দ হচ্ছে সতীত্ব আর সাহস। তাদের মতে বিয়ে স্বাভবসিদ্ধ ধর্ম, এটা না থাকলে মানুষ অসাধু। আর যে লোক মহিলাদের সম্মান করে না সে তো অসৎ। মিশনারিই হোক বা থিওসফিস্টই হোক সকলেরই পবিত্রতা সম্পর্কে এই ধারণা। এখন তারা দলে-দলে আমার কাছে আসছে। এখন শত-শত লোক বুঝেছে যে এমন লোকও আছে যারা নিজেদের কামবৃত্তিকে সত্যিই সংযত করতে পারে। দিনে দিনে তাদের ভক্তিশ্রদ্ধাও বাড়ছে। যারা ধৈর্য ধরে থাকে তাদের কাছে সমস্তই এসে যায়।'

ব্রহ্মচর্যের চেয়ে কী আর বল আছে? আবার বলছেন স্বামীজি : স্ত্রী-সম্বন্ধীয় আচার সব দেশেই একরকম, অর্থাৎ পুরুষ মানুষের অন্য স্ত্রী-সংসর্গে বড় দোষ হয় না

কিন্তু স্ত্রী লোকের বেলায় মুশকিল। তবে ফরাসী পুরুষ একটু খোলা, অন্যদেশের ধনীরা যেমন এ ব্যাপারে বেপরোয়া, তেমনি। আর ইউরোপীয় পুরুষ সাধারণ ওটা বিশেষ দোষের বলে ভাবে না। অবিবাহিতের পক্ষে ওটা তেমন গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়, বরং বিদ্যার্থী যুবক ও-বিষয়ে একান্ত বিরত থাকলে অনেকস্থলে মা-বাপ সেটা দোষাবহ মনে করে, পাছে ছেলেটা 'মেনিমুখো' হয়। পুরুষের একগুণ পাশ্চাত্ত্য দেশে চাই—সাহস। এদের 'ভার্চু' আর আমাদের 'বীরত্ব' একই শব্দ। আমাদের ধারণা এদের ঠিক উলটো। আমাদের ব্রহ্মচারী বিদ্যার্থী অর্থই কামজিৎ।

এদের উদ্দেশ্য ভোগ, ব্রহ্মচর্যের আবশ্যক তত নেই। আমাদের উদ্দেশ্য মোক্ষ, ব্রহ্মচর্য ছাড়া তা কী করে হয় বলো?

নিবেদিতাকে বললেন স্বামীজি, 'হিন্দু ব্রাহ্মণ বিধবার ব্রহ্মচর্য ও আদর্শ জীবন তোমাকে গ্রহণ করতে হবে, তাই বলে তোমার প্রেমসংযুক্ত নিঃস্বার্থ কর্ম তাদের মত স্বগৃহেই আবদ্ধ থাকবে না, সারা ভারতে ও ভারতীয়দের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। তোমার অন্তর ও বাহ্য জীবন গোঁড়া বিশুদ্ধা ব্রহ্মচারিণীর মত হবে। অতীত জীবন এমন কি স্মৃতি পর্যন্ত ভুলতে হবে। তোমাদের চিন্তা প্রয়োজন ধ্যান ধারণা সমস্ত কিছুই নিষ্ঠাবতী বিশুদ্ধা হিন্দু ব্রহ্মচারিণীর মত হওয়া চাই।'

তারপর স্বামীজি গেলেন ডেট্রয়টে, সঙ্গে গুডউইন। উঠলেন ছোট একটা 'ফ্যামিলি হোটেলে', নাম 'রিশিলু'। সপরিবারে বাস করা যায় সেখানে, কটা ঘর ভাড়া নিলেন স্বামীজি। ঘর এত বড় নয় যে সেখানে ক্লাশ হতে পারে, তবে উপায়? হোটেলের বড় ড্রইং রুমটা ব্যবহার করতে অনুমতি দিল ম্যানেজার। তবু সেটা যথেষ্ট বড় নয়। কী করা, যে কটা লোক ধরে তাদের সামনেই বলব ঈশ্বরকথা।

ড্রয়িং রুমে তিল ধারণের স্থান নেই। হল-ঘর লাইব্রেরি সিঁড়ি সমস্ত একেবারে মানুষে ঠেসে আছে। কত লোক যে দাঁড়াবার জায়গাটুকু না পেয়ে ফিরে গেছে তার লেখাজোখা নেই।

কী বলছেন আজ স্বামীজি? ভক্তির কথা, ভগবানকে ভালোবাসার কথা। মনে হচ্ছে খাদ্যের জন্যে যেমন ক্ষুধার্তের, জলের জন্যে যেমন তৃষ্ণার্তের, তেমনি ভগবানের জন্যে তাঁর দুর্ধর্ষ ব্যাকুলতা। মায়ের জন্যে যেমন শিশুর তেমনি একটা উদ্বেল কান্নায় যেন তিনি ফেটে পড়ছেন। এক দিব্য উন্মাদনা তাঁকে পেয়ে বসেছে। আর কী সুন্দর তাঁকে দেখাচ্ছে দেখ! এ কি মানুষের চেহারা না কি কোনো দেবতার?

বেথেল মন্দিরের পুজুরী লুই গ্রসম্যান। মন্দিরে রবিবার সন্ধ্যায় সভার আয়োজন হল—সে কী দুর্দান্ত ভিড়, বহুশত লোক জায়গা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে, ভয় হল হতাশ জনতা একটা অপ্রীতিকর কাণ্ড না বাধিয়ে তোলে। কিন্তু, না, যিনি ভিতরে বক্তৃতা দিচ্ছেন তার প্রভাব বুঝি বাইরেও বিস্তীর্ণ হচ্ছে। তাই যারা ফিরে গেল শান্ত হয়েই ফিরে গেল আর যারা ভিতরে বসে, শুনল মন্ত্রমুগ্ধের মত। আর তারা দেখল কী চোখ মেলে? দেখল রক্ত-মাংসের কোনো মানুষ নয়,যেন স্বর্গপ্রেরিত এক নির্মল অমল মানুষের ভাষায় উচ্চারিত হয়ে উঠেছে। বক্তৃতার বিষয় জগতে ভারতের বাণী।

জগৎ ভারতকে কী দিয়েছে? নিন্দা, অভিশাপ আর ঘৃণা—এ ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতীয়দের রক্তস্রোতের মধ্য দিয়ে অন্যে তার সমৃদ্ধির পথ করে নিয়েছে, ভারতীয়দের দারিদ্র্যে ও দাসত্বে পিষে, ফেলে। আর, আঘাতের পরে অপমান, চাপিয়ে

দিতে চাইছে এমন এক ধর্ম যার পুষ্টি ও প্রতিষ্ঠা আর সব ধর্মের বিনাশের উপর। কিন্তু ভারত ভীত নয়, সে কারু কৃপাভিখারি নয়। আমাদের একমাত্র দোষ আমরা অন্যকে পদদলিত করবার জন্যে যুদ্ধ করতে পারি না, আমরা সত্যে বিশ্বাসী, সত্যের অনন্ত মহিমায় আমাদের আশ্রয়। জগতে ভারতের বাণী কী? বাণী—পরম মঙ্গলেচ্ছা। অহিতের প্রতিদানেও হিতৈষণা। এই মহৎ আদর্শের উৎপত্তি ভারতবর্ষে। তার বাণী—প্রশান্তি, সাধুতা, ধৈর্য ও মৃদুতা শেষ পর্যন্ত জয়ী হবেই। সত্য অপরাভুয়।

আবার বললেন, বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ নিয়ে।

বললেন, ধর্মের সার্বভৌমিকতার বাস্তব রূপ বলে কিছু খুঁজে বার করা কঠিন, তবু আমরা জানি তা ঠিকই আছে। আমরা সকলেই মানুষ কিন্তু আমরা সকলে কি সমান? কখনো না। আমাদের পরস্পরের মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য, বিদ্যাবুদ্ধির তারতম্য এবং শারীরিক বলের তারতম্য আছে বলে আমরা একে-অন্যের থেকে পৃথক হতে বাধ্য। তবু আমরা জানি এই সাম্যবাদ আমাদের সকলের হৃদয়ই স্পর্শ করে। দুটি মানুষের ঠিক এক রকমের মুখ দেখি না তবু আমরা সকলেই মানবজাতীয়। নিজের মনে মানবস্বরূপে সাধারণ ভাবটি আছে বলেই সেই অনুসারে আমি তোমাকে নর বা নারীরূপে জানতে পারি। সর্বজনীন ধর্ম সম্বন্ধেও এই কথা। তা ঈশ্বরের ধারণা অনুসারে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মে অনুস্যূত আছে। অনন্তকাল ধরে আছে ও অনন্তকাল ধরে থাকবে। ভগবান বলেছেন, 'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।' আমি মণিগণের মধ্যে সূত্ররূপে বাঁধা আছি—এই এক-একটি মণিকে এক-একটি ধর্মমত বলা যেতে পারে। সমস্ত ধর্মমতের মধ্যে প্রভুই অচ্ছিন্ন সূত্ররূপে বর্তমান।

বহুত্বের মধ্যে একত্বই সৃষ্টির নিয়ম। আমরা সকলেই মানুষ অথচ আমরা সকলেই পরস্পর পৃথক। প্রাণী হিসেবে পৃথক হয়েও সত্তা হিসেবে তুমি-আমি বিরাট বিশ্বের সঙ্গে এক। সেই বিরাট সত্তাই ভগবান—তিনিই এই বৈচিত্র্যময় জগৎ প্রপঞ্চের চরম একত্ব। সর্বজনীন ধর্মের অর্থ যদি এই হয় যে সমস্ত জগৎবাসী একটি বিশেষ মত বিশ্বাস ও পালন করবে তা হলে বলব তা অসম্ভবের চেয়েও অসম্ভব। তা হলে সমস্ত সৃষ্টিই লোপ পাবে। এ জগতে গতি সম্ভব হচ্ছে কী করে। শুধু সমতাচ্যুতিতে। যখন এ জগৎ ধ্বংস হবে তখনই সাম্যরূপে ঐক্য আসতে পাবে। এর আসা কল্পনা করাও বিপজ্জনক। আমরা সকলেই এক রকম চিন্তা করব এ এক ভয়াবহ অবস্থা। তাহলে মনে হয় চিন্তা করবারই কিছু থাকবে না। তখন মিশরের মামিগুলোর মত আমরা সকলেই একরকম হয়ে যাব আর একে অন্যের দিকে নীরবে চেয়ে থাকব—আমাদের মনে ভাববার মত কোনো কথাই উঠবে না। পার্থক্য ও অনৈক্য—আমাদের পরস্পরের মধ্যে সাম্যের অভাবেই আমাদের উন্নতির প্রকৃত উৎস, তাই আমাদের সমস্ত চিন্তার প্রসূতি।

সার্বভৌম ধর্মের আদর্শ বলতে আমি কী বুঝি? আমি এমন কোনো তত্ত্ব বা আচরণপদ্ধতির কথা বলছি না যা সকলেরই গ্রাহ্য হবে। কারণ আমি জানি, নানা পাকে-চক্রে গড়া এই জগৎরূপ বিস্ময়কর ও বিশাল যন্ত্র চিরদিন এমনি জটিল ও দুর্বোধ্যই থাকবে, এমনিই চলবে আবর্ত-বাত্যায়। আমরা তবে কী করতে পারি? আমরা একে সুচারুরূপে চলতে সাহায্য করতে পারি, এর সংঘর্ষ কমাতে পারি, এর চাকাগুলো তৈলাক্ত ও মসৃণ রাখতে পারি। প্রশ্ন হবে, কেমন করে? বৈষম্যের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। আমাদের স্বভাববশতই যেমন একত্ব স্বীকার করতে হয় তেমনিই বৈষম্যও

অবশ্যস্বীকার্য। একই সত্য বহুভাবে প্রকাশিত হতে পারে আর প্রত্যেকটি ভাবই তার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে যথার্থ। বস্তুকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখা চলে কিন্তু বস্তু একই থাকে। সূর্যের কথা ধরা যাক। মনে করুন কেউ ভূপৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছে, সে শুধু একটি বৃহৎ গোলাকার বস্তু দেখতে পাবে। তারপর ধরুন, সে একটি ক্যামেরা নিয়ে সূর্যের দিকে যাত্রা করল আর যে পর্যন্ত না সূর্যে পৌঁছুল অনবরত সূর্যের ছবি নিতে লাগল। এক জায়গা থেকে তোলা ছবি আরেক জায়গা থেকে তোলা ছবির থেকে আলাদা হবে। যখন সে ফিরে আসবে তখন মনে হবে সে বুঝি কতগুলো নতুন সূর্যের ছবি তুলেছে। কিন্তু আমরা জানি এ সমস্ত একই সূর্যের আলাদা-আলাদা প্রতিচ্ছায়া।

ভগবান সম্বন্ধেও তাই। উচ্চতম বা নিম্নতম দর্শনের মধ্য দিয়েই হোক, সূক্ষ্মতম বা স্থূলতম পৌরাণিক আখ্যায়িকার মধ্য দিয়েই হোক, অথবা সুসংস্কৃত ক্রিয়াকাণ্ড বা হীনতম ভূতোপাসনার মধ্য দিয়েই হোক, প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক সম্প্রদায়, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ধর্ম জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ঊর্ধ্বগামী হয়ে ভগবানের দিকেই অগ্রসর হবার চেষ্টা করছে। মানুষ সত্যের যত প্রকার অনুভূতি লাভ করুক না কেন সবই ভগবানেরই প্রতিফলন। একই জলাশয় থেকে জল নিচ্ছে কেউ ঘটিতে কেউ কলসীতে কেউ বালতিতে। পাত্রের আকারের মতই জলের আকার হয়েছে, অথচ পাত্রে জল ছাড়া আর কিছু নেই। ধর্ম সম্বন্ধেও তাই। আমাদের মনও এই পাত্রের মত। যার যেরকম মনের গঠন তার সেই রকম ঈশ্বরানুভূতি। অথচ ঘটে-ঘটে সেই একই জল, একই ভগবান।

পৃথিবীর সকল ধর্মই সত্য একথা অনেকেই স্বীকার করেছেন অথচ তাদের একীকরণের কোনো কার্যকর উপায় কেউ দেখাতে পারেন নি। স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সমন্বয়—এ কোথায়?

আমি একটা উপায়ের কথা বলছি, দেখুন সেটি কার্যকর কিনা। সেটি আর কিছুই নয়, শুধু 'কিছু নষ্ট কোরো না।' ধ্বংসবাদী সংস্কারকেরা জগতের কোনো উপকারই করতে পারে না। কোনো কিছু একেবারে ভেঙে ফেলো না, ধূলিসাৎ কোরো না, বরং মেরামত করো। যদি পারো সাহায্য করো, না পারো হাত গুটিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো, যেমন চলছে চলতে দাও। ইষ্ট করতে না পারো অনিষ্ট কোরো না। যতক্ষণ মানুষ অকপট থাকে ততক্ষণ তার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটিও কথা বোলো না। বরং যে যেখানে আছে তাকে সেখান থেকে উপরে তুলতে চেষ্টা করো। যদি এই সত্য হয় ভগবানই সকল ধর্মের কেন্দ্রস্বরূপ আর আমরা প্রত্যেকেই যেন একটি বৃত্তের বিভিন্ন ব্যাসার্ধ দিয়ে সেই কেন্দ্রের দিকেই অগ্রসর হচ্ছি, তা হলে আমরা সকলেই কেন্দ্রে পৌঁছুব এবং যে-কেন্দ্রে সকল ব্যাসার্ধ মিলিত হয় সেই কেন্দ্রে পৌঁছে আমাদের সকল বৈষম্য তিরোহিত হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না পৌঁছুচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্তই বৈষম্য। কিন্তু কেন্দ্রে আমরা একদিন পৌঁছুবই পৌঁছুব—সকল রাস্তাই রোমে পৌঁছয়। তাই বলি কোনো রাস্তাই নষ্ট কোরো না, বরং পথের অন্তরায়গুলি অপসারিত করো।

তারপর স্বামীজি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে নিমন্ত্রিত হলেন স্নাতকদের সামনে বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে।

বেদান্তবাদীরা কী বলে? বলে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ বলে কিছু নেই, বুদ্ধিদ্বারা অধিগম্য জগৎ বলেও কিছু নেই। সৃষ্টির মূলে শুধু একটিমাত্র সত্তা আছে—এক ও অভেদ। সমগ্র বিশ্ব ঈশ্বর হতে উদ্ভূত বলে প্রতীয়মান হয় মাত্র। রজ্জুকে সর্প বলে

মনে হয় মাত্র, রজ্জু কখনো সর্পে পরিণত হয় না। এই প্রকাশমান সমস্ত বিশ্বই সেই সৎ-স্বরূপ, এতে কোনো পরিবর্তন নেই। যে সব পরিবর্তন দেখি তা আপাত-প্রতীয়মান মাত্র। দেশ কাল ও নিমিত্ত এই পরিবর্তন ঘটায়। আরো বলা যায়, নাম ও রূপ দিয়েই আমরা একটি পদার্থকে আরেকটি পদার্থ থেকে পৃথক করে বুঝি। আসলে সবই এক ও অভেদ।

মানুষ যখন অজ্ঞানের মধ্যে থাকে, তখন সে সৃষ্ট জগৎই দেখে, ঈশ্বরকে দেখে না। যখন সে ঈশ্বরকে দেখে তখন তার কাছে জগৎ লুপ্ত হয়ে যায়। এই ভ্রমই অবিদ্যা বা মায়া—এই মায়াই সৃষ্টির কারণ. এরই প্রভাবে চরম সত্যকে, অপরিবর্তনীয়কে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বলে আমরা মনে করি। এই মায়াকে মহাশূন্য বা অস্তিত্বহীন বলা যায় না। সৎও নয় অসৎও নয়—এই হল মায়ার সংজ্ঞা, অর্থাৎ মায়া আছে একথা বলা চলে না, আবার নেই এ কথাও বলা চলে না। একমাত্র চরম সত্যকেই সৎ বলা যেতে পারে, সেদিক থেকে দেখলে মায়া অসৎ, অস্তিত্বহীন। আবার মায়া অসৎ একথাও বলা চলে না, যেহেতু অসৎ হলে জগৎ সৃষ্টি করতে পারত না। কাজেই এ এমন একটা কিছু, যা সৎ বা অসৎ কোনোটাই নয়, এজন্যে বেদান্তদর্শন একে 'অনির্বচনীয়' বলেছে, বলেছে বাক্যদ্বারা প্রকাশের বাইরে।

মায়াই এই বিশ্বের কারণ। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যাতে উপাদান দেন মায়া তাতে নাম ও রূপ দেয়, আর উপাদানই নামে-রূপে প্রকটিত হয়েছে বলে প্রতীত হয়। কাজেই অদ্বৈতবাদীর কাছে জীবাত্মার কোনো স্থান নেই। জীবাত্মা মায়ার সৃষ্টি, আসলে তার কোনো পৃথক অস্তিত্ব সম্ভব নয়। যদি সর্বব্যাপী একটিমাত্র সত্তা থাকে, তবে আমি একটি সত্তা, তুমি একটি সত্তা, সে আরেকটি সত্তা—এমন কিছু হতে পারে না। আমরা সকলেই এক। দ্বৈতজ্ঞানই অনর্থের মূল। বিশ্ব থেকে আমি আলাদা এ বোধ যখন জাগতে সুরু করে তখনই প্রথমে ভয় দেখা দেয়, তার পরেই দুঃখ। 'যেখানে একে অপরের কথা শোনে, একে অপরকে দেখে, তা অল্প। যেখানে একে অপরকে দেখে না, একে অপরের কথা শোনে না—তাই ভূমা, তাই ব্রহ্ম। সেই ভূমাতেই পরম সুখ। অল্পে সুখ নেই।'

নিম্নতম কীট আর উচ্চতম মানুষের মধ্যে সেই একই ঈশ্বরীয় সত্তা বর্তমান। কীটের দেহই নিম্নতম রূপ, সেখানে দেবত্ব মায়া দ্বারা অনেক বেশি পরিমাণে ঢাকা আছে; যেখানে দেবত্বের উপর মায়ার আবরণ ক্ষীণতম তাই উচ্চতম রূপ বা দেহ। সব-কিছুর অন্তরালে সেই এক দেবত্বই প্রতিষ্ঠিত, এই সত্য অবলম্বন করেই নীতি গড়ে উঠেছে যে অপরের অনিষ্ট কোরো না। প্রত্যেককে নিজের মতো ভালোবাসো কারণ সমগ্র বিশ্বই এক। অন্যের অনিষ্ট করলে নিজেরই অনিষ্ট করা হয়, অন্যকে ভালোবাসলে নিজেকেই ভালোবাসা হয়। এই সত্য থেকেই অদ্বৈতবাদীর মূলতত্ত্বের উদ্ভব—সে আর কিছুই নয়, আত্মত্যাগ।

অদ্বৈতবাদী বলে, ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ববোধই আমার সমস্ত অনর্থের মূল। এই অহং-বোধই আমাকে অন্যের থেকে আলাদা করে রেখেছে, এই আমার মধ্যে ঘৃণা দ্বেষ দুঃখ সংগ্রাম ও আরো অনেক বিকৃতির জন্ম দিচ্ছে। এই বোধ থেকে নিষ্কৃতি পেলেই সব দ্বন্দ্বের অবসান হয়, দুঃখ বলে কিছুর অস্তিত্ব থাকে না। কাজেই এই পৃথক আমি-বোধ ত্যাগ করতে হবে। যখন কেউ একটি ক্ষুদ্র কীটের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়, বুঝতে হবে সে তখন অদ্বৈতবাদীর কাম্য পূর্ণত্বে পৌঁচেছে। যে মুহূর্তে সে এভাবে

প্রস্তুত হয় সেই মুহূর্তে তার সামনে থেকে মায়ার আবরণ সরে যায়, সে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করে। এই জীবনেই সে অনুভব করে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সে এক। কিন্তু যতক্ষণ দেহের কর্ম—প্রারব্ধ থাকে ততক্ষণ দেহাবরণ থেকে তার নিষ্কৃতি নেই।

তারপর স্বামীজিকে স্নাতকেরা প্রশ্ন করতে শুরু করল।

'মায়া বা অজ্ঞান আছে কেন?'

কার্যকারণের সীমার বাইরে 'কেন' এই প্রশ্ন অচল। মায়ার ভিতরেই কোনো বস্তু সম্বন্ধে 'কেন' জিজ্ঞেস করা চলে। সুতরাং আমাদের উত্তর দেবার অধিকার নেই।

আবার প্রশ্ন হল: সগুণ ঈশ্বর কি মায়ার অন্তর্গত?

স্বামীজি উত্তর দিলেন হ্যাঁ, এই সগুণ ঈশ্বর মায়ার মধ্য দিয়ে দেখা নির্গুণ ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নয়। মায়া বা প্রকৃতির অধীন হলে সেই নির্গুণ ব্রহ্মকে জীবাত্মা বলে এবং মায়াধীশ বা প্রকৃতির নিয়ন্তারূপে সেই নির্গুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম। আমরা যা কিছু দেখছি সব কিছুই সেই নির্গুণ ব্রহ্মসত্তারই বিভিন্ন রূপমাত্র, সুতরাং সেই হিসেবে তারাও সত্য।

সেই পূর্ণ নিরপেক্ষ সত্যকে জানবার উপায় কী?

দুই উপায়—একটি ইতিবাচক প্রবৃত্তিমার্গ, একটি নেতিবাচক নিবৃত্তিমার্গ। প্রথমটি প্রেমের পথ—এপথে প্রেমের পরিধি যদি অনন্তগুণ বাড়িয়ে দেওয়া যায় তবে আমরা এই সর্বজনীন প্রেমের জগতে উত্তীর্ণ হই। অপরটি জ্ঞানের পথ - অর্থাৎ নেতি, নেতি, এ নয় এ নয়—এই সাধনায় মনের বহির্মুখীতা নিবারণ করতে হয়। পরিশেষে মনের যখন মৃত্যু হয় তখন সত্য স্বয়ং প্রকাশিত হয়ে ওঠে। সেই অবস্থাকে আমরা সমাধি বা জ্ঞানাতীত অবস্থা বা পূর্ণ জ্ঞানের অবস্থা বলে থাকি।

আপনি যে অদ্বৈত অবস্থার কথা বলেন তা কি কেবল আদর্শমাত্র, না, কেউ সত্যি ঐ অবস্থা লাভ করেছেন?

আমরা বলি ঐ অবস্থা প্রত্যক্ষের বস্তু। উপলব্ধির বিষয়। যদি তা শুধু কথার কথা হত তবে তো তা অসার, অনর্থক। ঐ তত্ত্ব উপলব্ধি করবার জন্যে তিনটি উপায়ের কথা বেদে বলা আছে—শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন। এই আত্মতত্ত্ব প্রথম শুনতে হবে, পরে বিচার করে বিশ্বাস করতে হবে, শেষে আত্মস্বরূপের ধ্যানে নিযুক্ত হতে হবে। তখন সাক্ষাৎ উপলব্ধি হবে। এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই যথার্থ ধর্ম। শুধু বিশ্বাস করা ধর্মের অঙ্গ নয়। আমরা বলি এই সমাধি বা জ্ঞানাতীত অবস্থাই ধর্ম।

আপনি যদি এই সমাধি-অবস্থা লাভ করেন, তা হলে কি তার সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলতে পারবেন?

না। সমাধি-অবস্থা বা পূর্ণ জ্ঞানভূমি লাভ হলে সাধকের জীবনের ফলাফলেই তা বোঝা যায়। যে মূর্খ, নিদ্রাভঙ্গের পরেও সে মূর্খ থাকে। কিন্তু কেউ সমাধিস্থ হলে সমাধি-ভঙ্গের পর সে একজন তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ হয়ে দাঁড়ায়।

আচ্ছা ঐ সমাধি কি একরকম সেলফ-হিপনটিজম বা আত্মসম্মোহন নয়?

না, আত্মসম্মোহ-দূরীকরণ। আপনারা তো সম্মোহিত আছেনই, এই সম্মোহিত ভাবকে দূরে করতে হবে, বিগতমোহ, ডি-হিপনটাইজড হতে হবে। 'ন তত্র সূর্যোভাতি, ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।' যেখানে সূর্যও প্রকাশিত নয়, নয় বা চন্দ্র-তারা, নয় বা

বিদ্যুৎ, সামান্য অগ্নির কথা কী বলব! তিনি প্রকাশিত হলেই সমস্ত প্রকাশিত। এ তো সম্মোহন নয়, এ মোহ-দূরীকরণ এ মোহ-নিরাকরণ। অন্য সব ধর্মই এই প্রপঞ্চের সত্যতা শিক্ষা দেয়, অতএব তারাই একরকম সম্মোহন প্রয়োগ করছে। কেবল অদ্বৈত-বাদীই সম্মোহিত হতে অসম্মত। তারা দেখছে, বুঝছে, দ্বৈতবাদ থেকেই সম্মোহন এসে থাকে। অদ্বৈতবাদী বলছে, বেদ ছুঁড়ে ফেলে দাও, সগুণ ঈশ্বরকে ছুঁড়ে ফেলে দাও, জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তোমার নিজের দেহ-মনকেও ছুঁড়ে ফেলে দাও—কিছুই যেন না থাকে, তবেই তুমি সম্পূর্ণ মোহমুক্ত। 'যতোবাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।' মন আর বাক্য যেখান থেকে তাকে না পেয়ে ফিরে আসে সেই ব্রহ্মের আনন্দকে জানলে আর কোনো ভয় থাকে না। এই তো মোহ-মোচন। 'ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ। অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম। আমার পুণ্য নেই পাপ নেই সুখ নেই দুঃখ নেই, আমার মন্ত্র তীর্থ বেদ বা যজ্ঞ কিছু নেই। আমি ভোক্তাও নই, ভোজ্যও নই, আমি শুধু ভোজন। আমিই চিদানন্দরূপ শিব, আমিই শিব। এ সম্মোহন নয়, এ সম্মোহনের অতিক্রমণ।

আবার প্রশ্ন হল: আপনারা 'অ্যাস্ট্রেল বডি' কাকে বলেন?

স্বামীজি উত্তর দিলেন: আমরা একে লিঙ্গশরীর বলে থাকি। যখন এই দেহের পতন হয় তখন অপর দেহ পরিগ্রহ কী ভাবে হয়? শক্তি কখনো জড়পদার্থ ছাড়া থাকতে পারে না। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই, দেহত্যাগের পর সূক্ষ্মভূতের কিয়দংশ আমাদের মধ্যে থেকে যায়। অভ্যন্তরবর্তী ইন্দ্রিয়গুলি ঐ সূক্ষ্মভূতের সাহায্য নিয়ে আরেকটি দেহ গঠন করে—মনই শরীরের নির্মাণকর্তা। যদি আমি সাধু হই আমার মস্তিষ্ক সাধুর মস্তিষ্কে পরিণত হবে। আর যোগীরা বলেন এই জীবনেই তাঁরা নিজ দেহকে দেবদেহে পরিণত করতে পারেন।

হ্যাঁ, যোগশক্তির কথা বলুন, যোগশক্তিতে কি অলৌকিক কিছু দেখানো সম্ভব?

স্বামীজি বললেন, রাশি রাশি মতবাদের চেয়ে সামান্য একটু অভ্যাসের মূল্য অনেক বেশি। সুতরাং আমি নিজে এটা-ওটা হতে দেখিনি বলে সেগুলি মিথ্যে, এ বলবার আমার অধিকার নেই। যোগীদের গ্রন্থে আছে অভ্যাসের দ্বারা নানা প্রকার বিস্ময়কর ফল পাওয়া যায়। নিয়মিত অভ্যাসে অল্পকালের মধ্যেই অল্পস্বল্প ফল মেলে—তা থেকেই বোঝা যায় এ ব্যাপারে কোনো ভণ্ডামি নেই। অলৌকিক যা বলছেন যোগীরা তা বৈজ্ঞানিক ভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। ভারতে আজ পর্যন্ত অনেক অদ্ভুত ব্যাপার সাধিত হয়ে থাকে কিন্তু তাদের কোনোটাই অপ্রাকৃত শক্তির দ্বারা হয় না। মনের শক্তি দ্বারা যেসব ব্যাপার সাধিত হতে পারে বলে যোগীরা দাবি করেন তাদের মধ্যে নিম্নতর কতগুলি বিষয় আমি দেখেছি, তাই বলে উচ্চতর বিষয়গুলি যে হতে পারে না এ বলবার আমার অধিকার নেই।

একটা দৃষ্টান্ত দিন না।

যোগীর আদর্শ সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তার গুণে শাশ্বত শান্তি ও প্রেমের অধিকারী হওয়া। আমি একজন যোগীকে জানি, নাম পওহারী বাবা। তাঁকে একদিন একটা গোখরো সাপে কামড়েছিল, দংশনমাত্র তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন, সন্ধ্যার সময় তাঁর জ্ঞান আবার ফিরে এল! তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, কী হয়েছিল? তিনি বললেন, আমার প্রিয়তমের কাছ থেকে এক দূত এসেছিল। সর্বভূতে ও সর্ববিষয়ে ঈশ্বরত্ব দেখাই

যোগদৃষ্টি। এই যোগীর ঘৃণা ও হিংসা ক্রোধ ও অহংকার সমস্ত দগ্ধ হয়ে গিয়েছে, কিছুতেই তাঁকে আর প্রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করতে পারে না। তিনি অনন্ত প্রেমস্বরূপ হয়ে রয়েছেন, প্রেমের শক্তিতেই তিনি সর্বশক্তিমান। এইরূপ ব্যক্তিই যথার্থ যোগী। এই সব অলৌকিক শক্তির প্রকাশ গৌণমাত্র—যোগীর ওসবে লক্ষ্য নেই আকর্ষণ নেই। যোগীরা বলেন, যোগী ছাড়া, আর সকলেই দাসবৎ—খাদ্যের দাস, বায়ুর দাস, স্ত্রীর দাস, সন্তানের দাস, টাকার দাস, নামযশের দাস—হাজার রকমের দাসত্ববন্ধন। যে লোক এসব কোনো বন্ধনে আবদ্ধ নয় সেই যথার্থ মানুষ, সেই যথার্থ যোগী। 'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।' তাঁরা এখানেই সংসারকে জয় করেছেন, যাঁদের মন সমতায় অবস্থিত। যেহেতু ব্রহ্ম নির্দোষ ও সমভাবাপন্ন সেই হেতু তাঁরা ব্রহ্মে অবস্থিত।

আবার প্রশ্ন : কয়েকজন জার্মান দার্শনিকের মত—ভারতের ভক্তিবাদ খুব সম্ভব পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফল।

স্বামীজি বললেন, আমি তা মানতে প্রস্তুত নই। ভারতীয় ভক্তি পাশ্চাত্ত্য ভক্তির মতো নয়। ভক্তি সম্বন্ধে আমাদের মুখ্য ধারণা যে এতে বিন্দুমাত্র ভয়ের ভাব নেই, কেবল ভগবানকে ভালোবাসা। ভয়ে উপাসনা হয় না, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একমাত্র ভালোবাসায়ই উপাসনা সম্ভব। ভক্তির কথা অতি প্রাচীন উপনিষদেও আছে। উপনিষদ বাইবেলের চেয়ে অনেক প্রাচীন। সংহিতার মধ্যেও ভক্তির বীজ পাওয়া যাবে। ভক্তি শব্দও পাশ্চাত্ত্য নয়। বেদমন্ত্রে উল্লিখিত শ্রদ্ধা শব্দ থেকেই ক্রমশ ভক্তিবাদের উদ্ভব হয়েছিল।

কিন্তু যাই বলুন, 'বাগবৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্'-এ কিছু হবে না। অর্থাৎ অনর্গল বাক্যযোজনা বা শাস্ত্রব্যাখ্যা করবার বিচিত্র কৌশল—এ সব শুধু পণ্ডিতদের আমোদের জন্যে, এ সবে মুক্তিলাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। বেদান্তের শ্রবণে-পঠনেও কিছু হবে না, আমি বেদান্তপ্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্বকে প্রত্যক্ষ অনুভব করতে চাই। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ছাড়া কিছুতেই আমার মুক্তি নেই।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগণ্য পণ্ডিত রেভারেন্ড এভারেট স্বামীজির বক্তৃতা শুনে লিখলে : আমরা পাশ্চাত্ত্যবাসীরা বহুত্বকে নিয়ে ব্যাপৃত। কিন্তু যে একত্বের উপর বহুত্ব প্রতিষ্ঠিত তাকে বুঝতে না পারলে বহুত্বের কোনো বোধই জাগতে পারে না। অদ্বৈত যে একটা বাস্তব সত্য তা প্রাচ্যজগৎ আমাদের শেখাতে পারে এবং বিবেকানন্দ যে আমাদের তাই যথার্থ ভাবে শিখিয়েছেন তার জন্যে তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা অন্তহীন।

বস্টনেও সার্বভৌম ধর্মের আদর্শ নিয়ে বক্তৃতা দিলেন স্বামীজি। দেশ কাল পাত্র রুচি ও প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষের বিচিত্র ধর্মাচরণ হোক, কিন্তু তার মূল ভিত্তি হবে অদ্বৈত। আমিও সেই, তুমিও সেই—আমরা সকলেই বিশ্বসত্তার সঙ্গে এক ও অভিন্ন—এই সাম্যবোধই প্রকৃত মিলনভূমি। যত জীবদেহ আছে সব আমারই দেহ, তাই কাউকে আঘাত করার অর্থ আমার নিজেকেই আঘাত করা, কাউকে ভালোবাসার অর্থ আমার নিজেকেই ভালোবাসা। আমার অন্তর থেকে বিদ্বেষবিষ বাইরে বেরিয়ে আর-কাউকে আঘাত না করলেও আমাকেই শেষ পর্যন্ত আঘাত করবে—তেমনি আমার অন্তর থেকে ভালোবাসা বেরিয়ে এলে আর কেউ তা গ্রহণ না করলেও আমিই আবার তা ফিরে পাব।

কেননা আমিই বিশ্ব, সমগ্র বিশ্ব আমারই আয়তন। আমি যে অসীম, সম্প্রতি আমার সে অনুভূতি নেই। এই অসীমতার অনুভূতির জন্যেই সাধনা আর যখন আমার মধ্যে সেই অসীমতার পূর্ণ চেতনা জাগ্রত হবে তখনই আমি সিদ্ধ, আমি সম্পূর্ণ।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় স্বামীজিকে প্রাচ্য দর্শনের অধ্যাপকের পদ দিতে চাইল। বললে, আপনি আমাদের মধ্যে থাকুন, জীবন্ত বেদান্ত হয়ে।

স্বামীজি বললেন, 'আমি সন্ন্যাসী। আমার জন্যে কোনো চাকরি নয়, পদসম্পদ নয়।'

বস্টন ট্রান্সক্রিপট লিখল: স্বামীজি প্রমাণ করেছেন, ধর্ম শুধু কথার কথা বা কতগুলো সুন্দর ভাবমাত্র নয়। জীবনের প্রত্যেক কাজে সে ভাব প্রস্ফুট করতে পারলেই সত্যিকার ধর্মলাভ। বেদান্ত-ধর্মে এ জীবনেই মানুষের দেবত্বলাভ সম্ভব।

মূর্তিমান বেদান্ত শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কী লিখছেন স্বামীজি? লিখছেন শশী-মহারাজকে: বেদবেদান্ত আর আর-সব অবতার যা কিছু করে গেছেন, তিনি একলা নিজের জীবনে তা করে দেখিয়ে গেলেন। তাঁর জীবন না বুঝলে বেদবেদান্ত অবতার প্রভৃতি বোঝা যায় না—কেননা, হি ওজ দি এক্সপ্লেনেশান—তিনিই ব্যাখ্যাস্বরূপ ছিলেন। তিনি যেদিন জন্মেছেন সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ-ভেদ, ধনী-নির্ধন-ভেদ, পণ্ডিত-মূর্খ-ভেদ ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-ভেদ সব তিনি দূর করে দিয়ে গেলেন। আর তিনি বিবাদভঞ্জন—হিন্দু-মুসলমান-ভেদ খৃশ্চান-হিন্দু-ভেদ ইত্যাদি সব চলে গেল। ঐ যে ভেদাভেদে লড়াই ছিল, তা অন্যযুগের—এ সত্যযুগে তাঁর প্রেমের বন্যায় সব একাকার। এই ভাবগুলো বিস্তার করে লেখা দরকার। যে তাঁর পূজা করবে সে অতি নীচ হলেও মুহূর্তমধ্যে অতি মহান হবে—মেয়ে বা পুরুষ যেই হোক। আর এবারে মাতৃভাব—তিনি মেয়ে সেজে থাকতেন—তিনি যেন আমাদের মা—তেমনি সকল মেয়েকে মার ছায়া বলে দেখতে হবে। ভারতে দুই মহাপাপ—মেয়েদের পায়ে দলানো আর জাতি-জাতি করে গরিবগুলোকে পিষে ফেলা। তিনিই স্ত্রী জাতির উদ্ধারকর্তা, জনসাধারণের উদ্ধারকর্তা, উচ্চ-নীচ সকলের উদ্ধারকর্তা।

নিউইয়র্কে ফিরে এলেন স্বামীজি। বেদান্ত প্রচারের জন্যে 'নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি' নামে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। না, কোনো বিশেষ ধর্মমত পোষণ করা নয়, সকল ধর্মমতেই বেদান্তভাব উপলব্ধি করবার পথ দেখানোর জন্যেই এই প্রতিষ্ঠান। ফ্রান্সিস লেগেট সমিতির সভাপতি হল। ক্লাবের ব্যবস্থা করবে গায়িকা এমা থার্সবি আর তার বন্ধু মেরি ফিলিপস। কোষাধ্যক্ষ ওয়াল্টার গুডইয়ার।

এবার কাজের ভিত্তি দৃঢ়ীকৃত হল। স্বামীজি নিশ্চিন্ত হলেন। পূবে-পশ্চিমে সর্বত্র বেদান্ত জীবন্ত হয়ে উঠুক। বেদান্তই তো মহত্তম মানবতা।

এখন আবার লণ্ডনের দিকে পাড়ি জমাই।

কিন্তু তার আগে আরেকবার শিকাগো ঘুরে আসি। দেখে আসি হেল-পরিবারকে।

মিসেস জর্জ হেল ও তাঁর স্বামী দুজনেই ধর্মপ্রাণ। স্বামীজি মিস্টার হেলকে ডাকেন ফাদার পোপ বলে ও মিসেস হেলের নাম রেখেছেন মাদার চার্চ।

আর এই মাদার চার্চই নিরাশ্রয় বিবেকানন্দকে স্নেহে ও সেবায় তৃপ্ত করে ধর্ম-মহাসভার আফিসে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

হেল-এর দুই মেয়ে হ্যারিয়েট হেল আর মেরি হেল আর দুই ভাগ্নী হ্যারিয়েট ম্যাককিন্ডলি আর ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলি। এই চারজনই ছিল স্বামীজির চার বোন।

ইসাবেলকে চিঠি লিখছেন স্বামীজি: সেদিন ওয়ালডর্ফের বক্তৃতায় সত্তর ডলার পেয়েছি। আগামী কালের বক্তৃতা থেকেও কিছু পাবার আশা আছে। বস্টনেও বক্তৃতা আছে কিন্তু সেখানে পয়সা খুবই কম দেয়। গতকাল তেরো ডলার দিয়ে একটা পাইপ কিনেছি—দোহাই, ফাদার পোপকে যেন বোলো না। কোটের খরচ পড়বে প্রায় ত্রিশ ডলার। সময় মোটের উপর চমৎকার কাটছে, শুধু ঐ জঘন্য, অতি জঘন্য বিরক্তিকর বক্তৃতা ছাড়া। শিকাগোয় পাওয়া যায় না অথচ নিউইয়র্কে বা বস্টনে পাওয়া যায় এমন কোনো জিনিসের যদি তোমার দরকার থাকে, তাড়াতাড়ি লিখো। আমার এখন পকেট-ভর্তি ডলার। যা তুমি চাইবে পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেব। এতে অশোভন কিছু হবে এমন মনেও কোরো না। আমার কাছে বুজরুকি নেই। আমি যদি তোমার ভাই হই তো ভাইই। পৃথিবীতে একটা জিনিস আমি ঘৃণা করি—বুজরুকি।

আত্মীয়তার সস্নেহ সুর ভরানো চিঠি। এ যেন সেই বক্তৃমঞ্চের সুদূর গম্ভীর স্বামীজি নয়, এ যেন নিজেদের বাড়ির লোক। একেবারে আপনজন।

হেলদের কথা ব্রহ্মানন্দকে লিখছেন স্বামীজি:

ঐ যে ডবলিউ হেলের ঠিকানায় চিঠি দাও, তাদের কথা কিছু বলি। সে আর তার স্ত্রী, বুড়ো বুড়ি। আর দুই মেয়ে, দুই বোনঝি, এক ছেলে। ছেলে রোজগার করতে দোসরা জায়গায় থাকে। এদের দেশে মেয়ের সম্বন্ধই সম্বন্ধ। ছেলে বে করে পর হয়ে যায়, মেয়ের স্বামী ঘন-ঘন স্ত্রীর বাপের বাড়ি আসে। এরা বলে, পুত্রের যতদিন না বে হয় ততদিনই সে পুত্র—কন্যা চিরদিনই কন্যা।

চারজনই যুবতী বে-থা করেনি। বে হওয়া এদেশে বড় হ্যাংগাম। প্রথম, মনের মত বর চাই। দ্বিতীয়, পয়সা চাই। ছোঁড়া বেটারা ইয়ার্কি দিতে বড়ই মজবুত—ধরা দেবার বেলায় পগার পার। ছুঁড়িরা নেচে কুঁদে একটা স্বামী যোগাড় করবার চেষ্টা করে, ছোঁড়া বেটারা ফাঁদে পা দিতে বড়ই নারাজ। এই রকম করতে-করতে একটা 'লভ' হয়ে পড়ে, তখন সাদি হয়। এই হল সাধারণ—তবে হেলের মেয়েরা রূপসী, বড় মানুষের ঝি, ইউনিভার্সিটি গার্ল, নাচতে গাইতে পিয়ানো বাজাতে অদ্বিতীয়া—অনেক ছোঁড়া ফ্যা-ফ্যা করে—তাদের বড় পসন্দয় আসে না—তারা বোধ হয় বে-থা করবে না—তার উপর আমার সংস্রবে ঘোর বৈরিগ্যি উপস্থিত। তারা এখন ব্রহ্ম-চিন্তায় ব্যস্ত।

মেয়ে দুটির চুল সোনালি, অর্থাৎ ব্লণ্ড আর বোনঝি দুটির চুল ব্রুনেট, অর্থাৎ কালো চুল। জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডী-পাঠ এরা সব জানে। বোনঝিদের তত পয়সা নেই—

তারা একটা কিণ্ডারগার্টেন স্কুল করে—মেয়েরা আমাকে দাদা বলে, আমি তাদের মাকে মা বলি। আমার মালপত্র সব তাদের বাড়িতে—আমি যেখানেই কেন যাই না, তারাই সব ঠিকানা করে।

আবার লিখছেন ব্রহ্মানন্দকে :

এরা হল পৃথিবীর মধ্যে ধনী দেশ—টাকা খোলামকুচির মত খরচ হয়ে যায়। আমি কদাচ হোটেলে থাকি। আমি প্রায়ই এদের বড়-বড় লোকের অতিথি—আমি এদের কাছে একজন নামজাদা মানুষ এখন। মুলুকশুদ্ধ লোকে আমায় জানে, সুতরাং যেখানে যাই, আগ বাড়িয়ে আমাকে ঘরে তোলে। মিস্টার হেল, যাঁর বাড়িতে শিকাগোয় আমার সেন্টার, তাঁর স্ত্রীকে আমি মা বলি আর তাঁর মেয়েরা আমাকে দাদা বলে। আরে ভাই, তা নইলে কি এদের উপর ভগবানের এত কৃপা? কি দয়া এদের! যদি খবর পেলে যে একজন গরিব কোন জায়গায় কষ্টে রয়েছে মেয়েমদ্দে চলল—তাকে খাবার দিতে, কাপড় দিতে, কাজ জুটিয়ে দিতে। আর আমরা—আমরা কী করি!

'কী কারণে হিন্দুজাতি তার অদ্ভুত বুদ্ধি ও অন্যান্য গুণাবলী সত্ত্বেও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল?' জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারী দাস দেশাইকে লিখছেন স্বামীজি : 'আমি বলি হিংসা। এই দুর্ভাগ্য হিন্দুজাতি পরস্পরের প্রতি যেরূপ জঘন্যভাবে ঈর্ষান্বিত ও পরস্পরের যশখ্যাতিতে যে ভাবে হিংসাপরায়ণ তা কোনো কালে কোনো-খানে দেখা যায়নি। যদি আপনি কখনো এদেশে আসেন তবে সর্বত্র এই হিংসার অভাবই সর্বপ্রথম আপনার নজরে পড়বে।

ভারতবর্ষে তিনজন লোকও পাঁচ মিনিটকাল একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে পারে না। প্রত্যেকেই ক্ষমতার জন্যে কলহ করতে সুরু করে—ফলে সমস্ত প্রতিষ্ঠানটিই ভেঙে যায়। হায় ভগবান, কবে আমাদের হিংসা না করবার শিক্ষা হবে?

এই মহাসমুদ্রের সর্বব্যাপী বদ্ধতার মধ্যে যে কয়েকটি মহাপ্রাণ মনীষী প্রস্তরস্তূপের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আপনি তাঁদের অন্যতম। ভগবান আপনাকে নিরন্তর আশীর্বাদ করুন।'

পাদ্রী আর পুরোহিতেরা স্বামীজির উপর খেপে আছে কিন্তু ঈশ্বর তো শুধু পাদ্রী পুরোহিতেরই নয়, ঈশ্বর সকলের ঈশ্বর স্বামীজির।

মেমফিস-এর ধর্মযাজক সালিভান গির্জায় ভাষণ দিল, ধর্মমহাসভা একটা প্রকাণ্ড ভাঁওতা আর ঐ হিন্দু সন্ন্যাসী বুজরুক। বলে কিনা মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম আছে। মানুষ মরে পশুপক্ষী হবে। তাই যদি হয়, তবে মানুষ না হয়ে শূন্যে বিলীন হওয়া ভালো।

যেমন কর্ম তেমন ফল তো হবেই। কোনো কোনো পাদ্রী অসদাচারণের জন্যে পশু-পক্ষী হবে তা আর বিচিত্র কী। পুনর্জন্মবাদই একমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশ্বাস্য ব্যবস্থা। কারণ ছাড়া কার্য হয় না। জগৎ শূন্য হতে আসেনি। দুর্ঘটনায় এমন সৃষ্টি হয় না, এত শ্রী এত সুষমা এত সামঞ্জস্য। মানুষের বর্তমান জন্ম পূর্বজন্মেরই রচনা, পূর্ব-জন্মেরই পরিণাম। পুনর্জন্মবাদের সৌন্দর্য এই যে এ বলে, যা হয়ে গিয়েছে তার জন্যে আফশোস করে লাভ নেই, প্রতিমুহূর্তে শুভকর্ম করার যে সুযোগ আসে তারই সদ্ব্যবহার করো। পুনর্জন্মবাদ পিছু হটার নির্দেশ নয়, চিরন্তন সামনে এগিয়ে চলার নির্দেশ।

মিনিয়াপোলিস থেকে মেমফিসে আসছেন স্বামীজি, ট্রেনে একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কোথাকার লোক?'

'ভারতবর্ষের।'

'আপনার ধর্ম কী?'

'হিন্দু।'

'তাহলে আর কথা নেই, আপনি নরকে যাবেন।'

লোকটি রুক্ষ স্বভাবের গোঁড়া খৃস্টান, প্রায় মুখিয়ে উঠল। কিন্তু স্বামীজি শান্ত থাকলেন। তাকে বুঝিয়ে দিলেন পুনর্জন্মবাদের যৌক্তিকতা। যদি ভালো করো তো ভালো হবে, মন্দ করো তো দুঃখ পাবে। এ তো সোজা কথা, প্রায় গণিতের হিসেব। আর কিছু না হোক এ বিশ্বাস শুভ প্রবৃত্তির প্রবোচক। কাজ একবার করে ফেললে আর তো তাকে ফেরানো যায় না। আহা যদি একটু বুঝেসুঝে কাজটা করতে পারতাম, কত ভালো হত। অনুতাপ করবার সময় নেই। তোমার হাতের কাছে এখনো অফুরন্ত কাজ। অফুরন্ত সুযোগ। সুযোগগুলো নতুন করে কাজে লাগাও। এমনি করে তোমার ক্রমোন্নতির পথে নিরন্তর যাত্রা করো।

'হ্যাঁ, আমারও তাই বিশ্বাস।' গোঁড়া খৃস্টান সহসা নরম হয়ে গেল। বললে, 'জানেন আমার ছোট বোন এক দিন আমার পোশাক পরে হাজির, বললে, আমি আগে এমনি পুরুষ ছিলাম। হ্যাঁ, আত্মারও এমনি অন্য শরীর অবলম্বন করে নতুন করে প্রকাশিত হওয়া।'

'হ্যাঁ, তাই', স্বামীজি সমর্থন করলেন: যেমনি শৈশব কৌমার্য যৌবন ও বার্ধক্য তেমনি দেহান্তরপ্রাপ্তি। শুধু দেখ একটি যেন ভালো বাসা পাই, একটি মহত্তর দেহ। তারই জন্য ভালো কাজের প্রেরণা।

আমেরিকার সব মেয়েই মেরি আর ইসাবেল নয়। ডেট্রয়টে মিসেস ব্যাগলি স্বামীজিকে সংবর্ধনা করবার জন্যে যে প্রীতিসম্মিলনের আয়োজন করেছিলেন তাতে হঠাৎ বেসুর বেজে উঠল। নির্লজ্জ ঝড়ের মত একটি মহিলা সে সভায় ঢুকে নিষ্ঠুর রূঢ় কণ্ঠে স্বামীজিকে নিন্দা করতে সুরু করল। কী অপরাধ স্বামীজির? স্বামীজি নাকি খৃস্টধর্মের নিন্দা করেছেন।

মিশিগনের প্রাক্তন গভর্নর জন ব্যাগলির স্ত্রী মিসেস ব্যাগলি শুধু ধনী অভিজাত-বংশীয়াই নয়, শুধু সুন্দরী বা সুশিক্ষিতাই নয়, সে আধ্যাত্মিকতার অনুরাগিণী। ধর্মমহাসভায় স্বামীজির সংগে তার পরিচয়। সে-ই উদ্যোগ করে স্বামীজিকে ডেকে এনেছে, এনেছে একেবারে তার ঘরের অতিথি করে। সবাইকে দেখাবে শোনাবে, এই জন্মেই জন্মান্তর ঘটিয়ে দেবে।

ডেট্রয়টে স্টেশনে ট্রেন থেকে যখন নামলেন স্বামীজি, তখন তুষারঝঞ্ঝা চলেছে। স্বামীজির জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা—এই বরফের ঝড়। স্বামীজির মতে অভিজ্ঞতাই তো জীবন, অভিজ্ঞতাই তো জীবনকে সম্মুখ করে, উত্থানের পথ দেখায়। অভিজ্ঞতাই তো জীবনের উপর নিয়তির আঘাত। তাই যত আঘাত তত দৃঢ়তা। যত দুঃখ তত মহত্ত্ব।

কে জানে এই ঝড় তাঁর ডেট্রয়েট-জীবনের পূর্বাভাস কিনা। কিন্তু স্বামীজির চেয়ে আর কে বেশি জানে যে সমস্ত ঝড়ের গভীরে এক মহামৌন নিশ্চল শান্তিতে বিরাজ করছে। স্বামীজির জীবনে সেই অচাঞ্চল্যের উপাসনা।

ওয়াশিংটন এভিনিয়ুতে ব্যাগলিদের বাড়িতে সে কী বিরাট প্রীতিভোজের আয়োজন!

শহরের সমস্ত গণ্যমান্যের সমাবেশ হয়েছে—বিশপ মেয়র আইনজীবী ব্যবসায়ী অধ্যাপক ধর্মযাজক—সমাজের শিরোমণিরা কেউই বাদ পড়েনি। তারা যত না খেতে বা মিলতে এসেছে, তার চেয়ে বেশি এসেছে হিন্দু সন্ন্যাসীকে দেখতে ও তার কথা শুনতে। কী আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে স্বামীজিকে, তাঁর কমলারঙের আলখাল্লায় আর গেরুয়া রঙের পাগড়িতে ! সৌন্দর্য শুধু পোশাকে নয়, সৌন্দর্য চোখে মুখে সর্বাঙ্গে আর স্নেহস্নাত হাসিতে ! চালচলন মহত্ত্বব্যঞ্জক। সকলের সঙ্গে কী সহজ সৌহার্দ্যে কথা বলছেন। নিখুঁত পরিচ্ছন্ন ইংরিজিতে। কে তাঁকে এ ভাষা শেখাল ? কে বলবে যিনি এ ভাষায় কথা বলছেন বা আনুষ্ঠানিক ভাবে বক্তৃতা দিচ্ছেন তিনি একজন বিদেশী !

স্বামীজির ঠিক পাশেই বসেছে মিসেস ব্যাগলি, মুখে ম্যাডোনার প্রশান্তি, আধ্যাত্মিকতার লাবণ্য। যেন স্বামীজিরই প্রদীপ্ত উপস্থিতির আভা পড়েছে তার মুখে-চোখে। স্বামীজি এবার বক্তৃতা দিতে উঠবেন, সমস্ত ঘর উৎসুক হয়ে রয়েছে—এমনি এক ধ্যানমগ্ন নিস্তব্ধ মুহূর্তে নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকে এক আমেরিকান মহিলা স্বামীজিকে গালাগাল দিতে সুরু করল। স্বামীজি চুপ করে রইলেন। নিন্দা অপবাদ-গঞ্জনা-লাঞ্ছনায় তাঁর ক্ষোভ নেই।

এ সম্পর্কে ডেট্রয়েট ফ্রি প্রেস পত্রিকা লিখছে :

'কী নিদারুণ লজ্জা, স্বামীজির মুখ খোলবার আগেই এক অভ্যাগতা মহিলা স্বামীজিকে আক্রমণ করে বক্তৃতা দিতে সুরু করল ! তোমার নিমন্ত্রণ হয়েছে বক্তৃতা শোনার, বক্তৃতা দেবার জন্যে নয়। শুনতে না চাও, চলে যাও, এসো না। কিন্তু এসে এ কী ব্যবহার ! এখনো কিছুই যে বলেনি তার উপর এ সভায় আক্রমণ চলে কী করে ?

এই বুঝি সভ্য দেশের রীতিনীতি ; আমরা আবার অন্যদেশের রীতিনীতির সমালোচনা করি !

স্বামীজির বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি খৃস্টধর্মকে আক্রমণ করে কথা বলেন। এ অভিযোগ ভিত্তিহীন, তিনি যীশুর ধর্মকে কখনোই নিন্দা করেন না, বরং যীশুর প্রতি তাঁর চিত্তে অগাধ প্রেম, অমেয় শ্রদ্ধা—তিনি নিন্দা করেন তথাকথিত ধর্মধ্বজীদের ভণ্ডামিকে, তাদের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারকে, তাদের অসাধুতা, নিষ্ঠুরতা, অসহিষ্ণুতা ও স্বার্থপরতাকে। যীশু বলেছেন, যেমন নিজেকে ভালোবাসো তেমনি তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসো। সে কথায় কান না দিয়ে যারা প্রতিবেশীকে শোষণ করছে, দারিদ্র্যে-দুর্ভিক্ষে শৃঙ্খলিত করে রাখছে, সেই সব খৃস্টানদের নিন্দে করলে খৃস্টধর্ম অশুদ্ধ হয় না।'

'তা ছাড়া ব্যক্তিগত ভাবে বিবেকানন্দকে যে ব্যবহার দেখানো হয়েছে', লিখছে ফ্রি প্রেস, 'তা তাঁকে সংগতভাবেই তিক্ত সমালোচনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে। মনে করুন, শিকাগোতে ধর্মান্ধ মেয়ের দল কী ভাবে তাঁকে কটূক্তি করেছিল—ভাবুন আমেরিকান মেয়েরা ! তারপর এ শহরে প্রতি ডাকে তাঁর কাছে কী সব অবমাননাকর চিঠি আসছে ! তারপর আজকের প্রীতিভোজে এ অহেতুক দুরুক্তি ! তিনি আমাদের আইনকানুন সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকিবহাল নন বলে তাঁর লেকচার-টুরের টাকা আমরা বেমালুম মেরে দিচ্ছি। তিনি বলেই আমাদের এই হীনতা উপেক্ষা করতে পারছেন। আর ধর্মযাজকদের কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। তারা তো না শুনেই বিবেকানন্দকে নস্যাৎ করে

দিচ্ছে। কী অপূর্ব বিচার! কী বলল শুনলাম না, অথচ তার গায়ে পাঁক ছুঁড়ে মারলাম। আহা, যীশুর উপদেশ কী সুন্দর পালন করা হচ্ছে! বিচার কোরো না পাছে আর কেউ তোমার বিচার করে।'

'কিন্তু যে যাই বলুক, হে ভগবান, তুমি আমাদের মধ্যে আরো আরো বিবেকানন্দ পাঠাও যাতে অপরে আমাদের কী চোখে দেখে আমরা তা জানতে পারি। আমাদের প্রচারকেরা বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা বলে কিন্তু আমাদের প্রাচ্যদেশীয় ভাই যখন আমাদের কাছে আসে তখন আমরা তাকে শুধু নিন্দা দিয়েই অভ্যর্থনা জানাই। আমাদের সম্পর্কে বিবেকানন্দের যে ধারণা তার ব্যতিক্রম সম্ভব হবে কী করে?

কিন্তু, হে বিবেকানন্দ, আমাদের সকলকেই তুমি হৃদয়হীন ও সংকীর্ণচিত্ত মনে কোরো না। আমরা যারা সংস্কারমুক্ত মনে সেই নম্র ও স্নেহময় যীশুর বাণী গ্রহণ করেছি, তাঁরই বিশ্বপ্রেমের আহ্বানে তোমাকে ডাকছি আমাদের ভাই বলে, তোমার দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছি আমাদের বন্ধুত্বের হাত।'

স্বামীজিকে আশ্রয় দিয়েছে বলে মিসেস ব্যাগলিকেও কম গঞ্জনা সইতে হয়নি। তার ন বছর বয়সের নাতনিকে তো স্কুলের মেয়েরা মুখ ভেঙচায় – তাদের বাড়িতে কেন এক বিধর্মীকে জায়গা দিয়েছে। কিন্তু সমাজে ব্যাগলিদের প্রতিপত্তি এত বেশি ছিল যে সমস্ত অপভাষ ও অনাচার নিষ্ফল হয়ে গেল। তাছাড়া স্বামীজি নিজেই এসব ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন দৃপ্ত ব্যক্তিত্বে সমস্ত সংঘবদ্ধ শত্রুতা পরাস্ত হয়ে গেল। ক্রিস্টিন বলছে, 'এই দৈবশক্তিসম্পন্ন পুরুষসিংহ থেকে যে শক্তি নির্গত হয় তা এত প্রচণ্ড যে তার সংস্পর্শে আসতে শত্রুদলও সাহস পায় না। সে অগ্নিস্রোত যেন সবলকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। স্বামীজিকে শুনে সাধ্য নেই তুমি যেমনটি ছিলে ঠিক তেমনটিই থেকে যাও, অলক্ষ্যে তোমার মধ্যে পরিবর্তন ঘটে যাবে, জানতেও পারে না কখন গোপনে তোমার জীবনে আধ্যাত্মিকতার বীজ বপন করা হয়ে গিয়েছে, আর ক্রমেই তা বৃক্ষরূপে বাড়তে থাকবে যতক্ষণ না তা সুফলান্বিত হয়ে ওঠে।'

কিন্তু আর যাই করুন, ভারতনিন্দা সহ্য করতে পারেন না স্বামীজি। 'আপনাদের ধর্মযাজকদের বলুন', তাঁর ভাষণে বলছেন বিবেকানন্দ, 'যখন তারা আমাদের সমালোচনা করে, তারা যেন দয়া করে একথা মনে রাখে—যদি গোটা ভারত উঠে দাঁড়ায় আর ভারত মহাসাগরের নিচে যত কাদা আছে সব তুলে নিয়ে পাশ্চাত্য দেশগুলির দিকে ছুঁড়ে মারে তাহলে সামান্যতম প্রতিশোধও নেওয়া হবে না।'

পাদ্রীর দল সমানে বিষোদ্গার করতে লাগল। একজন বক্তৃতা দিল: 'বিবেকানন্দ বলছে, হে ভগবান, আমাদের দৈনিক রুটি দাও, এ প্রার্থনা স্বার্থপ্রণোদিত। কিন্তু হিন্দুরা তো প্রার্থনাই করে না, কারণ তাদের নির্গুণ ব্রহ্মের কান নেই।'

হাজার-হাজার নরনারী স্বামীজিকে মানছে, তাঁর কথায় অনুপ্রাণিত হচ্ছে, ধর্মের গোঁড়ামি বিসর্জন দিতে বসেছে, ঘৃণা ছেড়ে আসতে চাইছে মৈত্রীতে, পাদ্রীদের কাছে এ একেবারে মর্মশূলের মত। বর্বর পৌত্তলিক দেশ ভারতবর্ষ, তার প্রবক্তা কে এক সন্ন্যাসী, তার কথা শুনতে যেও না, তাকে বিদায় দিয়ে দাও—বিবেকানন্দ, বিদায়।

কিন্তু পাদ্রীদের সমস্ত আস্ফালন নিষ্ফল হতে চলল।

পাদ্রীদের বিরুদ্ধে খোদ আমেরিকানরাই কলম চালাল: 'একজন বিধর্মীকে খৃস্টান করতে হলে গড়ে বিশ হতে পঁচিশ হাজার ডলার খরচ পড়ে। কী অধার্মিক অপব্যয়!

আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কী উপায়ে এই বিপুল অর্থ সংগ্রহ করা হয়। ভারতে মদ বেচে, চীনে আফিং বেচে। অথচ ভারত মদ চায়নি, চীনও চায়নি আফিং। খৃস্টান ইংলন্ড কামান দেগে চীনে আফিং চালাল আর ভারতে মদ চালাল ব্যবসার বাজার বসিয়ে। স্বার্থহীন ধর্মপ্রাণ মিশনারি কোথায় ?'

'প্রকৃত ধার্মিক মিশনারির বিরুদ্ধে আমার কিছু বলবার নেই,' স্পষ্ট বলছেন স্বামীজি, 'কিন্তু তেমন ক জন ভারতে ধর্মপ্রচারে ব্রতী হয়েছে ? যারা গিয়েছে, গিয়েছে জীবিকার্জনের উদ্দেশ্যে। ক জনের ভারতের শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচয় আছে, ক জনের বা তা অধিগত ? শুধু দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে ধর্মান্তরিত করছে—এর মধ্যে কোথায় সাধুতা ? খৃস্টান হলে ভালো খেতে পাবে, পরতে পাবে, শুধু এই প্রলোভনে ধর্মান্তর তো একরকম ঠকবাজি। সকল ধর্মই মূলতঃ সত্য, তবে কেন এত ভালো-মন্দের হিসেব ? মিশনারিরা কি মনে করে জাতি হিসেবে সম্প্রদায় হিসেবে তারা উচ্চতর ? তারা যেন এ অহংকার না করে। ভগবানের সন্তানদের কোনো সম্প্রদায় নেই আর জাত বলতে পৃথিবীতে শুধু এক মানুষজাতই বর্তমান।'

ডেট্রয়েট থেকে ফের শিকাগোতে গেলেন স্বামীজি, ক দিন পর আবার ফিরলেন ডেট্রয়েটে। এবার মিস্টার পামারের অতিথি হলেন। লিখছেন হেল-বোনদের : 'আমি এখন পামারের অতিথি। চমৎকার লোক পামার। বয়েস ষাটের উপর। বুড়োদের নিয়ে একটা ক্লাব খুলেছে, নাম 'পুরোনো বন্ধুদের আড্ডা।' সেই আড্ডায় পড়ে এক রঙ্গালয়ে সেদিন বক্তৃতা দিলাম—ভাবতে পারো, টানা আড়াই ঘণ্টা। শুনে আমি তো আনন্দে আত্মহারা। এরা বক্তারা এমন নিশ্চল মনোযোগে শুনছে, বুঝতেই পারিনি এত দীর্ঘ সময় বলেছি। বক্তা যত তন্ময় হয়েই বলুক, শ্রোতা যদি চঞ্চল বা অমনোযোগী হয়, ঠিক সে তা বুঝতে পারে। কিন্তু জনতা সেদিন এমন মন্ত্রমুগ্ধ ছিল যে কোথাও একটাও শিথিলতার রেখা ফোটেনি।

কিন্তু কী হবে শুধু বক্তৃতা দিয়ে, নিরর্থক বাজে কাজে লিপ্ত থেকে ? বিরক্ত হয়ে উঠলেন স্বামীজি। ক দিন পরেই লিখছেন মেরী হেলকে : 'বক্তৃতা আর নানা অর্থহীন বাজে কাজে আমি একেবারে বিরক্ত হয়ে উঠেছি। বিচিত্র রকমের কতগুলো মানুষনামধারী জীব-জন্তুর সঙ্গে মিশে-মিশে অস্থির হয়ে পড়েছি। আমার মনের মত বিষয়টি কী জানো ? আসলে আমি লিখতেও পারি না, বক্তৃতা করতেও পারি না। আমি শুধু গভীরভাবে চিন্তা করতে পারি আর তার তাপে যখন উদ্দীপ্ত হই তখন বক্তৃতায় অগ্নিবর্ষণ করতে পারি—সে-বক্তৃতা অল্পসংখ্যক বাছাই-করা শ্রোতার সামনে হলেই ভালো হয়। তারপর তাদের যদি ইচ্ছা হয়, তারা আমার ভাবগুলি জগতে প্রচার করে বেড়াক—আমাকে ছুটি দিক।'

মানুষ যন্ত্র নয়, সে চিন্তা করতে পারে, এবং উচ্চতম চিন্তা, আধ্যাত্মিক চিন্তায়ও সে সুসমর্থ। চিন্তার জন্যেও স্বাধীনতার দরকার। হ্যাঁ, আধ্যাত্মিক চিন্তায়ও চাই দুর্নিবার স্বাধীনতা। মানুষ যে চিন্তায় যান্ত্রিক নয়, মানুষ যে চিন্তায়ও সর্বস্বাধীন এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাই ধর্মের সারকথা।

'যন্ত্রের স্তরে সব কিছুকে টেনে নামাবার এই প্রবৃত্তিই আজ প্রতীচ্যকে অপূর্ব সম্পদশালী করেছে সত্যি, কিন্তু এই আবার তার সমস্ত ধর্মচেষ্টাকে বিতাড়িত করেছে। যৎকিঞ্চিৎ যেটুকু বাকি আছে তাও পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে একটা নিষ্করুণ কসরৎ মাত্র।

আমি সত্যিই ঝঞ্ঝাময় বা তুফান-তোলা নই. বরং আমি তার বিপরীত। আমার যা কাম্য তা এখানে লক্ষ্য নয় আর ঐ 'ঝঞ্ঝাটে' আবহাওয়াও আমি আর সহ্য করতে পারছি না। বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে সময় স্বাস্থ্য ও শক্তির অপব্যয় করা আমার কাজ নয়। মুষ্টিমেয় কয়েকটি মহামানব তৈরি করাই আমার ব্রত।'

তারপর বিবেকানন্দের যা আসল স্বরূপ, বৈরাগ্যস্বরূপ, উচ্চারিত হয়ে উঠল। সেই একই চিঠিতে লিখলেন :

'হায়, যদি কয়েক বছরের জন্যে আমি নির্বাক হয়ে যেতে পারতাম, যদি একেবারেই কোনো কথা না বলতে হত! বস্তুতঃ, এই সব পার্থিব স্বপ্নের জন্যে আমি জন্মগ্রহণ করিনি। আমি স্বভাবতই কল্পনাপ্রবণ ও কর্মবিমুখ। আদর্শবাদী হয়েই আমি জন্মেছি আর বলতে গেলে আমি স্বপ্নরাজ্যেরই বাসিন্দে। জাগতিক বিষয় আমাকে উত্ত্যক্ত করে তোলে আর আমার দুঃখের কারণ হয়। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।'

একটা বক্তৃতা-কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল স্বামীজির—শহরে-শহরে ঘুরে-ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হবে আর বক্তৃতা-পিছু মিলবে মোটা অঙ্কের ডলার। কিন্তু এ কী বন্ধন : এ কী পুতুল-নাচ! তাঁর বক্তৃতা অর্থোপার্জনের কৌশল? কিন্তু অর্থ ছাড়া ভারতবর্ষে কাজ হবে কী করে? তবু বৈরাগ্যসিংহের গর্জন বন্ধ হবার নয়।

'বক্তৃতা কোম্পানির হলডেন আমাকে মিশিগানে বক্তৃতা দেবার জন্যে ঝোলাঝুলি করছে, এদিকে আমার ইচ্ছে নিউইয়র্কে যাই।' চিঠি লিখছেন স্বামীজি : 'সত্যি কথা বলতে কী, যতই আমি জনপ্রিয় হচ্ছি, আমার বাগ্মিতার উৎকর্ষ হচ্ছে, ততই আমার অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। এ সব অবান্তর বিষয় থেকে ভগবান আমাকে রক্ষা করুন।'

তারপর বক্তৃতা-কোম্পানি দস্তুরমত প্রতারণা করছে। তখন ডলারের দাম তিনটাকা—একটা একঘণ্টার বক্তৃতায় স্বামীজি একবার সাত হাজার পাঁচ শো টাকা রোজগার করলেন কিন্তু পাবার বেলায় পেলেন মোটে ছ শো। আলাসিঙ্গাকে লিখছেন : 'প্রবঞ্চক বক্তৃতা-কোম্পানি আমাকে ঠকিয়েছে, আমি তাদের সংস্রব ছেড়ে দিয়েছি।'

যে গুরুর কাছে দীক্ষা লাভ করে অজ্ঞানকে দূরীকৃত করেছে সেই মুনি কখনো রাজার প্রাসাদে, কখনো বা ধনীর অট্টালিকায়, পর্বতে বা নদীকূলে, বা তপঃক্লেশসহিষ্ণু জিতেন্দ্রিয় মুনির কুটিরে বাস করেও মোহপ্রাপ্ত হয় না।

যে গুরুর কাছে দীক্ষা লাভ করে অজ্ঞানকে দূরীকৃত করেছে সে পুত্তলিকা-হস্ত সহাস্য শিশুর সঙ্গেই খেলা করুক বা তারুণ্যালঙ্কৃত নববধূদের সঙ্গেই কৌতুক করুক, বা চিন্তাকুলিতহৃদয় বৃদ্ধের সঙ্গে বসেই বিলাপ করুক, সে মুনি কখনো মোহপ্রাপ্ত হয় না।

যে মৌনীর কাছে মৌনী, গুণবানের কাছে গুণবান, পণ্ডিতের কাছে পণ্ডিত, দীনের কাছে দীন, সুখীর কাছে সুখী, ভোগীর কাছে ভোগী, মূর্খের কাছে মূর্খ, যুবতীর কাছে যুবক বাগ্মীর কাছে বাগ্মী, অবধূতের কাছে অবধূত, সেই ত্রিভুবনবিজয়ীই ধন্য।

প্রথম লণ্ডন যাবার আগে নিউইয়র্কে ল্যাণ্ডসবার্গের যে বাড়িতে ছিলেন স্বামীজি, সেটা এক দরিদ্র পল্লীতে—তার কারণ শুধু অর্থেরই অভাব নয়, প্রচণ্ড বর্ণবিদ্বেষ। নিস লরা লেন, ভগিনী দেবমাতা লিখছেন : 'স্বামী বিবেকানন্দ এক নিদারুণ বর্ণবিদ্বেষের সম্মুখীন হয়েছেন, ফলে তাঁর বাসস্থান সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে উঠেছে। বাড়িওলারা

বলছে ব্যক্তিগত ভাবে স্বামীজির বিরুদ্ধে তাদের বিদ্বেষ নেই কিন্তু তাদের ভয় কোনো এশিয়াবাসীকে থাকতে জায়গা দিলে বাড়ির আর সব বাসিন্দারা ক্রুদ্ধ হবে, চাই কি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। তাই নিরুপায় হয়ে স্বামীজিকে একটা নিম্নস্তরের ঘর বেছে নিতে হল।'

তবু তাতেও ক্ষোভ নেই স্বামীজির। ওলি বুলকে লিখছেন: 'আমার বন্ধুরা সবাই ভেবেছিলেন একলা-একলা দরিদ্র পল্লীতে এভাবে থাকলে প্রচার কিছুই হবে না, কোনো ভদ্র মহিলাই সশ্রদ্ধ হয়ে আসবে না সেখানে। বিশেষত মিস হ্যামিলিন সিদ্ধান্ত করেছিলেন, যারা 'ঠিক লোক,' তারা কেউই দীনহীন কুটিরে এক নির্জনবাসীর কাছে উপদেশ শুনতে আসবে না, কিন্তু তিনি যাই সিদ্ধান্ত করুন সত্যিকার 'ঠিক লোক' ঠিক ঐ কুটিরে দিনরাত্রি আসতে লাগল, তিনিও আসতে লাগলেন।' তিন দিন পরে আবার লিখছেন ওলি বুলকে: 'এখন বেশ আরামে আছি। আমি আর ল্যান্ডসবার্গ দুজনে মিলে অল্প চাল-ডাল রাঁধি, চুপচাপ দুটিতে বসে খাই। তারপর হয়তো কিছু লিখি বা পড়ি, উপদেশপ্রার্থী দরিদ্রজন কেউ এলে আলাপ করি। এই ভাবে থেকে মনে হচ্ছে যেন খাঁটি সন্ন্যাসীজীবন যাপন করছি—আমেরিকায় এসে অবধি এরকমটি কখনো অনুভব করিনি।'

কিন্তু হঠাৎ বিপরীত ঘটল। ল্যান্ডসবার্গ, যে কিনা স্বামীজির ডান হাত, সংক্ষেপে বলতে গেলে সেক্রেটারি, হঠাৎ সম্বন্ধ ছিন্ন করলে। কোথায় যে চলে গেল কোনো হদিস পাওয়া গেল না।

সেই ওলি বুলকেই লিখছেন স্বামীজি: 'ল্যান্ডসবার্গ আর আসে না, ভয় হচ্ছে সে আমার উপর বিরক্ত হয়েছে। একেবারে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। ঠিকানাটা পর্যন্ত আমাকে দিয়ে যায়নি। তবু সে যেখানেই থাক, ভগবান তার মঙ্গল করুন। জীবনে যে সামান্য কজন অকপট লোকের দেখা পেয়েছি তাদের মধ্যে ল্যান্ডসবার্গ একজন।'

সহস্র-দ্বীপোদ্যানে - থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কে—হঠাৎ একদিন ল্যান্ডসবার্গ এসে হাজির। বললে, 'আমাকে দীক্ষা দাও।'

কোথায় সে পালাবে, কী দুর্জয় আকর্ষণে সে আবার সন্নিহিত হয়েছে! আর সে পালাবে না, পথের পতাকা সে হাতে তুলে নিয়ে চলবে।

স্বামীজি তাকে সন্ন্যাসদীক্ষা দিলেন। তার নাম হল কৃপানন্দ।

ছোট একটি বেদীতে আগুন জ্বলছে, কাছেই কটি ফুল সাজানো, পবিত্র শিখা আর পবিত্র সৌরভ—আর উচ্চারিত স্বামীজির কটি বাণী—এই দীক্ষার যাবতীয় আয়োজন, কিন্তু সহজ সাবল্যে গভীরস্পর্শী। শ্রীমতী ওয়াল্ডো লিখছে: গ্রীষ্মের এক ঊষায় সেই অনুষ্ঠানের স্মৃতি মর্মে গাঁথা হয়ে আছে। ফুল আর আগুন, আগুন আর ফুল, কিংবা বলতে পারো, পুষ্পাগ্নির বা অগ্নিপুষ্পের স্মৃতি।

দোতলায় যে ঘরে স্বামীজি বেদান্তের ক্লাশ নেন তার নিচে থাকে স্টেলা, এক বিগতযৌবনা অভিনেত্রী। সে দুচার দিন ক্লাশ করেই যেন বুঝে নিল, কী ব্যাপার, তারপর আসা ছেড়ে দিল। আর-আর ছাত্র-ছাত্রীরা বলাবলি করে, স্টেলার কী হল? কে একজন বললে, নিজের ঘরে বসে সে যোগ করছে!

কোনো আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার জন্যে নয়, যদি যোগবলে সে তার হারানো যৌবন ফিরে পায়, যদি শুষ্ক তরুতে আবার ফুল ফোটে। যদি স্বাস্থ্য যৌবন লাবণ্য মাধুর্যই না ফিরে পাই তা হলে আধ্যাত্মিকতায় লাভ কী!

আধ্যাত্মিকতা নিয়ে দেহের এই দোকানদারি অসহ্য। কেউ কিছু বলেনি কিন্তু স্বামীজি ঠিক বুঝতে পেরেছেন। একদিন বললেন, 'ও খুকিটিকে আমার বেশ ভালো লাগে।'

খুকি ? কার কথা বলছেন স্বামীজি ?

'হ্যাঁ, ঐ স্টেলা। ও খুকি, খুকির মতই সরল।' স্বামীজি হঠাৎ গম্ভীর হলেন : 'আমি ওকে এই আশায় খুকি বলি যে একদিন ও সত্যিসত্যিই বালিকার মতই হয়ে যাবে, সরলতার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠবে। লোকদেখানো ছলাকলার আশ্রয় নেবে না। অকপট হয়ে যাবে।'

ফাঙ্কিকেও স্বামীজি সরল বলেন, কিন্তু সে অন্য অর্থে। ফাঙ্কির চেষ্টা কী করে স্বামীজিকে বিশ্রাম দেবে, তাঁর গুরুভার লাঘব করে দেবে। সর্বক্ষণ দেহে-মনে উত্তেজনার চাপ ভালো নয়, তাই থেকে-থেকে স্বামীজির সঙ্গে হালকা কথা বলে, পরিহাস করে মজাদার গল্প বানিয়ে শোনায়। আর-সকলে স্বামীজিকে কথা কওয়াতে ব্যস্ত, ফাঙ্কি মাঝে মাঝে তাঁকে কথা শোনাতে উৎসুক। স্বামীজি হাসেন, ফাঙ্কির গল্পগাছা উপভোগ করেন আর বলেন, 'ও আমাকে বিশ্রাম দিচ্ছে। এই ওর একরকমের সেবা।'

'না, আমি জানি, তিনি আমাকে বোকা মনে করেন,' ফাঙ্কি বলছে তার বন্ধুকে, 'কিংবা পাগল। তা করুন, তবু তিনি যে আনন্দ পাচ্ছেন এই আমার সবচেয়ে বড় সুখ।'

ফাঙ্কি স্বামীজির কাজেই আত্মোৎসর্গ করতে চেয়েছিল কিন্তু সে যে বিবাহিত, তাই সে নির্বাচিত হতে পারল না। কিন্তু তাতে তার বিচ্যুতি নেই, মনে-প্রাণে সে স্বামীজিরই বহির্বর্তিকা।

'বিবেকানন্দের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকা, সকাল আটটা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তাঁর কথা শোনা, তাঁর আলোতে প্রজ্বলিত হয়ে থাকা—সে যে কী উত্তেজনা কী করে বোঝাই !' লিখছে ফাঙ্কি : 'কোনোদিন এমন অভিজ্ঞতা হবে কল্পনাও করতে পারিনি—বিবেকানন্দের সঙ্গে বাস করা, নিশ্বাসে তাঁর অস্তিত্বের সৌরভ নেওয়া, আর ভক্তিতে অবগাহন করে থাকা। কী আশ্চর্য পরিবেশ, আর কথা বলতে শুধু ঈশ্বরের কথা, বুদ্ধের কথা, যীশুর কথা ! যতই সংসারের খাতায় নাম লেখাই না কেন, সেখানেই কায়েমী হয়ে থাকব এমন ভরসা আর করি না। যেন সমস্ত মায়ার মধ্য থেকে সত্য উঁকি মারছে।'

'কেউ ভাবতে পারে না সে কী উদ্দীপনা, প্রত্যহ সকালে ও রাত্রে উপরের বারান্দায় ক্লাশ করছি, শুনছি বিবেকানন্দের কথা আর ঊর্ধ্বে দেখছি সোনার বিন্দুর মত তারাগুলি ঝলমল করছে। খেতে বসেও শুনছি তাঁর কথা, ভোগ্যবস্তুকেও অমৃতময় করে তুলছে। তারপর বিকেলে যখন তাঁর সঙ্গে বেড়াতে বেরোই, দেখি তিনি সেই নির্ঝরিণীর মধ্যে শুনছেন শাস্ত্রবাণী, পাথরের মধ্যে পড়ছেন ধর্মকথা, সকল বস্তুতে দেখছেন ঈশ্বরকে। আবার দেখবে এস স্বামীজি কত আনন্দোচ্ছল, কত পরিহাস-রসিক ! কথাপ্রসঙ্গে মনে হতে পারে তিনি বুঝি বিষয়বস্তু ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেলেন, কিন্তু, ভয় নেই, বারে-বারেই তিনি মূলবস্তু, সেই একমাত্র প্রাণপ্রদ বস্তুতে ফিরে-ফিরে আসেন—ভগবান লাভ করো, এ ছাড়া আর কিছুই পাবার মত নেই, হবার মতও নেই এই সংসারে।'

মেরী লুইও স্বামীজির দীক্ষিত শিষ্য—নাম অভেদানন্দ। দীর্ঘকায় চেহারায় পুরুষালি ভাবটাই প্রবল, কণ্ঠস্বরও গম্ভীর, পোশাকও ভারতীয় পুরুষের মত। ভালো বলতে-কইতে পারে বলে বক্তৃতামঞ্চই তার কাছে বৃহত্তর আকর্ষণ—ভক্তি ও উপাসনার পথ তাকে টানে না। অহংকার আর উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাকে বিবেকানন্দের আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিল সে নিজের কর্তৃত্বে ক্যালিফর্নিয়ায় বেদান্তকেন্দ্র স্থাপন করল।

কিন্তু ল্যান্ডসবার্গ চলে গিয়েও ফিরে এল। তার পথ ভক্তি, পুজো ও উপাসনার পথ। তার চরিত্রে যে আবেগের জ্বালা তার এই পথেই সার্থক পরিপাক। এই পথেই তার সমস্ত সঞ্চিত বিদ্যার পরম নিবেদন।

কখনো-কখনো একা ল্যান্ডসবার্গকে নিয়েই বেড়াতে বেরোন স্বামীজি। কথা বলতে-বলতে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যান। এ স্তব্ধতা কিসের জানো? নির্জনতার—যে নির্জনতা একমাত্র ভারতবর্ষের অরণ্যেই বাস করে। তাহলে শোনো আমার পরিব্রাজক জীবনের কথা।

গৃহকর্ত্রীর নাম মিস ডাচার, মেথডিস্ট সম্প্রদায়ের লোক, গোঁড়ামিতে শৃংখলিত। সে যে কী করে বিবেকানন্দের ছাত্রদলে এসে ভিড়েছে কেউ বলতে পারে না। ফান্কি বলে, আমি পারি। যে একবার স্বামীজিকে দেখেছে বা তাঁর কথা শুনেছে তার দলে ভেড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু বেদান্তের পথে অগ্রসর হওয়া ডাচারের পক্ষে দারুণ ক্লেশকর। এতে যে তার পুরোনো আদর্শ টলে যাচ্ছে, ভেঙে পড়ছে এতকালের ধর্মের ধারণা। ক্লাশে আসা সে কমিয়ে দিল। বেদান্ত হজম করা কঠিন হয়ে উঠেছে।

'ডাচার আসছে না কেন?'

'তার অসুখ করেছে।' কে একজন উত্তর দিলে।

'আমি জানি। এ সাধারণ অসুখ নয়।' বললেন স্বামীজি, 'তার মনে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, এ অসুখ তারই দৈহিক প্রতিক্রিয়া। সে সহ্য করতে পারছে না।'

সেদিন এই প্রতিক্রিয়া তো ক্লাশেই প্রত্যক্ষীভূত হল। সেদিন কী মনে করে ক্লাশে এসেছে ডাচার। স্বামীজি 'কর্তব্যবুদ্ধি' সম্বন্ধে বলছেন। 'কর্তব্যবুদ্ধি কী রকম জানো? এ যেন দুঃখের মধ্যাহ্ন-সূর্য, আত্মাকে পর্যন্ত জর্জরিত করে দেয়।'

'কিন্তু এ কি আমাদের কর্তব্য নয় যে—' প্রতিবাদ করতে উঠে দাঁড়াল ডাচার! কিন্তু প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না। তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে স্বামীজি গর্জে উঠলেন: 'না, স্বাধীন আত্মাকে কেউ শৃংখলে আবদ্ধ করতে পারে না, তুচ্ছ কর্তব্যবুদ্ধিও নয়।'

ডাচার বসে পড়ল। আর তাকে দেখা গেল না।

ফান্কি বলছে, এটা তার গুরুভক্তির অভাব। গুরুভক্তি থাকলে সে গুরুর দেখানো পথ, পুরোনো ছেড়ে নতুনের পথ, সহজেই ধরতে পারত। কিন্তু পুরোনো কুসংস্কার ও আচার-পদ্ধতি থেকে সে ছাড়া পেল না।

'কিন্তু তোমার পালাবার উপায় নেই।' ফান্কিকে বলছেন স্বামীজি, 'তোমাকে জাত-সাপে ধরেছে।'

সেদিন সন্ধ্যায় বৃষ্টি সুরু হল, বেরুনো গেল না। শয়ন ঘরেই সবাই বসল। স্বামীজি বললেন, 'এস তোমাদের কাছে আজ আমি এক পবিত্রতমা নারীর কথা বলি।'

'কে সে?'

'রামায়ণের সীতা।'

কী বেদনার্দ্র গম্ভীর সুস্বরে কাহিনী বলতে লাগলেন স্বামীজি! সত্যব্রতা নারী—পবিত্রতমা! ফার্ণ্ডের মনে কেমন একটা বিপরীত চিন্তা খেলে গেল। রমণী যদি পাপিষ্ঠা হত অথচ সুন্দরী-সম্রাজ্ঞী, তা হলে কী হত? কাহিনীতে নয়, যদি সে বাস্তবেই আবির্ভূতা হত, এইখানে, এই মুহূর্তে, স্বামীজির চোখের সামনে? আর সে এমন এক নারী যে প্রলোভনের পণ্য, যার দু'চোখে পুরুষকে বশীভূত করার মত মদির মন্ত্র মাখানো।

আশ্চর্য, প্রশ্নটা মনে উঠতে না উঠতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

স্বামীজি এক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইলেন। পরে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'যদি জগতের সুন্দরীশ্রেষ্ঠা নারী আমার দিকে অসৎ বা অনুচিত দৃষ্টিতে তাকায় সে তক্ষুনি একটা কদর্য ব্যাঙ-এ পরিণত হবে - আর তুমিই বলো, ব্যাঙ কি একটা দেখবার জিনিস?'

সেদিন পাহাড়ে বেড়াতে বেরুলেন স্বামীজি। সঙ্গে ফার্ণ্ড আর গ্রীনস্টিডেল। চড়াই ধরে উঠেছেন তো উঠছেনই, হঠাৎ একটা ডাল-পালা-মেলা গাছের নিচে বসে পড়লেন। সবাই ভাবল কোনো মূল্যবান কথা বলবেন এবার। কিন্তু, না স্বামীজি বললেন, 'আমরা এখন ধ্যান করব। বোধিদ্রুমতলে বুদ্ধের মত হয়ে যাব।'

বলতে বলতে কিছুক্ষণের মধ্যে স্বামীজি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

তুমুল বর্ষণ নেমে এল, সঙ্গে ঝড়, বিদ্যুৎ-বজ্র। কিন্তু স্বামীজি যেমন নিশ্চল ছিলেন তেমনি নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন। যেন নিস্পন্দ ব্রোঞ্জের মূর্তি। শুধু ফার্ণ্ড একটা ছাতা মেলে ধরে রইল। কিন্তু সেই ঝড়-বৃষ্টির কাছে ছাতা একটা দুর্বল প্রহসন মাত্র। স্বামীজি ভিজে যেতে লাগলেন। তবু চাঞ্চল্য এলো না। ছাতাতেও না। ছাতা অন্তত তো একটা স্নেহ-আচ্ছাদ। না, স্বামীজি এখন স্নেহেও আকৃষ্ট নন। সদ্য হতে তাঁর হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে গেছে, সমস্ত দ্বৈত-সংশয়ের অবসান হয়েছে।

উপলব্ধিই ধর্ম। বলছেন স্বামীজি, মানুষ এ পর্যন্ত যত নামে ঈশ্বরকে অভিহিত করেছে তার মধ্যে সত্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। সত্যই উপলব্ধির ফলস্বরূপ, অতএব আত্মার মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করো। পুঁথি ও প্রতীক দূর করে দিয়ে আত্মাকে তার স্বস্বরূপ দর্শন করতে দাও। যাবতীয় দ্বৈতভাবের ঊর্ধ্বে চলে যাও। তোমার সত্তা যদি পরমাত্মা থেকে ভিন্ন হয়, তাহলে চিরকালই ভিন্ন থাকবে, আত্যন্তিক মিলন হবে না কোনোদিন। যে মুহূর্তে তুমি মতবাদ, প্রতীক ও অনুষ্ঠানকে সর্বস্ব মনে করলে সেই মুহূর্তেই তুমি বন্ধনে পড়লে—অন্যকে সাহায্য করবার জন্যে ও-সকল মাধ্যমের সাহায্য নাও, কিন্তু সাবধান, ওগুলো যেন তোমার বন্ধন না হয়ে পড়ে। পুণ্যকর্ম দ্বারা যদি ঈশ্বর লাভ হয়, তা হলে ঐ কর্মশক্তি ক্ষয় হলেই আবার তা থেকে তুমি বিচ্যুত হবে। চক্ষুর দোষে যেমন এক চন্দ্র দ্বি-চন্দ্র দেখায়, তেমনি বুদ্ধির দোষে আমরা জীবকে পরমাত্মা থেকে ভিন্ন করে দেখছি। নিষ্কাম কর্মও সেখানে পৌঁছুতে পারে না। সোনার শিকল পরে মনে কোরো না গয়না পরেছি। সৎকর্মে বদ্ধ হয়ে মনে কোরো না সেবা করছি। ব্রহ্মজ্ঞানসুধা আকণ্ঠ পান করো। আত্মজ্ঞান নিজেকেই লাভ করতে হবে। আমি ছাড়া আর আমাকে কে জানবে—অহং ব্রহ্মাস্মি। ছিন্নবস্ত্রপরিহিত হয়েও যে 'সোঽহং' উপলব্ধি করে সেই যথার্থ সুখী। অনন্তের রাজ্যে প্রবেশ করো ও অনন্ত শক্তি নিয়ে ফিরে এস। ক্রীতদাস সত্যের অনু-সন্ধানে যায়, মুক্ত হয়ে ফিরে আসে।

একান্ত তন্ময় হয়ে বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বকেও অগ্রাহ্য করছেন স্বামীজি। হঠাৎ দূরে লোককোলাহল শোনা গেল। ক্রমেই তা নিকটে আসতে লাগল। এই তাণ্ডব ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে এ আবার কী চিৎকার! স্বামীজি ও তাঁর শিষ্যদের খোঁজে ছাতা ও বর্ষাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে লোকজন—এই যে এইখানে, এই গাছের নিচে!

স্বামীজি ভাসা-ভাসা চোখে ইতস্তত তাকালেন চারদিকে। বললেন, 'এ কী, আমি কি আবার কলকাতার বর্ষার মধ্যে এসে পড়লাম?'

না, কলকাতা নয়, আমেরিকায়। সত্যিই তো—উঠে পড়লেন স্বামীজি। ফিরে চললেন।

'প্রতিদিনই আমি অনুভব করছি আমার করণীয় কিছু নেই।' মেরি হেলকে লিখছেন স্বামীজি: 'আমি সর্বদাই পরম শান্তিতে আছি। কাজ যা করবার তিনিই করছেন, আমরা যন্ত্র মাত্র। তাঁরই জয় হোক, তাঁর নামের জয় হোক। কাম কাঞ্চন ও প্রতিষ্ঠা—এই তিন বন্ধন যেন আমার থেকে খসে পড়েছে। ভারতবর্ষে মাঝে-মাঝে আমার যেমন উপলব্ধি হত এখানেও আমার তেমনি হচ্ছে। ভেদবুদ্ধি ভালোমন্দবোধ ভ্রম-অজ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছে, আমি গুণাতীত রাজ্যে বিচরণ করছি। কোন বিধিনিষেধ মানব? কোনটা বা লঙ্ঘন করব? সে উচ্চ ভাবভূমি থেকে মনে হয় সারা বিশ্ব যেন একটা গত। হরি ওঁ তৎসৎ। একমাত্র তিনিই আছেন, আর কিছু নেই। আমি তোমাতে তুমি আমাতে। হে প্রভু, তুমি আমার চিরন্তন আশ্রয় হও। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।'

প্রথম ইংলণ্ড যাত্রার প্রাক্কালে স্টার্ডিকে লিখছেন স্বামীজি: 'ভারতবর্ষকে আমি সত্যিসত্যিই ভালোবাসি। কিন্তু দিনে-দিনে আমার দৃষ্টি খুলে যাচ্ছে। আমাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ ইংলণ্ড আমেরিকা আবার কী! ভ্রান্তবশে লোকে যাদের মানুষ বলে অভিহিত করে আমরা যে সেই নারায়ণের সেবক। যে বৃক্ষমূলে জলসেচন করে সে কি অন্য ভাবে সমস্ত বৃক্ষেই জলসেচন করে না?'

আবার লিখছেন ওলি বুলকে: 'আমি আমার স্বদেশবাসীর প্রতি কর্তব্য কিছুটা করেছি। যার কাছ থেকে এই দেহ পেয়েছি সেই জগতের জন্যে, যে দেশ আমাকে ভাব যুগিয়েছে সেই আমার ভারতবর্ষের জন্যে, আর যে মানুষকে আমি আমারই একজন বলে ভাবি, সেই মানুষের জন্যে এখন আমি কিছু করব।'

৮১

প্যারিস হয়ে লণ্ডনে যাচ্ছেন স্বামীজি। এই সেখানে প্রথম যাওয়া। উদ্দেশ্য বেদান্ত-প্রচার।

প্যারিস, সভ্যতার রাজধানী প্যারিস, রঙ-ঢঙ ভোগবিলাসের ভূ-স্বর্গ প্যারিস, বিদ্যাশিল্পের কেন্দ্র প্যারিস, সেই প্যারিসে এক বড় ধনী বন্ধু স্বামীজিকে নিমন্ত্রণ করে আনলেন। এক প্রাসোদোপম মস্ত হোটেলে নিয়ে তুললেন—রাজার মত খাওয়া-দাওয়া; কিন্তু স্নানের নামটি নেই। দুদিন ঠায় সহ্য করে শেষে আর থাকতে পারলেন না, বন্ধুকে বললেন, 'এ দারুণ গরমি, স্নান করবার ব্যবস্থা নেই, হন্যে কুকুর হবার দশা। শুধু রাজভোগে কী হবে? স্নান না হলে খিদেটাও তো বিশুদ্ধ হবে না।'

'দেখছি আর কোনো বড় হোটেল পাওয়া যায় কিনা।'

'বড়তে দরকার নেই, দেখ ভালো হোটেল পাও কিনা। ভালো মানে স্নানে ভালো।'

প্রধান-প্রধান বারোটা হোটেল খোঁজা হল, কিন্তু কোথাও স্নানের স্থান নেই। স্নান করতে চাও তো আলাদা স্নানাগার আছে, সেখানে টাকা দিয়ে স্নান করে এস। স্নান এখানে নিত্যকৃত্য নয়, বিরল বিলাস।

'হরিবোল! হরিবোল!' স্বামীজি প্রায় বসে পড়লেন: 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।'

তবু বেদান্তের জন্যে সমস্ত ক্লেশ সহ্য করবেন স্বামীজি। হে মন! সমস্ত সৃষ্ট পদার্থকে অতিক্রম করে আরো ঊর্ধ্বে ওঠো, তোমার দেহজ্ঞানকেও অতিক্রম করে বিদেহজ্ঞান লাভ করো, দেখবে সর্বনামরূপের প্রহেলিকার মাঝখানে একমাত্র সত্য বর্তমান, তাছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো অস্তিত্ব নেই--হে প্রভু, তোমাতে আমি শরণ নিলাম।

দিন সতেরো ছিলেন প্যারিসে, তারপর চলে এলেন লণ্ডন—স্টার্ডি ও মিস মুলারের বন্ধুতাকে আশ্রয় করে।

আর লণ্ডনে এসে কুড়িয়ে পেলেন মার্গারেট নোবল—শ্রীমতী নিবেদিতাকে।

লণ্ডনেও তিনি বেদান্তের ক্লাশ খুললেন। বিশিষ্ট ইংরেজ পরিবারের মহিলারা চেয়ারের অভাবে মেঝেতে আসনপিঁড়ি হয়ে বসছে এ দৃশ্য দেখবার মত! স্বামীজিকে ভালোবেসে তারা বুঝি ভারতবর্ষকেও ভালোবাসতে শিখবে।

স্টার্ডি লিখছে: 'স্বামী বিবেকানন্দের ইংলণ্ডে আসার ফলে এটা প্রমাণিত হল, এ দেশে এমন শিক্ষিত চিন্তাশীল লোক আছে যাঁরা ভারতবর্ষের প্রাণপ্রদ চিন্তাধারার সাহায্যে উপকৃত হতে প্রস্তুত। সব চেয়ে আনন্দের, স্বামীজির কথা গির্জার বেদী থেকে উচ্চারিত ভাষণে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। খৃস্টধর্মের ব্যাখ্যায় বেদান্তকে কী করে কতদূর কাজে লাগানো যায় যাজকেরা তার পথ খুঁজে পেয়েছেন। স্বামীজি শুধু একজন যোগী নন, তাঁর হৃদয় প্রেম দিয়ে পূর্ণ আর তাঁর স্মৃতি বহু যুগের ঐতিহ্য দিয়ে সমৃদ্ধ।'

কিন্তু বেদান্তপ্রতিষ্ঠার কাজে আরো প্রচারক চাই। স্বামীজি কলকাতায় লেখে পাঠালেন, রামকৃষ্ণানন্দকে পাঠিয়ে দাও, নয়তো সারদানন্দ বা অভেদানন্দকে। কিছু টাকাও পাঠিয়ে দিচ্ছি, শিগগিব কেউ চলে এস। আমি আর স্টার্ডি দুজনে পেরে উঠছি না। ঘুরে-ঘুরে লেকচার দিয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, রাত্রে প্রায়ই ঘুম নেই।

স্টার্ডি সম্বন্ধে ওলি বুলকে লিখছেন: 'স্টার্ডি কিছুদিন ভারতবর্ষে আমাদের সঙ্গে সন্ন্যাসীর মত জীবনযাপন করেছিল। সে শিক্ষিতই শুধু নয়, সে সংস্কৃতে অভিজ্ঞ, তাছাড়া সে উদ্যমশীল, অধ্যবসায়ী। পবিত্রতা, অধ্যবসায় আর উদ্যম—এই তিনটি গুণ আমি একসঙ্গে চাই। যদি এমনি ছ'জন লোক পাই আমার কাজ যথার্থ চলবে। আশার কথা, দু চারজন লোক পেয়ে যাব।'

কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে কেউ এল না। ওলি বুলকে আবার লিখলেন: 'আমি একজনের জন্য ভারতবর্ষে লিখেছি। এ পর্যন্ত সব ভালোভাবেই চলছে। এখন পরবর্তী ঢেউয়ের জন্য অপেক্ষা করছি। পেলেও ছেড়ো না, পাবার জন্যে ব্যস্তও হয়ো না, ভগবান স্বেচ্ছায় যা পাঠান তার জন্যে অপেক্ষা করো—এই আমার মূলমন্ত্র। আমি খুব কম চিঠি লিখি বটে, কিন্তু আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরা।'

কিন্তু সেই একজনও এল না। স্বামীজির দুমাসের প্রতীক্ষা বিফলে গেল। সাতাশে ডিসেম্বর স্বামীজি আমেরিকার জাহাজ নিলেন। মিসেস বুলকে লিখলেন: 'ইংলণ্ডে আমি জন কয়েক বন্ধু রেখে যাচ্ছি। আগামী গ্রীষ্মে আমি আবার আসব এই আশায় তারা আমার অনুপস্থিতিতে কাজ করবে।'

সেই জনকয়েক বন্ধুর অগ্রগণ্য স্টার্ডি।

অখণ্ডানন্দকে লিখছেন যাবার আগে: 'এ সংসার অতীব বিচিত্র, কাম-কাঞ্চনের হাত এড়ানো ব্রহ্মা-বিষ্ণুরও দুষ্কর। টাকাকড়ির সম্পর্কমাত্রেই গোলমালের সম্ভাবনা। অতএব মঠের জন্যে কাউকে অর্থসংগ্রহ করতে দেবে না। তুমি বালক, কাঞ্চনের মায়া বোঝ না। মহানীতিপরায়ণ লোকও অবস্থাদোষে প্রতারক হয়। পাঁচজনে মিলে কোনো কাজ করা আদতেই আমাদের স্বভাব নয়। এই জন্যে আমাদের দুর্দশা। যে হুকুম তামিল করতে পারে তারই হুকুম করার অধিকার। আমরা সকলেই হামবড়া, তাতে কখনো কাজ হয় না। মহাউদ্যম, মহাসাহস, মহাবীর্য এবং সকলের আগে মহতী আজ্ঞাবহতা—এই সব গুণ ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির একমাত্র উপায়। এই সব গুণ আমাদের মধ্যে কোথায়?

তুমি যে রকম কাজ করছ করে যাও—তবে পড়াশোনার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখবে। সকলের সঙ্গে মিশবে, কারু সঙ্গে কোনো বিরোধের ধারেও ঘেঁষবে না।'

নিউইয়র্কে ফিরে এসে যে বাড়িতে উঠলেন, দোতলায় দুখানা ঘরের ফ্ল্যাট, তার নিচের তলায় রান্নাঘর। সব ভাড়াটের সেই একটাই রান্নার জায়গা, তাই সেটা বিশেষ পরিচ্ছন্ন ছিল না। খেতে রুচি হত না স্বামীজির। তাই একদিন তিনি তাঁর ছাত্রী সারা এলেন ওয়াল্ডোকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আমাকে রেঁধে দিতে পারবে?'

ওয়াল্ডো এককথায় রাজি হয়ে গেল: 'পারব।'

কুমারী লরা গ্লেন স্বামীজির আরেক ছাত্রী। স্বামীজি তার নাম রেখেছেন দেবমাতা। ওয়াল্ডোর নাম হরিদাসী। দেবমাতা লিখছেন:

কি সুন্দর এই হরিদাসী! যেমন অর্থে তেমনি আকৃতিতে। দীর্ঘাঙ্গী মর্যাদাবাহিনী নারীমূর্তি, সর্বক্ষণ সর্বকার্যে ব্যস্ত হয়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। রালফ ওয়াল্ডো এমার্সনের দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। হরিদাসীর চেয়ে আর ভালো নাম কী হতে পারে? সে যে ঈশ্বরের সেবাতেই উৎসর্জিত। তার সেবা নির্বিশ্রাম। স্বামীজির ঘর মোছে, গোছগাছ করে, শ্রুতিলেখিকার কাজ করে, বইয়ের প্রুফ দেখে, বইয়ের সম্পাদন করে, অভ্যাগতের সঙ্গে আলাপ চালায়, বক্তৃতা পরিচালনার ভার নেয়। তারপর তাকে কিনা এখন বলা হচ্ছে, রান্না করে দাও।

ব্রুকলিনের অপর প্রান্তে তার বাড়ি, যানবাহন বলতে শুধু ঘোড়ার গাড়ি, আসতে-যেতে প্রতিক্ষেপে দুঘণ্টা। তবু হরিদাসী ভ্রূক্ষেপ করল না, নিজের বাড়ি থেকে বাসনকোসন নিয়ে এসে রান্না করতে বসল। বাড়িউলি আপত্তি করল না এই যা রক্ষে। সেই সকাল আটটায় বেরিয়ে রাত দশটায় ফেরা। এ যে কতখানি সেবা, কত বড় সেবা, কে তার হিসেব নেয়? ছুটির দিনে অবশ্য অন্য ব্যবস্থা—স্বামীজি নিজেই যান হরিদাসীর বাড়ি, সেই ছ্যাকরা গাড়িকে বাহন করে। গিয়ে নিজের হাতে রান্না করেন, আর রান্না নিয়েই বা তাঁর কত পরীক্ষা! বালকের মত সরল কৌতুহলে উদ্দীপ্ত হয়ে কত তাঁর ছোটাছুটি! রান্নার কৌশল নিয়ে কত তাঁর গবেষণা! রান্না খাবার মত হোক বা না হোক, তাঁর রান্না করার উৎসাহটা দেখবার মত।

'এমন নিবিড় মেলামেশার মধ্যেও কেন যে একবারও সংসার-ত্যাগের কথা আমার মনে হয়নি ভাবতে আশ্চর্য লাগে।' দেবমাতাকে বলছে হরিদাসী : 'তার সঙ্গে ভারতবর্ষে যাবার কথা স্পষ্ট করে কখনো ভাবিনি। আমার কেবলই মনে হত আমার স্থান আমেরিকায়। অথচ তাঁর জন্যে করতে পারতাম না এমন আমার কিছুই ছিল না। প্রথম যখন নিউইয়র্কে এলেন কমলারঙের আলখাল্লা পরে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন। ব্রডওয়ের উপর এমনি টকটকে রঙের কোটের পাশে-পাশে চলতে দস্তুরমত সাহসের দরকার হত। স্বামীজি কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে রাজোচিত ভঙ্গিতে দীর্ঘ পা ফেলে হাঁটতেন আর আমি বারেবারেই পিছিয়ে পড়তাম আর হাঁপাতাম। শুনতাম পথচারীরা বিস্ময় প্রকাশ করে বলছে, এরা আবার কারা হে? বুঝতাম তাঁর পোশাকের উৎকট রং ই সকলের চক্ষুপীড়ার কারণ হয়েছে। অনেক বলে-কয়ে স্বামীজিকে একটা ফিকে রঙের কোট পরতে রাজি করালাম।'

কোটের রঙে আর মানুষে আকৃষ্ট না হোক ঐ দীর্ঘছন্দ বীর-বিক্রান্ত তেজস্বী পুরুষকে দেখে কে না থমকে তাকাবে?

'এ কী, তুমি কাঁদছ?' স্বামীজি হরিদাসীকে প্রশ্ন করলেন ব্যথিত স্বরে।

'কই, না তো!'

'তোমার চোখে যে জল—কেন, কী হল?'

হরিদাসী মাথা নোয়ালো। বললে 'আমার মনে হচ্ছে আমি আমার সেবায় আপনাকে তুষ্ট করতে পারছি না।'

'কেন, এ কথা তুমি ভাবছ কেন?'

'অন্য লোকে ত্রুটি করলেও আমাকেই বকুনি খেতে হয়। হরিদাসীর স্বরে স্পষ্ট অভিমান।

'তোমাকে ছাড়া আমি আর কাকে বকব?' সরল শিশুর মত নিষ্পাপ মুখে বললেন স্বামীজি, 'আমি কি ওদের কাউকে চিনি যে বকতে সাহস হবে? আমি তোমাকে চিনি, তুমি আমার আপনার লোক, তাই যেখানে যা ঘটুক তোমাকে বকেই আমার সুখ। তাহলে তুমি বলো তুমি আমার আপনার লোক নও, তোমাকে তখন বকতে আমার বয়ে গেছে।'

কথা শুনে হরিদাসীর চোখের জল শুকিয়ে গেল। এরপর থেকে সে শুধু স্বামীজির গালাগালই খুঁজে বেড়াতে লাগল। হাতে ধরে সে নিজের কাজে খুঁৎ রাখতে পারে না, সে শুধু চায় অন্যদের ত্রুটি ঘটুক আর তার জন্যে সে স্বামীজির তিরস্কারে পুরস্কৃত হোক।

কিন্তু স্বামীজির আচরণে কোনোদিন কোনো ত্রুটি ঘটবে না? এমন পুরুষ তো সে দেখেনি যার মধ্যে কোনো না কোনো দুর্বলতা ধরা পড়ে। স্বামীজির মধ্যে দুর্বলতা আবিষ্কার করবার জন্যে হরিদাসী তীক্ষ্ণ চোখে জাগ্রত হয়ে থাকে। একদিনও স্বামীজি স্খলিত হবেন না?

ঠিক—ধরতে পেরেছে হরিদাসী। প্রতিদিন ঘরে ঢোকবার আগে দরজার আয়নার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়ান স্বামীজি। নিবিষ্ট হয়ে নিজের চেহারা দেখেন। ঘরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত হাঁটেন, আবার নিজেকে দেখেন আয়নায়। এ অহংকার ছাড়া আর কী! নিজে একজন সুপুরুষ এ যেন বারে বারে আর্শিতে যাচাই করে নেবার

দরকার আছে! স্বামীজি এত বড় একটা মানুষ হয়ে রূপের অহংকারের ফাঁদে আটকা পড়লেন!

সেই মুহূর্তে স্বামীজি হরিদাসীর দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন, 'এলেন, এ যে দেখছি আশ্চর্য ব্যাপার! আমি যে আমার নিজের চেহারা কিছুতেই মনে রাখতে পারছি না। আর্শিতে এত করে নিজেকে দেখে নিচ্ছি তবু সরে এলেই চেহারার কল্পনাটা মিলিয়ে যাচ্ছে। এই দেখছি আবার এই ভুলে যাচ্ছি। আমার এ কী হল বলো তো?'

হরিদাসী মাথা নত করল। তারই অহংকার গুঁড়ো হয়ে গেল।

নিউইয়র্কে স্বামীজি তাঁর আরব্ধ কাজকে একটি স্থায়ী রূপ দিতে চাইলেন। নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হল। প্রাসঙ্গিক সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপার একটি কমিটির হাতে দিয়ে স্বামীজি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

কিন্তু আবার লিখলেন কলকাতায়, শরৎ মহারাজকে: 'আমার সাহায্যের জন্যে এমন লোক চাই যারা সাহসী, অদম্য ও বিপদে অপরাঙ্মুখ – আমি খোকাদের ও ভীরুদের চাই না। আসলে আমি একাই কাজ করব। এই ব্রত আমার, আমিই তা উদ্‌যাপন করে যাব। হ্যাঁ, একাই আমি সম্পন্ন করব। কে আসে কে যায়, তাতে আমি ভ্রূক্ষেপ করি না।'

স্বামীজি 'রাজযোগ' রচনায় প্রবৃত্ত হলেন।

রাজযোগও বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান অতীন্দ্রিয় রাজ্যের দ্রষ্টা যে মন, তারই বিশ্লেষণ; আর তার সঙ্গে-সঙ্গে আধ্যাত্মিক রাজ্যের নির্মিতি। সব দেশের আচার্যেরাই একবাক্যে বলেছেন, সত্য আমরা দেখেছি, সত্য আমরা জানি। যীশু, পল ও পিটারও বললেন, আমাদের প্রচারিত সত্য আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

এই প্রত্যক্ষানুভূতি যোগলব্ধ।

সংজ্ঞা বা স্মৃতি জীবনের সীমারেখা হতে পারে না, কেননা আরেকটা অতীন্দ্রিয় ভূমি আছে, সে ভূমিতে ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয়, ইন্দ্রিয় সুষুপ্ত। যোগ ঠিক বিজ্ঞানের মতই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

মনের একাগ্রতাই সমস্ত জ্ঞানের উৎস।

যোগের শিক্ষা—জড়কে কী করে দাস করে রাখা যায়, আর জড়ের তাই ঠিক থাকা উচিত। যোগ মানে যোজনা করা, অর্থাৎ জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন ঘটানো।

মন নিম্নভূমিতে কাজ করে—জ্ঞানভূমিতে, কিংবা তারও নিম্নস্তরে। যাকে আমরা জানা বলি সেটা আমাদের প্রকৃতির অনন্ত শৃঙ্খলের একটা অংশমাত্র। ক্ষণেকের একটুখানি জ্ঞান নিয়ে আমাদের এই 'আমি।' আর তার চারদিকে বিরাট অজ্ঞান। এই 'আমির' ওপারে আমাদের অজ্ঞাত অতীন্দ্রিয় রাজ্য।

অকপট হৃদয়ে যোগ অভ্যাস করলে মনের পরদা একটার পর একটা সরে যায়, আর নব নব সত্যের প্রকাশ হয়। ধীরে ধীরে আমরা নতুন জগতের সন্ধান পাই, আমাদের মধ্যে নব নব শক্তির বিকাশ হয়। কিন্তু, সাবধান, মাঝপথে যেন থেমে না যাই। হীরের খনি সামনে রয়েছে, কাচের ঝিলিক যেন আমাদের চোখে ধাঁধা না লাগায়।

ভগবানই আমাদের লক্ষ্য, তাঁর কাছে যেতে না পারাই আমাদের মৃত্যু।

ব্রহ্মবিদ্যাই পরা বিদ্যা, বলছেন স্বামীজি, বিজ্ঞান অপরা বিদ্যা। যা দিয়ে সেই অক্ষর পুরুষকে লাভ করা যায় তাই পরা বিদ্যা। আর সব লৌকিক জ্ঞান অপরা। সেই অক্ষর পুরুষ নিজের মধ্যে থেকেই সমুদয় সৃষ্টি করছেন—বাইরের অপর কিছু

তার উপর কার্য করছে না। সেই ব্রহ্মই সমুদয় শক্তিস্বরূপ—যা কিছু আছে সমস্ত। যিনি আত্মযাজী, তিনিই কেবল ব্রহ্মকে জানেন। অজ্ঞানেরাই বাহ্যপূজাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, মনে করে কর্মের দ্বারা ব্রহ্ম লভনীয়। যাঁরা সুষুম্নাবর্ত্মে, যোগীদের মার্গে যাত্রা করেন তাঁরাই শুধু আত্মাকে লাভ করেন। ওঙ্কার ধনু, আত্মা তীর, ব্রহ্ম লক্ষ্য। অপ্রমত্ত হয়ে তাঁকে বিদ্ধ করতে হবে। তাঁতে মিশে এক হয়ে যেতে হবে। সসীম অবস্থায় আমরা কখনো সেই সীমাহীনকে প্রকাশ করতে পারি না। কিন্তু আমরাই তো সেই অসীমস্বরূপ। এটি জানলে আর তর্কবিতর্কের দরকার হয় না।

আবার বলছেন, ভক্তি, ধ্যান ও ব্রহ্মচর্যের দ্বারা সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হবে। সত্যমেব জয়তে, নানৃতম, সত্যেনৈব পন্থা বিততো দেবযানঃ। সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার কখনই জয় হয় না, সত্যের ভিতর দিয়েই ব্রহ্মলাভের একমাত্র পথ।

তারপর স্বামীজি 'আত্মা ও ঈশ্বর' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন :

শাশ্বত ঈশ্বর, শাশ্বত প্রকৃতি আর শাশ্বত আত্মা। এই হল ধর্মের প্রথম সোপান। একে বলে দ্বৈতবাদ। এই স্তরে মানুষ নিজেকে ও ঈশ্বরকে অনন্তকাল ধরে স্বতন্ত্র দেখে। এই স্তরে ঈশ্বর এক পৃথক সত্তা, মানুষ এক পৃথক সত্তা, প্রকৃতিও এক পৃথক সত্তা। এই মতে জ্ঞাতা কর্তা আর জ্ঞেয় কর্ম পরস্পরবিরোধী। মানুষ প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে মনে করে সে কর্তা আর প্রকৃতি কর্ম। যখন ঈশ্বরের দিকে তাকায় তখনও ঈশ্বরকে দেখে কর্মরূপে আর নিজেকে দেখে কর্তারূপে। সাধারণভাবে এই হল ধর্মের প্রথম রূপ।

তারপর আসে আরেকটি রূপ। মানুষ বুঝতে আরম্ভ করে, ঈশ্বর যদি বিশ্বের কারণ হন আর বিশ্ব যদি কার্য হয়, তবে ঈশ্বরই তো বিশ্ব আর আত্মারূপে প্রকাশিত হয়েছেন, আর মানুষ নিজেও পূর্ণ-সত্তা ঈশ্বরের একটি অংশমাত্র। জীবকণা বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডেরই স্ফুলিঙ্গমাত্র—সমগ্র বিশ্ব স্বয়ং ঈশ্বরেরই প্রকাশ। এটাই পরবর্তী সোপান। একে বলে বিশিষ্টাদ্বৈত। এই মতে আমরা ব্যক্তি বটে কিন্তু ঈশ্বর থেকে পৃথক নই। আমরা যেন একই বস্তুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চরমান অংশ আর ঈশ্বর হলেন সমষ্টিবস্তু। ব্যক্তিহিসেবে আমরা স্বতন্ত্র কিন্তু ঈশ্বরে আমরা এক। আমরা সকলে তাঁতেই আছি। আমরা সকলে তাঁরই অংশ, সুতরাং আমরা এক। তবুও মানুষে-মানুষে মানুষে-ঈশ্বরে একটি কঠোর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে—স্বতন্ত্র তবু স্বতন্ত্র নয়।

তারপর আসে আরেকটি প্রশ্ন – সূক্ষ্মতর প্রশ্ন : অসীমের কি অংশ থাকতে পারে? অসীমকে কখনো ভাগ করা যায় না, তা সর্বদাই অসীম। অসীমকে যদি ভাগ করা যেত, তা হলে প্রতিটি অংশই অসীম হত। অথচ অসীম কখনো দুটি থাকতে পারে না। ধরো যদি দুটি থাকত, তাহলে একটি অপরটিকে সীমাবদ্ধ করত এবং উভয়েই সসীম হয়ে যেত। কাজেই আমাদের সিদ্ধান্ত হল—অসীম এক, বহু নয়—একই অসীম আত্মা হাজার-হাজার দর্পণে নিজেকে প্রতিবিম্বিত করে ভিন্ন-ভিন্ন আত্মারূপে প্রতিভাত হচ্ছে। এই বিশ্বের পটভূমি সেই অসীম আত্মাকেই আমরা 'ঈশ্বর' বলি আর মানব-মনের পটভূমি সেই একই অসীম আত্মাকেই আমরা বলি মানবাত্মা।

ব্রুকলিনের হেলেন হান্টিংটন লিখলেন : ভগবান কৃপা করে ভারতবর্ষ থেকে একজন অধ্যাত্মসাধনার পথপ্রদর্শক আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। এই আচার্যের ভাবগম্ভীর দার্শনিক মত ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে আমাদের দেশের নৈতিক বায়ুমণ্ডলে সঞ্চারিত

হচ্ছে। এর প্রভাব ও পবিত্রতা অসাধারণ। তিনি আমাদের চোখের সামনে অধ্যাত্মজীবনের এক অত্যুচ্চ ভূমি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি এমন এক ধর্ম দেখিয়েছেন যা সার্বভৌম, যার পরমতসহিষ্ণুতা ও সহানুভূতি নিঃসংকোচ, যা বৈরাগ্যমণ্ডিত, মানবচিত্তে যত রকম সম্ভাবের উদয় হতে পারে তাতে অলংকৃত। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের কাছে এমন এক ধর্ম প্রচার করছেন যা অন্ধ মতবাদ বা নির্বিচার বিশ্বাসের মধ্যেই আবদ্ধ নয়, যা মানুষের মনকে সহজেই উন্নীত করে, পবিত্র করে, আশ্বস্ত করে, যা সমুদয় দোষের ঊর্ধ্বে বিরাজিত—তা ভগবদ্ভক্তি, মানবপ্রীতি ও অনাবিল ব্রহ্মচর্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যে তাঁকে দেখে যে তাঁকে শোনে সেই তাঁর বন্ধু হয়ে যায়। তাঁর ক্লাসে ও বক্তৃতাসভায় কত শত বুদ্ধিজীবী প্রগতিবাদীর দল ভিড় করে, সাধ্য নেই কেউ তাঁর উপস্থিতি ও বক্তব্যের প্রভাবকে এড়িয়ে যেতে পারে। সে প্রভাব অধ্যাত্মপ্রবাহের প্রভাব, তা বুঝি সকলের হৃদয়কে আপ্লুত করে। কারো কোনো নিন্দায় বা প্রশংসায় প্ররোচিত হয়ে তিনি কিছু বলছেন না, কোনো প্রতিবাদ বা সমর্থনও তাঁর বিষয় নয়, অর্থ বা প্রতিপত্তির কামনা তো সুদূরপরাহত। অশোভন অনুগ্রহের প্রতি তাঁর যেমন বৈরাগ্য অশোভন বিদ্বেষ-নিন্দার প্রতিও তাঁর তেমনি ঔদাসীন্য। অপরাধীকে বা অপবিত্র-চিত্তকেও তিনি নিন্দা করেন না—তিনি শুদ্ধ পবিত্র হতে, মঙ্গলময় জীবনযাপন করতে সকলকে উৎসাহিত করেন। অল্পকথায় বলতে গেলে, তিনি সত্যিই এমন এক মানুষ যাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে রাজারও আনন্দ হয়।

বেদান্তসাহিত্যের জন্যে কী ভীষণ চাহিদা বেড়ে গিয়েছে আমেরিকায়! মুখে-মুখে কত সংস্কৃত শব্দ ফিরছে! আত্মা, পুরুষ, প্রকৃতি, মোক্ষ—এ সব শব্দ ঢুকে পড়েছে আমেরিকার ইংরিজিতে। হাক্সলে আর স্পেনসারের মতই শংকরাচার্য ও রামানুজ চেনা হয়ে গিয়েছে। যে সব ইওরোপীয় গ্রন্থকার ভারতবর্ষ নিয়ে বই লিখেছে—ম্যাক্সমুলার, কোলব্রুক, ডয়সন বা বার্নোফ—তাদের বইয়ের কাটতি ও আদর বেড়ে গিয়েছে। এমনিতে সোপেনহাওয়ার শুকনো ও ক্লান্তিকর, কিন্তু যেহেতু তার বক্তব্য বৈদান্তিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাই পাঠকের কাছে এখন রমণীয় লাগছে।

স্টার্ডি বা কৃপানন্দ লিখছে: বেদান্তে মানুষ এমন একটি মতবাদের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য সহজেই অনুভব করতে পারে যা একাধারে দর্শন ও ধর্মের আকারে উদ্ভাসিত। যা হৃদয়কে যেমন আকর্ষণ করে বুদ্ধিকেও তেমনি তৃপ্তি দেয়। মানুষের যত প্রকার ধর্মপ্রেরণা আছে তার সংগে সামঞ্জস্য রাখে আর এ বলাই নিরর্থক, যখন এর ব্যাখ্যাতারূপে বিবেকানন্দ আবির্ভূত হন, যিনি বাগ্মিতাবলে মানুষের অন্তর্নিহিত দেবমহিমাকে পলকে উদ্বোধিত করতে পারেন, তখন বস্তুতান্ত্রিক বিজ্ঞানবদ্ধ মনেও সহজ বিশ্বাস জেগে ওঠে।

হে পৃথিবী গুরুকুল, তোমরা চুপ করো। গ্রন্থরাজি, স্তব্ধ হও। হে প্রভু, তুমি শুধু কথা বলো, তোমার ভৃত্য শুনুক। সেখানে যদি সত্য না থাকে তা হলে এ জীবনের আর প্রয়োজন কী? আমরা সকলেই ভাবি একে ধরতে পারব, কিন্তু পারি না। অনেকেই শুধু মুঠো ভরে ধুলো ধরে থাকি। সেখানে ঈশ্বর নেই। ঈশ্বরই যদি নেই তবে কী হবে এ জীবন দিয়ে, জীবনে তবে কী প্রয়োজন? কিসের জন্যে বেঁচে থাকা?

আরো বলছেন স্বামীজি, ঈশ্বর যদি থাকেন আমাদের অন্তরেই আছেন। আমাকে বলতে হবে, তাঁকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। নতুবা আমার কোনো ধর্ম নেই। কতগুলো

বিশ্বাস, মতবাদ আর উপদেশে ধর্ম হয় না। উপলব্ধি—ঈশ্বর-প্রত্যক্ষই একমাত্র ধর্ম। যাঁরা মহাপুরুষ, সমগ্র বিশ্ব যাঁদের পূজা করে, সেই সব মানুষের গৌরব কিসে? তাঁদের কাছে ঈশ্বর মতবাদমাত্র নয়। পিতামহেরা বিশ্বাস করতেন বলেই তাঁরা বিশ্বাস করতেন না। নিজেদের দেহ-মন সব কিছুর ঊর্ধ্বে যে অসীম, তার উপলব্ধিতেই তাঁরা গরীয়ান। সেই ঈশ্বরের তিলমাত্র প্রতিবিম্ব আছে বলেই এই পৃথিবী সত্য। আমরা ভালো লোককে ভালোবাসি, কারণ তার মুখে সেই প্রতিবিম্ব আরো একটু উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে। সেই জ্যোতির্ময়কে আমাদের নিজেদেরই ধরতে হবে। অন্য কোনো পথ নেই।

সেই তো লক্ষ্য। তার জন্যে সংগ্রাম করো। নিজের বাইবেল নিজে রচনা করো। নিজের খৃস্টকে নিজে আবিষ্কার করো। নতুবা তোমরা ধার্মিক নও, ধর্মের কথা বোলো না। মানুষ শুধু কথার পরে কথাই বলে যায়। তাদের মধ্যে অনেকে অন্ধকারে নিমজ্জিত থেকেও অন্তরের গর্বে ভাবে, সেই আলোক তারা পেয়েছে। আর শুধু তাই নয়, অন্যকেও তারা কাঁধে নিতে চায় এবং উভয়েই শেষে গর্তে পড়ে।

শুধু গির্জা বা মন্দিরই কাউকে রক্ষা করতে পারে না। মন্দির বা গির্জার আশ্রয়ে জন্মগ্রহণ করা ভালো কিন্তু সেখানেই যার মৃত্যু হয় সে বড়ই হতভাগ্য। সে কথা থাক! আরম্ভটা ভালো, কিন্তু সে কথাও থাক। সে তো শৈশবের স্থান—কিন্তু, বেশ, তাই হোক। ঈশ্বরের কাছে সোজা চলে যাও। কোনো ধারণা নয়, কোনো মতবাদ নয়। একমাত্র তা হলেই সব সন্দেহ দূর হবে, যা কিছু বাঁকা সোজা হয়ে যাবে।

বহুর মধ্যে যিনি এককে দেখেন, বহু মৃত্যুর মধ্যে যিনি দেখেন সেই এক জীবনকে, দেখেন নিজের অপরিবর্তনীয় আত্মাকে, তিনিই শাশ্বত শান্তির অধিকারী!

হার্টফোর্ড ডেলি টাইমস লিখছে: খৃস্টান নামে যারা পরিচিত তাদের অনেকের তুলনায় বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী অধিকতর খৃস্টসম্মত। তাঁর অসীম উদারতা সকল ধর্মকে সকল জাতিকেই স্বীকার করে। গতরাত্রে তিনি যেমন সরলভাবে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে যে কোনো শ্রোতাই মুগ্ধ হবে, ভাষণ শেষ হয়ে গেলেও স্তব্ধ হয়ে থাকবে কিছুক্ষণ।

ডাঃ স্ট্রিট সন্ন্যাস গ্রহণ করল। গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে স্বামীজিই তাকে দীক্ষা দিলেন, নাম দিলেন যোগানন্দ।

খবরের কাগজে মন্তব্য করা হল: কত বড় শক্তিশালী পুরুষ এই বিবেকানন্দ। যারাই তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবের আওতায় এসে পড়ে তাদের জীবনে মঙ্গলসাধনের কী পরিমাণ ক্ষমতা তিনি প্রয়োগ করতে পারেন এই ঘটনাই তার প্রকৃষ্টতম প্রমাণ।

প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হচ্ছে স্বামীজিকে। হিন্দুভাবগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ করা আর শুষ্ক দর্শন, জটিল পুরাণ ও অদ্ভুত মনোবিজ্ঞানের মধ্য থেকে ধর্ম বার করে আনা—যা একদিকে সহজ সরল ও জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহী হবে, অন্যদিকে মনীষীদের বুদ্ধিগ্রাহ্য হবে। সূক্ষ্ম অদ্বৈততত্ত্বকে প্রাত্যহিক জীবনের উপযোগী করে তোলা, জীবন্ত ও কবিত্বময় করে তোলাই এখন স্বামীজির জীবনব্রত।

কিন্তু শরীরে আর দিচ্ছে না, ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, প্রাণ শুধু হিমালয়ের নির্জনে ছুটি চাইছে। লিখছেন স্বামীজি: নিরন্তর কাজ করার ফলে এ বছর আমার স্বাস্থ্য খুবই ভেঙে গেছে, এই শীতে আমি একরাত্রিও ভালো করে ঘুমোইনি। ইংলণ্ডে আমার এখনো এক বৃহৎ কাজ বাকি আছে। শরীর যতই ভাঙুক, আমাকে তা সম্পূর্ণ করতে হবে।

তারপর আশা করি ভারতবর্ষে ফিরে বাকি জীবনটা আমি বিশ্রাম করে কাটাতে পারব। খুব ইচ্ছা হয়, কয়েক বছরের জন্যে বোবা হয়ে যাই, একেবারেই কথা না বলি। এই সকল পার্থিব সংগ্রাম ও সংঘর্ষের জন্যে আমি জন্মাইনি। স্বভাবত আমি স্বপ্নচারী ও শান্তি-প্রিয়। আমি আজন্ম আদর্শবাদী, স্বপ্নজগতেই আমার বাস, বাস্তবের সংস্পর্শ আমার স্বপ্নের বিঘ্ন ঘটায় আর আমাকে অসুখী করে তোলে। ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমার সমগ্র জীবনটাই স্বপ্নের পর স্বপ্নের সমাবেশ। সচেতন স্বপ্নচারী হওয়াই আমার উচ্চতম অভিলাষ।

ফাঙ্কি লিখছে তার স্মৃতিলিপিতে : মনে হচ্ছিল যেন স্বামীজির অন্তরাত্মা দেহ-বন্ধন ছিন্ন করে ফেলেছে, আর তখনই আমার মনে হল এ বুঝি তাঁর যাত্রাশেষের পূর্বাভাস। বহু বছর অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তিনি বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন আর তখনই বুঝতে পারা যাচ্ছিল যে তিনি আর বেশিদিন নেই। এই নিদারুণ দুঃখকে বাস্তবে না দেখবার জন্যে চোখ বুজে রইলাম কিন্তু হৃদয় সেই সত্যকে অপসৃত হতে দিল না। তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল কিন্তু তিনি অনুভব করছিলেন তাঁকে কাজ চালিয়েই যেতে হবে।

আলাসিংগাকে লিখছেন স্বামীজি : আমার ভয় হয় আমার পরিশ্রম অত্যধিক হয়ে পড়েছে—এই দীর্ঘ একটানা মেহনতে আমার স্নায়ুমণ্ডলী যেন ছিঁড়ে গেছে। যাই হোক, লোককল্যাণের জন্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—এই মনে করেই আমি সন্তুষ্ট। কাজ থেকে অবসর নিয়ে আমি গিরিগুহায় গিয়ে ধ্যানে নিমগ্ন হব, তখন আমার বিবেক পরিচ্ছন্ন থাকবে।

'আমরা পাশ্চাত্ত্যবাসীরা বহুত্বকে নিয়েই ব্যাপৃত থাকি।' হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পণ্ডিতাগ্রগণ্য রেভারেণ্ড সি. সি. এভারেট বলছেন, 'কিন্তু যে একত্বের উপর বহুত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে তাকে বুঝতে না পারলে বহুত্বের কোনো বোধই জাগতে পারে না। অদ্বৈত যে একটা বাস্তব সত্য—একথা প্রাচ্যজগৎ আমাদের যথার্থভাবেই শেখাতে পারে আর প্রাণান্বিত, প্রতিভান্বিত বিবেকানন্দের মত আচার্য যখন এই মতবাদের প্রবক্তা, তখন আমাদের শিখতে এতটুকুও দেরি হয় না। এ জন্যে তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।'

'শরীর একটা ভয়ঙ্কর বন্ধন।' মাঝে মাঝে বলে ওঠেন স্বামীজি : 'আমার ইচ্ছে হয় যাতে আমি নিজেকে চিরদিনের মত লুকিয়ে ফেলতে পারি।' মিসেস বুলকে লিখছেন : 'আমার একটা নোটবুক আছে, সেটা আমার সংগে সারা দুনিয়া ঘুরে এসেছে। তাতে সাত বছর আগেকার এই লেখাটি পাচ্ছি—এখন আমি একটি নিরিবিলি কোণ চাই যেখানে শুয়ে পড়ে মরতে পারি। কিন্তু এ সব কর্ম বাকি ছিল। আশা করি আমার প্রারব্ধ শেষ হয়েছে। এখন এটা একটা মায়ার খেলা বলে মনে হচ্ছে—আমি যেন শিশু, এটা-ওটা করার স্বপ্ন দেখছিলাম। আমি ওসব থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছি। সম্ভবত আমাকে এদেশে নিয়ে আসার জন্য একটা উন্মত্ত স্বপ্নের প্রয়োজন ছিল আর এ অভিজ্ঞতার জন্যে আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ।'

আলাসিংগাকে আবার লিখছেন : 'যখন আমি সন্ন্যাসী হই তখন আমি বুঝেসুঝেই ঐ পথ নিয়েছিলাম। বুঝেছিলাম, শরীরটাকে অনাহারে মরতে হবে। তাতে কী হয়েছে? আমি তো ভিখারি। আমার বন্ধুরা সব গরিব। গরিবদের আমি ভালোবাসি। আমি

দারিদ্র্যকে সাদরে বরণ করি। কখনো কখনো যে আমাকে উপোস করে কাটাতে হয় তাতে আমি খুশি। আমি কারো সাহায্য চাই না - তাতে ফল কী? সত্য নিজের প্রচার নিজেই করবে, আমার সাহায্যের অভাবে সে নষ্ট হয়ে যাবে না। সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ, ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব—সুখ-দুঃখ লাভ-অলাভ জয়-পরাজয় সব সমান করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এরূপ অনন্ত ভালোবাসা, সর্বাবস্থায় অবিচলিত সাম্যভাব থাকলে এবং ঈর্ষাদ্বেষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হলে তবে কাজ হবে। তাতেই কেবল কাজ হবে, আর কিছুতেই নয়।'

মহৎ চিন্তার আশ্রয়ে সবসময়েই গম্ভীর হয়ে থাকেন না স্বামীজি, সবার অলক্ষ্যে সহসা আবার লঘুতায় নেমে আসেন। সহজ মানবিক ভূমিতে নেমে এসে পরিহাস করে বসেন। খাবার টেবিলে উপাদেয় খাদ্য দেখলে একেবারে হাত দিয়ে মেখে খেতে শুরু করেন। বলেন, এমনি করে না খেলে কি পেট ভরে? প্রথম-প্রথম আঁতকে উঠত সাহেবেরা, কিন্তু শেষে বুঝল এতেই বুঝি বিবেকানন্দের স্বাভাবিকতা তৃপ্ত হয়—আর, বিবেকানন্দের আনন্দেই তো তার সহচর-অনুচরদের সমর্থন। তাই মাঝে মাঝে বাইরে থেকে ঘরে ঢুকেই স্বামীজি গলার কলার খুলে ফেলেন, খুলে ফেলেন পায়ের বুট। পরিচিত চটি জুতোর মধ্যে পা গলিয়ে দিতে কত আরাম। কৃত্রিম রীতি-নীতি ও আদবকায়দা যেন অবান্তর বন্ধন। ওসব যত দূরে যায় ততই শান্তি।

'যে ভালো রাঁধতে পারে না সে ভালো সাধু হতে পারে না,' বলছেন স্বামীজি, 'মন শুদ্ধ না হলে সুস্বাদু রান্না হবে কী করে?'

পাশ্চাত্য শিষ্যদের বাড়িতে গিয়ে মাঝে মাঝে রান্না করেন স্বামীজি। রান্না দিয়ে মন ভোলান সকলের। মাঝে মাঝে আবার দুষ্টুমি করে বসেন, ভারতীয় গরম মশলা মিশিয়ে দেন—ঝোলকে ঝাল করে তোলেন। তারপর হাসিমুখে লক্ষ্য করেন খানেওলাদের মুখভঙ্গ কেমন বিসদৃশ হয়। এতে কেউই রুষ্ট হয় না বরং তাঁর ছেলেমানুষিতে সবাই আমোদ পায়। বিবেকানন্দ তো শুধু এক দিব্যদীপ্ত মহাপুরুষই নয়, বিবেকানন্দ আবার এক নিষ্কিঞ্চন শিশু। যেমন দুর্ধর্ষ তেজ তেমনি দুর্বার মাধুর্য।

'ধাত্রী যখন কোনো শিশুকে উদ্যানে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে খেলা করতে থাকে,' বলছেন স্বামীজি, 'মা হয়তো তখন শিশুকে ঘরে ডেকে পাঠায়। শিশু তখন খেলায় মত্ত, সে বলে, যাব না, আমি খেতে চাই না। খানিক বাদেই খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শিশু বলে, আমি মার কাছে যাব। ধাত্রী বলে, এই দেখ, নতুন পুতুল। কিন্তু শিশুটি বলে, না, না, পুতুল চাই না, আমি মার কাছে যাব। আর যতক্ষণ না যেতে পারে কাঁদতে থাকে। আমরা সবাই এক-একটি শিশু। ঈশ্বর হলেন জননী। আমরা টাকাকড়ি ধন-দৌলত ইহজগতের এই সব জিনিস খুঁজে বেড়াচ্ছি, কিন্তু সময় আসবেই যখন আমাদের ঘুম ভাঙবে। তখন এই প্রকৃতিরূপিণী ধাত্রী আমাদের আরো পুতুল দিতে চাইবে, আর আমরা বলব, না ঢের হয়েছে, এবার ঈশ্বরের কাছে নিয়ে চলো।'

দুর্লভ্য প্রতিপত্তি ও নির্বারিত মাধুর্যের আশ্চর্য সন্নিবেশ স্বামীজিতে। বলছে তাঁর পাশ্চাত্ত্য শিষ্যেরা: স্বামীজি একাধারে শিশু ও ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ। তাঁর বক্তৃতা শুধু বক্তৃতা নয়, শ্রোতার মধ্যে অধ্যাত্মশক্তিসঞ্চার। যে শোনে সে শুধু মুগ্ধ হয় না, সে এক নতুন মানুষ হয়ে ওঠে।

স্বামীজির বক্তৃতার মূলে নিজের ব্যক্তিত্ব কাজ করছে না, কাজ করছে দৈবপ্রেরণা।

তিনি নিজে বলছেন না, কে যেন তাঁর মুখ দিয়ে বলাচ্ছে। রাত্রে তাঁর নিজের ঘরে এক অশরীরী স্বর আবির্ভূত হয়, পরদিন কী বক্তৃতা দেবেন তাই যেন উচ্চনাদে তাঁকে শুনিয়ে যায়। আশ্চর্য, পরদিনের সভায় বক্তৃতামঞ্চে উঠে দাঁড়ালেই দেখেন পূর্বরাত্রির সে কথাগুলি স্ফুরিত হচ্ছে। রাত্রে কখনো কখনো দুটি বিবদমান স্বর শোনেন, যেন তারা পরস্পর আলোচনা করছে, তর্ক করছে—এ থেকে পরদিনের বক্তৃতায় তর্কযুদ্ধের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করেন। কখনো কখনো স্বর অতি ক্ষীণরেখায় কোন দূর থেকে আসছে মনে হয়, মনে হয় বুঝি পথ হারিয়ে ফেলল, ঘরের মধ্যে এসে পৌঁছুল না, কিন্তু খানিকক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে থাকতেই স্বামীজি চমকে ওঠেন, স্বর জীবন্ত হয়ে উঠেছে, একেবারে চোখের সামনে উচ্চনিনাদে আবির্ভূত হয়েছে।

বলছেন নিবেদিতাকে, অতীতে দৈবপ্রেরণা শব্দটি যে অর্থেই ব্যবহৃত হোক না, সেটা এরকমেরই কিছু হবে।

আমাদের প্রত্যেকের পিছনে অনন্ত শক্তি রয়েছে। বলছেন স্বামীজি, জগদম্বার কাছে প্রার্থনা করলেই ঐ শক্তি তোমাতে আসবে। হে মাতঃ বাগীশ্বরী, তুমি স্বয়ম্ভু, তুমি আমার জিহ্বায় বাগ্‌রূপে আবির্ভূত হও। হে মাতঃ, বজ্র তোমার বাণীস্বরূপ, তুমি আমার ভিতর আবির্ভূত হও। হে কালী, তুমি অনন্ত কালরূপিণী, তুমিই অমোঘ শক্তিস্বরূপিণী। আমার মধ্যে আবির্ভূত হও।

ব্রহ্মানন্দকে লিখছেন, রাখাল, ঠাকুরের দেহত্যাগের পর মনে আছে সকলে আমাদের ত্যাগ করে দিলে—হাভাতে মনে করে। কেবল বলরাম সুরেশ মাস্টার আর চুনীবাবু এরাই আমাদের বিপদে বন্ধু হয়ে দাঁড়াল। অতএব এদের ঋণ আমরা কখনো পরিশোধ করতে পারব না। তুমি এ বিষয় অন্য কাউকে কিছু বলবে না। অথচ গোপনে চুনীবাবুকে বলবে যে তাঁর কোনো ভয় নেই। আমি ক্ষুদ্র জীব, কিন্তু প্রভুর অনন্ত ঐশ্বর্য—মাভৈঃ, মাভৈঃ। বিশ্বাস যেন না টলে। চুনীবাবুকে পেট ভরে যা ইচ্ছে তাই খেতে বল—এ চিঠি পাবার পূর্বেই তাঁর রোগ তিন ভাগ আরাম হয়ে গেছে। প্রভু অতি শীঘ্রই সকল বন্দোবস্ত করে দেবেন। একদম নিশ্চিন্ত হতে বলবে—দেনা-ফেনা সব উড়ে যাবে—কিছু ভয় নেই। মাভৈঃ! খুব আনন্দ করতে বল—তাঁর আশ্রিতের কি নাশ আছে রে বোকারাম?… রাখাল, তুই যেন গুরু-ভয় পাসনে। টাকা গড়গড় করে আসবে তোড়া তৈয়ার হচ্ছে। দেশে গিয়ে যেমনি আঙুল দিয়ে ছোঁব, অমনি গড়গড়িয়ে আসবে।

ত্রিগুণাতীতানন্দকে লিখছেন: সারদা, ঘরে বসে ভাত খেলে কি হয়? তুই খুব বাহাদুরি করেছিস। বাহবা, সাবাস। হুতথুতগুলো পেছু পড়ে থাকবে হাঁ করে, আর তুই লম্ফ দিয়ে সকলের মাথায় উঠে যাবি। ওরা নিজেদের উদ্ধার করছে—না হবে ওদের উদ্ধার, না হবে আর কারুর। মোচ্ছব এমনি মাচাবি যে দুনিয়াময় তার আওয়াজ যায়। অনেকে আছেন যাঁরা কেবল খুঁত কাড়তে পারেন, কিন্তু কাজের বেলা তো খোঁজ-খবর নাহি পাওয়ে। লেগে যা যত পারিস। পরে আমি ইণ্ডিয়ায় এসে তোলপাড় করে তুলব। ভয় কি? নাই-নাই বললে সাপের বিষ উড়ে যায়। নাই-নাই বলে যে না-ই হয়ে যেতে হবে।

গঙ্গাধর খুব বাহাদুরি করছে। সাবাস! কালী তার সঙ্গে কাজে লেগেছে। খুব সাবাস! একজন মাদ্রাজে যা, একজন বম্বে যা। তোলপাড় কর, তোলপাড় কর দুনিয়া। কি বলব, আপশোস,—যদি আমার মত দুটো-তিনটে তোদের মধ্যে থাকত—ধরা কাঁপিয়ে

দিয়ে চলে যেতুম। কি করি, ধীরে ধীরে যেতে হচ্ছে। তোলপাড় কর, তোলপাড় কর। একটাকে চীন দেশে পাঠিয়ে দে, একটাকে জাপান দেশে পাঠা। এ গৃহস্থদের কাজ নয়। সন্ন্যাসীর দলকে হুঙ্কার দিতে হবে—হর হর শম্ভো!

কী তেজোদৃপ্ত ব্যক্তিত্ব, ভয়-ভক্তি-সঞ্চারক, গম্ভীর ও কঠোর, অথচ আবার অমায়িক, রঙ্গপ্রিয়, স্নেহান্বিত। টাকা দিতে চেয়েও ইচ্ছেমত তাঁকে দিয়ে বক্তৃতা করানো যাচ্ছে না দেখে এক বিত্তবতী আমেরিকান মহিলা খেদের সঙ্গে স্নেহ মিশিয়ে বলছে, 'আমি তাঁর জন্যে যত মতলব আঁটি, তিনি শেষ মুহূর্তে সব ভণ্ডুল করে দেন, তিনি নিজের খেয়ালেই চলবেন। তাঁর স্বভাব যেন চীনা-মাটির আসবাবের দোকানে ঢুকে-পড়া পাগলা ষাঁড়ের মত।'

এক মুখ হাসি নিয়ে প্রায়ই বলেন, আমি মেলিকান।

এক চীনা নিজেকে আমেরিকান বলতে গিয়ে বলেছিল, আমি এখন মেলিকান। সেই ভঙ্গিটিই সহাস্যে নকল করছেন স্বামীজি। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট গল্প আছে, আর সে গল্পটি তাঁর কাছে খুব উপভোগ্য।

এক চীনা শুয়োরের মাংস চুরি করে ধরা পড়ে। হাকিম বললে, আমি তো জানতাম চীনারা শুয়োরের মাংস খায় না। তখন চীনা ভাঙা-ভাঙা ইংরিজীতে বললে, আমি তো এখন মেলিকান ম্যান, আমি ব্র্যাণ্ডি খাই, শুয়োর-মাংস খাই, সব খাই।

মিসেস বুল নিবেদিতাকে লিখছে: আমি কতদিন বিবেকানন্দকে ফিস ফিস করে বলতে শুনেছি, আমি মেলিকান! তোমার মত যারা স্বামীজির সঙ্গে অত পরিচিত নয়, তাদের কাছে এসব কথা তুচ্ছ মনে হবে। কিন্তু আমি ঠিক জানি তাঁর সম্বন্ধে কোনো কিছুই তোমার কাছে তুচ্ছ বা না-বলার মত বাজে নয়।

দুটি গল্প স্বামীজির কাছে খুব মুখরোচক—দুটোই পাদ্রীকে নিয়ে।

এক সুদূর নরখাদকের দ্বীপে নতুন পাদ্রী এসেছে। দ্বীপের সরদারকে পাদ্রী জিজ্ঞেস করলে, আমার আগে যিনি এসেছিলেন সেই পাদ্রীকে তোমাদের কেমন লেগেছিল? সরদার উত্তর দিল: ভারি সুস্বাদু!

দ্বিতীয় গল্পের পাদ্রী বলছেন তারস্বরে: জেনো, ভগবান আদমকে তৈরি করেছিলেন কাদা দিয়ে। তৈরি করে তাকে একটা বেড়ার গায়ে লটকে রাখলেন শুকোবার জন্যে। শ্রোতার ভিতর থেকে একজন বলে উঠল, থামুন, বুঝতে দিন। আদমই যখন আদি সৃষ্টি তখন তার আগে বেড়াটা এল কোত্থেকে? পাদ্রী খেপে উঠে বললে, স্যামজোন্স, শোনো—হাঁক-পাঁক করে আজে-বাজে প্রশ্ন করা ছেড়ে দাও। তুমি সমস্ত ধর্মতন্ত্র ভেঙে চুরমার করে দেবে নাকি?

নিজেই গল্প বলছেন আর হাসছেন স্বামীজি।

আবার সরস লঘুতা থেকে প্রজ্ঞালোকিত চৈতন্যভূমিতে উঠে যাচ্ছেন মুহূর্তে। হাস্য-পরিহাসের নির্ঝরধারার থেকে আবার অধ্যাত্মলোকের পর্বতচূড়ায়।

'অস্তি-নাস্তি কিছু নেই, সবই আত্মস্বরূপ।' বলছেন স্বামীজি, 'সমুদয় আপেক্ষিক ভাব, সমুদয় দ্বন্দ্ব দূর করে দাও। সব কুসংস্কার ঝেড়ে ফেল, জাতি কুল, দেবতা, আর যা কিছু সব চলে যাক। থাকা, হওয়া—এ সবের কথা কেন বল? দ্বৈত-অদ্বৈত সমুদয় কথা বিসর্জন দাও। তুমি দুই ছিলে কবে যে দ্বৈত-অদ্বৈতের কথা বলছ? এই জগৎ প্রপঞ্চ সেই শুদ্ধবুদ্ধস্বভাব ব্রহ্ম মাত্র, তিনি ছাড়া আর কিছু নয়। যোগের

দ্বারা বিশুদ্ধি লাভ হবে এ কথা বোলো না—তুমি স্বয়ং যে শুদ্ধস্বভাব। তোমায় কে শিক্ষা দেবে? গুরুই বা কে? শিষ্যই বা কোন জন?'

স্বামীজির আমেরিকান শিষ্য বলছেন, দিনে রাত্রে প্রতিমুহূর্তে কত উচ্চ চিন্তার চমক হানছেন স্বামীজি, কত আশা, কত আলো, কত আনন্দ। তাঁর সঙ্গে বেড়ানো, তাঁর সঙ্গে খাওয়া, তাঁর কাছটিতে চুপ করে বসে থাকা সমস্তই একটা বিরাটের অনুভূতি।

আরেকজন বলছেন, তিনি সর্বদা এই বোধই জাগিয়ে রাখতেন যে তিনি শরীর নন তিনি বিদেহ আত্মা। অথচ তাঁর রাজেন্দ্রসুন্দর গরীয়ান শরীর সকলের কাছেই কী আকর্ষণীয় ছিল!

'দূরবিনের কাচের দাগগুলি দেখে সূর্যকেও দাগযুক্ত মনে করাই আমাদের মুখ্য ভ্রম।' বলছেন বিবেকানন্দ, 'কিন্তু যেমন সূর্যের আলোকেই আমরা ঐ দাগগুলি দেখতে পাই, তেমনি ব্রহ্মরূপ সত্যবস্তু পিছনে না থাকলে আমরা মায়াটাকেও দেখতে পেতাম না। স্বামী বিবেকানন্দ বলে মানুষটা ঐ দূরবিনের কাচের উপরকার দাগমাত্র। আসলে আমি সত্যস্বরূপ অপরিণামী আত্মা, আর কেবল সেই সত্যবস্তুটাই আমাকে, স্বামী বিবেকানন্দকে, দেখতে সমর্থ করছে। সকল ভ্রমের মূলীভূত সার সত্তা আত্মা—আর যেমন সূর্য কখনো ঐ কাচের উপরের দাগগুলির সঙ্গে মিশে যায় না, আমাদের দাগগুলি দেখিয়ে দেয় মাত্র, তেমনি আত্মাও কখনো নামরূপের সঙ্গে মিশে যায় না। আমাদের শুভ ও অশুভ কর্ম ঐ দাগগুলিকে কমায়-বাড়ায় মাত্র, কিন্তু তারা আমাদের অভ্যন্তরস্থ ঈশ্বরের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। মনের দাগগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে ফেল। তা হলেই আমরা দেখব—আমি ও আমার পিতা এক।'

আবার সাধারণ মানবিকতায় ফিরে আসেন স্বামীজি। দেখেন হাত-পায়ের নখ অসম্ভব বড় হয়েছে। জর্জ হেলের বাড়িতে আছেন, এক মেয়ের কাছে একটা পেন্সিল-কাটা ছুরি চাইলেন।

'কী করবেন ছুরি দিয়ে?'

'হাত-পায়ের নখ কাটব।'

যন্ত্রপাতি নিয়ে এল মেয়ে। গালচের উপর পিছন দিকে পা মুড়ে বসল নিচু হয়ে। সন্তর্পণে প্রথমে পায়ের বুট খুললে, পরে মোজা খুললে। তার পরে শুরু করল নখ কাটা। কখনো পা নিজের হাঁটুর উপর রেখে ধীরে ধীরে নখ কাটছে, আবার কখনো গালচের উপর রেখে নিজের মাথা হেঁট করে হুমড়ি খেয়ে পড়ে নখ চাঁচছে—সে যে কত রকম কারুকার্য, স্বামীজি মুগ্ধ হয়ে রইলেন। ভাবলেন এ কী বন্ধনে এসে পড়লেন, ছাড়িয়ে নিতে গেলেও যে ব্যথা বাজে। সব পরিপাটি করে কেটে-চেঁছে আবার দুপায়ে মোজা পরিয়ে দিল মেয়েটি, বুট পরিয়ে দিল, সযত্নে বেঁধে দিল ফিতে। যন্ত্রপাতি গুটিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ হাত পেতে বললে, 'দিন, দাম দিন। আমরা আমেরিকান, দাম না পেলে কোনো কাজ করি না। নাপিতের দোকানে গেলে দু-তিন ডলার দিতে হত, আমি ঘরে বসে নখ কেটে দিয়েছি, আমাকে না হয় এক ডলার দিন।'

স্বামীজি বললেন, 'সে কী! এই যে আমার পা ছুঁয়েছ, নখ কাটবার অধিকার পেয়েছ, এর দরুন আমাকে কী প্রণামী দেবে তাই আগে বলো। পোপের পা ছুঁতে পেলে কত ডলার দিতে হয়?'

'বা, মজা মন্দ নয়। কাজও করব আবার ঘর থেকে টাকাও দেব।' হাততালি দিয়ে নাচতে-নাচতে চলে গেল মেয়েটি।

একবার এক শিষ্যার বাড়িতে আছেন স্বামীজি, শিষ্যার এক মহিলা-বন্ধু সে বাড়িতে থাকতে এল। এসেই ঘোরতর জ্বরে পড়ল। যন্ত্রণায় ছটফট করছে মহিলা, স্বামীজি তার ঘরে তার শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আমি তোমার অসুখ ভালো করে দেব।'

'সত্যি ?' মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকাল রুগিনী।

রুগিনীর পাশে বসলেন স্বামীজি। তার দুখানি-হাত তাঁর দু হাতের তালুর উপর রাখতে বললেন। রুগিনী তাই রাখল। স্বামীজির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। দেখল চোখদুটি মুদ্রিত, মুখমণ্ডলে আশ্চর্য প্রশান্তি। আরো কতক্ষণ পরে দেখল স্বামীজি নিশ্চল হয়ে গিয়েছেন। তাঁর তপ্ত স্পর্শ ক্রমশ শীতল হয়ে আসছে। সে কী, স্বামীজি যে দেখছি কাঠের মত শক্ত হয়ে উঠেছেন। কী হল তাঁর ?

তাঁর আবার কী হবে ? রুগিনীরই আর জ্বর নেই।

হঠাৎ চোখ খুললেন স্বামীজি। হাত ছেড়ে দিয়ে দ্রুতগতিতে ঘরের বাইরে চলে গেলেন। রুগিনী আবিষ্কার করল তার সমস্ত জ্বর-জ্বালা অন্তর্হিত হয়েছে।

যোগবলে ব্যাধি সারিয়ে দিয়েছেন স্বামীজি।

দর্শনের অধ্যাপক উইলিয়ম জেমস স্বামীজিকে গুরু বলে মেনেছে। তাঁর কাছে নিয়েছে রাজযোগের পাঠ আর সেই রাজযোগ অভ্যাস করে তার স্নায়ুরোগ সারিয়ে নিয়েছে!

'ধর্ম তোমাকে নতুন কিছুই দেয় না, কেবল প্রতিবন্ধগুলি সরিয়ে দিয়ে তোমার নিজের স্বরূপ দেখতে দেয়।' বলছেন বিবেকানন্দ, 'ব্যাধিই প্রথম মস্ত বিঘ্ন—সুস্থ শরীরই সেই যোগাবস্থা লাভ করবার সর্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রস্বরূপ। দৌর্মনস্য বা মন-খারাপ-হওয়ারূপ বিঘ্নটিকে দূর করা একরকম অসম্ভব বললেই হয়। তবে একবার যদি তুমি ব্রহ্মকে জানতে পারো, পরে আর তোমার মন খারাপ হবার সম্ভাবনা থাকবে না। সংশয়, অধ্যবসায়ের অভাব, ভ্রান্তধারণা—এগুলোও অন্যান্য বিঘ্ন।'

স্বামীজির উপস্থিতি যেমন রোগ সারাতে পারে তেমনি বিরুদ্ধবাদীদের প্রাতিকূল্যকে পরাস্ত করতে পারে। তাঁর এক আমেরিকান শিষ্য লিখছেন : 'আমি এমন একজনের কথা জানি যে স্বামীজির সঙ্গে বিরুদ্ধ তর্ক করতে গিয়ে এমন স্নায়বিক আঘাত পেয়েছিল যে তিন দিন সে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি। স্বামীজির মধ্যে এমন শক্তি আছে যে ইচ্ছে করলে তিনি বিরুদ্ধবাদীর বক্তব্যকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন।'

স্বামীজির স্বপ্ন আমেরিকায় একটি মন্দির নির্মাণ করবেন, তার নাম হবে বিশ্বজনীন মন্দির বা সংক্ষেপে বিশ্বমন্দির। সে কথা এক চিঠিতে জানালেন আলাসিঙ্গাকে : 'এ সংবাদটি এখুনি প্রকাশ করে দিও না যেন, ঠিক সময়ে আমি জগন্মণ্ডলীর সামনে প্রচণ্ড বেগে আত্মপ্রকাশ করব। স্থির হয়ে থাকো, বৎস ! স্থির হও আর কাজ করে যাও।'

'সে-মন্দিরে শুধু একটি প্রতীকেরই উপাসনা হবে।' বলছেন বিবেকানন্দ, 'সে প্রতীকের নাম ওঁ—ওঁ-ই নিত্যসত্য অদ্বিতীয়। ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ নাম ওঁ, সুতরাং ঐ ওঙ্কার জপ করো, তার ধ্যান করো, তার ভিতর যে অপূর্ব অর্থসমূহ নিহিত আছে, তা ভাবনা করো। সর্বদা ওঙ্কার জপই যথার্থ উপাসনা। ওঙ্কার সাধারণ শব্দমাত্র নয়, স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ।'

'ওঁ তৎসৎ—অর্থাৎ একমাত্র সেই নির্গুণ ব্রহ্মই মায়ার অতীত, কিন্তু সগুণ ঈশ্বরও নিত্য।' আবার বলছেন স্বামীজি, 'যতদিন নায়গ্রা-প্রপাত রয়েছে ততদিন তাতে প্রতিফলিত রামধনুও রয়েছে। কিন্তু প্রপাতের প্রবাহে ছেদ নেই। ঐ জলপ্রপাত জগৎপ্রপাত আর রামধনু সগুণ ঈশ্বর—দুই-ই নিত্য। যতক্ষণ জগৎ আছে ততক্ষণ জগদীশ্বর অবশ্যই আছেন। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করছেন, আবার জগৎ ঈশ্বরকে সৃষ্টি করছে—দুইই নিত্য। মায়া সৎও নয়, অসৎও নয়। নায়গ্রা-প্রপাত ও রামধনু দুইই অনন্তকালের জন্যে পরিণামশীল—দুইই মায়ার মধ্য দিয়ে দৃষ্ট ব্রহ্ম। পারসিক ও খৃস্টানেরা মায়াকে দু অংশে ভাগ করে ভালো অর্ধেকটাকে ঈশ্বর আর মন্দ অর্ধেকটাকে শয়তান নাম দিয়েছে। বেদান্ত মায়াকে সমষ্টিরূপে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে আর তার পিছনে ব্রহ্মরূপে এক অখণ্ড সত্তা স্বীকার করে।'

আমেরিকার মহিলারা স্বামীজিকে না জানিয়ে স্বামীজির মা ভুবনেশ্বরীকে একটি চিঠি লিখে পাঠাল :

'বিবেকানন্দ-জননী সমাপেষু,

প্রিয় মহোদয়া,

এই ক্রিসমাসের পর্বে যখন সমস্ত বিশ্ব মেরীপুত্রকে নিয়ে উৎসবে মুখর, তখন এটাই ঠিক স্মরণের সময়—শুধু পুত্রকে নয়, তার জননীকেও। পুত্র আমাদের কাছেই আছেন, আমরা জননীকে অভিনন্দন পাঠাচ্ছি। কয়েকদিন আগে তিনি এখানে ভারতীয় মাতৃত্বের আদর্শ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছেন তাঁর যা কিছু কল্যাণকর্ম সমস্তের মূলে তাঁর জননীর প্রেরণা। এখানকার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার জন্যে তাঁর যে সেবার বদান্যতা তারও উৎস আপনারই শ্রীচরণে। সেদিন তাঁর কথা শুনে সকলের মনে হয়েছিল তাঁর জননীকে অর্চনা করলে দিব্যশক্তি লাভ করা যাবে, ঘটবে আত্মিক অভ্যুদয়।

হে পুণ্যচরিতে, আপনার জীবন ও কর্ম আপনার পুত্রের চরিত্রে প্রতিফলিত। সেই মাহাত্ম্যের স্বীকৃতিতে আপনাকে আমরা আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। দয়া করে তা গ্রহণ করুন। আমাদের এই শ্রদ্ধা-উপহার সকলকে এ কথাই সুস্পষ্ট ভাবে স্মরণ করিয়ে দেবে যে, জগৎ ভগবানের থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে যে সৌভ্রাত্র ও একপ্রাণতা অর্জন করেছে তার প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠার আর দেরি নেই।'

চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দিল একখানি ছবি—মাতা মেরীর কোলে পুত্র যীশু।

ভারতীয় নারীর বিভিন্ন আদর্শের মধ্যে মাতার আদর্শই শ্রেষ্ঠ—স্ত্রীর চেয়েও তার স্থান উচ্চে। বলছেন স্বামীজি : স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করতে পারে কিন্তু মা পারে না। মায়ের ভালোবাসায় জোয়ার-ভাঁটা নেই, কেনা-বেচা নেই, জরা-মরণ নেই। শাক্তেরা জগতের সর্বব্যাপিনী শক্তিকে মা বলে পুজো করে—মা নাম করলেই শক্তির ভাব, সর্বশক্তিমত্তা, ঐশ্বরিক শক্তির উদয় হয়। শিশু নিজের মাকে সর্বশক্তিময়ী বলে মনে করে। আমাদের পার্থিব জননীতে সেই জগন্মাতার যে এক কণা প্রকাশ পেয়েছে তারই উপাসনায় মহত্ত্বলাভ হয়।

এই দেশেও মা—মাতৃভাবও যথেষ্ট। প্রটেস্টান্ট তো ইওরোপে নগণ্য—ধর্ম তো ক্যাথলিক। সে ধর্মে জিহোবা, যীশু, ত্রিমূর্তি—সব অন্তর্ধান, জেগে বসে আছেন শুধু মা। লক্ষ স্থানে লক্ষ রকমে লক্ষ রূপে, অট্টালিকায়, বিরাট মন্দিরে, পথপ্রান্তে, পর্ণকুটিরে

মা, মা, মা। রাজা ডাকছে মা, ফিল্ড মার্শাল—জঙ্গ বাহাদুর সেনাপতি ডাকছে মা, বন্দুকহাতে সৈনিক ডাকছে মা, জাহাজে নাবিক ডাকছে মা, জীর্ণবস্ত্র জেলে ডাকছে মা, রাস্তার কোণে ভিখিরি ডাকছে মা—ধন্য মেরী, ধন্য মেরী দিনরাত এই ধ্বনি উঠছে।

আমিও আমার মাকে ডাকি, মাকে দেখি, মাকে ভুলি না। বলছেন আমেরিকান মহিলাদের, আমার মা-ই আমার সমস্ত কর্মের প্রেরণা। মার নিঃস্বার্থ স্নেহ ও প্রদীপ্ত পবিত্রতাই আমার সন্ন্যাসী-জীবনের পরম বিত্ত। মার ত্যাগ ও করুণা না থাকলে আমি কোথায়! আর নিজের মাকে ভালো না বাসলে কোথায় জগন্মাতা!

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়ে আমেরিকান সভ্যতার অপকৃষ্ট দিকটা খুলে দেখালেন স্বামীজি। নিন্দায় নির্মমরূপে মুখর হয়ে উঠলেন। বহু শ্রোতা বিরক্ত হয়ে উঠে চলে গেল। তবু স্বামীজি তাঁর বক্তব্য থেকে বিচলিত হলেন না।

পরদিন খবরের কাগজে ছাপার অক্ষরে নিজের বক্তৃতা পড়ে স্বামীজি ম্লান হয়ে গেলেন। তাঁর নির্ভীকতা ও অকাপট্যের প্রশংসা দেখেও খুশি হতে পারলেন না। ছি ছি, তিনি রামকৃষ্ণের শিষ্য হয়ে এমনি পরনিন্দা করেছেন! শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন স্বামীজি। বন্ধুদের বললেন, 'আমার গুরুদেব মানুষের দোষ দেখতেন না—একটি পিঁপড়েরও তিনি নিন্দা করেন নি। নিজের নিকৃষ্টতম নিন্দুকের প্রতিও প্রেম ছাড়া অন্য কোনো ভাব তিনি পোষণ করতেন না। আমি গুরুদেবের কথা বলতে গিয়ে অন্যের নিন্দা করেছি, অন্যের মনে আঘাত দিয়েছি—এতে আমার গুরুদ্রোহের অপরাধ হয়েছে। তাঁর মানে আমি শ্রীরামকৃষ্ণকে এখনো আত্মসাৎ করতে পারিনি, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলার আমার যোগ্যতা নেই।'

এতেই আবার স্বামীজির নিবর্গল সারল্য, নিষ্কলুষ মানবমমতা! নিরঙ্কুশ গুরুভক্তি!

'আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় দুজনমাত্র বিখ্যাত ব্যক্তির দর্শন পেয়েছি যাদের সামনে নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে স্বচ্ছন্দ সারল্যে চলা-ফেরা করা যায়—তাদের একজন হচ্ছেন জার্মানীর সম্রাট আর-একজন হচ্ছেন বিবেকানন্দ।'

কেউ-কেউ বলে রাজাধিরাজ সন্ন্যাসী। সর্বদা ভগবদভাবে বিভোর, কেউ বলে বুদ্ধ, কেউ বলে খৃস্ট, কেউ বলে উপনিষদের ঋষি। কেউ বা প্রব্রাজক শঙ্করাচার্য। মহত্তম চেতনার ভাস্বর ভাস্কর। সত্যকে উপলব্ধি করবার সাহসে ও তেজে চিরজাগ্রত। মুখমণ্ডলে অপার্থিব প্রেম ও প্রশান্তি, দুই চোখে অফুরন্ত আশীর্বাদ। এই এক লোক যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে বহুদূর পথ হেঁটেছেন। এঁর কথা না শুনে উপায় নেই। আর ওঁকে দেখা মানেই ঈশ্বরত্বকে স্পর্শ করা।

৮২

আঠারোশ ছিয়ানব্বুই সালের পনেরো এপ্রিল স্বামীজি ইংলণ্ডের জাহাজ নিলেন। খবর পেয়েছেন কলকাতা থেকে গুরুভাই সারদানন্দ স্বামী আগেই ইংলণ্ডে এসে গেছে—আছে রিডিং শহরে, পূর্বপরিচিত স্টার্ডির বাড়িতে। স্বামীজি তাই রিডিং-এ এসে উপস্থিত হলেন। উঠলেন স্টার্ডির বাড়িতে।

সারদানন্দকে দেখে স্বামীজির আনন্দ আর ধরে না। কতদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণের গায়ের গন্ধ নিয়ে মনোনীত দূত এল।

স্টার্ডির আনন্দও দেখবার মত।

কদিন পরে এসে গেল ছোট ভাই, মহেন্দ্র দত্ত। মায়ের—ভুবনেশ্বরীর গন্ধ মেখে।

'এবার সমুদ্রযাত্রা রমণীয় হয়েছে, এবার আর সাগরপীড়ায় কাতর হইনি।' মিস হেলকে চিঠি লিখছেন স্বামীজি: 'কিন্তু এখানে পৌঁছেই আবার সেই ব্রহ্ম, মায়া, জীবাত্মা, পরমাত্মা এসে জুটেছে। আমি যখনই আমেরিকার বাইরে যাই, তখনই আমেরিকাকে বেশি ভালোবাসি।'

তারপর লিখলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে—কী ভাবে মঠ চালাবে তার নানা রকমের নির্দেশ দিয়ে। প্রথমেই লিখলেন: 'দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো, এ কথা কখনো ভুলবে না। নিয়মবন্ধ হওয়া আমাদের নয় বটে কিন্তু কাঁচা অবস্থায় নিয়মের অনুগামী হওয়া বিশেষ দরকার। প্রভুর কথা মনে করো, কাঁচ গাছের চারদিকে বেড়া দিতে হয়। আমি নিজের কর্তৃত্ব জাহির করবার আশায় নয়, শুধু তোমাদের কল্যাণ ও প্রভুর অবতীর্ণ হবার উদ্দেশ্যকে সফল করবার জন্যে লিখছি। তিনি তোমাদের ভার আমার উপরেই দিয়ে গিয়েছেন আর আমি জানি তোমাদের দিয়ে জগতের মহাকল্যাণ হবে—তাই এসব লেখা। তোমাদের মধ্যে দ্বেষভাব ও অহমিকা প্রবল হলে বড়ই দুঃখের বিষয়। যারা দশ জনে দশ দিন প্রীতিতে বাস করতে পারে না তাদের দ্বারা জগতে প্রীতিস্থাপন কি সম্ভব?'

তারপর বহুতর নির্দেশ লিপিবদ্ধ করে শেষ দিকে লিখছেন:

'মতামত সম্বন্ধে এই যে, যদি কেউ পরমহংসদেবকে অবতার ইত্যাদি বলে মানে, উত্তম কথা, না মানে, উত্তম কথা। সার এই যে, পরমহংসদেব চরিত্র সম্বন্ধে পুরাতন ঠাকুরদের উপরে যান এবং শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি সকলের চেয়ে উদার ও নতুন প্রগতিশীল। অর্থাৎ পুরোনোরা সব একঘেয়ে। এ নতুন অবতার বা শিক্ষকের এই শিক্ষা যে, এখন যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, কর্মের উৎকৃষ্ট ভাবগুলো একত্র করে নতুন সমাজ তৈরি করতে হবে। পুরোনোরা বেশ ছিলেন বটে, কিন্তু এ যুগের এই ধর্ম—একাধারে যোগ জ্ঞান ভক্তি কর্ম -আচণ্ডালে জ্ঞান-ভক্তি দান—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। ও সকল কেষ্ট-বিষ্টু বেশ ঠাকুর ছিলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণে একাধারে সব ঢুকে গেছেন। সাধারণ লোকের পক্ষে এবং প্রথম উদ্যোগীর পক্ষে নিষ্ঠা বড়ই আবশ্যক—অর্থাৎ শিক্ষা দাও, অন্য সকল দেবকে নমস্কার কিন্তু পুজো রামকৃষ্ণের। নিষ্ঠা ভিন্ন তেজ হয় না—তা না হলে মহাবীরের ন্যায় প্রচার হয় না। আর ওসব পুরোনো ঠাকুর দেবতা বুড়িয়ে গেছে—এখন নূতন ভারত, নূতন ঠাকুর, নূতন ধর্ম, নূতন বেদ। হে প্রভো, কবে এ পুরোনোর হাত থেকে উদ্ধার পাবে আমাদের দেশ? গোঁড়ামি না হলে কল্যাণ দেখছি কই? তবে অপরের প্রতি দ্বেষ ত্যাগ করতে হবে।'

আবো লিখছেন: 'প্রভু তোমাদের সৎবুদ্ধি দিন। দুজনে জগন্নাথ দেখতে গেল, একজন দেখলে ঠাকুর, আর একজন দেখলে পুঁইগাছ! বাবু হে, তোমরা সকলেই তাঁর সেবায় ছিলে বটে, কিন্তু যখনই মন-ফুলে আমড়া গাছ হবে তখনই মনে করো যে থাকলে কি হয় তাঁর সঙ্গে? দেখছ কেবল পুঁই গাছ! যদি তা না হত তো এতদিন প্রকাশ হত। তিনি নিজেই বলতেন, 'নাচিয়ে গাহিয়ে তারা নরকে যাইবে।' ঐ নরকের মূল অহঙ্কার।

'আমিও যে ওও সে'—বটে রে মাধো ? 'আমাকেও তিনি ভালোবাসতেন'—হায় মধুরাম, তা হলে কি তোমার এ দুর্গতি হয় ? এখনও উপায় আছে—সাবধান ! মনে রেখো যে তাঁর কৃপায় বড় বড় দেবতার মত মানুষ তৈরি হয়ে যাবে, যেখানে তাঁর দয়া পড়বে। এখনও সময় আছে—সাবধান ! আজ্ঞানুবর্তিতাই প্রথম কর্তব্য।

রাখালকে বলবে যে সকলের দাস সেই সকলের প্রভু। যার ভালোবাসায় ছোট-বড় আছে, সে কখনও অগ্রণী হয় না। যার প্রেমের বিরাম সেই, উচ্চ-নীচ নেই, তার প্রেম জগৎ জয় করে।'

লণ্ডনে লেডি মার্গ্যুসনের বাড়ি ভাড়া নিল স্টার্ডি। লেডি মার্গ্যুসন কয়েক মাসের জন্যে অন্যত্র যাওয়ায় বাড়িটা খালি পাওয়া গেল—আসবাব-সজ্জিত বাড়ি। সেখানেই স্বামীজি বাসা নিলেন। তাঁর সঙ্গে থাকতে এল সারদানন্দ, বৃদ্ধা মিস হেনরিয়েটা মুলার, গুডউইন আর মহেন্দ্র। বাড়ির ঠিকানা ৬৩ সেণ্ট জর্জেস রোড, লণ্ডন।

লণ্ডনে স্বামীজিকে মহেন্দ্র প্রথম দেখল চীপসাইডের একটা চৌমাথার কোণে দাঁড়িয়ে আছেন, পাশে এক সাহেব আর সারদানন্দ। সাহেব আর কেউ নয়, গুডউইন। সারদানন্দকে তো সহজেই চেনা যাচ্ছে। কিন্তু ঐ, ঐ কি কলকাতার নরেন্দ্রনাথ ? গায়ের রঙ আগের চেয়ে ঢের বেশি উজ্জ্বল হয়েছে, চোখদুটি আরো বিশাল আরো বিশদ, ভিতর থেকে যেন কী এক তেজ ফুটে বেরুচ্ছে—কোনো কিছুতে প্রতিহত হচ্ছে না। আর, কথা বলছেন, যেন শঙ্খ বাজছে। স্বর এমনি সতেজ ও গম্ভীর। শব্দস্রোত বহুদূরে পর্যন্ত ছুটে যাচ্ছে অবাধে। যে শুনেছে সেই আকৃষ্ট হচ্ছে। কে এই স্বর-সম্রাট !

মাদ্রাজের কৃষ্ণ মেনন মহেন্দ্রকে নিয়ে এসেছিল পথ চিনিয়ে। বললে, 'মাদ্রাজে যে স্বামীজিকে দেখেছি, যাকে তামাক সেজে দিয়েছি, যে আমার সঙ্গে কত হাসিঠাট্টা করেছে সে এ লোক নয়। এ যেন একেবারে অন্য মানুষ। এর ভেতর এখন এমন শক্তি জেগেছে যে কাছে গিয়ে কথা কইতে ভয় হয়। ইচ্ছে করে নিজে না নিচে নেমে এলে সাধ্য নেই তুমি আলাপ করো। এ এক দারুণ যৌগিক শক্তির বিস্ফোরণ।'

মহেন্দ্রের ডাক নাম মহিম। তাকে সেণ্ট জর্জ রোডের বাড়িতে দেখে স্বামীজি উল্লসিত হয়ে উঠলেন : 'তোকে এ বাড়িতে কে নিয়ে এল ?'

'কৃষ্ণ মেনন।'

'তুই আছিস কোথায় ?'

কাছেই একটা রাস্তা, ঠিকানা বললে মহেন্দ্র।

'তুই আমার এখানেই থাকবি। ও-বাসা তুলে দে।' নির্দ্বিধায় আদেশ করলেন স্বামীজি : 'আমার জন্যে 'বাচস্পত্যম অভিধানম' এনেছিস ?'

'এনেছি।'

'শোন।' পাশে একটা নির্জন কক্ষে নিয়ে গেলেন। বললেন, 'আমাকে দেখে তোর মনে কী ভাব হচ্ছে, শুধু এখনকার নয়, কয়েকদিন আগে পর্যন্ত কী চিন্তা করেছিস, সব তোকে স্পষ্ট বলে দেব।'

'বলো না শুনি।' মৃদু হাসল মহেন্দ্র।

আশ্চর্য, সব ঠিক-ঠিক বলে গেলেন স্বামীজি। যেন একটা খোলা বই দেখে পড়ে যাচ্ছেন এমনি স্বাচ্ছন্দ্যে বলে গেলেন। চীপসাইডের মোড়ে দেখে কী ভাব হয়েছিল তাই নয়, লণ্ডনে এসে অবধি কোন কোন চিন্তায় সে কাতর ও আচ্ছন্ন হচ্ছে সব হুবহু বর্ণনা

করলেন। কে বলবে এ সেই গৌর মুখার্জি লেনের নরেন্দ্রনাথ, এ এক বৈদিক ঋষি, যোগসিদ্ধ জগদগুরু।

আবার কতক্ষণ পরে নরেন্দ্রনাথ হয়ে গেলেন। বললেন, 'এই পাঁচ পাউন্ড নে, খরচ-পত্রের জন্যে ভাবিসনে, আমি আছি।'

উপহারস্বরূপ পাওয়া একটা সোনার কলমও দিয়ে দিলেন। মহেন্দ্র সেটা আবার আরো ছোট ভাই ভুপেনকে পাঠিয়ে দিল।

জ্ঞানযোগের ক্লাশ খুললেন স্বামীজি। সেই জ্ঞানযোগ যার আলোকে সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন, যার আলোকে মানুষের আত্মস্বরূপের উপলব্ধি। সকল জিনিসের 'কেন' জানা, শুধু 'কী করে হয়' জেনে থেমে থাকা নয়।

'বিজ্ঞানবিৎ হওয়া খুব ভালো এবং গৌরবের বিষয় বটে,' বলছেন স্বামীজি, 'কিন্তু যখন কেউ বলে এই বিজ্ঞানচর্চাই সর্বস্ব, এ ছাড়া জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই, তখন বুঝতে হবে সে নির্বোধের মত কথা বলছে। বুঝতে হবে সে কখনো জীবনের মূলে রহস্য জানতে চেষ্টা করেনি। আসল বস্তু কী সে সম্বন্ধে কোনো অনুসন্ধান চালায়নি। আমি অনায়াসেই তর্ক করে বুঝিয়ে দিতে পারি তোমার যত কিছু জ্ঞান সব ভিত্তিহীন। তুমি প্রাণের বিভিন্ন বিকাশগুলো নিয়ে আলোচনা করছ, কিন্তু যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, প্রাণ কী, তুমি বলবে, আমি জানি না। আর যদি জিজ্ঞেস করি, প্রাণ কেন, তা হলে তো আরো তলিয়ে যাবে। অবশ্য তোমার যা ভালো লাগে তা করতে তোমায় কেউ বাধা দিচ্ছে না কিন্তু আমাকে আমার ভাবে থাকতে দাও।'

পিকাডিলি অঞ্চলে 'রয়েল ইনস্টিটিউট অব পেনটার্স ইন ওয়াটার কালার্স' নামক প্রতিষ্ঠানের গ্যালারিতে প্রত্যেক রবিবার বক্তৃতা দিতে সুরু করলেন স্বামীজি।

বিকেলে ঘোড়াটানা বাসএ করে পিকাডিলির দিকে চলেছে পাঁচ জন। ছাদের উপর সামনের দিকে স্বামীজি আর স্টার্ডি বসেছেন পাশাপাশি, সিগারেট টানছেন, আর পিছনে গুডউইন, সারদানন্দ আর মহেন্দ্র। 'ধর্মের প্রয়োজন' বা 'সার্বজনীন ধর্ম' বা 'মানুষের স্বরূপ—প্রকৃত ও আভাসমান' এরকম সব কঠিন বিষয়ে বক্তৃতা হবে, তার জন্যে স্বামীজির মুখে বিন্দুমাত্র উদ্বেগের ছায়া নেই। স্টার্ডির সঙ্গে দিব্যি হাসিঠাট্টা করতে-করতে চলেছেন। লেকচার-হলে ঢুকতেই দেখছেন, কেউ-কেউ তাঁর আগের থেকেই চেনা—তাদের সঙ্গে সম্ভাষণ-বিনিময় করছেন, লঘু স্বরে আলাপ-আপ্যায়ন করছেন, যেন স্বামীজিও তাদেরই মত একজন শ্রোতামাত্র। এতটুকু শঙ্কা-চিন্তা নেই, নেই এতটুকু অস্থৈর্য।

হ্যাঁ, ধীরে-ধীরে মঞ্চের দিকেই অগ্রসর হচ্ছেন স্বামীজি, মনে পড়েছে একটা গভীর বিষয়ের উপর তাঁকে জোরালো বক্তৃতা দিতে হবে। কিন্তু বিষয়টা কী? গুডউইন যে আগে থেকেই কাগজে-কাগজে বক্তৃতার বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিয়েছে, যার দরুণ এই অসম্ভব ভিড়, সেই বক্তৃতার বিষয়টা তাঁকে জানতে দেবে তো? গুডউইনের দিকে একবার জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন, গুডউইন তখন কাছে এসে কানে-কানে বলার মত করে বিষয়টা মনে করিয়ে দিল।

মঞ্চের উপর উঠে দাঁড়ালেন স্বামীজি। কাঠের মঞ্চ, তার উপরে সামান্য একটা টেবল আর টেবলের উপর জলের কুঁজো আর গ্লাশ। চেয়ার নেই, আগে বা শেষে বসবার প্রশ্রয় নেই। ওঠো, দাঁড়িয়ে থেকে বক্তৃতা দাও, আর বলা শেষ করে নেমে যাও। তাই করব। বলার শেষে বা বলতে বলতে থেমে গিয়ে আর-কিছু বলবার নেই বলে বসে পড়ব না।

স্বামীজি বুকের উপর দু হাত রেখে স্থির চোখে দাঁড়ালেন নিশ্চল হয়ে। তারপর খানিকক্ষণ ধীরে ধীরে পাইচারি করলেন। তারপরে স্থির হলেন, দৃঢ় হলেন, প্রশান্ত হলেন। এ যেন আরেক ব্যক্তি, আরেক আবির্ভাব। লঘুতার কুয়াশা সরিয়ে যেন পর্বতের সৌধচূড়ায় দেখা দিলেন বিভাবসু। যেন স্তম্ভ বিদীর্ণ করে বেরুল নরসিংহ। বক্তৃতার আরম্ভটি মৃদু-মধুর, ক্রমে-ক্রমে শিখর হতে শিখরে আরোহণ, স্বর ক্রমশই গম্ভীর, উদাত্ত, মহাবলসম্পন্ন হয়ে উঠল। যেন কোন দূরের সমুদ্র কাছে এসে তরঙ্গিত ও নিনাদিত হচ্ছে। ঘরের দূর কোণের লোকও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে এমন সতেজ স্বরনিক্ষেপ। আর সে-বলা এমন বলা, যা মাত্র একজনই বলতে পারে আর তার নাম বিবেকানন্দ।

ভাব যেন চোখের সামনে মূর্তি ধরে দেখা দেয় আর শব্দই সে মূর্তির প্রতিচ্ছবি। 'আমি যদি বুদ্ধকে অভীষ্ট করে ধ্যান করি আমি বুদ্ধ হয়ে যাই, যদি শঙ্করাচার্যকে অভীষ্ট করে ধ্যান করি শঙ্করাচার্য হয়ে যাই। আমার সামনে এক অদৃষ্টপূর্ব পুরুষ এসে দাঁড়ায়, আমি তাকে দেখি আর তার কথা বলি। আমার নিজের বলে কিছু বলার থাকে না। একেই বলে ভাবের আকারধারণ, ভাবের প্রত্যক্ষীকরণ।'

আত্মনিমগ্ন বিভোরবিহ্বল হয়ে বক্তৃতা দেন স্বামীজি। দেড়-দু-ঘণ্টার আগে থামেন না। থেমে যাবার পর শ্রোতাদেরও বুঝি ধ্যান ভাঙে। এতক্ষণ তারা বুঝি আরেক রাজ্যে, অপার্থিব অনুভবের রাজ্যে ছিল। এ কী, এ যে সেই লণ্ডন, সেই পিকাডিলি, সেই পেন্টিং গ্যালারি। মুক্তিদাতা, তুমি আমাদের আবার কেন এই সংকীর্ণ আয়তনের মধ্যে নিয়ে এলে ?

'গুডউইন, আমি পাগলের মত এতক্ষণ কী বাজে বকলাম ?' স্বামীজি মঞ্চ থেকে নেমে এসেই গুডউইনকে কাছে টেনে এনে অস্ফুটে জিজ্ঞেস করেন, 'লোকেরা আমাকে পাগল বলে চিনতে পারেনি তো ?'

গুডউইন খানিকক্ষণ চিত্রাঙ্কিতের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

'আমি দেখি আমার সামনে যেন কে এসে দাঁড়ায়। আমি সেটাকে দেখি আর অনর্গল বকতে থাকি। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না। তুমি আমাকে সাবধানে বাঁচিয়ে রেখো, নইলে ইংরেজরা যদি টের পায় আমি পাগল তা হলে রাস্তায় আমাকে ঢিল মারবে।'

'আপনি কী বলছেন ? আপনার আজকের বক্তৃতা দারুণ ভালো হয়েছে।' গুডউইন নির্বাধ আনন্দে স্বামীজিকে আশ্বস্ত করতে চাইল।

'ভালো হয়েছে ? কী বলেছি বলো তো ?'

'অনেক সুন্দর-সুন্দর কথা বলেছেন।'

'কী কথা ?' বালকের মত অসহায় ভাব দেখিয়ে স্বামীজি বললেন, 'আমি যে কিছুই মনে করতে পারছি না।'

গুডউইন তখন তার সংকেত-লিপি থেকে খানিকটা পড়ে শোনায় স্বামীজিকে।

স্বামীজি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'এর মানে কী ? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।'

গুডউইন ব্যাখ্যা করে দেয়।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বেশ বলা হয়েছে। মানেটা বুঝতে পারছি মনে হচ্ছে। রেখে দাও ঠিকঠাক, নষ্ট করে ফেলো না। বেশ ভালো কথা, সুন্দর কথা।'

এর অর্থ স্বামীজি ইচ্ছেমত বিদেহ বা অশরীরী হয়ে যেতে পারেন। স্থূল দেহ

ত্যাগ করে কারণ-শরীর অবলম্বন করে নিজের সামনেই নিজে এসে দাঁড়ান। এই এক উচ্চারূঢ় রাজযোগীর অবস্থা।

এনি বেশান্তের নিমন্ত্রণে স্বামীজি তার এভিনিউ রোডের বাড়িতে বক্তৃতা দিলেন। বিষয় ভক্তি।

ভক্ত কী বলে? ভক্ত বলে, সমস্তই ভগবানের। তিনি আমার প্রিয়তম, আমি তাঁকে ভালোবাসি। ভক্তের নিকট সমস্তই পবিত্র বলে বোধ হয় কারণ সবই তাঁর। সকলেই তাঁর সন্তান, তাঁর অঙ্গস্বরূপ, প্রকাশস্বরূপ। আমি তখন কী করে অন্যের প্রতি হিংসা করতে পারি? ভগবৎপ্রেম এলেই তার সঙ্গে সঙ্গে তার নিশ্চিত ফলস্বরূপ সর্বভূতে প্রেম আসবে। তখনই সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন আরম্ভ হয়। যখন প্রেমের আরো উচ্চতর স্তরে উপনীত হই তখন এই জগতের সকল পদার্থের মধ্যে যে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পার্থক্য আছে তা লোপ পেয়ে যায়। প্রেমিকের দৃষ্টিতে মানুষকে আর মানুষ বলে বোধ হয় না, ভগবান বলে বোধ হয়। অপরাপর প্রাণীকেও আর সেই-সেই প্রাণী বলে বোধ হয় না, তার দৃষ্টিতে তারাও তখন ভগবান। এমন কি বাঘও আর বাঘ নয়, সাপও আর সাপ নয়, তারাও ভগবান। এ ভাবে এই প্রগাঢ় ভক্তির অবস্থায় সর্বভূতই আমার উপাস্য হয়ে পড়ে। শাস্ত্র বলছে, হরিকে সর্বভূতে অবস্থিত জেনে জ্ঞানী ব্যক্তির সর্বভূতের প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি প্রয়োগ করা উচিত। এমনি প্রগাঢ় সর্বগ্রাহী প্রেমের ফল পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন। তখন দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে সংসারে ভালো-মন্দ যা কিছু ঘটে, কিছুই আমাদের অনিষ্টকর নয়। তখন সর্বত্র অবিরোধ, সর্বত্র অপ্রাতিকূল্য। তখন সেই প্রেমিক পুরুষ দুঃখ এলে বলতে পারে, এস দুঃখ—কষ্ট এলে বলতে পারে, এস কষ্ট—তুমিও আমার প্রিয়তমের কাছ থেকেই আসছ। সাপ এলে সাপকেও সে স্বাগত জানাতে পারে। মৃত্যু এলে মৃত্যুকেও। সব তাঁর কাছ থেকেই আসছে, সানন্দে নেব বুক পেতে। এই পরিপূর্ণ নির্ভরতার অবস্থায় সুখে-দুঃখে আর কোনো প্রভেদ থাকে না, তখন সুখেও আনন্দ দুঃখেও আনন্দ। কোথাও আর বিরক্ত নেই দ্বিরুক্তিও নেই। এই বিরক্তি-দ্বিরুক্তিশূন্য নির্ভরতা মহাবীরত্বপূর্ণ—কে তা অস্বীকার করবে? পার্থিব কর্মার্জিত কীর্তি এর কাছে অকিঞ্চিৎ।

একদিন বক্তৃতার পর এক বিখ্যাত পক্বকেশ দার্শনিক স্বামীজির কাছে এগিয়ে এলেন, বললেন, 'সুন্দর বলেছেন, আপনাকে অভিনন্দন জানাই।' বলেই ঠোঁটের কোণে একটু হাসলেন: 'কিন্তু যা বললেন কিছুই নতুন নয়।'

তৎক্ষণাৎ স্বামীজি তাঁর দীপ্ত সুধাস্বরে বলে উঠলেন: 'আমি সত্যের কথা বলেছি, আর সত্যের মতো পুরোনো কে? সনাতন কে? সত্য কিংবদন্তীর পাহাড়ের মত পুরোনো, সৃষ্টির মত পুরোনো, স্বয়ং ঈশ্বরের মত পুরোনো। আমি যদি এমন কিছু বলে থাকি যা আপনাকে ভাবাবে ও সেই ভাবনার আলোকে কাজ করাবে, তা হলে বলুন, বলে কি ভালো করিনি?'

'হিয়ার! হিয়ার!' শ্রোতার দল করতালি দিয়ে উঠল। সহজেই বোঝা গেল স্বামীজি কেমন সকলের অভিরাম হয়ে উঠেছেন। দার্শনিকের মুখে আর কথা ফুটল না।

কী করে সেই সত্যকে জানতে পারলাম, এবার তোমাদের কাছে সেই কথা বলি। স্বামীজি বলতে লাগলেন। সেই সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণ। শোনো তবে তাঁর জীবনকথা।

শ্রোতারা শ্রীরামকৃষ্ণের মানবলীলার কিছু আভাস পেল, কী তাঁর অগাধ সারল্য, কী

বিপুল বিশ্বাস আর সত্যকে পাবার জন্যে কী তাঁর অদম্য ব্যাকুলতা। দুঃসাধ্য ক্লেশে সমস্ত ধর্মমতের পথ বিচরণ করে সেই অমূল্যকে আবিষ্কার করা। কী সেই আবিষ্কার? শোনো সেই নির্ভুল ঘোষণা—যেখানে আমি আছি সেইখানেই সত্য আছে। সংক্ষেপে, আমিই সেই শাশ্বত। আমিই সমস্ত। আমিই ব্রহ্ম।

আমি সত্যকে লাভ করলাম, যেহেতু সত্য আমার মধ্যে আগে থেকেই বর্তমান ছিল। নইলে আমিই সেই সত্য হই কী করে? আত্মবঞ্চনা কোরো না। ঘুণাক্ষরেও ভেবো না, সত্য ধর্মে আছে বা ধর্মে পাবে, সে তোমার নিজের মধ্যেই অধিষ্ঠিত। ভেবো না তোমার ধর্মীয় মতবাদ সত্যকে তোমার কাছে এনে দেবে, তোমাকেই বরং ধর্মীয় মতবাদের মধ্যে সত্যকে এনে স্থাপন করতে হবে। আলাদা-আলাদা নাম দিয়ে ধর্মীয় পুরুতের দল জট পাকিয়ে রেখেছে। এ বলে, এটা বিশ্বাস করো, ও বলে, ওটা। শোনো সে অমূল্যরতন তোমার মধ্যে আগে থেকেই রয়ে গেছে। যা কিছু আছে সেই একই আছেন। শোনো, তুমিই সেই এক।

তোমাদের শোনাবার মত আমার নিজস্ব একটিও কথা নেই, সব আমার গুরুদেব, শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। তিনিই অক্ষয় উৎস, অক্লান্ত প্রেরণা। এ যুগের সমস্ত সমস্যার সমাধান, সমস্ত সংশয়ের নিরসন। সমস্ত বিরুদ্ধতার প্রতিকার।

স্বামীজি নিজের বলে কিছু নিচ্ছেন না, সমস্ত তাঁর গুরুদেবের প্রতিষ্ঠার জন্যে এতটুকু মোহ নেই, স্বার্থের জন্যে নেই এতটুকু লালসা। চারদিক থেকে নিরর্গল প্রশংসা আসছে, কোনো কিছুকেই তাঁর কৃতত্বের মূল্য বলে নিচ্ছেন না, নিচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ বলে। বলছেন, 'আমি যা আমি তাই। তবু আমি যেটুকু আমি, সেটুকুও শ্রীরামকৃষ্ণের পাওনা। আমার কথায় যদি কিছু সত্য ও শিব থেকে থাকে তা শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ থেকেই এসেছে, শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয় ও আত্মার উপলব্ধি থেকে। বর্তমান পৃথিবীর অধ্যাত্ম জীবনের একমাত্র উৎসই শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি যদি তাঁর জীবনের একটি বিদ্যুৎ-ঝলকও পৃথিবীকে দেখাতে পারি তা হলেই আমি কৃতকৃতার্থ।'

আত্মপ্রশংসা নয়, গুরুব—প্রভুব গুণানুবাদ—এই তেজোদৃপ্ত পুরুষ জগতের নেতা হবে না তো কে হবে?

'আমরা এই বাড়িতে বেশ ছোটখাট একটি পরিবার হয়ে আছি।' ৬৩ সেন্ট জর্জেস রোড থেকে স্বামীজি চিঠি লিখছেন আমেরিকায়। সারদানন্দ সম্পর্কে লিখছেন: 'এই পরিবারের মধ্যে আছে ভারতবর্ষ থেকে আগত একজন সন্ন্যাসী। 'বেচারা হিন্দু' বলতে যা বোঝায় তা এঁকে দেখলেই বেশ বুঝতে পারবে। সর্বদাই যেন ধ্যানস্থ রয়েছেন—অতি নম্র এবং মধুর স্বভাব। আমার যেমন একটা দুর্জয় সাহস ও অদম্য কর্মতৎপরতা আছে তেমনি ওর মধ্যে কিছু নেই। এতে চলবে না। ওর ভেতর একটু কর্মোদ্যম ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করব। এখনই দুটি করে আমার ক্লাশের অধিবেশন হচ্ছে। চার পাঁচ মাস এমনি চলবে। তারপর ভারতে ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু, যাই বলো, আমেরিকাতেই আমার হৃদয় পড়ে আছে। আমি আমেরিকাকে ভালোবাসি।'

আরো লিখছেন: 'আমি নতুন সব দেখতে চাই। আমি পুরোনো ধ্বংসস্তূপের চারপাশে ঘুরে বেড়িয়ে, পুরোনো ইতিহাস ঘেঁটে পুরোনো লোকেদের কথা ভেবে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে হা-হুতাশ করতে মোটেই রাজি নই। আমার রক্তের যা জোর আছে তাতে ওরকম করা চলে না। সমস্ত ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত স্থান পাত্র ও সুযোগ শুধু

আমেরিকাতেই আছে। আমি আমূল পরিবর্তনের নিদারুণ পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি। আমি শিগগিরই ভারতবর্ষে ফিরব, পরিবর্তন-বিরোধী থসথসে জেলিমাছের মত ঐ বিরাট পিণ্ডটার কিছু করতে পারি কি না দেখতে হবে। তারপর পুরোনো সংস্কার-গুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন করে আরম্ভ করব—একেবারে সম্পূর্ণ নতুন, সরল অথচ বলিষ্ঠ, সদ্যোজাত শিশুর মত সজীব ও সতেজ। প্রাচীন যা কিছু দূর করে ফেলে দাও, নতুন করে আরম্ভ করো। যিনি সনাতন, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, অপরিসীম তিনি কোনো ব্যক্তিবিশেষ নন, তিনি তত্ত্বমাত্র। তুমি আমি সকলেই সেই তত্ত্বের বাহ্য প্রতিরূপ। এই অনন্ত তত্ত্বের যত বেশি যে ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তিনি তত মহৎ—শেষে সকলকেই তার পূর্ণ প্রতিমূর্তি হতে হবে। এই ভাবে, এখন যদিও সকলেই স্বরূপতঃ এক, তবু তখনই প্রকৃতপক্ষে এক হয়ে যাবে। ধর্ম এ ছাড়া অন্য কিছু নয় এই একত্বানুভব বা প্রেমই তার সাধন। সেকেলে নির্জীব অনুষ্ঠান আর ঈশ্বরসম্পর্কিত ধারণা প্রাচীন কুসংস্কারমাত্র। বর্তমানেও সেগুলোকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা কেন? পাশেই যখন জীবন ও সত্যের নদী বয়ে যাচ্ছে, তখন আর তৃষ্ণার্ত লোকগুলোকে নর্দমার পচা জল খাওয়ানো কেন? এ মানুষের স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। পুরোনো সংস্কারগুলোকে সমর্থন করতে করতে আমি বিরক্ত হয়ে পড়েছি। আমি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, পূতিগন্ধময় ও গতায়ু ভাবরাশির সমর্থন করতে গিয়ে আমি আজ পর্যন্ত অনেক শক্তি বৃথা ক্ষয় করেছি। জীবন ক্ষণস্থায়ী, সময়ও ক্ষিপ্রগতিতে চলে যাচ্ছে। যে স্থানে ও পাত্রে ভাবরাশি সহজে কাজে পরিণত হতে পারে সেই স্থান আর পাত্রই প্রত্যেকের বেছে নেওয়া উচিত। হায়! যদি বারো জন মাত্র সাহসী উদার মহৎ ও অকপটহৃদয় লোক পেতাম!'

সারদানন্দ লণ্ডনে এসেছে বটে কিন্তু আরাম পাচ্ছে না। না পোশাকে না ভাষায় না শয়নে-বিশ্রামে। এখন আবার স্বামীজি আদেশ করেছেন ইংরিজিতে বক্তৃতা দেওয়া অভ্যেস করতে। এমন জানলে কে এখানে আসত। এর চেয়ে দেশে নিছক সাধুগিরি করা অনেক আরামের।

জুতো, মোজা, ট্রাউজার্স, টাই, কলার, কোট- যেন আষ্টেপৃষ্টে বেঁধেছে সন্ন্যাসীকে। কী দুর্ভোগ! সারদানন্দ ঘরে এসে সব খুলে ফেলে স্লিপিং স্যুট পরল। মহেন্দ্রও হালকা হল। দুজন ছাড়া ঘরে আর তৃতীয় প্রাণী নেই। আলমারির সুমুখে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল সারদানন্দ। মহেন্দ্রকে বললে, 'একটু পা ছড়িয়ে বসে হাঁপ ছাড়ি। দাঁড়িয়ে আছ কেন? তুমিও বসে পড়ো।'

শুধু বসেই থাকল না, গালচেতে সারদানন্দ গড়াগড়ি খেতে লাগল। মহেন্দ্রকে বললে, 'একবার গড়িয়ে নাও হে, দেখ না সত্যি কি আরাম!'

মহেন্দ্র বসল। গড়াগড়ি খেল।

'বাবা, চব্বিশ ঘণ্টা আটে-কাটে বদ্ধ থাকা, একি আমার সাধ্যি? অষ্টবজ্রে বন্ধন করে পা ঝুলিয়ে বসে থাকো। এ বাপু নরেনের সাধ্যি, নরেন করুক গে।' আসন পিঁড়ি হয়ে বসল গালচের উপর। বললে, 'নরেনের হাপরে পড়ে প্রাণটা আমার গেল। কোথায় বাড়ি ছাড়লুম মাধুকরী করব, নিরিবিলিতে জপধ্যান করব, তা না, এক হাপরে ফেলে দিলে। না জানি ইংরিজি, না জানি কথাবার্তা কইতে, অথচ বলা হচ্ছে, লেকচার করো, লেকচার করো!'

'তা করতে করতে অভ্যেস হয়ে যাবে।' মহেন্দ্র চাইল আশ্বস্ত করতে।

'আরে বাপ্‌, আমার পেটে কি কিছু আছে ? আবার নরেন যা রাগী হয়েছে, কোনদিন মেরে বসবে !'

'কিন্তু চেষ্টা করতে দোষ কী।'

'তা যা বলেছ, একবার চেষ্টা করব। যদি হয় তো ভালো, নয়তো চোঁচা দৌড় মারব, একেবারে দেশে গিয়ে উঠব। সাধুগিরি করব, সেই আমার ভালো। কী উপদ্রবেই না পড়েছি ! কী ঝকমারির কাজ ! এমন জানলে কি এখানে আসতুম ?'

'তবে এলে কেন ?'

'শুধু নরেনের অসুখ শুনে এলুম।' এক মুহূর্ত থামল সারদানন্দ। নরেনের জন্যে সে, তার গুরু ভাইয়েরা, কী না করতে পারে ! পরে আবার সেই আত্মগত অন্তরঙ্গ স্বরে বলতে লাগল : 'নরেন আর গঙ্গাধর সারাদিন শুধু বকবেই, ওদের মুখের আর বিরাম নেই। কান ঝালাপালা হয়, সেই জন্যে আমি পালিয়ে আসি। আচ্ছা ওদের মুখ কি ব্যথা করে না ? মাথা ধরে না ?'

দরজায় টোকা পড়ল।

আদবকায়দা রপ্ত হয়ে গেছে এতদিনে—সারদানন্দ বলে উঠল . 'কাম ইন প্লিজ।'

যা ভেবেছিল, গুডউইন প্রবেশ করল। বললে, 'সারা দিন কাজে ব্যস্ত ছিলাম, কারু সঙ্গে ঝগড়া করবার সময় পাইনি। জানোই তো কারু সঙ্গে ঝগড়া করতে না পেলে মন সুস্থ থাকে না।'

'তার মানে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এলে ?' সারদানন্দ হাসল।

'তা ছাড়া আবার কী ! নইলে সব সময়ে তুমি ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকবে এ কে সহ্য করবে ?'

'তুমি ধ্যানের কী বোঝো ?' সারদানন্দ পালটা বললে।

'রাখো, ইউ ব্ল্যাক স্বামী, ডেভিল স্বামী, তুমি তো চোখ বুজে কেবল ধ্যান করো কখন খাবার আসবে, কখন খাবার ঘণ্টা বাজবে—'

সকলে হেসে উঠল। সুরু হল হাসা-পরিহাসের ঝগড়া।

কতক্ষণ পরে গুডউইন তার জিনিসপত্র নিয়ে গ্যারেট-ঘরে শুতে গেল। সারদানন্দ আর মহেন্দ্রও শুয়ে পড়ল তাদের বিছানায়, স্প্রিংওয়ালা লোহার খাটে, কম্বল মুড়ি দিয়ে। সারদানন্দ বললে, 'আমরা গরিব দেশের মানুষ, মেঝেতে মাদুর পেতে রাত কাটাই। প্রথম যখন এ দেশে এসে বিছানায় শুতে গেলুম তখন দেখি না ধবধবে বিছানা —একটার উপর আর-একটা, কোনটা গায়ে দেব আর কোনটায় শোব কিছুই ঠিক করতে পারলুম না। শেষে হাঁটু দুটো গুড়িয়ে শুলুম। শীত ধরলে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলুম। তা কি জানি বিছানার মধ্যে এত কেরামতি ?'

ঝিমঝিম বৃষ্টি হচ্ছে। মহেন্দ্র বললে, 'শীত ধরলে সব তুলে বিছানার ভেতরে ঢুকে পড়ো। তা হলেই গরম হয়ে আরাম পাবে।'

শীতার্ত জীবনে ঈশ্বরচিন্তার মত উত্তপ্ত আরাম আর কী আছে ?

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার তাঁর বাড়িতে স্বামীজিকে আহ্বান করলেন। সত্তর বছরের বৃদ্ধ হলেও দেখায় যুবকের মত। মুখমণ্ডলে একটিও বার্ধক্যের রেখা নেই।

কী অসাধারণ লোক এই ম্যাক্সমুলার! ব্রহ্মবাদিন পত্রিকায় লিখছেন স্বামীজি : গত ২৮শে মে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দেখা করতে নয়, বলা উচিত, আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। কেননা যে শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালোবাসে, সে যে দেশের যে ধর্মের যে সম্প্রদায়েরই লোক হোক না কেন, তার কাছে যাওয়া আমার তীর্থে যাওয়ার সমান। মহান ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের জীবনে অকস্মাৎ যে গুরুতর পরিবর্তন ঘটল তার পিছনে কোন শক্তি কাজ করছে তা অনুসন্ধান করতে তিনি নিজেই প্রথমে উৎসুক হন, তারপর থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশ তাঁর কাছে বিরাট আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠেছে। আমি বললাম, আজ হাজার হাজার লোক রামকৃষ্ণের পুজো করছে। অধ্যাপক উত্তর দিলেন : এমন লোককে পুজো করবে না তো আর কাকে করবে?

সহৃদয়তার প্রতিমূর্তি এই অধ্যাপক। আমাকে ও স্টার্ডিকে মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। ঘুরে ঘুরে অক্সফোর্ডের কলেজগুলো দেখালেন, দেখালেন বোডলিয়ান লাইব্রেরি। ফেরবার সময় আমাদের রেলস্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। কেন, কী দরকার,—তাঁকে নিরস্ত করতে চেয়েছিলাম। তিনি বললেন, রামকৃষ্ণের শিষ্যের সঙ্গে রোজ-রোজ দেখা হচ্ছে কই?

তাঁর কাছে যাওয়া যেন নতুন এক বিস্ময়ের রাজ্যে উপনীত হবার মত মনে হল। ছোট সুন্দর বাড়ি, সামনে সুন্দর বাগান, সুন্দর নীরবতা—তার অভ্যন্তরে শুভ্রকেশ এক ঋষি বসে আছেন, সত্তর বছর বয়সেও যার মুখে শান্তি ও করুণার শ্রী মাখানো, ললাট শৈশবসারল্যে মসৃণ, যার অন্তরের অধ্যাত্মসম্পদের আলো মুখে এসে পড়ে বোঝাচ্ছে সে আকর কত গভীর ও কত বিস্তীর্ণ। আর তাঁর মহীয়সী ভার্যা, তাঁর দীর্ঘ ও কঠোর সন্ধান-যাত্রার সঙ্গিনী, যে সন্ধান চিরন্তন উত্তেজনা জুগিয়েছে, চারপাশের অবজ্ঞা ও বিরুদ্ধতাকে পরাভূত করেছে, তারপর ক্রমে ক্রমে প্রাচীন ভারতবর্ষের ঋষি-চিন্তার প্রতি সশ্রদ্ধ করে তুলেছে। শুধু ঋষিরা নয়, ভারতবর্ষের গাছ, ফুল, প্রান্তর—প্রান্তরের শান্তি, নির্মুক্ত আকাশ—আকাশের স্বচ্ছতা—সব তাঁকে মুগ্ধ করেছে, নিয়ে গিয়েছে সেই প্রাচীন তপোবনে, ব্রহ্মর্ষি আর রাজর্ষির আবাসে, বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর কুটিরে।

আমি একজন ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতকে দেখছিলাম না, দেখছিলাম এক মুমুক্ষু মানবাত্মা, যে অহর্নিশ ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের সাজুয্য অনুভবে প্রয়াসী, আর এমন একটি হৃদয় যে বিশ্বহৃদয়ের সঙ্গে মিলিত হবার পিপাসায় নিত্য প্রসারিত।

কী হবে অপরা বিদ্যায় যদি তা পরা বিদ্যালাভে না সাহায্য করে। জ্ঞান যদি আমাদের পরাৎপরের কাছে নিয়ে না যায় তা হলে কী হবে জ্ঞান দিয়ে?

আর ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর কী অনুরাগ! যদি মাতৃভূমির প্রতি আমার সে অনুরাগের শতাংশের একাংশও থাকত! এই অসামান্য মনস্বী সক্রিয় মননে পঞ্চাশ বছর কি তারো বেশী সময় ভারতীয় চিন্তারাজ্যে বাস ও বিচরণ করছেন। অপার আগ্রহে ও ভালোবাসায় সংস্কৃত সাহিত্যের অরণ্যে ঘুরে ঘুরে নানা আলো-ছায়ার বিচিত্র খেলা

দেখেছেন, শেষে সেই আলো-ছায়া তাঁর মনের বিষয় হয়ে গিয়েছে, অনুস্যূত হয়েছে সমস্ত সত্তায়। বেদান্তীদের বেদাশ্রী এই ম্যাক্সমুলার।

বেদান্তই একমাত্র আলোক যা পৃথিবীর সকল সম্প্রদায় ও মতবাদকে অনুপ্রাণিত করছে। বেদান্তই একমাত্র তত্ত্ব যা সমুদয় ধর্মের পরিণত রূপ। রামকৃষ্ণ পরমহংস কী ছিলেন? তিনি এই প্রাচীন তত্ত্বের প্রত্যক্ষ উদাহরণ, প্রাচীন ভারতের সাকার বিগ্রহ ও ভবিষ্যৎ ভারতের পূর্বাভাস—যার ভিতর দিয়েই সকল জাতি আধ্যাত্মিক আলো-হাওয়া আকর্ষণ করে নিচ্ছে। জহুরিই জহর চেনে। তাই ভাবি এ কী বিস্ময় যে ভারতীয় চিন্তাগগনে কোনো নতুন জ্যোতিষ্কের উদয় হলেই ভারতবাসীদের এর মহত্ত্ব বোঝবার আগেই এই পাশ্চাত্ত্য ঋষি তার প্রতি আকৃষ্ট হন!

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কবে আসছেন ভারতে? যিনি ভারতবাসীদের পূর্ব-পুরুষের চিন্তারাশি যথার্থ ভাবে লোকসমক্ষে প্রকাশ করেছেন তাঁকে বরণ করে নিতে ভারতের সকলেই উন্মুখ হবে। উত্তরে বৃদ্ধ ঋষির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চকিতে এক ফোঁটা চোখের জলও দেখা দিল নয়নে। মৃদু-মৃদু মাথা নেড়ে বললেন, একবার গেলে, যেতে পারলে, আমি আর ফিরব না, আমাকে সেই ভারতের মাটিতেই গোর দিতে হবে। আর প্রশ্ন করা সংগত মনে করলাম না, কে জানে তাঁর হৃদয়ের গোপন ভাণ্ডারে সেটা অনধিকার প্রবেশ হবে কি না। কে জানে, তিনি হয়তো অজ্ঞাতসারে স্নেহনিবদ্ধ পূর্বজন্মের বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করছেন। 'তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বম। ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি।'

মেরি হেলকে চিঠি লিখছেন স্বামীজি: 'অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে চমৎকার পরিচয় হল। তিনি ঋষিকল্প লোক—বেদান্তের ভাবে ভরপুর! তোমার কী মনে হয়? অনেক বছর যাবৎই তিনি আমার গুরুদেবের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন। তিনি 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি'তে গুরুদেব সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন—তা শিগগির প্রকাশিত হবে। ভারতসংক্রান্ত নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হল। হায় হায়, ভারতের প্রতি তাঁর প্রেমের অর্ধেকও যদি আমার থাকত!'

'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরিতে' ম্যাক্সমুলার শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার নাম: 'এক প্রকৃত মহাত্মা।' পরে পুরোপুরি একখানা জীবনী লিখলেন, নাম: 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী।' এই বই পাশ্চাত্ত্য জগৎকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি কৌতূহলী করল আর স্বামীজি সেই কৌতূহলকে নিয়ে গেল স্থির সিদ্ধান্তে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মিস্টার টনিও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখে প্রচার করলেন। তাঁর ছাত্র বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্তই তাঁকে এ বিষয়ে উদ্যোগী করেছে। নিয়মিত চিঠি চলে তাদের মধ্যে। বৃদ্ধ টনি শুধু বাইবেলই নয়, কথামৃতও পড়েন রোজ সকালে।

মিস মুলারের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেলেন স্বামীজি। সঙ্গে সারদানন্দ আর মহেন্দ্র। মিস মুলারের বাড়িতে জায়গা কম বলে মহেন্দ্র উঠল পাশের বাড়িতে। কিন্তু চলা-বলা ওঠা-বসা সব একসঙ্গে।

কলকাতার ডাক এসেছে, সারদানন্দ চিঠি পড়ে শোনাচ্ছে স্বামীজিকে: 'রাখাল মহারাজের পুত্র সত্য মারা গেছে। এতে রাখাল মহারাজ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, খুবই ব্যথিত ও বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন।'

খবর শুনে সবাই খানিক স্তব্ধ হয়ে রইল।

বেদনার্ত মুখে স্বামীজি বললেন, 'রাখালের মতো এত উচ্চ অবস্থার লোকও পুত্রশোকে বিহ্বল হয়! পুত্রশোক কী ভয়ঙ্কর! মানুষ জগতের সব কিছু সহ্য করতে পারে কিন্তু পুত্রশোক পারে না। তাই তো, রাখালের ছেলেটি মারা গেল! ছেলেটি বেঁচে থাকলে তাকে মঠে নিয়ে নিতুম। তৈরি করে নিতুম।' মহেন্দ্রের দিকে তাকালেন: 'তার কী অসুখ করেছিল জানিস?'

মহেন্দ্র বললে, 'ছেলেদের সঙ্গে খেলতে-খেলতে পড়ে যায়, একটা গোঁজা লেগে পাঁজরা ফুলে ওঠে। সেই থেকে বুক ধড়ফড় করত। রাখাল মহারাজ আমাকে নিয়ে রোজ কাঁসারিপাড়ার সেনেদের বাড়িতে গিয়ে ছেলেটিকে দেখে আসতেন। চিকিৎসাও হয়েছিল সাধ্যমত।'

স্বামীজি কথা শুনে একটু সুস্থ হলেন। বললেন, 'যাক, রাখাল তো ছেলের কিছু দেখাশোনা করেছে। কিন্তু, আহা, রাখালের ছেলেটা মারা গেল!'

ঘরের দেয়ালে একটি ছবি টাঙানো। একটি তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে চুল এলিয়ে দিয়ে হাঁটু উঁচু করে চরকায় সুতো কাটছে। কাটতে-কাটতে সুতো ছিঁড়ে গিয়েছে। তাইতে মেয়েটি হেঁট হয়ে একটা খুঁটিতে মাথা নুইয়ে দেবার ভঙ্গি করে আছে, অন্য পা-টা টান করে ছড়িয়ে দেওয়া। ছবির তলায় নাম লেখা—আশাভঙ্গ।

স্বামীজি দেয়ালে সেই ছবির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, 'মানুষের আশা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সে ঘাড় উঁচু করে হাত-পা সংযত করে প্রফুল্ল মনে বসে থাকে, কিন্তু আশাটি নষ্ট হয়ে গেলে আর তার হাত-পায়ের জোর থাকে না, হাত-পা এলিয়ে পড়ে। ছবিখানা ভাবটা বেশ প্রকাশ করেছে, তাই না? কিন্তু, তাই বলে রাখালের ছেলেটা মারা গেল!'

বাড়ির উঠোনের কোণে একটি লতাকুঞ্জ। সেখানে সবাই সান্ধ্য-আহারে বসেছে। দুধ দিয়ে তৈরি কী এক সুপ খেতে দিয়েছে, তাতে নুন দেওয়া।

দু এক চামচ খেয়েই তো সারদানন্দের বমির উপক্রম হল।

'ওরে শরৎ, প্লেট ও রকম করে ধরে না, আমি যে রকম করছি সেই রকম কর। চামচের গোড়া নয়, মাঝখানটা ধর।' স্বামীজি সারদানন্দকে তালিম দিতে লাগলেন 'ডান হাতে ছুরি নে, বাঁ হাতে কাঁটা। অত বড় বড় গ্রাস করে না, ছোট ছোট গ্রাস করবি। খাবার সময় দাঁত-জিভ বার করবি না। খবরদার, কখনো কাশবি না, ধীরে ধীরে চিবুবি। খাবার সময় বিষম খাওয়া কি ঢেঁকুর তোলা ভীষণ অপরাধ। আর দেখিস, নাক যেন কখনো ফোঁস ফোঁস না করে।'

নুন-দেওয়া দুধ খেয়ে সারদানন্দের দারুণ অস্বস্তি হচ্ছিল, কিছুই তারিয়ে খেতে পারল না। কোন রকমে ভোজন পর্ব সমাধা করে বাইরে এসে মহেন্দ্রকে বললে, 'না, বাবা, এ পোষাবে না। এ নরেনের কাজ নরেন করুক গে। দরকার নেই আমার লেকচার দিয়ে। কোথায় হাতে করে বড় বড় থাবা করে খাব, না একটু একটু করে ছুঁচ বিঁধে খাওয়া! আর দ্যাখ দেখি, হিন্দুর ছেলে, দুধে নুন দিয়ে খাওয়া! খেয়ে আমার পেট গুলিয়ে উঠল, কিন্তু ভয়ে বমি করতে পারলুম না।' তারপর দুধের জন্যে শোক করতে লাগল। 'কী সুন্দর ঘন দুধ! ভালো করে চিনি দিয়ে কমলালেবুর ক্ষীর করে খেলে কী

চমৎকার হয় বল তো ! তা নয়, নুন মেশানো ! শুধু ওর খাতিরেই এ জায়গায় পড়ে আছি আর অখাদ্য খেয়ে বেঁচে আছি।'

কিছুক্ষণ পরে স্বামীজি এসে মিললেন। আর তৎক্ষণাৎ সারদানন্দ শান্তশিষ্ট ভালো-মানুষটি হয়ে উঠল। যেন খেয়ে কত তার পেট ভরেছে !

একঘেয়ে রান্না খেয়ে-খেয়ে স্বামীজিরও অরুচি ধরে গিয়েছিল। মহেন্দ্রকে বললে, 'চল রান্নাঘরে গিয়ে রাঁধি গে—বেশ ঝাল-ঝাল আলুচচ্চড়ি। যাক্, তোকে সঙ্গে যেতে হবে না, আমি একাই পারব।'

কতক্ষণ পরে বেশ খানিকটা মাখন দিয়ে কালোমরিচ দেওয়া আলুচচ্চড়ি রেঁধে আনলেন স্বামীজি। সেই আলুচচ্চড়ি মুখে দিয়ে তিনটি ভারতীয়ের ধড়ে যেন প্রাণ এল। স্বদেশের রান্নার মত উপাদেয় আর কিছু নেই, স্বদেশের স্বাদটিই মধুগন্ধী।

লণ্ডন থেকে মেরি হেলকে চিঠি লিখছেন স্বামীজি : 'কাল রাত্রে আমি নিজেই রান্না করেছিলাম। জাফরান, লেভেণ্ডার, জয়ত্রী, জায়ফল, কাবাব চিনি, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, মাখন, লেবুর রস, পেঁয়াজ, কিসমিস, বাদাম, গোলমরিচ আর চাল—এই সব মিলিয়ে এমন সুস্বাদু খিচুড়ি বানিয়েছিলাম যে নিজেই গলাধঃকরণ করতে পারিনি। ঘরে হিং ছিল না, থাকলে তার খানিকটা মেশালে যদি তলানো যেত।'

হিমালয়সদৃশ বিরাট কঠিন পৌরুষ, তার মধ্যেই আবার চপল চটুল নির্ঝরস্রোত বয়ে চলেছে। সে লঘুতা ও চাপল্য স্বামীজির স্নেহ-দ্রব আনন্দময়তারই অকুণ্ঠ পরিচয়। আমেরিকায় কতদূর কী কাজ হয়েছে বা হচ্ছে, ইংলণ্ডে আসার পরই কী সম্ভাবনার আলো দেখা যাচ্ছে তারই একটা রিপোর্ট বা বিবরণী তৈরি করেছেন স্বামীজি, মাদ্রাজের 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকার জন্যে। সারদানন্দকে বললেন, পড়, শুনি।

সারদানন্দ পড়তে লাগল।

স্বামীজি হেসে বললেন, 'দূর ! অমন এঁ্যা এঁ্যা করে পড়ছিস কেন ? তোর চণ্ডীপাঠ করা অভ্যেস কিনা, তাই মনে করিস যেন চণ্ডীপাঠ করছিস। ভালো করে স্পষ্ট করে পড়।'

সারদানন্দ শুধরে নিল।

'চল, সুমুখের মাঠে বাইক চড়ি গে।' স্বামীজি ডাকলেন দুজনকে।

মিস মুলারের মালী, আর্থার, গ্রীন হাউস থেকে একটা বাইক এনে দিল। এক হাত মহেন্দ্রের কাঁধে, আরেক হাত সারদানন্দের কাঁধে, স্বামীজি বাইকে উঠে বসলেন। দুজনের ঘনিষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে চলতে লাগলেন স্বামীজি। আনন্দে গান ধরলেন : 'সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।'

কতক্ষণ পরে নেমে পড়ে সারদানন্দকে বললেন, 'তুই চড়, দিন কতক চেষ্টা করলে ঠিক শিখে ফেলতে পারবি।'

সারদানন্দের ইচ্ছে নেই, তবু স্বামীজির খাতির চড়ে বসল। আবার তেমনি দুজন দুদিক থেকে তাকে সামাল দিতে লাগল।

মালী আর্থার দৃশ্য দেখে হেসে কুটপাট।

'ওরে আমাদের চড়া দেখে মালী-ছোঁড়া হাসছে।' স্বামীজি আর্থারের উদ্দেশে কৌতুক করে উঠলেন : 'আরে হাস করছিস ক্যান ?'

আর্থারের আরো হাসি।

স্বামীজি তখন সারদানন্দকে বললেন, 'তুই মোটা, তোর পা চালানো শিখতে দেরি হবে। মহিমের পা লম্বা, ও শিগগির শিখে ফেলবে। তুই নাম।'

সেনাপতির যেমন আদেশ! সারদানন্দ তক্ষুনি নেমে পড়ল।

বাইক শেখাটা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য কতক্ষণ জগৎটাকে ভুলে গিয়ে খেলাধুলো নিয়ে মেতে থাকা। খানিকক্ষণের জন্যে সরল বালক হয়ে যাওয়া।

লণ্ডনে ফিরে এসে সারদানন্দ জ্বরে পড়ল। মহেন্দ্রও সঙ্গ ধরল। কলকাতায় থাকতে দুজনেই ম্যালেরিয়ার কবলে ভুগছিল। ইদানিং সারদানন্দের জ্বরটা মাস দেড়েক স্থগিত ছিল কিন্তু মহেন্দ্রের দু তিন দিন পর-পরই জ্বর আসছে আর তারই প্রতিকারে সে কুইনিনকে নিত্যকর্ম পদ্ধতি করে তুলেছে।

সেদিন দুজনেরই জ্বর, দুজনেই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। দোতলার ঘরে। স্বামীজি নিচে থেকে মাঝে মাঝে গুডউইনকে পাঠাচ্ছেন খোঁজ-খবর নিতে—গুডউইন দুজনকে দুধ-সাবু খাইয়ে দিয়ে সরে পড়েছে। দুপুর বেলা জ্বর বুঝি প্রবলতর হল। সারদানন্দ উঠে পড়ে পাইচারি করতে লাগল। বললে, 'দেখ মহিম, নরেন কিছুতেই ছাড়বে না, যে করে হোক, আমাকে দিয়ে লেকচার দেওয়াবেই। আমি ওসবের কিছু বুঝি না, কিন্তু তার কথার অমান্য করি এমন আমার সাধ্য নেই। না বললে কে জানে হয়তো মেরেই বসবে। তুমি শোনো, আমি লেকচার রিহার্সাল দি। তুমি হুঁ দিও।'

মহেন্দ্র জ্বর নিয়ে একটা চেয়ারে উঠে বসল।

ঘরময় ঘুরে-ঘুরে সারদানন্দ বক্তৃতার প্রথম লাইনটাই বারে-বারে বলতে লাগল: 'আই হ্যাভ গট ন্যাথিং টু সে—কী মহিম, শুনছ তো? হুঁ দাও।'

মহেন্দ্র জ্বরের ঘোরে উত্তর দিল: 'হুঁ!'

এ রকম চলল কতক্ষণ। কী মহিম শুনছ তো? হুঁ!

স্বামীজির পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে বুঝি! দুজনে ফের কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। সারদানন্দ তখনো বক্তৃতা দিয়ে চলেছে আর কম্বলের ভিতর থেকে একটা গোঙানির মত শোনা যাচ্ছে মহেন্দ্রের সমর্থন।

স্বামীজি হেসে ধমক দিয়ে উঠলেন। দুজনেই নিঝুম হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিনও দুজনের জ্বরের বিরাম হল না। দুজনেই যেমন-কে-তেমন কম্বল মুড়ি দিয়ে পাশাপাশি শুয়ে রইল।

বেলা প্রায় আড়াইটের সময় মহেন্দ্র অনুভব করল পায়ের চেটো অসম্ভব গরম হয়ে উঠেছে, আর সে-তাপটা ধীরে ধীরে উঠছে উপরের দিকে। উঠতে-উঠতে সে-তাপ হাঁটুর কাছে এসে আটকে রইল। তার পর সেটা হঠাৎ দ্রুতগতিতে নেমে গেল নিচের দিকে। খানিক বাদে হাঁটুর থেকে আবার একটা তাপস্রোত উঠতে-উঠতে কোমর পর্যন্ত এসে থামল, আবার নেমে গেল অকস্মাৎ। তার পরে কোমর থেকে উঠল তাপস্রোত, থামল হৃৎপিণ্ডের কাছে এসে। সে কী ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা! তারপর বুকের থেকে উঠে তাপস্রোত মাথার মধ্যে প্রবেশ করল। সর্বাঙ্গে ঘাম ছুটতে লাগল। মহেন্দ্র অজ্ঞান হয়ে গেল।

সারদানন্দেরও বুঝি সেই দশা।

বেলা প্রায় চারটের সময় দরজায় টোকা পড়ল।

'কাম ইন প্লিজ।' ক্ষীণস্বরে আওয়াজ করল মহেন্দ্র।

হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলেন স্বামীজি: 'কি রে, তোর জ্বর ছাড়ল?'

'হ্যাঁ, ছেড়েছে।' মহেন্দ্র বললে শান্ত মুখে, 'গা একদম ঠান্ডা।'

'যা, তোকে আর কুইনিন খেতে হবে না।' স্বামীজি বললেন দৃপ্ত স্বরে, 'জ্বরকে তাড়িয়ে দিয়েছি।' তারপর সারদানন্দের দিকে এগোলেন : 'তোর কী অবস্থা ?'

'জ্বর নেই।' বললে সারদানন্দ।

'যা, তোরও জ্বর আর আসবে না। আমি নিচে ডাইনিং রুমের চেয়ারে বসে উইলফোর্স দিচ্ছিলুম, জ্বরকে জোর করে টেনে বের করে দিলুম।' স্বামীজি ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে সুরু করলেন . 'জ্বর যাবে না ! হুকুম মানবে না !'

সারদানন্দ হঠাৎ তার কম্বল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তড়াক করে মেঝেতে নেমে হাঁটু গেড়ে বসে স্বামীজির পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। বললে, 'আমার দেহের মত মনও ভালো করে দাও। জ্বরের মত মনটাকেও তুলে নাও উপড়ে।'

'দূর ! ও কী করছিস ? ওঠ।' স্বামীজি পা ছাড়িয়ে নিতে চাইলেন : 'তোকে সভায় দাঁড়িয়ে লেকচার দিতে হবে। লেকচার দিবিনে তো তোকে এই চারতলার জানলা থেকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দেব।'

'তা দিও। তোমার যা খুশি তাই করিয়ো আমাকে দিয়ে, কিন্তু আমার মন ভালো করে দাও।'

'তা হবেখন, তুই ওঠ।' উঠিয়ে দিলেন স্বামীজি : 'কিন্তু শক্তিসঞ্চারটা বুঝলি তো ?'

'বুঝলাম। এবার আমার মন ভালো করে দাও।'

'সে আর বাকি থাকবে না।' স্বামীজি তাকালেন মহেন্দ্রের দিকে : 'আর কুইনিন খাসনে, যা আছে বাক্স থেকে সব টেনে ফেলে দে।' তারপর লক্ষ্য করলেন সারদানন্দকে : 'কি রে, দেখলি তো উইলফোর্সে সব হয়। আজ রাতে রুটি খাসনে, দুধসাবু খাস।' বলে স্বামীজি নেমে গেলেন।

সারদানন্দ বললে আপন মনে, 'সে নরেন আর নেই। এই তো হাতে-হাতে দেখলুম হুকুমে এক বৎসরের পুরোনো জ্বরকে একদিনে তাড়িয়ে দিলে। এখন ওর সঙ্গে বুঝে সুঝে কথা কওয়া ভালো।'

কিন্তু মহেন্দ্র এদেশে এসেছে কেন ? তার ইচ্ছে আইন পড়ে ব্যারিস্টার হয়। কিন্তু স্বামীজির তাতে সমর্থন নেই। স্বামীজির ইচ্ছে সে বিজ্ঞান পড়ে ও এঞ্জিনিয়র হয়। দেশে চিঠি লিখছেন স্বামীজি :

'আমার বাবা যদিও উকিল ছিলেন আমি চাই না যে আমাদের বংশের কেউ উকিল হয়। আমার গুরুদেব এর বিরুদ্ধে ছিলেন আর আমার এই বিশ্বাস যে পরিবারে কতকগুলো উকিল আছে সে পরিবার নিশ্চয়ই একটা গোলমালে পড়বে। আমাদের দেশ উকিলে ছেয়ে গেছে—প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শত-শত উকিল বেরুচ্ছে। আমাদের জাতের পক্ষে এখন দরকার কর্মতৎপরতা ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা। সুতরাং আমার ইচ্ছা মহেন্দ্র তড়িৎ-তত্ত্ববিদ হয়। সিদ্ধিলাভ করতে না পারলেও সে যে বড় হবার ও দেশের যথার্থ উপকারে লাগবার চেষ্টা করেছিল—এইটুকু ভেবেই আমি সন্তোষ লাভ করব। শুধু আমেরিকার বাতাসেই এমন একটি গুণ আছে যে সেখানকার প্রত্যেকের ভিতরে যা কিছু ভালো সমস্তই ফুটিয়ে তোলে। আমি চাই সে সাহসী ও অকুতোভয় হোক, তার নিজের জন্যে ও স্বজাতির জন্যে একটা নতুন পথ বের করতে যথাসাধ্য প্রয়াস করুক।

একজন ইলেকট্রিক এঞ্জিনিয়র ভারতে অনায়াসে করে খেতে পারবে।...আমার মনে হয় সারদানন্দের সঙ্গে মহেন্দ্রকেও আমেরিকায় পাঠিয়ে দিতে পারব।'

একটা মাঠে স্বামীজি বেড়াচ্ছেন, সঙ্গে মিস মুলার ও একজন ইংরেজ পুরুষ। হঠাৎ একটা ক্ষিপ্ত ষাঁড় তাঁদের দিকে ছুটে এল। ইংরেজ বীর চোঁচা দৌড় মারল, পলকে কোথায় মিলিয়ে গেল কোনো চিহ্ন রেখে গেল না। মিস মুলারও ছুটল বটে কিন্তু কতদূর গিয়েই পড়ল আছাড় খেয়ে। স্বামীজি এক মুহূর্ত ভাবলেন, তাহলে এভাবেই বুঝি সব ফুরিয়ে যায়! এতটুকু ভয় পেলেন না, বিচলিত হলেন না, বুকের উপর পাশাপাশি দুহাত রেখে দাঁড়ালেন স্থির হয়ে, ঋজু হয়ে, মিস মুলারের আচ্ছাদন হয়ে। ভাবনার মধ্যে আর কিছু এল না—এল একটা অঙ্কের হিসাব। ক হাত ক গজ বা ক ফার্লং দূরে ষাঁড়টা তাঁকে পারবে ছুঁড়ে ফেলে দিতে? না কি ক মাইল!

কিন্তু আশ্চর্যের আশ্চর্য, কয়েক পা দূরে ষাঁড়টা হঠাৎ থেমে পড়ল। একবার মাথা তুলল, দেখল, তারপর ধীরে-ধীরে ফিরে গেল।

আমেরিকা থেকে পিয়ার ফক্স এসে হাজির। বয়সে তরুণ, সকলের স্নেহপাত্র। ওলি বুলের বাড়িতে স্বামীজি যখন ছিলেন তখন সে তাঁর সেক্রেটারির কাজ করেছিল—সেই সুবাদে আসা এবং সকলের সুহৃদ হয়ে যাওয়া।

প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার দু বার করে বক্তৃতা দিচ্ছেন স্বামীজি—প্রথম পর্ব বেলা এগারোটা থেকে একটা, দ্বিতীয় পর্ব সন্ধে সাতটা থেকে। মাসখানেক পরে জুটল আবার রবিবারের বক্তৃতা, বিকেল চারটে থেকে যতক্ষণ না ক্লান্তি আসে।

দুর্ধর্ষ পরিশ্রমেও পরাস্ত হচ্ছেন না স্বামীজি। কিন্তু সেদিন মধ্যাহ্নভোজের পর তাঁর হেলান-দেওয়া চেয়ারে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন, হঠাৎ তাঁর মুখে যন্ত্রণার কাতরতা ফুটে উঠল। ফক্স আর মহেন্দ্র কাছেই ছিল, কী হল হঠাৎ, কেন এই কষ্টের ছবি, বুঝে উঠতে পারল না।

খানিক পরে একটা নিশ্বাস ছেড়ে স্বামীজি ফক্সের দিকে তাকালেন। বললেন, 'জানো, আমার প্রায় হার্টফেল করছিল। বুকে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিল—'

'সে কী?' ফক্স সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

'আমার বাবাও এই রোগে মারা গিয়েছেন।' বললেন স্বামীজি, 'এটা আমাদের বংশের রোগ।'

মহেন্দ্রও কম উদ্বিগ্ন হল না। স্বামীজির প্রসাদ-প্রোজ্জ্বল মুখে এ কী কালো ছায়া!

আরো একদিন দুপুর বেলা সেই হেলান-দেওয়া চেয়ারে পায়ের উপর পা রেখে গা ঢেলে বসে আছেন স্বামীজি। চোখ বোজা, কী যেন ভাবছেন তন্ময় হয়ে। হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠে বসে ফক্সকে লক্ষ্য করে বললেন, 'শুধু ভক্তি দিয়ে ধর্মের কাজ চলে না, উন্মাদ হওয়া চাই—বিদ্বান উন্মাদ। খালি উন্মাদনাটাও কোনো কাজের নয়, সেটা প্রায় মস্তিষ্কের ব্যাধি, কিন্তু উন্মাদনার সঙ্গে যদি পাণ্ডিত্য মেশে তবেই তা ফলপ্রসূ হতে পারে। দেখ না সেণ্ট পলকে, সে ছিল 'লার্নেড ফ্যানাটিক'—বিদ্বান ধর্মোন্মাদ, তাই সে ইহুদিদের ভাবের জোরে গ্রীক দর্শন ও রোমান সভ্যতাকে উল্টিয়ে দিল। আমিও অমনি বিদ্বান ধর্মোন্মাদ, আমি একদল বিদ্বান ধর্মোন্মাদ তৈরি করতে চাই। তারাই পারবে জগতের চেহারা পালটে দিতে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ কী বলতেন? বলতেন, ভক্ত ভালো, যেন হাতির দাঁত, কিন্তু বিদ্বান ভক্ত আরো ভালো, যেন হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

স্বামীজিকে দেখে ইংলণ্ডের অনেকেই বলাবলি করে, যীশুর যেমন সেণ্ট পল তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের বিবেকানন্দ।

ফক্সকে বলছেন স্বামীজি : 'দেখলাম তোমাদের আমেরিকা। লোকগুলো টাকা-টাকা করে উন্মাদ। তাদের কাছে জগৎ মানেই টাকা। জীবন মানেই টাকা। আরো যে জিনিস আছে ভাববার ও পাবার, তাতে তাদের কোনো চেতনা নেই। শিকাগোর একজিবিশন দেখতে গিয়ে নাগরদোলায় চড়লাম। দেখলাম দুলুনিতে দুটো লোকের প্রচণ্ড মাথা-ঠোকাঠুকি হল। কোথায় তারা অপ্রতিভ হয়ে পরস্পর মাপ চাইবে, তা নয়, পকেট থেকে বিজ্ঞাপনের কার্ড বের করে পরস্পরের হাতে দিল—এই উপলক্ষে কারবারের যদি কিছু সুবিধে হয়! লোকগুলোর মুখে কারবার ছাড়া কোনো কথা নেই। কিন্তু জানো, যখন টাকাটা খুব জমে যাবে তখন মন উচ্চ চিন্তার দিকে যাবে, তখন বড় দার্শনিক চিত্রকর ও গায়কের আবির্ভাব হবে।'

মানুষ অনন্ত, তাই তার বাসনাও অনন্ত, তার পরিতৃপ্তিও এই অনন্তের মধ্যে। আমাদের জীবন যেন স্বপ্ন থেকে স্বপ্নান্তরে যাত্রা। মানুষ অনন্ত স্বপ্নবিলাসী, সে কী করে সীমার স্বপ্নে তুষ্ট থাকবে?

'আমি যেন অনন্ত নীলাকাশ।' বলছেন স্বামীজি, 'আমার উপর দিয়ে নানা রঙের মেঘ ভেসে চলে যায়, কখনো বা এক মুহূর্ত থাকে, তারপর আর দেখা যায় না। আমি সেই চিরন্তন নীলই থেকে যাই। আমি সব কিছুর সাক্ষী, সেই চিরন্তন সাক্ষী। আমি দেখি বলেই প্রকৃতি আছে। আমি না দেখলে প্রকৃতি থাকে না। আমরা কেউই কিছু দেখতে বা কিছু বলতে পারতাম না, যদি বিশ্বময় এই অনন্ত ঐক্য এক মুহূর্তের জন্যেও ভেঙে যেত।'

ডক্টর জন ভেন-এর ছাত্রী মিস মুলার। ভেন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক—লজিক অব চান্স বা আকস্মিকতার যৌক্তিকতা নিয়ে সারা জীবন গবেষণা করেছেন। যে ঘটনা দৈবাৎ ঘটছে বলে মনে করি, যার কার্য-কারণের পারম্পর্য দৃষ্টিগোচর হয় না তার দূর অন্তরালে কোনো ধ্রুব নিয়ম বা সুদৃঢ় যুক্তি আছে কিনা তার অনুসন্ধান। ন্যায়শাস্ত্রে অগ্রগণ্য পণ্ডিত, তার নাম শুনেছেন স্বামীজি। মিস মুলার বললেন, 'আমার অধ্যাপক—যাবেন একদিন আলাপ করতে?'

'যাব।'

ভেন স্বামীজির সঙ্গে আলাপ করে অবাক হয়ে গেলেন। এ যে তাঁর চেয়েও বড় যুক্তিবাদী। ভেবেছিলেন এমনি বুঝি ধর্মের উপদেশ দিয়ে বেড়ান আর অদৃশ্য বস্তুর বিষয়ে যে সব বাগবিস্তার করেন, সব ফাঁকা কথা। আলাপ করে বুঝলেন, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মশাস্ত্রই নয়, সমস্ত ন্যায়শাস্ত্র তাঁর করতলে। হ্যাঁ, ঈশ্বরও যুক্তিগ্রাহ্য, যুক্তিসিদ্ধ।

'হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরেই জগতের শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। যদি কেউ সেখানে কিছুকাল অতিবাহিত করে, তবে আগে সে যতই অস্থিরচিত্ত থাক না কেন, অবশ্যই সে মানসিক শান্তি লাভ করবে।' বলছেন বিবেকানন্দ, 'প্রাকৃতিক নিয়ম-গুলোর মধ্যে ভগবানই সর্বোচ্চ নিয়ম। এই নিয়মটি একবার জানতে পারলে অন্যান্য নিয়মগুলোকে এর অধীন বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। পতনশীল বস্তুগুলির কাছে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-নিয়মের যে স্থান, ধর্মের কাছে ঈশ্বরেরও সেই স্থান।'

মিস জনসন নামে এক ভদ্রমহিলা স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে এল। বয়েস চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে, ইংরেজ হলেও রাশিয়ার মানুষ—অবিবাহিত।

'স্বামীজি আছেন ?'

'উপরে আছেন। একজন সাক্ষাৎকারীর সঙ্গে কথা বলছেন।' বললে সারদানন্দ, 'আপনাকে একটু বসতে হবে।'

'তাই বসছি। স্বামীজি এমন এক বস্তু যাঁর জন্যে অনন্তকাল বসে থাকা যায়।'

'আপনার কি বিশেষ কোনো কথা আছে ?'

'আমি কথার কী বুঝি ! আমার আবার কী কথা থাকবে ! আমি শুধু তাঁকে দেখব।'

'দেখবেন !' মহেন্দ্র দারুণ কৌতূহলী হল।

'আমি যে তাঁকে দেখেছি অন্ধকার সমুদ্রে—' মিস জনসন চোখ বুজল।

কিছুক্ষণ পরে বলতে লাগল আবিষ্টের মত : 'মস্কোতে আমার বাড়িতে রাত্রে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলাম, স্বপ্ন দেখলাম এক জ্যোতির্ময় পুরুষ এসে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, ওঠো, চলো আমার সঙ্গে।

আমার এতটুকু দ্বিধা বা সংশয় জাগল না, আমি অনায়াসে তাঁকে অনুসরণ করলাম। অনেক দূর হেঁটে মাঠ পার হয়ে তাঁর পিছে-পিছে এক সমুদ্রতীরে এসে উপস্থিত হলাম। মনে হল একটা জাহাজ দাঁড়িয়ে। ঘোর অন্ধকার রাত, কে এক অদৃশ্য মানুষ গর্জে উঠল, এই জাহাজে ওঠো। উঠলাম, দেখি সেই জ্যোতির্ময় পুরুষও উঠলেন। পাল-তোলা জাহাজ, হাওয়া পেয়ে নক্ষত্রবেগে ছুটে চলল। চারদিকে শুধু উত্তাল ঢেউ, সমুদ্রের কোনো কূলকিনারার সংকেত নেই কোথাও। আমার নিদারুণ ভয় করতে লাগল। এই জাহাজের কাপ্তেন কে, কারাই বা আরোহী—তারা সব কোথায় ? প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম, দেখলাম মাথার উপরে ছোট একটা লণ্ঠন জ্বলছে। আলো ক্ষীণ হলেও প্রাণে একটু আশা হল। হয়তো এবার কোনো লোক দেখতে পাব। ঠিক—পেলাম দেখতে। একটি মনুষ্যমূর্তি ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল। ভাবলাম ইনি হয়তো জাহাজের কোনো কর্মচারী হবেন, কিংবা ইনিই হয়তো জাহাজের কাপ্তেন—নাবিক-নায়ক। মনে বল এল, ভালো করে তাকালাম তাঁর দিকে। তাঁর চেহারার ছাপ আমার মনের পটে স্পষ্ট মুদ্রিত হয়ে গেল। আমাকে লক্ষ্য করে তিনি গম্ভীর স্বরে বললেন, ভয় নেই। উন্মত্ত সমুদ্রে চারদিক অন্ধকার করে এলেও জাহাজ ঠিক তার বন্দরে গিয়ে পৌঁছুবে। মনে হল যে জ্যোতির্ময় পুরুষ আমাকে এই জাহাজে উঠতে বলেছিলেন ইনি সেই পুরুষ। কোন দেশের যে তিনি অধিবাসী ঠাহর করতে পারলাম না। কত বিদেশীর মুখ আমি দেখেছি কারো সঙ্গে সে মুখের মিল নেই। জাহাজ বন্দরে গিয়ে পৌঁছুবার আগেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। বুঝলাম, আমার মাথার গোলমাল হয়েছে, তাই এই দুঃস্বপ্ন। তারপর—'

মিস জনসন থামল। সারদানন্দ আর মহেন্দ্র একে অন্যের মুখের দিকে তাকাল নীরবে।

'গত কয়েক বছর আমি লণ্ডনে আছি, কিন্তু স্বপ্নের কোনো কিনারা করতে পারছি না। স্বপ্ন, অবাস্তব ব্যাপার, মাথার গোল—এ সমস্ত জেনেও স্বপ্নকে পারছি না তাড়াতে। সব সময়েই মনের মধ্যে আনাগোনা করছে। কয়েক সপ্তাহ আগে লোকের মুখে শুনতে পেলাম কে একজন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে খুব ভালো বক্তৃতা করছে। মনের ভিতরটা, কেন

কে জানে, হঠাৎ দুলে উঠল। স্বপ্নের ছবিটা উঠল ঝলমল করে। বলব কী, আমি গেলাম একদিন বক্তৃতা শুনতে। জানতাম আমার স্বপ্ন মিথ্যে হবে, তবু বক্তৃতা আরম্ভ হবার অনেক আগেই এসে সভায় বসলাম। আমি কি অন্যমনস্ক ছিলাম, হঠাৎ দেখি বক্তৃতা সুরু হয়ে গিয়েছে। কী যে বলা হচ্ছে তা কিছু বুঝতে পাচ্ছি না, বক্তার মুখও স্পষ্ট নয়—কী রকম একটা আবেশের মধ্যে এসে পড়েছি। খানিক পরে বলবার সঙ্গে-সঙ্গে কণ্ঠস্বর দীপ্ত হয়ে উঠল আর সেই স্বরদীপ্তিতে প্রস্ফুট হল বক্তার মুখচ্ছবি। আমার সমস্ত চেতনা ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল, এ যে আমার সেই স্বপ্ন, সেই জ্যোতির্ময় স্বপ্ন! সেই মুখ সেই চোখ সেই রঙ। যে স্বর আমাকে ডেকেছিল, জাহাজে উঠতে বলেছিল, শেষে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, ভয় নেই, জাহাজ ঠিক বন্দরে গিয়ে পৌঁছবে—এ সেই কণ্ঠস্বর! স্বপ্ন মিথ্যে হবে যখন ভাবছিলুম তখনো বুঝি মনের গোপনে এই কথাটাই উঁকি মারছিল যে এমন ঘটনাও ঘটে যা স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবা যায়নি। তার পরে, আরো আশ্চর্য, আমার মনের মধ্যে যে প্রশ্ন যে সংশয় অহরহ যন্ত্রণা দিচ্ছিল স্বামীজি তাঁর বক্তৃতায় তার নিবারণ করলেন। মনে হল বিশেষ ভাবে আমাকে লক্ষ্য করেই সেই উত্তর বিঘোষিত হল। মনে হল আমি পেয়ে গেলুম, পৌঁছলুম এসে নিরাপদ বন্দরে।'

'বক্তৃতার পরে স্বামীজির সঙ্গে দেখা করলেন?' জিজ্ঞেস করল সারদানন্দ।

'দেখা করবার জন্যে এগোলুম কিন্তু নাগাল পেলুম না। তা ছাড়া কিছু জানি না শুনি না, ভয়ও হচ্ছিল খুব—'

'আজ?'

'আজ সাহস করে তাঁর বাড়িতে নিরিবিলিতে এসেছি।' মিস জনসনের চোখ জলে ভরে উঠল: 'যদি তাঁর সময় হয়! যদি তিনি দেখা করেন।'

প্রায় তক্ষুনিই আগের সাক্ষাৎকারী নেমে গেল। মিস জনসনকে ডেকে পাঠালেন স্বামীজি।

বুকের উপর প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত-জোড় করা মিস জনসন উঠে গেল উপরে।

৮৪

সারদানন্দকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিলেন স্বামীজি।

গুডউইন বললে, 'আমিও যাই।'

'কেন, তুমি যাবে কেন?'

গুডউইন তার কারণটা বিশদ করল। প্রথমত সে গরিব, চাল-চুলোহীন, আর সেই কারণে মিস মুলার আর স্টার্ডি তাকে সহ্য করতে পারে না, তার সঙ্গে একত্র এক টেবিলে খায় না পর্যন্ত। এই কারণে তাকে বাইরে খেতে হয়, কিন্তু এখানে তার রোজগার কোথায়? লণ্ডনে এমন কেউ পরিচিত নেই যে তাকে স্টেনোগ্রাফারের বাড়তি কাজ দিতে পারে। আমেরিকায় তার অনেক জানা-শোনা, সেখানে তার কাজের অভাব হবে না, সহজেই খরচ চালিয়ে নিতে পারবে। এখানে এ বাড়িতে সুবিধে হচ্ছে না।

'কিন্তু আমার—আমার কী হবে?' বেদনার্ত মুখে স্বামীজি বলে উঠলেন: 'তুমি না থাকলে আমার কাজ চলবে কী করে? আমার বক্তৃতা কে লিপিবদ্ধ করবে?'

মুহূর্তে গুডউইনের মুখ বিমর্ষ হয়ে গেল। আমেরিকায় যাওয়া যে স্বামীজিকেও ছেড়ে যাওয়া সেটা যেন মর্মে-মর্মে বুঝল এতক্ষণে। বললে, 'তবে এক কাজ করি। চেষ্টা করে দেখি কোথাও দু-তিন ঘণ্টার মত কাজ পাই কিনা, তা হলেই একরকম চলে যাবে আমার। বাকি সময়, বিশেষত বক্তৃতার সময় আমি এসে ঠিক আপনার কাজ করে দেব। কিন্তু এ বাড়িতে থাকতে পারব না কিছুতেই। স্টার্ডিদের মনের ভাব, আমি অন্যত্র চলে যাই। তার জন্যে আপনি ভাববেন না, পাশের একটা বাড়িতে থাকা-খাওয়ার যাহোক একটা বন্দোবস্ত করে নিতে পারব!'

স্বামীজি চিন্তান্বিত মুখে ভাবতে বসলেন। এমন একটি সৎ, দক্ষ, অনুগত লোককে উপযুক্ত আশ্রয় দিতে পারলাম না!

পরে একদিন স্বামীজি গুডউইনকে ডেকে বললেন, 'তুমি শরতের সঙ্গে চলে যাও আমেরিকায়। শরৎ নতুন লোক, আমেরিকার হালচাল জানে না, তুমি সঙ্গে থাকলে তার উপকার হবে।'

এ যুক্তি কাটানো কঠিন। তবু গুডউইন মুখভার করে বললে, 'ওখানে যাবার খরচা নেই আমার।'

'আমি দেব। যদি পারো তো মহিমকেও রাজি করাও। লণ্ডনের চাইতে নিউইয়র্কে মানুষ বেশি তেজী হয়!'

কিন্তু মহেন্দ্র এখন যেতে রাজি নয়। ব্রিটিশ মিউজিয়মের লাইব্রেরি ছেড়ে অন্যত্র যেতে তার রুচি নেই। অন্তত এ মুহূর্তে তো নেই। পরে দেখা যাবে। পরের কথা পরে।

আর সারদানন্দ?

কী করি, নরেনের হুকুম। নরেন যখন বলেছে তখন চেষ্টা করে দেখব। আমার তো যাওয়া নয়, লেকচার দেওয়া নয়, আমার শুধু স্বামীজির আদেশ পালন করা।

রামকৃষ্ণানন্দকে লিখছেন স্বামীজি :

'শরৎ কাল আমেরিকায় চলল। পত্রপাঠ কালীকে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেবে। শরতের বেলায় যেমন গড়িমসি হয়েছিল তেমনি না হয়। শরতের এখানে কোনো কাজ ছিল না—ছমাস বাদে এল, তখন আমি এখানে। সে প্রকার না হয় যেন। চিঠি যেন হারিয়ে না যায়—শরতের বেলার মত। তৎপর পাঠিয়ে দেবে।

এখানকার কাজ পেকে উঠেছে। লণ্ডনে একটি সেণ্টারের জন্যে টাকা এর মধ্যে উঠে গেছে। আমি আসচে মাসে সুইজারলণ্ডে গিয়ে দু একমাস বিশ্রাম নেব। তারপর আবার লণ্ডনে। আমার শুধু-শুধু দেশে ফিরে গিয়ে কী হবে? এই লণ্ডন হল দুনিয়ার সেণ্টার। ভারতের হৃৎপিণ্ড এখানে। এখানে একটা গেড়ে না বসিয়ে কি যাওয়া যায়? তোরা পাগল নাকি?

মহাতেজ, মহাবীর্য, মহা উৎসাহ চাই। মেয়ে-নেকড়ার কি কাজ? একমাত্র সঙ্ঘবদ্ধতায়ই শক্তি আর আজ্ঞানুবর্তিতাই সঙ্ঘবদ্ধতার মূল রহস্য।'

সেভিয়ার ভারতীয় সৈন্যবিভাগে কাজ করত, এখন অবসর নিয়ে ইংলণ্ডের হ্যাম্পস্টেডে ধর্মালোচনায় মনোনিবেশ করেছে। তার স্ত্রীও তার যোগ্য সহধর্মিণী। কিন্তু না পঠনে না শ্রবণে না বা আলোচনায় কোথাও শান্তি পাচ্ছে না। ধর্ম যেন কতগুলো আচারের সমষ্টি, কোথাও যেন একটা অনুভূতির বিদ্যুৎস্পর্শ নেই। খুঁজতে খুঁজতে

ক্লাস্ত, সেভিয়ার শুনতে পেল কে এক ভারতীয় যোগী প্রাচ্য দর্শন ব্যাখ্যা করবেন। দেখি না কী বলে, স্ত্রীকে নিয়ে একদিন শুনতে গেল সেভিয়ার।

এ যে নতুন কথা, মনের মতন কথা—ভগবৎ-সত্তার সঙ্গে অভেদানুভূতির কথা। লাফিয়ে উঠল সেভিয়ার। আমরা তো এমনি এক মহৎ দর্শনেরই সন্ধান করছিলাম, এমনি এক সত্যোজ্জ্বল প্রবক্তার। বক্তৃতার শেষে সেভিয়ার মিস ম্যাকলাউডকে জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি এই বক্তাকে জানেন ?'

'জানি।'

'আচ্ছা, তাঁকে যেমন দেখাচ্ছে তিনি সত্যি কি তেমনি ?'

'অবিকল।'

'তা হলে আর কথা নেই।' সেভিয়ার বললে গাঢ় স্বরে, 'তা হলে তো তাঁকেই অনুসরণ করতে হবে আর তাঁরই সাহায্যে ভগবানকে লাভ করব।' স্ত্রীর দিকে তাকাল সেভিয়ার। 'আমি যদি স্বামীজির শিষ্য হতে চাই তুমি মত দেবে তো ?'

'দেব।' মিসেস সেভিয়ার পালটা জিজ্ঞেস করলেন, 'আমিও যদি শিষ্য হতে চাই, তুমি রাজি হবে তো ?'

সেভিয়ার সপ্রেমে হাসল। বললে, 'বলতে পাচ্ছি না।'

তারপর তাদের যখন স্বামীজির সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ হল স্বামীজি মিসেস সেভিয়ারকে 'মা' বলে ডাকলেন। কী শক্তি, কী শান্তি, কী সহজ সুধা এই মা-ডাকে। মিসেস সেভিয়ার অভিভূত হয়ে গেল। তাকাল স্বামীর দিকে। কী, শিষ্য হতে দেবে না ? এ যে তার চেয়েও বেশি হলাম—মা হলাম।

'আপনাদের কি ভারতে আসতে ইচ্ছে করে না ?' জিজ্ঞেস করলেন স্বামীজি।

'আগে করত না, এখন করে। কিন্তু সে সৌভাগ্য কি আমাদের হবে ?'

'যদি আসেন আমি আপনাদেরকে আমার উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ সম্পদ দান করব।' স্বামীজি ডাকলেন : 'আপনারা আসুন।'

সেভিয়ার দম্পতি স্বামীজির কাছে দীক্ষা নিল। আর নিল স্টার্ডি, মিস মুলার। আর—আর মিস মার্গারেট নোবল।

গতবার লন্ডনে আলাপের পর স্বামীজির বেদান্ত-ক্লাশে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে মার্গারেটের মনে বৈরাগ্যের রঙ আরো গাঢ় হল। স্বামীজির একটি কথাই বিশেষ করে তাকে আন্দোলিত করতে লাগল। সেটি 'পরোপকার'—'বিশ্বকল্যাণ।' স্বামীজি বললেন, 'ইংরেজরা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছে, তাই সর্বদা তাদের চেষ্টা কী করে সীমাবদ্ধ থাকবে। তুমি সেই সীমা অতিক্রম করে তাকাও, দেখ, অনুভব করো। সমস্ত মানুষের মধ্যেই দেবত্ব নিহিত আছে। সেই নিদ্রিত দেবতাকে জাগাও। শ্রেষ্ঠ সেবা কী ? মানুষের কাছে এই দেবত্বের বাণী পৌঁছে দেওয়া। শ্রেষ্ঠ দান কী ? ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ দান।' শুনতে শুনতে মার্গারেটের সংকল্প জাগল ঈশ্বরের এই সর্বজনীনতার মন্দিরে সে আত্মোৎসর্গ করবে।

কী চমৎকার বললেন স্বামীজি : 'ঈশ্বর আছেন, যদি একথা সত্য হয়, তবে জগতে আর প্রয়োজন কী ? আর যদি এ কথা সত্য না হয় তবে আমাদের জীবনেই বা কী প্রয়োজন ?'

সেদিন ক্লাশে প্রশ্নোত্তর সারা হবার পর স্বামীজি হঠাৎ ধ্বনিত হয়ে উঠলেন : 'জগৎ

আজকের দিনে কী চায় জানো ? চায় এমন বিশজন স্ত্রী-পুরুষ যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে সদর্পে বলতে পারবে ঈশ্বর ছাড়া আমাদের আপনার বলতে আর কেউ নেই, কিছু নেই। কে কে যেতে প্রস্তুত ?' স্বামীজি উঠে দাঁড়ালেন, তাকালেন শ্রোতাদের দিকে, মার্গারেটের দিকে। মার্গারেটের মনে হল সে উঠে দাঁড়াবে, স্বামীজির ঐ দৃষ্টির ইঙ্গিত তাকেই যেন উঠে দাঁড়াতে বলছে। 'কিসের ভয় ?' তার ক্ষণকালিক দ্বিধার পর পড়ল আবার স্বামীজির প্রত্যয়ের অমৃত : যদি ঈশ্বর আছেন তবে জগতের কী দরকার ? আর যদি ঈশ্বর নেই তবে এই জীবনেরই বা দরকার কী।

'স্বামীজি', মার্গারেট স্বামীজির নিভৃতিতে গিয়ে দাঁড়াল : 'আমি আপনার সেই বিশজনের একজন হতে চাই।'

স্বামীজির সেই চিঠির কথা আগুনের অক্ষরে জ্বলছে মর্মের মধ্যে : জাগো জাগো মহাপ্রাণ, জগৎ যন্ত্রণায় জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে ?

মার্গারেটের কথায় স্বামীজি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'আমাদের দেশের মেয়েদের জন্যে আমার মনে একটি কল্যাণ-পরিকল্পনা আছে, আমার বিশ্বাস তাকে কার্য-কর করে তুলতে তুমি বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারো।'

'আমি নেব সেই কার্যভার।' মার্গারেট রাজি হয়ে গেল।

সেই চিঠির কথা আবার মনে পড়ল : অনন্ত প্রেম ও করুণা বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রয়োজন। জগৎ এমন মানুষ চায় যার জীবন প্রেমদীপ্ত স্বার্থশূন্য ; যে প্রেমে প্রত্যেকটি বাক্যও বজ্রের মত শক্তিশালী।

'তুমি রাজি ?' স্বামীজি সস্নেহে তাকালেন : 'এর জন্যে তোমাকে কী করতে হবে জানো ?'

'জানি। আত্মবিসর্জন। সর্বস্বত্যাগ।'

'হ্যাঁ, তাই।' আনন্দিত হলেন স্বামীজি : 'যার ঈশ্বরই সর্বস্ব, সর্বস্ব ত্যাগ করলেও তার ঈশ্বরই থাকে।'

মার্গারেটের মনে পড়ল চিঠির সেই শেষ কথা : তুমি চিরকাল আমার অফুরন্ত আশীর্বাদ জানবে।

অফুরন্ত আনন্দে ও আলোকে আছেন স্বামীজি, এক আধ্যাত্মিক বিশ্বমৈত্রীতে। ফ্রান্সিস লেগেটকে চিঠি লিখছেন স্বামীজি, প্রিয়ত্বের প্রেরণায় তাকে সম্বোধন করেছেন ফ্রাঙ্কিনসেন্স বলে, সুগন্ধনির্যাস বলে।

অতলান্তিকের এ পারে আমি বেশ ভালো আছি আর কাজকর্ম আশানুরূপ ভালো হচ্ছে।

আমার রবিবারের বক্তৃতাগুলো খুব জমেছিল, তেমনি ক্লাশগুলোও। এখন কাজের মরশুম শেষ হয়েছে, আমিও নিদারুণ ক্লান্ত। এখন আমি মিস মুলারের সঙ্গে সুইজার-ল্যান্ডে বেড়াতে যাচ্ছি।

ইংলন্ডে কাজ খুব আস্তে আস্তে অথচ সুনিশ্চিত ভাবে বেড়ে চলেছে। এ না হয় ও, অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষ আমার সঙ্গে দেখা করে আমার কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যতই ত্রুটি থাক, এ যে ভাবপ্রচারের শ্রেষ্ঠ যন্ত্র এতে আর কোনো সন্দেহ নেই। আমার সংকল্প—এই যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে আমার ভাবগুলি স্থাপন করব—তা হলেই সেগুলি সমগ্র জগতে ছড়িয়ে পড়বে। অবশ্য সব বড় কাজই খুব আস্তে

আস্তে হয়ে থাকে—তার বাধাবিঘ্নও বহু, বিশেষ করে আমরা হিন্দুরা, যখন বিজিত জাতি। কিন্তু এও বলি, যেহেতু আমরা বিজিত জাতি, সেই হেতু আমাদেরই ভাব চারদিকে ছড়াতে বাধ্য, কারণ, দেখা যায়, আধ্যাত্মিক আদর্শ চিরকাল পরাভূত পদদলিত জাতির মধ্য থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। দেখ না—ইহুদিরা তাদের আধ্যাত্মিক আদর্শে রোম সাম্রাজ্যকেও আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

তুমি জেনে সুখী হবে, আমি দিন-দিন ধৈর্যে ও সহানুভূতিতে জীবনের পাঠ নিচ্ছি। মনে হয়, স্পর্ধিত য়্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও যে ভগবান আছেন আমি পারছি তা উপলব্ধি করতে। আরো মনে হয় আমি ধীরে ধীরে সেই অবস্থার দিকেই এগুচ্ছি যেখানে শয়তান বলে যদি কেউ থাকে তাকে পর্যন্ত ভালোবাসতে পারব।

বিশ বছর বয়সের সময় আমি এমন গোঁড়া ও একগুঁয়ে ছিলাম যে কারু প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারতাম না, পারতাম না বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে। কলকাতার যে ফুটপাতে থিয়েটার সেই ফুটপাত দিয়ে হাঁটতাম না। এখন এই তেত্রিশ বছর বয়সে গণিকাদের সঙ্গে অনায়াসে এক বাড়িতে বাস করতে পারি—তাদের তিরস্কার করবার কথা ভাবতেও পারি না। এর মানে কি আমার অধঃপতন হয়েছে, না, আমার হৃদয় ক্রমশ উদার হয়ে-হয়ে অনন্ত প্রেম বা সাক্ষাৎ সেই ভগবানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে? আবার লোকে বলে শুনি যে চার দিকে মন্দ না দেখে, সে ভালো কাজ করতে পারে না, সে নিশ্চেষ্ট অদৃষ্টবাদে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। কোথায়, আমি তো তা দেখছি না। বরং, ভালোকে, ভাগবানকে, দেখতে পেয়ে আমার কর্মশক্তি প্রবলতর ভাবে বেড়ে চলেছে, শুধু বাড়ছেই না, ফলপ্রদ হচ্ছে। কখনো কখনো আমার এক রকম ভাবাবেশ হয়—মনে হয় পৃথিবীর সকল মানুষকে সকল বস্তুকে আশীর্বাদ করি, সমস্ত কিছুকে ভালোবাসি, আলিঙ্গন করি। তখন দেখি যা মন্দ তাই ভ্রান্তি। প্রিয় ফ্রান্সিস, আমি এখন তেমনি ভাবের ঘোরে আছি আর আমার প্রতি তোমার ও মিসেস লেগেটের ভালোবাসা ও দয়ার কথা ভেবে আমি আনন্দে চোখের জল ফেলছি। ধন্য সেই দিন যেদিন আমি জন্মেছিলাম। সেই প্রথম দিনটি থেকে কী অপরিসীম দয়া আর ভালোবাসা আমার জীবনে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। যে অনন্ত প্রেমস্বরূপ হতে আমার আবির্ভাব, তিনি আমার ভালো-মন্দ ('মন্দ' কথাটাতে ভয় পেয়ো না) প্রত্যেকটি কাণ্ড লক্ষ্য করে আসছেন। কারণ তাঁর হাতের যন্ত্র ছাড়া আমি আর কী, কবেই বা ছিলাম—তাঁরই সেবার জন্যে আমি আমার সর্বস্ব ত্যাগ করেছি। আমার প্রিয়জনদের ছেড়েছি, সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছি, এমন কি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছি। তিনি আমার এক আমুদে প্রিয় বন্ধু, আমি তাঁর খেলুড়ে। এই জগতের কাণ্ডকারখানায় কোনো হেতু-নিমিত্ত খুঁজে পাওয়া যায় না—কোন যুক্তি তাঁকে বাঁধবে বলো? লীলার সাগর তিনি, জগৎনাট্যে সর্বত্র সকল চরিত্রে তিনি হাসিকান্নার অভিনয় করছেন। জোসেফিন ম্যাকলাউড—অর্থাৎ জো যেমন বলে—মজা, কেবল মজা!

এ জগৎ মজার কুটি! আর সকলের চেয়ে মজার মানুষটি তিনি, সেই অনন্ত প্রেমস্বরূপ। তুমি দেখতে পাচ্ছ না মজাটা? আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাবই বলো আর খেলুড়েপনাই বলো, এ যেন জগতের খেলার মাঠে একদল স্কুলের ছেলেকে খেলতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—আর সবাই হৈ-চৈ করে খেলছে প্রাণপণে। কার স্তুতি করব, কার নিন্দা? এ যে সবই তাঁর খেলা। লোকে জগতের ব্যাখ্যা চায় কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যা করবে কিরূপে?

তাঁর তো মস্তিষ্ক বলে কিছু নেই, কোনো যুক্তিবিচারেরও তিনি ধার ধারেন না। তিনি আমাদের সকলকে ছোটখাটো মাথা ও ছোটখাটো বুদ্ধি দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন—কিন্তু যাই বলো, এবার আর আমাকে ঠকাতে পারছেন না, আমি এবার খুব সজাগ আছি।

আমি এত দিনে দু-একটা জিনিস শিখেছি। শিখেছি, প্রেম আর প্রেমাস্পদ—এই অনুভব সমস্ত যুক্তিবিচার বিদ্যাবুদ্ধি ও বাগাড়ম্বরের অতীত। হে আমার সাকি, পেয়ালা কানায়-কানায় ভরে দাও আর আমরা পান করে উন্মত্ত হয়ে যাই।

ইতি

তোমারই

পাগল বিবেকানন্দ

স্বামীজির প্রেরণায় ও আদর্শে মাদ্রাজ থেকে 'প্রবুদ্ধ ভারত' বা 'য়্যাওকেন্ড ইণ্ডিয়া' নামে মাসিক পত্র বেরুল—সম্পাদক রাজম আয়ার আর পৃষ্ঠপোষক নজুণ্ড রাও। পত্রিকা হাতে পেয়ে স্বামীজি খুশি হয়েছেন কিন্তু মলাটের ছবি দেখে তাঁর শিল্পবোধ পীড়িত বোধ করছে। রাওকে এ সম্পর্কে চিঠি লিখছেন :

'একটা বিষয়ে আমার কিন্তু একটু মন্তব্য করতে হল—মলাটটা একেবারে রুচিহীন ও কদর্য হয়েছে। সম্ভব হলে ওটাকে বদলে ফেলুন। ওটাকে ভাবব্যঞ্জক অথচ সরল করুন, আর এতে মানুষের মূর্তি কদাচ রাখবেন না। বটবৃক্ষ মোটেই প্রবুদ্ধ হবার চিহ্ন নয়, পাহাড় তো নয়ই, ঋষিরাও নন, ইউরোপিয় দম্পতিও নয়। পদ্মফুলই হচ্ছে পুনরভ্যুত্থানের প্রতীক। চারুশিল্পে আমরা খুবই পিছিয়ে আছি—বিশেষত চিত্রকলায়। বনে বসন্ত জেগেছে, তরুলতায় নব কিশলয় দেখা দিয়েছে—এমনি একটা অরণ্যচিত্র আঁকুন। কত ভাবই তো রয়েছে, ধীরে ধীরে তা চিত্রশিল্পে ফুটিয়ে তুলুন।

আমি আগামী রবিবার সুইজরলণ্ডে যাচ্ছি। শরৎকালে ইংলণ্ডে ফিরে এসে আবার কাজ সুরু করব। সম্ভব হলে ওখান থেকে আপনাকে প্রবন্ধ পাঠাব। আপনি জানেন আমার পক্ষে বিশ্রাম এখন নিতান্ত দরকার।'

সেভিয়ার দম্পতি ও মিস মুলারের অর্থানুকূল্যে স্বামীজির ইউরোপ-ভ্রমণ সম্ভব হল। উনিশে জুলাই, ১৮৯৬, স্বামীজি ডোভারে জাহাজে উঠলেন, তাঁর সঙ্গীও ঐ তিনজন। 'কী আনন্দ, বরফ দেখতে পাব, পাহাড়ি রাস্তায় পারব বেড়াতে!'

ইংলিশ চ্যানেল শান্ত ছিল, ক্যালেতে পৌঁছুলেন নির্বিঘ্নে। একটানা জেনেভায় না গিয়ে প্যারিসে রাত কাটালেন। সকালে উঠে যাত্রা সুরু হল, মহানন্দে পৌঁছুলেন জেনেভায়। যে হোটেলে তাঁরা উঠলেন, তার ঠিক সামনেই প্রশান্ত-বিস্তীর্ণ হ্রদ। তার নিবিড় নীল জল, উপরে আকাশ, চার দিকের মাঠ, ছবির মত সাজানো বাড়ি-ঘর আর বুকভরা বাতাস—সব মিলিয়ে স্বামীজিকে বিহ্বল করে তুলল।

হ্রদে নেমে দুদিন অবগাহন স্নান করলেন। ইতিহাসবিশ্রুত চিলন-দুর্গ বেড়িয়ে এলেন। তারপর চাল্লিশ মাইল দূরে চললেন চামুনিক্স গ্রামের দিকে। আল্পস-পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মব্লাঁ দেখলেন। দেখেই সোল্লাসে অভিনন্দন করে উঠলেন : 'এ সত্যিই বিস্ময়কর! তা হলে আমরা একেবারে বরফের মধ্যে এসে পড়েছি! কি আনন্দ!'

পাহাড়ে উঠতে চাইলেন স্বামীজি, গাইড বাধা দিল। অসজ্জিত পদযাত্রীর পক্ষে আরোহণ সাধ্যাতীত। স্বামীজিকে হতাশ হতে হল। কিন্তু তাই বলে কি একটা

হিমস্রোতও অতিক্রম করতে পারব না ? তা হলে সুইজরলণ্ডে আসা তো সর্বসাকুল্যেই বিফল হয়ে যাবে। তা হলে তো মানচিত্র দেখেই ভ্রমণ সারা সহজ ছিল।

না, কাছেই হিমনদী, মার-দ্য-গ্লেস। হাতে যেন চাঁদ পেয়ে গেলেন স্বামীজি। কিন্তু চলা যত সহজ ভেবেছিলেন তত সহজ হল না, বারে-বারেই পদস্খলন হতে লাগল। তবু যখন বেরিয়েছি থামব না, পিছু হটব না, শুধু অগ্রসর হব। হিমবাহ ঠিক অতিক্রম করে গেলেন, কিন্তু ঠিক পরেই একটা বিরাট চড়াই—সেটা পেরোলে তবে গ্রাম। উঠতে-উঠতে মাথা ঘুরল, পা টলল, তবু কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে দিলেন না, ঠিক গ্রামে গিয়ে পৌঁছুলেন।

এমনি পাহাড়ের উপরে ধ্যানগম্ভীর পরিবেশে যদি আমার একটি আশ্রম থাকত ! হিমালয়ের কথা স্বভাবতই মনে পড়ল। রুক্ষ কাঠিন্যের সঙ্গে শ্যামশ্রী কোলাকুলি করে থাকবে। সমস্ত কাজ থেকে ছুটি নিয়ে সেই আশ্রমের নির্জনতায় বাকি জীবন ধ্যানলীন হয়ে কাটিয়ে দেওয়ায় কী আনন্দ ! শুধু আমি নই, আমার সঙ্গে থাকবে আমার ইউরোপিয় ও ভারতীয় শিষ্যেরা। তারা একসঙ্গে থাকবে আর বেদান্ত পড়বে। বেদান্ত-বিদ্বান হয়ে তারা বেরুবে ঈশ্বরপ্রচারে, যার-যার নিজের দেশসেবায় !

'সত্যি স্বামীজি, হিমালয়ের কোলে আমাদের এমনি একটি আশ্রম হতে পারে না ?' বলে উঠল সেভিয়ার।

পাহাড়ের কোলে ছোট একটি গ্রামে দু সপ্তাহ কাটালেন চুপচাপ। চারদিকে বরফ আর বরফ, নিষ্কলুষ শুভ্রতার শান্তি। কোথাও সাংসারিকতার ধূলিলেশ নেই। কর্মের কোলাহল নেই। গর্বিত আত্মপ্রচার নেই। এখানে স্বামীজি আর বক্তা নন, প্রচারক নন, এখানে তিনি এক নিরাসক্ত নিঃসঙ্গানন্দ সন্ন্যাসী, শান্তি ও স্তব্ধতার উপাসক।

চারদিকে যেন ধ্যানের স্পর্শ লেগেছে, ধ্যানের মাদকতা। স্বামীজি একা-একা অনেক দূর পর্যন্ত হাঁটছেন, কেউ তাঁর সঙ্গ নিচ্ছে না, কেননা স্বামীজিকে একা থাকতে দিলে তারাও খানিকক্ষণ একা থাকতে প্যারবে, একা থেকে তারাও পারবে ধ্যানমগ্ন হতে।

চৈতন্যই দেহ, চৈতন্যই সমস্ত লোক, চৈতন্যই সমস্ত বস্তু। অহংকার, অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয়গ্রাম, সবই চৈতন্য। অর্থাৎ সমস্ত কিছুই চেতন্যস্বরূপ ব্রহ্মে কল্পিত--চৈতন্যসত্তা ভিন্ন এদের আর সত্তা কোথায় ?

আমার বন্ধ-মুক্তি নেই। আমার শাস্ত্রও নেই গুরুও নেই। কারণ এ সব কিছুই মায়ার বিলাস—আমি মায়ার অতীত অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ।

যিনি বিজ্ঞানী তিনি রাজাই করুন আর ভিক্ষাটনই করুন, তিনি নিত্যশুদ্ধ বলে পদ্মপত্রের জলের মতো কখনো কোনো দোষের দ্বারা লিপ্ত হন না।

স্বপ্নাবস্থার পাপপুণ্য যেমন জাগ্রতবস্থায় স্বীকৃত হয় না, তেমনি, হে তুরীয় আত্মা, জাগ্রতবস্থার পাপপুণ্য তোমাকে স্পর্শ করে না।

হে আত্মা, তোমাকে নমস্কার। শরীর কর্ম করুক, বাগিন্দ্রিয় তার শক্তি ক্ষয় করুক, বুদ্ধি বিষয়-রাজ্যের চিন্তাভারে আক্রান্ত থাক—তুমি পূর্ণ নির্লিপ্ত, তোমার তাতে ক্ষতি কী ?

পঞ্চপ্রাণ স্বধর্মের অনুষ্ঠান করুক, মন কামনার কল্পনায় ব্যথিত হোক, আমি যে আনন্দস্বরূপ অমৃতস্বরূপ, আমি যে পরিপূর্ণ—আমার আবার দুঃখ কোথায় ?

যেমন জলমধ্যস্থ লবণ জলেই অদৃশ্য থাকে, সেইরূপ হে আত্মা, তুমি ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন, তাই তুমি অদৃশ্য বলে প্রতীয়মান হও, কিন্তু তুমি প্রতিমুহূর্তেই বোধস্বরূপ।

আজ কী আনন্দের সমরস ! ইন্দ্রিয় মন প্রাণ অহঙ্কার প্রত্যেকেই তাদের জড়তার উপাধি ত্যাগ করে চৈতন্যানন্দসমুদ্র আত্মার স্বরূপে নিমগ্ন ।

আজ আমি স্বয়ং অপরোক্ষানুভূত । আমার অজ্ঞান অদৃশ্য, আমার কর্তৃত্ব বিনষ্ট, আমার আর কোনো কর্তব্য নেই ।

স্বামীজি একা একা হাঁটছেন আর উপনিষদ আবৃত্তি করছেন । বেদধ্বনিতে আল্পস হিমালয়ে পরিণত হচ্ছে । হঠাৎ তাঁর পাহাড়-চড়ার লাঠি একটা ফাটলে ঢুকে পড়তেই তিনি প্রায় পড়ছিলেন হুমড়ি খেয়ে, কে যেন তাঁকে আটকে দিল । ঐ খাড়া পাহাড় থেকে পড়লে আর দেখতে হত না । কিন্তু কেন কে জানে, বেঁচে গেলেন । এ কি একা চলার অহংকারকে শাসন করা, না, কোনো মুহূর্তেই তুমি একাকী নও এই কথাটা ধাক্কা মেরে বুঝিয়ে দেওয়া ?

'আপনাকে কখনো আর একা যেতে দেওয়া হবে না ।' বন্ধুরা তাঁকে সতর্ক করে দিল।

'কিন্তু শেষপর্যন্ত সঙ্গে থাকতে পারবে কে ?' বললেন স্বামীজি, 'শেষপর্যন্ত একাই যেতে হবে ।'

একদিন বেড়িয়ে ফেরবার পথে ছোট একটি পার্বত্য গির্জা চোখে পড়ল ।

'চলো ভার্জিন-এর পায়ে ফুল দিয়ে আসি ।' বললেন স্বামীজি । ভক্তির মধুর নম্রতা চোখেমুখে ছড়িয়ে পড়ল ।

কিছু পাহাড়ি ফুল আহরণ করলেন । নিজের হাতে করে দিলে অপরাধ হবে কিনা কে জানে, মিসেস সেভিয়ারকে স্বামীজি বললেন, 'মা, আমার ভক্তির এই কটি ফুল তুমি কুমারী মেরীর শ্রীচরণে দিয়ে এস ।'

সুইজরল্যাণ্ড থেকে আমেরিকায় মিসেস ওলি বুলকে চিঠি লিখছেন স্বামীজি 'আমি জগৎটাকে একেবারে ভুলে যেতে চাই, অন্তত দুমাসের জন্যে । কঠোর সাধনে ডুবে যেতে চাই, আর তাই আমার বিশ্রাম । পাহাড় আর বরফ দেখলে আমার মনে অনির্বচনীয় শান্তির ভাব আসে । এখানে আমার যেমন সুনিদ্রা হচ্ছে তেমন অনেকদিন হয়নি ।'

আবার গুডউইনকে লিখছেন : 'এখন আমি অনেকটা চাঙ্গা হয়েছি । জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বিরাট তুষার প্রবাহগুলি দেখি আর ভাবি আমি হিমালয়ে আছি । আমি সম্পূর্ণ শান্ত আছি, আমার স্নায়ুগুলোতে স্বাভাবিক শক্তি ফিরে এসেছে ।...জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি—যিনি দ্বেষও করেন না আকাঙ্ক্ষাও করেন না তাঁকেই নিত্যসন্ন্যাসী বলে জেনো । আর রোগ শোক ও মৃত্যুর চিরলীলাভূমি এই সংসার-পল্বলে কী আর কাম্য বস্তু থাকতে পারে ? ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম—যিনি সব বাসনা ত্যাগ করেছেন তিনিই সুখী ।

সেই অনন্ত অনাবিল শান্তির কিছু আভাস আমি এখন এই মনোরম স্থানে পাচ্ছি । আত্মানং চেদ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ । কিমিচ্ছন কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ— মানুষ যদি একবার জানতে পারে যে সে আত্মস্বরূপ, তা ছাড়া কিছু নয়, তবে কোন অভিলাষে কোন কামনার বশে সে দেহজ্বালায় জ্বলে মরবে ?

লালা বদ্রী শা-কে লিখছেন : 'আমি একটা মঠ স্থাপন করতে চাই । আলমোড়ায় বা আলমোড়ার কাছে হলে ভালো হয় । তেমন কোনো সুবিধাজনক স্থান আপনার জানা আছে কি যেখানে বাগবাগিচাসহ আমার মঠ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ? বাগান অবশ্যই থাকা চাই ! একটা গোটা ছোট পাহাড় হলেই আমার মনোমত হয় ।'

হিমালয়—পাথর আর বরফ, রুক্ষতা আর শ্যামলাবণ্য—নিঃসীম নির্জনতা, চেতনার সর্বোচ্চ আরোহণ—এই বুঝি স্বামীজির মঠের স্বপ্ন !

সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়াসমন্বিতঃ। যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্যতে ॥ যে গাছের ফল ও ছায়া দুইই আছে সেই মহৎ বৃক্ষেরই আশ্রয় নেওয়া উচিত। ফল যদি না-ও পাওয়া যায়, ছায়া তো থাকবে, ছায়া তো কেউ পারবে না কেড়ে নিতে। সুতরাং আদর্শকে বড় করে নিয়েই কাজে নামো, কার্যে বিফল হলেও বীর্যের সন্তোষ থেকে বঞ্চিত হবে না।

দেশে আলাসিংগাকে লিখছেন : 'দেখতেই পাচ্ছ আমি এখন সুইজরলণ্ডে আছি। আর ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছি। পড়া বা লেখার কোনো কাজ আমি করতে পারছি না—করা উচিতও নয়। লণ্ডনে আমার এক মস্ত কাজ পড়ে আছে, যা আগামী মাস থেকে সুরু করতে হবে। আমি আসচে শীতে ভারতে ফিরব। এবং সেখানকার কাজটাকে দাঁড় করাব। সকলে আমার ভালোবাসা জানবে। সাহসে বুক বেঁধে কাজ করে যাও। পশ্চাৎপদ হয়ো না—'না' বলো না। কাজ করো, ঠাকুর পিছনে আছেন। মহাশক্তি তোমার নিত্যসংগী। শুধু লেগে থাকো, সাহসী হও, ভরসা করে সব বিষয়ে লেগে পড়ো। ব্রহ্মচর্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। তোমার তো যথেষ্ট ছেলেপুলে আছে—আর কেন ?'

গুডউইন সুসংবাদ পাঠিয়েছে সারদানন্দ বক্তৃতায় সফল হয়েছে, কিন্তু কৃপানন্দ বা ল্যান্ডসবার্গ সম্বন্ধে খবর অস্বস্তিকর। বোঝা যাচ্ছে লণ্ডনে বেদান্ত-সমিতির সভ্যদের সংগে তার বনিবনা হচ্ছে না, তারই জন্যে সে অশান্তিতে ভুগছে। স্বামীজি ভাবছেন, আমেরিকায় যদি একটা মঠ থাকত তা হলে সেখানে গিয়ে একা-একা নিজের মনে থাকতে পারত—ছন্নছাড়া হয়ে যেতে হত না।

গুডউইনকে এ সম্পর্কে লিখলেন স্বামীজি :

'দিন কয়েক আগে কৃপানন্দকে চিঠি লেখবার একটা অদম্য ইচ্ছে হয়েছিল। মনে হচ্ছিল সে আনন্দে নেই, হয়তো আমায় স্মরণ করছে। তাই আমি তাকে একটা স্নেহমাখা চিঠি লিখেছিলাম। আজ আমেরিকার সংবাদ পেয়ে বুঝতে পারলাম তার কারণ কী। আমি তুষারপ্রবাহের কাছাকাছি জায়গা থেকে তোলা কটি সুন্দর ফুল তাকে পাঠিয়েছি। মিস ওয়াল্ডোকে বলবে, তাকে যেন প্রচুর স্নেহ জানিয়ে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেয়। ভালোবাসা কখনো মরে না। সন্তানেরা যাই করুক আর যেমনই হোক, পিতৃস্নেহের মরণ নেই। সে আমার সন্তান। সে আজ দুঃখে পড়েছে বলে আমার স্নেহ ও সাহায্যের উপর তার আরো বেশি দাবি।'

গুডউইনকে আরো লিখলেন :

'আমার মনে হয় লোকে যাকে কাজ বলে তাতে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা হবার হয়ে গেছে। আমি মরে গেছি—এখন আমি বেরিয়ে আসবার জন্যে হাঁপাচ্ছি। 'মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।' সহস্র লোকের মধ্যে কচিৎ কেউ সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করে, সেই চেষ্টাপরায়ণদের মধ্যেও কচিৎ কেউ আমাকে যথার্থ জানতে পায়। কারণ 'ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ।' ইন্দ্রিয়গুলি বলবান, তারা সাধকের মনকে জোর করে লুণ্ঠন করে নেয়।'

তারপর কোথায় যান ভাবছেন স্বামীজি, জার্মান দার্শনিক ডক্টর পল ডয়সেনের কাছ থেকে এক নিমন্ত্রণ এসে হাজির। এতদূরে এসেছেন, যদি আমার সঙ্গে একবার দেখা

করেন। ডয়সেন থাকে কোথায় ? থাকে জার্মানির কিয়েলে। সে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক। তার বৈশিষ্ট্য কী ? সে সংস্কৃতে বিশারদ, প্রাচ্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত। সে বিবেকানন্দের বক্তৃতা বরাবর অনুসরণ করে আসছে। সে বিবেকানন্দের ভক্ত।

লিখে দাও, যাব, দশুই সেপ্টেম্বর। মিস মুলার না পারুক, সেভিয়াররা আমার সঙ্গী হবে।

হাতে এখনো একমাস সময়। সুইজারলণ্ডে আরো কটা দিন কাটাই। লুসার্ন দেখে আসি চলো।

তার আগে কৃপানন্দকে চিঠি লিখলেন স্বামীজি :

'তুমি পবিত্র এবং সর্বোপরি অকপট হও। মুহূর্তের জন্যেও ভগবানে বিশ্বাস হারিয়ো না, তা হলেই তুমি আলোক দেখতে পাবে। যা কিছু সত্য তাই চিরস্থায়ী, তার যা সত্য নয় তাকে কেউ বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। অন্যে যাই ভাবুক আর করুক, তুমি কখনো তোমার পবিত্রতা সুনীতিবোধ ও ভগবৎপ্রেমের উচ্চ আদর্শকে খর্ব কোরো না। সর্বোপরি সর্বপ্রকার গুপ্ত সমিতির বিষয়ে সতর্ক থেকো। ভগবৎপ্রেমিকের পক্ষে কোনো ষড়যন্ত্রেই ভীত হবার কিছু নেই। স্বর্গে ও মর্তে একমাত্র পবিত্রতাই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম, সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।' সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যের নয়, সত্যেরই মধ্য দিয়ে দেবযানের পথ প্রসারিত। কে তোমার সহগামী হল কি না হল তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামিয়ো না। শুধু প্রভুর হাত ধরে থাকতে যেন কখনো ভুল না হয়—তা হলেই যথেষ্ট।

আমি 'মণ্টি রোসার' তুষারপ্রবাহের ধারে গিয়েছিলাম এবং কী আশ্চর্য, বরফের মধ্যেই শক্ত পাপড়ির তেজী ফুল ফুটে আছে, তাই কটি তুলে এনেছিলাম। তারই একটি তোমাকে এই চিঠির মধ্যে পাঠাচ্ছি। জাগতিক জীবনের সমস্ত হিমস্তূপ ও তুষারপাতের মধ্যেও ঐ ফুলের মত তুমি আধ্যাত্মিক দৃঢ়তায় বিকশিত হও।

তোমার স্বপ্নটি খুব সুন্দর। স্বপ্নে আমরা আমাদের মনের এমন একটা স্তরের পরিচয় পাই যা জাগ্রত অবস্থায় পাই না। আর কল্পনা যতই দূরপ্রসারী হোক না কেন, দুর্জ্ঞের আধ্যাত্মিক সত্য চিরকালই তার নাগালের বাইরে থেকে যায়। সাহস অবলম্বন করো। মানুষের কল্যাণের জন্যে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব, বাকি সব প্রভু জানেন।

অধীর হয়ো না, তাড়াহুড়া কোরো না। স্থির, একনিষ্ঠ ও নীরব কর্মেই সাফল্যলাভ সম্ভব। প্রভু অতি মহান। বৎস, আমরা সফল হবই—আমাদের সফল হতেই হবে। তাঁর নাম ধন্য হোক।

আমেরিকায় যদি একটা আশ্রম থাকত !'

স্বামী সারদানন্দ আমেরিকায় ভালো অভ্যর্থনা পাচ্ছে, তার বক্তৃতাও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে এ খবরে উৎফুল্ল স্বামীজি। ধীর, নম্র, প্রশান্তস্বভাব, তার সংস্পর্শে যে আসে সেই মোহিত হয়ে যায়। বিশিষ্ট হয়ে শোনে।

গ্রীনএক্যরে গিয়ে স্বামীজির মত সেই পাইন গাছের নিচে বসে ছাত্রদের বেদান্ত পড়ায়, গীতা-চণ্ডীর ব্যাখ্যা করে। নানা জায়গায় তার বক্তৃতার ডাক পড়ে—বস্টনে, ব্রুকলিনে, নিউইয়র্কে।

এ সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথকে সারদানন্দ পরে বলেছিল পরিহাস করে: 'ভাই লেখাপড়া তো তেমন ছিল না, আর লেকচারও কোনো দিন করিনি। কিন্তু নরেনের তাড়নায় লেকচার না দিলেই নয়। ভয় পেলেও দিতে হবে। 'না' বললে, বলা যায় না, যে রকম রাগী, হয়তো মেরেই বসবে। তারপরে ভাবো, ইংরিজিতে লেকচার! ইংরিজিতে কথাই ভালো কইতে পারি না, আটকে-আটকে যায়। কিন্তু কোনো উপায় নেই, নরেনের হুকুম। ভাবলুম, আমেরিকায় গিয়ে একবার তো ভঙ্গি-টঙ্গি করে দাঁড়িয়ে লেকচার দিতে উঠব, পারি তো ভালো, না পারি তো জাপান দিয়ে সটকান দেব। আর এ মুখো হব না। চোঁচা দৌড় মেরে দেশে গিয়ে পেঁছিব। কিন্তু একবার তো, যা থাকে কপালে, যাত্রাদলের দোঁহারের মত গাইতে উঠতেই হবে। গাওনা কেমন হবে কিছুই জানি না। মনে পড়ল নরেনের বইগুলো গুডউইন ছাপাচ্ছে। সেগুলো একটু দেখি। ফর্মাগুলো সঙ্গে নিয়ে জাহাজে বসে মন দিয়ে পড়তে লাগলুম, যেন একজামিন দিতে হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে খুব করে ঠাকুরকে ডাকতে লাগলুম—আমার না হোক, অন্তত নরেনের যেন মুখরক্ষা হয়।'

নরেনের মুখ শুধু রক্ষা নয়, মুখ উজ্জ্বল করল শরৎ।

আবার মহেন্দ্রনাথকে বলছেন সারদানন্দ: 'সেবার একটা তাঁবুতে বিরাট সভা—বক্তা আমি। এত বড় সভার সম্মুখীন হইনি আগে, কিঞ্চিৎ চঞ্চল হবারই কথা। সঙ্গে গুডউইন, নাছোড়বান্দা, নানাভাবে আমাকে উত্তেজিত করছে। নরেনকে স্মরণ করে ঠাকুরের নাম নিয়ে মঞ্চে উঠে দাঁড়ালুম। কে যে কী বলাল জানি না, দেখলুম সবাই সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে নিবিষ্টচিত্তে শুনছে। বক্তৃতার শেষে গুডউইনের স্ফূর্তি দেখে কে। বুঝলুম ফোয়ারার মুখ ঠিক খুলে গিয়েছে। কিন্তু যাই বলো, সমস্ত কৃতিত্ব তোমার দাদার। শেষে কী হল যদি শোনো—' সারদানন্দ পরে আবার বললেন, 'গীতা আর চণ্ডীর ভাব নিয়ে কয়েক মাস খুব লেকচার দিলুম, কিন্তু একই কথা বারবার বললে লোকে শুনবে কেন? ঠাকুরকে খুব ডাকলুম, কয়েক দিন পরে বুকে একটা অসীম সাহস এল। নতুন উদ্যমে লেকচার করতে লাগলুম—তোমাকে কী বলব, বক্তৃতা দারুণ জমে উঠল। শ্রোতার ভিড় সভাস্থল ছাপিয়ে যেতে লাগল। মুখ খুলে গিয়েছে, বুকে বিষম সাহস, বাজার সরগরম, ভাবলুম বছর কতক এখানে থেকে যাব। ও হরি, তোমার দাদাই আবার সব মাটি করে দিল। হুকুম করল, কলকাতায় ফিরে এস। ব্যস, লেকচার খতম, তল্পিতল্পা গুটিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলুম। আমি লেকচারও বুঝি না, আমেরিকা-ইংলণ্ডও বুঝি না, স্বামীজির আদেশপালন করাই আমার একমাত্র কাজ।'

লুসার্নে পেঁছে যা দর্শনীয় সমস্ত দেখলেন স্বামীজি। মিস মুলার বিদায় নিল। সেভিয়ারদের নিয়ে স্বামীজি এগুলেন জার্মানির দিকে।

নজুণ্ড রাওকে লিখছেন স্বামীজি :

'বীরের মত কাজ করে যান। আমরণ কাজ করে যান। আমি আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি, আর শরীর চলে গেলেও আমার শক্তি আপনাদের মধ্যে কাজ করবে। জীবন তো আসে যায়—ধন, মান, ইন্দ্রিয়ভোগ সবই দুদিনের জন্যে। ক্ষুদ্র সংসারী কীটের মত মরার চাইতে, কর্মক্ষেত্রে গিয়ে সত্যের জন্যে মরা ভালো—ঢের ভালো। চলুন—এগিয়ে চলুন।'

লুসার্নে থেকে তারপর এক চিঠি লিখলেন কলকাতার স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে :

'আজ রামদয়ালবাবুর চিঠি পেলাম। তিনি লিখছেন যে দক্ষিণেশ্বরের মহোৎসবে বেশ্যারা যাচ্ছে আর সেই কারণে ভদ্রলোকেরা যেতে চাচ্ছে না। তাঁর মতে উৎসব একদিন পুরুষের জন্যে আরেকদিন মেয়েদের জন্যে হওয়া উচিত। সে বিষয়ে আমার বিচার এই :

বেশ্যারা যদি দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে যেতে না পায় তাহলে তারা কোথায় যাবে? প্রভুর প্রকাশ পুণ্যবানদের জন্যে তত নয় যত পাপীদের জন্যে।

স্ত্রী-পুরুষভেদ, জাতিভেদ, ধনভেদ, বিদ্যাভেদ ইত্যাদি নারকীয় বহুভেদ সংসারের মধ্যে থাক। পবিত্র তীর্থস্থানে যদি ওরকম ভেদ থাকে, তাহলে তীর্থে আর নরকে ভেদ কি?

আমাদের মহাজগন্নাথপুরী—যেখানে পাপী-অপাপী, সাধু-অসাধু, নর-নারী, বালক-বৃদ্ধ সকলের সমান অধিকার। যদি বছরের মধ্যে অন্তত একদিন হাজার হাজার নরনারী পাপবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধির হাত থেকে নিস্তার পেয়ে হরিনাম করে ও শোনে—এ পরম মঙ্গল।

যদি তীর্থস্থলেও লোকের পাপবৃত্তি একদিনের জন্যেও না সঙ্কুচিত হয়, তবে তা তোমাদের দোষ, তাদের নয়। এমন বিপুল ধর্মস্রোত তোলো যে-কেউ তার কাছে আসবে, ভেসে যাবে।

যারা ঠাকুরঘরে গিয়েও, ও পতিতা ও নীচ জাত ও গরিব ও ছোটলোক—এসব হিসেব করে, তাদের, মানে যাদের তোমরা ভদ্রলোক বলো, সংখ্যা যত কম হয় ততই মঙ্গল। যারা ভক্তের জাত বা জন্ম বা কর্ম দেখে তারা আমাদের ঠাকুরকে কী করে বুঝবে? প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি শত শত গণিকা আসুক তাঁর পায়ে মাথা নোয়াতে, একজনও ভদ্রলোক না আসে তো নাই আসুক। বেশ্যা আসুক, মাতাল আসুক, চোর আসুক—সকলে আসুক—তাঁর অবারিত দ্বার। ধনীর পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে উটের পক্ষে ছুঁচের ছিদ্রে প্রবেশ করা অনেক সোজা। এসকল নিষ্ঠুর রাক্ষুসে ভাব মনেও স্থান দিও না।

আমি এখন সুইজরলণ্ডে ভ্রমণ করছি। অধ্যাপক ডয়সেনের সঙ্গে দেখা করতে শিগগির জার্মানিতে যাব। সেখান থেকে ২৩-২৪ সেপ্টেম্বর নাগাদ ইংলণ্ডে ফিরব। তারপর আগামী শীতে স্বদেশ।'

শফহজেন-এ রাইন নদীর জলপ্রপাত দেখে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে গেলেন কবলে লজ-এ। সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন স্টিমার নিলেন। রাইন নদীর উপর দিয়ে স্টিমার চলল, পেঁছুলেন কোলোন-এ। কোলোন-এর বৃহত্তর গির্জায় প্রার্থনা শুনলেন।

সেভিয়ারদের ইচ্ছে এখান থেকে সোজা কিয়েল-এ চলে যায়, কিন্তু স্বামীজি বললেন, না, বার্লিন দেখব।

বার্লিনের পর ড্রেসডেন-এর কথা বলছিল সেভিয়ার, কিন্তু স্বামীজি হেসে বললেন, 'না, এখন ডয়সেন।'

স্বামীজি এসেছেন, হোটেলে আছেন, খবর পেয়েই ডয়সেন পরদিন প্রাতরাশের জন্যে তাঁকে ও তাঁর সংগী সেভিয়ার দম্পতিকে নিমন্ত্রণ করে পাঠাল। পরদিন সকাল দশটায় ডয়সেনের বাড়িতে উপস্থিত হল সকলে। গৃহস্বামী কোথায়? আসুন, তিনি আপনাদের জন্যে তাঁর লাইব্রেরিতে অপেক্ষা করছেন।

প্রথম সাদর সম্ভাষণ বিনিময়ের পর আলাপ সুরু হল। ডয়সেন জানতে চাইল স্বামীজি আর কোথায় যাবেন, কী তার মানচিত্র। তারপর টেবলের উপব খোলা বই-গুলোর দিকে তাকালেন সস্নেহে। বললেন, 'বেদান্ত একটা বিরাট কীর্তি। সত্যসন্ধানী মানুষের উচ্চতম মহত্তম চিন্তা। বিশেষত শঙ্করভাষ্যের ভিত্তিতে যে দর্শন গড়ে উঠেছে সেই বেদান্তদর্শনের তুলনা নেই।'

ইউরোপের সংস্কৃত পণ্ডিতমণ্ডলীর অগ্রগণ্য, ডয়সেন দর্শনের ব্যাপ্তি ও অনুভূতিতেও বিদগ্ধতম। আরো বললেন, 'একমাত্র বেদান্তই মানবিকতার পবিত্রতম নীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারে—সে নীতি এই যে প্রত্যেক মানুষই ভগবৎস্বরূপ। তাকালেন স্বামীজির দিকে: 'আমার মনে হয় জগৎ ক্রমে আধ্যাত্মিকতারই উৎসমুখে প্রত্যাবর্তন করবে আর সে আন্দোলনের নেতৃত্ব নেবে ভারতবর্ষ। যে দেশ বেদান্ত রচনা করেছে সে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মশক্তিরূপে স্বীকৃত হবে এ আর বিচিত্র কী।'

'আমি একবার ভারতের মরুভূমিতে একমাসেরও বেশি ভ্রমণ করেছিলাম।' বলছেন বিবেকানন্দ, 'রোজই দেখতাম চোখের সামনে কত মনোহর দৃশ্য, সুন্দব গাছ, ছায়া, হ্রদ, হ্রদের টলটলে জল। একদিন তৃষ্ণার্ত হয়ে হ্রদের জল খাবার জন্যে এগোলাম, কোথায় জল, সমস্ত হ্রদটাই অন্তর্হিত হয়েছে। তক্ষুনি মস্তিষ্কে প্রবল আঘাতের সংগে এই জ্ঞান হল এতদিন যে মরীচিকার কথা পড়ে এসেছি এ সেই মরীচিকা। নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেই হাসতে লাগলাম। পরদিন আবার যখন হ্রদ দেখলাম আমার জ্ঞান ফিরে এল যে এ মরীচিকা ছাড়া কিছু নয়। জ্ঞান ভ্রমোৎপাদিকা শক্তিকে বিনষ্ট করল। এমনি ভাবেই এই জগদভ্রান্তিও একদিন ঘুচবে। এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডও একদিন আমাদের সামনে থেকে অন্তর্হিত হয়ে যাবে। এর নামই প্রত্যক্ষানুভূতি। দর্শন কেবল কথার কথা নয়। তা প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয়। এ শরীর উড়ে যাবে—আমি দেহ বা মন এই যে আমাদের জ্ঞান এ কিছুক্ষণের জন্যে চলে যাবে—কিংবা যদি কর্ম সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়ে থাকে, তবে একেবারে চলে যাবে, আর ফিরে আসবে না—আর যদি কর্মের কিছু বাকি থাকে, তবে হাঁড়ি তৈরি হয়ে যাবার পর পূর্ব বেগের প্রেরণায় কুম্ভকারের চাকের ঘোরার মত মায়ামোহমুক্ত হয়েও দেহটা কিছুদিন টিঁকে থাকবে। তখন আবার জগৎ ফিরে আসবে, আসবে নরনারী, আবার সেই মায়ামোহ—যেমন পরদিনেও মরুভূমিতে এসেছিল মরীচিকা। কিন্তু তা আর আগের মত শক্তি বিস্তার করতে পারবে না কারণ সংগে সংগে এই জ্ঞানও আসবে যে আমি ওদের স্বরূপ জেনেছি। তখন আর ওরা আমাকে বদ্ধ করতে পারবে না, দুঃখ কষ্ট শোক আর পারবে না উৎপাত ঘটাতে। যখন দুঃখকর বিষয় আসবে তখন মন বলতে পারবে, আমি তোমাকে জানি, তুমি ভ্রমমাত্র।

যখন মানুষ এই অবস্থা লাভ করে তাকে জীবন্মুক্ত বলে। জীবন্মুক্ত মানে জীবিত অবস্থায়ই মুক্ত। জ্ঞানযোগীর জীবনের উদ্দেশ্য এই জীবন্মুক্ত হওয়া। সেই জীবন্মুক্ত যে এই জগতে অনাসক্ত হয়ে বাস করতে পারে। যেন জলস্থ পদ্মপত্র। জলের মধ্যে বাস করলেও জল যেমন পদ্মপত্রকে সিক্ত করতে পারে না তেমনি জীবন্মুক্ত সংসারে থেকেও নির্লিপ্ত থাকে। সে জীবশ্রেষ্ঠ যেহেতু সে পূর্ণস্বরূপের সঙ্গে নিজের অভেদ ভাব উপলব্ধি করেছে। যতক্ষণ এই জ্ঞান থাকে যে ভগবানের থেকে তোমার সামান্যতম ভেদ আছে ততক্ষণ তোমার ভয় থাকবে। কিন্তু যখনই জানবে তুমিই ভগবান তখন আর তোমার ভয় কোথায় ?'

ডয়সেন সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুবাদে ব্যাপৃত—সে নিয়ে কথা উঠল। স্বামীজি কয়েকটি শব্দের সংশোধন করতে চাইলেন, ডয়সেন সম্মতি দিল না, বললে, শব্দটা শ্রুতিকটু। স্বামীজি বললেন, অর্থের যাথার্থ্যই আসল, ভাষার মাধুর্য গৌণ। এ নিয়ে আরো কথা হল, আরো দ্বন্দ্ব। ডয়সেন দেখল স্বামীজির নির্বাচিত শব্দের তাৎপর্যে অনেক সূক্ষ্মতা, অনেক অনুভূতি, সুতরাং ডয়সেন নরম হল। স্বামীজির নির্বাচনকেই অনুমোদন করলে।

আর সব ছেড়ে স্বামীজি একটা কবিতার বই টেনে নিয়ে দেখতে লাগলেন। ডয়সেন কী একটা প্রশ্ন করল। স্বামীজি উত্তর দিলেন না। কবিতায় অভিনিবেশের দরুনই এই ঔদাসীন্য।

কিন্তু ডয়সেন ক্ষুণ্ণ হল। ভাবল এ কী অশালীন ব্যবহার।

ডয়সেনের ক্ষোভের কথা স্বামীজি জানতে পেলেন। তক্ষুনি ত্রুটি স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন। বললেন, 'কবিতা পড়ছিলাম, আপনার প্রশ্ন শুনতে পাইনি।'

'কবিতা !' ডয়সেন যেন বিশ্বাস করতে চাইল না। ভাবখানা, সন্ন্যাসী মানুষ কবিতা পড়তে যাবে কেন ?

'সত্যি পড়ছিলাম।' দৃঢ়স্বরে বললেন স্বামীজি 'তবে শুনুন।' বই না দেখে দিব্য আবৃত্তি করতে লাগলেন স্বামীজি !

কটা পৃষ্ঠা উলটে পালটে দেখেছেন, কী একটু পড়েছেন ভাসা-ভাসা, তাই অবিকল মুখস্থ – ডয়সেন বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল। স্বামীজির দুহাত চেপে ধরে বললেন, 'এই আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি আপনি কোথায় পেলেন ?'

'শুধু যোগসাধনে।' স্বামীজি হাসলেন : 'এ সামান্য জিনিসে অবাক হবেন না। ভারতীয় যোগীরা যোগবলে এমন একাগ্রতা অর্জন করে যে গায়ে জ্বলন্ত অঙ্গার ফেলে দিলেও তার ধ্যান ভাঙে না।'

কিল থেকে স্টার্ডিকে চিঠি লিখছেন স্বামীজি :

অবশেষে অধ্যাপক ডয়সেনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল। অধ্যাপকের সঙ্গে দ্রষ্টব্য জায়গাগুলি দেখে ও বেদান্ত আলোচনা করে কালকের দিনটা খুব চমৎকার কেটেছে।

আমার মতে তিনি যেন এক রণমুখো অদ্বৈতবাদী। অন্য কিছুর সঙ্গেই তিনি আপোস করতে নারাজ। ঈশ্বর শব্দে পর্যন্ত তিনি আঁতকে ওঠেন। তাঁর ক্ষমতায় কুলোলে তিনি ঈশ্বরকেও রাখতেন না।

হামবুর্গ আর আমস্টার্ডাম হয়ে স্বামীজি ফিরে গেলেন ইংলন্ডে। স্বয়ং ডয়সেন

তাঁর সঙ্গী হল। সেভিয়ারদের অনুরোধে স্বামীজি তাদের হ্যাম্পস্টেডের বাড়িতে অতিথি হলেন আর ডয়সেন উঠল সেণ্ট জন্‌স উড-এ, এক বন্ধুর আবাসে।

এবার স্বামীজির বক্তৃতার জন্যে স্টার্ডি ভিক্টোরিয়া স্ট্রিটে একটা প্রকাণ্ড হল-ঘর ভাড়া নিলে, স্বামীজির থাকবার জায়গাও কাছাকাছি গ্রে কোর্টস গার্ডেনসে ঠিক হল। স্বামীজি ফিরে এসেছেন শুনে উৎসাহীর দল সীমা-সংখ্যা ছাড়িয়ে যেতে চাইল। হল-ঘরেও বুঝি উঠল না কুলিয়ে।

'যুক্তির রাজ্য ছাড়িয়ে আরো উচ্চতর অবস্থা আছে। বাস্তবিক বুদ্ধির অতীত প্রদেশেই আমাদের প্রথম ধর্মজীবন আরম্ভ হয়। যখন তুমি চিন্তা বুদ্ধি যুক্তি—সব অতিক্রম করে চলে যাও, তখনই তুমি ভগবৎপ্রাপ্তির পথে প্রথম পদক্ষেপ করলে। এই জীবনের প্রকৃত সূচনা। জানি, এখানে প্রশ্ন তুলবে, চিন্তা ও বিচারের অতীত অবস্থাই যে সর্বোচ্চ অবস্থা, তার প্রমাণ কী? প্রথমত, জগতের কত শ্রেষ্ঠ মানুষ, যাঁরা নিজ শক্তি বলে সমুদয় জগৎ পরিচালিত করেছিলেন, যাঁদের হৃদয়ে স্বার্থের লেশমাত্রও ছিল না, তাঁরা জগতের সমক্ষে ঘোষণা করে গিয়েছেন যে, আমাদের জীবন সেই সর্বাতীত অনন্তস্বরূপে পৌঁছবার পথের একটি বিশ্রামস্থান মাত্র। দ্বিতীয়ত তাঁরা শুধু এইটুকু বলেই ছেড়ে দেননি, তাঁরা সেখানে যাবার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সে পথ ধরে কী করে এগিয়ে যেতে হয় বুঝিয়ে দিয়েছেন তার পদ্ধতি-প্রণালী। যদি স্বীকার করা যায় এ জীবনের চেয়ে উচ্চতর অবস্থা আর নেই তাহলে কোন যুক্তিতে এই দৃশ্যমান বিপুল বিশ্বজগতের ব্যাখ্যা করবে? যদি আমাদের এর চেয়ে বেশিদূরে যাবার শক্তি না থাকে, যদি আমাদের এর চেয়ে কিছু প্রার্থনা করবার না থাকে, তাহলে এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই আমাদের জ্ঞানের চরম সীমা থেকে যাবে। একেই অজ্ঞেয়বাদ বলে। কিন্তু প্রশ্ন এই, আমরা ইন্দ্রিয়ের সমুদয় সাক্ষ্যেই যে বিশ্বাস করব তারই বা যুক্তি কী?

যদি শূন্যবাদকেই অবলম্বন করে থাকতে হয় তাহলে জগতে কোথাও আমরা স্থির থাকতে পারব না। শুধু অর্থ যশ নামের আকাঙ্ক্ষায় অস্তিবাদী হয়ে আর সব ব্যাপারে নাস্তিক হওয়া জুয়াচুরি ছাড়া কিছু নয়। দার্শনিক কাণ্ট বলেছেন, আমরা যুক্তির দুর্ভেদ্য প্রাচীর অতিক্রম করে তার অতীত প্রদেশে যেতে পারি না। কিন্তু ভারতবর্ষে যত তত্ত্ব আবিষ্কৃত তার সবগুলিরই প্রথম কথা, যুক্তির পরপারে উত্তরণ। যোগীরা অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে এই রাজ্যের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন এবং শেষে এমন এক বস্তু লাভ করেন, যা যুক্তির পরপার, যেখানেই শুধু আমাদের বর্তমান পরিদৃশ্যমান অবস্থার কারণ পাওয়া যায়। 'তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের অজ্ঞানের পরপারে নিয়ে চলো।' 'ত্বং হি নঃ পিতা, যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি।' এই ধর্ম-বিজ্ঞান। আর কিছুই প্রকৃত ধর্মবিজ্ঞান হতে পারে না।'

স্বামী অভেদানন্দ বা কালী মহারাজ বা কালী তপস্বীকে চিঠি লিখলেন তাড়াতাড়ি চলে আসতে। নভেম্বরে আবার তাঁর আমেরিকা যাবার কথা, যেসকল শিষ্য-ভক্ত রেখে যাবেন ইংলণ্ডে, তাদের কে দেখাশোনা করবে, কে বা পড়াবে বেদান্ত? সারদানন্দের শূন্য স্থান পূর্ণ করা সমূহ দরকার।

'এই পত্রে মহেন্দ্রবাবু মাস্টার মশায়ের নামে চেক পাঠালাম। এ দিয়ে কাপড় চোপড় কিনবে। গঙ্গাধরের তিব্বতী চোগা মঠে আছে। ঐ ঢং-এর একটা চোগা গেরুয়া রঙের কাপড়ে তৈরি করে নেবে। কলারটা যেন কিছু উপরে হয়, অর্থাৎ গলা পর্যন্ত

ঢাকা পড়ে। সকলের আগে চাই একটা খুব গরম ওভারকোট। শীত বড়ই প্রবল। সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট পাঠাচ্ছি,—ফার্স্ট ক্লাসে সেকেণ্ড ক্লাসে বড় বিশেষ নেই।... খেতড়ির রাজাকে লিখছি যে তাঁর বোম্বের এজেন্ট যেন তোমাকে দেখে শুনে 'বুক' করে দেয়। যদি এই ১৫০ টাকায় কাপড়-চোপড় না হয়, রাখাল যেন তোমাকে বাকি টাকা দেয়, আমি পরে তাকে পাঠিয়ে দেব। তাছাড়া পঞ্চাশ টাকা হাতখরচের জন্যে রাখবে, রাখালকে দিতে বলবে। তারপর আমি পাঠিয়ে দেব। যে স্টিমার একদম লণ্ডনে আসে তাই ধরবে। কারণ তাতে দুচার দিন যদিও বেশি লাগে, ভাড়া কম। এখন আমাদের তো বেশি পয়সা নেই। কালে দলে-দলে চতুর্দিকে পাঠাব।

সকলে উঠে পড়ে না লাগলে কি কাজ হয়? উদ্যোগিনাং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ। পিছু দেখতে হবে না, এগিয়ে চলো। অনন্ত বীর্য, অনন্ত উৎসাহ, অনন্ত সাহস, অনন্ত ধৈর্য, তবেই মহাকার্য সাধন হবে। দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দিতে হবে!'

কালী কি আসতে দেরি করছে?

আবার তাড়া দিয়ে লিখলেন কালীকে:

'যদি শরতের বেলার মত দেরি হয় তো কাউকেও আসতে হবে না—ওরকম গড়িমসি নিষ্কর্মার কাজ নয়, মহারজোগুণের কাজ। তমোগুণটা আমাদের দেশময়—খালি তমস্ আমাদের দেশে। রজস চাই, তারপর সত্ত্ব—সে ঢের দূরের কথা।'

কালীপ্রসাদ ঠিক এসে পৌঁছুল লণ্ডনে। থাকতে লাগল স্বামীজির সঙ্গে, গ্রে কোট স গার্ডেনস-এ।

শরৎ আর কালী, শ্রীরামকৃষ্ণের 'ভুলুয়া' আর 'কালুয়া', দুজনেই চলে এসেছে বিদেশে, বেদান্তবার্তার বাহক হয়ে। দুজনে প্রথম দেখা হল আমেরিকায়, নিউইয়র্কে। সেই কথা মনে করে লিখছেন অভেদানন্দ:

'শরৎ মহারাজকে বহুদিন পর দেখে পূর্বের সকল স্মৃতি মনে ভেসে উঠল। একসঙ্গে দুজনে কতদিনই না আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণতলে কাটিয়েছি। স্বামীজি আমাদের দুজনকে বলতেন 'কালুয়া' ও 'ভুলুয়া'। শরৎ মহারাজ ও আমি একসঙ্গে পুরীতে গেছি ও সেখানে এমার মঠে রামানুজ সম্প্রদায়ের আচারী বৈষ্ণবদের সঙ্গে প্রায় ছ মাস কাটিয়েছি। একদিন অশোকের কীর্তিস্তম্ভ দেখে ফিরছি, পথ না পেয়ে ঢুকে পড়েছি জঙ্গলের মধ্যে। আমার যোগী খোঁজা বাই ছেলেবেলা থেকেই ছিল। শরৎ মহারাজকে বললাম, চলো এই জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের গুহায় নিশ্চয়ই কোনো যোগীর সন্ধান পাব। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একটা গুহার সামনে গিয়ে হাজির হলাম। আশা হল নিশ্চয়ই কোনো ধ্যানস্থ যোগীর দেখা মিলবে। তাকাতেই অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। দেখলাম প্রকাণ্ড একটা বাঘিনী তার ছানাগুলোকে নিয়ে পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। ঘুমুচ্ছিল, তাই রক্ষে—আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করতে করতে চোঁচা দৌড় দিলুম। কিছুদূরে দৌড়ুবার পর ওদেশের জংলি একটি লোকের সঙ্গে দেখা হল। সে আমাদের মুখে ঘটনা শুনে হাসল, বললে, আমার কাছে ঐ বাঘিনীর দুধ আছে, একটু চেখে দেখবেন? আমরা রাজি হলুম। খেলুম বাঘের দুধ।'

বাঘের দুধ খাওয়া বীরসিংহ সন্ন্যাসী ভক্ত—এক গুরুভাইয়ের প্রতি আরেক গুরুভাইয়ের কী নিবিড় ভালোবাসা!

ব্লুমস স্কোয়ারে অভেদানন্দকে দিয়ে প্রথম বক্তৃতা দেওয়ালেন স্বামীজি। সবাই জানত স্বামীজিই বলবেন, কিন্তু বলতে উঠে বলে বসলেন, আজ আমার পরিবর্তে আমার গুরুভাই অভেদানন্দ বলবেন।

বিপর্যস্ত হয়ে যাবার কথা, কিন্তু অভেদানন্দ বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত হল না। ঋজু উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বে উঠল বক্তৃতা দিতে। বেদান্তদর্শনের মূল সূত্রগুলো নিজের উপলব্ধির আলোকে নতুনভাবে উদ্ভাসিত করে তুলল। স্বামীজিও ভাবতে পারেননি অভেদানন্দ এমন গৌরবে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। আর শ্রোতার দল তো অভিভূত, অনুপ্রাণিত। ইনি স্বামীজির চেয়েও কিছু কম যান না! সে রকমই আধ্যাত্মিক প্রত্যয়ে প্রদীপ্ত, সে রকমই বক্তব্যের দৃঢ়তায় স্থিরোন্নত। প্রথম ইংরিজি বক্তৃতায়ই এতটা ঔজ্জ্বল্য প্রকাশিত করতে পারবে এ সকলের কাছে বিস্ময়ের মত মনে হল।

'আর আনন্দে যেন স্নান করে উঠলেন স্বামীজি।' সে বক্তৃতার বর্ণনায় লিখছে এরিক হ্যামন্ড, 'তাঁর মুখে-চোখে সে কী তৃপ্তির বিভাত! ছোট ভাইয়ের অপ্রত্যাশিত সাফল্যে বড় ভাইয়ের অপরিমিত আহ্লাদ। নিজেকে সরিয়ে রেখে যে ভাইকে স্থান করে দিয়েছিলেন এই পরিতোষই তাঁর পরম পুরস্কার। বললেন স্বামীজি, আমার আর ভয় নেই। আমি ইহলোক হতে বিদায় নিলেও আমার কথা জগৎকে শোনাবার জন্যে আমার এই প্রিয় ভাই থাকবে। এ কথা শুনে বিপুল জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠল। এ অভিনন্দন যতটা বিবেকানন্দকে, ততটাই অভেদানন্দকে।'

এমনি সব যুবকদের কথা ভেবেই তো কয়েকদিন আগে স্বামীজি লিখেছিলেন আলাসিংগাকে, 'কিন্তু বৎস, আমি এমন লোক চাই, যার পেশী লোহার মত দৃঢ়, স্নায়ু ইস্পাত দিয়ে তৈরি, আর তার মধ্যে চাই এমন একটি মন যা বজ্রের উপকরণ দিয়ে গড়া। চাই বীর্য, মনুষ্যত্ব, ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ। আমাদের সুন্দর সুন্দর ছেলেগুলি—যাদের উপর সব আশা করা যায়, তাদের সব গুণ সব শক্তি আছে—কেবল যদি তাদের বিবাহ নামে কথিত এই পশুত্বের বেদীর সামনে হত্যা না করা হত! প্রভু, আমার কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত করো। মাদ্রাজ তখুনি জাগবে যখনই তার হৃদয়শোণিত, অন্তত একশো শিক্ষিত যুবক, সংসার থেকে সম্পূর্ণ সরে গিয়ে বদ্ধপরিকর হবে এবং দেশে-দেশে সত্যের জন্যে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত হবে। ভারতবর্ষের বাইরে এক ঘা দিতে পারলে ভিতরের লক্ষ ঘায়ের সমান হবে।'

সন্দেহ কী, অভেদানন্দ সেই সর্বজয়ী ছেলে। সেই পুরুষশার্দূল।

৮৬

তবু আমেরিকাই ডাকছে স্বামীজিকে।

সারদানন্দ স্বামী নিউইয়র্কে স্থায়ী হয়ে বসে বেদান্ত প্রচার করছে, স্বামীজির শিষ্যা শ্রীমতী হরিদাসী বা ওয়ালডোও স্বতন্ত্র বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে—আসর জমজমাট—তবু স্বামীজির জন্যেই সকলের চিত্তের আকাঙ্ক্ষা, স্বামীজি ফিরে আসুন।

শ্রীমতী হেলেন হান্টিংটন লিখছে: সূর্যালোকের মতই বিবেকানন্দের প্রভাব—নীরব, দুর্বার, সর্বত্রবিস্তারী। আমরা পাশ্চাত্ত্যবাসীরা চিরন্তন অভ্যাসের বশে যদিও

বিপরীত মত পোষণ করে থাকি, তবু প্রাচ্যবাসী একজন বক্তা কী করে পশ্চিম দেশে স্থায়ী প্রভাব রেখে গেল—এ এক বিস্ময়ের বিষয় হয়ে থাকবে। এ আমাদের সাময়িক কৌতূহলের উদ্দীপনা নয়, নয় বা নতুন কোনো কোলাহলের উত্তেজনা। স্বামীজির কত যে শিষ্য হয়েছে তার গণনা হয় না - সবাই যে যেমন পারছে তাঁর বার্তা—বেদান্তের বার্তা—প্রচার করছে, কেউ প্রকাশ্যে, কেউ নীরবে। কেউ বক্তৃতামঞ্চে, কেউ বা পরিবারের শান্ত পরিবেশে। নীরবে যে প্রভাব সঞ্চারিত হয় তার পরিমাপ কে করবে? আমি এখন জর্জিয়াতে আছি। স্বামীজির কর্মক্ষেত্র থেকে হাজার মাইল বা তারও চেয়ে বেশি দূরে বসে আমি অন্যের মুখে তাঁর নাম শুনেছি। অদূর ভবিষ্যতে নিউইয়র্কের মত এখানেও বেদান্ত পরিচিত হয়ে উঠবে। আমরা বিবেকানন্দকে এত ভালোবেসে ফেলেছি যে প্রতি-মুহূর্তে আমরা চাইছি তিনি আমাদের কাছে ফিরে আসুন। স্বামীজি তাঁর নিজের গুরুদেব সম্পর্কে বলতেন—তার উপস্থিতিমাত্রেই পাপী-অপাপী সকলে আশীর্বাদ পেত, তেমনি তাঁর উপস্থিতিও আমাদের পক্ষে সমান কার্যকর। মহত্তর জীবনযাপন ও পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাব পোষণই তাঁর উপস্থিতির নির্দেশ।

কিন্তু ভারতবর্ষ, তাঁর স্বদেশই, স্বামীজিকে টানছে।

মেরি হেলকে চিঠি লিখছেন স্বামীজি, 'সোনা রূপা এসব কিছুই আমার নেই। তবে যা আমার আছে তাই তোমায় দিচ্ছি মুক্ত হস্তে। সেটি এই জ্ঞান যে সোনার স্বর্ণত্ব, রূপার রৌপ্যত্ব, পুরুষের পুরুষত্ব, স্ত্রীর স্ত্রীত্ব—এক কথায় ব্রহ্ম থেকে স্তম্ব পর্যন্ত প্রত্যেক বস্তুর যথার্থ স্বরূপ—ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম আমাদের ভিতরেই রয়েছেন এবং আমরাই তিনি—সেই শাশ্বত দ্রষ্টা, সেই যথার্থ অহম, যাঁকে কখনোই ইন্দ্রিয়গোচর করা যাবে না, যাকে অন্যান্য বস্তুর মত ইন্দ্রিয়গোচর করার চেষ্টা সময় ও বুদ্ধির বৃথা অপব্যবহার।'

আমেরিকায় সারদানন্দ, ইংলণ্ডে অভেদানন্দ—স্বামীজি মনে করলেন, এবার ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়া যায়।

কেউ কি তাঁর সাথি হবে? সেভিয়ার দম্পতি তো যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আছে, আলমোড়াতে বসবাস করাই তাদের অন্তিম স্বপ্ন। আর যাবে গুডউইন। সে তো এখন স্বামীজিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

নভেম্বরের প্রথম দিকে একদিন হঠাৎ মিসেস সেভিয়ারকে ডেকে স্বামীজি বললেন, আমরা চারজন যাব। চারখানা টিকিট কিনুন। গুডউইন লন্ডন থেকে যাবে আর আমরা তিনজন নেপলস থেকে জাহাজ নেব। পথে ইউরোপের কিছু অংশ দেখা হয়ে যাবে।

স্বামীজির সংকল্পে সেভিয়ার দম্পতি উল্লসিত হয়ে উঠল। ভারতেই তারা বানপ্রস্থ-জীবন যাপন করবে এই স্বপ্ন সফল হতে চলেছে এতদিনে। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে পাঁচ বছর অফিসার পদে বহাল ছিল সেভিয়ার, সে জানে তার পাহাড়ের মৌনে কী অমৃতের বাণী নিত্য উচ্চারিত হচ্ছে, তারই জন্যে চিত্ত পিপাসিত হয়ে উঠল। সে আর তার স্ত্রী তাদের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে দিল—আসবাব, ছবি, গৃহসামগ্রী, এমনকি অলঙ্কার পর্যন্ত। যতদূর পারা যায়, টাকা সংগ্রহ করে নিল। বাড়ি ছাড়বারও নোটিশ দিয়ে বসে রইল দোরগোড়ায়। ক্যালেন্ডারে চোখ, কবে ষোলই ডিসেম্বর দেখা দেবে!

মিস মুলারও কয়েকদিন পরে যাবে বলে তল্পিতল্পা গুছোতে বসল।

ওদিকে ওলি বুলকে জানাতেই সে এক বৃহদংক টাকার দান নিয়ে উপস্থিত। আপনার ভারতীয় কাজের জন্যে, কলকাতায় স্থায়ী আশ্রম স্থাপনের জন্যে প্রভূত টাকার দরকার। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই।

টাকা নিয়ে প্রথমেই জড়িয়ে পড়তে চাইলেন না স্বামীজি। কাজের আরম্ভটা নিরাড়ম্বর হওয়াই সমীচীন। কাজে আন্তরিকতা যদি একবার প্রতিষ্ঠিত হয়, টাকা ঠিক এসে পড়ে।

অবস্থা অনুকূল, ঠাকুরের প্রসন্ন কৃপাদৃষ্টির আলো সর্বত্র বিচ্ছুরিত। এই লক্ষণই শুভাবহ।

আলাসিংগাকে লিখছেন স্বামীজি : 'আমার সংগে যাচ্ছেন আমার ইংরেজ বন্ধু সেভিয়ার দম্পতি ও গুডউইন। মিস্টার সেভিয়ার ও তাঁর স্ত্রী হিমালয়ে আলমোড়ার কাছে আশ্রম নির্মাণ করতে যাচ্ছেন। ঐ হবে আমাদের হিমালয়ের কেন্দ্র, আর পাশ্চাত্ত্য-বাসী শিষ্যেরা ইচ্ছানুসারে সেখানে এসে বাস করতে পারবে। গুডউইন অবিবাহিত যুবক। সে অবিকল সন্ন্যাসীরই মত।'

আরো লিখছেন : 'শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের সময় আমার কলকাতায় থাকার ভাবি ইচ্ছা। সুতরাং খবর নিয়ে উৎসবের তারিখটি জেনে রেখো যাতে মাদ্রাজে আমাকে বলতে পারো। কলকাতা আর মাদ্রাজে দুটি কেন্দ্র খুলবে—এই হচ্ছে আমার বর্তমান পরিকল্পনা। সেখানে যুবক প্রচারক তৈরি করা হবে। কলকাতায় কেন্দ্র খোলবার মত টাকা আমার হাতে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানেই আজীবন কাজ করে গেছেন, সুতরাং কলকাতার ওপরেই আমাদের প্রথম নজর দিতে হবে। মাদ্রাজে কেন্দ্র খোলবার মত টাকা আশা করি ভারতবর্ষ থেকেই পেয়ে যাব।'

তেরোই ডিসেম্বর স্বামীজিকে বিদায়-সংবর্ধনা দেওয়া হল। সভা বসল পিকাডিলিতে, রয়্যাল সোসাইটি অব পেণ্টার্স ইন ওয়াটার কালার্স-এর ভবনে। মুখ্য উদ্যোক্তা স্টার্ডি, সহকারী গুডউইন। সে যে কী প্রচণ্ড জনসমাবেশ, দেবতাদের দেখার মত। বিরাট গৃহে তিলধারণেরও স্থান নেই। যারা জায়গা পায়নি তারা ফিরে যায়নি, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে যদি দৈবাৎ একবার সেই মর্তসূর্যকে দেখতে পায়। এত লোকসমাগমেও কোথাও এতটুকু বিশৃংখলা নেই, শুধু এক গম্ভীর বিষাদে সবাই আচ্ছন্ন হয়ে আছে। নম্র, শান্ত, শোকার্ত—প্রার্থনানিমগ্ন। নীরবতাই তো সুন্দরতম প্রার্থনা।

পুরুষ আর স্ত্রী নানা জনে নানা বক্তৃতা দিল। শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছাপিয়ে বেজে উঠছিল অন্তরংগ বেদনার সুর, এমন মহামহিম সংস্পর্শ থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হব। আমাদের বায়ুমণ্ডল থেকে সেই মহৎ চিন্তার সজীব সৌরভ হারিয়ে যাবে। না, কিছুই হারাবে না, কিছুই দূরে সরে থাকবে না, কোথাও কোনো বিচ্ছেদ-ব্যবধান নেই—বেদীতে স্বামীজির উপস্থিতিই যেন তার অভ্রান্ত ঘোষণা। সকলের ইচ্ছে আরো একটু তাঁকে দেখি, আরো একটু শুনি, আরো একবার তাঁর ঐ হলদে রঙের ঝলমলে পোশাকটা ধরি হাত বাড়িয়ে।

সেই মর্মেই বিদায়-সভার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখছে এরিক হ্যামণ্ড। সবার চোখ প্রায় কান্নার কাছাকাছি, বক্তৃতার পর যে হর্ষধ্বনি উঠছে তাতেও যেন কান্না মাখানো। সেই বিষাদ বুঝি স্বামীজিকেও স্পর্শ করেছে। হ্যামণ্ড লিখছে : 'একটি রৌদ্ররেখার জ্বলন্ত শরের মত দুঃসহ দ্রুত গতিতে সভাস্থল ভেদ করে তিনি বেরিয়ে গেলেন, মুখে তাঁর শুধু এই কথা : হবে, হবে, আবার আমাদের দেখা হবে।'

কিন্তু ঠিক বিদায়ের প্রাক্কালে হ্যামণ্ডকে বললেন একান্তে, 'কে জানে আমার হয়তো এমনও মনে হতে পারে এ দেহ থেকে আমার মুক্ত হয়ে যাওয়া, বা, বলা যাক, এই দেহকে পরিত্যক্ত বস্ত্রের মত ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াই সমীচীন। কিন্তু এও ঠিক, যদ্দিন পর্যন্ত মানব-জাতির সকলে মহত্তম সত্যকে জানতে না পারবে ততদিন আমি আমার কাজ থেকে বিরত হব না। আমার একটা মাত্রই কাজ, অদ্বৈত বেদান্ত প্রচার। আমি চলে গেলেও আমার বাণী কাজ করে যাবে।'

বেদান্তই ঈশ্বরবাণী। বিজ্ঞানের মূল কথা—বিশ্ব এক, সত্য অনন্ত, তত্ত্ব নির্গুণ, আত্মা আদিহীন, প্রকৃতি-প্রবাহ অখণ্ড, আকাশ-অবকাশ সীমাহারা। সমস্ত জগৎ এগিয়ে চলেছে, স্থিতি স্বীকার না করলে গতির ব্যাখ্যা হবে কী করে? যা কিছু আপাত-প্রতীয়মান তার পিছনে রয়েছে একটি অখণ্ড সত্তা। সেটা, শূন্যবাদী বলেন, ভ্রমমাত্র, কিন্তু এই ভ্রমোৎপত্তির কারণ কী তা বলতে পারেন না। আবার অদ্বৈতবাদীও বোঝাতে পারেন না—এক বহু হল কী করে? এর ব্যাখ্যা শুধু পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত অবস্থায় গেলেই পাওয়া যেতে পারে। সেখানে কাল প্রতিহত, সমস্ত স্পন্দ নিস্পন্দ, সমস্ত শক্তি শক্তিশূন্য। আমাদের সেই তুরীয় ভূমিতে যেতে হবে, যেতে হবে সেই অতীন্দ্রিয় অবস্থায়। বলছেন বিবেকানন্দ, উক্ত অবস্থায় যাবার শক্তি যেন একটি যন্ত্রস্বরূপ আর সেই যন্ত্রের ব্যবহার অদ্বৈতবাদীর করায়ত্ত। সেই শুধু ব্রহ্মসত্তাকে অনুভব করতে সমর্থ। বিবেকানন্দ নামক মানুষটাই নিজেকে ব্রহ্মসত্তাতে পরিণত করতে পারে, আবার সেই পারে ঐ অবস্থা থেকে মানবীয় অবস্থায় ফিরে আসতে। সুতরাং তার পক্ষে জগৎসমস্যার মীমাংসা হয়ে গেছে, আর গৌণভাবে অপরের পক্ষেও ঐ মীমাংসা হয়ে গেছে, কারণ সে অপরকে ঐ অবস্থায় পৌঁছুবার পথ দেখিয়ে দিতে পারছে।

তাই দেখা যাচ্ছে যেখানে বিজ্ঞানের শেষ সেখানে দর্শনের আরম্ভ, যেখানে দর্শনের শেষ সেখানে ধর্মের আরম্ভ। আর এইরূপে উপলব্ধি দ্বারা জগতের এই কল্প[illegible] হবে যে এখন যা জ্ঞানাতীত রয়েছে তাই সর্বসাধারণের পক্ষে জ্ঞান[illegible] হয়ে যাবে। সুতরাং ধর্মলাভই হচ্ছে জগতের শ্রেষ্ঠ কর্ম। আর মানু[illegible] [illegible]তসারে এইটে অনুভব করেছে [illegible] রয়েছে।
বলেই সে আবহমান কাল ধর্মকেই[illegible] বহুগণশালিনী পয়স্বিনী গাভী। সে অনেক লাথি
বলছেন বিবেক[illegible] সে অনেক দুধও দেয়। যে গরুটা দুধ দেয় গোয়ালা তার লাথি মেরেকে খায়।'

ষোলই ডিসেম্বর স্বামীজি লণ্ডন ছাড়লেন, সঙ্গে সেভিয়ার আর তার স্ত্রী—গুডউইন সাদাম্পটনে জাহাজ ধরে নেপলসে গিয়ে মিলিত হবে।

স্বামীজিকে বিদায় দিতে বহু বন্ধুবান্ধব স্টেশনে এসে ভিড় জমাল। তাদেরকে স্বামীজির বিদেশী মনে হল না, পরপীড়ক শাসকদের দলের লোক বলে দূরস্থ মনে হল না—মনে হল সকলেই তার আপন জন, কাছের মানুষ।

'স্বামী বিবেকানন্দ আজ চলে গেলেন।' স্টার্ডি চিঠি লিখছে বন্ধুকে: 'তাঁর প্রভাব হৃদয়ে-হৃদয়ে কী গভীর ভাবে প্রবেশ করেছে তা তাঁর বিদায়সভায় টের পেলাম। আমরা তাঁর কাজ পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছি। ভারতবর্ষ থেকে তাঁর এক গুরুভাই এখানে এসেছেন—অমায়িক, সুদর্শন, বৈরাগ্যবান যুবক, সে আমাকে এই কাজে নির্বিরাম সাহায্য করবে।

তুমিই ঠিক বুঝেছ। আমি আমার মহত্তম প্রিয়তম পবিত্রতম বন্ধু ও উপদেষ্টাকে হারিয়ে বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে আছি। কিন্তু নিরন্তর তাঁর কাজ করার মধ্যেই নিরন্তর তাঁর সঙ্গলাভ। অতীতে নিশ্চয়ই ভাণ্ডারে কিছু পুণ্য সঞ্চিত ছিল তাই ইহকালে আমার এই সৌভাগ্য। আমার সারা জীবনের আকাঙ্ক্ষার প্রতিমূর্তিই বিবেকানন্দ।'

সর্ববন্ধনমুক্তির নির্মল আনন্দ নিয়ে স্বামীজি দেশে ফিরে চললেন। প্রভুর হাতের বীণা আমি, যে সুরে বাজাবেন সেই সুরে বেজে যাব।

'এখন আমার একটিমাত্র চিন্তা,' সেভিয়ারকে বলছেন স্বামীজি, 'আর তা হচ্ছে ভারতবর্ষ। এখন একটি দিকেই শুধু আমার চোখ, আর তা ভারতবর্ষের দিকে।'

লণ্ডন রেলস্টেশনে একজন ইংরেজ বন্ধু স্বামীজিকে জিগগেস করেছিল, 'বিলাসী ও শক্তিশালী পাশ্চাত্ত্য দেশে চার-চার বছর থেকে যাবার পর আপনার দীনহীনা মাতৃভূমিকে কেমন লাগবে ?'

স্বামীজি মৃদু হাসলেন। বললেন, 'দেশ ছেড়ে আসবার আগে ভারতবর্ষকে শুধু ভারতবর্ষ বলেই ভালোবাসতাম। এখন ভারতবর্ষের প্রতিটি ধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র, তার বাতাসের স্পর্শটুকুও পবিত্র। ভারতবর্ষ এখন আমার কাছে পুণ্যস্থান, দেবস্থান, তীর্থস্থান।'

ট্রেনে করে মিলান-এ এসে উপস্থিত হলেন। এবার ট্রেন-চলায় স্বামীজির ক্লান্তি নেই—পশ্চিম জগতে বেদান্তের সাফল্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করে রেখেছে, তার উপর রয়েছে ভারতে ভাবী আন্দোলনের স্বপ্ন, তাই স্বামীজি এখন আনন্দের নিয়তনির্ঝর—যা দেখেন তাই সুন্দর, যা শোনেন তাই মনোরম। আর যা ভাবেন তাই প্রার্থনা দিয়ে ভরা।

এখন একটা হোটেল নাও যা কোনো চার্চ বা ক্যাথিড্রেলের কাছাকাছি হয়। বারে বারে যেতে পারব প্রার্থনাসভায়।

দে... দাভিঞ্চির 'লাস্ট সাপার' বা 'শেষ ভোজ' ছবিটা। দেখলেন গিরিশৃঙ্গে তুষারসম্ভার। প্র... দৃশ্যাবলী আর কী, শুধু একের পর এক ঈশ্বরের স্বাক্ষর-পত্র।

সেখান থেকে পিসা... ফ্লোরেন্স। আর কী আশ্চর্য, সেখানে হঠাৎ হেল ও তার স্ত্রীর সাথে দেখা। তারা জানত... স্বামীজি এখানে আছেন. তারা ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়ে সম্প্রতি ফ্লোরেন্সে ঘুরছেন, তাই এই... এখন দু পক্ষেরই নিদারুণ আনন্দ হল। মনে হল মানুষ যেন একই আকাশের নিচে ...ই বাস করছে, তার এক আনন্দ, এক আত্মীয়তা।

এই কদিন আগেও মেরি ও হ্যারিয়েট হেলকে চিঠি লিখে এসেছেন স্বামীজি :

'ইংরেজ জাতির সম্বন্ধে আমার ধারণা ওলটপালট হয়ে গেছে। এখন আমি বুঝতে পারছি প্রভু কেন তাদের অন্যসব জাতের চেয়ে বেশি কৃপা করছেন। তারা অটল, অকাপট্য তাদের অস্থিমজ্জাগত, তাদের অন্তর ভাবুকতায় ভরা—কেবল বাইরে একটা কঠোরতার আবরণ মাত্র রয়েছে। ওটা ভেঙে দিতে পারলেই হল—ব্যস, তোমার মনের মানুষের খোঁজ পেয়ে যাবে।'

ফ্লোরেন্সে আছেন মিনার্ভা হোটেলে। বিশে ডিসেম্বর স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখছেন :

প্রিয় রাখাল,

এই পত্র দেখেই বুঝতে পারছ আমি এখনো রাস্তায়। লণ্ডন ছাড়বার আগেই আমি তোমার পত্র ও পুস্তিকা পেয়েছিলাম। মজুমদারের পাগলামির দিকে দৃকপাত কোরো

না। ঈর্ষাবশতঃ তাঁর নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে। তিনি যে রকম অসভ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন তা শুনলে সভ্য দেশের লোকে তাঁকে বিদ্রূপ করবে। অসভ্য ভাষা প্রয়োগ করে তিনি নিজের উদ্দেশ্য নিজেই বিফল করেছেন।

সে যাই হোক, আমরা কখনো আমাদের নাম করে হরমোহন বা অপর কাউকেও ব্রাহ্মদের সঙ্গে লড়াই করতে দিতে পারি না। জনসাধারণ জানুক যে কোনো সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের বিবাদ নেই। যদি কেউ কলহের সৃষ্টি করে, তার জন্যে সে নিজেই দায়ী। পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করা ও পরস্পরকে নিন্দা করা আমাদের জাতের মজ্জাগত। অলস অকর্মণ্য মন্দভাষী ঈর্ষাপরায়ণ ভীরু আর কলহপ্রিয়—এই আমরা বাঙালি জাতি। আমার বন্ধু বলে পরিচয় দিতে হলে ওগুলো ত্যাগ করতে হবে।'

ফ্লোরেন্স থেকে এলেন রোমে। সেণ্ট পিটার্স গির্জায় গিয়ে তিনি ধ্যানস্থ হলেন। ধূসর অতীত যেন তাঁর অনুভবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল—মনে পড়ল সে সব দিনের কথা যখন সেণ্ট পল খৃস্টের বাণী প্রচার করে বেড়াচ্ছে আর সেণ্ট পিটার জোগাচ্ছে অনুপ্রেরণা। এই তো সেদিনের কথা। মনে হয় আমিই বুঝি সেদিন এখানে উপস্থিত ছিলাম! আমিই বুঝি সে সব কথা বলেছি—শুনেছি স্বকর্ণে। কে জানে সে সব বুঝি আমারই কথা!

'ভজনে এসব অনুষ্ঠান কি আপনার ভালো লাগে?' এক মহিলা জিজ্ঞেস করলেন স্বামীজিকে।

'কেন লাগবে না? ঈশ্বর যেখানে ব্যক্তিস্বরূপ তখন তাকে নিয়ে একটু আড়ম্বর করতে ইচ্ছে হয় বৈকি। ইচ্ছে করে তাকে উপহারে ঢেকে দিই। কিন্তু বলুন কী তাকে উপহার দিতে পারি? ফুল ফল ধূপগন্ধ রেশমি কাপড় -এই সব? আরো কি কিছু দেবার নেই?'

কিন্তু আড়ম্বরেরও তো সীমা আছে। কদিন পরে যীশুখৃস্টের জন্মদিনে সেণ্ট-পিটার্স গির্জার 'হাইমাস' উৎসবে যখন যোগ দিলেন দেখলেন সে কী সমারোহ! এই অতিকৃত ধুমধাম স্বামীজির ভালো লাগল না। পীড়িত বোধ করে পাশের লোকের কানে কানে বললেন 'এত সব জাঁকজমক মানায় না যীশুকে। যে গরীব যীশুর ভূমণ্ডলে একটু মাথা গোঁজবার ঠাঁই ছিল না, তার জন্যে এত আয়োজন। যারা এত সব আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত তারা যীশুর অনুগামী হবে কী করে? কী করে ধরবে তাঁর বৈরাগ্যের ব্রত?'

ইংলণ্ডে থাকতে স্বামীজি একবার মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন: 'যীশুখৃস্ট তাঁর সারমন অন দি মাউণ্ট-এ এরকম উক্তি কেন করেন নি—যারা সদা আনন্দময় ও সদা আশাবাদী তারাই ধন্য কেননা স্বর্গরাজ্যলাভ তো তাদের হয়েইআছে! আমার বিশ্বাস
কেন...
এই যে সাধুটির ও রকম কিছু বলেছিলেন যদিও তা লিপিবদ্ধ হয়নি। বলেছিলেন
রোমের যেখানেই স্বজাত্র দুঃখ তিনি অন্তরে বহন করতেন আর তাঁর একটি উক্তি
বিস্ময়ে সবাই হতবাক হয়ে যায়। অদ্ভুত!'
এত তিনি পড়লেন কবে, মনেই বা রাখলেন ক[illegible]ন্দার প্রাচীন ইতিহাসের বর্ণনা দেন।
রোম দেখলেন, নেপলস্ দেখলেন, কিন্তু দু চোখ আ[illegible] কাছে লুকোনো নেই।
হয়ে আছে কবে ভারতবর্ষের মাটি দেখব!

তারপর সাউদামটন থেকে সেই প্রার্থিত জাহাজ এসে পৌঁছুল—হ্যাঁ, ঐ তো দাঁড়িয়ে আছে গ্ুডউইন।

তিরিশে ডিসেম্বর জাহাজ ছাড়ল, পনেরোই জানুয়ারী কলম্বোতে পৌঁছুবার তারিখ। কিন্তু দিন কি আর কাটে। সমুদ্রের মেজাজ ভালো নয়, তাই আরোহীদের মনও খারাপ হবার কথা। তেসরা জানুয়ারী মেরি হেলকে লিখছেন স্বামীজি: 'নেপলস থেকে চারদিন ভয়াবহ সমুদ্রযাত্রার পর পোর্ট সৈয়দের কাছে এসে পড়েছি। জাহাজ ভীষণ দুলছে—অতএব এই অবস্থায় লেখা আমার এই হিজিবিজি তুমি ক্ষমা কোরো।' মেরি বুঝল এ হিজিবিজি আনন্দের রেখায় আঁকা—এ আনন্দ দেশে ফেরার আনন্দ। শুধু জাহাজ দুলছে না, স্বামীজির মনও দুলছে।

নেপলস ছেড়ে পোর্ট সৈয়দের দিকে জাহাজ চলেছে কোথায় কতদূর এসেছে কোনো খেয়াল নেই স্বামীজি রাত্রে তাঁর কেবিনে ঘুমিয়ে আছেন হঠাৎ তাঁর মনে হল কে একজন ঋষিকল্প বৃদ্ধ লোক তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। বললে 'এই জায়গা ভালো করে দেখে রেখো। যে জায়গাটা তোমাকে দেখাচ্ছি—হ্যাঁ, এই জায়গাটা।'

স্বপ্নে স্বামীজি বিস্ময়াহত চোখে তাকালেন বৃদ্ধের দিকে।

বৃদ্ধ বললে, 'তুমি এখন ক্রিট দ্বীপে এসে পড়েছ। এই দেশেই খৃস্টধর্মের উৎপত্তি। অনেক 'থেরাপুটি' এখানে বাস করত, আমি তাদেরই একজন।'

'থেরাপুটি' থেরাপুত্ত বা থেরাপুত্রের অপভ্রংশ। আর থেরা তো বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। প্রাচীন বৌদ্ধ মতবাদ তো থেরাবাদ নামেই প্রসিদ্ধ। সুতরাং থেরাপুটি মানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর শিষ্য।

বৃদ্ধ আরো বললে, যে সব সত্য ও আদর্শের বাণী আমরা প্রচার করতাম খৃস্টানরা তাই যীশুখৃস্টের উপদেশ বলে চালিয়েছে। কিন্তু সত্য কথা বলতে কী, যীশুখৃস্ট নামধারী কোনো ব্যক্তির কোনো অস্তিত্বই কখনো ছিল না। যদি এ জায়গা খনন করো তবে তার অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণ উদ্ধার করা যাবে।'

স্বামীজির ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে একজন জাহাজী কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন রাত কটা?'

কর্মচারী বললে, 'মাঝরাত।'

'এখন আমরা কোথায়?'

'ক্রিট দ্বীপের কাছাকাছি। ক্রিট দ্বীপ এখান থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে।'

স্বামীজি এই স্বপ্ন নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান নি, মেরীপুত্র যীশুর জন্যে তাঁর প্রেমভক্তি নির্বিচল ও নিরর্গল ছিল। বললেন, 'আমি যদি নাজারথে যীশুর কালে জন্ম নিতাম তা হলে আমি তাঁর পা ধুয়ে দিতাম চোখের জলে নয়, বুকের রক্তে।'

কে এক শিষ্য তাঁর চোখের সামনে একদিন মেরীক্রোড়ে যীশুর একখানি ছবি এনে ধরেছিল, স্বামীজি তখুনি সেই শিশু যীশুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন।

কিন্তু সহযাত্রী দুজন খৃস্টান মিশনারি গায়ে পড়ে স্বামীজির সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে চাইল। তাদের বক্তব্য হিন্দুধর্মের চেয়ে খৃস্টধর্ম অনেক বেশি ভালো। কোন যুক্তিতে? স্বামীজি ছেড়ে দেবার পাত্র নন, তাদের তর্কে টেনে আনলেন। কিন্তু তাদের তর্কের চেয়ে গালাগালে বেশি রুচি, যুক্তির চেয়ে বেশি বিশ্বাস গায়ের জোরে। যেহেতু তারা ইংরেজ, শাসকের জাত, সেই হেতুই তাদের ধর্ম মহত্তর এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তারা হিন্দু ও

হিন্দুধর্ম সম্পর্কে নোংরা গালিগালাজ করতে লাগল। স্বামীজির ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে যেতেই তিনি শক্ত কব্জিতে একজনের শার্টের কলার চেপে ধরলেন, পরুষকণ্ঠে বললেন, 'আবার আমার ধর্মের নিন্দা করবে তো জাহাজ থেকে ছুঁড়ে জলে ফেলে দেব বলছি।'

জল হয়ে গেল লোকটা। মিহি গলায় বললে, 'আর করব না স্যার, ছেড়ে দিন।'

স্বামীজি ছেড়ে দিলেন।

দেশে ফিরে কিছুদিন পরে একদিন প্রিয়নাথ সিংহকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আচ্ছা প্রিয়নাথ, কেউ যদি তোমার মাকে অপমান করে তাহলে তুমি কী করো?'

প্রিয়নাথ বললে, 'মশাই, আমি সিংহ, তখুনি তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তাকে ঘায়েল করি।'

ভালো কথা। মার প্রতি যেমন, তেমনি যদি তোমার স্বধর্মের প্রতি সেই রকম ভক্তি থাকত তাহলে একটি হিন্দুর ছেলেকেও খৃস্টান হতে দেখতে পারতে না। প্রত্যহ এ ঘটনা ঘটছে কিন্তু কই তোমার রক্ত তো গরম হয় না? আসলে তোমাদের কারু স্বধর্মে বিশ্বাস নেই, স্বধর্মের প্রতি মমতা নেই, তাই এই ঔদাসীন্য। নইলে মুখের উপর পাদরিরা যে তোমার ধর্মকে গাল দিচ্ছে তা সহ্য করছ কী করে?'

জাহাজ এডেনে এসে ভিড়ল। স্বামীজি তীরে নেমে বেড়াতে বেরুলেন। কতদূর এসে দেখলেন কে একটি লোক একটা পুকুরের ধারে বসে হুঁকো টানছে। নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের লোক। স্বামীজি তাঁর বিদেশী সঙ্গীদের পিছনে রেখে ছুটে তার কাছে গেলেন ও পাশে বসে গল্পে মেতে উঠলেন। হিন্দুস্থানী পানওয়ালা কিন্তু যেহেতু ভারতীয়, সেহেতু তাকে পরম বান্ধব বলে তাঁর মনে হল। স্বদেশবাসীর মুখের মতো এমন সুন্দর মুখ আর কোথায় আছে? ডাকলেন ভাই বলে। বললেন 'তোমার হুঁকোটা একটু দাও দুটো টান দিই।'

লোকটা দ্বিধা করল না। স্বামীজির হাতে হুঁকো ছেড়ে দিল। কত—কত দিন হুঁকো টানিনি। স্বামীজি পরম আরামে হুঁকো টানতে লাগলেন।

'তাই তাই আমাদের ফেলে আপনি ছুটে এসেছেন!' বিদেশী সঙ্গীরা স্বামীজির সরল মানবমমতায় অভিভূত হয়ে গেল।

তারপর লোকটা যখন জানল কাকে সে তামাক খাইয়েছে তখন সে প্রণামে একেবারে বিলুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। সামান্য একটা পানের দোকানের মালিক কিন্তু এমন সে আবেগাপ্লুত যেন সে তার সর্বস্বই তখুনি-তখুনি দিয়ে দিতে পারে স্বামীজিকে।

আঠারোশো সাতানব্বইয়ের পনেরোই জানুয়ারি সকালে স্বামীজি সিংহলের তীররেখা দেখতে পেলেন। সিংহল ভারতবর্ষেরই অংশ আর এই সিংহলেই তো প্রায় আটশো খৃস্টপূর্বাব্দে বাঙালিরা উপনিবেশ স্থাপন করে। স্বদেশের বাতাস এসে স্বামীজিকে স্পর্শ করল। ঐ তো দেখা যাচ্ছে বালুস্তর, নারকেল গাছের সার। স্বামীজির নয়ন-মন বিপুল আনন্দে ভরে উঠল।

পারে কারা সব এসেছে সংবর্ধনা করতে। নিরঞ্জনানন্দ স্বামীকে চিনতে পারলেন। কিন্তু এ যে দেখি বিশাল জনতা।

এত ভিড় কেন? কিসের এত সমারোহ?

বিশ্বজয়ী বেদান্তপুরুষ বীরেশ্বর বিবেকানন্দের জন্যে। এই মুহূর্তে তিনিই তো

ভারতনায়ক ! কিন্তু এ যে দেখি দীর্ঘ শোভাযাত্রা ! হ্যাঁ, দীর্ঘতম ! এই শোভাযাত্রা কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত ।

৮৭

পনেরোই জানুয়ারি, ১৮৯৭—কলম্বোতে নির্ধারিত দিনেই পৌঁছুলেন স্বামীজি । জাহাজ থেকে লঞ্চে নামলেন, লঞ্চ থেকে কূলে । জলসমুদ্র পেরিয়ে পড়লেন এসে জন-সমুদ্রে । সমগ্র দেশ তাঁর অভ্যর্থনায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে ।

বার্নেস স্টিটের বাংলোতে স্বামীজিকে নিয়ে যাওয়া হল—নিয়ে যাওয়া হল জমকালো এক জুড়ি গাড়িতে করে । বাংলোর কাছেই কলম্বোর বিখ্যাত দারচিনির বাগান । বলা যেতে পারে দারচিনির বাগানের মধ্যেই ঐ বাংলো । কিন্তু নিরিবিলি কই ? বাংলোর মুখেই যে প্রকাণ্ড মণ্ডপের নিচে অতিকায় সভার আয়োজন ।

সিংহলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য কুমারস্বামী অভিনন্দন-পত্র পড়ল । সিংহলবাসীরাই ধন্য, তারাই প্রথম আপনাকে অভিনন্দন করবার সৌভাগ্য অর্জন করল । আপনিই প্রথম পাশ্চাত্ত্য দেশে হিন্দুধর্মের সার্বলৌকিকত্ব প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে এলেন ।

বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে স্বামীজি উত্তর দিতে উঠলেন ।

এ কাকে অভিনন্দন ? আমাকে ? আমি কে ? আমি কোনো ধনকুবের নই, কৃতী রাজপুরুষ নই, নই কোনো যুদ্ধজয়ী সেনাপতি । আমি তো এক নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী মাত্র । এ অভিনন্দন ধর্মকে—হিন্দুধর্মকে । আধ্যাত্মিকতাই যে জাতীয় জীবনের মেরু-দণ্ড—অভিনন্দন সেই স্বীকৃতিকে ।

সেই বাংলো—পরে যার নাম হয়েছে বিবেকানন্দ-মন্দির—তীর্থে পরিণত হল । লোকের পর লোক, কখনো একলা, কখনো সদলে, দেখা করতে আসতে লাগল । কাউকে ফেরাবেন না স্বামীজি । দর্শন করতে আসা মানুষই তো দর্শন দিতে আসা ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি । ধর্মজিজ্ঞাসু মানুষের সঙ্গে কথা বলার অর্থ তো ঈশ্বরেরই কথা বলা ।

একটি নিরীহ দরিদ্র নারী দেখা করতে এসেছে । হাতে ফলফুলের উপচার ।

'কিছু বলবেন ?' জানতে চাইলেন স্বামীজি ।

'আমার স্বামী সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছেন । আমি কি করি ? কোথায় যাই ? কোথায় গেলে আমি পাব ঈশ্বরকে ?'

'আপনাকে কোথাও যেতে হবে না । আপনি সংসারেই থাকুন ।'

'সংসারে থেকেই আমি ঈশ্বর পাব ? কিছু করতে হবে না ?'

'গীতা পড়ুন আর গৃহস্থের যা কর্তব্য তাই যথোচিত পালন করুন ।' আন্তরিক হয়ে বললেন স্বামীজি ।

গৃহস্থ মহিলার কণ্ঠে অনুরূপ আন্তরিকতা ফুটে উঠল : 'শুধু গীতা পড়লে কী হবে ? তার ভেতরের সত্য তো উপলব্ধি করা চাই । তা করি কী করে ?'

মহিলার আকুতি শুনে চমকে উঠলেন স্বামীজি । শুধু একটা নিয়ম পালন করে সে তৃপ্ত নয়, সে চায় সারবস্তু আস্বাদ করতে । এই তো হিন্দু-ভারতের শাশ্বত ক্ষুধা । শুধু বুদ্ধি নয়, অনুভব । শুধু পাণ্ডিত্য নয়, উপলব্ধি । শুধু অনুষ্ঠানসাধনের নিষ্ঠা নয়, অভ্যন্তরে প্রবেশ করার ব্যাকুলতা ।

কী বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ? বলছেন: শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু নেই। তাঁকে পাবার উপায়, তাঁকে জানবার জন্যেই বই পড়া। একটি সাধুর পুঁথিতে কী আছে একজন জিজ্ঞেস করলে সাধু খুলে দেখালে—পাতায়-পাতায় শুধু ও' রামঃ লেখা রয়েছে, আর কিছুই নেই।

স্বামীজি বললেন, 'মন দিয়ে গীতা পড়ুন। পড়তে পড়তেই সত্য উদ্ভাসিত হবে।'

গীতা সম্পর্কে ঠাকুর কী বলেছেন মনে পড়ল। বলেছেন: গীতার অর্থ কী? দশবার বললে যা হয়। 'গীতা' 'গীতা' দশবার বলতে গেলে 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' হয়ে যায়। গীতার এই শিক্ষা—হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা করো। সাধুই হোক সংসারীই হোক, মন থেকে আসক্তি ত্যাগ করা চাই।

সংসারীদের বলছেন, তোমরা সংসারী, তোমরা এও রাখো, ও-ও রাখো। সংসারও রাখো, ধর্মও রাখো। তোমাদের পক্ষে মনে ত্যাগ, বাইরে নয়। সংসার ত্যাগ নয়, সংসারে অনাসক্তি। তবে একটা না সরালে কি আর একটা পাওয়া যায়?

পরদিন কলম্বোর ফ্লোরাল হল-এ স্বামীজি বক্তৃতা করলেন। প্রাচ্যভূমিতে এই তাঁর প্রথম বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয় 'পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ'।'

'পৃথিবীর মধ্যে যদি এমন কোনো দেশ থাকে যাকে পুণ্যভূমি নামে বিভূষিত করা যায় তবে তা আমাদের মাতৃভূমি এই ভারতবর্ষ। মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ—শান্তি, দয়া, ধৃতি ও শুচিতা কোন দেশে সব চেয়ে বেশি, যদি কেউ প্রশ্ন করে—উত্তর, ভারতবর্ষ। যদি এমন কোনো দেশ থাকে যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ ঘটেছে, তবে তারও নাম ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ থেকেই দার্শনিক জ্ঞানের স্রোত সর্বত্র প্রবাহিত হয়েছে, উত্তরে-দক্ষিণে প্রাচ্যে-প্রতীচ্যে। ইহলোকসর্বস্ব সভ্যতাকে ভারতবর্ষই আধ্যাত্মিক সম্পদের সংবাদ দেবে। জড়বাদের আগুনকে শান্ত করবার জন্যে যে অমৃতবারির প্রয়োজন তার উৎস এই ভারতবর্ষে।

অন্য সব দেশ যে পথে তাদের ভাবপ্রচার করতে চেয়েছিল তা যুদ্ধবিগ্রহের রক্তরঞ্জিত পথ, তার সজ্জা রণসজ্জা, তার ধ্বনি রণভেরী—সমস্ত জয়নিনাদের পিছনে লক্ষ-লক্ষ মানুষের হাহাকার, লক্ষ লক্ষ অনাথের, বিধবার, নিরাশ্রয় গৃহহীনের। কিন্তু ভারতবর্ষের ভাবতরঙ্গের সম্মুখে শান্তি ও পশ্চাতে আশীর্বাদ। আমাদের কারু প্রতি হিংসা নেই, অস্ত্র দিয়ে আমরা কাউকে জয় করতে চাইনি—শুধু সেই শুভ কর্মফলেই আমরা এখনো বেঁচে আছি। কোথায় সেই গ্রীক-বাহিনীর বীরদর্প? কোথায় বা রোমানদের অহংকার? তাদের ক্যাপিটোলাইন পর্বত, যার উপর তাদের কুলদেবতা জুপিটরের সু-উচ্চ মন্দির ছিল তা আজ ভগ্নস্তূপমাত্র। সিজাররা যেখানে একদিন দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করত সেখানে আজ উর্ণনাভ তন্তুরচনা করছে। পরপীড়নপুষ্ট রাজ্য জলবুদ্বুদের মত স্বল্পকাল পরেই বিলীন হয়ে গেছে।

অন্যান্য জাতির পক্ষে ধর্ম—সংসারের আর সব কাজের মতই একটা কাজ মাত্র। কিন্তু ভারতবর্ষের সমস্ত চেষ্টাই ধর্মের জন্যে, ধর্মলাভই তার জীবনের একমাত্র কাজ। প্রত্যেক জাতিরই সমগ্র মানবজাতির উন্নতির জন্যে কিছু না কিছু দেবার আছে। তেমনি শান্তিপ্রিয় হিন্দুরও আছে—সে শুধু আধ্যাত্মিকতার আলো। এই আলোতেই ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করবে।

বেদের লাটিন অনুবাদ পড়ে কী বলেছিল শোপেনহাওয়ার—উনিশ শতকের সেই

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ? বলেছিল, 'হৃদয়কে উচ্চে তুলে ধরতে পারে এমন গ্রন্থ আর নেই উপনিষদ ছাড়া। জীবদ্দশায় উপনিষদই আমাকে শান্তি দিয়েছে, মৃত্যুকালে উপনিষদই আমাকে শান্তি দেবে।'

অন্য দেশে ভারতীয় ধর্মের প্রভাব বলতে আমি তার মূলতত্ত্বগুলির কথা বলছি যার উপর তার সত্যের সৌধ দাঁড়িয়ে আছে. আমি সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি বা আচার-ব্যবহারের কথা বলছি না। সে সব কিছু ধর্ম নয়, সে সব শুধু সামাজিক প্রয়োজনে তৈরি হয়েছে। তাদের বলতে পারো যুগধর্ম। যুগধর্মের উপরে আমাদের সনাতন ধর্মকে দেখ। দেখ আমরা মানুষের স্বরূপ, আত্মার স্বরূপ, ঈশ্বরের স্বরূপ বলতে কী বুঝি, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের কী ব্যাখ্যা, জগৎ কি শূন্য থেকে প্রসূত না কি পূর্বাবস্থানেরই ভিন্নতর প্রকাশ, আর মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মা ঈশ্বরেরই বা কী সম্পর্ক। যে দেখেছে, গভীরে গিয়েছে, সেই ভারতীয় চিন্তার সৌন্দর্যে ও ঔদার্যে মুগ্ধ হয়েছে।

ভারতবর্ষ কখনো তার ঈশ্বরকে ক্ষুদ্র করেনি। আমার ঈশ্বর সত্য, তোমার ঈশ্বর মিথ্যা, এস যুদ্ধের দ্বারা মীমাংসা করি, প্রতিবেশীর সঙ্গে এমনি বিরোধে লিপ্ত হয়নি। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দেবতার জন্যে যুদ্ধরূপ সংকীর্ণভাব ভারতবর্ষের নয়। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। একমাত্র সত্তাই বর্তমান—বিপ্র অর্থাৎ সাধুগণ তাঁকে নানাভাবে বর্ণনা করেন। এই মহাবাণী ভারতবর্ষেই উত্থিত হয়েছিল। শিব বিষ্ণুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ এ নয়, অথবা বিষ্ণুই সর্বস্ব, শিব কিছুই নন, তাও নয়। এক ঈশ্বরকেই কেউ শিব কেউ বিষ্ণু কেউ বা আরেক নামে ডেকে থাকে। নাম আলাদা কিন্তু বস্তু এক। এই তত্ত্বই জাতির রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। সেই শক্তিতেই আমাদের এই প্রাচীন মাতৃভূমিতে সকল ধর্মকে সকল সম্প্রদায়কে সাদরে স্থান দেবার অধিকার অর্জন করেছি।

এই ভারতে আপাতবিরোধী বহু সম্প্রদায় বর্তমান অথচ সকলেই নির্বিরোধে বাস করছে। এই অপূর্ব ব্যাপারের একমাত্র ব্যাখ্যা পরধর্মে দ্বেষরাহিত্য। তুমি হয়তো দ্বৈতবাদী, আমি হয়তো অদ্বৈতবাদী। তোমার বিশ্বাস—তুমি ভগবানের নিত্য দাস, আবার আরেকজন বলছে, আমি ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন। অথচ উভয়েই খাঁটি হিন্দু। এ কী করে সম্ভব হচ্ছে? সেই মহাবাক্য স্মরণ করো—একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। এই মহান সত্যই জগৎকে শেখাতে হবে। 'রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিলনানাপথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।' বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত ও বৈষ্ণব—এই সব ভিন্ন-ভিন্ন মত সম্পর্কে কেউ একটিকে শ্রেষ্ঠ, অন্যটিকে হিতকর বলে। সমুদ্র যেমন সমস্ত নদীর একমাত্র গন্তব্যস্থান, রুচিভেদে সরল-কুটিল নানা পথিক-জনের ঈশ্বরও তেমনি একমাত্র গন্তব্য।

যে যে-পথেই যাক, সোজা বা বাঁকা, হেঁটে বা দৌড়ে, সবাই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবে। সেখানেই সমস্ত ভক্তির সমস্ত দর্শনের সম্পূর্ণতা! তিনিই যথার্থ হরিভক্ত যিনি সেই হরিকে সর্বজীবে ও সর্বভূতে দেখে থাকেন। তুমি যদি যথার্থ শিবভক্ত হও তবে তোমাকে সেই শিবকে সর্বজীবে ও সর্বভূতে দেখতে হবে। যে নামে যে রূপে তাঁকে উপাসনা করা হোক না কেন, তোমাকে বুঝতে হবে তাঁরই উপাসনা। কাবার দিকে মুখ করেই কেউ জানু অবনত করুক বা খৃষ্টীয় গির্জায় বা বৌদ্ধ চৈত্যেই উপাসনা করুক, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে সে তাঁরই উপাসনা করছে। যে কোনো নামে যে কোনো মূর্তির

উদ্দেশে যে ভাবেই পুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হোক না কেন তা তাঁরই পাদপদ্মে পৌঁছায় কারণ তিনিই সকলের একমাত্র প্রভু, সকলের আত্মার অন্তরাত্মা। ভেদ থাকবেই। বৈচিত্র্য ছাড়া জীবন অসম্ভব। চিন্তার সংঘর্ষ থেকেই জ্ঞান আর জ্ঞান থেকেই উন্নতি। ভাব প্রতিদ্বন্দ্বী হলেই যে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বিরোধ করতে হবে বিদ্বেষ করতে হবে তার কোনো অর্থ নেই। এই মূলে সত্যই আমাদের আবার শিখতে হবে—একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।

পরদিন স্বামীজি বেরুলেন মন্দিরদর্শনে। রাস্তায় অগণিত মানুষ, গাড়ি থামিয়ে কেউ তাঁকে ফলের ডালি দিচ্ছে, কেউ বা ফুলের মালা, কেউ বা পিচকারিতে গোলাপজল ছিটিয়ে দিচ্ছে। তামিল পল্লীর চেকু স্ট্রিট আলোকমালায় সাজানো। মন্দিরে গিয়ে পৌঁছনো মাত্রই জনগণ 'জয় মহাদেব' ধ্বনি তুলল।

জয় মহাদেব! রামকৃত শিবস্তুতি স্মরণ করো।

হে চন্দ্রমৌলে! ভ্রান্তিহেতু যেমন শুক্তিতে রজতগ্রহ এবং রজ্জুতে সর্পগ্রহ হয়ে থাকে, তেমনি অজ্ঞানবশতঃ তোমাতে এই জগৎ-জ্ঞান হয়, কিন্তু বাস্তবিক এই জগৎ তোমার মায়াতে কল্পিত হয়ে তোমাতেই দৃশ্যরূপে প্রতীয়মান। হে দেবদেব! তুমিই প্রকাশমান পদার্থ, তাই আপন প্রকাশ দ্বারা সমস্ত জগৎ প্রকাশিত করছ, তোমার আলো ছাড়া ক্ষণকালও এই জগৎ গোচরীভূত হয় না। হে মহাদেব! ক্ষুদ্র পদার্থ নিজের চেয়ে বৃহৎ পদার্থকে কখনো ধারণ করতে পারে না—একটি পরমাণু তার নিজের দেশ বিন্ধ্যাপর্বতকে কী করে ধারণ করবে? কিন্তু তোমার মুখমধ্যে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দৃশ্য হচ্ছে, এ কী অদ্ভুত তোমার অঘটনঘটনপটীয়সী শাম্ভবী মায়া! হে নীলকণ্ঠ! যেহেতু রজ্জুতে সর্প উৎপন্ন হয় না, সেই হেতু তার নাশও সম্ভব নয়, অথচ ঐ ভ্রান্তিজনিত সর্পই লোকের ভয়োৎপাদন করে, সেইরূপ মায়াকল্পিত বিশ্বও তোমাতেই ব্যবহারযোগ্যতা লাভ করে।

পরদিন সকালে শ্রীযুক্ত চেলিয়ার বাড়ি গেলেন স্বামীজি। সেখানে দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি। ভক্তিভরে প্রতিকৃতিকে প্রণাম করলেন। দেখলেন আরো সব মহাপুরুষের ছবি রয়েছে। এই তো আনন্দের হাট, অমৃতের সত্র। সকলের উদ্দেশে নমস্কার করলেন।

'তোর হরি যদি সর্বত্রই থাকে তাহলে তাকে এই স্তম্ভমধ্যে দেখা।' হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে এ কথা বলা মাত্রই যিনি স্তম্ভ হতে বহির্গত হয়ে সেই দৈত্যরাজের বক্ষ নিজ নখরে বিদীর্ণ করেন সেই আর্তত্রাণপরায়ণ নারায়ণই আমার একমাত্র গতি। 'এই বিভীষণ আর্ত, সেই হেতু আগত।' রাবণ কর্তৃক তিরস্কৃত হয়ে বিভীষণ রামসন্দর্শনে এলে সুগ্রীব ঐ কথা বলে যাঁর কাছে নিয়ে যাওয়ামাত্র যিনি বলেছিলেন, 'ভয় নেই, আমিই এর তত্ত্বাবধান করব,' এবং তাকে দিয়েছিলেন লঙ্কার আধিপত্য, সেই আর্তত্রাণপরায়ণ নারায়ণই আমার একমাত্র গতি। দুর্যোধন-সভায় বস্ত্র-হরণে প্রবৃত্ত দুঃশাসন কর্তৃক আকর্ষিত হয়ে যখন দ্রৌপদী প্রার্থনা করেছিল, হে কৃষ্ণ, হে অচ্যুত, হে করুণাসাগর, অবমানিতাকে রক্ষা করো, তখন যিনি অক্ষয়বস্ত্রের দ্বারা তার লজ্জা নিবারণ করেছিলেন, সেই আর্তত্রাণপরায়ণ নারায়ণই আমার একমাত্র গতি।

সন্ধ্যায় কলম্বোর পাবলিক হলে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন স্বামীজি। সকলেই আমরা সেই এক, আমিই সমস্ত, 'স্ববোধে নান্যবোধেচ্ছা,' আমিই সর্বসম, নিঃসংগ-নির্মল, সেই উদার সার্বভৌম ধর্মের কথাই বললেন—সেই পরিচ্ছেদশূন্য অস্তিত্বের কথা। জ্ঞানচক্ষুতে সর্বত্র আত্মবীক্ষণের কথা। সমস্ত সভা শুনল তন্ময় হয়ে, বুঝল কাকে বলে দিব্যবোধ, আত্মবিস্তারের ডাক।

স্বামীজি দেখলেন সভায় কেউ-কেউ সাহেবি পোশাকে শোভা পাচ্ছেন। পোশাকে ব্যক্তি বা খানিক গর্বের ভাব, যত না দীপ্ত দেখাচ্ছে তার চেয়ে বেশি দৃপ্ত দেখাবার ভঙ্গি। তিনি এই দাস্যবৃত্তি সহ্য করতে পারলেন না, দাঁড়কাকের ময়ূর সাজবার এই মনোভাব। পোশাকের নিন্দা নয়, পরানুচিকীর্ষার নিন্দা। স্বামীজি তো সমস্ত বিশ্বের হয়েও স্বদেশের। তাঁর ঈশ্বর-সাধনার মধ্যে তো স্বাদেশিকতারও সাধনা, স্বাধীনতারও সাধনা।

ভেবেছিলেন জলপথে সোজা মাদ্রাজ চলে যাবেন। কিন্তু স্বামীজির কাছে ক্রমাগত তার আসতে লাগল, আমাদের দর্শন দিয়ে যান। দিব্যবাণীর কিছু স্পর্শ দিয়ে যান আমাদের। তাদের অনুরোধ ঠেকাতে পারলেন না স্বামীজি। ট্রেনে করে গেলেন কান্ডি, কান্ডি থেকে মাতালে, তারপর মাতালে থেকে গাড়ি করে অনুরাধাপুর।

ভগবান বুদ্ধের দন্ত-মন্দিরের জন্যে কান্ডি বিখ্যাত। সেখানে স্বামীজিকে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হল, তার উত্তরে স্বামীজি বক্তৃতা করলেন 'বক্তৃতা ও অধ্যাপনায় বেশি কাজ হবে না, এখন প্রয়োজন সক্রিয় ধর্মের।' আবার বলছেন স্বামীজি: 'মানুষ চাই, কর্মবীর মানুষ শরীর তো যাবেই, কুড়েমিতে যায় কেন? মর্চে পড়ে-পড়ে মরার চেয়ে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে মরা ভালো। মরে গেলেও হাড়ে-হাড়ে ভেলকি খেলবে, তার ভাবনা কী? টাকা-ফাকা সব আপনা আপনি আসবে, মানুষ চাই—টাকা চাই না। মানুষ সব করে, টাকায় কী করতে পারে? মানুষ চাই মানুষ চাই।

সন্ধ্যায় মাতালেতে পৌঁছে সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে যাত্রা সুরু করলেন। এবার যাত্রা ঘোড়ার গাড়িতে। গন্তব্যস্থল জাফনা, পথে অনুরাধাপুর। দুশো মাইলের পাড়ি। ভারতে পৌঁছে কোথায় বিশ্রাম নেবার স্বপ্ন, কোথায় বা স্বাস্থ্যোদ্ধার, তার বদলে ক্লেশকর দীর্ঘভ্রমণ—তাও কিনা ঘোড়ার গাড়িতে! কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে দেখ কী নয়নানন্দ দৃশ্য, সবুজ শস্যে দিকদিগন্ত পর্যন্ত ভরে রয়েছে! বিধাতার অপর্যাপ্ত করুণার মতই এই শ্যামল সম্ভার!

কিন্তু শুধু করুণা নয়, বিধাতার আছে আবার রসিকতা, নিষ্ঠুরতার রসিকতা। কয়েক মাইল পরে ডাম্বুল-এর কাছাকাছি গাড়ির একটা চাকা ভেঙে পড়ল। পাহাড়ের গড়ানে পথ ধরে নামতে গিয়েই এই দুর্ঘটনা। তবু ভাগ্যিস চাকাটা একদম খুলে পড়েনি, তাই রক্ষে। এখন কী করা! হাতের কাছে কোনো বিকল্পের ব্যবস্থা নেই—গরুর গাড়ির খোঁজে লোক পাঠানো হল। ঘণ্টা তিনেক পরে মিলল এক গরুর গাড়ি। তাতে জিনিসপত্র সহ শুধু মিসেস সেভিয়ারের জায়গা হল—আর সকলে হেঁটে চললেন। আরো কয়েক মাইল হাঁটার পর আরো গরুর গাড়ি পাওয়া গেল। প্রভু যখন যে অবস্থায় রাখেন তাতেই সম্মতি, তাতেই প্রসন্নতা! চলন্ত গরুর গাড়িতেই কাটিয়ে দেব এই আরণ্য রাত্রি।

কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।

যে পরম পদকে জেনেছে, স্বাত্মস্বরূপ বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে সকল দেহের অন্তরে বাহিরে এক আত্মাকে জেনেছে, সেই নিস্ত্রৈগুণ্য-পথে বিচরণ করতে নিয়মই বা কী, নিষেধই বা কোথায়?

লবণ যেমন সিন্ধুতে গলে যায় তেমনি যে সচ্চিদানন্দ ক্ষীরসমুদ্রে সমস্ত ভুবন পৃথিবী সলিল অনিল অনল আকাশ ও অখিল জীব ক্রমে বিলীন হয়ে সামরস্যৈকভূত হয়ে যায় তাকে যে জেনেছে, তার সেই নিস্ত্রৈগুণ্য-পথে বিচরণ করতে নিয়মই বা কী, নিষেধই বা কোথায়?

রাত ভোর করে প্রায় আট ঘণ্টা পরে অনুরাধাপুরে পৌঁছুলেন স্বামীজি। চারদিকে বৌদ্ধদের প্রাচীন কীর্তির ভগ্নস্তূপ পড়ে আছে—মন্দির আর মঠ—কত স্থাপত্য-সৌষ্ঠব। কবে কোন কালে বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুমের একটি শাখা এনে এখানে কে পুঁতেছিল, তাই এখন বিরাট মহীরুহে উচ্ছ্বসিত হয়েছে। সেই বৃক্ষতলে স্বামীজি 'পূজা' সম্পর্কে বক্তৃতা করলেন। তাঁর ইংরিজি বক্তৃতা জনতার কাছে যুগপৎ তামিল ও সিংহলি ভাষায় অনূদিত হতে লাগল। বক্তৃতার সার কথা, অসার আড়ম্বর ছেড়ে শুধু উপদেশগুলি কার্যে রূপান্তরিত করো।

বক্তৃতা জমে উঠেছে এমন সময় ধর্মান্ধ বৌদ্ধ ও ভিক্ষুর দল ক্যানেস্তারা পিটিয়ে বিকট গোলমাল সুরু করে দিল। বৌদ্ধপ্রধান সিংহলে চলবে না হিন্দুত্ব-প্রচার। স্বামীজি তখুনি তাঁর ভাষণ শেষ করলেন, হিন্দু জনতাকে বললেন সংযত থাকতে। বললেন, ধৈর্যই ধর্ম। হিন্দুরা সেদিন ধৈর্য না ধরলে মারাত্মক দাঙ্গা বেধে যেত। আরও বললেন, শিবই বলো, বিষ্ণুই বলো বা বুদ্ধই বলো, যে নামে যাকেই কেননা পূজা করো, সেই এক ঈশ্বরকেই ডাকা, এক ঈশ্বরকেই পূজা করা। পরধর্মের প্রতি শুধু সহিষ্ণুই থাকবে না, পরমধর্মের প্রতি সশ্রদ্ধ হবে।

তারপর স্বামীজি গেলেন জাফনায়, অনুরাধাপুর থেকে একশো মাইল দূরে এক দ্বীপের শহরে। স্বামীজির সম্মানে সারা শহর আলোকমালায় সাজানো হল, মশালের শোভাযাত্রা করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল হিন্দুকলেজের প্রাঙ্গণ-মণ্ডপে। সেখানে তাঁকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হল।

'আপনি বেদে প্রকাশিত সত্যের আলোক শিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রজ্বলিত করেছেন, ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় প্রচারিত করেছেন ভারতের ব্রহ্মবিদ্যা, উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছেন হিন্দুধর্মের সত্যসমূহ কত গভীর কত উদার ও সর্বব্যাপী, তার জন্যে আমাদের পরম-আত্মীয় ধর্মের সেবার জন্যে, আমরা হিন্দুরা আপনাকে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। জড়বাদসর্বস্ব যুগে যখন সর্বত্রই শ্রদ্ধার অভাব ও আধ্যাত্মিকতায় অরুচি, তখন এই ঘোর দুর্দিনে আপনি যে আমাদের প্রাচীন ধর্মের পুনরভ্যুদয়ের জন্যে আন্দোলন সুরু করেছেন তার জন্যেও আমাদের বহুতর ধন্যবাদ।

আপনি যেমন বেদকে সমস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মূল ভিত্তিস্বরূপ বলে মনে করেন, আমাদেরও সেই বিশ্বাস। ঈশ্বর আপনার মহৎকার্যের সহায় হয়ে আপনাকে সফলকাম করেছেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা, তিনি দীর্ঘকাল আপনাকে আপনার মহৎ ব্রতসাধনে নিযুক্ত রাখুন।

সেদিনের প্রতিভাষণের পর পরদিন ঐ কলেজ-প্রাঙ্গণেই স্বামীজি বললেন বেদান্তের কথা।

প্রথমত, হিন্দু কে ?

যারা সিন্ধুনদের পারে বাস করে তারাই হিন্দু। প্রাচীন পারসিকদের উচ্চারণবৈকল্যে সিন্ধু হিন্দু হয়েছে। সিন্ধুতীরে শুধু হিন্দুরাই বাস করে না, মুসলমান খৃস্টান জৈন বৌদ্ধরাও বাস করে। সুতরাং হিন্দু বলতে ভারতবর্ষের সকল অধিবাসীকেই বোঝায়। তবে শুধু হিন্দুদের বোঝাতে আমরা কোন শব্দ ব্যবহার করব ? আমার মতে 'বৈদিক' শব্দটাই সুষ্ঠু। বৈদিক মানে যারা বেদান্তানুবর্তী—যদি 'বৈদান্তিক' বলো তাহলে আরো ভালো হয়। আমরা শুধু হিন্দু নই, আমরা বৈদান্তিক।

এখন, বেদ কী?

প্রত্যেক ধর্মই বিশেষ কতকগুলো গ্রন্থকে প্রামাণ্য বলে থাকে। তাদের বিশ্বাস এই গ্রন্থগুলো ঈশ্বর বা অন্য কোনো অতিপ্রাকৃত পুরুষের বাক্য সুতরাং এই গ্রন্থগুলিই তাদের ধর্মের ভিত্তি। পাশ্চাত্ত্য দেশের আধুনিক পাণ্ডতদের মতে ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে হিন্দুদের বেদই প্রাচীনতম।

বেদনামক শব্দরাশি কোনো পুরুষমুখনিঃসৃত নয়। তার সন-তারিখ এখনো নির্দিষ্ট হয়নি, কোনো দিন হবে না, হতে পারে না। আমাদের মতে বেদ আদিহীন, বেদ অন্তহীন। আর সকল ধর্ম ঈশ্বরনামক ব্যক্তির বা ভগবানের দূত বা প্রেরিত পুরুষের বাণী। হিন্দুর বেদ অপৌরুষেয়। তার অন্য কোনো প্রমাণ নেই, সে স্বতঃপ্রমাণ। বেদ কখনো লিখিত হয়নি, সৃষ্টি হয়নি, বেদ ঈশ্বরের জ্ঞান, (বিদ ধাতুর অর্থ জানা), যেমন সৃষ্টি অনাদি-অনন্ত তেমনি ঈশ্বরের জ্ঞানও অনাদি-অনন্ত।

বেদান্তনামক জ্ঞানরাশি ঋষি-নামধেয় পুরুষসমূহের দ্বারা আবিষ্কৃত। তিনি পূর্ব থেকে অবস্থিত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করেছেন মাত্র, ঐ জ্ঞান তাঁর নিজের চিন্তাপ্রসূত নয়। যখন শুনবে, বেদের অমুক অংশের ঋষি অমুক, তখন ভেবে নিয়ো না যে তিনি তা লিখেছেন বা নিজের মন থেকে কল্পনা করেছেন। তিনি পূর্ব থেকে অবস্থিত জ্ঞান বা ভাবের দ্রষ্টামাত্র। ঋষিগণ শুধু আবিষ্কর্তা।

বেদের দুই কাণ্ড—কর্মকাণ্ড আর জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে নানারকম যাগযজ্ঞের কথা আছে, সেগুলি বর্তমান কালের অনুপযোগী বলে পরিত্যক্ত হয়েছে কিন্তু সাধারণ মানুষের কর্তব্য—ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী—বিভিন্ন আশ্রমীর বিভিন্ন কর্তব্য—এখনো পর্যন্ত অল্প-বিস্তর অনুসৃত হয়ে আসছে। দ্বিতীয় ভাগ জ্ঞানকাণ্ড—এটাই আমাদের আধ্যাত্মিক অংশ। এর নাম বেদান্ত অর্থাৎ বেদের শেষ—বেদের চরম লক্ষ্য। বেদজ্ঞানের এই সারভাগের নাম বেদান্ত বা উপনিষদ। ভারতের যে কোনো সম্প্রদায়—দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী অথবা সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব—যে কেউ হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত থাকতে চায়, তাকে বেদের এই উপনিষদভাগকে মেনে চলতেই হবে। তারা উপনিষদকে নিজের রুচি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে পারে কিন্তু তাদের বেদান্তকে প্রামাণ্য স্বীকার না করে উপায় নাই। তাই আমি 'হিন্দু' শব্দের বদলে 'বৈদান্তিক' ব্যবহার করতে চাই।

বেদান্তের পরেই স্মৃতির প্রামাণ্য। এগুলি ঋষিলিখিত গ্রন্থ, কিন্তু এদের প্রামাণ্য বেদান্তের অধীন। অর্থাৎ যদি স্মৃতির কোনো অংশ বেদান্তের বিরোধী হয় তবে তা পরিত্যাগ করতে হবে, তার কোনো প্রামাণ্য থাকবে না। স্মৃতি যুগে যুগে আলাদা। দেশ-কাল-পাত্রের পরিবর্তন অনুসারে আচার প্রভৃতির পরিবর্তন হয়েছে, আর স্মৃতি প্রধানতঃ এই আচারের নিয়ামক বলে সময়ে-সময়ে তারও পরিবর্তন করতে হয়েছে। কিন্তু বেদান্ত অখণ্ড, অপরিবর্তনীয়, যেহেতু বেদান্তে ধর্মের মূল তত্ত্বগুলোই ব্যাখ্যাত।

প্রথম ধরো সৃষ্টিতত্ত্ব। আমাদের সকল সম্প্রদায়েরই এই মত যে এই সৃষ্টি এই প্রকৃতি এই মায়া অনাদি ও অন্তহীন। জগৎ কোনো বিশেষ দিনে সৃষ্টি হয়নি। একজন ঈশ্বর এসে এই জগৎ সৃষ্টি করলেন, তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন, এমনটি হতে পারে না। সৃষ্টিকারিণী শক্তি এখনো বর্তমান। ঈশ্বর অনন্তকাল ধরে সৃষ্টি করছেন, তিনি কখনো বিশ্রাম করেন না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমি যদি ক্ষণকাল কর্ম থেকে বিরত

হই তবে জগৎসংসার ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের সৃষ্টি ইংরিজি creation নয়। ইংরিজিতে creation বলতে কিছু না হতে কিছু হওয়া, অসৎ থেকে সতের উদ্ভব, এই অপরিণত মতবাদ বোঝায়। আমি এমনি অসংগত কথা বিশ্বাস করতে বলে তোমাদের বুদ্ধি ও বিচারশক্তির অবমাননা করতে চাই না। তরঙ্গের উত্থান-পতন আছে, স্রোত অবিচ্ছিন্ন। যুগের আরম্ভ বা শেষ থাকতে পারে কিন্তু সৃষ্টি আদি-অন্তহীন। অনাদ্যন্ত।

কে এই সৃষ্টি করছেন?

উত্তর ঈশ্বর। ইংরেজিতে সাধারণতঃ God বলতে যা বোঝায় আমার অভিপ্রায় তা নয়। সংস্কৃত ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহার করাই সর্বাপেক্ষা যুক্তিসংগত। তিনিই এই জগৎপ্রপঞ্চের সাধারণ কারণস্বরূপ। ব্রহ্মের স্বরূপ কী। ব্রহ্ম নিত্য নিত্যশুদ্ধ নিত্যজাগ্রত সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ দয়াময় সর্বব্যাপী নিরাকার অখণ্ড। এখন প্রশ্ন এই, এই ব্রহ্মই যদি জগতের স্রষ্টা ও নিত্যবিধাতা হন, তাহলে জগতে এত অনৈক্য কেন? কেন একজন সুখী, কেন আরেকজন দুঃখী? কেন ধনী-নির্ধনের বৈষম্য? কেন বা এত নিষ্ঠুরতা? এমন দেখা যায় একের জীবন অন্যের মৃত্যুর উপর নির্ভর করছে। একজন আরেকজনকে হত্যা করছে, একজনের সর্বনাশ ঘটিয়ে আরেকজনের সাফল্য ঘটছে। কেন এই প্রতিযোগিতা, এই দ্বন্দ্ব, এই কান্না, এই দীর্ঘশ্বাস! এই যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি হয় তবে সেই ঈশ্বর তো ঘোরতর নির্মম। মানুষ যত নিষ্ঠুর দানবই কল্পনা করে থাকুক না কেন, এই ঈশ্বর তার চেয়েও নিষ্ঠুর। বেদান্ত বলে, ঈশ্বর এই বৈষম্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ নয়। তবে এ কে করল? আমরা নিজেরাই করেছি। মেঘ সকল ক্ষেত্রে সমভাবেই বৃষ্টি বর্ষণ করল। কিন্তু যে ক্ষেত্র কর্ষণ করা হয়েছে সে ক্ষেত্রই শস্য ফলাল। কিন্তু যে ক্ষেত্র কর্ষণ করা হয়নি সে বর্ষণের ফল পেল না। এ সে মেঘের অপরাধ নয়। তেমনি ঈশ্বরের অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন দয়া— আমরাই বৈষম্য সৃষ্টি করেছি। কী করে আমরা এই বৈষম্য সৃষ্টি করলাম? কেউ জগতে সুখী হয়ে জন্মাল, কেউ বা দুঃখী হয়ে। বলবে তারা তো এই বৈষম্য সৃষ্টি করেনি। আমি বলব, না, তারাই করেছে। আমরাই সকলে আমাদের পূর্বজন্মকৃত কর্মের দ্বারা এই ভেদ এই বৈষম্য সৃষ্টি করেছি।

শুধু আমরা হিন্দুরা নই, বৌদ্ধ ও জৈনরাও একমত, সৃষ্টির মত জীবনও অনন্ত। আমরা প্রত্যেকেই অনন্ত অতীতের কর্মসমষ্টির ফলস্বরূপ। নিজের অতীত কর্মের ফল ভোগ করবার জন্যেই জন্ম। সেই থেকেই বৈষম্যের উৎপত্তি। আমরা প্রত্যেকেই নিজের অদৃষ্টের গঠনকর্তা। এই মতবাদের দ্বারাই অদৃষ্টবাদ খণ্ডিত হয় এবং এ-ই ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ নিরাকৃত করে। আমরা যা কিছু ভোগ করি তার জন্যে আমরাই দায়ী, আর কেউ নয়। কার্য-কারণ দুইই আমরা নিজেরা। সুতরাং আমরা স্বাধীন। যদি আমি অসুখী হই, তবে বুঝতে হবে আমিই আমাকে অসুখী করেছি—যদি ইচ্ছা করি তবে আমিও সুখী হতে পারি। যদি আমি অপবিত্র হই, তবে তাও আমার নিজকৃত—ইচ্ছা করলে আমি আবার পবিত্র হতে পারি। মানুষের ইচ্ছা কোনো ঘটনাধীন নয়। মানুষের অনন্ত মহৎ প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতার কাছে প্রাকৃতিক শক্তিগুলি পর্যন্ত মাথা নোয়াবে, বশংবদ হয়ে থাকবে।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে—আত্মা কী? আত্মাকে না জানলে আমাদের শাস্ত্রের ঈশ্বরকেও জানা হবে না। আর এই ঈশ্বরের জ্ঞান বাহ্যজগৎ হতে পাওয়া যাবে না।

অন্তরের মধ্যে আত্মার মধ্যে তার অন্বেষণ করতে হবে। বাহ্যজগৎ সেই অনন্ত সম্বন্ধে আমাদের কোনো সংবাদ দিতে পারে না, অন্তর্জগতে অন্বেষণ করলেই তার সংবাদ পাওয়া যায়। অতএব শুধু আত্মতত্ত্বের অন্বেষণেই, আত্মতত্ত্বের বিশ্লেষণেই পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান সম্ভব।

জীবাত্মার স্বরূপ কী?

জীবাত্মার স্বরূপ নিয়ে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ থাকলেও এক বিষয়ে তাদের ঐক্য আছে—জীবাত্মা অনাদি অনন্ত ও স্বরূপতঃ অবিনাশী। তাছাড়া প্রত্যেক আত্মায় সর্ববিধ শক্তি আনন্দ পবিত্রতা সর্বব্যাপিতা ও সর্বজ্ঞত্ব অন্তর্নিহিত রয়েছে। মানুষ বড় হোক কি ছোট হোক ভাল হোক কি মন্দ হোক, সবল হোক কি দুর্বল হোক, সকলের মধ্যেই সেই সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ আত্মা বাস করছে। আত্মা হিসেবে কোনো প্রভেদ নেই, প্রভেদ শুধু প্রকাশের তারতম্যে। আমার ও ঐ ক্ষুদ্রতম প্রাণীর মধ্যে প্রভেদও সেই প্রকাশের তারতম্য—স্বরূপতঃ তার সঙ্গে আমার কোনো ভেদ নেই, সে আমার ভাই, তারও যে আত্মা আমারও তাই। ভারত এই মহত্তম তত্ত্ব জগতে প্রচার করেছে। অন্যান্য দেশে সমগ্র মানবজাতির ভ্রাতৃভাবের কথা বলা হয়েছে, ভারত বলেছে 'সর্বপ্রাণীর ভ্রাতৃভাব'। অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণী, এমন কি ক্ষুদ্রতম পিপীলিকাও আমার ভাই —আমার দেহস্বরূপ। 'এবং তু পণ্ডিতৈজ্ঞাত্বা সর্বভূতময়ং হরিম।' পণ্ডিতেরা সেই প্রভুকে সর্বভূতময় জেনে সকল প্রাণীকেই ভগবানজ্ঞানে উপাসনা করবেন। তারই জন্যে ভারতে তির্যগজাতি ও দরিদ্রগণের প্রতি এত দয়ার ভাব। সর্ববস্তু সম্বন্ধেই এই দয়ার ভাব।

সংস্কৃত আত্মা আর ইংরেজি soul ভিন্নার্থবাচক। আমরা যাকে মন বলি তাকেই ওরা soul বলে। আমাদের যে এই স্থূল শরীর তারই পশ্চাতে মন, কিন্তু মন আত্মা নয়। মন সূক্ষ্মশরীর। তা-ই জন্মজন্মান্তরে বিভিন্ন শরীর আশ্রয় করে—কিন্তু তার পিছনে আত্মা বর্তমান। এই আত্মার অনুবাদ soul বা mind শব্দ দিয়ে হতে পারে না, বরং যা পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকেরা আজকাল বলছেন সেই self হতে পারে। যে শব্দই ব্যবহার করি না কেন, আত্মা মন ও স্থূল শরীর দুয়ের থেকেই আলাদা—এ ধারণা থেকে আমরা যেন না বিচ্যুত হই। এই আত্মাই মন বা সূক্ষ্মশরীরকে সঙ্গে করে এক দেহ থেকে দেহান্তরে নিয়ে যায়। পূর্ণত্ব লাভ করার পর তার জন্মমৃত্যু হয় না—সে স্বাধীন হয়ে যায়। এই স্বাধীনতাই আত্মার লক্ষ্য। আমাদের ধর্মের বিশেষত্ব এইখানে।

আমাদের ধর্মেও স্বর্গ-নরক আছে। কিন্তু তারা কিছু চিরস্থায়ী বস্তু নয়। যারা ফলাকাঙ্ক্ষা করে ইহলোকে কোনো সৎকর্ম করে, তারা মৃত্যুর পর কোনো স্বর্গে ইন্দ্রাদি দেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই দেবত্ব বিশেষ বিশেষ পদমাত্র। এই দেবতারাও একসময়ে মানুষ ছিলেন, সৎকর্মফলে এঁদের দেবত্বপ্রাপ্তি ঘটেছে। ইন্দ্র-বরুণ নাম কোনো দেব-বিশেষের নাম নয়। হাজার-হাজার ইন্দ্র হবে। রাজা নহুষ মৃত্যুর পর ইন্দ্রত্ব পেয়েছিল। ইন্দ্রত্ব পদমাত্র। যে কেউ সৎকর্মের ফলে উন্নত হয়ে ইন্দ্রত্ব পেলেন, কিছুদিন সেই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকলেন, পরে দেবদেহ ত্যাগ করে আবার মানুষ হয়ে জন্মালেন। মনুষ্যজন্ম আবার সর্বশ্রেষ্ঠ জন্ম। কোনো কোনো দেবতা স্বর্গসুখের কামনা ছেড়ে মুক্তিলাভের চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু যেমন এই জগতের অধিকাংশ লোক ধনমান ঐশ্বর্য পেলে উচ্চতত্ত্ব ভুলে যায়, তেমনি বেশির ভাগ দেবতাও ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়ে আর মুক্তির কথা

ভাবে না, শুভকর্মের ফলভোগ শেষ হয়ে গেলে পৃথিবীতে আবার মানুষের রূপ নিয়ে দেখা দেয়। অতএব দেখা যাচ্ছে এই পৃথিবীই কর্মভূমি। এই পৃথিবী থেকেই আমরা মুক্তিলাভ করতে পারি। সুতরাং স্বর্গে আমাদের প্রয়োজন নেই।

তবে কোন বস্তু লাভের জন্যে আমরা সচেষ্ট হব? সেই বস্তুর নাম মুক্তি। আমাদের শাস্ত্র বলে, শ্রেষ্ঠতম স্বর্গেও তুমি প্রকৃতির দাসমাত্র। বিশ হাজার বছর তুমি রাজত্ব ভোগ করলে, তাতে কী হল? যতদিন তোমার শরীর যতদিন তোমার উপর দেশ-কাল ক্রিয়াশীল, ততদিন তুমি দাস, ক্রীতদাস মাত্র। এই কারণে আমাদের বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি উভয়কেই জয় করতে হবে। প্রকৃতি যেন তোমার পদতলে থাকে, প্রকৃতিকে পদদলিত রেখে তার বাইরে গিয়ে তোমাকে মুক্তভাবে নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তখন তুমি জন্মের অতীত হলে, মৃত্যুকেও অতিক্রম করলে। তখন তোমার সুখ চলে গেল, দুঃখও অস্তমিত হল। তখনই তুমি সর্বাতীত অব্যক্ত অবিনাশী আনন্দের অধিকারী হলে। আমরা যাকে এখানে সুখ ও মঙ্গল বলি তা সেই অনন্ত আনন্দেরই এক কণিকামাত্র। ঐ অনন্ত আনন্দই আমাদের লক্ষ্য।

আত্মাতে নর-নারী ভেদ নেই, আত্মা লিঙ্গবর্জিত। দেহসম্বন্ধেই নরনারীভেদ। আত্মাতে স্ত্রী-পুরুষ ভেদারোপ ভ্রমমাত্র—শরীর সম্বন্ধেই তা সত্য। তেমনি আত্মার সম্বন্ধে কোনো বয়সও নির্দিষ্ট হতে পারে না—সেই পুরাণ পুরুষ সর্বদাই একরূপ।

আত্মা বদ্ধ হল কিরূপে?

আমাদের শাস্ত্রই একমাত্র এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। অজ্ঞানই বন্ধনের কারণ। অজ্ঞানেই আমরা বদ্ধ হয়েছি, জ্ঞানোদয়েই তা নাশ হবে। জ্ঞানই আমাদের অন্ধতমসের অপর পারে নিয়ে যাবে।

জ্ঞানলাভের উপায় কী?

ভক্তিপূর্বক ঈশ্বরোপাসনা ও সর্বভূতকে ভগবানের মন্দিরজ্ঞানে সর্বভূতে প্রেম—এতেই জ্ঞানলাভ হয়। ঈশ্বরে পরমানুরক্তিতেই অজ্ঞান দূরীভূত হবে, সমস্ত বন্ধন খসে যাবে ও আত্মা মুক্তিলাভ করবে।

আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরের দ্বিবিধস্বরূপের উল্লেখ আছে—সগুণ ও নির্গুণ। সগুণ ঈশ্বর কী?

সগুণ ঈশ্বর অর্থে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কর্তা—জগতের অনাদি জনক-জননী। তাঁর সঙ্গে আমাদের নিত্য ভেদ। মুক্তি অর্থে তাঁর সামীপ্য ও সালোক্যপ্রাপ্তি।

আর নির্গুণ ব্রহ্ম

তার কোনো বিশেষণ নেই। তাঁকে সৃষ্টিকর্তা বলা যায় না। তাঁর আবার বন্ধন কী। প্রয়োজন ছাড়া কেউই কোনো কাজ করে না। তাঁর আবার প্রয়োজন কী? তাঁকে জ্ঞানবান বলা যায় না কারণ জ্ঞান মনের ধর্ম। তাঁর আবার মন কী? তাঁকে চিন্তাশীল বা বিচারশীলও বলা যায় না কেননা চিন্তা বা বিচার সসীমতা বা দুর্বলতার চিহ্ন। তাঁর আবার সীমা কী অভাব কী? বেদ তাঁকে 'সঃ' বলেনি, 'সঃ' বললে ব্যক্তিবিশেষ বোঝাত, জীবজগতের থেকে পৃথক হয়ে থাকত, নির্গুণতা বোঝাবার জন্যে বলেছে 'তৎ'। এই 'তৎ' থেকেই অদ্বৈতবাদ।

এই নির্গুণ পুরুষের সঙ্গে আমাদের কী সম্বন্ধ?

আমরা তাঁর সঙ্গে অভিন্ন। আমরা প্রত্যেকেই সর্বপ্রাণীর মূল কারণস্বরূপ, নির্গুণ

পুরুষেরই বিভিন্ন বিকাশ। যখনই আমরা আমাদেরকে নির্গুণ পুরুষ থেকে আলাদা ভাবি তখনই আমাদের দুঃখের আরম্ভ, শুধু তাঁর সঙ্গে অভেদজ্ঞানেই আমাদের মুক্তি, আমাদের ভূমানন্দ। নির্গুণ ব্রহ্মবাদই সর্বপ্রকার নীতিবিজ্ঞানের ভিত্তি। প্রাণীনির্বিশেষে সকলকেই আত্মতুল্য প্রীতি করতে বলা হয়েছে, করলে কেন কল্যাণ হবে এর কারণ আর কেউ দিতে পারেনি, দিয়েছে এই ব্রহ্মবাদ। নির্গুণ ব্রহ্মবাদে যখন তুমি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে এক অখণ্ডস্বরূপ বলে জানবে, যখন জানবে অন্যকে ভালোবাসলে নিজেকে ভালোবাসা হল, অন্যের ক্ষতি করলে নিজেরই ক্ষতি হল, তখন বুঝবে কেন অন্যের অনিষ্ট করা উচিত নয়, কেন বিশ্বভ্রাতৃত্ব লাভজনক। নীতিবিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের যুক্তি এই ব্রহ্মবাদে।

সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসবান হলে হৃদয়ে কী অপূর্ব প্রেমের উচ্ছ্বাস হয় তা আমি জানি। কিন্তু আমাদের দেশে এখন আর কাঁদিবার সময় নেই, এখন বীর্যের দরকার। এই নির্গুণ ব্রহ্মে বিশ্বাস হলে—'আমিই সেই নির্গুণ ব্রহ্ম' এই জ্ঞানসহায়ে নিজের পায়ের উপর উঠে দাঁড়ালে হৃদয়ে কী অপূর্ব শক্তির বিকাশ হয় তা বলে শেষ করা যায় না। ভয়? কার ভয়? আমি প্রকৃতির নিয়ম পর্যন্ত গ্রাহ্য করি না। মৃত্যু? মৃত্যু আমার কাছে উপহাসের বস্তু। নিজের আত্মার মহিমায় যদি মানুষ অবস্থিত হয়, যে আত্মা অনন্ত ও অবিনাশী, যাকে অস্ত্র ছিন্ন করতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করতে পারে না, জল বিগলিত করতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করতে পারে না, যে জন্মরহিত, যে মৃত্যুশূন্য, যার চেতনায় সমস্ত সূর্য-চন্দ্র ব্রহ্মাণ্ডসিন্ধুতে বিন্দুর মত প্রতীয়মান, তার আর ভয় কাকে? এই মহামহিম আত্মায় বিশ্বাসবান হলেই বীর্য আসবে। তুমি যা চিন্তা করবে তুমি তাই হবে। দুর্বল ভাবলে দুর্বল হবে, তেজস্বী ভাবলে তেজস্বী হবে। যদি তুমি নিজেকে অপবিত্র ভাবো তবে তুমি অপবিত্র, বিশুদ্ধ ভাবলে বিশুদ্ধতম। অদ্বৈতবাদ আমাদের দুর্বল ভাবতে উপদেশ দেয় না, এবং তেজস্বী সর্বশক্তিমান ভাবতে শেখায়। আমার মধ্যে সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত শক্তি, পরিপূর্ণ পবিত্রতা বিরাজ করছে, তবে আমি তা জীবনে প্রকাশিত করতে পারি না কেন? পারি না কারণ আমার বিশ্বাস নেই। যদি আমি বিশ্বাসী হই তবে নিশ্চয়ই তা উদ্ঘাটিত হবে। এই আত্মতত্ত্বই জীবন—মহত্তম জীবন।

এই আত্মতত্ত্বেই বিজ্ঞানে-ধর্মে বিরাট সামঞ্জস্য।

ভারতে অনেক সম্প্রদায়, বিভিন্ন সাধন প্রণালী। কারু সঙ্গে কারু বিরোধ নেই। শৈব একথা বলে না যে বৈষ্ণবমাত্রই অধঃপাতে যাবে, তেমনি বৈষ্ণবও বলে না শৈবমাত্রই অভিশপ্ত। আমি আমার পথে চলি তুমি তোমার পথে চলো, পরিণামে সবাই এক জায়গায় পেঁছুব। যার যেই মত তার সেই পথ। একেই ইষ্টনিষ্ঠা বলে। সকলকে এক পথের পথিক করার চেষ্টা অসঙ্গত। পৃথিবীর সকলের একই ধর্মমত—এ এক ভয়াবহ ব্যাপার। তাহলে মানুষের স্বাধীন চিন্তাশক্তি লোপ পাবে, লোপ পাবে আন্তরিকতা, যা কিনা আসল ধর্মভাব। ভেদই আমাদের জীবনযাত্রার মূলমন্ত্র। আমি আমার পথে চলি, তুমি তোমার পথে চলো। কোন খাদ্য আমার শরীরের উপযোগী তা আমি জানি, তোমাকে ডাক্তারি করতে হবে না। তুমি নিজের চরকায় তেল দাও।

ইষ্টনিষ্ঠা থেকে ভ্রষ্ট হয়ো না।

যদি কোনো মন্দিরে গিয়ে অথবা কোনো প্রতিমার সাহায্যে তুমি তোমার আত্মায় অবস্থিত ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারো, বেশ তো, মন্দিরে যাও, বহু-বহু প্রতিমা গড়ো। যদি কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে তোমার ঈশ্বর উপলব্ধির সাহায্য হয় তবে ঐ সব

অনুষ্ঠান পালন করো। কিন্তু অন্যের পথ নিয়ে বিবাদ কোরো না। যে মুহূর্তে তুমি বিবাদ করেছ সেই মুহূর্তে তুমি ঈশ্বর-পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছ, পেঁাচেছ পশুপদবীতে।

এখন এ যুগের কী প্রয়োজন তাই তোমাদের বলি। মহাভারতকার বেদব্যাসের জয় হোক। তিনি বলেছেন, একমাত্র দানই কলিযুগের ধর্ম। শ্রেষ্ঠ দান কী? ধর্মদানই সর্বশ্রেষ্ঠ দান। তারপর, বিদ্যাদান, তারপর প্রাণদান। অন্নবস্ত্র দান তারও পরে। যিনি ধর্মজ্ঞান দেন তিনিই আত্মাকে অনন্ত জন্মমৃত্যুপ্রবাহ থেকে রক্ষা করেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানদানই শুধু দান হিসেবে নয় কর্ম হিসেবেও শ্রেষ্ঠ। শুধু লম্বা-চওড়া কথা বললেই ধর্ম হয় না—এমন জীবন দেখাও যাতে ত্যাগ ও তিতিক্ষা, আধ্যাত্মিকতা ও অনন্ত প্রেম বিরাজ করছে। যদি তোমরা সত্যিই তোমাদের ধর্মকে তোমাদের দেশকে ভালোবাসো, তবে সর্বসাধারণের দুর্বোধ্য শাস্ত্র থেকে রত্নরাজি আহরণ করে তাদের প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিতরণ করো। এই বিতরণে তোমাদের দানরূপ মহাব্রত সাধন সম্পন্ন হবে। শত শত শতাব্দী ধরে আমরা ঘোরতর ঈর্ষাবিষে জর্জরিত হচ্ছি। অন্য ব্যাপারে তো বটেই ধর্মকর্মেও আমরা শ্রেষ্ঠত্বের অভিলাষী—এখন আমরা ঈর্ষার দাস। যদি ভারতে কোনো প্রবল পাপ রাজত্ব করে এসে থাকে, তা এই ঈর্ষা। সকলেই আদেশ দিতে চায়, আদেশ পালন করতে কেউ প্রস্তুত নয়। প্রথমে আদেশ পালন করতে শেখ, পরে আদেশ দেবার মত শক্তি আপনা থেকেই আসবে। সকলের দাস হতে শিখলেই তবে প্রভু হওয়া যায়।'

প্রায় চার হাজার শ্রোতার সামনে প্রায় এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট ধরে ভাষণ দিলেন স্বামীজি। সভাশেষে সে কী উদ্দীপনা! এমন উদাত্ত কণ্ঠে হিন্দুধর্মের এমন উদার ব্যাখ্যা কে আর কবে শুনেছে?

আপনি কে? ক্যাপটেন সেভিয়ারকে ধরলেন কেউ কেউ।

আমি স্বামীজির অনুচর।

আপনার ধর্ম কি?

আমি হিন্দু। আমি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছি।

৮৮

সিংহল ছেড়ে স্বামীজি গেলেন পাম্বানে। পাম্বান ভারতের নিকটবর্তী একটি ছোট দ্বীপ। পাম্বান থেকে রামেশ্বরে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন, খবর এল রামনাদের রাজা নিজে আসছে স্বামীজিকে নিয়ে যেতে। স্বামীজিকে আমেরিকা পাঠাতে যারা অগ্রণী ছিল রাজা নিজে তাদের একজন, তাঁর প্রত্যাবর্তনে রাজাই আবার অভ্যর্থনায় অগ্রণী হবে তা আর আশ্চর্য কী। রাজা শুধু একা আসেনি, তার দলবল নিয়ে এসেছে, সঙ্গে তার নিজের নৌকো।

রাজকীয় নৌকোয় চড়িয়ে স্বামীজিকে পাম্বানে নিয়ে যাওয়া হল। অভিনন্দনে বলা হল: 'হে ধর্মাচার্য, পাশ্চাত্ত্য দেশে আপনার হিন্দুধর্মপ্রচারে যথেষ্ট সুফল হয়েছে। এবার এই নিদ্রিত ভারতকে তার অজ্ঞান-নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তুলুন।'

'ভারতবর্ষ—আমার পুণ্য মাতৃভূমি'। প্রত্যুত্তরে বললেন স্বামীজি, 'আমাদের এই

পুণ্যভূমিতেই ধর্ম ও দর্শনের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি। শুধু এখানেই ত্যাগধর্ম প্রচারিত হয়েছে। শুধু এখানেই আবহমান কাল মানুষের সামনে উচ্চতম আদর্শ স্থাপিত হয়েছে। ভারতবর্ষ ছাড়া কোথায় আর এত জন্মেছে ধর্মবীর ?

পশ্চিমে অনেক ঘুরলাম। দেখলাম প্রত্যেক দেশেরই একটি মুখ্য আদর্শ আছে, সেই আদর্শই যেন তার জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। কারু রাজনীতি কারু যুদ্ধ কারু বাণিজ্য কারু বা তন্ত্রবিজ্ঞান। এ সব কিছুই ভারতের আদর্শ নয়। ভারতের আদর্শ ধর্ম, ধর্মই তার যথার্থ মেরুদণ্ড।

শারীর শক্তি ও যন্ত্রশক্তি অনেক অদ্ভুত কাজ করতে পারে সন্দেহ নেই কিন্তু অধ্যাত্ম-শক্তির প্রভাবই কালজয়ী। সমগ্র জগৎ এই অধ্যাত্ম খাদ্যের জন্যে ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে। ভারতকেই তা জোগাতে হবে। সমগ্র জগৎকে ধর্ম শেখাতে ভারতই ধর্মতঃ ও ন্যায়তঃ বাধ্য।

আমাদের ঈশ্বর সকল ধর্মেরই ঈশ্বর—এই উদার ভাব শুধু ভারতে বর্তমান। জগতের অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে এমন উদার ভাব দেখাও দেখি। অন্যান্য দেশের লোকেরা পার্বত্যদুর্গনিবাসী লুণ্ঠনকারী দস্যু ব্যারনদের পূর্বপুরুষরূপে দেখাতে পারলে গৌরববোধ করে—আমরা হিন্দুরা পর্বতগুহাবাসী ফলমূলাহারী ব্রহ্মধ্যানরত ঋষিমুনির বংশধর বলে পরিচয় দিতে পারলে কৃতার্থ হই। এখন আমরা অবনত ও হীন হয়ে আছি—কিন্তু আমরা যদি আমাদের ধর্মের জন্যে আবার প্রাণপাত করি, তবে আবার আমরা মহৎ পদবীতে উন্নীত হব।

আপনাদের আন্তরিক অভ্যর্থনার জন্যে ধন্যবাদ। যদি আমার দ্বারা কিছু ভালো কাজ হয়ে থাকে তার জন্যে ভারত এই মহাপুরুষ রামনাদের রাজার কাছে ঋণী। কারণ আমাকে শিকাগো পাঠাবার কল্পনা এই রাজার মনেই প্রথম জাগে, তিনিই প্রথম আমার মাথায় এ চিন্তা ঢুকিয়ে দেন আর তিনিই চিন্তাকে কাজে পরিণত করার উত্তেজনা জোগান। আর সব রাজারাও যদি এমনি ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা করতেন !'

ঘোড়ার গাড়িতে করে স্বামীজিকে রাজার বাংলোর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, রাজা আদেশ করল, ঘোড়া খুলে দাও, আমরা সকলে মিলে স্বামীজির গাড়ি টানব।

আর কথা নেই, রাজাও গাড়ি টানতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে কত লোক হাত লাগাল তার ঠিক নেই। টানাটানির জন্যে ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। নিয়ে আসা হল এক রাজপ্রাসাদে।

পরদিন স্বামীজি গেলেন রামেশ্বরদর্শনে।

প্রায় পাঁচ বছর আগে এখানেই একদিন এসেছিলেন পদব্রজে, নিঃসঙ্গ ও পরিক্লান্ত। তখন সেই দণ্ডকমণ্ডলুধারী ধূলিধূসরকলেবর সন্ন্যাসীকে কে চিনত ? কিন্তু আজ ? আজ তাঁকে নিয়ে এক বিরাট শোভাযাত্রার আয়োজন হয়েছে। পতাকা, বাদ্যভাণ্ড, হাতি-ঘোড়া-উটের সারি, মানুষের জনতাই বা কী বিস্তীর্ণ ! কিন্তু এ সব সমারোহে স্বামীজির কি এসে যায় ? যিনি শিব তিনি শিবই আছেন, আর বিল্বে-নন্দে বনে-ভবনে ঋদ্ধে-রুদ্ধে সর্বত্র তাঁর শিবদর্শন।

তস্মাদেকং ত্বাং প্রপদ্যে মহেশম।

এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সমস্ত—এ ধ্রুব সত্য, এ ছাড়া আর কিছু নেই। এক রুদ্রই আছেন, দ্বিতীয় আর কিছু নেই, সেই জন্যে সেই এক মহেশেরই শরণাগত হই।

হে শম্ভো, তুমিই সকলের একক কর্তা, নানা রূপ ধারণ করেও একরূপস্বরূপ। তুমি সকলের সাক্ষী, এক হয়েও অনেক, সেইজন্যে অন্যের নয়, একমাত্র মহেশ, তোমারই শরণাপন্ন হই।

রজ্জুতে যেমন সর্প-ভ্রান্তি, শুক্তিতে যেমন রজত-ভ্রান্তি, জলবিন্দুতে যেমন চন্দ্র-সূর্যের ভ্রান্তি, তেমনি যাঁকে জানলে এই বিশ্বপ্রপঞ্চে ঐরূপ অনিত্যবুদ্ধি হয়, সেই মহেশে শরণাগত হই।

যিনি জলে শৈত্য, বহ্নিতে দাহকত্ব ভানুতে তাপ, চন্দ্রে প্রসাদ, পুষ্পে গন্ধ, দুগ্ধে নবনী, হে শম্ভো, তিনি তুমিই, তাই তোমার শরণাপন্ন হই।

তোমার কর্ণ নেই অথচ তুমি সর্বশব্দগ্রাহী, নাসিকা নেই অথচ তুমি সর্বগন্ধগ্রাহী, তোমার চরণ নেই অথচ তুমি সুদূরগামী, চক্ষু নেই অথচ তুমি সর্বদর্শী, জিহ্বা নেই অথচ তুমি সর্বরসবেত্তা, তুমিই তোমাকে সম্যকরূপে জানতে পারো, সুতরাং তোমারই শরণ নিলাম।

হে ঈশ, তোমাকে আমরা জানি না সাক্ষাৎ বেদও তোমায় জানেন না, বিষ্ণু বা অখিল-বিধাতা ব্রহ্মাও তোমায় জানেন না, যোগীন্দ্র বা দেবাগ্রগণ্য ইন্দ্রও তোমায় জানেন না, একমাত্র ভক্তেরাই তোমাকে জানতে পারে, অতএব তোমারই শরণ নিলাম।

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বর॥

রামেশ্বরমন্দিরে স্বামীজি বক্তৃতা দিলেন :

ধর্ম অনুষ্ঠানে নয়, ধর্ম অনুরাগে। হৃদয়ের পবিত্র ও অকপট প্রেমই ধর্ম। যদি দেহমন শুদ্ধ না হয় তবে মন্দিরে গিয়ে শিবপুজো করা বৃথা। যাদের দেহ-মন পবিত্র, শিব তাদেরই পুজো নেন, তাদেরই প্রার্থনা শোনেন। চিত্তশুদ্ধি বা মানসপুজোই আসল জিনিস। সকল উপাসনার সারই এই শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অন্যের কল্যাণ সাধন করা। দরিদ্র দুর্বল রুগ্ন ভগ্ন সকলের মধ্যে যিনি শিব দেখেন তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন আর যে শুধু বিগ্রহের মধ্যে শিবের উপাসনা করে সে প্রবর্তক মাত্র। যে শিবজ্ঞানে দরিদ্রকে সেবা করে আর যে মন্দিরবিগ্রহে শুধু শিবদর্শন করে দুজনের মধ্যে প্রথম জনেরই প্রতি শিব বেশি প্রসন্ন।

যে শিবের সেবা করতে চায় তাকে আগে শিবের দরিদ্র ও দুর্গত সন্তানদের সেবা করতে হবে। শাস্ত্রে বলেছে যাঁরা ভগবানের দাসদের সেবা করেন তাঁরাই ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ দাস।

সৎকর্ম বলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সকলের অভ্যন্তরে যে শিব আছেন তিনি প্রকাশিত হন। দর্পণের উপর ধুলো থাকলে আমরা আমাদের প্রতিচ্ছায়া দেখি না। সে ধুলো পরিষ্কার করতে হবে। হৃদয়দর্পণেও তেমনি অজ্ঞান ও পাপের ময়লা লেগে আছে। সেই দর্পণেরও মার্জন প্রয়োজন।

আমাদের সবচেয়ে বড় পাপ স্বার্থপরতা, শুধু নিজের ভাবনা ভাবা। আমিই আগে যাব, আগে খাব, সব সুবিধাটুকু আমিই লুটে নেব, আমার পরে আর কেউ নেই, থাকলেও আমার কিছু আসে যায় না। স্বর্গে যাবার বেলায়ও আমি আগে, মুক্তি পাবার বেলায়ও আমি আগে। সব ব্যাপারেই এই অগ্রাধিকারের চেষ্টার নামই স্বার্থপরতা। যে স্বার্থ-শূন্য সে বলে আমি আগে যেতে চাই না, সকলের শেষেই যাব, আমি স্বর্গে যেতে চাই

না, যদি কারু সাহায্যের জন্য নরকে যেতে হয় আমি তাতেও প্রস্তুত। কেউ ধার্মিক কি অধার্মিক পরখ করতে হলে দেখতে হবে সে কতদূর নিঃস্বার্থ। যে বেশি নিঃস্বার্থ সে বেশি ধার্মিক, সেই শিবের সমীপবর্তী। সে পণ্ডিত হোক মূর্খ হোক, সে শিবের বিষয়ে কিছু জানুক বা না জানুক, সে আর সকলের চেয়ে শিবের বেশি ঘনিষ্ঠ। আর যে স্বার্থপর সে সব তীর্থ আর দেবমন্দির দেখে এলেও শিবের থেকে অনেক দূরে।'

'নেত্রত্রয়ায় শুভলক্ষণলাঞ্ছিতায় দারিদ্র্যদুঃখ-দহনায় নমঃ শিবায়।'

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে! হে স্থাণুবৎ নিশ্চল, পরাবাকপতি গিরীশ! হে মহেশ গিরিজেশ, ভীতজনের ভয়ত্রাতা, সংসার-দুঃখগহনাৎ জগদীশ রক্ষ। হে পার্বতী-হৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে, হে ভূতাধিপ প্রমথনাথ, হে বামদেব ভবরুদ্র, রুদ্রে পিনাকপাণি, হে সর্বপ্রাণীশ্বর, সংসারদুঃখের দুর্গম অরণ্য থেকে উদ্ধার করো। হে নীলকণ্ঠ বিশ্বনাথ শিবশঙ্কর, হে ধূর্জটি ব্যোমকেশ, হে ভস্মাঙ্গরাগ, নরকপাল-মাল, হে মৃত্যুঞ্জয় শক্তিনাথ, হে বিশ্ববন্দ্য, করুণাময় দীনবন্ধু, সংসারদুঃখনহনাৎ জগদীশ রক্ষ।

পশ্চিমে ধর্মপ্রচারের পর স্বামীজির স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে রামনাদের রাজা পাম্বানে চল্লিশ ফুট উঁচু একটি স্তম্ভ স্থাপন করলেন। তাতে 'সত্যমেব জয়তে' এই বেদবাক্য খোদিত হল। আরও লেখা হল 'পাশ্চাত্য দেশে বেদান্ত ধর্মপ্রচারে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ইংরেজ শিষ্যদের সহ ভারতভূমির যে স্থানে প্রথম পদার্পণ করেন, সেই স্থাননির্দেশের হেতু রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি কর্তৃক এই স্মৃতিস্তম্ভ প্রোথিত হল। ১৮৯৭, ২৭শে জানুয়ারি।'

পাম্বান থেকে রামনাদ।

রামনাদে স্বামীজি রাজগুরুরূপে সম্বর্ধনা পেলেন। রাস্তার দু ধারে মশাল জ্বলল, উড়ল হাউই, সুরু হল তোপধ্বনি। বিলিতি ব্যান্ডে বাজল ইংরিজি গান—'হের ঐ সমাগত জয়ী মহাবীর।' এবার আর শকটে নয়, শিবিকায় চললেন স্বামীজি। পুরোভাগে রাজা স্বয়ং চলল নগ্ন পায়ে।

আবার অভিনন্দন, আবার প্রতিভাষণ।

অভিনন্দনে স্বামীজিকে সম্বোধন করা হল, শ্রীপরমহংস যতিরাজ দিগ্বিজয়-কোলাহল সর্বমতসম্প্রতিপন্ন পরমযোগেশ্বর শ্রীমদ্ভগবচ্ছ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসকরকমলসঞ্জাত রাজাধিরাজসেবিত শ্রীবিবেকানন্দস্বামী পূজ্যপাদেষু—

তারপর বলা হল : 'স্বামিন, আমরা এই প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান সেতুবন্ধ রামেশ্বর বা রামনাথপুরম বা রামনাদের অধিবাসী আপনাকে আমাদের এই মাতৃভূমিতে সাদরে স্বাগত সম্ভাষণ করি। যেস্থান শ্রীভগবান রামচন্দ্রের পদার্পণে পবিত্র হয়েছে সেই স্থানে ভারতে আপনার প্রথম পদার্পণের সময় আমরাই যে সর্বাগ্রে আপনাকে আমাদের প্রণাম নিবেদন করতে পারছি এতে আমরা কৃতকৃতার্থ।'

প্রতিবেদনে স্বামীজি বললেন,

'সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন শব চোখ মেলে জেগে উঠছে। হিমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়ু তার শিথিল অস্থিমাংসে জীবনসঞ্চার করছে। আমাদের হিমালয় কিসের আলয়? জ্ঞান ভক্তি কর্মের অনন্ত আলয়। তার প্রতি শৃঙ্গে বেজে উঠেছে আবার সেই প্রাচীন বাণী, আমাদের প্রতি গৃহে প্রতি হৃদয়ে তা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

কুম্ভকর্ণের দীর্ঘ নিদ্রা ভাঙছে এতদিনে। কোনো বাহ্যশক্তিরই সাধ্য নেই আর আমাদের গতিরোধ করে।

ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, মূল ভিত্তি, প্রাণকেন্দ্র। অন্যেরা রাজনীতির কথা বলুক, বলুক ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা, ভোগসর্বস্বতার কথা। হিন্দুরা এসব বোঝে না, চায়ও না বুঝতে। তাদের কাছে ঈশ্বরের কথা বলুন, বলুন আত্মার কথা, মুক্তির কথা—অন্যান্য দেশের তথাকথিত দার্শনিকের চেয়ে আমাদের দেশের হীনতম কৃষকও এ সব ভালো বোঝে, বেশি বোঝে। জগৎকে শেখাবার মত আমাদেরও কিছু আছে। আছে বলেই শত অত্যাচারে সহস্র বৎসর ধরে বৈদেশিক শাসনে ও পীড়নে থেকেও এই জাতি এখনো বেঁচে আছে। এই জাতি এখনো বেঁচে আছে কারণ এখনো এই জাতি ঈশ্বর ও ধর্মরূপ মহারত্নকে ত্যাগ করেনি।

এখন প্রশ্ন, জগতের কাছে আমাদের কিছু শেখবার আছে কিনা। হ্যাঁ, আছে, সে হচ্ছে বহির্বিজ্ঞান শিক্ষা। কী ভাবে দল গঠন ও পরিচালন করতে হয়, বিভিন্ন শক্তিকে কী করে প্রণালীবদ্ধভাবে কাজে লাগাতে হয়, কী করে অল্প চেষ্টায় অধিক ফল লাভ করতে হয় তা শিখতে হবে। তবু বলি ভোগবাদ নয়, ত্যাগবাদই ভারতের আদর্শ। কিন্তু সংসারী মানুষ যতদিন না সমর্থ হচ্ছে ততদিন সে ভোগ-চেষ্টায় যত্নপর হতে শিখুক। যে দরিদ্র তাকে সংসারের সুখ কিছু ভোগ করতে দাও। কিন্তু এ যদি কেউ বলে ভারতে ভোগসুখই পরম পুরুষার্থ, জড়জগৎই ভারতবাসীর ঈশ্বর, তাহলে আমি বলব সে মিথ্যাবাদী। ভোগের ব্যবস্থা কেন ? শুধু এ তত্ত্ব বোঝবার জন্যে যে সংসার অসার, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, আত্মাই একমাত্র সত্য, ধর্মই একমাত্র সত্য।

সন্ন্যাসীর নিয়মে সমাজকে বাঁধতে গিয়েই দেশ দরিদ্র হয়েছে। না, ভোগ থাকুক কিন্তু ত্যাগের মুকুট পরে। দারিদ্র্য মোচন করো কিন্তু অন্তরে রাখো সেই বৈরাগ্যের দীনতা যা কিনা প্রণামের লাবণ্য দিয়ে ভরা। যা কিছুই শেখ না কেন, তোমার ধর্মের নিচে ঈশ্বরের নিচে তার স্থান দিও।'

'আমরা হিন্দুরা,' আবার বলছেন স্বামীজি, 'অজ্ঞ হতে পারি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হতে পারি, কিন্তু আমাদের একটা বিশ্বাস আছে। সেই জোরে দাঁড়াতে পারি নিজের পায়ে, কিন্তু আমাদের দেশের সাহেবি ভাবাপন্ন লোকগুলো একেবারে মেরুদণ্ডহীন, চারদিক থেকে কতগুলো এলোমেলো ভাব নিয়ে বদহজমের খিচুড়ি বানিয়ে তুলেছে। তাদের সংস্কার-কাজের গূঢ় কারণ কী জানো ? আমাদের হর্তাকর্তাবিধাতা ইংরেজ কিসে তাদের পিঠ চাপড়ে দুটো বাহবা দেবে এই তাদের সর্বকার্যের অভিসন্ধির মূল। সে যে সমাজ-সংস্কারে অগ্রসর হয়, আমাদের সামাজিক প্রথাকে আক্রমণ করে, তার কারণ ঐ সব আচার সাহেবদের মতবিরুদ্ধ। কেন আমাদের প্রথাগুলো কু ? কারণ সাহেবেরা তাই বলে থাকে। এই মানসিকতা আমি সহ্য করতে পারি না। বরং নিজের যা আছে তা নিয়ে নিজের জোরের উপর থেকে মরে যাও, তবু পরের ঘরের দাস হয়ো না। যদি জগতে কিছু পাপ থাকে তবে দুর্বলতাই সেই পাপ। দুর্বলতাই হীনতম মৃত্যু।

ব্যতিক্রম কি নেই ? আছে—পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিতদের মধ্যে আদর্শ পুরুষও আছেন, যাঁরা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন, দু-জাতের ভালোটাকে নিয়েছেন, মন্দটাকে বাদ দিতে দ্বিধা করেন নি। মনু মহারাজ কী বলেছেন ?

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥

শ্রদ্ধাপূর্বক নীচ ব্যক্তির থেকেও শুভকরী বিদ্যা গ্রহণ করবে। নীচ জাতির থেকেও শ্রেষ্ঠ ধর্মের উপদেশ নেবে আর বিবাহের জন্যে হীন কুল থেকেও নেবে স্ত্রীরত্ন।

মনু মহারাজ তার সংহিতায় আরো বলেছেন—ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে। শুধু ব্রাহ্মণ নয়, আমি বলি পবিত্র ভারতভূমিতে যে কোনো নরনারী জন্মগ্রহণ করে, তারই জন্মগ্রহণের কারণ ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে—ধর্মরূপ ধনভাণ্ডারের রক্ষা। যেমন গানে একটি প্রধান স্বর থাকে, অন্যান্য স্বরগুলি তার অধীন ও অনুগত থাকে, তেমনি আমাদের জীবনে ধর্মই সেই মূল স্বর আর সব বিষয় তারই আশ্রিত, তারই অনুগামী। হিন্দুর যদি ধর্ম যায় তাহলে তার জাতীয় সৌধ কোন ভিত্তির উপর নির্মিত হবে?'

রামনাদ থেকে স্বামীজি চললেন মাদ্রাজের দিকে।

রামনাদ থেকে মেরী হেলকে চিঠি লিখছেন স্বামীজি: 'পরিবেশ আশ্চর্যরূপে আমার অনুকূল হয়ে আসছে। জাহাজ থেকে প্রথম নেমেছি কলম্বোতে, এখন ভারতবর্ষের দক্ষিণতম ভূখণ্ডে, রামনাদে, সেখানকার রাজার অতিথিরূপে বাস করছি। কলম্বো থেকে রামনাদ—আমার অভিযান একটা বিরাট শোভাযাত্রা—হাজার-হাজার লোকের ভিড়, মশাল, আতসবাজি—কত মানপত্র! ভারতে আমার পদার্পণ-ভূমিতে চল্লিশ ফুট উঁচু স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি হচ্ছে। রামনাদের রাজা তাঁর অভিনন্দন-পত্রটি একটি সুন্দর সোনার বাক্সে করে আমাকে দিয়েছেন, তাতে আমাকে 'মহাপবিত্রস্বরূপ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। মাদ্রাজ ও কলকাতা আমার জন্যে আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে, বুঝতে পারছি সেখানেও চলেছে সম্মানের অর্ঘ্য সাজানো। সুতরাং, মেরী, তুমি দেখতে পাচ্ছ আমি আমার অদৃষ্টের তুঙ্গতম শিখরে এসে উঠেছি, কিন্তু তোমাকে কী বলব, আমার মন শিকাগোর সেই বিশ্রামভরা নিস্তব্ধ দিনগুলোর দিকেই ছুটে চলেছে—কী শান্তিতে ভরা প্রেমে ভরা সেই দিনগুলো! মনে পড়ল আর তোমাকে চিঠি লিখতে বসলাম।'

মাদ্রাজের পথে স্বামীজি পরমকুড়িতে নামলেন। পরমকুড়ি থেকে মনমাদুরায়, পরে মাদুরায়। সর্বত্রই অভিনন্দন, সর্বত্রই স্বামীজির বজ্রঘোষণ বক্তৃতা। বাক্য শুধু উদ্দীপক নয়, বাক্য সদর্থসম্পন্ন।

পরমকুড়িতে স্বামিজী বললেন:

'জগতে দুটো আলাদা ভিত্তির উপর সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা হয়েছে—এক ধর্মভিত্তিক, আরেক প্রয়োজনভিত্তিক। একটি আধ্যাত্মিকতা, আরেকটি জড়বাদ। একটি অতীন্দ্রিয়বাদ, আরেকটি প্রত্যক্ষবাদ। একটি জড়জগতের সীমার বাইরে দৃষ্টিপাত করে, সংসারের সঙ্গে সংস্রব রাখে না, আরেকটি শুধু জড়ের উপরেই জীবনকে দৃঢ় করতে চায়। মাত্র একটি দিয়েই সম্পূর্ণ কল্যাণ হবে না, দুয়ের সমন্বয় করতে হবে। জড়বাদে পার্থিব উন্নতির সমারোহ হবে সন্দেহ নেই কিন্তু তাতেই নিমগ্ন হয়ে থাকলে আবার হাহাকার উঠবে, এ সব কী করলুম, সবই যে বৃথা হল। ধর্ম সহায় না হলে, ক্রমশ জড়বাদের গভীর আবর্তে মজ্জমান জগতের ত্রাণে ধর্ম এগিয়ে না এলে জগতের ধ্বংস অনিবার্য।

তেমনি আবার আধ্যাত্মিকতার একাধিপত্যে জনজীবনের দুর্গতি। তখন আবার পুরোহিতদের অত্যাচার, তারাই তখন সর্বসাধারণের ঘাড়ে চড়ে প্রভুত্ব খাটায়। তখন সেই

নির্যাতনকে শাসন করবার জন্যে জড়বাদের প্রয়োজন। তাই অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদ পরস্পর পরস্পরকে শাসনে রাখবে, পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণতা দেবে। ঐন্দ্রিয়িক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের পরম সামঞ্জস্যেই অখণ্ড মানুষ।'

তারপর স্বামীজি এলেন বেদান্তে :

'বিশ্বাসই বেদান্ত—জীবাত্মার সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস। হিন্দু জৈন বৌদ্ধ সকলেই স্বীকার করেন আত্মা সর্বশক্তির আধারস্বরূপ। কেউ বলে না শক্তি পবিত্রতা বা পূর্ণতা বাইরে থেকে লাভ করতে হয়। ওগুলো আমাদের জন্মগত অধিকার—আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ। তুমি যথার্থ যা, তা তুমি অনাদিকাল থেকেই পরিপূর্ণ। আত্মসংযম করতে তোমার বাইরের সাহায্যের দরকার নেই, তুমি অনাদিকাল থেকেই পূর্ণ সংযমী। শুধু অবিদ্যাই জানতে দিচ্ছে না, অবিদ্যাই অজ্ঞান—সমস্ত অনিষ্টের মূল। ভগবান ও মানুষ, সাধু ও পাপীতে প্রভেদ কিসে? শুধু অজ্ঞানে। ক্ষুদ্র কীটের মধ্যেও অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত পবিত্রতা, এমন কি সাক্ষাৎ অনন্ত ভগবান আছেন। অব্যক্তভাবে আছেন, তাঁকে ব্যক্ত করতে হবে। ভারত এই মহাসত্যই জগৎকে শেখাবে—কারণ এ আর কোথাও নেই। এই আধ্যাত্মিকতা, এই আত্মবিজ্ঞান।

কোন শক্তিতে মানুষ উঠে দাঁড়াবে? শুধু বীর্যে—বীর্যই সাধুত্ব, দুর্বলতাই পাপ। যদি উপনিষদে এমন কোনো শব্দ থাকে যা বজ্রবেগে অজ্ঞানপিণ্ডের উপর পড়ে তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে, তা অভীঃ। যদি জগৎকে কোনো ধর্ম শেখাতে হয় তা এই অভীঃ। ভয়ই পাপ, ভয়ই সমস্ত পতনের কারণ। এ ভয় আসে কোত্থেকে? আত্মার স্বরূপজ্ঞানের অভাব থেকেই এ ভয়ের উদ্ভব। যিনি রাজার রাজা মহারাজা তুমি তাঁর উত্তরাধিকারী। শুধু তাই নয়, অদ্বৈতবাদে তুমি স্বয়ং ব্রহ্ম। স্বরূপ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে নিজেকে ক্ষুদ্র মানুষ ভাবছ, ভেদজ্ঞানে আমি বড় তুমি ছোট ভেবে বিভ্রান্ত হচ্ছ। আসলে তুমিও ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম। আত্মার মধ্যেই যে সকল শক্তি সন্নিহিত—ভারত জগৎকে এই মহাশিক্ষা দেবে। হৃদয়ে এই তত্ত্ব ধারণ করলে তোমার কাছে জগৎ আরেক ভাবে, আরেক অর্থে প্রতিভাত হবে। আগে তুমি নরনারী ও অন্যান্য প্রাণীদের যে চোখে দেখতে, এখন তাদের অন্য চোখে দেখবে। তখন এ পৃথিবী আর দ্বন্দ্বক্ষেত্ররূপে প্রতীয়মান হবে না। তখন আর এ বোধ হবে না যে পৃথিবীতে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দুর্বলের ওপর বলবানের জয়লাভের জন্যেই মানুষের জন্ম। তখন বোধ হবে এ পৃথিবী আমাদের খেলবার জায়গা, স্বয়ং ভগবান বালকের মত এখানে খেলছেন, আর আমরা তাঁরই খেলার সহচর, বলতে পারো, তাঁর কাজের সহায়ক। যতই ভয়ঙ্কর, যতই বীভৎস বোধ হোক, এ খেলামাত্র। আমরা ভুল করে এই খেলাকে একটা ভয়ংকর ব্যাপার বলে ভাবছি। যখন আমরা আত্মার স্বরূপ জানতে পারি, তখন অতি দুর্বল হতভাগ্য, অতি অধম পাপীর হৃদয়েও আশার আলোর সঞ্চার হয়। শাস্ত্র বারো-বারেই বলছে, নিরাশ হয়ো না—তোমার প্রকৃতি শুদ্ধ। তোমার স্বরূপ অব্যক্তভাবে আছে মাত্র, একদিন সে পরিপূর্ণ তেজে উদ্ঘাটিত হবে। বেদান্ত এই আত্মার সংবাদ দেয়, কাউকে অভাজন বলে ত্যাগ করে না। কাউকে ভয় দেখিয়ে ধর্ম করায় না। বেদান্তে শয়তান নেই। সে এ কথা বলে না যে শয়তান তোমাকে সতর্ক চোখে লক্ষ্য করছে, একবার হোঁচট খেয়েছ কী, তোমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে।

বেদান্তে বিশুদ্ধ কর্মবাদ। বেদান্ত বলে, অদৃষ্ট তোমার নিজের হাতে। তোমার

নিজের কর্মই তোমার এই শরীর গঠন করেছে, অন্য কেউ তোমার হয়ে শরীর গঠন করেনি। তুমি যে সব সুখ-দুঃখ ভোগ করছ তার জন্যে তুমিই দায়ী। ভুলেও ভেবো না তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বে তোমাকে সংসারে আনা হয়েছে, রাখা হয়েছে ভয়াবহ অবস্থায়। তুমি জানো তুমিই ধীরে ধীরে তোমার জগৎ রচনা করেছ, এখনো করছ। তুমি নিজেই আহার করো, তোমার হয়ে আর কেউ তা করে না। তুমি যা আহার করো তার সারভাগ তুমিই শরীরে শোষণ করে নাও, তোমার হয়ে আর কেউ তা করে না। ঐ খাদ্য থেকে তুমিই রক্ত মাংস তৈরি করো, তোমার হয়ে আর কেউ তা করে না। ভালোমন্দের সমস্ত দায়িত্বই তোমার। এই-ই তো মহা ভরসার কারণ। আমি যা করছি আমিই আবার তা ভেঙে ফেলতে পারি, গড়তে পারি নতুন করে।

যদিও আমাদের শাস্ত্রে কঠোর কর্মবাদ রয়েছে তবুও তা ভগবৎকৃপা অস্বীকার করে না। আমাদের শাস্ত্রে বলে, ভগবান শুভাশুভরূপী এই ঘোর সংসারপ্রবাহের অপর পারে আছেন। তিনি বন্ধনশূন্য নিত্যদয়াময়, জগতের ত্রিতাপজর্জর নরনারীকে সংসার-সাগরের পরপারে নিয়ে যাবার জন্যে সর্বদাই বাহু প্রসারিত করে আছেন। তাঁর দয়ার সীমা নেই। আর রামানুজ বলে, বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির কাছেই এই দয়ার আবির্ভাব ঘটে।'

আর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, ভগবানের কৃপায় কী না হয়? অসম্ভবও সম্ভব হয়। হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো আসে, সে কি একটু একটু করে আসবে? একেবারে ঘর আলোকিত হবে। কৃপা হলে একমুহূর্তে অষ্টপাশ চলে যেতে পারে। সব গেরো খুলে যায় নিমেষে। তাঁর কৃপা হলে আর ভয় নেই। বাপের হাত ধরে গেলেও বরং ছেলে পড়তে পারে কিন্তু ছেলের হাত যদি বাপ ধরে তাহলে আর ভয় নেই। তবে তাঁকে পাবার জন্যে খুব ব্যাকুল হয়ে ডাকতে-ডাকতে সাধন করতে-করতে তবে কৃপা হয়।

৬৯

পরমকুড়ি থেকে স্বামীজি মনমাদুরায় এলেন।

সেখানেও তাঁকে অভিনন্দন জানানো হল। পশ্চিমের উদরসর্বস্ব জড়বাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্যে।

অভিনন্দনের উত্তরে এবার কিছু কড়া কথা শোনালেন স্বামীজি :

ওরা তো উদরসর্বস্ব, কিন্তু আমরা কী? আমরা এখন আর বৈদান্তিক নই পৌরাণিক নই, তান্ত্রিকও নই। আমরা এখন শুধু ছুঁৎমার্গী। আমাদের ধর্ম এখন রান্নাঘরে। ভাতের হাঁড়ি আমাদের ঈশ্বর, আর আমাদের মন্ত্র, ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না। বেশি দিন এ ভাব চললে মস্তিষ্কবিকৃতির জন্যে আমাদের প্রত্যেককে পাগলা গারদে যেতে হবে।

অথচ আমাদের ধর্ম কী উদার, কী অগাধ তার ধনভাণ্ডার! সমগ্র জগৎ এই ভাণ্ডার থেকে সাহায্য পাবার জন্যে উৎসুক হয়ে আছে। সে-ধন সমস্ত জগৎকে বিলিয়ে দিতে হবে। তা না হলে জগৎ দরিদ্র হয়ে যাবে, পরম খাদ্য ও পুষ্টির অভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং বিতরণে বিলম্ব কোরো না। মহাবীর্যের সঙ্গে ধর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।

ব্যাস বলেছেন, কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম, তার মধ্যে ধর্মদান সর্বশ্রেষ্ঠ দান। তারপরে বিদ্যাদান, তার নিচে প্রাণদান—সর্বনিকৃষ্ট দান অন্নদান। অন্নদান আমরা যথেষ্ট করেছি, আমাদের মত দানশীল জাতি আর নেই। এখানে ভিক্ষুকের কাছেও যতক্ষণ একখানা রুটি থাকবে সে তার অর্ধেক দান করবে। এখন আমাদের আর দুই দানে অগ্রসর হতে হবে—ধর্মদান আর বিদ্যাদান।'

শেষে বললেন, 'আমি একটা নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী ঠিক করেছি—যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, যদি আমার শরীর থাকে, তবে সংকল্পিত বিষয়গুলি কার্যে পরিণত করার ইচ্ছা আছে। জানি না আমি কৃতকার্য হব কিনা, তবে একটা মহান আদর্শ নিয়ে তাতেই মন-প্রাণ নিয়োগ করে কাজ করে যাওয়াই জীবনের এক উচ্চ সার্থকতা। তা না হলে এ ক্ষুদ্র পশুজীবনযাপনে ফল কী?'

মনমাদুরা থেকে মাদুরায় এলেন স্বামীজি।

মাদুরার হিন্দু অধিবাসীরা স্বামীজিকে অভিনন্দন জানাল :

আমরা আপনার মধ্যে হিন্দু সন্ন্যাসীর জীবন্ত উদাহরণ দেখছি। আপনি সংসারের সমস্ত বন্ধন ও আসক্তি ছিন্ন করে মহান পরহিতব্রতে নিযুক্ত হয়েছেন—সে ব্রত সমগ্র মানবজাতির উন্নতিসাধন। বাহ্যিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে যে হিন্দুধর্মের অচ্ছেদ্য কোনো সম্পর্ক নেই, শুধু উন্নত দার্শনিক ধর্মই ত্রিতাপদগ্ধ জীবনকে পরমতম শান্তি দিতে পারে তাই আপনি আপনার জীবনে প্রমাণিত করেছেন। পাশ্চাত্য দেশগুলিকে যে সেই ধর্ম ও দর্শনকে শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছেন এ আপনার কীর্তি। আপনার বক্তৃতা এ দেশেও বিদেশাগত জড়বাদের প্রভাবকে সংকুচিত করবে। ভারতবর্ষ যে আজও বেঁচে আছে তার কারণ তাকে সমগ্র বিশ্বের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনরূপ মহাব্রত সাধন করতে হবে, আর তারই পুরোধারূপে আপনার আবির্ভাব।

প্রতিভাষণে স্বামীজি বললেন :

'আমাদের দুই পথের মাঝামাঝি চলতে হবে। এক দিকে কুসংস্কারপূর্ণ সমাজ, অন্য দিকে জড়বাদ, ইউরোপিয় ভাব, নাস্তিকতা, তথাকথিত সংস্কার যা পাশ্চাত্য জগতের উন্নতির মূল ভিত্তি পর্যন্ত প্রবিষ্ট। এ দুয়ের থেকেই আমাদের সাবধান হতে হবে। প্রথমত আমরা কখনো সাহেব হতে পারব না, সুতরাং ওদের অনুকরণ বৃথা। কালের প্রারম্ভ থেকে মানবজাতির ইতিহাসের লক্ষ লক্ষ বছর ধরে একটি নদী হিমালয় থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে। তুমি কি তাকে তার উৎপত্তিস্থান হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গে ফিরিয়ে নিতে চাও? তা যদি বা সম্ভব হয়, তবুও তোমাদের পক্ষে ইউরোপিয় ভাবাপন্ন হয়ে যাওয়া অসম্ভব। ইউরোপিয়দের পক্ষে যদি কয়েক শত শতাব্দীর শিক্ষা সংস্কার ত্যাগ করা অসম্ভব মনে কর, তবে তোমাদের পক্ষে শত-শত শতাব্দীর সংস্কার বিসর্জন দেওয়া কিরূপে সম্ভব হবে?

আমাদের মনে রাখতে হবে সাধারণত যাকে আমাদের ধর্মবিশ্বাস বলি তা আমাদের নিজেদের ক্ষুদ্র গ্রাম্য দেবতাকে নিয়ে, তা ক্ষুদ্র কুসংস্কার বা দেশাচার মাত্র। এমনি দেশাচার সংখ্যাতীত, পরস্পর-বিরোধী। এর মধ্যে কোনটা মানব, কোনটা মানব না, কে বলে দেবে? দাক্ষিণাত্যের এক ব্রাহ্মণ আরেক ব্রাহ্মণকে একটুকরো মাংস খেতে দেখলে ভয়ে দু শো হাত পিছিয়ে যাবে। আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণ কিন্তু মহাপ্রসাদের ভক্ত, পুজোর জন্যে সে অনায়াসে ছাগবলি দিচ্ছে। তুমি তোমার দেশাচারের দোহাই দেবে, সে তার

দেশাচারের দোহাই দেবে। প্রত্যেক দেশাচারই স্থানবিশেষে আবদ্ধ। শুধু অজ্ঞ মানুষেরা তাদের নিজের পল্লীতে প্রচারিত আচারকেই ধর্মের সার বলে মনে করে। এ এক বিরাট ভ্রান্তি ছাড়া আর কী।

প্রথার বদল আছে, ধর্মের বদল নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে, বেদই চিরন্তন সত্য, আমাদের চরম লক্ষ্য। যদি কোনো স্মৃতি বা পুরাণ কোনোরূপে বেদের বিরোধী হয় তবে তা আমাদের নির্মম ভাবে ত্যাগ করতে হবে। কোনো সামাজিক প্রথার পরিবর্তন হচ্ছে বলে ধর্ম গেল এমন কথা মনে কোরো না। এই ভারতে এমন সময় ছিল যখন গোমাংস ভোজন না করলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকত না। বেদপাঠ করলে দেখবে কোনো বড় সন্ন্যাসী বা রাজা বা সম্ভ্রান্ত পুরুষ এলে ছাগ ও গো-হত্যা করে তাদের খাওয়ানোর প্রথা ছিল। ক্রমশঃ সকলে বুঝল, আমরা প্রধানত কৃষিজীবী। এই ভাবে ষাঁড় মেরে ফেললে সমস্ত জাতিই ধ্বংস হবে। সেই কারণে গো-হত্যা প্রথা রহিত করা হল—গো-হত্যা মহাপাতক বলে গণ্য হল। প্রাচীন শাস্ত্রপাঠে আমরা আরো দেখি এমন সব আচার প্রচলিত ছিল যা এখন আমাদের বিবেচনায় বীভৎস। বেদ যুগে-যুগে একই থাকবে, স্মৃতিই যুগ-প্রয়োজনে বারে-বারে বদলে যাবে। তাই বলে প্রাচীন আচারগুলোকে নিন্দা করতে যেও না, না, একান্ত কুৎসিতগুলোরও না। এখন যে প্রথাগুলোকে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অনিষ্টকর বলে ভাবছ, অতীতকালে সেগুলোই সাক্ষাৎসম্বন্ধে জীবনপ্রদ ছিল। ওদের দ্বারাই জাতীয় জীবন রক্ষা করা গেছে, সুতরাং ওদেরকেও মূল্য দাও।

আর এ কথা মনে রেখো, কোনো রাজা বা কোনো সেনাপতি কোনোকালে আমাদের সমাজের নেতা ছিল না। ঋষিরাই চিরকাল আমাদের নেতা। ঋষি কে? যিনি ধর্মকে সাক্ষাৎকার করেছেন, যাঁর নিকট ধর্ম শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, বাগবিতণ্ডা বা তর্কযুদ্ধ নয়—সাক্ষাৎ উপলব্ধি, অতীন্দ্রিয় সত্যের সাক্ষাৎকার—তিনিই ঋষি। উপনিষদ বলেছেন তিনিই মন্ত্রদ্রষ্টা। এই ঋষিত্বলাভ কোনো দেশ কাল জাত বা সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করে না। ঋষি বাৎস্যায়ন বলছে, সত্যের সাক্ষাৎকার করতে হবে, আর সর্বদা মনে রাখতে হবে, তোমাকে আমাকে সকলকেই ঋষি হতে হবে, অগাধ আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন হতে হবে, আমরাই সমস্ত জগৎকে শক্তিমান করে তুলব। কারণ সর্বশক্তির আধার যে আমরাই।

মীনাক্ষী-মন্দিরে গেলেন স্বামীজি। মীনাক্ষী দেবী ও সুন্দরেশ্বর শিবকে দর্শন করলেন।

মীনাক্ষী পঞ্চরত্ন মনে করো।

যিনি শ্রীবিদ্যারূপিণী, মহাদেবের বামপার্শ্বে অবস্থিতা, হ্রীংকার মন্ত্রে যিনি সমুজ্জ্বলা, শ্রীচক্রাঙ্কিত বিন্দুমধ্যে যাঁর বসতি, যিনি শ্রীমৎ-সভার নায়কী, যিনি ষণ্মুখ ও বিঘ্নরাজজননী, যিনি শ্রীমতী জগন্মোহিনী, সেই কৃপাসাগরী দেবী মীনাক্ষীকে—লোহিতাক্ষীকে—সতত প্রণাম করি।

যিনি শিবসুন্দর-নায়কী, ভয়হরা, জ্ঞানপ্রদা, নির্মলা, শ্যামাভা, কমলাসন ব্রহ্মা কর্তৃক অর্চিতপদা, নারায়ণের অনুজা, বীণাবেণু-মৃদঙ্গবাদ্যরসিকা, নানাবিধ আড়ম্বর-পরায়ণা, সেই কারুণ্যবারিনিধি দেবী মীনাক্ষীকে সর্বদা প্রণাম করি।

নানা যোগী এবং মুনিশ্রেষ্ঠের হৃদয়ে যিনি বাস করেন, নানা বিষয়ে যিনি সিদ্ধি প্রদান করেন, যাঁর পদযুগলে নানা পুষ্প বিরাজিত, শ্রীনারায়ণের দ্বারা যিনি অর্চিতা,

নাদব্রহ্মময়ী, পরাৎপরতরা, নানার্থ-তত্ত্বাত্মিকা, সেই করুণাবরুণালয়া দেবী মীনাক্ষীকে সতত প্রণাম করি।

তারপর এই দেখ জগদ্দীপাকার সুন্দরেশ্বর শিব।

হে বিরূপাক্ষ, তোমাকে প্রণাম, হে দিব্যচক্ষু, তোমাকে প্রণাম। পিণাকহস্ত, বজ্রহস্ত, ত্রিশূলহস্ত, দণ্ডপাশাসিপাণি, তোমাকে প্রণাম। হে ঈশান, হে শাশ্বত, হে শ্মশান, হে সুশ্বেত-সুবক্ত্র, হে শ্বেতশিখা, তোমাকে প্রণাম। তুমি সৌরাষ্ট্রে সোমনাথ, শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুন, উজ্জয়িনীতে ওঙ্কার-অমলেশ্বর, হিমালয়ে কেদার, দারুকাবনে নাগনাথ, গৌতমীতটে ত্র্যম্বক, বারাণসীতে বিশ্বনাথ, সেতুবন্ধে রামেশ্বর, হে সংসার-সমুদ্রসেতু, তোমাকে প্রণাম।

এবার কুম্ভকোণম-এর দিকে সন্ধ্যার ট্রেনে যাত্রা করছেন স্বামীজি। যে স্টেশনেই ট্রেন থামে সেখানেই স্বামীজিকে দেখবার জন্যে ভিড়, সহৃদয় অভ্যর্থনার আয়োজন। সবখানেই কিছু না কিছু বলবার অনুরোধ। যদি কিছু নাও বলেন, শুধু আমাদের চোখের সামনে দাঁড়ান, আপনাকে দেখেই আমরা ঈশ্বরকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় আগুন হয়ে উঠি।

রাত্রে আর ঘুম হল না, শেষ রাতে চারটের সময় ট্রেন যখন ত্রিচিনপল্লীতে দাঁড়াল, তখন স্বামীজি বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে গেলেন, এত রাত্রেও হাজার-হাজার লোকের সমাগম হয়েছে। কী দেখবে? কী শুনবে? যদি কাউকে দেখবার থাকে সে হচ্ছে সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম, যদি কিছু শোনবার থাকে তা হচ্ছে তোমার বিবেকের বাণী, তোমার সত্তার আদিম নির্ঘোষ। তুমিই সেই, তুমিই একমাত্র।

কুম্ভকোণম-এ বিরাটকায় জনতা স্বামীজিকে বন্দনা করল।

স্বামীজি বললেন, 'গীতাকার বলেছেন, স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। অল্পমাত্রও কোনো ধর্মকর্ম করলে মহৎ ফললাভ হয়। এ আমার ক্ষুদ্র জীবনে বারে বারে প্রত্যক্ষ করেছি। নইলে আমি কী একটু সামান্য কাজ করেছি, তার জন্যে আমাকে নিয়ে পথে পথে এত আনন্দোচ্ছ্বাস। এ আমার স্বপ্নের অতীত। কিন্তু আসলে এ হিন্দু সংস্কারেরই উপযুক্ত নিদর্শন। কেননা হিন্দুর জীবনীশক্তিই ধর্ম। ধর্মই তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস। তার গৃহবাসের ভিত্তি। তার সোজা হয়ে দাঁড়াবার মেরুদণ্ড।

বিরুদ্ধবাদীরা অভিযোগ করে, হিন্দুধর্ম দিয়ে সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হয় না, কাঞ্চনলাভ হয় না, সমগ্র জাতিকে দস্যুতে পরিণত করা যায় না। এ ধর্মে গরিবের ঘাড়ে পড়ে বলবানের রক্তপানের প্ররোচনা নেই। পরের সর্বনাশসাধনের জন্যে যত্রতত্র সৈন্য-প্রেরণেরও ব্যবস্থা নেই। তাই তারা প্রশ্ন করে, এ ধর্মে আছে কী? যখন এর অস্ত্রের জোর নেই, যখন এ চলতি কলে শস্য জুগিয়ে কাজ আদায় করতে জানে না তখন একে দিয়ে কী হবে? তারা বোঝে না ঐ যুক্তিতেই আমাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হচ্ছে। আমাদের ধর্মের লক্ষ্য সাংসারিক ভোগসুখ নয়, ব্রহ্মলাভ, সুতরাং এতেই আমাদের ধর্ম শ্রেষ্ঠ। আমাদের ধর্মই সত্যধর্ম, কেননা এ বলতে পেরেছে, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। আমাদের ধর্মই বলতে পেরেছে, কাঞ্চন লোষ্ট্র বা ধূলির তুল্য। বলতে পেরেছে, ইন্দ্রিয়-ভোগ অস্থায়ী, বিনাশই তার পরিণাম। সুতরাং এ ইন্দ্রিয়সুখের বাসনা ত্যাগ করো। ত্যাগই আমাদের চরম লক্ষ্য মুক্তির সোপান—ভোগ নয়। এ জন্যেই আমাদের ধর্ম সত্যধর্ম, শ্রেষ্ঠধর্ম!

আমাদের ধর্ম ছাড়া জগতের আর সকল বড় বড় ধর্ম কোনো ধর্ম-প্রবর্তকের জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত—যে জীবনের অর্ধেক ঘটনা লোকে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করে না, আর বাকি অর্ধেকের উপরও তাদের বিশেষ সন্দেহ। আমাদের ধর্ম বিশুদ্ধ কতকগুলি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোনো নর-নারীই বেদের প্রণেতা বলে দাবি করতে পারেন না। বেদে শুধু সনাতন তত্ত্বগুলি লিপিবদ্ধ আছে—ঋষিরা তাদের আবিষ্কর্তা মাত্র। তাঁরা কে ছিলেন, কী করতেন, তাও আমরা জানি না। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের পিতা কে ছিলেন তাও জানা যায় না, জন্মস্থান ও জন্মকাল তো দূরস্থান! ঋষিরা নামের আকাঙ্ক্ষা করতেন না, শুধু তত্ত্ব আবিষ্কার করে উপলব্ধি করে তবে তা প্রচার করেছেন।

আমাদের ঈশ্বর যেমন নির্গুণ হয়ে আবার সগুণ, তেমনি আমাদের ধর্ম যদিও কোনো ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে না, তবুও এতে অনন্ত অবতার ও মহাপুরুষের স্থান হতে পারে। যদি এও প্রমাণিত হয় তাঁরা ঐতিহাসিক নন, তবুও আমাদের ধর্মে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগবে না, যেহেতু কোনো ব্যক্তিবিশেষের উপর এ ধর্ম স্থাপিত নয়, শুধু সনাতন সত্যের উপরেই এ স্থাপিত।

'ইষ্টনিষ্ঠা' বলে যে অপূর্ব বিধি আমাদের ধর্মে প্রচলিত, তাতে অবতারদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করে তাকে আদর্শ করে নিতে তোমাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তুমি যে কোনো অবতারকে তোমার উপাস্যরূপে গ্রহণ করতে পারো, তাকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিলেও কোনো ক্ষতি নেই। যে অবতারই হোন না কেন, বৈদিক সনাতন তত্ত্বের উদাহরণস্বরূপ বলেই তিনি আমাদের মান্য। শ্রীকৃষ্ণের এইই মাহাত্ম্য যে তিনি এই তত্ত্বাত্মক সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক এবং বেদান্তের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যাতা।

বেদান্তই একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম। বেদান্তই বিজ্ঞানসম্মত। বেদান্তই যুক্তিসিদ্ধ। আধুনিক বিজ্ঞান যে সব সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেছে, অনেক শতাব্দী আগে বেদান্ত সেই সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল—শুধু বিজ্ঞান যাকে জড়শক্তি বলছে, বেদান্ত বলছে তাই ব্রহ্ম।

সমস্ত ধর্মমতের তুলনামূলক আলোচনা করে আমরা কী দেখি? দেখি সকল ধর্মই সত্য আর জগতের সকল বস্তু আপাতত বিভিন্ন হলেও একই মূল বস্তুর বিভিন্ন বিকাশমাত্র। এই সত্যই প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের এক ঋষি উপলব্ধি করে প্রচার করেছিলেন—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' জগতে একমাত্র বস্তুই বর্তমান, বিপ্র অর্থাৎ সাধুগণ তাকে নানা ভাবে বর্ণনা করেন। এমন চিরায়ত বাণী আর কখনো উচ্চারিত হয়নি, এমন মহত্তম সত্য আর কখনো আবিষ্কৃত হয়নি। ঐ সত্যই আমরা হিন্দুরা সর্বাংশে ভালোবাসি, তাই আমাদের দেশ পরধর্মে দ্বেষরাহিত্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ মহিমময় ভূমি হয়ে রয়েছে।

জগৎকে এই উদারতা একমাত্র বেদান্তই শেখাতে পারে। এই আপাতপ্রতীয়মান জগতের একত্বভাবেরও পিছনে যে আত্মা আছেন তিনিও একমাত্র। জগদব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র আত্মাই বিরাজমান—সবই সেই একসত্তামাত্র। জগতে আমাদের যদি কিছু প্রাণপ্রদ শিক্ষা দিতে হয় তবে তা এই অদ্বৈতবাদ। ভারতের মূক জনসাধারণের উন্নতির জন্যে এই অদ্বৈতবাদের প্রচার দরকার। এই অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত না হলে আমাদের এই মাতৃভূমির পুনরুজ্জীবনের আর উপায় নেই।

অদ্বৈতবাদই নীতিবিজ্ঞানের মূলভিত্তি। একমাত্র অনন্ত সত্য তোমাতে, আমাতে,

আমাদের সকলের আত্মাতে বর্তমান, এর চেয়ে বড় নীতি আর কী হতে পারে ? তোমাতে আমাতে শুধু ভাই-ভাই সম্বন্ধ নয়—তুমি আর আমি এক। সবরকম নীতি আর ধর্ম-বিজ্ঞানের মূল ভিত্তিই এই একত্ব।

যখন আমি আমেরিকায় ছিলাম, অভিযোগ শুনেছিলাম, আমি অদ্বৈতবাদই বেশি প্রচার করছি, দ্বৈতবাদ বড় করছি না। দ্বৈতবাদের প্রেমভক্তি উপাসনায় যে কী অসীম অপূর্ব পরমানন্দ লাভ হয় তা আমি জানি। কিন্তু এখন আমাদের আনন্দে ক্রন্দন করবার পর্যন্ত সময় নেই। আমরা ঢের কেঁদেছি। কোমলতার সাধন করতে-করতে আমরা জীবন্মৃত হয়ে পড়েছি। আমাদের এখন প্রয়োজন লোহার মত দৃঢ় পেশী, ইস্পাতের মত কঠিন স্নায়ু, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যভেদের সংগ্রামে এগিয়ে যাওয়া। অদ্বৈতবাদের আদর্শই আনতে পারে এই তেজ, এই দৃঢ়তা।

বিশ্বাস, বিশ্বাস—নিজের উপর বিশ্বাস—ঈশ্বরে বিশ্বাস—উন্নতিলাভের এই একমাত্র উপায়। পুরাণের তেত্রিশ কোটি দেবতায় বিশ্বাস আছে, বৈদেশিকেরা মাঝে মাঝে যে সব দেবতা আমদানি করেছে তাতে বিশ্বাস আছে, অথচ তোমার আত্মবিশ্বাস নেই, তোমার কখনোই মুক্তি হবে না। শুধু আত্মবিশ্বাসে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও, বীর্যবলিষ্ঠ হও। হাজার বছর ধরে যে কোনো মুষ্টিমেয় বিদেশী দল আমাদের ভূলুণ্ঠিত দেহকে পদদলিত করতে চেয়েছে, আমরা ত্রিশ কোটি লোক অপ্রতিবাদে তারই পদানত হয়েছি। কেন ? কারণ, ওদের নিজেদের উপর বিশ্বাস আছে, আমাদের তা নেই। এরই জন্যে বেদান্তের অদ্বৈতভাব প্রচার করা দরকার। যাতে লোকের হৃদয় জাগ্রত হয়, যাতে সকলে নিজেদের আত্মার মহিমা জানতে পারে। বুঝতে পারে আত্মার অমেয়ত্ব।

আমাদের দুর্দশার জন্যে আমরাই দায়ী। আমরাই আমাদের জাতিকে নীচ করেছি। শত শত বছর ধরে তাদের দিয়ে শুধু কাঠ কাটিয়েছি আর জল টানিয়েছি। তাদেরকে অবিমিশ্র দারিদ্র্যে রেখে বুঝতে শিখিয়েছি তারা নীচ, তারা দীনহীন। এদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার এরা দুর্বল নয়, নিঃসম্বল নয়, তাদের মধ্যেও সেই অনন্ত আত্মার অধিষ্ঠান। তারাও উন্নত হতে পারে, মহৎ হতে পারে। তাদেরকে শোনাও বেদান্তের বাণী। ওঠো, জাগো, নিজেদের দুর্বল ভেবে যে-মোহে আচ্ছন্ন আছ সে-মোহ দূর করে দাও। নিজের স্বরূপ প্রকাশিত করো, তোমাদের মধ্যে যে ভগবান আছেন তাঁকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করো, তাকে অস্বীকার কোরো না। আত্মা প্রবুদ্ধ হলেই শক্তি আসবে, মহিমা আসবে, সাধুত্ব আসবে, পবিত্রতা আসবে। যদি গীতার মধ্যে কিছু আমার ভালো লাগে, তবে তা এই দুটি শ্লোক—এই দুটি শ্লোকই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের সারস্বরূপ, এই দুটি শ্লোকই মহাবলপ্রদ :

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎ স্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥
সমং পশ্যন হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হি নস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥

অর্থাৎ বিনাশশীল সর্বভূতের মধ্যে যিনি পরমেশ্বরকে সমভাবে অবস্থিত দেখেন তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। কারণ ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখে তিনি আত্মা দ্বারা আত্মার হিংসা করেন না, সুতরাং পরমাগতি প্রাপ্ত হন।

আত্মা সর্বব্যাপী। আত্মা সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত। এই অপরূপ তত্ত্ব দুটির

প্রচার করতে হবে। এই দ্বি-তত্ত্বের প্রচারেই সর্ববিধ কল্যাণ। ভেদবুদ্ধিই অশুভ, অভেদবুদ্ধিই সত্য শিব ও সুন্দর।

আমি সমাজসংস্কারক নই, আমি কেবল 'সর্বভূতে প্রেম করো' এই তত্ত্বের প্রচারক। আমি সমাজের দোষ-সংশোধনের চেষ্টা করছি না, আমি শুধু বলছি, এগিয়ে যাও, বেদান্ত যে পথ দেখিয়ে দিয়েছে সেই পথে এগিয়ে যাও। সমগ্র মনুষ্য জাতির একত্ব ও প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই নিহিত ঈশ্বরত্ব—এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হও। বেদান্তের আলোক প্রত্যেক গৃহে নিয়ে যাও, মানুষের মধ্য থেকে প্রসুপ্ত ঈশ্বরকে জাগ্রত করো।

এই বেদান্তসাধনেই জাতিভেদ দূর হবে। যুগচক্র ঘুরে সত্যযুগের আবির্ভাব ঘটবে। মানুষ ঈশ্বরসাযুজ্য লাভ করবে।

স্বদেশহিতৈষী হও। যে জাতি অতীতকালে আমাদের জন্যে এত বড় বড় কাজ করেছে সেই জাতিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসো। তোমাদের নিন্দার মুখ বন্ধ হোক, খুলে যাক ভালোবাসার হৃদয়।

কুম্ভকোণম থেকে মাদ্রাজের ট্রেন নিলেন স্বামীজি। পথে স্টেশনে তেমনি দুর্বার জনতা। মায়াবরম স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই জনতা সভা করে তাঁকে অভিনন্দন করল। উত্তরে তিনি বললেন, আমি এমন কিছুই বড় কাজ করিনি, শুধু প্রভুর নির্দেশ পালন করেছি মাত্র। কোথাও আমার জয় নয়, সর্বত্র প্রভুর জয়।

পথে জনতা ক্রমশই উদ্বেলতর হতে লাগল। মাদ্রাজের আগের এক স্টেশনে জনতা রেল-লাইনের উপর শুয়ে পড়ল। ট্রেন দাঁড় করাতে হবে। সে কী! এটা থ্রু ট্রেন, মাঝের ছোট-খাট স্টেশনে এর থামবার কথা নয়। তা আমরা জানি, আমাদের শেখাতে হবে না। তবু বলছি, ট্রেন থামাতে হবে, আমরা স্বামী বিবেকানন্দকে দর্শন করব। যদি দর্শন না পাই, যদি ট্রেন না থামে, আমরা চাকার তলায় প্রাণ দেব।

অগত্যা গার্ড সাহেবকে ট্রেন থামাতে হল। উঠল অভ্রভেদী জয়োল্লাস। কোন কামরা, স্বামীজির কোন কামরা?

স্বামীজি দরজা খুলে দাঁড়ালেন। ভারতের নবীন উদয়-ভানুকে সবাই দেখল তৃপ্ত চোখে। স্বামীজি হাত তুলে সবাইকে আশীর্বাদ জানালেন। উত্তালমুখর জনতা শান্ত হয়ে গেল।

ছয়ুই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭ মাদ্রাজ পৌঁছুলেন স্বামীজি। হাজার-হাজার লোক প্ল্যাটফর্ম ছেয়ে ফেলল। কে আসছে কাউকে বলে দিতে হল না। আসছে এক ঈশ্বরের লোক, যিনি ঈশ্বরচিন্তা করতে-করতে ঈশ্বরায়িত হয়ে উঠেছেন। তাঁকে দেখবার জন্যে আমরা যে নরদেহে এত দিন বেঁচে ছিলাম আমাদের উপর ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহ।

বিরাট শোভাযাত্রা তৈরি হল—স্বামীজিকে বসানো হল একটা ঘোড়ার গাড়িতে। কিছু দূর যাবার পরেই গাড়ির ঘোড়া খুলে দেওয়া হল, জনতাই গাড়ি টেনে নিয়ে চলল। দীর্ঘ পথ ধরে চলল শোভাযাত্রা, সতেরটি সুসজ্জিত তোরণ পেরিয়ে। তোরণগুলি স্বামীজির জয়যাত্রার জন্যেই তৈরি। তোরণের কাছে শোভাযাত্রা যেই পৌঁছুচ্ছে, হচ্ছে পুষ্পবৃষ্টি। মন্দিরে দেবতার কাছে যেমন অর্ঘ্য নিয়ে আসে তেমনি পূজার থালায় করে ফুল ফল সাজিয়ে স্বামীজিকে নিবেদন করছে কেউ কেউ। কোথাও বা মহিলারা ধূপ-দীপে আরতি করছে। এ কে এসেছে তাদের সামনে? কোনো দিগ্বিজয়ী নরপতি, না, এ এক দৈবত আবির্ভাব?

'দেখি, দেখি, আমাকে একবার দেখতে দাও।' এক বৃদ্ধা মহিলা ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে চাইল।

'দূরে থেকেই দেখ না। এগিয়ে যাবার কী দরকার?' বিক্ষুব্ধ জনতা বাধা দিল।

'দূরে থেকে ভালো ঠাহর করতে পারছি না।' বললে বৃদ্ধা, 'কাছাকাছি হলেই তবে পরিপূর্ণ দেখতে পাব। তবেই আমার শাপমোচন হবে।'

'কেন, ইনি কে?'

'সে কি, জান না তোমরা? ইনি সম্বন্ধমূর্তির অবতার।'

মাদ্রাজের এটর্নি আয়েঙ্গারের রাজকীয় প্রাসাদ, ক্যাসল কার্নানে, স্বামীজি থামলেন। এখানেই তাঁকে থাকতে হবে। কিন্তু তাঁকে এখুনি নামতে দিচ্ছে কে? মাদ্রাজ বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী সভা তাঁকে সংস্কৃতে অভিনন্দন জানালে। আরেক জন কানাড়া ভাষায় ভাষণ পড়ল। স্বামীজি দারুণ ক্লান্ত, প্রতিভাষণের জন্যে কেউ পিড়াপিড়ি করল না। বরং হাইকোর্টের জজ সুব্রহ্মণ্য আয়ার যখন বললেন, স্বামীজির এখন বিশ্রাম দরকার, আপনারা এখন ফিরে যান, তখন অব্যাক্যব্যয়ে ফিরে গেল। তাদের প্রিয় স্বামীজির এখন বিশ্রামই প্রিয়, সুতরাং তাঁর স্তব্ধতায় ব্যাঘাত ঘটাতে চাইল না।

সন্ধের দিকে অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ার এল। আমেরিকা যাবার আগে ত্রিবান্দ্রমে এর বাড়িতে স্বামীজি আতিথ্য নিয়েছিলেন। সেই থেকে হৃদ্যতা।

'স্বামীজি, একটা অনুরোধ করি।' অন্তরঙ্গ সুরে বললে সুন্দররাম।

'বলুন।' স্বামীজি আয়তনেত্রে হাসলেন।

'আমাদের একটু গান গেয়ে শোনান। কতদিন আপনার গানের কণ্ঠ শুনিনি।'

স্বামীজি এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। এক মুহূর্ত মৌনে থেকে কী ভাবলেন। পরে জয়দেবের একটি গান ধরলেন।

দেখতে-দেখতে ক্যাসল কার্নাল এক মন্দিরে পরিণত হয়ে গেল। সম্বন্ধমূর্তি শিবেরই আরেক নাম। সবাই দেখল সম্বন্ধমূর্তিই বিচিত্র রাগে গান করছেন সামনে বসে। গানের মধ্য দিয়েই যিনি স্বয়ং প্রকাশিত।

আটুই ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজে তাঁকে অভিনন্দন দেওয়া হল। সভার স্থান ভিক্টোরিয়া হল কিন্তু জনসমাগম প্রায় দশ হাজারেরও বেশি, তাই হলের বাইরের লোক দাবি তুলল খোলা মাঠে সভা হোক। স্বামীজি বেরিয়ে এলেন, সভা বাইরেই হবে। কিন্তু কিসের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেব—মঞ্চ কই? তখন একটা ঘোড়ার গাড়ি এনে স্বামীজিকে বলা হল, এটার উপরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিন।

তথাস্তু। স্বামীজি গাড়ির কোচবাক্সে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন:

'ব্যবস্থা হয়েছিল অভ্যর্থনা ইংরিজি ধরনে হবে। কিন্তু ঈশ্বরের বিধানে আমি গীতার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলছি। আমি এর আগে কখনো খোলা ময়দানে এত বড় সভায় বক্তৃতা করিনি, ভয় হচ্ছে আমার কণ্ঠস্বর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছুবে কি না। তবু আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব, আপনারা অবধান করুন।

পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিরই জীবনীশক্তি একটা বিশেষ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। ধর্মই ভারতবর্ষের সেই বিশেষত্ব। ইংলণ্ডে ধর্ম অনেক গৌণ পোশাকী জিনিসের মধ্যে একটা, ভারতবর্ষে ধর্ম মূল মর্মের বস্তু। ধর্মই তার একমাত্র কাজ, একমাত্র চিন্তা।

কিন্তু প্রশ্ন এই, জয়ী হবে কে, জড় না চৈতন্য ? ভোগ না ত্যাগ ? প্রেম না ঘৃণা ? আমি বলি ত্যাগ, প্রেম ও অপ্রতীকারই জগতে জয়ী হবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।'

সভার মধ্যে গোলমাল সুরু হয়ে গেল, শোনা যাচ্ছে না বলে গোলমাল, আর যত গোলমাল ততই স্বামীজি অসহায়। স্বামীজি বুঝলেন বক্তৃতা এইখানেই শেষ করতে হবে। তবু বললেন শেষ কথা।

'হ্যাঁ, উৎসাহ চাই, প্রবল উৎসাহ। যে চিরন্তন উৎসাহ-উজ্জ্বল সে অবসন্ন হবে না।'

রুদ্র হৃদয়োপনিষৎ শোনো :

যিনি সর্বজ্ঞ, যাঁতে ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের জ্ঞান অবস্থিত, যিনি সর্ব বিদ্যার আশ্রয়, জ্ঞানই যাঁর তপস্যার রূপ, যাঁর থেকে ভোক্তা ও ভোজ্য দুই-ই উৎপন্ন হয়েছে, যাঁতে এই বিশ্ব সর্পের ন্যায় প্রতীত হচ্ছে, তিনিই ব্রহ্ম। এই অবিনাশী ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনিই মুক্ত হন।

তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই সংসারবন্ধন নাশ হয়—তীর্থ যজ্ঞাদি দ্বারা নয়। অতএব হে মুমুক্ষু মন, বিধিপূর্বক শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছে যাও। তিনি তোমাকে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সম্বন্ধে পরাবিদ্যা উপদেশ করবেন। যদি পুরুষ তার হৃদয়-গুহার অধিবাসী অক্ষর ব্রহ্মের সাক্ষাৎ করে, তা হলে অবিদ্যারূপিণী মায়াগ্রন্থি ছিন্ন করে সে সনাতন শিবত্বে উপনীত হবে। সেই শিবই অমৃত, সেই অমৃতই মুমুক্ষুর প্রাপণীয়।

৯০

তিরুপ্পাতুর শহরের একদল শৈব স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে এল।

'আমরা অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। আপনি অদ্বৈতবাদী, আমাদের দাবী, আপনাকে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।'

'বলুন।' স্বামীজি স্নিগ্ধ সৌম্যতাতে হাসলেন।

'আমাদের প্রথম প্রশ্ন—অদ্বৈত কেমন করে ব্যক্ত হলেন ?'

উত্তর দিতে স্বামীজির এক মুহূর্ত দেরি হল না। তিনি বললেন, 'কেন, কেমন করে, বা কী উদ্দেশ্যে, কোন যুক্তিতে—এ সব প্রশ্ন আপেক্ষিক জগতের, যা অব্যক্ত ও অবিনাশী তার সম্বন্ধে অচল। যে জগৎ ব্যক্ত ও বিকারশীল তার সম্বন্ধেই 'কেন' বা 'কেমন করে' জিজ্ঞাসা করা চলে কিন্তু যা সর্বপ্রকার বিকারের অতীত বলে অব্যক্ত, যার সঙ্গে চিরপরিবর্তনশীল ব্যক্ত জগতের কোনো সম্পর্ক নেই, তার সম্বন্ধে 'কেন' বা 'কেমন করে' আদৌ খাটে না। সুতরাং অযৌক্তিক প্রশ্ন করে লাভ নেই। যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন করুন, উত্তর দেব।'

শৈব দল উত্তর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এক খাতা প্রশ্ন লিখে নিয়ে এসেছিল, ভেবেছিল স্বামীজিকে কত না জানি পর্যুদস্ত করবে। কিন্তু প্রথম প্রশ্নেই এমন ঘায়েল হয়ে গেল যে তারা আর দন্তস্ফুট করতে পারল না।

গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞেস করলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, ব্রহ্মের আধার কী ? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'গার্গী, অতিপ্রশ্ন কোরো না। অর্থাৎ আমরা শুধু দৃশ্য জগতেরই পরিমাণ করতে পারি। কার্য-কারণ সম্বন্ধ পরিণামী জগতেই সম্ভব। ব্রহ্ম অব্যয় অক্ষয় অসীম সত্তা,

অপরিণামী ধারয়িতা—তার আধার কোথায় ? বুদ্ধি দেশ-কাল নিমিত্তের বন্ধন অতিক্রম করে যেতে পারে না। আমরা বুদ্ধির মধ্য দিয়ে যে জ্ঞান পাই সেটা বাহ্য জগতের একটা আভাসমাত্র। আমাদের তাই চিন্তাজগৎ ছাড়িয়ে বোধি-জগতে যেতে হবে। বুদ্ধি থেকে বোধিতে উত্তরণ—শ্রীরামকৃষ্ণ যাকে বলেছেন 'বোধে বোধ', সেখানেই সত্য আর জ্ঞাতার মধ্যে তাদাত্ম্য ঘটে গিয়েছে, সেখানেই জ্ঞানের সম্পূর্ণতা। যে অন্ধকার বুদ্ধি ভেদ করতে পারে না বোধি তাকে প্রকাশ করতে পারে।

যারা তর্কযুদ্ধ করতে এসেছিল তারা অপ্রস্তুত হল—শুধু তাই নয়, অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা স্বামীজির ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়ে গেল, তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর কাছ থেকে উপদেশ ভিক্ষা করল।

স্বামীজি বললেন, 'ভগবানকে সন্ধান করতে হবে আর্ত ও পীড়িতের মধ্যে, তাদের সেবাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ আরাধনা। হ্যাঁ, আরাধনা ছাড়া আর কী—শিবজ্ঞানে জীবসেবা, ক্ষুধার্তকে আহার দেওয়া, রুগ্নকে শুশ্রূষা, গৃহহীনকে আশ্রয়, দুর্বলকে বন্ধুতা। সেবার মত আনন্দময় উপাসনা আর কী আছে ?'

মাদ্রাজে দ্বিতীয় বক্তৃতায় স্বামীজি তাঁর পশ্চিমভ্রমণসম্পর্কে কিছু নতুন কথা বললেন, বললেন তার বিরুদ্ধে নানা প্রকার হীন ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচারের কথা। বিদেশে থাকতে তিনি এ সব ব্যাপারে প্রায় চুপ করে ছিলেন কিন্তু স্বদেশে ফিরে এসে সে সব ইতিহাস আর গোপনে রাখা উচিত নয়। দেশবাসী জানুক তাঁকে কী জঘন্য শত্রুতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

'তাকিয়ে দেখ আমি যে দণ্ডকমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসী ছিলাম, আজও আমি সেই সন্ন্যাসীই আছি। তাই লোকের নিন্দা-দ্বেষে আমার কিছু এসে যায় না, তবু সত্যকে সত্য বলেই স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

প্রথমে থিওজফিক্যাল সোসাইটির কথা নিই। সন্দেহ নেই ঐ সোসাইটি দিয়ে ভারতে কিছু ভালো কাজ হয়েছে, ওর সভ্য মিসেস বেসান্তের কাছে প্রত্যেক হিন্দুরই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। মিসেস বেসান্ত যে ভারতের অকপট শুভাকাঙ্ক্ষিনী ও ভারতের উন্নতির জন্যে চেষ্টান্বিতা এ কে অস্বীকার করবে ? কিন্তু ঐ পর্যন্তই। একটা খবর রাষ্ট্র হয়েছে যে আমার পশ্চিম অভিযানে থিওজফিস্টরা আমাকে সাহায্য করেছে ! এটা একেবারে বাজে কথা।

চার বছর আগে আমি সোসাইটির নেতার সঙ্গে দেখা করি। তখন আমি এক অপরিচিত গরিব সন্ন্যাসীমাত্র। সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে আমেরিকা যাচ্ছি, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে একটা পরিচয়পত্র দেবেন ? ভারতভক্ত আমেরিকান, আমি ভেবেছিলাম, সানন্দ ঔদার্যেই বুঝি হাত বাড়াবেন। কিন্তু না, তিনি অন্য প্রশ্ন তুললেন। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমাদের সোসাইটিতে যোগ দেবে ? আমি বললাম, তা কী করে সম্ভব ? আমি যে আপনাদের অনেক কথাই বিশ্বাস করি না। তবে যাও, ভাগো, ভদ্র-লোক আমাকে দরজা দেখালেন, তোমার জন্যে কিছু করতে পারব না। বলো এই কি আমার অভিযানের পথ করে দেওয়া ?

মাদ্রাজী বন্ধুদের সাহায্যে আমেরিকায় এসে নামলাম। আমার কাছে টাকা সামান্যই ছিল। ধর্মমহাসভার আগেই সব খরচ হয়ে গেল। শীত এসে পড়ল, গরম জামাকাপড় কিছু নেই। একদিন আমার হাত হিমে আড়ষ্ট হয়ে গেল। এই অবস্থায় কী করব ভেবে

পেলাম না। যদি রাস্তায় ভিক্ষা করতে বেরুই, নির্ঘাৎ আমাকে জেলে নিয়ে যাবে। আমার তবে আর ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা করা চলে না। আমি নিরুপায় হয়ে মাদ্রাজী বন্ধুদের কাছে তার করলাম। সে খবর থিওজফিস্টরা জানতে পেল। তাদের মধ্যে একজন লিখল: 'শয়তানটা শিগগিরই মারা যাবে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, বাঁচা গেল।' বলো এই কি আমার অভিযানে সাহায্য করা? তারপর ধর্মমহাসভাতেই কজন থিওজফিস্টকে সশরীরে উপস্থিত থাকতে দেখলাম। তারা কী কঠিন অবজ্ঞায় আমার দিকে তাকিয়েছিল, ভাবখানা এমন, এই দেবসভায় এ জংলিটা জায়গা পেল কী করে? বলো এই কি সহৃদয় সহায়কের মনোভাব? তারপর ধর্মমহাসভায় আমার যখন নামযশ হল তখন তাদের ক্ষিপ্ততা একবারে মাত্রা ছাড়িয়ে গেল।

ওদের সঙ্গে আমার আরেক বিরোধী দল, খৃস্টান মিশনারিরা, যোগ দিল। মিশনারিরা এমন সব ভয়ানক মিথ্যা কথা রটাতে লাগল যা অকল্পনীয়। তারা বলতে লাগল, এ লোকটাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দাও, একে না খেতে দিয়ে মেরে ফেল। সব চেয়ে লজ্জার কথা, সেই আন্দোলনে আমারই এক স্বদেশবাসী যোগ দিয়েছিল। সে যে-সে লোক নয়, ভারতের সংস্কারকদলের একজন নেতা। খৃস্ট ভারতবর্ষে এসেছেন —এ প্রচার তাঁরই নেতৃত্বের ফল। জিজ্ঞেস করি ভারতীয় খৃস্টের মহিমার এই কি নমুনা? একে যখন শিকাগোতে দেখলাম তখন আমি হাতে স্বর্গ পেলাম। এ শুধু আমার স্বদেশবাসী নয়, এ আমার বাল্যপরিচিত বন্ধু। কিন্তু বন্ধুত্বের সে কী পরিচয় দিল? যেই আমি ধর্মমহাসভায় প্রশংসা পেলাম, শিকাগোয় জনপ্রিয় হয়ে উঠলাম, সেই থেকেই বন্ধুর সুর বদলে গেল। গোপনে সে আমার অনিষ্টচেষ্টা করতে লাগল, এমন কি চাইল আমি অনশনে মারা পড়ি, অপমানিত হয়ে বিতাড়িত হই। জিজ্ঞেস করি, খৃস্ট কি এভাবেই ভারতে দেখা দেবেন? বিশ বছর খৃস্টের পদতলে বসে আমার বন্ধু কি এ শিক্ষাই পেয়েছে এতদিন?

শত্রুপক্ষ আরেক প্রশ্ন তুলেছে। বলছে, আমি শূদ্র আমার সন্ন্যাসী হবার অধিকার নেই। সন্ন্যাসীতেও জাতিবুদ্ধি! আমি শূদ্র ছিলাম, এতে আমি আনন্দিত। যদি আমি নীচ চণ্ডাল হতাম, আমার আরো বেশি আনন্দ হত। কারণ আমি যাঁর শিষ্য তিনি শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণ হলেও এক নীচ জাতের গৃহ পরিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। সে ব্যক্তি অবশ্য এতে সম্মত হয় নি—কী করেই বা হবে? ব্রাহ্মণ আবার সন্ন্যাসী, তাই তাঁর প্রস্তাব কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। সুতরাং তিনি গভীর রাতে অজ্ঞাত ভাবে সেই ব্যক্তির ঘরে ঢুকে তার পায়খানা পরিষ্কার করে দিলেন, তাঁর মাথার চুল দিয়ে সে-স্থান মুছে দিলেন। এমনি এক দিন নয়, দিনের পর দিন, তিনি এমনি করতে লাগলেন। কেন? তিনি যেন নিজেকে সকলের দাস সকলের সেবক করতে পারেন তার জন্যে। সেই সন্ন্যাসীর শ্রীচরণ আমি শিরোধার্য করে আছি। তিনিই আমার আদর্শ, আর আমার শত্রুরা জেনে রাখুন, আমি সেই আদর্শ পুরুষের জীবনই অনুসরণ করবার চেষ্টা করব। আমাদের সংস্কারকদের মধ্যে কেউ অনুরূপ জীবন দেখান, নীচজাতির পায়খানা সাফ করে চুল দিয়ে মুছে দিতে প্রস্তুত আছেন, আমি তার পদতলে বসে উপদেশ নেব, কিন্তু বলে রাখছি, তার আগে নয়। হাজার হাজার লম্বা কথার চেয়ে এতটুকু একটু কাজের দাম ঢের বেশি।

সংস্কারকদের বলতে চাই আমি তাঁদের চেয়েও বড় সংস্কারক। তাঁরা যেখানে-সেখানে

একটু-আধটু সংস্কার করতে চান, আমি চাই আমূল সংস্কার। আমাদের প্রভেদ শুধু সংস্কারের প্রণালীতে। তাদের প্রণালী হচ্ছে ভেঙে ফেলা, আমার প্রণালী হচ্ছে গড়ে তোলা। তাদের ধ্বংসে আমার সংগঠন। আমি বাইরে থেকে হুকুম দিয়ে জোর করে কিছু চাপাতে রাজি নই, আমার বিশ্বাস স্বাভাবিক উন্নতিতে। আমি নিজেকে ঈশ্বরের স্থানে বসিয়ে সমাজকে, এদিকে চলো ওদিকে নয়, বলে আদেশ করতে সাহস করি না। আমি শুধু সেই কাঠবেড়ালের মত হতে চাই যে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সময় যথাসাধ্য এক অঞ্জলি বালি বয়ে এনেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছিল।

সামাজিক ব্যাধির প্রতিকারের উপায় শিক্ষা—গায়ের জোরে সংস্কারচেষ্টা নয়। দোষ দেখিয়ে দেবার লোক অনেক আছে কিন্তু প্রতিকার করবার লোক কই? সেই জলমগ্ন বালক আর দার্শনিকের গল্পে দার্শনিক যখন বালককে গম্ভীরভাবে উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন সেই বালক বলেছিল, আগে আমাকে জল থেকে তুলুন, পরে আপনার উপদেশ শুনব। তেমনি আমাদের দেশের লোক চিৎকার করে বলছে, ঢের-ঢের বক্তৃতা শুনেছি, ঢের-ঢের কাগজ পড়েছি, সমাজ ঘুরেছি, আমরা এখন এমন লোক চাই যে আমাদের হাতে ধরে এই মহাপঙ্ক থেকে টেনে তুলতে পারে। এমন লোক কোথায়? কে সে লোক যে আমাদের সত্যি-সত্যি ভালোবাসে, আমাদের উপর সত্যি-সত্যি যার দরদ আছে?

যারা সংস্কারপ্রার্থী তারাই বা কোথায়? অল্পসংখ্যক লোক যে জোর করে আর সকলের উপর নিজেদের মনোমত সংস্কার চালাবার চেষ্টা করেন এর মত প্রবল অত্যাচার জগতে আর নেই। অল্প কয়েক জনের দোষবোধই সমগ্র জাতিকে চঞ্চল করে না। প্রথমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষা দাও, বিধান আপনা আপনি আসবে। যে শক্তির অনুমোদনে বিধান তৈরী হবে সে লোকশক্তি কোথায়? আর সেই লোকশক্তিকে জাগাতে হলে চাই লোকশিক্ষা। তাই সমাজসংস্কারের জন্যে প্রথম দরকার লোকশিক্ষা। যতদিন এই শিক্ষা না সম্পূর্ণ হচ্ছে ততদিন সংস্কারকে অপেক্ষা না করে উপায় নেই। গায়ের জোরে অত্যাচার হয়, সংস্কার হয় না।

সংস্কারকেরা পুতুল-পুজার নিন্দা করছেন। আমিও এককালে পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলাম। এর শাস্তিস্বরূপ আমাকে এমন এক ব্যক্তির পদতলে বসে শিক্ষালাভ করতে হল যিনি পুতুল-পুজো থেকেই সব পেয়েছিলেন। আমি কার কথা বলছি বুঝতে পারছেন আশা করি। যদি পুতুল-পুজো করে রামকৃষ্ণ পরমহংসের আবির্ভাব হয়, তবে আমি হিন্দুদের জিজ্ঞাসা করছি, তোমরা কী চাও? সংস্কারকগণের ধর্ম চাও, না, পুতুল-পুজো চাও? আমি এর স্পষ্ট জবাব চাই। যদি ঈশ্বর ঘুঘুর রূপ ধরে এলে তা মহাপবিত্র হয়, তবে গাভীর রূপ ধরে এলে তা হিদেনদের কুসংস্কার হবে কেন?

ভারতবর্ষে ধর্মজীবনই জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ। তা-ই জাতীয় জীবনরূপ মহাসংগীতের প্রধান সুর। যদি তোমরা ধর্মকে কেন্দ্র না করে রাজনীতি, সমাজনীতি বা অন্য কিছুকে তার জায়গায় বসাও, তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। যে সমাজসংস্কারই তোমরা চালাতে চাও, তোমাদের আগে দেখতে হবে সেই সামাজিক প্রথায় আধ্যাত্মিক জীবন লাভের কতটা সাহায্য হবে। এখানে সেই রাজনীতিই গ্রাহ্য হবে যা আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা, আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপূরক। আমাদের স্বভাব কিছুতেই বদলাবে না—আমরা যে ধর্মগতপ্রাণ।

এই কারণে ভারতে যে কোনো সংস্কার বা উন্নতি করবার চেষ্টা করা যাক, প্রথমেই

ধর্মপ্রচার আবশ্যক। ভারতকে সামাজিক বা রাজনৈতিক ভাবের বন্যায় ভাসাতে গেলে প্রথমেই আধ্যাত্মিক বন্যায় ভাসাতে হবে। আমাদের বেদে-পুরাণে-উপনিষদে যে সব অপূর্ব সত্য নিহিত আছে তা মঠ-মন্দিরের অধিকার থেকে বের করে এনে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। শাস্ত্রবাক্যের ধ্বনি হিমালয় থেকে কুমারিকা, সিন্ধু থেকে ব্রহ্মপুত্রে ধাবিত হোক। শাস্ত্রেই বলেছে, আগে শ্রবণ, পরে মনন, শেষে নিদিধ্যাসন। প্রথমে লোকে শাস্ত্রবাক্য শুনুক—আর যে শাস্ত্রবাক্য শোনায় বা শোনাতে সাহায্য করে সে এমন এক কাজ করে মহত্ত্বে যার তুলনীয় কিছুই হতে পারে না। মনু বলেছেন, কলিকালে শুধু একটি কার্যই মানুষের করবার আছে। যজ্ঞ ও কঠোর তপস্যা করবার দিন আর নেই। এখন দানই একমাত্র কর্ম। 'দানমেকং কলৌ যুগে।'

দান—কী দান ? কোন দান শ্রেষ্ঠ ? আগেও বলেছি, আবার বলি, ধর্মদান, আধ্যাত্মিক জ্ঞানদানই সর্বশ্রেষ্ঠ দান। গুণানুসারে দ্বিতীয়, বিদ্যাদান ; তৃতীয়, প্রাণদান ; চতুর্থ, অন্নদান। এই দানশীল দেশে আমাদের দুই রকম দানে সাহস করে এগুতে হবে। প্রথমেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানবিস্তার—সঙ্গে-সঙ্গে লৌকিক বিদ্যাদান। ধর্মকে বাদ দিয়ে লৌকিক জ্ঞানের প্রচার সফল হবে না অথচ ধর্মপ্রচারের সঙ্গে-সঙ্গেই লৌকিক বিদ্যা এসে পড়বে।

অতএব আমার সঙ্কল্প এই যে ভারতে আমি কতকগুলো শিক্ষালয় স্থাপন করব—যাতে আমাদের যুবকেরা ভারতে ও ভারতের বাইরে আমাদের শাস্ত্রনিহিত সত্যের প্রচারে শিক্ষিত হতে পারে। মানুষ চাই, আর সব অমনি হয়ে যাবে। বীর্যবান, অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক। এ রকম একশো যুবক হলে জগতের ভাবস্রোত ফিরিয়ে দেওয়া যায়। অন্যান্য সকল শক্তির চেয়ে ইচ্ছাশক্তির প্রভাব বেশি প্রবল। ইচ্ছাশক্তির কাছে আর সমস্তই নিঃশক্তি হয়ে যায়, কারণ ঐ ইচ্ছাশক্তি স্বয়ং ঈশ্বর থেকে আসে। শুধু, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিই সর্বশক্তিমান। একবার শুধু নিজেকে বিশ্বাস করো। দেখ তোমরা কী ছিলে, তোমরাই বা সহসা কী করে উঠতে পারো।

শত-শত শতাব্দী ধরে সমগ্র জগতের সাধারণ মানুষদের শেখানো হয়েছে তারা দীনহীন, অবজ্ঞেয়, অপাঙক্তেয়। তাদের শুধু ভয় দেখানো হয়েছে। ভয় পেতে-পেতে তারা ক্রমশ পশুপদবীতে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের কখনো আত্মতত্ত্ব শুনতে দেওয়া হয়নি। তোমরা তাদের আত্মতত্ত্ব শোনাও, তাদের শেখাও, তারা ক্ষুদ্র নয়, খর্ব নয়, তাদের মধ্যে রয়েছে অনাদি অনন্ত অবিনাশী আত্মা, যার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, যাকে তরবারি ছিন্ন করতে পারে না, যাকে আগুন পারে না দগ্ধ করতে, যে নিত্য নিরঞ্জন।

ইংরেজের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ কোথায় ? প্রভেদ এই, ইংরেজ নিজের উপর বিশ্বাসী, আমরা নই। ইংরেজ বিশ্বাস করে, যেহেতু সে ইংরেজ সে যা ইচ্ছা করে তাই করতে পারে। এই বিশ্বাসের জোরে তার অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জেগে ওঠে, সে তাই তার ইচ্ছাকে কার্যে রূপায়িত করতে পারে। আর আমাদেরকে সকলে বলে আসছে ও শেখাচ্ছে যে আমাদের কিছুই করবার ক্ষমতা নেই, কাজেই আমরা অকর্মণ্য হয়ে পড়েছি। অতএব, নিজেকে বিশ্বাস করো, আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠো।

আমাদের দরকার এখন—শক্তি-সঞ্চার। আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছি। সেইজন্যে আমাদের মধ্যে গুপ্তবিদ্যা, রহস্যবিদ্যা, ভুতুড়ে কাণ্ড—এই সমস্ত এসেছে। ওদের মধ্যে অনেক মহান সত্য থাকতে পারে কিন্তু ঐ সবের চর্চা আমাদের নষ্ট করে ফেলেছে। তোমাদের স্নায়ুকে সতেজ করো। আমরা অনেকদিন ধরে কেঁদেছি, আর কাঁদবার দরকার

নেই, এখন নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মানুষ হও। আমাদের এখন বীর্য চাই যা আমাদের মানুষ করতে পারে। আমাদের এখন এমন সর্বাঙ্গসম্পন্ন শিক্ষার প্রয়োজন যাতে মানুষ প্রস্তুত হয়। যা শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক দুর্বলতা আনে তা বিষবৎ পরিহার করো। ওতে প্রাণ নেই, ওতে তাই সত্যও নেই। সত্যই বলপ্রদ, সত্যই পবিত্র-কারক, সত্যই অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ।

উপনিষদই এই বলবীর্যপ্রদ, আলোকপ্রদ সত্যের ভাণ্ডার। ঐ সত্যসমূহ উপলব্ধি করে বাস্তব কার্যে পরিণত করো, তবেই ভারতের উদ্ধার।

স্বদেশহিতৈষার কথা তুলতে চাও? সে সম্বন্ধে আমারও একটা আদর্শ আছে। মহৎকার্য করতে হলে তিনটি জিনিষের দরকার হয়। প্রথম হৃদয়বত্তা, আন্তরিকতা। বুদ্ধি আর বিচারশক্তি কয়েক পা এগোতে পারে মাত্র, কিন্তু হৃদয়ের দ্বার দিয়েই মহাশক্তির প্রেরণা আসে। প্রেমই অসম্ভবকে সম্ভব করে। জগতের সকল রহস্য একমাত্র প্রেমিকের কাছেই উন্মুক্ত। হে ভাবী সংস্কারকগণ, স্বদেশহিতৈষীগণ, তোমরা হৃদয়বান হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে-প্রাণে অনুভব করছ যে কোটি-কোটি লোক অনাহারে মরছে, অজ্ঞানের কালো মেঘ সমস্ত দেশটাকে আচ্ছন্ন করে আছে? এই ভাবনায় তোমাদের চোখে ঘুম নেই, আহারে রুচি নেই? এই ভাবনা কি তোমাদের পাগল করে তুলেছে? এই ভাবনায় বিভোর হয়ে তোমরা কি তোমাদের নাম, যশ, স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-সম্পত্তি, এমন কি শরীর পর্যন্ত ভুলেছ?

দ্বিতীয়, দুর্দশা-প্রতিকারের কোনো উপায় স্থির করেছ কি? তোমরা কি পর্বতপ্রায় বিঘ্নবাধাকে তুচ্ছ করে কাজে এগোতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ তরবারি হাতে নিয়ে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তবুও তুমি তোমার সত্যকে আঁকড়ে থাকতে পারো? যদি তোমার স্ত্রী-পুত্র ধন-মান সব যায়, তবুও কি তুমি তোমার ব্রতে স্থির থাকো?

তোমার যদি এই দৃঢ়তা থাকে—দৃঢ়তাই হল কার্যসিদ্ধির তৃতীয় উপাদান—তাহলে তুমি ঠিক তোমার লক্ষ্যে পৌঁছুবে। তোমার মুখ এক অপূর্ব জ্যোতি-শ্রী ধারণ করবে। তোমাকে যদি পর্বতগুহায় বন্দী করে রাখা হয়, তোমার চিন্তার দীপ্তি পর্বতগাত্র ভেদ করে বাইরে প্রকাশিত হবে। আর-কাউকে প্ররোচিত করবে। কাজ এগিয়ে যাবে সমাপ্তির পথে। অকাপট্য, সাধু অভিসন্ধি আর উদ্বুদ্ধ চিন্তা—এদের শক্তি অসামান্য। এদের জয় অবশ্যম্ভাবী।'

কোয়েম্বাটোর থেকে একটি যুবক স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

'আমি আপনার রাজযোগ পড়েছি।'

'শুধু পড়েছ?'

'না, আপনার লিখিত পদ্ধতি-অনুযায়ী কিছু সাধনও করেছি।'

'তারপর?'

'করতে-করতে মনে হল শরীর যেন ক্রমেই হালকা হয়ে যাচ্ছে।'

'বেশ—তারপর?' স্বামীজি উৎসুক হয়ে তাকালেন।

'আমার বন্ধুরা আমাকে অগ্রসর হতে বারণ করছে।'

'বন্ধুরা!'

'শুধু বন্ধুরা নয়, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরাও।'

'তারা কী বলছে?'

'বলছে পাগল হয়ে যাব।'

স্বামীজি তাকে অভয় দিয়ে বললেন, 'পরের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে সমাধিতে পৌঁছনোর লক্ষ্য থেকে বঞ্চিত হয়ো না। এগিয়ে যাও। এগিয়ে যাও।'

দুদিন পরে স্বামীজি ভিক্টোরিয়া হলে তাঁর দ্বিতীয় বক্তৃতা দিলেন। বিষয়—ভারতীয় মহাপুরুষ।

'জগতের অধিকাংশ লোকই একজন ব্যক্তিবিশেষরূপে ঈশ্বরের সন্ধানী। তেমনটি না পেলে তারা কার উপর নির্ভর করে থাকবে? যে বুদ্ধ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রচার করে গেলেন, তাঁর দেহত্যাগের পর পঞ্চাশ বছর যেতে-না-যেতেই তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে ঈশ্বর করে তুলল।

কিন্তু, যে যাই বলুক, ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরে প্রয়োজন আছে। আমরা জানি কাল্পনিক ঈশ্বরের চেয়ে জীবন্ত ঈশ্বর শ্রেষ্ঠতর। জীবন্ত ঈশ্বর অধিকতর পূজার্হ। ঈশ্বর সম্বন্ধে তুমি-আমি যতটা ধারণা করতে পারি তার চেয়ে শ্রীকৃষ্ণ অনেক বড়। আমরা চিন্তার আদর্শকে যত উচ্চেই তুলতে চাই না কেন, বুদ্ধ তার চেয়েও উচ্চতর। সেই জন্যে সমস্ত কাল্পনিক ঈশ্বরকে পদচ্যুত করে মানুষেরাই চিরকাল পূজা পেয়ে আসছেন। এই মানুষেরাই অবতারপুরুষ। আমাদের ঋষিরা তা জানতেন, আর তা জেনেই অবতার-পূজার পথ খুলে দিয়ে গেছেন। যিনি আমাদের পূর্ণ অবতার সেই শ্রীকৃষ্ণই গীতায় বলেছেন—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবম্॥

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে দিয়ে যেখানে তেজস্কর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ হয়, জেনো আমি সেখানে বিদ্যমান, আমার থেকেই এই আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ।

হিন্দু তাই যে কোনো দেশের যে কোনো সাধু-মহাত্মার পূজা করতে পারে। বস্তুত দেখি আমরা কখনো কখনো খৃস্টানদের গির্জায় ও মুসলমানদের মসজিদে গিয়ে উপাসনা করি। এতে আমাদের বাধে না। কেন বাধবে? আমাদের ধর্ম সার্বভৌম। তা এত উদার ও প্রশস্ত যে সব রকম আদর্শকেই সে সাদরে মেনে নিতে পারে। ভবিষ্যতে যদি নতুন কোনো ধর্ম আসে তাকেও মেনে নিতে পারবে। বৈদান্তিক ধর্ম তার অনন্ত বাহু মেলে সবাইকে বুকে টেনে নিতে পারবে।

অবতারের নিচে ঋষিরা আছেন। ঋষি অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা, যিনি কোনো তত্ত্বের সাক্ষাৎ-কার করেছেন। প্রাচীন কাল থেকেই এ প্রশ্ন করা হচ্ছিল, ধর্মের প্রমাণ কী? প্রাচীন কাল থেকেই ঋষিরা বলে আসছেন বহিরিন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যে ধর্মের সত্যতা প্রমাণ হয় না। ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি ন মনঃ। অর্থাৎ সেখানে চোখ যেতে পারে না, এমন কি মনও নয়। মন আর বাক্য পাঠাতে চাইলে বারে-বারে ফিরে ফিরে আসে। যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

শত-শত যুগ ধরে ঋষিরা এই কথা বলে আসছেন। আত্মার অস্তিত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, অনন্ত জীবন, মানুষের চরম লক্ষ্য। এ সব ব্যাপারে বাহ্য প্রকৃতি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ। আমাদের মনের সর্বক্ষণ পরিণাম হচ্ছে, সর্বক্ষণ এর প্রবাহ চলছে, সে নানা অংশে ভেঙে-চুরে রয়েছে, তা দিয়ে, যা স্থির যা শাশ্বত যা অখণ্ড ও অবিভাজ্য, যা অনন্ত ও সনাতন, তার কিনারা হবে কী করে? ভাঙা বস্তু কী করে

অন্তঃস্থের সংবাদ দেবে? চৈতন্যহীন জড়ের থেকে চরম উত্তর নিতে গিয়েই মানুষের সর্বনাশ ঘটেছে। কে বলবে, মানুষের ইন্দ্রিয়জ্ঞানই চূড়ান্ত? পঞ্চেন্দ্রিয়ের বেষ্টনীর বাইরে যিনি যেতে পেরেছেন তিনিই ঋষি। ঋষিরা বলছেন, আত্মা ইন্দ্রিয় দ্বারা বদ্ধ নয়, এমনকি জ্ঞানের দ্বারাও বদ্ধ নয়। জ্ঞান তো পঞ্চেন্দ্রিয়ের ব্যাপার। ঋষিরা তাই জ্ঞানের অতীত ভূমিতে নির্ভীক ভাবে আত্মানুসন্ধান করেছেন, ধর্মকে সাক্ষাৎকার করেছেন। আমাদেরও ধর্মকে সাক্ষাৎকার করতে হবে, ঋষি হতে হবে। এই ঋষিত্বলাভ দেশ কাল বা জাতির উপর নির্ভর করে না। বাৎস্যায়ন অকুতোভয়ে বলেছেন, এই ঋষিত্ব শুধু ঋষির বংশধরদেরই নয়, আর্য অনার্য এমনকি ম্লেচ্ছেরও সাধারণ সম্পত্তি। হিন্দুর মুক্তি শুধু এই ঋষিত্বলাভে।

ভাগবতের মতে অবতার অসংখ্য। তার মধ্যে রাম আর কৃষ্ণই মহত্তম। রাম সমগ্র নীতিতত্ত্বের সাকার মূর্তিস্বরূপ। আদর্শ তনয়, আদর্শ পতি, আদর্শ পিতা, সর্বোপরি আদর্শ রাজা—রামের মহৎ চরিত্র এমনি করে চিত্রিত করে আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। আর সীতার কথা কী বলব? এমনটি পৃথিবীর কোনো সাহিত্যে খুঁজে পাবে না। ভারতীয় নারীর যেমন হওয়া উচিত সীতা তারই উদাহরণ। প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর শোণিতে সীতা বিরাজমান। আমরা সকলেই সীতার সন্তান। সীতার আদর্শ থেকে স্খলিত হয়ে নয়, সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই ভারতীয় নারীদের উন্নতিসাধনে ব্রতী হতে হবে।

তারপর তাঁর কথা বলি যিনি আবালবৃদ্ধবনিতা ভারতবাসী মাত্রেরই পরমপ্রিয় ইষ্ট-দেবতা। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ভাগবতকার তাঁকে অবতার বলেই তৃপ্ত হননি, বলেছেন, 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম।' অর্থাৎ অন্যান্য অবতার ভগবানের অংশ ও কলাস্বরূপ, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

কৃষ্ণ একাধারে বৃহত্তম সন্ন্যাসী ও গৃহী ছিলেন। তাঁর মধ্যে যেমন পরিপূর্ণ রজঃ-শক্তির বিকাশ তেমনি পরিপূর্ণ ত্যাগের নিদর্শন। তিনি তাঁর নিজের উপদেশের মূর্তি-মান বিগ্রহ। এক কথায় তিনি অনাসক্তির রাজা। কত লোককে তিনি রাজা করলেন কিন্তু নিজে কোনোদিনই সিংহাসনে বসলেন না। যিনি সমগ্র ভারতের নেতা, যাঁর কথায় রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এসে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়তেন, তাঁর রাজা হবার সাধ নেই।

তাঁর জীবনের চিরস্মরণীয় অধ্যায়ের কথা মনে পড়ছে। হ্যাঁ, গোপীপ্রেমের কথা বলছি। যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ পূর্ণ ব্রহ্মচারী ও পবিত্রস্বভাব হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার এ তত্ত্ব বোঝবার চেষ্টা করা উচিত নয়। বৃন্দাবনের মধুর লীলায় যা রূপকভাবে বর্ণিত হয়েছে, প্রেমের সেই অত্যদ্ভুত বিকাশ আর কোথায় দেখব? যে প্রেম চরম আদর্শ-স্বরূপ, যে প্রেম বিনিময়ে কিছু প্রার্থনা করে না, যাতে ঐহিক-পারত্রিক কোনোই আকাঙ্ক্ষা নেই, সে-প্রেমের মাহাত্ম্য ক'জন বুঝবে? সে-প্রেম না পেয়ে গোপীদের বিরহ-যন্ত্রণার ভাব কে হৃদয়ে ধরতে পারে যে এই প্রেমমদিরা পান করে উন্মত্ত হতে পারেনি?

এই গোপীপ্রেম দিয়ে সগুণ নির্গুণ ঈশ্বরবাদের সামঞ্জস্য সাধন হয়েছে। আমরা জানি মানুষ সগুণ ঈশ্বর থেকে উচ্চতর ধারণা করতে সক্ষম। এও জানি দার্শনিক দৃষ্টিতে সমগ্র জগদ্ব্যাপী—সমগ্র বিশ্ব যাঁর বিকাশমাত্র—সেই নির্গুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসই স্বাভাবিক। এদিকে আমাদের প্রাণ একটা সাকার বস্তু চায়, যা আমরা ধরতে পারি, যাঁর পাদপদ্মে আমরা প্রাণ ঢেলে দিতে পারি। সুতরাং সগুণ ঈশ্বরই মানবস্বভাবের চূড়ান্ত ধারণা।

তবু বুদ্ধি যুক্তি এই ধারণায় সন্তুষ্ট হতে পারে না। যদি একজন সগুণে সম্পূর্ণ দয়াময়, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর থাকেন, তবে এই নরকবৎ সংসারের অস্তিত্ব কেন? কেন তিনি জগৎ সৃষ্টি করলেন? এর একমাত্র মীমাংসা গোপীপ্রেম—এ সবই তাঁর লীলা। গোপীরা কৃষ্ণের উপর কোনো বিশেষণ আরোপ করতে চাইত না, তিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি সর্বনিয়ন্তা তিনিই জগৎগুরু, এ সব বিচারের তারা ধার ধারত না। তারা কেবল জানত কৃষ্ণ প্রেমময়—এই বিদ্যাবুদ্ধিই তাদের পক্ষে যথেষ্ট। তারা কৃষ্ণকে শুধু বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বলে বুঝত। সেই বহু অনীকিনীর নেতা রাজাধিরাজ কৃষ্ণ তাদের কাছে চিরকাল সেই রাখাল বালক।

> ন ধনং ন জনং ন কবিতাং সুন্দরীং বা জগদীশ কাময়ে।
> মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতু ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

হে জগদীশ, আমি ধন জন কবিতা বা সুন্দরী কিছুই প্রার্থনা করি না, যেন জন্মে-জন্মে তোমার প্রতি আমার অহেতুকী ভক্তি থাকে। এই অহেতুকী ভক্তি—ধর্মের ইতিহাসে এ এক নতুন অধ্যায়। অবতারশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের মুখ থেকে এই তত্ত্ব প্রথম ভারতবর্ষেই প্রচারিত হয়েছে। ভয়ের ধর্ম, কামনার ধর্ম চিরদিনের মত চলে গেল। আর মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক নরকভয় ও স্বর্গসুখভোগেচ্ছা সত্ত্বেও এই অহেতুকী ভক্তি ও নিষ্কাম কর্মরূপ শ্রেষ্ঠ আদর্শের অভ্যুদয় হল।

আমাদের মধ্যে অনেক অশুদ্ধাত্মা নির্বোধ আছে যারা গোপীপ্রেমের নাম শুনলে তাকে অত্যন্ত অপবিত্র ব্যাপার ভেবে ভয়ে দশ হাত পিছিয়ে যায়। তারা নিজেরা অপবিত্র, তাই তাদের ভয়। যিনি এই অদ্ভুত গোপীপ্রেম বর্ণনা করেছেন তিনি আর কেউই নন, আজন্মশুদ্ধ ব্যাসতনয় শুক। যতদিন হৃদয়ে স্বার্থপরতা থাকে ততদিন ভগবৎপ্রেম অসম্ভব। ততদিন তো শুধু দোকানদারি। আমি তোমায় কিছু দিচ্ছি, প্রভু, তুমি আমাকে কিছু দাও। আর ভগবান বলছেন, তুমি যদি এমনটি না করো তা হলে তুমি মরলে পর দেখে নেব, কিংবা বাঁচিয়ে রেখে চিরকাল মারব দগ্ধ করে। সকাম মানুষের এমনি ঈশ্বরধারণা। তারা কী করে বুঝবে গোপীপ্রেম, গোপীদের প্রেমজনিত বিরহের উন্মত্ততা?

> সুরতবর্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম।
> ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম ॥

তোমার অধরামৃত সুরতবর্ধক ও শোকনাশক। শব্দায়মান বেণু সুন্দর ভাবে তোমাকে চুম্বন করে থাকে। ঐ অধরামৃতে মানুষের সার্বভৌম সুখেচ্ছারও বিস্মরণ হয়। তুমি আমাদের সেই অধরসুধা বিতরণ করো।

কৃষ্ণ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্যই এই গোপীপ্রেমশিক্ষা। এমন কি দর্শনশাস্ত্রশিরোমণি গীতা পর্যন্ত সেই অপূর্ব প্রেমোন্মত্ততার কাছে দাঁড়াতে পারে না। গোপীপ্রেমে গুরু-শিষ্য শাস্ত্র-উপদেশ, ঈশ্বর-স্বর্গ সব একাকার। সেখানে ভয়ের ধর্মের চিহ্নমাত্র নেই, সব গিয়েছে—আছে কেবল প্রেম, প্রেমোন্মত্ততা। তখন কৃষ্ণময় সংসার, সংসারময় কৃষ্ণ। মহানুভব কৃষ্ণের এমনি মহিমা!

এবার আদর্শপ্রেমিক কৃষ্ণের কথা ছেড়ে একটু নিম্নস্তরে নেমে গীতাপ্রচারক কৃষ্ণকে দেখা যাক। ভগবান সেখানে সমস্ত রকম সাধনপ্রণালীকেই সত্য বলেছেন। সম্প্রদায়গত বিরোধের সামঞ্জস্য ঘটিয়ে ভগবান বললেন, 'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা

হব।' যেমন সুতোয় মণিগুলো গাঁথা থাকে তেমনি আমারই মধ্যে সমস্ত ওতপ্রোত হয়ে আছে।

ধর্মমত ও জাতিতত্ত্ব নিয়ে আমাদের সমাজের দুটি প্রবল অংগ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিবাদ চলছিল, তখন সমস্ত বিরোধের ঊর্ধ্বে এক মহামহিমময় মূর্তি জেগে ওঠে। তিনি আর কেউ নন, আমাদেরই গৌরব শাক্যমুনি। আমরা হিন্দুরা তাঁকে ঈশ্বরের অবতার বলে পূজা করে থাকি। এত বড় নির্ভীক নীতিতত্ত্বের প্রচারক জগৎ আর কখনো দেখেনি। তিনি কর্মযোগীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই কৃষ্ণই যেন নিজেরই শিষ্যরূপে তাঁর উপদেশগুলোকে কার্যে পরিণত করবার জন্যে আবির্ভূত হলেন। গীতোক্ত সেই বাণী আবার উচ্চারিত হল, 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।' অর্থাৎ এই ধর্মের অতি সামান্য অনুষ্ঠানও মহাভয় থেকে রক্ষা করে। আবার, 'স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম।' অর্থাৎ স্ত্রী, বৈশ্য, এমন কি শূদ্রেরা পর্যন্ত পরম গতি প্রাপ্ত হয়।

গীতার বাক্য, কৃষ্ণের বজ্রবাণী, সকলের শৃংখলবন্ধন মোচন করে দেয়। সকল মানুষের জন্যেই পরমপদলাভের অধিকার ঘোষণা করে।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥

অর্থাৎ যাদের মন সাম্যভাবে অবস্থিত, তাঁরা এখানেই সাম্য জয় করেছেন। তাঁরা ব্রহ্মসমভাবাপন্ন ও নির্দোষ, তাই তাঁরা ব্রহ্মেই অবস্থিত।

সমং পশ্যন হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম।
ন হিনস্ত্যাত্মনং ততো যাতি পরাং গতিম ॥

অর্থাৎ, ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখে তিনি নিজে নিজেকে আর হিংসা করেন না, সুতরাং পরমগতি লাভ করেন।

গীতার উপদেষ্টাই শাক্যমুনি হয়ে এলেন মর্তধামে। ইনি রাজসিংহাসন ত্যাগ করে দুঃখী দরিদ্র পতিত ভিক্ষুকদের সংগে বাস করতে লাগলেন, দ্বিতীয় রামের মত চন্ডালকে বুকে ধরলেন। যাতে সর্বসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করতে পারেন, দেবভাষা পর্যন্ত পরিত্যাগ করলেন, সর্বসাধারণের ভাষায় উপদেশ দিতে লাগলেন।

সর্বপ্রাণীতে দয়া, অপূর্ব নীতিতত্ত্ব ও নিত্য আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে চুলচেরা বিচার সত্ত্বেও, প্রচারের ত্রুটিতে বৌদ্ধধর্মের প্রাসাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, আর যা ভগ্নাবশেষ রইল তা অত্যন্ত বীভৎস।

কিন্তু ভারতের জীবনীশক্তি নষ্ট হবার নয়, তাই আবার ভগবানের আবির্ভাব হল। যিনি বলেছিলেন যখনই ধর্মের গ্লানি হয় তখনই আমি এসে থাকি, সেই তিনি আবাব আবির্ভূত হলেন। এবার আবির্ভূত হলেন দাক্ষিণাত্যে। সেই ব্রাহ্মণযুবক যিনি ষোল বছর বয়সেই তাঁর সমগ্র গ্রন্থরচনা সমাপ্ত করেছিলেন সেই প্রতিভাপুরুষ শঙ্করাচার্যের কথা বলছি। তিনি সংকল্প করেছিলেন সমগ্র ভারতকে তার প্রাচীন বিশুদ্ধ মার্গে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু সে কাজ যে কী কঠিন ছিল তা ভেবে দেখো। তখন বৌদ্ধ ধর্ম নানা আচারে-অনুষ্ঠানে ছেয়ে গেছে—তাতার-বেলুচিরাও বৌদ্ধ হয়ে আমাদের সংগে মিশে গেল আর আমাদের জাতীয় জীবনে মিশিয়ে দিল তাদের পাশবিক আচার-অনুষ্ঠান। মহাদার্শনিক শংকরাচার্য দেখালেন বৌদ্ধধর্ম ও বেদান্তের সারাংশে বেশি প্রভেদ নেই।

আরও দেখালেন, বুদ্ধদেবের শিষ্যপ্রশিষ্যেরা তাদের আচার্যের উপদেশের তাৎপর্য বুঝতে না পেরেই নিজেদের হীনাবস্থ করেছে ও আত্মা আর ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে নাস্তিক হয়েছে। তখন বৌদ্ধরা তাদের প্রাচীন ধর্ম অবলম্বন করতে লাগল। কিন্তু যে সব অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে তারা অভ্যস্ত হয়েছিল সে সব কর্মকাণ্ডের কী হবে?

তখন এলেন মহানুভব রামানুজ। পতিতের দুঃখে তাঁর হৃদয় কাঁদল, তিনি পুরোনো অনুষ্ঠান-পদ্ধতিগুলো যথাসাধ্য সংস্কার করলেন, প্রবর্তন করলেন নতুন উপাসনা-প্রণালী। ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল, সকলের জন্যেই উচ্চতম আধ্যাত্মিক উপাসনার পথ উন্মুক্ত রাখলেন।

তারপর আর্যাবর্তে প্রেমাবতার ভগবান শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হল। তাঁর প্রেমের সীমা-পরিসীমা ছিল না। হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, সাধু-পাপী, পবিত্র-অপবিত্র, বেশ্যা-পতিত সকলেই তাঁর প্রেমের ভাগী ছিল, সকলের প্রতিই তাঁর দয়া নির্বারিত ছিল। যদিও কালপ্রভাবে তাঁর প্রবর্তিত সম্প্রদায়ে অবনতি ঘটেছে তবু আজ পর্যন্ত তা দরিদ্র দুর্বল জাতিচ্যুত সমাজবহিষ্কৃত পতিত জনের আশ্রয়স্থল। কিন্তু আমাকে সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হবে যে দার্শনিক সম্প্রদায়েই আমরা অদ্ভুত উদার ভাব দেখতে পাই। শঙ্করমতাবলম্বী কেউই এ কথা স্বীকার করবে না যে ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস্তবিক কোনো ভেদ আছে। এদিকে কিন্তু জাতিভেদ সম্বন্ধে তিনি অতিশয় সংকীর্ণতার পোষকতা করতেন। প্রত্যেক বৈষ্ণবাচার্যের মধ্যে আবার আমরা জাতিভেদ বিষয়ে অদ্ভুত উদারতা দেখতে পাই কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে তাঁদের মত অতি সংকীর্ণ।

একজনের ছিল অদ্ভুত মস্তিষ্ক, অন্যের ছিল বিশাল হৃদয়। এখন এক ব্যক্তির জন্মের সময় হল যিনি একাধারে শংকরের মস্তিষ্ক ও চৈতন্যের হৃদয়ের অধিকারী হবেন, যিনি দেখবেন সকল সম্প্রদায় এক, আত্মা এক ঈশ্বরশক্তিতে অনুপ্রাণিত ও প্রত্যেক প্রাণীতে সেই ঈশ্বর বিদ্যমান, যাঁর হৃদয় ভারতের ও ভারতের বাইরের সকল দুর্বল দরিদ্র ও পতিত জনের জন্যে কাঁদবে, অথচ যাঁর বিশাল বুদ্ধি এমন মহৎ তত্ত্বের উদ্ভাবন করবে যাতে ভারতের ও ভারতের বাইরের সমস্ত বিরোধী সম্প্রদায়ের সমন্বয় ঘটবে, ও এই সমন্বয়সাধনেই হবে সার্বভৌম ধর্মের প্রকাশ। এমনি এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও অনেক বছর ধরে তাঁর চরণতলে বসে আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। ওটাই ছিল তাঁর জন্মাবার উপযুক্ত সময়, তাঁর আবির্ভাব প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। তাঁর সমগ্র জীবনের কাজ এমন এক শহরের উপান্তে চলেছিল যা তখন পাশ্চাত্ত্যভাব-মদিরায় সর্বাধিক উন্মত্ত। তাঁর পুঁথিগত বিদ্যা কিছুমাত্র ছিল না, অথচ প্রত্যেকে, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের মহারথীরাও তাঁকে একজন মহামনীষী বলে স্থির করেছিল। তাঁর কথা বলবার মত আজ আমার সময় নেই। ভারতীয় মহাপুরুষদের পূর্ণপ্রকাশস্বরূপ যুগাচার্য মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের নামটুকু উচ্চারণ করেই আজ ক্ষান্ত থাকব। দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান, বাংলা দেশের সুদূর অজ্ঞাত এক পল্লীগ্রামে তাঁর জন্ম। আজ ইউরোপ-আমেরিকার হাজার-হাজার মানুষ সত্যি-সত্যিই ফুলচন্দন দিয়ে তাঁর পূজা করছে—পরে আরো হাজার-হাজার লোক করবে তাতে সন্দেহ কী। ঈশ্বরেচ্ছা কে বুঝতে পারে? তোমরা যদি এতে বিধাতার হাত দেখতে না পাও তবে তোমরা অন্ধ, নিশ্চিত জন্মান্ধ। যদি সময় আসে, যদি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করবার আর কখনো অবকাশ হয়, তবে তাঁর বিষয় তোমাদের কাছে বিস্তৃত করে বলব। এখন শুধু এইটুকু বলতে চাই তাঁর

উপদেশই আমাদের বিশেষ কল্যাণপ্রদ। আর এও বলতে চাই যদি আমি আমার জীবনে একটি সত্যও বলে থাকি তবে তা তাঁরই বাক্য—আর যদি এমন অনেক কথা বলে থাকি যা অসত্য, ভ্রান্ত বা অকল্যাণকর, সেগুলি সব আমার রচনা, তার জন্যে একান্তভাবে আমিই দায়ী।'

৯১

খেতড়ির মহারাজা অজিত সিংও মাদ্রাজে স্বামীজির উদ্দেশে এক অভিনন্দন-পত্র পাঠিয়েছিল। অজিত সিং স্বামীজির বিশ্বস্ত শিষ্য ও স্বামীজির আমেরিকা যাওয়া সম্ভব হয়েছিল প্রধানত তারই অর্থানুকূল্যে।

আমেরিকায় চলে গেলে মাকে কে দেখবে এই চিন্তাও নিরন্তর স্বামীজির মনে জাগ্রত ছিল। মার একটা স্বচ্ছন্দ ব্যবস্থা না করতে পারলে কী করে তিনি শান্তি পাবেন? আর অন্তরে শান্তি না থাকলে কোথায় বেদান্ত?

খালি পেটে ধর্ম হয় না এ মোক্ষম কথা তো শ্রীরামকৃষ্ণই বলে গেছেন। মা উপোস করে থাকবেন এ তো তাঁর নিজের খালি-পেটের চেয়েও ভয়াবহ। স্বামীজি তাঁর গুরুর মতই মাতৃভক্ত। তাঁদের কাছে সন্ন্যাসের চেয়েও মা বড়। সন্ন্যাসের জন্যে মাকে ছাড়া যায় না, মার জন্যে সমস্ত কিছু ছাড়া যায়, এমন কি সন্ন্যাসের ধ্বজপট।

তাই যাবার আগে অজিত সিংকে লিখলেন স্বামীজি: 'তুমি যদি আমার মাকে মাসে-মাসে একশোটি করে টাকা দিতে রাজি থাকো তবেই আমার পক্ষে আমেরিকা যাওয়া সম্ভব হয়। এখানে আমার মায়ের সংসার চলবে না আর আমি সমুদ্রের ওপারে গিয়ে ঈশ্বরের সংসার দেখে বেড়াব এ এক নির্মম প্রহসনের মত মনে হবে। ঈশ্বর জানেন, এখন তোমার উপরেই নির্ভর।'

অজিত সিং স্বামীজির অনুরোধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। মাস-মাস একশোটি টাকা পাঠিয়েছিল ভুবনেশ্বরীকে। ভুবনেশ্বরীর সংসার চলেছিল। সেই সংসার না চললে, স্বামীজি জানতেন, তাঁর বেদান্তের সংসারও নিশ্চল।

জুনাগড়ের দেওয়ান বিহারীদাস দেশাইকে স্বামীজি ১৮৯৪-এর ২৯শে জানুয়ারি লিখছেন শিকাগো থেকে:

'কয়েকদিন হল আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনি আমার দুঃখিনী মা ও ছোট ভাইদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন জেনে আনন্দ হচ্ছে। আপনি আমার মায়ের কথা বলে আমার অন্তরের কোমলতম স্থানটি স্পর্শ করেছেন। আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন আমি পাষাণহৃদয় নই। সমগ্র পৃথিবীতে আমার ভালোবাসার জন যদি কেউ থেকে থাকে, তিনি আমার মা। তবু এ আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে সংসার না ছাড়লে আমার মহান গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস যে সত্য প্রচার করতে এসেছিলেন তা প্রকাশিত হত না।'

স্বামীজি সংসার ছাড়লেন বটে কিন্তু মাকে ছাড়লেন না, মাকে মাস-মাস মাসোয়ারা পাঠালেন।

পরে উনিশ শো সালের সতেরোই জানুয়ারি ওলি বুল বা ধীরা মাতাকে লিখছেন স্বামীজি:

'এখন আমার কাছে এটাই স্পষ্টতর হয়ে উঠছে, আমাকে মঠের ভাবনা একেবারে বিসর্জন দিতে হবে আর আমি আমার মার কাছে ফিরে যাব। আমার জন্যে আমার মা অনেক কষ্ট পেয়েছেন। তাঁর জীবনের শেষ কটা দিন আমি স্বচ্ছন্দ করে দিতে চাই। আপনি জানেন, শঙ্করাচার্যকেও শেষ পর্যন্ত এ-ই করতে হয়েছিল, তিনি তাঁর মার কাছে শেষ জীবনে ফিরে গিয়েছিলেন। আমিও তাই করব, আমিও মা-তেই শরণাগত। আমার কাছে ত্যাগের মহত্তম আহ্বান আসছে—উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নেতৃত্ব বা যশোভিলাষ—সব জলাঞ্জলি দিতে হবে। মিস্টার লেগেটের কাছে আমার যে এক হাজার ডলার আছে তাই আমার অভাবের দিনের সম্বল বলে বিবেচনা করব।'

পরে উনিশ শোর ছয়ুই মার্চ আবার লিখছেন ধীরা মাতাকে :

'শেষ জীবনে—আমার ও মার দুজনেরই শেষ জীবনে—আমরা একসঙ্গে থাকব। নিউইয়র্কে যে হাজার ডলার আছে তাতে মাসে ন টাকা আসবে। তারপর আমি মার জন্যে একখণ্ড জমি কিনব, তাতেও মাসে ছ টাকা আয় হবে। আর পুরোনো বাড়িটার ভাড়া ছটাকা কোন না পাব। কুড়ি টাকায় আমার মা ও ঠাকুমার ও আমার ভাইয়ের দিব্যি চলে যাবে।'

মায়ের চিন্তা স্বামীজির কাছে সব সময়েই এমনি মধুর ছিল। আর এই মাধুর্যের কারুকার্যে খেতড়ির মহারাজার হাত অনেকখানি।

অভিনন্দনপত্রে অজিত সিং বললেন : 'ভারতবর্ষ যে আধ্যাত্মিকতার অফুরন্ত ভাণ্ডার—এ শুধু আপনারই মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্যদেশ আজ জানতে পেরেছে। আপনিই নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে বেদান্তের সার্বভৌম আলোতেই জগতের আপাতবিরোধী ধর্মমতগুলির সামঞ্জস্যসাধন হতে পারে। বহুত্বে একত্ব ও একত্বে দেবত্ব -বেদান্তের এই মর্মবাণী জগতে নতুন যুগের অভ্যুদয় ঘটাবে। আপনিই সেই যুগনায়ক।'

মাদ্রাজে স্বামীজির শেষ বক্তৃতা 'ভারতের ভবিষ্যৎ'।

কিন্তু তার আগের দিন তিনি 'ভারতীয় জীবনে বেদান্ত' নিয়ে বললেন। 'ভারতীয় ধর্মচিন্তার সমস্ত বীজ এই উপনিষদে। এমনকি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মূল ভিত্তিও এই উপনিষদ। উপনিষদের ধর্ম ভয়ের নয়, জ্ঞানের এবং অবশেষে ভক্তির। ভক্তিতত্ত্বের সব কিছুই আছে সেখানে, শুধু ভক্তির আদর্শ উচ্চ হতে উচ্চতর হচ্ছে। দ্বৈত-অদ্বৈত দুই ভাবই সেখানে রয়েছে পাশাপাশি। পরস্পর বিবাদ নেই, বিরোধ নেই। একটি অপরটির সোপানস্বরূপ হয়ে আছে। একটি যেন গৃহ অন্যটি ছাদ। একটি মূল অন্যটি ফলপরিণাম।

বিধাতার ইচ্ছায় আমি এমন এক ব্যক্তির সহবাসের সুযোগ পেয়েছিলাম যিনি একদিকে যেমন ঘোর দ্বৈতবাদী তেমনি অন্যদিকে ঘোর অদ্বৈতবাদী ছিলেন। একদিকে যেমন পরম ভক্ত, অন্যদিকে তেমনি পরম জ্ঞানী ছিলেন। এঁরই শিক্ষাফলে আমি উপনিষদকে বুঝতে শিখেছি। দেখেছি উপনিষদে প্রথমে দ্বৈতভাবের কথা, উপাসনায় আরম্ভ হয়েছে, শেষে সমাপ্ত হয়েছে অপূর্ব অদ্বৈতভাবের উচ্ছ্বাসে।

একই বৃক্ষের উপর দুটি সুপর্ণ পাখি রয়েছে, উভয়েই পরস্পর সখা। একটি পাখি নিচু ডালে বসে সেই বৃক্ষের ফল খাচ্ছে, অন্যটি উপর ডালে স্থির ভাবে নীরবে বসে আছে। ফল কখনও মধুর কখনো কটু, সেই অনুসারে যে-পাখি ফল খাচ্ছে সে কখনো সুখী কখনো দুঃখী, কিন্তু যে পাখি গম্ভীর হয়ে বসে আছে—সে সুখে-দুঃখে উদাসীন,

সে শুধু আপন মহিমায় নিমগ্ন। নিচু ডালের পাখি হচ্ছে জীবাত্মা, উপর ডালের পাখি পরমাত্মা। মানুষ ইহকালের স্বাদু-অস্বাদু ফল খাচ্ছে, সে ইন্দ্রিয়ের পিছনে ক্ষণিক সুখের সন্ধানে ছুটেছে মরিয়া হয়ে। ফিরে এসে দেখে উপরের পাখি স্বাদু-অস্বাদু কোনো ফলই খাচ্ছে না, শুধু সে নিজ মহিমায় বিভোর, আত্মতৃপ্ত। যে আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তার আর বৃথা কাজের প্রয়োজন নেই। তখন নিচের পাখি উপরের পাখির কাছাকাছি এসে বসে, বোঝে তার সমস্ত চাঞ্চল্য ঐ নিবৃত্তির জন্যে, আসলে সে ঐ উপরের পাখিরই প্রতিবিম্ব। তার আর তখন ভয় থাকে না, চাঞ্চল্য থাকে না—দ্বৈত তখন অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপনিষদের উপদেশ, হে মানুষ, নির্ভয় হও, তেজস্বী হও, বীর্য অবলম্বন করো। 'অভীঃ'—ভয়শূন্য, এই বিশেষণটি উপনিষদ বারবার ব্যবহার করেছে—মানুষের এত বড় বিশেষণ আর কোনো দেশের শাস্ত্র আবিষ্কার করতে পারেনি। হে মানুষ, তোমার কিসের ভয়? তুমিই অজর অমর ব্রহ্ম, তুমিই সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান। দুর্বল দুঃখী পদদলিতকেও উপনিষদ উচ্চরবে আহ্বান করছে, নিজের শক্তিতে বিশ্বাসবান হয়ে উঠে দাঁড়াও। তোমাকে বাইরে থেকে কেউ এসে উদ্ধার করবে না, তুমি নিজেই নিজের শক্তিতেই মুক্ত হবে। অনন্ত শক্তির আধার যে তুমিই।

আমাদের হীনতার প্রধান কারণ শারীরিক দৌর্বল্য। শারীরিক দৌর্বল্যই সকল অনিষ্টের মূল। দুর্বল মস্তিষ্ক কিছু করতে পারে না, আমাদের প্রথমে সবলমস্তিষ্ক হতে হবে। আগে সবল হও, পরে ধার্মিক হয়ো। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও, তোমাদের প্রতি এই আমার একমাত্র উপদেশ। গীতাপাঠের চেয়ে ফুটবল খেলা বেশি করে তোমাদের স্বর্গের কাছে নিয়ে যাবে। তোমাদের শরীর একটু শক্ত ও রক্ত একটু সজীব হলেই তোমরা গীতা ভালো বুঝবে, তোমাদের চেতনায় পার্থসারথি কৃষ্ণের প্রতিভা উজ্জ্বলতর হয়ে পরিস্ফুট হবে। দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ কোনো বাদ প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু বলতে চাই, আত্মার গভীর তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত হও। আত্মার শক্তি অনন্ত, শুদ্ধত্ব অনন্ত, আত্মা অনন্তপরিপূর্ণ।

উপনিষদ শুধু সন্ন্যাসীর জন্যে নয়। বেদান্ত প্রত্যেকের। বেদান্তের তত্ত্ব শুধু অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকবে না, সে লোকালয়ে প্রত্যেক ঘরে-ঘরে ঢুকে মানুষকে বড় হয়ে ওঠবার ডাক দেবে। যখনই মানুষ নিজেকে আত্মা বলে জানবে তখনই সে বৃহত্ত্বে ও মহত্ত্বে প্রবেশ করবে। তার সমস্ত কাজ পূজা হয়ে যাবে।

বেদান্ত শ্রেণীবিভাগ ঘোচাবে না, তবে অধিকারের তারতম্য ঘুচিয়ে দেবে। যেরূপ সমাজব্যবস্থাই হোক না কেন, মানুষ নিজেদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করে নেবে। কিছুতেই একে অতিক্রম করা যাবে না। কিন্তু তার মানে এ নয় যে অধিকার-তারতম্যগুলিও থেকে যাবে। যদি জেলেকে বেদান্ত শোনাও সে বলবে, তুমিও যেমন আমিও তেমন, তুমি না হয় দার্শনিক, আমি না হয় মৎস্যজীবী, কিন্তু তোমার মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন আমার মধ্যেও সেই ঈশ্বর।

জগতে জ্ঞানালোক বিস্তার করো—আলোক, আলোক নিয়ে এস। প্রত্যেক নর-নারীকে, সকলকেই ঈশ্বরদৃষ্টিতে দেখতে থাকো। তুমি কাউকে সাহায্য করতে পারো না, তুমি শুধু সেবা করতে পারো। যদি প্রভুর কৃপায় তাঁর কোনো সন্তানকে সেবা করতে পারো, তুমি ধন্য। তুমি ধন্য যেহেতু তুমি সেবা করবার অধিকার পেয়েছ, অন্যে পায়নি।

তোমার সেবা তোমার পূজাস্বরূপ। কতগুলি লোক যে দুঃখ ভোগ করছে, সে তোমার-আমার মুক্তির জন্যে, যাতে আমরা রোগী পাগল কুষ্ঠী পাপী প্রভৃতি রূপধারী প্রভুর পূজো করতে পারি। আমি জানি আমার কথাগুলো খুব কঠিন হচ্ছে, কিন্তু আমাকে এ বলতেই হবে, কারণ তোমার-আমার জীবনের এই সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য যে আমরা প্রভুকে এই সব বিভিন্নরূপে সেবা করতে পারি।'

'ভারতের ভবিষ্যৎ' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্বামীজি বললেন :

'ধর্ম—ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি। ধর্মই মূল সুর। ধর্মেই আমাদের প্রাণপ্রবাহ। আমি এ বলছি না যে রাজনৈতিক বা সামাজিক উন্নতির কোনো প্রয়োজন নেই, আমার শুধু এইটুকু বক্তব্য—ঐগুলো গৌণমাত্র, ধর্মই মুখ্য।

আমি আমেরিকা ও ইংলণ্ডে কেন গিয়েছিলাম ? ধর্মমহাসভার জন্যে আমার বিশেষ ভাবনা ছিল না, ওটা শুধু একটা সুযোগ হয়ে এসে পড়েছিল। আমার মনে যে সংকল্প ঘুরছিল তাই আমাকে সমগ্র জগতে ঘুরিয়েছে। আমার সংকল্প এই —আমাদের শাস্ত্র-ভাণ্ডারে সঞ্চিত, মঠে ও অরণ্যে গুপ্তভাবে রক্ষিত, অতি অল্প লোকের অধিকৃত ধর্মরত্ন-গুলিকে প্রকাশ্যে বার করে দেওয়া—শুধু তাই নয়, সংস্কৃতের দুর্ভেদ্য পেটিকা থেকে মুক্তি দিয়ে সর্বসাধারণের বোধ্য ভাষায় তা প্রচার করা। সংস্কৃত আমাদের গৌরবের বস্তু, কিন্তু তার কাঠিন্যই ভাবপ্রচারের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। চলতি ভাষায় ভাবপ্রচার চললেও সংস্কৃতকে উপেক্ষা করলে চলবে না, সংস্কৃত শিক্ষারও প্রসার করতে হবে। অর্থ-সম্পদের তো কথাই নেই, সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণেই শক্তিসঞ্চার ঘটে। শুধু জ্ঞানের বিস্তারে কাজ হবে না, তার সঙ্গে-সঙ্গে গৌরববুদ্ধি ও সংস্কার জন্মানো দরকার। শিক্ষা মজ্জাগত হয়ে সংস্কারে পরিণত না হলে কতগুলো জ্ঞানসমষ্টি নানা ভাববিপ্লবের মধ্যে কখনো টিকতে পারে না। সাধারণকে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা দাও, তাদের ভাব দাও সঙ্গে সঙ্গে তাদের জ্ঞান যাতে সংস্কারে পরিণত হয় তার চেষ্টা করো। যারা নিম্নজাতীয়, তাদের অবস্থা উন্নত করবার একমাত্র উপায় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা। জাতিভেদ তুলে দিয়ে সাম্যভাব আনবার একমাত্র উপায় উচ্চবর্ণের শিক্ষার—যা নিয়ে উচ্চবর্ণের এত তেজ ও গৌরব—সম্পূর্ণ স্বায়ত্তীকরণ।

উচ্চবর্ণকে নিচু করে নয়, নিম্নজাতিকে উন্নত করলেই সমস্যার সমাধান। সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি ছিল। আগামী সত্যযুগে আবার ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই ব্রাহ্মণরূপে পরিণত হবে। ভারতে ব্রাহ্মণই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ। শংকরাচার্য বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ শুধু ব্রাহ্মণত্বকে রক্ষা করবার জন্যে। ব্রাহ্মণই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, তার লোপসাধন চলবে না। ব্রাহ্মণকে চণ্ডাল করা নয়, চণ্ডালকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করাই একমাত্র মীমাংসা। ঋষি শব্দের আরেক অর্থ বিশুদ্ধস্বভাব ব্যক্তি। অল্পাধিক পরিমাণে তোমাদের সকলকে ঋষি হতে হবে। বিশুদ্ধস্বভাব হও, দেখবে তোমার মধ্যে কত শক্তি এসে গিয়েছে। তেমনি ব্রাহ্মণেরও কর্তব্য হবে সর্বসাধারণের কাছে তার জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেওয়া। মনু বলছেন :

ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে যে এত সম্মান ও অধিকার দেওয়া হয়েছে তার কারণ তার কাছে ধর্মের ভাণ্ডার সংরক্ষিত। সেই ধনভাণ্ডার খুলে রত্নরাজি তাকে জগতে বিতরণ করতে

হবে। ধর্ম ও বিদ্যাদানই তার প্রধান কর্তব্য। ব্রাহ্মণেতর জাতিকে ধর্ম ও বিদ্যায় বঞ্চিত করার জন্যেই ভারতবর্ষের এই পরাধীনতা। সংহতিই শক্তির মূল। জাতিভেদের দরুন ভারতে সংহতি কোথায়? সংস্কৃতশিক্ষাই এই সংহতি আনবে। সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য থাকলেই ভারতে সম্মানভাজন হওয়া যায়। সংস্কৃতে জ্ঞানী হলে কেউ তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারবে না। এই একমাত্র রহস্য—সংস্কৃতজ্ঞ হলেই তোমরা ব্রাহ্মণের তুল্য হবে। সেই সমত্ব থেকেই আসবে সংহতি।

আগামী পঞ্চাশ বছর ধরে এই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাদের এই ক বছর ভুলে থাকলে কোনো ক্ষতি নেই। আর-আর দেবতারা ঘুমোচ্ছেন, এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—তোমার স্বজাতি—সর্বত্রই তাঁর হাত, তাঁর কান, তিনি সমস্ত পরিব্যাপ্ত করে আছেন। তুমি কোন নিষ্ফলা দেবতার অন্বেষণে ছুটছ আর তোমার সামনে তোমার চারদিকে যে দেবতা দেখছ সেই বিরাটের উপাসনায় কেন তোমার দেরী হচ্ছে? যখন তুমি ঐ দেবতার উপাসনায় সক্ষম হবে তখন অন্যান্য দেবতাও পূজা পাবার জন্যে জেগে উঠবে। তোমরা এক পোয়া পথ হাঁটতে পারো না, হনুমানের মত সমুদ্র পার হতে যাচ্ছ! সকলেই যোগী হতে চায়, সকলেই ধ্যান করতে উন্মুখ। সারাদিন সংসারের কর্মকাণ্ডে মিশে সন্ধেবেলা খানিকটা বসে নাক টিপলে কী হবে? এ কি এমনই সহজ ব্যাপার · তিনবার নাক টিপেছ আর অমনি ঋষিরা উড়ে আসবেন! এ কি তামাসা না ছেলেখেলা? দরকার চিত্তশুদ্ধি। কী করে এই চিত্তশুদ্ধি হবে? প্রথমে পূজা, বিরাটের পূজা—তোমার সামনে, তোমার চারদিকে যারা আছে তাদের পূজা—তাদের পূজা করতে হবে, সেবা নয়—সেবা বললে আমার অভিপ্রেত ভাবটি ঠিক বোঝানো যাবে না, শুধু পূজা শব্দেই ঐ ভাবটি প্রকাশ করা সম্ভব। এই সব মানুষ—এই সব পশু—এরাই তোমার ঈশ্বর আর তোমার স্বদেশ-বাসীরাই তোমার প্রথম উপাস্য—এদেরই পূজা করো।

আমাদের সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক ও লৌকিক শিক্ষার ভার নিতে হবে এবং যতদূর সম্ভব জাতীয় ভাবে তা দিতে হবে। এখন যা শিক্ষালাভ করছ তা সম্পূর্ণ নাস্তি-ভাবের শিক্ষা—তা দিয়ে মানুষ তৈরি হয় না। যে শিক্ষায় সব ভেঙে-চুরে যায় তা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ানক। বালক স্কুলে গেলে প্রথম শিখল তার বাপ একটা মূর্খ, তার পিতামহ একটা পাগল, প্রাচীন আচার্যগণ সব ভণ্ড, আর শাস্ত্র সব মিথ্যা। ষোল বছর বয়স হবার আগেই সে একটা প্রাণহীন মেরুদণ্ডহীন 'না'-এর সমষ্টি হয়ে দাঁড়াল। মাথায় কতগুলি ভাব ঢোকানো হল, সারাজীবন হজম হল না—অসম্বদ্ধ ভাবে মাথায় ঘুরতে লাগল—একে শিক্ষা বলে না। বিভিন্ন ভাবগুলিকে এমন ভাবে আপনার করে নিতে হবে যাতে মানুষ তৈরি হয়, যাতে চরিত্র গড়ে ওঠে। যদি শিক্ষা বলতে কতগুলি বিষয় জানা-ই বোঝায় তা হলে পৃথিবীর লাইব্রেরিগুলিই শ্রেষ্ঠ সাধু, অভিধানগুলিই ঋষি। শিক্ষায় চরিত্রগঠন হল না শুধু বই মুখস্থ হল—সে-তো সেই চন্দনভারবাহী গর্দভের মত, ভারই বুঝল, চন্দন কী বস্তু তা বুঝল না। 'যথা খরশ্চন্দনভারবাহী, ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।'

আমাদের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে হবে, কারণ হিন্দুরা সব কাজের প্রথমে ধর্মকে স্থান দিয়ে থাকে। সে মন্দির অসাম্প্রদায়িক হবে। সেখানে সকল সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ উপাস্য ওঙ্কারেরই শুধু উপাসনা হবে। এই মন্দিরের সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষক ও প্রচারক

গঠন করবার জন্যে একটি বিদ্যালয় থাকবে। এতে যে সব আচার্য তৈরি হবে তারা সর্ব-সাধারণকে ধর্ম ও অপরা বিদ্যা শেখাবে। আমরা এখন যেমন দ্বারে-দ্বারে ধর্ম প্রচার করছি, আচার্যদের তেমনি ধর্ম ও বিদ্যা দুইই প্রচার করতে হবে। কাজ যতই বিস্তৃত হতে থাকবে, আচার্য ও প্রচারকের সংখ্যা ততই বেড়ে চলবে। মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হতে থাকবে—যতদিন না সমস্ত জগৎ ছেয়ে ফেলে।

তোমরা বলবে, এ প্রকাণ্ড ব্যাপারের জন্যে টাকা কোথায় ? টাকার দরকার নেই—টাকায় কী হবে ? গত বারো বছর ধরে কাল কী খাব আমার ঠিক ছিল না, কিন্তু আমি জানতাম, অর্থ আর যা কিছু আমার প্রয়োজনীয়, আসবেই আসবে। কারণ অর্থাদি আমার দাস, আমি তো তাদের দাস নই। প্রশ্ন হচ্ছে, টাকা নয়—লোক কোথায় ?

অনেক লোক নয়, আমি শুধু কয়েকটি যুবক চাই। বেদ বলছে, 'আশিষ্ঠো বলিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো মেধাবী' যুবকেরাই ঈশ্বর লাভ করবে। শুধু নিজের উপর প্রবল বিশ্বাস রাখো, তাতেই কাজ হবে। এইই তো সময়, যতদিন তোমাদের মধ্যে যৌবনের তেজ ও নবীনতা আছে কাজে লেগে যাও। নবপ্রস্ফুটিত অস্পৃষ্ট অনাঘ্রাত ফুলেই শুধু প্রভু গ্রহণ করেন। আয়ু অল্প, এখুনি আরম্ভ করো, জাতির কল্যাণের জন্যে আত্মবলিদান জীবনের শ্রেষ্ঠ-কর্ম। এই জীবনে আর আছে কী ? তোমরা হিন্দু আর তোমাদের মজ্জাগত বিশ্বাস দেহের নাশে জীবনের নাশ হয় না। কোনো কোনো যুবক আমার কাছে এসে নাস্তিকতার কথা বলে। আমি বিশ্বাস করি না হিন্দু কখনো নাস্তিক হতে পারে। পাশ্চাত্ত্য গ্রন্থ পড়ে কেউ মনে করতে পারে আমি জড়বাদী হলাম, কিন্তু সে দুদিনের জন্যে, জড়বাদ তোমার মজ্জায় নেই, যা তোমার ধাতে নেই, তা তুমি হও কী করে ? অমন অসম্ভব চেষ্টা কোরো না। আমি বাল্যাবস্থায় একবার ঐ চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সফল হতে পারিনি। ও যে হবার নয়, কিছুতেই নয়। জীবন ক্ষণস্থায়ী কিন্তু আত্মা অবিনাশী ও অনন্ত, অতএব যখন মৃত্যুই সুনিশ্চয় তখন একটি মহৎ আদর্শে জীবনকে নিয়োজিত করাই একমাত্র কর্তব্য।'

পরদিন পনেরোই ফেব্রুয়ারি স্বামীজি মাদ্রাজ ছাড়বেন ঠিক করলেন। কোথায় যাবেন—কলকাতা না পুনা ? পুনায় কেন ? বালগঙ্গাধর তিলক স্বামীজিকে পুনায় নিমন্ত্রণ করেছে। পাঁচ বছর আগে আমেরিকা যাবার আগে তিলকের সঙ্গে পরিচয়, সেই সূত্রেই এই নিমন্ত্রণ।

বম্বে থেকে পুনা চলেছে, তিলকের ট্রেনের কামরায় বিবেকানন্দ উঠে বসল। ক'জন গুজরাটি ভদ্রলোক তুলে দিতে এসেছিল স্বামীজিকে, তিলককে দেখে আশ্বস্ত হল। দুজনের আলাপ করিয়ে দিল—ইনি দেশনেতা বালগঙ্গাধর তিলক আর ইনি—ইনি এক সন্ন্যাসী। সম্প্রতি পুনায় চলেছেন। যদি বলেন পুনায় ইনি আপনার বাড়িতে থাকতে পারেন।

'নিশ্চয়।' এক বাক্যে রাজি হল তিলক।

আট-দশ দিন তিলকের সঙ্গে থাকলেন স্বামীজি কিন্তু ঘুণাক্ষরেও আত্মপরিচয় দিলেন না। এমন কি নিজের নামটা পর্যন্ত বললেন না।

'আপনার নাম কী ?' কতবার জিজ্ঞেস করেছে তিলক।

'সন্ন্যাসীর আবার নাম কী!' বারে বারেই হাসিমুখে বলেছেন স্বামীজি : 'সন্ন্যাসীর নাম নেই।'

কোথাও যান না, বেরোন না, কারু সঙ্গে মেশেন না, শুধু বাড়িতে বসে তিলকের সঙ্গে বেদান্তচর্চা করেন।

'গীতা কি কর্মত্যাগ করতে বলে?' জিজ্ঞেস করল তিলক।

'কখনো না, গীতা নিরাসক্ত হয়ে কাজ করতে বলে।'

তিলক যেন জোর পেল। বললে, 'আমারো সেই মত। ফলের জন্যে নয়, শুধু কাজের জন্যে কাজ করা।'

'হ্যাঁ, কাজের আনন্দ কাজে। পথের আনন্দ পথে।'

হিরাবাগের ডেকান-ক্লাবে প্রতি সপ্তাহে এক দিন সভা হয়। তিলক সেই ক্লাবের সভ্য, একদিন ওখানকার এক সভায় স্বামীজিকে সাথি হিসেবে নিয়ে গিয়েছিল। স্বামীজি যে বক্তৃতা করতে পারেন এ তিলকের জানা ছিল না, স্বামীজিরও কোনো আগ্রহ ছিল না বক্তৃতায়। তা ছাড়া সে দিনের বক্তা কাশীনাথ গোবিন্দনাথ ধর্ম বিষয়ে এমন সুন্দর বললে যে কারু দন্তস্ফুট করবার অবকাশ ছিল না। কিন্তু ও কী? স্বামীজি যে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন, বলতে সুরু করলেন। অনর্গল ইংরিজিতে সে কী উদ্দীপ্ত বক্তৃতা! পূর্ববর্তী বক্তা যা বলেছেন তা অসম্পূর্ণ, বিষয়ের অন্যান্য দিক আছে, তারও আলোচনা দরকার।

স্বামীজির বক্তৃতা শুনে সবাই স্তব্ধ, অভিভূত হয়ে গেল। কে এ সন্ন্যাসী?

সমস্ত ভারত পরিভ্রমণ করছেন, অথচ তিলক অবাক হল, সঙ্গে একটাও পয়সা নেই। সম্বল শুধু একটি মৃগচর্ম, দুখানি বস্ত্র আর একটি কমণ্ডলু। ট্রেনের টিকিটের পয়সা পান কোথায়? কেউ একজন দিয়ে দেয়। আসলে দেনেওয়ালা সেই একজন। শতহস্তে চার দিক থেকে তিনি সাহায্য পাঠান।

বক্তৃতা দেবার পর দিনই স্বামীজি হঠাৎ পুনা ছেড়ে নিরুদ্দেশ হলেন।

দু-তিন বছর এই সন্ন্যাসীর কথা তিলকের আর মনে ছিল না। পথচারী কত আগন্তুক জীবনের হাটে এসে সওদা করে চলে যায়, তাদের কথা কে আর অত মনে রাখে?

কে এক ভারতীয় সন্ন্যাসী শিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুত্বের জয়ধ্বজা উড়িয়ে এসেছে এ খবর তিলকের কাছে ঠিকই পৌঁচেছিল—তারপর খবর এল সেই সন্ন্যাসী ভারতে ফিরেছে এবং যেখানে পদার্পণ করছে সেখানেই বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হচ্ছে! কে এ সন্ন্যাসী? খবরের কাগজে তার ছবি বেরিয়েছে, খবরের কাগজ টেনে নিল তিলক, ছবির উপর চোখ রাখল। কী আশ্চর্য, এ যে সেই সন্ন্যাসী যিনি পুনায় তাঁর বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন! আশ্চর্য, তাঁরই নাম বিবেকানন্দ, তিনিই সেই বেদান্তকেশরী!

সেই কথা মনে করে তিলক স্বামীজিকে নিমন্ত্রণ করে পাঠাল। যদি আরেকবার সশরীরে দর্শন দেন।

স্বামীজি বিনয়নম্র বন্ধুতার সুরে চিঠির উত্তর দিলেন। হ্যাঁ, আপনার অনুমান ঠিক, আমিই সেই সন্ন্যাসী। কিন্তু এখন পুনায় যেতে পারছি না বলে দুঃখিত—আমার কলকাতা আমাকে ডাকছে।

পরে কলকাতায় বেলুড়মঠে তিলকই গেল স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে।

একসঙ্গে চা খেতে-খেতে স্বামীজি তিলককে বললেন, 'আপনি যদি সন্ন্যাসী হতেন, সন্ন্যাসী হয়ে বাংলা দেশে আমার কাজ করতেন আর আমি যদি মহারাষ্ট্রে আপনার কাজ

করতাম তা হলে খুব ভাল হত।' একটি দীর্ঘশ্বাস বুঝি গোপন করলেন স্বামীজি : 'লোকে দূরের মাঠকেই সবুজ দেখে। আপন জনের চেয়ে দূরের মানুষকেই বুঝি কাছে টানা সহজ।'

মাদ্রাজ থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে চিঠি লিখছেন স্বামীজি :

'প্রিয় রাখাল, আগামী রোববার 'মোম্বাসা' জাহাজে আমার রওনা হবার কথা। স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় পুনায় ও অন্যান্য স্থানের নিমন্ত্রণ আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। অতিরিক্ত পরিশ্রম ও গরমে শরীর খুবই অসুস্থ।

থিয়োসফিস্টরা আমাকে সন্ত্রস্ত করবার চেষ্টায় ছিল। সুতরাং আমাকেও দুচারটি কথা খোলাখুলি বলতে হয়েছে। তুমি জানো ওদের দলে যোগ দিতে চাইনি বলে ওরা আমাকে আমেরিকায় বরাবর নির্যাতন করেছে, এখানেও সেই রকম সুরু করেছিল। কাজেই আমার এবার স্পষ্ট না হয়ে উপায় ছিল না। এতে আমার কলকাতার বন্ধুদের কেউ যদি অসন্তুষ্ট হন ভগবান তাঁকে কৃপা করুন। তোমার ভয় পাবার কারণ নেই। আমি নিঃসঙ্গ নই, প্রভু সর্বদাই আমার সঙ্গে আছেন। ইতি। তোমাদের বিবেকানন্দ।'

শঙ্করাচার্যের সাধনপঞ্চক স্মরণ করো।

বেদ নিত্য অধ্যয়ন করো, বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠানে ঈশ্বরের পূজা বিধান করো, কাম্য কর্মে মতি ত্যাগ করো, পাপসমূহ পরিধৌত করো, সংসারসুখে সর্বদা দোষানুসন্ধান করো, আত্মজ্ঞানের ইচ্ছা বৃদ্ধি করো, নিজগৃহ হতে শীঘ্র প্রস্থান করো।

সৎ সঙ্গ করো, ভগবানে দৃঢ় ভক্তি রাখো, শমদম অভ্যাস করো, সদবিদ্বানের কাছে যাও, ব্রহ্মের একাক্ষর মন্ত্র যে ওঙ্কার তা তার নিকট প্রার্থনা করো এবং উপনিষদ শ্রবণ করো।

অহং ব্রহ্মাস্মি এই মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ বিচার করো, বিচারকালে বেদান্তপক্ষ আশ্রয় করো, কুতর্ক হতে বিরত হও। আমি ব্রহ্ম অহরহ এই চিন্তা করো, দেহে অহং বুদ্ধি পরিত্যাগ করো, শাস্ত্রবিবাদ পরিহার করো।

ক্ষুধাব্যাধির চিকিৎসার জন্যে প্রতিদিন ভিক্ষৌষধ ভোজন করো, স্বাদু অন্ন যাচঞা কোরো না, দৈববশে যা পাও তাতেই সন্তুষ্ট থাকো, শীতোষ্ণাদি সহ্য করো, লোকের নিকট কৃপা ভিক্ষা ও লোকের প্রতি নিষ্ঠুরতা দুইই বর্জন করো।

একান্ত সুখে অবস্থান করো, পরব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করো, পূর্ণাত্মাকে সুস্পষ্টরূপে দর্শন করো, জ্ঞানবলে পূর্বসঞ্চিত কর্ম ও আগামী কর্ম বিলোপ করো, প্রারব্ধ কর্ম এখানেই ভোগ করে নাও এবং পরমাত্মস্বরূপে অবস্থান করো।

যে প্রতিদিন এই শ্লোকপঞ্চক পাঠ বা স্থির হয়ে চিন্তা করে, চিতি-শক্তি-প্রসাদে তার সংসার-দাবানলের ঘোরতাপ শীঘ্র প্রশমিত হয়।

পনেরোই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭, সোমবার কলকাতার জাহাজ ছাড়ল।

জাহাজ ভিড়ল খিদিরপুরে, চারদিন পর। বিশে ফেব্রুয়ারি সকালে স্পেশাল ট্রেনে স্বামীজি শেয়ালদা পৌঁছুলেন।

স্টেশনে হাজার-হাজার লোক সমবেত হয়েছে। ট্রেনের হুইসল বাজতেই উত্তরঙ্গ জনতা শ্রীরামকৃষ্ণের জয় দিয়ে উঠল। জয় আবার স্বামী বিবেকানন্দেরও।

কামরার সামনে দাঁড়িয়ে জনতাকে নমস্কার করলেন স্বামীজি।

অনেক কষ্টে ভিড় সরিয়ে স্বামীজিকে একটি ল্যাণ্ডো গাড়িতে তোলা হল। কিন্তু এ গাড়ি ঘোড়া টানবে না—যুবকের দল এগিয়ে এল—আমরা টানব। সামনে ব্যান্ডপার্টি, পিছনে কীর্তনের দল—চলল এক ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা। যেন যুদ্ধ জয় করে ফিরছেন সেনানায়ক।

প্রথম থামলেন রিপন কলেজে—কিন্তু না, সেখানে অভ্যর্থনার বিস্তৃত অনুষ্ঠান করা যাবে না, ভিড় এত প্রচণ্ড, কিছু অঘটন না ঘটে যায়। পরে আর কোথাও অভ্যর্থনার উপযুক্ত আয়োজন করা যাবে, এখন এগিয়ে চলো।

শোভাযাত্রা এসে থামল বাগবাজারে, রায়বাহাদুর পশুপতিনাথ বসুর আলয়ে। স্বামীজি ও তাঁর সহযাত্রী সেভিয়ার দম্পতি ও অন্য বিদেশী শিষ্যেরা সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজন করলেন। বিদেশী সঙ্গীদের থাকবার স্থান হল কাশীপুরে গোপাললাল শীলের উদ্যানবাটিতে। স্বামীজি চললেন তাঁর আলমবাজার মঠে।

সেই তাঁর মঠ। সেই উদ্যানবাটি। ঐ অদূরে দক্ষিণেশ্বর! আর এই তাঁর গুরুভাইয়েরা। আনন্দের উপর আনন্দের সমাবেশ।

আটাশে ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্য জনসভায় কলকাতা নগরবাসীদের পক্ষ থেকে স্বামীজিকে অভিনন্দন জানানো হবে, স্থান শোভাবাজারের রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের বাড়ির বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। তার এখনো দেরি আছে। তার আগে রাজবল্লভ পাড়ায় প্রিয়নাথ মুখুজ্জের বাড়ি চলো।

প্রিয়নাথ রামকৃষ্ণের ভক্ত, মধ্যাহ্নভোজনে স্বামীজিকে নিমন্ত্রণ করেছে। ভোজনান্তে অনেক ভক্ত এসে জড়ো হয়েছে, তার মধ্যে একজন দর্জিপাড়ার শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন, আচারনিষ্ঠ ও বেদান্তবাদী। সংস্কৃতে একটি রামকৃষ্ণস্তোত্র লিখে মঠকে উপহার দিয়েছে। সেই স্তোত্রটি পড়ে স্বামীজি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, বলেছিলেন, ওকে একদিন আসতে বোলো।

বলতে হয়নি, শরৎ নিজের থেকেই চলে এসেছে। প্রণাম করতেই তুরীয়ানন্দ স্বামী পরিচয় দিল—এই সেই স্তোত্রকার।

স্বামীজি শরৎকে পাশের একটি ছোট নির্জন ঘরে নিয়ে গেলেন। শংকরাচার্যের বিবেকচূড়ামণির একটি শ্লোক শোনালেন আবৃত্তি করে:

মা ভৈষ্ট বিদ্বন তব নাস্ত্যপায়ঃ
সংসারসিন্ধোস্তরণেহস্ত্যুপায়ঃ।
যেনৈব যাতা যতয়োঽস্য পারং
তমেব মার্গং তব নির্দ্দিশ্যামি॥

হে বিদ্বন, ভয় কোরো না, তোমার বিনাশ নেই—সংসারসাগর পার হবার উপায় আছে। যে উপায় অবলম্বন করে শুদ্ধসত্ত্ব যোগীরা পার হয়েছেন, সেই পথ আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব।

শ্লোক শুনে শরৎ চমকে উঠল। স্বামীজি কি তাকে মন্ত্রদীক্ষা নেবার সংকেত করছেন? গুরুকরণে তার যে এখনো মতি স্থির হয়নি, বেদান্তীর আবার গুরু কী, তার আবার পথনির্দেশ কোনখানে?

স্বামীজি বললেন, 'বিবেকচূড়ামণি পড়ো।'

ইন্ডিয়ন মিরর-এর সম্পাদক নরেন সেন এসে হাজির।

'তাঁকে এখানে নিয়ে এস।'

কথায়-কথায় নরেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'ওদেশে বেদান্ত-প্রচারে আমাদের রাজনৈতিক উন্নতির কোনো আশা আছে কি?'

স্বামীজি বললেন, 'ওরা মহাপরাক্রান্ত বিরোচনের সন্তান। ওদের শক্তিতে পঞ্চভূত নাচের পুতুলের মত কাজ করছে। ওদের সঙ্গে সংঘর্ষে স্থূলে পাঞ্চভৌতিক শক্তি প্রয়োগ করে আমরা একদিন স্বাধীন হতে পারব, এ অসম্ভব। স্থূল শক্তিতে ওরা হিমালয় আর আমরা পাথরের টুকরো। আমার মত কী জানেন? বেদান্তের গূঢ় রহস্য প্রচার করে আমরা ওদেশের শক্তিধরদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারি, তাতেই ওরা ধর্মে আমাদেরকে গুরু বলে মানবে, যেমন অন্যান্য ঐহিক ব্যাপারে আমরা ওদের গুরু বলে মানছি। আমরা যদি ধর্মেও ওদের শিষ্যত্ব নিই তাহলে আমাদের অধঃপতনের আর কিছু বাকি থাকবে না, আমাদের জাতিত্বই ঘুচে যাবে। আমাদের বেদান্ত ওদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও অনুরাগই টেনে আনবে না, টেনে আনবে স্বাধীনতা। আপনারা যদি মনে করেন অন্য পথ আছে, সেই পথে আপনারা যেতে পারেন। আমি আমার বিশ্বাসকে কার্যে পরিণত করবার সাধনায় জীবন ক্ষয় করে যাব।'

গোরক্ষণী সভার কয়েকজন সভ্য এসেছে দেখা করতে। এরা হিন্দুস্থানী, প্রায় সন্ন্যাসীর মত বেশবাস, মাথায় গেরুয়া রঙের পাগড়ি বাঁধা।

'আপনাদের সভার উদ্দেশ্য কী?' জিজ্ঞেস করলেন স্বামীজি।

'কশাইয়ের হাত থেকে গোমাতাদের রক্ষা করা, রুগ্ন ও অক্ষম গোমাতাদের জন্যে পিঁজরাপোল স্থাপন করা।'

'খুব ভালো কথা। আপনাদের আয়ের পথ কী?'

'আপনার মত দয়ালু মহাপুরুষেরা যা চাঁদা দেন—'

'তা ছাড়া?'

'মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা এ সভার পৃষ্ঠপোষক। এঁরা এই সৎকাজে অনেক টাকা দিয়েছেন।'

'মধ্যভারতে এবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়েছে জানেন? ন লক্ষ লোকের মৃত্যুর তালিকা স্বয়ং গভর্ণমেন্টই প্রকাশ করেছে। আপনাদের সভা এই দুর্ভিক্ষে কোনো সাহায্য করেছে কি?'

গোরক্ষণীর প্রচারক গম্ভীরমুখে বললেন, 'আমরা দুর্ভিক্ষে সাহায্য করি না। শুধু গোমাতাদের রক্ষার কাজেই টাকা ব্যয় করে থাকি।'

'যে দুর্ভিক্ষে আপনাদের জাতভাই লাখ-লাখ মারা গেল, সামর্থ্যসত্ত্বেও তাদের

আপনারা অন্ন দিয়ে সাহায্য করলেন না—এ কী ভয়ানক কথা !' স্বামীজি বিমূঢ় হয়ে গেলেন।

প্রচারক বললে, 'লোকের কর্মফলে, পাপে, এই দুর্ভিক্ষ। যেমন কর্ম করেছে তেমনি ফল পেয়েছে।'

'অসম্ভব।' স্বামীজি গর্জন করে উঠলেন : যে প্রতিষ্ঠান মানুষের প্রতি মমতা দেখায় না, অনশনে মরছে দেখেও নিজের ভাইকে এক মুষ্টি অন্ন না দিয়ে যে পশুপাখির জন্যে রাশি-রাশি অন্ন ব্যয় করে, তার প্রতি আমার কোনো সহানুভূতি নেই। কর্মফলে মানুষে মরছে—এইভাবে কর্মের দোহাই দিলে, জগতের কোনো বিষয়ের জন্যে চেষ্টা-চরিত্র করাটাই অনর্থক হয়ে দাঁড়ায়। আপনাদের ঐ পশুরক্ষার কাজটাও তাতে বাদ পড়ে না। ঐ কাজ সম্পর্কেও বলা যেতে পারে গোমাতারাও আপন আপন কর্মফলেই কশাইদের হাতে যাচ্ছেন ও মরছেন—আপনাদের ওতে কিছু করবার নেই।'

'আপনি যা বলছেন তা ঠিক ' প্রচারক বলতে দ্বিধা করল না : 'তবে শাস্ত্র বলেছে গরু আমাদের মাতা। মাতার প্রতি কর্তব্যে—'

স্বামীজি হেসে উঠলেন : 'গরু যে আমাদের মা তা বুঝতে আর আমার বাকি নেই। তা না হলে এমন সব কৃতী সন্তান প্রসব করেন !'

প্রচারক দমবার পাত্র নয়। বললেন, 'যদি আপনি কিছু ভিক্ষা দেন—'

'আমি তো ফকির। আমার অর্থ কোথায় যে আপনাদের সাহায্য করব ? আর অর্থ যদি আমার হাতে আসেও তা আগে মানুষের সেবায় ব্যয় করব। আগে মানুষকে বাঁচাতে হবে—অন্নদান বিদ্যাদান ধর্মদান করতে হবে। এসব করে যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে আপনাদের গোরক্ষণীতে পাঠিয়ে দেব।'

প্রচারক ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল।

'কী কথাই বললে !' স্বামীজি শরৎকে লক্ষ্য করলেন : 'বলে কিনা কর্মফলে মানুষ মরছে, তাদের দয়া করে কী হবে ! দেশটা যে অধঃপাতে গেছে এই তার চূড়ান্ত প্রমাণ। তোমাদের হিন্দুধর্মের কর্মবাদ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখ। মানুষের জন্যে যাদের প্রাণ কাঁদে না তারা কি মানুষ ?' দুঃখে ক্ষোভে স্বামীজির বিশাল চোখ আর্দ্র হয়ে উঠল।

কতক্ষণ পরে শরৎ বললে, 'আপনার সঙ্গে নির্জনে কথা কইতে খুব ইচ্ছে হয়।'

'তা বেশ তো একদিন রাতে যেও—হয় আলমবাজার মঠে, নয় কাশীপুর বাগানবাড়িতে। ও দু জায়গার কোনো একখানে আমি থাকব।'

'আপনার সঙ্গে কতগুলো বিদেশী আছে শুনেছি, তারা আমার বেশভূষা ও কথাবার্তায় রুষ্ট হবে না তো ?'

'তারা বেদান্তধর্মনিষ্ঠ। তোমার সঙ্গে আলাপ করে তারা খুশি হবে।'

'বেদান্তে যে সব অধিকারীর লক্ষণ আছে তা বিদেশীদের মধ্যে আছে ? শাস্ত্রে বলে, অধীতবেদান্ত, কৃতপ্রায়শ্চিত্ত, নিত্যনৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠানকারী, আহার-বিহারে পরম সংযত, বিশেষত চতুঃসাধনসম্পন্ন না হলে বেদান্তে অধিকারী হয় না। আপনার বিদেশী শিষ্যেরা একে অব্রাহ্মণ, তায় অশনবসনে অনাচারী, তারা বেদান্তবাদ বুঝল কী করে ?'

'তাদের সঙ্গে আলাপ করেই বুঝতে পারবে তারা বেদান্ত বুঝেছে কিনা।'

স্বামীজি বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে গেলেন। শরৎ বটতলার একখানি বিবেকচূড়ামণি কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরল।

আরেকদিন গিরিশ ঘোষের বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে বিশ্রাম করছেন স্বামীজি, শরৎ এসে প্রণাম করে দাঁড়াল।

'চল কাশীপুর।'

একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল তাতে শরৎকে নিয়ে স্বামীজি উঠে পড়লেন।

একটা রেলের ইঞ্জিন চিৎপুরের লাইন ধরে যাচ্ছে, তাই দেখে স্বামীজি উচ্ছল কণ্ঠে বললেন, 'দ্যাখ দেখি কেমন সিংহের মতন যাচ্ছে!'

শরৎ বললে, 'তাতে ওর বাহাদুরি কী! ও তো একটা জড় পদার্থ। ওর পিছনে মানুষের চেতন শক্তি কাজ করছে, তবেই না ওর চলা!'

'আচ্ছা বল দেখি চেতনের লক্ষণ কী?'

'যাতে বুদ্ধি দ্বারা ক্রিয়া হয় তাই চেতন।'

'যা কিছু প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাই চেতন, তাতেই চৈতন্যের বিকাশ।' বললেন স্বামীজি, 'দ্যাখ না, একটা সামান্য পিঁপড়েকে মারতে গেলে সেও জীবনরক্ষার জন্যে একবার লড়াই করবে। যেখানে সংগ্রাম যেখানে বিদ্রোহ সেখানেই চৈতন্যের অধিষ্ঠান।'

'মানুষের বেলায়ও কি এই নিয়ম?'

'শুধু তোরা ছাড়া সব জাতি সম্পর্কেই ঐ নিয়ম খাটে। শুধু তোরাই জগতে জড়বৎ পড়ে আছিস। তোদের যেন কে মন্ত্রনিশ্চল করে রেখেছে। বহু প্রাচীন কাল থেকে তোদেরকে শোনাচ্ছে তোরা হীন, তোরা দুর্বল, তোরা অকর্মণ্য, আর তাই ভাবতে-ভাবতে তোরা তাই হয়ে পড়েছিস।' স্বামীজি নিজের শরীরের প্রতি ইঙ্গিত করলেন: 'এ দেহও তো তোদের দেশের মাটি থেকেই জন্মেছে। কিন্তু আমি ঐ হীনমন্যতার ভাবনায় নিজেকে আচ্ছন্ন করিনি। তাই দ্যাখ, ঈশ্বরের ইচ্ছায়, যারা চিরকাল আমাদের হীনজ্ঞান করেছে তারাই আজ আমাকে দেবতার মত বন্দনা করছে। তোরাও যদি ভাবতে পারিস তোদের মধ্যে অনন্ত শক্তি, অপার জ্ঞান ও অদম্য উৎসাহ আছে, আর যদি ঐ প্রবলতাকে নিজের মধ্যে জাগাতে পারিস, তোরাও আমার মত হতে পারবি।'

শরৎ স্বামীজির মুখের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল। পরে ম্লানকণ্ঠে বললে, 'এমনি করে ভাবার শক্তি কোথায়? কে শেখায়, কে বুঝিয়ে দেয়?'

'আমরা শেখাব, আমরাই নতুন চেতনার উদ্বোধন ঘটাব।' স্বামীজি প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেন: 'আমি অবিবাহিত যুবকদের নিয়ে একটা সেণ্টার করব, প্রথম তাদের শেখাব, পরে তারা শেখাবে, গ্রামে শহরে সর্বত্র এই ভাব ছড়িয়ে দেবে।'

'তাতে তো বিস্তর টাকা লাগবে, টাকা আসবে কোত্থেকে?'

'টাকা!' স্বামীজি বিরক্ত হলেন: 'মানুষই তো টাকা করে, টাকায় মানুষ করে এ কথা কবে কোথায় শুনলি? তুই যদি মন-মুখ এক করতে পারিস, কথায় ও কাজে এক হতে পারিস, টাকা জলের মত এসে পড়বে, রুখতে পারবি নে।'

'কিন্তু আপনার আগেও তো কত মহাপুরুষ কত ভালো কাজ করেছিলেন, সে সব আজ কোথায়?' শরৎ হতাশ মুখে বললে, 'আপনার কাজেরও সেই দশা হবে না কে বলতে পারে?'

'কে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে বসেছে? পরে কী হবে এই যে সর্বক্ষণ ভাবে তার দ্বারা কোনো কাজই হবে না। যা সত্য বলে বুঝেছিস তা এখুনি করে ফ্যাল, পরে কী হবে না

হবে তা দিয়ে তোর কী দরকার ? এইটুকু তো জীবন—তার মধ্যে অত ফলাফল খতালে কি কোনো কাজ হতে পারে ? ফলাফলদাতা একমাত্র ঈশ্বর। সে হিসেবে তোর কাজ কী। তুই কাজ করার মানুষ, তুই শুধু কাজ করে যা।'

বাগানবাড়িতে অনেক লোক জড় হয়েছে, স্বামীজি গাড়ির থেকে নেমে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। কাছেই মূর্তিমান সেবার মত গুডউইন দাঁড়িয়ে। মুখে স্নিগ্ধ হাসি, স্বামীজি কোনো একটা নির্দেশ দিলেই সে কৃতার্থ বোধ করবে এমনি যেন নিয়তপ্রস্তুত।

সন্ধ্যার পর শরৎকে আবার ডাকলেন স্বামীজি। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই কি কঠোপনিষদ পড়েছিস ?'

'পড়েছি।'

'কণ্ঠস্থ করেছিস ?'

'না।'

'উপনিষদের মধ্যে এমন সুন্দর গ্রন্থ আর হয় না। ইচ্ছে করে ওখানা তুই কণ্ঠে করে রাখিস। নচিকেতার মত শ্রদ্ধা সাহস বিচার ও বৈরাগ্য জীবনে আনবার চেষ্টা কর। শুধু পড়ে কী হবে ?'

'কৃপা করুন যাতে অনুভূতি আসে।'

'ঠাকুর কী বলতেন জানিস না ? বলতেন, কৃপার বাতাস সব সময়েই বইছে, তুই শুধু পাল তুলে দে। কেউ কাউকে কিছু করে দিতে পারে না, নিজের নিয়তি নিজের হাতে। গুরু শুধু পথের সঙ্কেত দিতে পারেন, পথ চলতে হবে নিজের জোরে, নিজের নিষ্ঠায়। বীজের শক্তিতেই গাছ হয়। জলবায়ু শুধু আনুষঙ্গিক সহায়মাত্র।'

'কিন্তু কোথায় যাব, কতদূর বা যাব ?

'উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান, আত্মদর্শন। আত্মা সূর্যের মত জ্বলছে, শুধু অজ্ঞানমেঘ তাকে আড়াল করে রয়েছে। উদ্দেশ্য এই অজ্ঞানমেঘকে সরিয়ে দেওয়া। এতে সব জাতির সর্বজীবের সমান অধিকার।'

'কিন্তু প্রাণ সর্বদা ছটফট করে, আজও আত্মবস্তুর সাক্ষাৎ হল না।'

'করে, ছটফট করে ?' স্বামীজি উৎসাহিত হলেন। 'এরই নাম ব্যাকুলতা। কী বলতেন ঠাকুর ? বলতেন ঝাঁপ দিলে হবেই হবে। শিষ্য এসে গুরুকে জিজ্ঞেস করলে, ঈশ্বরকে কেমন করে পাওয়া যায় ? গুরু বললেন, এস, দেখিয়ে দিই। বলে শিষ্যকে একটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে জলের ভিতর ডুবিয়ে রাখলেন। খানিক পরে হাত ধরে তুলে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন লাগছিল জলের নিচে ? শিষ্য বললে, প্রাণ আটুবাটু করছিল—যেন প্রাণ যায় ! গুরু তখন বললেন, যখন তোমার ভগবানের জন্যে প্রাণ অমনি আটুবাটু করবে তখন বুঝবে দর্শনের আর দেরি নেই।'

'কত—কত দিনে দর্শন হবে ?' শরতের কণ্ঠে স্পষ্ট ব্যাকুলতা।

'কাল পরিপক্ক হোক—শাস্ত্র বলছেন, কালেনাত্মনি বিন্দতি। তবে যখন ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছে তখন আর দেরি নেই। ব্যাকুলতা হলেই অরুণোদয় হয়, প্রতিবন্ধরূপ মেঘ কেটে যায়। ক্রমে আত্মা করতলের আমলকী হয়ে দাঁড়ায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্যে গোপীদের যেমন উদ্দাম উন্মত্ততা ছিল, আত্মদর্শনের জন্যে চাই সেই উন্মত্ততা।'

'বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ আর কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ—দুই রূপ।'

'আমাদের এখন কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণকে দরকার। দ্যাখ, ভয়ঙ্কর যুদ্ধকোলাহলেও কৃষ্ণ কেমন স্থির, শান্ত ও গম্ভীর। যুদ্ধক্ষেত্রেই অর্জুনকে গীতা বলছেন, যুদ্ধে এগিয়ে দিচ্ছেন। এই যুদ্ধের প্রবর্তক হয়েও নিজে কেমন কর্মহীন—অস্ত্র ধরলেন না। যে দিকে চাইবি দেখবি কৃষ্ণচরিত্র সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ। জ্ঞান কর্ম ভক্তি যোগ, তিনি যেন সকলের মিলিত বিগ্রহ। এই কৃষ্ণকেই দরকার—শুধু বৃন্দাবনের বাঁশিবাজানো কৃষ্ণকে দেখলে চলবে না, তাতে জীবের উদ্ধার হবে না। চাই গীতারূপ সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা। মহারজোগুণের উদ্দীপনা ভিন্ন আমাদের এখন না আছে ইহকাল, না বা পরকাল।'

'পশ্চিমের রজোভাব দেখে আপনার কি আশা হয় যে ওরা ক্রমে সাত্ত্বিক হবে?'

'নিশ্চয় হবে। মহারজোগুণসম্পন্ন ওরা এখন ভোগের শেষ চূড়ায় উঠেছে। ওদের যোগ হবে না তো কি পেটের দায়ে লালায়িত তোদের হবে? তোদের ভোগের কথা বলিসনে। তোদের ভোগ হচ্ছে স্যাঁতসেঁতে ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে বছর-বছর শুয়োরের মত বংশবৃদ্ধি! কতগুলো ক্ষুধাতুর ভিক্ষুক আর কতগুলো ক্রীতদাসের জন্ম দেওয়া। তাই বলছি এখন দেশের লোককে রজোগুণে উদ্দীপিত করে কর্মপ্রাণ করে তুলতে হবে। কর্ম—কর্ম—কর্ম—এখন আর নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়, এ ছাড়া উদ্ধারের আর পথ নেই।'

কথায়-কথায় রাত হয়ে গেল। স্বামীজির শিষ্যা মিস মুলার বাড়ি ফিরল। স্বামীজি তার সঙ্গে শরতের পরিচয় করিয়ে দিলেন। হাসিমুখে প্রসন্ন বাক্যালাপ করে মিস মুলার উপরে চলে গেল।

স্বামীজি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'দেখছিস কেমন বীরের জাত এরা! কোথায় বাড়ি-ঘর, বড়লোকের মেয়ে, তবু ধর্মলাভের আশায় কোথায় এসে পড়েছে।'

'আপনিই টেনে এনেছেন!' শরৎ বললে মুগ্ধের মত: 'আপনার ক্রিয়াকলাপ সত্যিই অদ্ভুত।'

স্বামীজি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'শরীর যদি থাকে তো আরো কত দেখবি। যদি কতগুলি উৎসাহী ও অনুরাগী যুবক পাই, দেশটাকে তোলপাড় করে ছাড়ি। মাদ্রাজে জন কয়েক পেয়েছি। বাঙলাতেই আমার বেশি আশা। এমন পরিষ্কার মাথা আর কোথাও নেই, কিন্তু মাংসপেশীতে শক্তি নেই। মস্তিষ্ক ও মাংসপেশী সমানভাবে গঠিত হওয়া চাই।'

খবর এল স্বামীজির খাবার দেওয়া হয়েছে।

'চল আমার খাওয়া দেখবি।' স্বামীজি শরৎকে টেনে নিয়ে গেলেন।

খেতে-খেতে স্বামীজি বললেন, 'মেলাই তেল-চর্বি খাওয়া ভালো নয়। লুচির থেকে রুটি ভালো। মাছ মাংস তাজা তরি-তরকারি খাবি, মিষ্টি কম।' বলতে-বলতে প্রশ্ন করলেন: 'হ্যাঁ রে, কখানা রুটি খেয়েছি? আর কি খেতে হবে?'

খাচ্ছেন বটে কিন্তু যেন শরীরজ্ঞান নেই, খিদে আছে কি নেই তাও বুঝতে পারছেন না।

হরি মহারাজ—তুরীয়ানন্দ বলতেন, 'নরেনের সব কাজ কী চটপটে, পাগড়ি বাঁধবে তাও কী চটপট করে। অন্যের পাগড়ি বাঁধতে কত আরশির দরকার, সাতবার করে মুখ দেখছে ঠিক হল কিনা। কিন্তু নরেন কাপড়খানা নিয়ে ঘুরিয়ে নিমেষের মধ্যে পাগড়ি বেঁধে ফেললে—একেবারে নিখুঁত। এই বলে নিজেই নরেনের অনুকরণে নিজের মাথায় পাগড়ি বাঁধবার কসরৎ দেখাল।

'অন্য লোকে এক ঘণ্টায় যে কাজ করবে নরেন দুই মিনিটে সে কাজ করে ফেলে আর এক সঙ্গে পাঁচ-ছটা কাজ করে যায়। নরেনের মন এত তীক্ষ্ণ ও দ্রুতগামী যে কাজে মনটি স্পর্শ করেছে তখনিই সে কাজটা হয়ে যাচ্ছে। আলুর খোসা ছাড়ানো দেখ, আলুকে আঙুলে ধরে বাটর গায়ে ছোঁয়াতেই খোসাটি পরিষ্কার উঠে গেল। আলুটা কোনো জায়গায় বেধে গেল না, চোকলাও উঠল না এতটুকু। কী আশ্চর্য তার কাজকর্ম। সব বিষয়ে যেন চনমন করছে। এই কুটনো কুটছে, এই হাসি-তামাসা করছে, এই দর্শনের কথা বলছে কোনোটাই যেন তার পক্ষে কিছু নয়। নরেনের মুখখানি নয় তো ক্ষুর-খানি। মাথার যেখানে ধরবে সেখান থেকেই একটা চাকলা তুলে নেবে। যে কথাই যে তুলুক না কেন, নরেন তার এমন জবাব দেবে যে তার কথা বলবার আর কিছুই থাকবে না। সে লোক যত বড়ই হোক না, তাকে একেবারে কেঁচো করে দেবে।'

একবার বোম্বাই-অঞ্চলে হরি-মহারাজের সঙ্গে স্বামীজির দেখা হয়েছিল। স্বামীজি হরিমহারাজকে বললেন, 'ভাই হরি, ধর্ম-কর্ম কিছু বুঝলুম না। ভগবানও কিছু পেলুম না, তবে একটা কিছু হয়েছে, বুকটার ভিতর বড় ভালোবাসা বেড়ে গিয়েছে। জগতকে শুধু ভালোবাসা দিতে ইচ্ছে করছে—অফুরন্ত ভালোবাসা, আর তো কিছু বুঝতে পারছি না'।'

খানকতক বই মাথায় দিয়ে গাছতলায় স্বামীজি বাঁ পাশ ফিরে মাটিতে শুয়ে আছেন। মুখে শুধু এই কথা : 'কই ভগবানকে তো দেখতে পেলুম না' কত বইই তো ঘাটলুম, কিছুই তো বুঝতে পেলুম না। তবে কী জানো, বুকের ভিতর কী হয়েছে। সেইটেই আমাকে ঘোরাবার চেষ্টা করেছে, অস্থির করে তুলেছে। ওরে এটার নামই কি ভালোবাসা?'

হরি-মহারাজ বলছেন, 'কী আশ্চর্য। দেখলুম যেন সাক্ষাৎ শিব হয়ে শুয়ে আছেন আর মুখে বলছেন, ভগবান দর্শন হল না, ধর্ম-কর্ম সব অসার হল! গরিব-দুঃখীর দুঃখ-কষ্টেব যন্ত্রণা —এটাই তাঁকে উন্মত্ত করে তুলেছে। শিব কি আর শিবকে দেখতে পান — শিব শিবই হন।'

একদিন শিষ্য শরৎ এসে জিজ্ঞেস করলে, 'স্বামীজি, কেমন আছেন?'

'বাঙলা দেশে শরীব ধারণ করতে হয়েছে, শরীরে রোগ লেগেই আছে।' বললেন স্বামীজি, 'বেশি কাজ করতে গেলেই শরীব দুর্বহ হয়ে ওঠে। তবে যে কটা দিন দেহ আছে, তোদের জন্যে খাটব। খাটতে-খাটতে মরব।'

'আপনি এখন কিছু দিন কাজকর্ম ছেড়ে স্থির হয়ে বসে থাকুন, তা হলেই শরীর সারবে।'

'বসে থাকবার কি উপায় আছে? ঐ যে ঠাকুর যাকে কালী-কালী বলে ডাকতেন, ঠাকুরের দেহ রাখবার দু তিন দিন আগে সেইটে এই শরীরে ঢুকে গেছে—সেইটেই আমাকে এদিক-ওদিক কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায়, স্থির হয়ে থাকতে দেয় না।'

শরৎ কৌতূহলী হল। জিজ্ঞেস করলে 'শক্তি-প্রবেশের কথাটা কি রূপকচ্ছলে বলছেন?'

'না রে না। তবে শোন কী হয়েছিল। দেহ যাবার তিন-চার দিন আগে ঠাকুর আমাকে একদিন তাঁর কাছে ডাকলেন। সামনে বসিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। আমি তখন ঠিক অনুভব করতে লাগলুম তাঁর শরীর থেকে একটা সূক্ষ্ম তেজ ইলেকট্রিক শক-এর মত এসে আমার শরীরে ঢুকছে। ক্রমে আমিও

বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম। কতক্ষণ এমনি ছিলুম মনে পড়ছে না। যখন বাহ্য চেতনা হল, দেখি ঠাকুর কাঁদছেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে ঠাকুর সস্নেহে বললেন, 'আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করে তবে ফিরে যাবি।' আমার মনে হয় ঐ শক্তিই আমাকে এ-কাজে সে-কাজে কেবল ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে। বসে থাকতে দিচ্ছে না।'

তারপর স্বামীজি যখন আমেরিকাকে মাতিয়ে দিলেন তখন গিরিশ ঘোষ উদ্ভ্রান্তের মত বলতে লাগল : 'ওহে এ হল কী। এ যে দেখি মিরাকল-এর দিন আবার ফিরে এল। মিরাকল বহু শতাব্দী আগে হয়েছিল শুনেছি, এখন যে চোখের সামনে সেই মিরাকল দেখছি। এ যে বুদ্ধি-বিবেচনার উপরে গেল। এ কি তর্ক-যুক্তিতে হয়? একটা শক্তি পেছনে না দাঁড়ালে এ সব কাজ কি কেউ করতে পারে?' বলে দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ করে ঘন-ঘন প্রণাম করতে লাগল।

যোগেন মহারাজের বাবা বৃদ্ধ চৌধুরী মশায়ও স্বামীজির জয়-গৌরবে আত্মহারা। একদিন আলমবাজারের মঠে এসে শশী-মহারাজকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন: 'ওহে, এ হল কী! নরেন যে সকলকে ছাপিয়ে উঠল। এখন যে ও শঙ্কর-বুদ্ধের দলে গেল, আর সাধারণ লোকের হিসেবে রইল না। ব্যাপারটা হল কী, এ যে শঙ্কর-বুদ্ধ আবার ফিরে এল।'

৯৩

আটাশে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭, স্বামীজির কলকাতা স্বামীজিকে অভিনন্দিত করল। সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব মানপত্র পড়লেন।

'বেদান্তের আচার্যরূপে বেদান্তের বিস্তারে আপনার কৃতকার্য হবার কারণ শুধু আপনার আর্যধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও সুগভীর পরিচয় নয়, নয় শুধু আপনার শাস্ত্র-ব্যাখ্যার পটুতা, নয় বা আপনার বাগ্মিতা ও বাগবৈদগ্ধ্য, আসল কারণ আপনার প্রদীপ্ত চরিত্র। আপনার সরল অকপট আত্মত্যাগময় জীবন, আপনার বিনয়, আদর্শনিষ্ঠা ও তৎপরায়ণতা। আমরা যে আপনাকে পেয়েছি তার জন্যে আমরা আপনার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট ঋণী। আপনার ভিতরে যে দিব্য বহ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিল তা তাঁরই আবিষ্কার এবং তাঁরই প্রসাদে আপনি ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী হয়েছেন।

আপনার স্বদেশ আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। অগণ্য হিন্দুর কাছেই আপনাকে হিন্দুধর্মের সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে হবে। আমাদের জাতীয় ধর্ম কোনো পার্থিব বিজয় চায় না। তার লক্ষ্য আধ্যাত্মিক। জড়নয়নের অন্তরালে অবস্থিত, বিচারদৃষ্টিতে মাত্র প্রতিভাত, সত্যই ওর অস্ত্র। আপনি হিন্দুদের—সমগ্র জগৎবাসীর—অন্তশ্চক্ষু উন্মীলন করে দিন, যাতে ইন্দ্রিয়ের রাজ্যের পরপারে পরমসত্যের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়।'

প্রতিভাষণে স্বামীজি প্রথমেই তাঁর মাতৃভূমিকে স্মরণ করলেন। বললেন :

'মানুষ নিজের মুক্তির চেষ্টায় জগৎপ্রপঞ্চের সম্পর্ক একেবারে ত্যাগ করতে চায়—এমন কি, সে নিজে যে সার্ধ ত্রিহস্ত-পরিমিত দেহধারী মানুষ তা ভুলতেও প্রাণপণে চেষ্টা করে, কিন্তু তার অন্তরের অন্তরে দিবারাত্র সে একটি মৃদু অস্ফুট ধ্বনি শুনতে

পায়—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। হে ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানীর অধিবাসী, আমি আপনাদের কাছে সন্ন্যাসীভাবে বা ধর্মবক্তারূপে আসিনি, আগের মতন সেই কলকাতার ছেলে হয়ে এসেছি। ইচ্ছে হচ্ছে, কলকাতার পথে ধুলোয় বসে ছোট ছেলেটির মতই সরল প্রাণে মনের কথা খুলে বলি। স্বদেশে ফেরবার ঠিক আগে আমাকে একজন ইংরেজ বন্ধু জিজ্ঞেস করেন, চার বছর বিলাসের লীলাভূমি গৌরবমুকুটধারী মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্ত্য দেশে বসবাসের পর আর কি আপনার ভারতবর্ষকে ভালো লাগবে? আমি বললাম, এখানে আসবার আগে ভারতবর্ষকে শুধু বিমূর্ত ভাবমূর্তিতে ভালোবাসতাম, এখন ভারতবর্ষের প্রতিটি ধূলিকণাকে আমি প্রত্যক্ষরূপে ভালোবাসি, ভারতবর্ষের প্রতিটি ধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র তীর্থস্বরূপ।

শিকাগোর ধর্মমহাসভা একটা বিরাট ব্যাপার হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তার গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল খৃস্টধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা ও অন্য ধর্মগুলিকে হাস্যাস্পদ করা। কার্যত তাদের ইচ্ছানুরূপ না হয়ে অন্যরূপ হয়েছিল। বিধির বিধানে তা না হয়ে উপায় ছিল না। আমার আমেরিকা যাত্রা ধর্মমহাসভার জন্যে তত নয় যত বেদান্তপ্রচারের জন্যে। তবে ঐ সভা দ্বারা আমার পথ অনেক পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। অজ্ঞানই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জাতির পরস্পর বিদ্বেষের মূল, আমার প্রচার ছিল সেই অজ্ঞানের বিরুদ্ধে। পশ্চিমের লোক মনে করে যেহেতু ভারতবাসী দরিদ্র ও পরাধীন সেহেতু সে ধর্মহীন, তেমনি ভারতবাসীরা মনে করে যেহেতু পশ্চিমের লোক জড়বাদী ও ভোগতৎপর সেহেতু সে ধর্মবিমুখ। দুইই অজ্ঞান, দুইই ভ্রান্তি। যত পথ সবই সেই ঈশ্বরের পথ, যত মানুষ সবই সেই ঈশ্বরের প্রতিনিধি।

আপনারা আমার হৃদয়ের আরেক তন্ত্রী—সবচেয়ে গভীরতম তন্ত্রীতে স্পর্শ করেছেন—আমার গুরুদেব, আমার ইষ্ট, আমার জীবনের আদর্শ, আমার প্রাণের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম করেছেন। যদি কায়মনোবাক্যে আমি কোনো সৎ কাজ করে থাকি, যদি আমার মুখ থেকে এমন কোনো কথা বার হয়ে থাকে যাতে জগতে কোনো লোক কিছুমাত্র উপকৃত হয়েছে, তাতে আমার কোনো গৌরব নেই, তা তাঁর। কিন্তু যদি আমার মুখ থেকে কখনো কোনো অভিশাপ বা ঘৃণার বাক্য বার হয়ে থাকে, তবে তার কালিমা আমার, তাঁর নয়। যা কিছু দুর্বল, যা কিছু দোষযুক্ত, সব আমি। যা কিছু পবিত্র, যা কিছু বলপ্রদ, জীবনপ্রদ, সমস্ত তিনি। এমন উজ্জ্বল এমন সর্বমহিমামণ্ডিত মহাপুরুষ আর হয়নি।

মহাশক্তির আধার শ্রীরামকৃষ্ণ। যারা শত শত শতাব্দী ধরে পৌত্তলিক উপাসনার বিরুদ্ধে চিৎকার করে এসেছে তারাই এখন শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করছে। এ কার শক্তি? তোমাদের, না আমার? এ আর কারু শক্তি নয়, যে শক্তি এখানে রামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, এ সেই শক্তি। কারণ তুমি আমি সাধু সন্ত এমন কি অবতার মহাপুরুষ, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই শক্তির বিকাশমাত্র, কোথাও বা কম কোথাও বা বেশি ঘনীভূত। এখন আমরা সেই মহাশক্তির খেলার আরম্ভ মাত্র দেখছি আর বর্তমান যুগের অবসানের আগেই তোমরা এর আশ্চর্য, অতি-আশ্চর্য খেলা প্রত্যক্ষ করবে। যে মূল জীবনীশক্তি ভারতকে সদা সঞ্জীবিত রাখবে, সেই ধর্মের কথা সময়ে-সময়ে আমরা ভুলে যাই। যে মেরুদণ্ডের বলে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেই ধর্মের স্থানে আমরা যদি রাজনীতির মেরুদণ্ড এনে বসাই, তা হলে আমাদের সমূলে বিনাশ হবে। কিন্তু তা হবার নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবই তার প্রমাণ। তাঁর জীবনটাই একটা ধর্মমহাসভা।

কলকাতাবাসী যুবকদের ডেকে বলছি, ওঠো, জাগো, সাহসে বুক বাঁধো, একমাত্র আমাদের শাস্ত্রেই 'অভীঃ' এই বিশেষণ উচ্চারিত হয়েছে। আমাদের 'অভীঃ' অর্থাৎ নির্ভীক হতে হবে, তবেই আমরা সিদ্ধিলাভ করব। ওঠো, জাগো, তোমাদের মাতৃভূমি মহাবলি প্রার্থনা করছেন। শুধু নিজের উপর বিশ্বাস রাখো, নিজেকে শ্রদ্ধা করতে শেখ। আমার গুরুদেব বলতেন, যে নিজেকে দুর্বল ভাবে সে দুর্বলই হয়ে যায়। শ্রদ্ধা তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করুক। পাশ্চাত্ত্যজাতি যে জড়জগতে আধিপত্য লাভ করেছে তা এই শ্রদ্ধার ফলে। তারা তাদের শারীরিক বলে বিশ্বাসী। তোমরা যদি আত্মায় বিশ্বাসী হও, তা হলে ফল আরো অদ্ভুত হবে। আত্মা অনন্ত শক্তির আধার, সেই অনন্ত অবিনাশী আত্মায় বিশ্বাসী হও। এই আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করো।'

চলমান জগতের যা কিছু সব ঈশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্ত করো। অনিত্য নামরূপাত্মক ভোগ ত্যাগ করে তাঁকেই সম্ভোগ করো। কারু ধনে লোভ কোরো না।

এখন যখন দেহাত্মবোধ যায়নি তখন ফলত্যাগ করে শতবর্ষ জীবিত থেকে ইহলোকে কর্ম করো। 'পশ্যেম শরদঃ শতং, জীবেম শরদঃ শতং, শৃণুযাম শরদঃ শতং, প্রব্রবাম শরদঃ শতং, অদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতম।' আমি যেন শত শরৎ দর্শন করি, শত শরৎ জীবিত থাকি, শত শরৎ শ্রবণ করি, শত শরৎ কথা বলি, শত শরৎ অদীন হয়ে দিন কাটাই।

সর্বত্র এই কর্মেরই প্রশস্তি। কর্মে ব্যাপ্ত এই আত্মা সর্বপ্রাণীর আশ্রয়। তার যাগযজ্ঞ দ্বারা সে দেবলোকের আশ্রয় হয়, অধ্যয়ন ও অনুশিক্ষা দ্বারা সে ঋষিলোকের আশ্রয় হয়, পিতৃতর্পণ ও প্রজাইচ্ছা দ্বারা সে পিতৃলোকের আশ্রয় হয়, আর মানুষকে অন্নদান দ্বারা সে মনুষ্যলোকের আশ্রয় হয়। আর যদি পশুকে তৃণোদক দেয়, কুকুর, বিড়াল, কাক ও পিপীলিকাকে খাদ্য দেয় তবে ঐ সব প্রাণী দাতা মানুষকেই অবলম্বন করে জীবিত থাকে এবং সেই জন্যে ঐ দাতা ও কর্মকারী মানুষের মংগল প্রার্থনা করে।

কাশীপুরের বাগানে আছেন স্বামীজি, একদল সংস্কৃত-পণ্ডিত তাঁর সংগে তর্ক করতে এল। তাঁরা স্বামীজিকে সংস্কৃতে সম্ভাষণ করে সংস্কৃতেই বাক্যালাপ শুরু করলে। স্বামীজি পেছপা হলেন না, তিনিও অনর্গল সংস্কৃতে উত্তর দিতে লাগলেন। বিদেশে থাকার দরুন বহুদিন সংস্কৃতচর্চার অবকাশ মেলে নি, তবুও স্বামীজির সংস্কৃত দুর্বল বা নিষ্প্রভ দেখাল না। পণ্ডিতেরা উত্তেজিত চিৎকারে দর্শনের কূট প্রশ্ন পাড়তে লাগল আর স্বামীজি ধীরে প্রশান্তস্বরে মীমাংসা রচনা করতে লাগলেন। উচ্চারণের গম্ভীর লালিত্যে স্বামীজির সংস্কৃতই শ্রবণমধুর।

এক জায়গায় একটু ভুল করে ফেললেন স্বামীজি। 'অস্তি' বলতে গিয়ে 'স্বস্তি' বলে ফেললেন। পণ্ডিতের দল তারস্বরে টিটকিরি দিয়ে উঠল।

স্বামীজি বিনয়স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'পণ্ডিতানাং দাসোঽহম ক্ষন্তব্যমেতৎ স্খলনম।' অর্থাৎ আমি পণ্ডিতদের দাস, আমার এই স্খলন মার্জনা করুন।

পণ্ডিতের দল স্বামীজির বিনয়-দৈন্যে মুগ্ধ হয়ে গেল। সত্যিকার পণ্ডিত না হলে এত নম্রতা, এত গভীরতা হয়!

যোগানন্দ, নির্মলানন্দ, শিবানন্দ—স্বামীজির গুরুভায়েরা সেখানে উপস্থিত। প্রীতিসম্ভাষণ অন্তে পণ্ডিতেরা যখন চলে যাচ্ছে তখন গুরুভায়েরা জিজ্ঞেস করলে, 'স্বামীজিকে কেমন বুঝলেন?'

'ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি গভীর না হলেও স্বামীজি শাস্ত্রের গূঢ়ার্থদ্রষ্টা, মীমাংসায় অদ্বিতীয়, আর বাদখণ্ডনে বিদগ্ধ-নিপুণ। এমনটি আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি।' পণ্ডিতের দল স্বীকৃতির প্রসন্নতায় তৃপ্তমুখে বিদায় নিল।

'কিন্তু শশী-মহারাজ, রামকৃষ্ণানন্দ কোথায়?' স্বামীজি শরৎকে জিজ্ঞেস করলেন।

'তিনি পাশের ঘরে।'

'পাশের ঘরে কী! এই ঘোরতর তর্কের সময় সে এখানে ছিল না?'

'না, তিনি পাশের ঘরে বসে একান্তমনে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছিলেন।'

'প্রার্থনা—কেন?'

'যাতে তর্কে আপনি জেতেন, পণ্ডিতেরা পরাস্ত হয়, তার জন্যে।'

স্বামীজি হেসে উঠলেন। কিন্তু অন্তরে-অন্তরে বুঝলেন তাঁকে তাঁর গুরুভায়েরা কী গভীর ভালোবাসে।

বাবুরাম মহারাজ বা প্রেমানন্দ স্বামী প্রথমে স্বামীজির প্রতি বিরূপ ছিল—আমেরিকায় তাঁর বক্তৃতায় শ্রীরামকৃষ্ণের নামপ্রচার করছেন না বলে।

'নরেনটা অহঙ্কারে ফুলে উঠেছে।' বলছে বাবুরাম মহারাজ, 'নিজে নাম কেনবার জন্যে হুড়োহুড়ি লাগিয়েছে, ভাবখানা, চেলা করে নিজেই এক মহান্ত হয়ে বসবে। এমন অহংকার, ঠাকুরের নামটা পর্যন্ত উল্লেখ করছে না। শুধু নিজের নাম জাহির করে বেড়াচ্ছে। কথা যা বলছে তার কিছুই যেন ঠাকুরের নয়! এ ভাব যেন নরেনের স্বতন্ত্র ভাব, তার সঙ্গে ঠাকুরের ভাবের কোনোই মিল নেই!'

কদিন পরে আমেরিকা থেকে স্বামীজির চিঠি এল শশী-মহারাজের কাছে। লিখছেন :

'আমার বক্তৃতায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম করা হয়নি বলে কেউ যেন মনে-মনে উদ্বিগ্ন না হয়। তাঁর নাম এখানে প্রথমেই করতে গেলে বা তাঁর কথা যেখানে-সেখানে বলতে গেলে লোকে উপযুক্ত সম্মান না দেখাতে পারে, সেজন্যে প্রথমে নিজের পা জমিয়ে নিতে হচ্ছে, বক্তৃতায় বেদান্তের কথা বলতে হচ্ছে। তারপর একবার জমে গেলে তখন তাঁর কথা চালানো যাবে। আরে, বক্তৃতা করা কি আমার কর্ম? এ কারে পড়ে করতে হচ্ছে। বক্তৃতা করি আর নিজে অবাক হয়ে যাই, বলি, মগজ বাবাজি, তোমার পেটে এত ছিল! প্রতাপ মজুমদার যে পাঁচ কথা গিয়ে বলছে, ও কী করতে পারে? আমরা রামকৃষ্ণের তনয়, তাঁর শক্তিতে সর্বদা জয়লাভ করব।'

এ চিঠি পড়ে বাবুরাম মহারাজের মত পালটে গেল। বললে, 'তাই তো, আমরা যে সব কথা বলাবলি করছিলুম নরেন সেখানে বসে সব টের পেয়েছে দেখছি। তা হলে নরেনের দেখছি শক্তি জন্মেছে। তা তো হবেই, তিনি নরেনকে এত করে ভালোবাসতেন আর নরেনের মত তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি আর কার আছে! নরেন ঠিকই বলেছে, নিজেকে একটু দাঁড় করাতে না পারলে গুরুকে মানবে কেন?'

সেই ধরনের কথাই আবার উঠল বাগানবাড়িতে।

'তুমি ওদেশে সর্বদা সর্বসমক্ষে ঠাকুরকে অবতার বলে প্রচার করলে না কেন?' প্রশ্ন করল গুরুভাই।

স্বামীজি বললেন, 'ওরা দর্শন-বিজ্ঞানের বড়াই করে। তাই যুক্তি-তর্ক দর্শন-বিজ্ঞান দিয়ে ওদের জ্ঞান-গরিমা চূর্ণ করে দিতে না পারলে কোনো কিছু করা যায় না। তর্কে

খেই হারিয়ে যারা যথার্থ তত্ত্বান্বেষী হয়ে আমার কাছে আসত, তাদের কাছে ঠাকুরের কথা কইতুম। নইলে একেবারে অবতারবাদের কথা কইলে ওরা বলত, ও আর তুমি নতুন কী বলছ, আমাদের প্রভু ঈশাই তো রয়েছেন।'

পাশ্চাত্য সভ্যতার ঐহিকতা ও ভারতীয় সভ্যতার আধ্যাত্মিকতা দুয়ের সংযোগ সাধন করতেই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব—স্বামীজি এই কথাই সেদিন বলছিলেন বুঝিয়ে।

'আর এক কথা—ওদেশের লোকেরা ভাবে, যে যত ধর্মপরায়ণ হবে সে বাইরের চালচলনে তত বেশি গম্ভীর হবে, মুখে অন্য কথাটি থাকবে না। একদিকে আমার মুখে উদার ধর্মকথা শুনে ওদেশের ধর্মযাজকেরা যেমন অবাক হয়ে যেত, তেমনি বক্তৃতান্তে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করতে দেখেও ওদের বিস্ময়ের অন্ত থাকত না। মুখের উপর কখনো বলেও ফেলত, স্বামীজি, আপনি একজন ধর্মযাজক, সাধারণ লোকের মত আপনার এমনি হাসি-তামাসা করা উচিত নয়। আপনাকে এরূপ চপলতা মানায় না। তার উত্তরে আমি বলতাম, আমরা আনন্দের সন্তান, আমরা কেন বিরস মুখে থাকব ?'

'জয় রামকৃষ্ণ'— ভক্ত নবগোপাল ঘোষের এই একমাত্র ধ্বনি ছিল। বাড়ি করবে বলে জমি কিনতে গিয়ে শুনল অঞ্চলটার নাম রামকৃষ্ণপুর—জায়গাটা গঙ্গার পশ্চিম পারে, হাওড়ার মধ্যে। বাড়ি তৈরি হবার কয়েক দিন পরেই স্বামীজি ফিরেছেন, অতএব বাড়িতে স্বামীজিকে দিয়েই রামকৃষ্ণবিগ্রহ স্থাপন করানো চাই। প্রস্তাব নিয়ে মঠে গেল নবগোপাল, স্বামীজি এক বাক্যে সম্মত হলেন।

উত্তাল উৎসব লেগে গেল। জয় রামকৃষ্ণ—এই অবিচ্ছিন্ন আনন্দধ্বনিতে রামকৃষ্ণপুর মুখর হয়ে উঠল।

তিনখানা ডিঙি নৌকো করে কলকাতা থেকে স্বামীজি, তাঁর গুরুভাইয়েরা ও বালক ব্রহ্মচারীর দল রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে এসে নামলেন। আমেরিকা-ফেরত স্বামীজিকে দেখবার জন্যে ঘাটে অগণন লোক ভিড় করেছে—কিন্তু কোথায় স্বামীজি ? কোথায় সেই বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ ? সবাই ভেবেছিল স্বামীজির কত না জানি সাজসজ্জার ঘটা থাকবে, কত না জানি সম্ভ্রম-সমারোহ! কিন্তু ও কী বেশবাস! পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় পাগড়ি আর খালি পা, গলায় মৃদঙ্গ ঝোলানো। গান গাইছেন স্বামীজি!

তাঁর এই দীনতায়, সর্বসাধারণের সঙ্গে মিশে যাওয়ার সমতায়, সর্বোপরি তাঁর প্রবল-উজ্জ্বল ভক্তিতে সবাই অভিভূত হয়ে গেল। কিন্তু কী গাইছেন ?

গাইছেন গিরিশ ঘোষের লেখা গান—গানের বিষয় রামকৃষ্ণ :

> দুখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছে আলো করে
> কে রে ওরে দিগম্বর এসেছে কুটির-ঘরে।
> ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছে একা
> বদনে করুণামাখা, হাস কাঁদ কার তরে॥

নবগোপালের বাড়ির দোতলায় ঠাকুরঘর হয়েছে, মর্মর প্রস্তরে তৈরি। মাঝখানে সিংহাসন, তার উপর শ্রীরামকৃষ্ণের পোর্সিলেনের প্রতিমূর্তি।

ঘর ও মূর্তি দেখে স্বামীজি খুব খুশি।

'আমাদের সাধ্য কী যে ঠাকুরের সেবাধিকার লাভ করি ? সামান্য ঘর, সামান্য অর্থ,' নবগোপালের গৃহিণী বললে, 'আপনি নিজে কৃপা করে ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করে আমাদের ধন্য করুন।'

'তোমাদের ঠাকুর তো এমনি মারবেল পাথরে মোড়া ঘরে চোদ্দপুরুষে বাস করেননি।' স্বামীজি বললেন হাসি মুখে, 'সেই পাড়াগাঁয়ে খোড়ো ঘরে জন্ম, যেন-তেন করে দিন কাটিয়ে গেছেন। এখানে এমনি রাজসিক সেবায় যদি তিনি না থাকেন তো কোথায় আর থাকবেন ?'

সর্বাঙ্গে বিভূতি মেখে স্বামীজি পূজকের আসনে বসলেন। ঠাকুরকে আবাহন করলেন। যেন মহাদেবই মহাদেবের উপাসনায় বসেছেন।

যথাবিহিত পূজোপচারে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হল। স্বামীজি প্রণীত মন্ত্র উচ্চারণ করলেন :

স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥

সাতুই মার্চ রবিবার দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে ঠাকুরের আবির্ভাবোৎসব হচ্ছে। বেলা দশটার মধ্যেই স্বামীজি সদলে সেখানে উপস্থিত হলেন। এবারের জনসঙ্ঘের বিশেষ আকর্ষণ স্বামীজিকে দেখা ও তাঁর বক্তৃতা শোনা। নগ্নপদ, মাথায় পাগড়ি, স্বামীজির গৌরবোজ্জ্বল মূর্তিই যেন এক ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা। সবাই তাঁর পাদপদ্ম স্পর্শ করবার জন্যে উন্মুখ।

স্বামীজি ভবতারিণীর মন্দিরে ঢুকলেন। জগন্মাতাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। পরে রাধাকান্তের মন্দিরে গিয়ে রাধাকান্তকে প্রণাম করে রামকৃষ্ণের ঘরটিতে উপস্থিত হলেন। এই সেই ঘর! এই সেই ঠাকুরের তক্তপোষ। এই জলের জালা। ঐ সেই পশ্চিমের বারান্দা।

পঞ্চবটীর দিকে এগুলেন। দেখলেন গঙ্গার দিকে মুখ করে গিরিশ ঘোষ বসে আছে। 'এই যে জি-সি'। স্বামীজি গিরিশকে প্রণাম করলেন। গিরিশ করজোড়ে প্রতি-নমস্কার করল।

'সেই একদিন আর এই একদিন।' বললেন স্বামীজি, যেন গিরিশকে আগের কথা মনে করিয়ে দিতে চাইলেন।

'তা বটে।' গিরিশও এক পলক অতীতে ঘুরে এল, বললে, 'তবু এখনো সাধ যায় আরো দেখি। যাবৎ বাঁচি তাবৎ দেখি।'

সবাই বক্তৃতার জন্যে পিড়াপিড়ি করতে লাগল। স্বামীজিও দাঁড়ালেন বলতে। কিন্তু এমন ভীষণ কোলাহল সুরু হল কিছুতেই তার ঊর্ধ্বে তাঁর কণ্ঠস্বরকে তুলতে পারলেন না। বক্তৃতা ছেড়ে চললেন সেই প্রসিদ্ধ বেলগাছের দিকে। তাঁর সঙ্গে দুজন ইংরেজ মহিলা আছেন, তাদেরকে ঠাকুরের সাধনার স্থলগুলি দেখাতে লাগলেন।

পরে ঘোড়ার গাড়ি ডাকিয়ে ফিরে চললেন মঠে, আলমবাজারে।

গাড়িতে চলতে চলতে শিষ্য শরৎকে বললেন, 'শুধু ভাবমাত্র নিয়ে পড়ে থাকলে কি হবে ? এসব উৎসব এসব কথন-কীর্তনও দরকার। তবে তো জনসাধারণের মধ্যে এসব ভাব ক্রমশ ছড়িয়ে পড়বে। হিন্দুদের বারো মাসে তেরো পার্বণের তাৎপর্যও তাই। অবতারকল্প মহাপুরুষেরাও লোকসংগ্রহের জন্যে উৎসবপালনের বিধান দেন।'

'কিন্তু এসব বাহ্যিক লোকব্যবহারের কি প্রয়োজন আছে ?'

'দেশকাল পাত্র ভেদে প্রয়োজন আছে বৈকি। অধিকারীভেদে সব ব্যবহারেরই প্রয়োজন আছে। ঠাকুরের কথা মনে নেই ? মা কোনো ছেলেকে পোলাও কালিয়া রেঁধে দেন,

কোনো ছেলেকে ঝোল-ভাত। এখানকার ভাব তো জানিস—এখানকার ভাব সম্প্রদায়-বিহীনতা। আমাদের ঠাকুর ঐটে দেখাতেই জন্মেছিলেন। তিনি সব মানতেন, আবার বলতেন, ব্রহ্মজ্ঞানের দিক দিয়ে দেখলে ও সব আবার মিথ্যা মায়ামাত্র।'

চৌঠা মার্চ স্টার থিয়েটারে স্বামীজি 'সর্বাবয়ব বেদান্ত' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন।

উপনিষদের মন্ত্রাবলীর মধ্যে গূঢ় ভাবে যে সমন্বয় আছে তার ব্যাখ্যা ও প্রচার দরকার। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ—সব রকম মতবাদই সত্য ও চরম উপলব্ধির পথে ভিন্ন ভিন্ন সোপান মাত্র। সকলের মধ্যেই যে সমন্বয় রয়েছে তা জগতের সামনে স্পষ্ট করতে হবে। শুধু ভারতের নয়, সমগ্র জগতে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে পরম সামঞ্জস্য বিদ্যমান তাই দেখতে হবে।

ঈশ্বরকৃপায় আমার এমন এক ব্যক্তির পদতলে বসে শিক্ষালাভের সৌভাগ্য হয়েছিল, যাঁর সমগ্র জীবনই উপনিষদের মহাসমন্বয়-পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা। তাঁকে দেখলেই মনে হত উপনিষদের ভাবগুলি যেন বাস্তব মানবরূপ ধরে প্রকাশিত হয়েছে। বৈদান্তিক সম্প্রদায়-গুলি যে পরস্পরবিরোধী নয়, পরস্পরসাপেক্ষ, একটি যে অপরটির পরিণতিস্বরূপ, সোপানস্বরূপ এবং সর্বশেষ চরম লক্ষ্য অদ্বৈত 'তত্ত্বমসি'তে পর্যবসান—এ দেখানোই আমার জীবনব্রত।'

স্বামীজি বলরাম বোসের বাড়িতে আছেন, শিষ্য শরৎ চক্রবর্তীকে সায়নভাষ্য সহ বেদ পড়াচ্ছেন, এমন সময় গিরিশ ঘোষ পাশে এসে বসলেন, শুনতে লাগলেন।

হঠাৎ গিরিশের দিকে তাকিয়ে স্বামীজি বললেন, 'জি সি-সি, এসব তো কিছু পড়লে না, শুধু কেষ্ট-বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে।'

'কী আর পড়ব ভাই, অত অবসর নেই বুদ্ধিও নেই, যে ওতে সেঁধুব।' বললেন গিরিশ, 'তবে ঠাকুরের কৃপায় ও সব বেদবেদান্ত মাথায় রেখে এবার পাড়ি মারব। তোমাদের দিয়ে তাঁর ঢের কাজ করাবেন বলে ওসব পড়িয়ে নিয়েছেন—আমার ওসব দরকার নেই।' এই বলে গিরিশ প্রকাণ্ড বেদগ্রন্থখানিতে মাথা ঠেকিয়ে বারে বারে প্রণাম করে বলতে লাগলেন, 'জয় বেদরূপী রামকৃষ্ণের জয়।'

স্বামীজি আনমনা হয়ে কী ভাবছিলেন, গিরিশ বলে উঠলেন, 'হাঁ হে, নরেন, একটা কথা বলি। বেদবেদান্ত তো ঢের পড়লে, কিন্তু এই যে দেশে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, নানা মহাপাতক চোখের সামনে দিন-রাত ঘুরছে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে?' বলে গিরিশ বাস্তব কতকগুলি ঘটনার ফিরিস্তি দিলে। বললে, 'ওসব দারিদ্র্য অত্যাচার প্রবঞ্চনা—এদের রহিত করবার উপায় তোমার বেদে আছে কি?'

স্বামীজি নির্বাক হয়ে থাকলেন। জগতের দুঃখকষ্টের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর চোখে জল এল। হয়তো তিনি আকুল হয়ে উঠবেন তাই তাড়াতাড়ি ভাব গোপন করে উঠে চলে গেলেন বাইরে।

শরৎকে গিরিশ বললেন, 'দেখলি কত বড় প্রাণ। তোর স্বামীজিকে শুধু বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানি না, কিন্তু ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল এই মহাপ্রাণতার জন্যে মানি। চোখের সামনে দেখলি তো, মানুষের দুঃখকষ্টের কথা শুনে করুণায় হৃদয় ভরে উঠতেই বেদ-বেদান্ত সব উড়ে পালাল।'

শরৎ বললে, 'দিব্যি বেদ পড়া হচ্ছিল, মায়ার জগতের কী কতকগুলো ছাই-ভস্ম কথা তুলে স্বামীজির মন খারাপ করে দিলেন।'

'মন খারাপ ! জগতে এত দুঃখকষ্ট আর উনি সে দিকে না তাকিয়ে চুপ করে বসে শুধু বেদ পড়ছেন । রেখে দে তোর বেদ-বেদান্ত, শাস্ত্র-ব্যাকরণ ।'

'আপনি হৃদয়বান কিনা তাই শুধু হৃদয়ের ভাব-ভাষাই ভালোবাসেন । শাস্ত্র—যার আলোচনায় জগৎ ভুল হয়ে যায় তাতে আপনার আদর নেই ।'

গিরিশ গর্জে উঠলেন : 'বলি জ্ঞান আর প্রেমের ভেদটা কোথায় আমায় বুঝিয়ে দে দেখি । এই দ্যাখ না, তোর গুরু স্বামীজি যেমন পণ্ডিত তেমনি প্রেমিক । অত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করছিলেন কিন্তু যেই জগতের দুঃখের কথা শুনলেন, অবহিত হলেন, অমনি জীবের দুঃখে কাঁদতে লাগলেন । বেদ-বেদান্ত যদি জ্ঞানে আর প্রেমে ভেদ করে থাকে বলিস তো অমন বেদ-বেদান্ত আমার মাথায় থাকুক ।'

স্বামীজি ফিরে এলেন । শরৎকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে কী কথা হচ্ছিল ?'

এই বেদের কথাই হচ্ছে । শরৎ বললে, 'গিরিশবাবু বেদ পড়েননি কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত যথার্থ হচ্ছে, একেবারেই বেদের অবিরোধী নয় ।'

স্বামীজি বললেন, 'গুরুভক্তি থাকলে সব সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ হয়, পড়বার-শোনবার দরকার হয় না । কিন্তু মনে রাখবি, সবাই আর গিরিশ ঘোষ নয় । ওর মত ভক্তি-বিশ্বাস জগতে দুর্লভ । যাদের অমনি ভক্তি-বিশ্বাস আছে তাদের শাস্ত্র পড়বার দরকার নেই । কারু বা শাস্ত্রপাঠে শাস্ত্রালোচনায় সত্যবস্তু প্রত্যক্ষ হয়, কারু বা মূকাস্বাদনবৎ—যেখানে শাস্ত্র স্তব্ধ, যুক্তি-তর্ক অর্থহীন ।'

এমন সময় স্বামীজির শিষ্য গুপ্ত মহারাজ বা স্বামী সদানন্দ সেখানে হাজির হল । তাকে লক্ষ্য করে স্বামীজি বললেন, 'ওর এই জি-সির মুখে দেশের দুর্দশার কথা শুনে প্রাণটা আকুপাকু করছে । দেশের জন্যে কিছু করতে পারিস ?'

সদানন্দ লাফিয়ে উঠল । বললে, 'যো হুকুম, বান্দা তৈয়ার হ্যায় ।'

স্বামীজি সেবাশ্রম খুলতে বললেন । বললেন, 'জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম নেই । সেবাধর্মের ঠিক-ঠিক অনুষ্ঠান করতে পারলে অতি সহজেই সংসারবন্ধন কেটে যায়, মুক্তিঃ করফলায়তে ।' তারপর গিরিশকে সম্বোধন করে বললেন, 'দেখ জি-সি, এই জগতের দুঃখ দূর করতে যদি আমাকে হাজার বার জন্ম গ্রহণ করতে হয়, আমি তাতেও রাজি । মনে হয় শুধু নিজের মুক্তি নিয়ে কী হবে ? সকলকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলেই তো আসল মুক্তি । আচ্ছা বলো তো আমার কেন এমন ভাব ওঠে ?'

গিরিশ বললেন, 'তা না হলে ঠাকুর তোমাকে সকলের চেয়ে বড় আধার বলবেন কেন ?'

আলমবাজার মঠ থেকে ওলি বুলকে চিঠি লিখছেন স্বামীজি : শোভাযাত্রা বাদ্যভাণ্ড ও সংবর্ধনার রকমারি আয়োজনের চাপে আমার এমন অবস্থা হয়েছে, লোকে যাকে বলে, মরবারও সময় নেই । আমি এখন মৃতপ্রায় । ঠাকুরের জন্মোৎসব শেষ হবার সঙ্গেই আমি পাহাড়ে পালিয়ে যাব ।

মার্চ মাসের মাঝামাঝি স্বামীজি দার্জিলিঙ গেলেন । উঠলেন এম. এন. ব্যানার্জির বাড়িতে । উনিশে মার্চ দার্জিলিঙ থেকে শরৎ চক্রবর্তীকে সংস্কৃতে চিঠি লিখলেন :

'সেই লোকগুরু মহসমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি তোমার হৃদয়ে আবির্ভূত হন, যাতে তুমি কৃতার্থ ও মহাশৌর্যশালী হয়ে মহামোহসাগর থেকে লোকসমাজকে উদ্ধার করতে যত্নবান হও । ভব চিরাধিষ্ঠিত ওজসি । চিরতেজস্বী হও ।

বীরাণামেব করতলগতা মুক্তির্ন কাপুরুষাণাম। মুক্তি বীরদেরই করতলগতা, কাপুরুষদের নয়। হে বীরগণ, বদ্ধপরিকর হও। মহামোহরূপ শত্রুগণ সম্মুখে। শ্রেয়োলাভে বহু বিঘ্ন ঘটে, এ নিশ্চিত জেনে বেশি করে উৎসাহিত হও। দেখ মোহগ্রাসে পড়ে জীবগণ কী দুঃসহ কষ্ট পাচ্ছে! তাদের হৃদয়ভেদী সকরুণ আর্তনাদ শোনো। হে বীরগণ, বদ্ধদের পাশমোচন করতে, দরিদ্রের ক্লেশভার শিথিল করতে ও অজ্ঞ জনগণের হৃদয়ান্ধকার দূর করতে অগ্রসর হও। অভিরভীরিতি ঘোষয়তি বেদান্তডিণ্ডিমঃ। ঐ শোনো, বেদান্ত-দুন্দুভি ঘোষণা করছে, ভয় নেই। ভয় নেই। এই দুন্দুভিধ্বনি নিখিলজগৎনিবাসী সকল মানুষের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করুক। ইতি তোমার একান্ত শুভভাবুক—পরম শুভাকাঙ্ক্ষী বিবেকানন্দ।'

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ

কবি-ভাগবত
স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী
শ্রীকরকমলে

এই গ্রন্থ-প্রণয়নে নিম্নলিখিত পুস্তকাবলীর উপর নির্ভর করেছি :

শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীকৃত শ্রীশ্রীসদগুরুসঙ্গ
শারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত আচার্য প্রসঙ্গ
অমৃতলাল সেন রচিত শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ
অমিয়কুমার সান্যাল লিখিত শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণলীলামৃত

ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

ওঁ জটিনে দণ্ডিনে নিত্যং লম্বোদরশরীরিণে
কমণ্ডলুনিষঙ্গায় তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ ॥

ভূমিকা

যুগ-প্রয়োজনে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। যুগ-প্রয়োজনে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। যুগ-প্রয়োজনে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীবিজয়কৃষ্ণ। তিন অবতার-পুরুষ। বারদীর ব্রহ্মচারী বিজয়কৃষ্ণকে বলতেন জীবনকৃষ্ণ। বলতেন, তোদের কৃষ্ণ অচলবিগ্রহ, আমার কৃষ্ণ সচল। মেরা আশুতোষ, বলতেন ভোলানন্দ গিরি-মহারাজ। রামদাস কাঠিয়া বাবাজি বলতেন, গোঁসাইজি তো সাক্ষাৎ মহাদেব হ্যায়, প্রেমকা অবতার। ময়ূরমুকুট বাবা বলতেন, মেরা কিষণজি। আর তৈলঙ্গস্বামী বলতেন, বিজয়কৃষ্ণ সমাধির যে অবস্থায় আছেন মানবদেহে এর চেয়ে উচ্চ অবস্থা আর হতে পারে না। যে পরমানন্দ মাধব মূককে বাচাল করেন পঙ্গুকে দিয়ে গিরিলঙ্ঘন করান, তাঁর কৃপায় আমিও তিন অবতার-পুরুষের পুণ্য জীবনকাহিনী ক্রমে-ক্রমে লিখে ফেললাম। কিছুই আমার কৃতিত্ব নয়, সব তাঁর কৃপা। নামে যেমন সমস্ত ন্যূনতাব পূরণ হয় তেমনি ভক্তিতে সমস্ত বিচ্যুতির মার্জনা হোক।

অচিন্ত্যকুমার

বাড়িতে হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে। ব্যাপার কী? আদালতের পেয়াদা এসেছে ক্রোকী পরোয়ানা নিয়ে। পেয়াদা-বরকন্দাজকে তখন বিষম ভয়। কী হল্লা হাঙ্গামা শুরু করে না জানি। বাড়ির মেয়েরা যে যেখানে পারল গা ঢাকা দিল। স্বর্ণময়ী লুকোল বাড়ির পিছনে পিটুলি গাছের নিচে কচুবনের মধ্যে।

বাপের বাড়ি এসেছে স্বর্ণময়ী। বাপ গৌরীপ্রসাদ জোয়ারদার। পরোপকারী হলে যা হয়। কোন এক দেনদার বন্ধুর জামিন হয়েছিলেন গৌরীপ্রসাদ। যথাকালে সে বন্ধু ফেরার হয়েছে। সুতরাং ধরো গৌরীপ্রসাদকে। ক্রোক করো তার অস্থাবর।

ক্রোকের হাঙ্গামা মিটতে-মিটতে সন্ধে।

শ্রাবণের ঝুলন পূর্ণিমার সন্ধে। দিকে-দিকে কৃষ্ণনামসুধার ঢেউ।

পেয়াদারা বিদায় হলে খোঁজ পড়ল মেয়েদের। সবাই ফিরল কিন্তু স্বর্ণময়ী কোথায়? বাপ গৌরীপ্রসাদ অস্থির হয়ে উঠলেন। মেয়ে যে অন্তর্বত্নী। আসন্নপ্রসবা। খুঁজতে খুঁজতে স্বর্ণময়ীকে পাওয়া গেল কচুবনে। কিন্তু এ কী অঘটন! সে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছে আর তার কোলে সদ্যোজাত শিশু। পবিত্রের পবিত্র, মঙ্গলের মঙ্গল, ভুবন-সুন্দর -আনন্দকর।

এই শিশুই বিজয়কৃষ্ণ।

কৃষ্ণের জন্ম কারাগারে। বুদ্ধের জন্ম বৃক্ষতলে। যীশুর আস্তাবলে। রামকৃষ্ণের ঢেঁকিশালে। নিমাইয়ের নিমতলায়। আর বিজয়কৃষ্ণের কচুবনে।

'যা বাড়ি যা, আমি তোর ঘরে তোর পুত্র হয়ে জন্মাব।' বিজয়ের বাপ আনন্দ-কিশোর গোস্বামী পুরী গিয়েছেন, মধ্যরাত্রে জগন্নাথকে স্বপ্ন দেখলেন।

কী অমানুষিক ক্লেশ করে গিয়েছিলেন পুরী। নিতাপুজোর শালগ্রামচক্র গলায় বেঁধে দণ্ডী কাটতে কাটতে গিয়েছিলেন চারশো মাইল—শান্তিপুর থেকে শ্রীক্ষেত্র। যেতে লেগেছিল দেড় বছর। নদী পার হবার সময় নৌকোতেও দণ্ডী দেবার কামাই ছিল না। বুকে ও হাঁটুতে ঘা হয়ে গেল, ঘায়ে জড়িয়ে নিলেন চট, তবু নিরস্ত হলেন না সাষ্টাঙ্গ থেকে। শ্রীধামে ফিরে মনস্থ করলেন, আর ফিরবেন না। পেয়ে গেছি পুরুষোত্তমকে।

তখন স্বপ্ন দেখলেন। জগন্নাথ বললে, 'যা, পুরুষোত্তম তোর পুত্র-রূপে তোর ঘরে আবির্ভূত হবে।'

'পুরুষোত্তম তো তুমি।'

'হ্যাঁ, আমিই তোর পুত্ররূপে জন্মাব। গত জন্মে যে কাজটুকু বাকি ছিল তাই সম্পন্ন করব এবার।'

দু-দু'বার বিয়ে করেছিলেন অনন্দকিশোর। দু' স্ত্রীই নিঃসন্তান।

বড় ভাই গোপীমাধব মৃত্যুকালে পাশে ডাকলেন আনন্দকে। বললেন—'যাবার সময় একটা কথা বলে যাই তোকে। আমার এই অন্তিম অনুরোধ তোকে রাখতেই হবে।'

'বলুন ।'

'দেখছিস আমার স্ত্রীর ছেলেপিলে নেই। তোর ছোট ছেলেটি তাকে দত্তক দিবি।'

'সে কী!' আকাশ থেকে পড়লেন আনন্দকিশোর : 'আমিও তো নিঃসন্তান। তা ছাড়া আমি আবার বিপত্নীক। আমার আবার দত্তক দেওয়া কিসের ?'

গোপীমাধব চঞ্চল হলেন না। বললেন,—'আমি দিব্যচক্ষে দেখছি তুমি তৃতীয়বার বিয়ে করেছ আর তোমার দুটি ছেলে হয়েছে। আমি অপুত্রক—তোমার ছোট ছেলেটি আমার স্ত্রীকে দিয়ে দিও।'

মনে মনে হাসলেন আনন্দকিশোর। বিয়ের নামে দেখা নেই, তায় পোষ্যপুত্র।

কিন্তু এ কী স্বপ্ন দেখালেন জগন্নাথ! আর এমন আশ্চর্য, পঞ্চাশ বছর বয়স আনন্দকিশোরের, তৃতীয়বার বিয়ে করলেন। বিয়ে করলেন নদীয়া জেলার শিকারপুরের কাছে দহকুল গ্রামের গৌরী জোয়ারদারের মেয়ে স্বর্ণময়ীকে। স্বর্ণময়ীও তেমনি মেয়ে। আসলে জীবন্মুক্ত অবস্থা, লোকে বলে পাগলিনী।

এক মুসলমান ফকিরের বরে তার জন্ম। বাপ-মা ফকিরকে বলেছিল, দ্বিতীয় সন্তান জন্মালে তোমাকে দিয়ে দেব। দ্বিতীয় সন্তান জন্মালে প্রতিশ্রুতি পালন করল না। ফকির শাপ দিল : দেখিস, তোদের প্রথম সন্তান থাকবে না স্ববশে।

পাগল কোথায়! ও তো করুণার মন্দাকিনী। শান্তিপুরে কোথেকে এক পাগলি এসে জুটেছে। দুরন্তেরা তার পিছু নিয়েছে, ছুড়ছে ধুলো বালি। অসহায় পাগলির মুখে শুধু একটা করুণ কান্নার শব্দ।

কী হয়েছে রে তোর ? স্বর্ণময়ী তাকে হাত ধরে নিয়ে এলেন ঘরে।

'আমি পুত্রশোকে উন্মাদ।'

'পুত্র কি তোমার যে তুমি শোক করছ ? যাঁর জিনিস তিনি নিয়ে গিয়েছেন। তোমাকে দুদিন দিয়েছিলেন নাড়তে চাড়তে, সেবা করতে। নেড়েছ চেড়েছ, সেবা করেছ। বাস, ফুরিয়ে গিয়েছে। পরের জিনিসে শোক কিসের ? কৃষ্ণজীকে ডাকো, তিনিই তোমাকে শান্ত করবেন, স্নিগ্ধ করবেন বুঝিয়ে দেবেন আগাগোড়া।'

হাত-ভর্তি তেল নিয়ে পাগলির মাথায় মাখিয়ে দিলেন স্বর্ণময়ী। ঘড়ায়-ঘড়ায় জল ঢেলে স্নান করিয়ে দিলেন। পাগলির পাগলামি সেরে গেল বোধ হয়। বললে,—'মা, তুমি আমাকে জুড়িয়ে দিলে। এমনটি আর কোথাও দেখি নি। সবাই আমাকে পাগল বলে, ক্ষেপায়, দূর হ' বলে ঢিল ছোঁড়ে, জ্বালার উপর জ্বালা দেয়। কেবল তুমিই আমাকে স্নিগ্ধ করলে। তুমি কে মা ?'

এক কুলত্যাগিনীকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিলেন। পতিতা বলে ঘৃণা করলেন না। শুধু আশ্রয় নয়, সমস্ত গৃহকর্মের ভার চাপিয়ে দিলেন তার উপর। আরো বড় কথা, দীক্ষা দিলেন কৃষ্ণমন্ত্রে। প্রত্যহ ভোরে উঠে গঙ্গাস্নান করে সেই মেয়ে, স্নানান্তে ইষ্টমন্ত্র জপ করে তারপর সংসারের কাজে লাগে। সংসারের কাজে তার অন্তহীন স্ফূর্তি। চিন্তাহীন উৎসাহ।

কোথায় পড়ে থাকতাম পঙ্ককুণ্ডে, তুলে নিয়ে এসে লাবণ্য-উজ্জ্বল বিকচ পদ্মে পরিণত করলেন। করুণার এমনি কত শত বৃষ্টি বিন্দু।

কালীঘাট যাচ্ছেন। দেখলেন পথের ধারে খোলার ঘরের সামনে অল্প বয়সের একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুরন্ত শীত, তবু ফাঁকা ছেড়ে ঘরে যাচ্ছে না। মেয়েটি কে বুঝতে

দেরি হল না স্বর্ণময়ীর। ফিরিয়ে নিলেন চোখ। কিন্তু মন্দির থেকে ফেরবার সময় দেখলেন তখনো তেমনি দাঁড়িয়ে আছে সেই বারাঙ্গনা। শীতে কাঁপছে নিরালায়। স্বর্ণময়ী এগোলেন তার কাছে। সঙ্গে যা টাকা-পয়সা ছিল সব সেই মেয়েটির হাতে ঢেলে দিলেন। বললেন, 'বাছা, আর শীতে দাঁড়িয়ে থেকো না, ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো।'

স্টেশনে এসে শান্তিপুরের টিকিট কিনতে গিয়ে দেখেন, সব পয়সা দিয়ে এসেছেন সেই বারাঙ্গনাকে।

সংসারের যা বরাদ্দ তার চেয়েও বেশি রান্না করেন স্বর্ণময়ী। গরিব দুঃখী স্ত্রীলোক যারা শান্তিপুরের বাজারে শাক-সবজি বেচতে আসে, তাদের বাড়িতে ধরে ধরে এনে খাওয়ান। বলেন, 'যে একলা নিজের জন্যে রান্না করে সে তো শেয়াল কুকুরের মতো। পাঁচজনের কম রান্না করা উচিত নয় কখনো।'

আর খাওয়ান কৃপণদের। বলেন, 'ওদের মতো দুঃখী বুঝি আর কেউ নেই। নিজেদের থেকেও ওরা উপোস করে থাকে।'

আর আনন্দকিশোর? তাঁকে সসম্ভ্রমে সকলে ঋষি-গোস্বামী বলে। ভোগ রান্নার কাঠও গঙ্গাজলে ধুয়ে নেন। নিষ্ঠার আধিক্যের জন্যে কেউ কেউ বা বলে লকড়ি-ধোয়া বা খাড়-ধোয়া গোঁসাই। গৃহদেবতা শ্যামসুন্দর, তারই সেবা-পুজো ও বৈষ্ণবসেবাই তাঁর নিত্য কর্ম। আর, শুনে যাও দেখে যাও, তাঁর ভাগবতপাঠ।

যখন ভাগবত পড়েন তখন চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যায়, পুঁথির পাতা ভিজে ওঠে। শুধু তাই? রোমকূপ থেকে রক্ত ফেটে পড়ে, গায়ের জামা লাল হয়ে যায়। ভাবাবেশে হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন রাধাশ্যাম, রাধাপ্যারী, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সে হুঙ্কারে শ্রোতাদেরও রোমাঞ্চ জাগে। আত্মসংবরণ অসাধ্য হয়। কান্নায় লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

একবার দোলের দিন এক শিষ্যের দেওয়া আবির ভাগবতের উপর ছড়িয়ে দেন আনন্দকিশোর। শিষ্য ক্ষুণ্ণ হয়, কেন বিগ্রহকে না দিয়ে ভাগবতকে দেওয়া। আনন্দকিশোর শিষ্যকে বিগ্রহের কাছে নিয়ে গেলেন ডেকে। দেখ দেখ বিগ্রহের গায়েও আবির মাখানো। এ কী, কে আবির দিল বিগ্রহকে? কেউ দেয় নি। ওই ভাগবতের আবিরেই বিগ্রহ রঙিন হয়ে গিয়েছে।

আনন্দকিশোরের প্রথম পুত্র ব্রজগোপাল। যত দিব্য ঘটনার সূত্রপাত দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের প্রাক্কালে। রাসপূর্ণিমার দিন শ্যামসুন্দরকে দর্শন করে ঘরে যাচ্ছেন স্বর্ণময়ী, বিগ্রহ থেকে এক জ্যোতির্ময় শিশু বেরিয়ে এসে তাঁর আঁচল চেপে ধরলো। চলল সঙ্গে সঙ্গে।

স্বর্ণময়ী চমকে উঠল। কে? কে তুমি? কই, কেউ নেই তো।

কিন্তু রাতে স্বপ্ন দেখলেন স্বর্ণময়ী। সেই জ্যোতির্ময় শিশু তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। অমনি ধরেছে আঁচল চেপে। বলছে, মা, তোমার কাছে এলাম। তখন তাকে কত কী দেখছেন। সোনার রোদ গাছের পাতায় ঝিকমিক করছে, মনে হচ্ছে যেন রাধাকৃষ্ণ নাচছে। শুয়ে আছেন, দেখছেন গর্ভের সন্তান বাইরে বেরিয়ে এসে শুয়ে আছে মাথা ঘেঁষে। আলো হয়ে গেছে ঘরদোর। গৃহকাজে হাঁটছেন চলছেন, কে যেন নূপুর পরে ফিরছে পায়ে-পায়ে। সুগন্ধে আমোদ হয়ে গিয়েছে দশ দিক।

স্বামী ছাড়া আর কাকে বলবেন এসব অনুভূতির কথা। আনন্দকিশোর বলছেন,— 'পুরীর স্বপ্ন কখনো মিথ্যে হবার নয়।'

কচুবন থেকে শিশুকে ঘরে নিয়ে আসা হল। ডাকা হল কবরেজ। দেখুন দেখি, শিশু এমন নিস্কম্ম হয়ে রয়েছে কেন ?

কবরেজ দু'রকম ওষুধ দিল। একটা খাবার, আরেকটা মালিশের। প্রথমটাতে মুসব্বর, দ্বিতীয়টাতে আফিং।

স্বর্ণময়ী ভুল করে আফিং খাইয়ে দিলেন শিশুকে।

সর্বনাশ করেছিস। নিজের হাতে বিষ দিয়েছিস মা হয়ে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, বিষেই উল্টো ফল হল। জ্ঞান হল শিশুর।

শান্তিপুরে খবর গেল। গোপীমাধবের স্ত্রী কৃষ্ণমণির আনন্দ আর ধরে না। দত্তক পাবেন এই শিশুকে।

ছ মাস পরে স্বর্ণময়ী ফিরলেন শান্তিপুরে। পতিগৃহে। কত বড় মর্যাদাসম্পন্ন সে ঘর! অদ্বৈত আচার্যের বংশ। যার আর্তিতে-হুঙ্কারে মহাপ্রভুর আবির্ভাব। সেই মহাপ্রভুই আবার এলেন নদীয়ায়, ঝুলন পূর্ণিমার সন্ধ্যায়, বহিরঙ্গনে বৃক্ষতলে। আর যখন অষ্টম মাসে শিশুর অন্নপ্রাশন হল, শিশু আগের মতোই, সোনা রুপো মাটি না ধরে ধরল ভাগবত। ধরল মঙ্গলময় হরিকথা।

কিন্তু নাম উঠল কী রাশিচক্রে? দুই নাম উঠল। দুইই অসামান্য। এক নাম দিগ্বিজয়, আরেক নাম বিজয়কৃষ্ণ। শুধু দিক-দেশ বিজয় নয়, সর্বাংশে সর্বজনমন জয় করবে বলেই বিজয়কৃষ্ণ নির্ধারিত হল।

শিশুর গায়ে গয়না উঠেছে। আয় খোকা, পাখি ধরে দেব, বলে চোর তাকে কোলে তুলে নিয়েছে। এগিয়ে চলেছে নিরালার সন্ধানে। কিন্তু এ কী, চোরের দিকভ্রম হল নাকি? কোথায় নির্জনে যাবে, তা নয়, ঘুরতে ঘুরতে আনন্দকিশোরের দোরগোড়াতেই এসে হাজির হল।

'বাবা!' আনন্দকিশোরকে দেখে লাফিয়ে পড়ল ছেলে। বাপের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হাত মেলে।

চোর কিছুতেই তাকে পারল না ধরে রাখতে। বেগতিক দেখে নিজেই চম্পট দিল।

শ্যামসুন্দর, আমার বিজয়কে দেখো, আত্মান্তরে ফেলো না।

কিন্তু বিজয়ের যখন প্রায় চার বছর বয়েস, আনন্দকিশোর চোখ বুজলেন। জমিদার শিষ্য মুকুন্দ চৌধুরির বাড়িতে ভাগবত পড়তে পড়তে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

'কালো কুচকুচে, লাল টুকটুকে, শাদা ধবধবে, আবার হলুদে মেশানো—তুই কে রে?' এক পাগল বারে বারেই ছুটে আসে বিজয়ের কাছে, আর ওই বলে হাঁক পাড়ে। পাগলের নাম শ্যামা ক্ষেপা। সকলে বলে, সর্বজ্ঞ।

তার মানে তুমিই কি সেই ভাগবতবর্ণিত কৃষ্ণ? 'শুক্লো রক্ত স্তথা পীতঃ ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ?' তুমিই কি সেই তমালশ্যামল কৃষ্ণ, পরমসুখকন্দ গোবিন্দ? আর্তত্রাণ-পরায়ণ জগন্নাথ?

স্বামী গত হবার পর স্বর্ণময়ী ছেলেদের নিয়ে ফাঁপরে পড়লেন। নিজেই যেতে লাগলেন স্বামীর শিষ্যদের বাড়িতে। ওখান থেকে যা আদায় হয় তা দিয়েই সংসার-নির্বাহ। কায়ক্লেশে দিন কাটানো। আবার কখনো যান পিত্রালয়ে, শিকারপুরে।

একবার ছেলেদের নিয়ে শিকারপুরে থেকে আসছেন শান্তিপুরে। দেখলেন নদীর খানিকটা শুকিয়ে গিয়েছে। শান্তিপুর আর দূরে নয়, দু' তিন ঘণ্টার পথ। কিন্তু

হঠাৎ এ কী দুস্তর বাধা ! ঘুরে যেতে হলে তিন দিনের ধাক্কা। এখন কী করেন, কে আছে—তাঁদের পার করে দেবে, কোথায় তুমি অচল-চালক ! কে এক বিরাট পুরুষ হঠাৎ আবির্ভূত হল সেখানে। শুকনো ডাঙার উপর দিয়েই নৌকো টেনে নিয়ে চলল সবলে। জলে এনে ছেড়ে দিল, ভাসিয়ে দিয়ে গেল। তারপর কোথায় মিলিয়ে গেল কেউ দেখল না। সর্বক্ষণ ভয়ে কাঁপছে বিজয়। কে এই অপ্রমেয় মহাবাহু। কে এই বহুমঙ্গল লোকবন্ধু !

শিকারপুরে দিঘির জলে পড়ে গিয়েছে বিজয়। অতলতল দিঘি, কেউ সন্ধান পাচ্ছে না শিশুর। গৌরীপ্রসাদ জাল ফেলেছেন। পারে দাঁড়িয়ে হাহাকার করছেন স্বর্ণময়ী। শুধু স্বর্ণময়ী নয়, গাঁয়ের কত শত লোকজন।

ও মা, ছেলে দেখি ওপারে চলে গিয়েছে। কে একজন শিশুর লম্বা চুল ধরে টেনে তুলে দিয়েছে ওপারে। সেই বুঝি জলের মধ্যে এতক্ষণ শিশুকে বুকে করে ছিল। কী আশ্চর্য, এক ফোঁটা জল খায় নি বিজয়।

মাথার চুলে সুন্দর জটা হয়েছিল বিজয়ের। আদর করে সবাই ডাকে জটে গোঁসাই।

'তেঁতুল ঝোলা দেখাও তো জটে গোঁসাই।'

বললেই হল, শিশু আনন্দে অমনি মাথা ঝাঁকাতে শুরু করে। ঝটপট শব্দ হয় জটায়, তা দেখে সবাই হেসে কুটিকুটি।

মায়ের স্নেহে ভরপুর থাকলে কী হবে, বাবাকে প্রায়ই মনে পড়ে শিশুর। ছাদে কখন একা একা চলে এসেছে বিজয়। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। চেয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছে অতর্কিতে।

এই দেখ, ছাদে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। কী ভীষণ ছেলে ! ভয় ডর কিছু নেই।

ডাকাডাকি করতেই চমকে উঠল বিজয়।

'কী রে, তখন অমন চমকে ছিলি কেন ?' জিগগেস করলেন স্বর্ণময়ী।

'জানো মা, বাবাকে দেখলাম।'

'কাকে ?' এবার স্বর্ণময়ী চমকালেন।

'বাবা এসে আমার হাত ধরলেন, বললেন ওঠ। বলে তাঁর কোলে বসিয়ে নিয়ে গেলেন চাঁদের দেশে। কত সেখানে নদী, কত পাহাড়, কত ফুল বাগান—'

'কিছু বললেন ?'

'বললেন, আমার ঘরে একজন খুব বড় সাধু হবে। তুই হবি সেই সাধু।' হাসতে লাগল বিজয়।

'তুই কী বললি ?'

'বললাম, হব। আমিই তো হব।' একটু বুঝি উদাস হল শিশু : 'বললাম, আর অমনি বাবা খুশি হয়ে ফিরে গেলেন। জেগে দেখি চাঁদে নয়, ছাদে শুয়ে আছি।'

ছেলে এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে—এবার তবে পোষ্য দাও। দাবি করলেন কৃষ্ণমণি। আর ফেরানো যায় না, যায় না ঠেকানো। বিধিমতো লেখাপড়া করলেন কৃষ্ণমণি। করলেন শাস্ত্রমতো যাগযজ্ঞ। গণ্যমান্যদের সাক্ষী রাখলেন দলিলে। বিজয়কৃষ্ণ দত্তক হয়ে গেল।

কিন্তু কৃষ্ণমণিকে কিছুতেই মা বলবে না বিজয়। আমার নিজের মা থাকতে কেন আরেক জনকে মা বলতে যাব ? কৃষ্ণমণি তাকে নিজের ঘরে বন্দী করে রাখতে চান,

নিজের স্নেহাঞ্চলে। বিজয় মানবে না সে বন্ধন, গোঁ ধরে থাকবে। আমি আমার মায়ের ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে যাব কেন? আমার মায়ের ঘরে কি আদর নেই? তাঁর পাশটিতে কি জায়গা নেই আমার বিছানার? কত বড় মা আমার।

গয়ার পাহাড়ে পাথরে পা ঠুকে ব্যথা পেয়েছে বিজয়কৃষ্ণ। মা গো—বলে আর্তনাদ করে উঠেছে। দুঃখে-দৈন্যে আঘাতে-ব্যাঘাতে মা নাম ছাড়া আর কী আছে সংসারে?

বাড়ি ফিরে এলে স্বর্ণময়ী বললেন, 'হ্যাঁ রে, পায়ে পাথরের ঠোক্কর খেয়ে ব্যথা পেয়েছিলি?'

'তুমি কেমন করে জানলে?'

'হঠাৎ সেদিন, ঘরে বসে আছি, আমার পায়ে একটা পাথরের চোট লাগল। আমি ভাবলুম, সে কী, ঘরে বসে আছি, পাথর এলো কোত্থেকে?'

'কিন্তু সে যে আমাকে লাগা পাথর, তা তুমি বুঝলে কী করে?' প্রশ্নে ব্যাকুল হল বিজয়।

'তোর ডাক যে আমার কানে বাজল, মনে হল, তুই নিশ্চয় কষ্ট পেয়েছিস।'

২

কুলদেবতা শ্যামসুন্দর।

ভোর বেলা, ঘুম থেকে উঠে স্বর্ণময়ী দেখলেন, বিজয় ঘরে নেই। কোথায় গেল দুরন্ত ছেলে! ও মা, শ্যামসুন্দরের মন্দিরের বন্ধ দরজায় ধাক্কা মারছে। দ্রুত পায়ে ছুটে গেলেন স্বর্ণময়ী। 'ও কী, মন্দিরের দোর ঠেলছিস কেন?'

'আমার বল খুঁজে পাচ্ছি না।'

'বল খুঁজে পাচ্ছিস না তো ওখানে কী!'

'এই শ্যামসুন্দরই আমার বল নিয়ে পালিয়ে এসেছে।'

'সে কী অসম্ভব কথা!' স্বর্ণময়ী অবাক মানলেন।

'বা, শ্যামসুন্দর যে খেলছিল আমার সঙ্গে।' বিজয় সরল মুখে বললে, 'খেলতে খেলতে পালিয়ে এসেছে।'

'তা পূজারী আসুক। পূজারী এসে দরজা খুলুক। তখন দেখা যাবে।'

কখন পূজারী আসবে কে জানে। গায়ের জোরে দরজা যখন খুলতে পারছে না, তখন বিজয় কাকুতি-মিনতি করছে। 'দাও না আমার বল। কেন বসে আছ দোর এঁটে? বাইরে বেরিয়ে এসো না। খেলার মাঝখানে পালিয়ে গিয়ে কেউ লুকোয় ঘরের মধ্যে?'

কে শোনে কার কথা! তখন বিজয় এক লাঠি কুড়িয়ে আনল। দাঁড়াও, কতক্ষণ বন্ধ হয়ে থাকবে? পূজারী এসে দরজা খুললেই দেখে নেব তোমাকে। কে তখন তোমাকে বাঁচায় দেখা যাবে।

দরজা খোলা হল যথাসময়ে। কিন্তু হায়, বিজয়কে ঢুকতে দেওয়া হল না। তার যে এখনো পৈতে হয় নি। সারা দিন উপোস করে রইল বিজয়। স্বর্ণময়ী এসে কত সাধ্যসাধনা করলেন, নরম হল না এতটুকু। শ্যামসুন্দরের উপর প্রতিশোধ না নিয়ে অন্নজল গ্রহণ করবে না কিছুতেই। ঘরে ভাত রেখে শুয়ে পড়লেন স্বর্ণময়ী। খিদের

কাছেও যে হার মানে না, সে কেমনতরো ছেলে। মাঝ রাতে স্বর্ণময়ীর ঘুম ভেঙে গেল। বিজয় যেন কথা কইছে কার সঙ্গে!

'যাক, ঘাট মানলে তাই ছেড়ে দিলাম। নইলে দেখাতাম একবার মজা!'

তারপর আবার অন্যরকম সুর ধরল।

'আমি না হয় তোমার উপর রাগ করে খাই নি। কিন্তু তুমি খেলে না কেন? তোমার কী হয়েছিল? বেশ বেশ, এসো দু'জনে একসঙ্গে খাই।' ঢাকা তুলে খেতে লাগল বিজয়। যেন তার সঙ্গে আরো একজন কে খাচ্ছে তৃপ্তি করে।

সকালে উঠে পূজারীর কাছে খোঁজ নিল স্বর্ণময়ী। পূজারী বললে, 'আমি কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছি শ্যামসুন্দর বলছেন তাঁর মাধ্যাহ্নিক ভোগ হয় নি।'

সে কী কথা! বিজয়কে ডেকে জিগগেস করলেন, 'কাল রাতে ঘরে কার সঙ্গে বসে কথা কইছিলে?'

বিজয় আকাশ থেকে পড়ল। 'কই কিছু জানি না তো!'

বিজয়কৃষ্ণ তখন ব্রাহ্মসমাজে। একদিন শ্যামসুন্দর তাকে বললেন, 'আমি সোনার চুড়ো পরব। আমাকে একটা গড়িয়ে দে না।'

বিজয় বললে, 'আমি তোমাকে মানি না। যারা মানে তাদের বলো গে। আমার টাকা-পয়সা নেই।'

'তোর টাকা নেই, তোর খুড়ির আছে,' বললেন শ্যামসুন্দর। 'দ্যাখ গে তোর খুড়ির ঝাঁপির মধ্যে অনেক টাকা। খুড়িকে বলে চেয়ে নে গে।'

খুড়িমাকে বলতে গিয়ে বিজয়।

'কী আশ্চর্য!' খুড়িমা অভিভূতের মতো বললেন, কাল যে আমাকেও স্বপন দিয়েছেন শ্যামসুন্দর। বললেন, ওগো সোনার চুড়ো পরব। আমি বললুম, টাকা কোথায় পাব! শ্যামসুন্দর বললেন, দ্যাখ না ঝাঁপি খুলে, চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা কোন না পাবি! লুকিয়ে-চুরিয়ে সাতষট্টি টাকা জমিয়ে ছিলাম ঝাঁপিতে, কেউ জানে না, কিন্তু শ্যামসুন্দর ঠিক দেখে রেখেছেন। সাধ্য নেই ওঁর চোখে ধুলো দি।'

বিজয়ের হাতে টাকা দিল খুড়িমা। সেই টাকায় ঢাকা থেকে গড়ানো হল সোনার চুড়ো। সেই চুড়ো পরানো হল শ্যামসুন্দরকে।

সন্ধ্যের আগে ছাদে গিয়েছে বিজয়, শ্যামসুন্দর ঘর থেকে উঁকি মারল উপরে। বললে, 'ওরে একবার দেখে যা না, চুড়ো পরে আমাকে কেমন দেখতে হয়েছে।'

'আমি আর কি দেখব।' স্নেহকটাক্ষ ফিরিয়ে দিল বিজয়: 'আমি তো আর তোমাকে মানি না। যারা তোমাকে মানে তাদের ডেকে আনো গে।'

শ্যামসুন্দর হাসল মৃদু মৃদু। বললে, 'নাইবা মানলি, তাতে একবার দেখতে দোষ কী।'

সত্যিই তো, দেখতে বাধা কিসের! একটা পাথরের মূর্তির মাথায় মুকুট পরানো হয়েছে, এইটুকুই তো দেখা। দেখি না কেমন গড়িয়ে এনেছে সোনার চুড়ো। শ্যামসুন্দরের কাছে এসে দাঁড়াল বিজয়কৃষ্ণ। এ কী, চোখ যে আর ফিরিয়ে নিতে পারছে না। পদ্মপত্রবিশালাক্ষ কী অপার স্নেহে তাকিয়ে আছেন! সমস্ত ঘর নয়, সমস্ত ভুবন যেন দাঁড়িয়েছেন আলো করে!

'কি রে, মানিস না, তবে অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন?' হাসল শ্যামসুন্দর। 'চোখের দেখা তো কখন হয়ে গিয়েছে। এবার যা না ফিরে!'

কোথায় ফিরে যাবে ? পা ওঠে না বিজয়ের, নিষ্পলক দেখছে শ্যামসুন্দরকে।

শান্তিপুরের এক প্রান্তে শ্যামচাঁদের মন্দির। সেখানে নানা সাধুসন্ন্যাসীর ভিড়। সেখানে কখন একা-একা চলে আসে জটে-গোঁসাই, সকলের আদরের জিনিসটি হয়ে বসে থাকে। এ যেন আগন্তুক কোনো শিশু নয়, সবলের মনে হয়, যেন কোন অন্তরঙ্গ আত্মীয়। কোথায় বাড়ি-ঘর কে জানে, মন তবু চায় না ছেড়ে দিতে।

সেদিন সন্ধ্যেও যায় যায়, বিজয়ের দেখা নেই। স্বর্ণময়ী ঘর-বার করতে লাগলেন। সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হল, রাত মাঝরাত। কোথায় বিজয় ! ঘরে-বাইরে হাহাকার পড়ে গেল। বিজয়কে পাওয়া যাচ্ছে না।

পরদিন সকালে খবর পাওয়া গেল, ঠিক জায়গাতেই আছে—শ্যামচাঁদের বাড়িতে, নিরাপদ পরিবেশে—সাধুসঙ্গে। সাধুরা তাকে আদর করে খাইয়েছে, হরিনাম শুনিয়েছে, বিছানা করে ঘুম পাড়িয়েছে। এমন স্বাদুসংগ থেকে পারে নি বিচ্ছিন্ন থাকতে।

ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলেকে ছিনিয়ে নিলেন স্বর্ণময়ী।

মা কেমন সুন্দর রাঁধেন শ্যামসুন্দরের জন্যে। কেমন সুন্দর ভোগ সাজান, পরি-বেশন করেন। কিন্তু শ্যামসুন্দরের পাশে যে আছেন ওই শ্রীমতী, তিনি কী করেন ? তিনি একটু পরিশ্রম করে পরিবেশন করতে পারেন না ?

'মা, তুমি রাধাকে একটু বলো না, আমাকে পরিবেশন করে খাওয়াতে। বলো না।' স্বর্ণময়ীকে পিড়াপিড়ি করতে লাগল বিজয়।

'তা কি কখনো হয় ?' স্বর্ণময়ী বিমূঢ়ের মতো হয়ে গেলেন।

'খুব হয়। কেন হবে না ? তুমি বলো না রাধাকে।' গম্ভীর-গম্ভীর মুখ করল বিজয় : 'আমাকে খাওয়াবে না তো ও কাকে খাওয়াবে !'

দুই ভাই, ব্রজ আর বিজয়, বলরাম আর কৃষ্ণ সেজেছে। আমরা কৃষ্ণলীলা অভিনয় করছি। আর এই যে দেখছ আমাদের সহচর-অনুচর, এরা সব রাখাল বালক। শ্রীদাম সুদাম।

অভিনয়ের শেষে দুই ভাই হাত ধরাধরি করে নাচে আর গায় : কানাই বলাই দুই ভাই, পথ ছেড়ে দে বাড়ি যাই।

কোথায় বাড়ি ! গঙ্গার পারে বেড়াতে বেড়াতে পথ হারিয়ে ফেলেছে বিজয়। রাত হয়ে এল, পথঘাট মুছে গেল অন্ধকারে। কোথাও লোকজন নেই, এ ধারটা একেবারে নির্জন। একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল, ডাকতে লাগল শ্যাম-সুন্দরকে। শ্যামসুন্দর, আমাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দাও। অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতে পাচ্ছি না, আমাকে পথ দেখাও। একটি সমবয়সী ছেলে কোত্থেকে পাশে এসে দাঁড়াল। বললে, এসো আমার সঙ্গে।

পথ আলো করে চলতে লাগল শ্যামসুন্দর। বাড়ি পৌঁছিয়ে দিল নির্ভুল।

'ও সন্নিসি ঠাকুর, তুমি ও কার পুজো করছ ?' বাড়িতে এক সন্ন্যাসী অতিথি হয়েছেন, তাঁকে জিগগেস করল বিজয়। বললে, 'ও তো দেখছি একটা পাথরের টুকরো।'

'হোক। ওই আমার ঠাকুর।'

'ওটি আমাকে দাও না।' সন্ন্যাসীর শালগ্রাম-শিলার দিকে হাত বাড়াল বিজয় : 'আমি ওর পুজো করব।'

কী সর্বনাশ। শিলা বুঝি ছুঁয়ে দিল ছেলে, সবাই আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। সন্ন্যাসী শিলাকে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরল বুকের মধ্যে। বিজয় কাঁদতে লাগল।

সন্ন্যাসী ভাবলে, পালাই। যা দস্যি ছেলে, কখন না জানি শিলা অশুচি করে দেয়। যাবার সময় ছল করে একটা পাথরের টুকরো দিয়ে গেল বিজয়কে। বললে, 'এই নাও ঠাকুর।'

ঠাকুর পেয়ে বিজয়ের আনন্দ দেখে কে! ছল-অছল কী জানে, এক মনে সেই পাথরের টুকরোকেই পুজো করতে লাগলো।

ফিরতি পথে এসেছে সেই সন্ন্যাসী। ছদ্ম-হাসির আড়ালে দাঁড়িয়ে বিজয়ের পুজো দেখছে। চমকে উঠল সন্ন্যাসী। এ কে পুজো করছে? কার পুজো? স্বর্ণময়ীকে বললে, 'মা, তোমার এ ছেলে সামান্য নয়।'

'নয়? কেন?' ভয় পেলেন স্বর্ণময়ী।

'ওই প্রস্তরখণ্ড জাগ্রত হয়ে উঠেছে।'

'বলেন কী সর্বনেশে কথা!' স্বর্ণময়ী বিজয়ের ঠাকুর, সেই পাথরের টুকরো, সন্ন্যাসীকে ফিরিয়ে দিলেন।

বিজয় মনে মনে হাসল। যেন ঠাকুরকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়! যেন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তাকে সরিয়ে দেওয়া চলে! যেন তাড়িয়ে দিলেই তাকে তাড়ানো যায়!

উন্মাদ অবস্থায় শান্তিপুর থেকে একা ঢাকায়, গেণ্ডারিয়া আশ্রমে, চলে এসেছেন স্বর্ণময়ী। বিজয়কৃষ্ণ তো অবাক। এ কী, তুমি কোত্থেকে? এত দূর পথ কী করে এলে একা-একা?

'আমাকে ওরা সবাই পাগলা-গারদে দিতে চেয়েছিল।' বললেন স্বর্ণময়ী, 'আমি ভয় পেয়ে শ্যামসুন্দরকে বললাম, শ্যামসুন্দর, আমাকে তুমি আমার ছেলের কাছে রেখে এস। শ্যামসুন্দর বললেন, তোর ছেলে কোথায়? আমি তখন ধমকে উঠলাম, বললাম, দ্যাখ, চালাকি করতে হবে না। শিগগির রেখে আয় বলছি। তখন আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসে রেখে গেল তোর কাছে।'

'শ্যামসুন্দর?'

'হ্যাঁ, এই দ্যাখ, তোকে দেবার জন্যে তাঁর এই গাত্রবস্ত্র আমাকে দিলেন। বললেন, আমার বিজয়কে দিবি।' বলে স্বর্ণময়ী শ্যামসুন্দরের এক খণ্ড উত্তরীয় বিজয়কৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করলেন।

অভিভূত হয়ে সেই উত্তরীয় মাথায় ধরল বিজয়কৃষ্ণ। আমি তাঁকে জানি বা না জানি, মানি বা না মানি, তিনি আমাকে কখনো ছাড়েন না, পারেন না ছেড়ে থাকতে।

প্রচারক অবস্থায় একবার বাড়ি ফিরেছে বিজয়। বাড়ি ফিরেছে মাকে দেখে যেতে। দুপুর বেলায় বসে আছে চুপচাপ, শ্যামসুন্দর এসে বললেন, 'দ্যাখ, আজ আমাকে খাবার দিয়েছে, কিন্তু জল দেয় নি। জল ছাড়া খেয়ে কখনো তৃপ্তি হয়?'

তখুনি উঠে পড়ল বিজয়। খুড়িমাকে গিয়ে বলল, 'তোমার শ্যামসুন্দর বলছেন, আজ তোমরা তাঁকে জল দাও নি।'

খুড়িমা ঝামটা মেরে উঠলেন: 'শ্যামসুন্দর তো আর লোক পেলেন না, তুই ব্রহ্ম-জ্ঞানী, তোকে এসেছেন নালিশ করতে!'

'তার আমি কী জানি। তুমি একবার দেখ না খোঁজ নিয়ে।'

খুড়িমা খোঁজ নিয়ে জানলেন, সত্যিই আজ জল দেওয়া হয় নি শ্যামসুন্দরকে। তখন ত্রুটিমোচন করতে পথ পান না খুড়িমা।

পূজারির কোনো যদি অনাচার ঘটে তা হলে, বলতে গেলে, শ্যামসুন্দর সেই বিজয়কেই বলবে। আমি আর কাউকে জানি না, তোমাকে জানি—তুমি এর প্রতিবিধান করো।

বলছেন বিজয়কৃষ্ণ, 'আমি না মানলেও তিনি আমাকে ছাড়েন নি।'

শ্যামসুন্দরকে উদ্দেশ করে বলছেন, 'ঠাকুর, আমার উপর তোমার এতই দয়া, তবে আর এতকাল এত ঘোরালে কেন? সমস্ত ভাঙিয়ে-চুরিয়ে বিষম কালাপাহাড় করেছিলে কেন?'

শ্যামসুন্দর বললেন, 'তাতে তোর কী? ভেঙেও ছিলাম আমি, এখন আবার গড়ে নিচ্ছিও আমি। তাতে তোর কী হয়েছে? ভেঙে গড়লে ঢের-ঢের সুন্দর হয় না কি।'

কিন্তু সকলের আগে মা। মা-ই সমস্ত।

সরল বিশ্বাসে যথার্থ কাতর হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে ভগবান নিশ্চয়ই পূর্ণ করেন প্রার্থনা। সরল বিশ্বাস মানেই বালকের বিশ্বাস। বালকের যেমন মাকে বিশ্বাস। আর যথার্থ কাতর তো একমাত্র শিশুই হতে পারে তার মায়ের কাছে।

ইউরোপে কোথাও অনেকদিন ধরে দারুণ অনাবৃষ্টি যাচ্ছে। বৃষ্টির জন্যে নগরবাসী-দের সমবেত প্রার্থনা হবে গির্জেয়, চারদিকে রাষ্ট্র হয়েছে বিজ্ঞাপন। নির্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যার দিকে গির্জেয় দলে দলে লোক এসে জমায়েত হল—প্রার্থনায় যদি ফল হয়। জনতার মধ্যে একটি বালক ছাতা হাতে করে এসেছে। সবাই পরিহাস করছে, এমন সময়ে গরমে ছাতা কেন? সরল চোখ তুলে বালক বললে: 'আজ বৃষ্টি হবে না?' বৃষ্টি হবে —কে বললে? সবাই সরবে হেসে উঠল। 'বা, বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা হবে না, সমবেত প্রার্থনা?' তা হবে তো হবে, তাতে এখুনি-এখুনি বৃষ্টি কী। 'বা, সমবেত কাতর প্রার্থনা শুনলেই ভগবান বৃষ্টি দেবেন। আর তখন বৃষ্টি হলে আমি যাই কোথায়? যাই বলো, ভিজে-ভিজে বাড়ি ফিরতে আমি প্রস্তুত নই।'—যেই সমবেত প্রার্থনা শেষ হল, তক্ষুনি ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। ছাতা খুলে বাড়ি চলল বালক, সকলকে বললে, 'ভগবানের উপর যদি তোমাদের সত্যি-সত্যি বিশ্বাস থাকত তা হলে ছাতা ফেলে আসতে না, আমার মতো নিয়ে আসতে সঙ্গে করে। এখন দেখ, তোমরা পড়ে রইলে, আর আমি চলে যাচ্ছি বৃষ্টির মধ্যে।'

'তোমাদের পায়ে পড়ে বলছি,' বলছেন বিজয়কৃষ্ণ, 'একবার মাকে ডাকো। শিশু যেমন ডাকে তেমনি কাতর হয়ে ডাকো। মায়ের দয়ার ইতি-অন্ত নেই। বিশ্বাস করে ডাকলে, সরলভাবে ডাকলে মা দেখা দেবেন, ধরা দেবেন। তেমনি করে মাকে একবার ডেকে দেখ না কী হয়, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।'

মায়ের সঙ্গে কুটুম্ব বাড়ি গিয়েছে বিজয়। রাত্রে ঘরে একা-একা ঘুমুচ্ছে।

অমাবস্যা, কোথাকার এক বনে ভাঙা মন্দিরে কালীপুজো হবে। নর-বলির বলি সংগ্রহ করতে বেরিয়েছে লোক, কিন্তু বলির দেখা নেই এখনো। কে একজন ঘুমন্ত শিশু বিজয়কে এনে হাজির করল। সকলের আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা রইল না। এমন নির্মল নিরবদ্য বলি আর কোথায় মিলবে? স্নান করিয়ে শিশুকে নিয়ে এল

মন্দিরে। তান্ত্রিক কাপালিক খড়্গ তুলেছে বলি দিতে, এমন সময় কোত্থেকে কে জানে, এক পাগল এসে উপস্থিত। মুহূর্তে কাপালিকের হাত থেকে খড়্গ কেড়ে নিয়ে উলটে আক্রমণ করল। কাপালিক আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা দে-দৌড়।

বিজয়কে কোলে করে কুটুম্ব-বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল পাগল। কেমন-তরো মা ঘুমন্ত শিশুকে একা ফেলে রাখে! কেমনতরো কুটুম্ব! অতিথি শিশুর দিকে নজর রাখে না! বকতে বকতে, অসতর্কতাকে শাসন করতে করতে চলে গেল রক্ষাকর্তা।

কে এই পাগল? কে এই গতিভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী? কে এই সাক্ষাৎসুহৃৎ।

'কে ও? দুলাল দাদা না?' ডেকে উঠল বিজয়।

'আরে কে ও? গোঁসাই দাদা?' দুলাল-সর্দারের হাতের বর্শা শিথিল হয়ে পড়ল।

গোস্বামীদের প্রজা, জাতিতে জেলে, রংপুর অঞ্চলে থামারে এলে বিজয়কে নিয়ে খেলা করত। কাঁধে চড়াত। রং-বেরঙের পাখি দেখাত। ডাকাত গোঁসাই-দাদা বলে।

তুমি আমার দুলাল-দাদা। পাল্টা সম্ভাষণ করত বিজয়।

রংপুরে শিষ্যবাড়ি চলেছেন স্বর্ণময়ী। পথে রাত হতে চড়ার কাছে ঝাউবনের আড়ালে নৌকো বাঁধল মাঝিরা। নদীতে ডাকাতের ভয়। দুলাল সর্দারের ভয়ে সমস্ত নদীই এখানে তটস্থ। যা ভয় করেছিল, হারে-রে-রে রব তুলে ডাকাতের ছিপনৌকো এসে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। মারো, লোটো, কাটো। কেটে নদীর জলে ফেলে দে টুকরোগুলো।

'কে ও? দুলাল দাদা না?' ডাকাতের সর্দারকে পলকে চিনতে পেরেছে বিজয়।

'আরে কে ও? তুমি? আমার গোঁসাই দাদা?' দুলালের হাতের বর্শা, যা কোনোদিন হয় নি, থরথর করতে লাগল।

কত ছেলেকেই তো কোলে-পিঠে করেছে দুলাল, কত লোকের কণ্ঠেই তো শুনেছে দুলালদাদা, কিন্তু এ কে অপরূপ, যার কণ্ঠস্বরটি তখনো কানে লেগে আছে মধু হয়ে! যার ডাকটি শত কোলাহলেও ডুবে যায় না, মুছে যায় না মন থেকে। এক ডাকে চেনা যায়!

'কোথায় চলেছ?'

'শিষ্যবাড়ি।'

'এত রাত্রে, এখানে? ঝোপের মধ্যে?'

'তোমার ভয়ে।' হেসে উঠল বিজয়।

'সঙ্গে আর কে আছে?'

'মা আর দাদা।'

নৌকোয় নিজের লোক দিয়ে দিল দুলাল। বলে দিল নিরাপদে এদের শিষ্য বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবি। দেখিস পথে কেউ যেন না বিরক্ত করে, একটি আঙুলও যেন না তোলে। বলবি দুলাল-সর্দারের লোক।

দুলাল-সর্দারের মধ্যেও শ্যামসুন্দর।

জয়গোপালদের নাটমন্দিরে কীর্তন শুনতে যাচ্ছে বিজয়। পথে দেখতে পেল অশ্বত্থ গাছের ডাল তাক করে একটা লোক বাঁটুল ছুঁড়ছে। সঙ্গে সঙ্গেই একটা ঘুঘুপাখি রক্তাক্ত দেহে ছিটকে পড়ল জলের উপর, মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল।

'গোপাল-দা, দেখ দেখ, কে এই লোকটা, নিরীহ পাখিটাকে মারলে।' আহত পাখিটাকে বুকে নিয়ে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল বিজয়।

পাখিটার মুখে-গায়ে জল দেওয়া হল। কণ্ঠনালীটা একবার নড়ল পাখির, তারপর নিস্পন্দ হয়ে গেল। পীতাম্বর তর্কবাগীশের বাড়ির সামনে ঘটনা। তিনি কান্না শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন মৃত পাখি হাতে নিয়ে ছোট একটি ছেলে আকুল হয়ে কাঁদছে।

কে রে এই জগন্মোহন ছেলে, সামান্য পাখির শোকে এমন করে কেঁদে ভাসায়!

বিজয়কে কোলে নিলেন পীতাম্বর। শান্ত করতে বসলেন। তাঁর নিজের চোখও সিক্ত হল। আর যে মেরেছিল পাখিটাকে—পান্তু ঘাসী তার নাম—চিরজীবনের মতো ছেড়ে দিল পাখিশিকার।

আমতলায়, নিজ আসনে ধ্যানমগ্ন আছেন বিজয়কৃষ্ণ। হঠাৎ চমকে উঠে বললেন, 'দেখ তো, দেখ তো, ওদের তাড়িয়ে দাও, তাড়িয়ে দাও, পাখিরা ডাকছে।'

কোথায় পাখি ডাকছে! কোথায় কাকে তাড়িয়ে দেবে?

গোস্বামী-প্রভু বললেন, 'গিয়ে দেখ কুঞ্জ ঘোষের বাড়ির বড়ো আম গাছে।'

শিষ্য ভক্ত কুলদানন্দ তখুনি ছুটল। গিয়ে দেখল, কুঞ্জ ঘোষের বাড়ির বড়ো আম গাছটাকে লক্ষ্য করে দুটো ছেলে ঢিল ছুঁড়ছে। ওখানে কী? শালিকের বাসা। তিন চারটে শালিক গাছের উপরে এ-ডাল থেকে ও-ডালে ওড়া-ওড়ি করছে আর ডাকছে। ধমক দিতেই ক্ষান্ত হল ছেলেগুলো। পাখিরাও স্থির হল। ফিরে এল কুলদা।

'কী দেখলে?' জিগগেস করলেন বিজয়কৃষ্ণ।

কুলদা যা দেখেছে বললে। বললে, 'আমি তো এখানেই বসেছিলাম, পাখিদের শব্দ তো কিছুই শুনতে পাই নি। আপনি মগ্নাবস্থায় থেকে অত দূরে পাখিদের ডাক কী করে শুনলেন?'

গোস্বামী-প্রভু বললেন, 'নিকটে বা দূরে, তাব কী করবে? যেখানে যে অবস্থায়ই থাকা যাক, কোনো আপদে পড়ে কেউ ডাকলে তখুনি তা এসে প্রাণে বাজে।'

৩

ভগবান সরকারের পাঠশালাতে ভর্তি হল বিজয়।

মাস্টার তো নয় একখানা লিকলিকে বেত। শাসনে যেমন কঠোর স্নেহে তেমনি কোমল। পড়ায় ভুল করলেই প্রহার। দুরন্তপনা করলে তো কথাই নেই। হাতে পায়ে ইঁট নিয়ে নাড়ুগোপাল সাজো। নয় তো বোসো লাল পিঁপড়ের ঢিপিতে। তারপর পালপার্বণে আনো আলুটা-মুলোটা। তেল-ঘি-তামাকও আনো কেউ-কেউ। বিজয় আরো বেশি দেয়। দেয় শ্যামসুন্দরের প্রসাদ। শিষ্যবাড়ি থেকে পাওয়া নতুন কাপড়। বিজয়ের উপর খুব প্রসন্ন ভগবান। তা ছাড়া লেখাপড়ায়ও সে হীরের টুকরো ছেলে।

কলেরা লেগেছে শান্তিপুরে। পাঠশালার দু'জন পড়ুয়া মারা গেল।

বিজয়ের মন খুব ম্লান। সমস্ত কিছু সেই রকম আছে, আর ওরা দু'জন শুধু নেই? তাদের জায়গা পড়ে আছে, বই খাতা খেলনা পড়ে আছে, ওদের সঙ্গী সহচররা

পড়ে আছে, ওরা গেল কোথায় ? কেউ চলে যেতে পারে নিশ্চিহ্ন হয়ে ? বাজে কথা। নিশ্চয়ই কোথাও আছে লুকিয়ে। আমারই দোষ দেখতে পাচ্ছি না, শুনতে পাচ্ছি না। ধরতে পাচ্ছি না হাতে হাতে।

কে বলে আমারে দোষ ? যারা মরে যায়, চলে যায়, তারা কি আর থাকে ?

সহসা, নির্জনে পথের মাঝখানে, সেই দুই ছেলে সমস্বরে বলে উঠল : বিজয় আমরা আছি। আমরা আছি।

বিজয়ের বুকের মধ্যিখানটা কেঁপে কেঁপে উঠল। ব্যাকুল হয়ে তাকাতে লাগল চারপাশ। কোথায় ? কোনখানে ?

এই যে এখানে। সবখানে।

ছুটতে ছুটতে পাঠশালায় এল বিজয়। গুরুমশাইকে সব বললে।

'আমাকে শোনাতে পারবি ?' গুরুমশাই ভুরু কুঁচকোলেন।

'কেন পারব না ? আমার সঙ্গে যখন কথা বলেছে তখন আপনার সঙ্গেও বলবে।' শৈশবসারল্যে বললে বিজয়। 'চলুন।'

সেই নির্জন পথের মাঝখানে এল দু'জন। কতরকমের শব্দ, লতায়-পাতায়, কিন্তু অশরীরী কণ্ঠস্বর কই ?

ভগবানের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তেড়ে গেলেন বিজয়ের দিকে : 'ফাজলামোর জায়গা পাওনি ! নচ্ছার, মিথ্যেবাদী কোথাকার।'

এই মারে তো সেই মারে।

বিজয় কাঁদো কাঁদো মুখে বলে উঠল, 'ওরে তোরা কোথায় ? সেই আমার সঙ্গে কথা বলেছিলি তেমনি আবার বল। নইলে আমার আর রক্ষে নেই। আমাকে মেরে শেষ করে ফেলবে।'

কই, কোনো সাড়াও নেই শব্দও নেই। শূন্যতার কোলে শুধু স্তব্ধতা শুয়ে আছে। গালাগালের তুবড়ি ছোটালেন ভগবান। বেত না থাক, সোজা কিল-চড়েই সজুত করব তোকে।

'গুরুমশাই, বিজয়কে মারবেন না।' পাশের থেকে কারা বলে উঠল সমস্বরে : 'মারবেন না বলছি।'

ভগবানের হাত আড়ষ্ট হয়ে এল। সত্যিই তো, ঐ তো ছেলে দুটোর মিলিত কণ্ঠস্বর। মূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তোরা কোথায় !

'এই তো এইখানে। এই যে দেখুন—'

বিজয় ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন না ভগবান। দু'হাতে বিজয়কে জড়িয়ে ধরলেন বুকের মধ্যে। কে রে তুই দিব্য-চক্ষু দিব্য-কর্ণের ছেলে ?

লছমনদাস বাবাজী বুঝি চিনতে পেরেছে। গঙ্গাতীরে বক্তার ঘাটে থাকে সেই বৈষ্ণব। কী যে করে কে জানে, কেবল দোঁহা পড়ে আর গান গায়। বাবাজীর গান শুনতে খুব ভালোবাসে বিজয়। সহচরদের নিয়ে আসে আর মাঝে মাঝে সুরের সঙ্গে স্বর মেলায়। তালি দিয়ে তাল রাখে।

'এ ছেলেটির অবস্থা বড় মনোহর। হৃদয় প্রেমরসে পরিপূর।' বিজয়কে লক্ষ্য করে বলেন বাবাজী। 'এ একজন মহাপুরুষ।'

বিজয় যখন বোঝে তাকে নিয়েই চলছে এই স্তবস্তুতি তখন সে সেখান থেকে চম্পট দেয়।

ধুলট উৎসব হচ্ছে। কার সাধ্য পথে হাঁটে। আসল উৎসব শেষ হয়ে গিয়েছে কবে, তবু ধুলো ওড়ানো থামছে না। হাকিম ঈশ্বর ঘোষালের কাছে নালিশ করছে পথচারীরা।

'কারা ধুলো ওড়াচ্ছে ?'

'বিজয় গোস্বামী আর সাঙ্গোপাঙ্গেরা। দুরন্তের একশেষ।'

'দাঁড়ান, আমি পুলিশ দিচ্ছি।'

কনস্টেবলদের বলে দিলেন শুধু ফোঁস করবে, ছোবল মারবে না। গোঁসাই পাড়ার ছেলে, সাবধান।

ভেঙে গেল ধুলট খেলা। ভাঙুক। আরো কত খেলা আছে।

জমিদার অম্বিকাবাবুর ঘোড়া ধরে লুকিয়ে রেখেছে ছেলেরা। খবর গিয়েছে জমিদারের কাছে। ছেলেদের ধরে এনেছে। নিয়েছ আমাদের ঘোড়া ?

সকলে একবাক্যে বললে, 'না। আমরা তার কী জানি ?'

'তুমি জানো ?' বিজয়কে জিগগেস করলেন জমিদার।

'জানি।' সত্যভাষণের দীপ্তিতে স্বভাবসুন্দর বিজয়কৃষ্ণ 'ঐ জঙ্গলের মধ্যে গাছের সঙ্গে বাঁধা আছে।'

ধরা যখন পড়েছি, সত্য কথা বলব। সত্য বলতে পেছপা হব না। সত্যই কলির তপস্যা।

অম্বিকাবাবু তো সামান্য, স্বয়ং মহকুমা হাকিমেরই ঘোড়া ধরল ছেলেরা। একে-একে সকলে চড়ল তার পিঠে। যেই বিজয় চড়ল অমনি মনের সুখে অশ্বিনীতনয় লম্বা ডাক ছাড়ল। সে-ডাক হাকিমের সহিস চিনতে পারল পলকে। ছুটল ঘোড়া ধরতে। ছোকরারা দৌড় মারল। বিজয় পালাল না। ঘোড়া সমেত তাকে ধরে আনা হল হাকিমের কাছে।

'তোমরা নিয়েছ ঘোড়া ?' হুমকে উঠল ঈশ্বর ঘোষাল।

'নিয়েছি।'

'কোত্থেকে নিয়েছ ?'

'আপনাদের আস্তাবল থেকে।'

'কেন নিয়েছ ?'

'চড়বার শখ হয়েছিল, তাই।' সরল-উজ্জ্বল মুখে বললে বিজয়।

এক মুহূর্ত কী ভাবলেন ঈশ্বর ঘোষাল। বললেন, 'বেশ। আবার যখন শখ হবে বলবে আমাকে, আমি ঘোড়া সাজিয়ে দেব। ঘোড়া সাজানো না থাকলে পড়ে যেতে পারো। জিন লাগাম গদি না থাকলে কি ঘোড়সওয়ার হওয়া যায় ?'

ঘোড়ার পর এবার নৌকো ধরেছে বিজয়রা। চল কালনায় ঝুলনের মেলা দেখে আসি। রাত্রে শান্তিপুরের ঘাটে নৌকো বাঁধা আছে মাঝিদের। তারই একটা খুলে নিয়ে চলে যায় ওপারে। আবার ভোর হবার আগেই ফিরে আসে শান্তিপুর। যেমন নৌকো তেমনি আবার ঘাটে বাঁধা থাকে।

একদিন অন্যরকম হল। বিজয় ও তার দলবল পৌঁচেছে কালনায়, শুরু হল ঝড়-বৃষ্টি। এ দুর্যোগে নদী পার হওয়া নৌকোর অসাধ্য। মন মুখ মেঘলা করে ছেলের দল জেগে রইল সারারাত। আকাশ পরিষ্কার হতে হতে প্রভাত হয়ে গেল। এখন দিনের আলোয় নৌকো ফেরাতে গেলে মাঝিরা আর আস্ত রাখবে না। কিন্তু খেয়ার নৌকোয় পার হবার মতো পয়সা নেই। যা পয়সা ছিল সব মেলায় খরচ হয়ে গেছে। এখন উপায় ? উপায় সারল্য। উপায় সত্যকথা। উপায় মধুবাক্য।

খেয়ার মাঝিকে বিজয় বললে, 'দেখ ভাই আমাদের কারুর পয়সা নেই। ঝড়ে-জলে ঘুমুতে পারি নি সারারাত। এখন তুমি যদি দয়া করো আমরা ফিরতে পারি। খেতে পারি বাড়ি গিয়ে।'

খেয়ার মাঝির মন গলল। বিনি পয়সায় পার করে দিল।

বাড়ি ফিরে এসে প্রথমেই মাকে বললে এই দুর্বিপাকের কথা। মাগো, অপরাধ করে ফেলেছি। এখন কী করি?

স্বর্ণময়ী বললেন, 'মাঝিদের ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দাও আর মাপ চাও।'

সাপের উদ্যত ফণায় ধুলো পড়ল। মারমুখো মাঝিরা নরম হয়ে গেল।

কিন্তু দুষ্টুমি কি যায়? আগে-আগেও কি দৌরাত্ম্য কম ছিল? নন্দনন্দনের চাঞ্চল্যে ব্রজমণ্ডল অস্থির হয়ে উঠেছিল। আর মহাপ্রভু? মহাপ্রভু তো ছিলেন উদ্ধতের শিরোমণি।

গয়লানীরা বাজারে ময়রার দোকানে ছানা বেচতে আসছে। বিজয় আর তার দলের ছেলেরা রাস্তায় গর্ত করেছে, কচুপাতা কলাপাতা দিয়ে তা ঢেকে রেখে তার উপর ধুলো ছড়িয়ে চৌরস করে রেখেছে। গর্তে পা পড়লেই হাঁড়িশুদ্ধু উলটে পড়ে যায় গয়লানীরা। আয়, আয় যত পারিস কুড়িয়ে নে ছানা, খা পেট ভরে, বানরদেরও দে বিলিয়ে।

গয়লানীরা স্বর্ণময়ীর কাছে নালিশ করতে আসে।

আমার ছেলে অমনি অশান্তের একশেষ। তা তোমাদের কত লোকসান হয়েছে বলো বাছা, দাম দিয়ে দি।

পশু পাখির প্রতি অগাধ ভালোবাসা বিজয়ের। জীবে দয়া অর্থ শুধু দুঃস্থ-আতুর মানুষের প্রতি নয়। সমগ্র প্রাণিলোকের প্রতি। কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে বাঘ-সাপ-বেড়াল-বানর পর্যন্ত।

বানরদের নানারকম নাম রেখেছে বিজয়। হুঁকোমুখো, বুড়োদাদা, কানি, ফেলি, লেজকাটি। গায়ে দিব্যি হাত দিয়ে ঠেলে আদর করে নেয় খাবার। গরু আসে, ছাগল আসে, বেড়াল তো ঘুর-ঘুরই করে, এমন কি ইঁদুর আরশুলাও এসে গা খোঁটে। ওরে ওদের এখন খাবার দে। ওদের খিদে পেয়েছে।

গেণ্ডারিয়া আশ্রমে ভজনকুটিরের গর্তে একটি সাপ এসে বাসা করেছে। গোঁসাইজি যত্ন করে তাকে দুধকলা খাওয়ান, গায়ের স্পর্শ দিয়ে আদর করেন। জটা বেয়ে সাপ কাঁধ ছাড়িয়ে মাথায় গিয়ে ওঠে, আবার নিজের খেয়ালে নেমে যায়। ছোবল তো মারেই না, ফোঁসও করে না, যেমন মসৃণ তেমনি মসৃণ হাঁটে-চলে ওঠে-নামে।

'এটা কী ব্যাপার?' কেউ-কেউ প্রশ্ন করে গোঁসাইজিকে: 'সাপ আপনার গায়ে-মাথায় ওঠে কেন?'

'ওঠে নামধ্বনি শুনতে।'

ভক্তরা সকলে তাকাল কৌতূহলী হয়ে।

'নামের সঙ্গে যখন স্বাভাবিক প্রাণায়াম চলে তখন শরীরের মধ্যে একটা মধুর অব্যক্ত ধ্বনি হতে থাকে। সাধারণত দুই ভুরুর মাঝখান থেকে ওঠে সেই ঝঙ্কার। সাপ তা শোনার জন্যে তাই মাথায় ওঠে, কখনো বা স্বর মিলিয়ে শিস দেয়। অমনি অবস্থায় পৌঁছবার আগে দেহ সম্পূর্ণরূপে অহিংস হয়ে যায়। তখন হিংস্র জন্তুও নম্র হয়ে সামনে বসে।'

একটা কুকুর আছে আশ্রমে। সবাই তাকে 'কেলো' বলে ডাকে। কীর্তন শুরু হলেই বসে এসে ভিড়ের মধ্যে। কাঁপতে-কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তখন কর্ণমূলে হরিনাম দিলে চেতন হয়।

একদিন গোস্বামী-প্রভুর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। যেন কী নীরব প্রার্থনা আছে, তাই তার ঐ আর্ত-আর্দ্র মিনতি।

গোঁসাইজি বললেন, 'কালু, আমাকে মিনতি করলে কী হবে? এ জন্ম এই ভাবে কাটাও, পরের জন্মে তোমার উদ্ধার।'

ভেউ-ভেউ করে কাঁদতে লাগল কালু।

কিন্তু ঐ লোকটা অমন পরিত্রাহি কাঁদছে কেন। ছ-সাত বছরের ছেলে বিজয় খেলা ফেলে ছুটল সেই কান্নার দিকে। দেখল জমিদার পাওনা টাকা আদায়ের জন্য একটা লোককে বাঁশডলা দিচ্ছে। অসহায় লোকটা চেঁচাচ্ছে প্রাণপণে। যন্ত্রণায় আছড়াচ্ছে হাত-পা, ঝলকে-ঝলকে রক্ত উঠছে মুখ দিয়ে।

বিজয়ের অসহ্য লাগল। জমিদারের সামনে লাফিয়ে পড়ে সে গম্ভীর-বজ্রস্বরে গর্জন করে উঠল: 'তুমি ডাকাত! তুমি ডাকাত!'

জমিদার রোষনেত্রে তাকাল বালকের দিকে।

'লোকটা যে মরে গেল—এই দেখেও তোমার লাগছে না এতটুকু?' কাঁদতে লাগল বিজয়: 'ভালো চাও তো ছেড়ে দাও বলছি, এখুনি ছেড়ে দাও।' বলেই বিজয় মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

কি জানি কী হল, জমিদার ছেড়ে দিল লোকটাকে।

সেই জমিদারেরই পরে কী দশা হয়েছে দেখ।

অসহায় ব্রাহ্মণ বিধবা—তারও বুঝি ঋণ ছিল জমিদারের কাছে। দিনে-দুপুরে তার বাড়ি ঢুকে জমিদার তার যথাসর্বস্ব লুট করল। রান্না চড়িয়েছে বিধবা, তার ভাতের হাঁড়িটা পর্যন্ত লাথি মেরে ভেঙে ফেলল। বিধবা বললে, 'আমি কার কাছে এর প্রতিকার চাইব? আমার কে আছে? যিনি সকলের হয়েও আমারই একমাত্র সেই ভগবানকে বলছি, তিনি এর বিচার করবেন। যেমন যেমনটি আমাকে তুমি করলে, তোমার স্ত্রীর বেলায়ও তেমন তেমনটি ঘটবে।'

কী হল তার পর? জমিদার বেশ শক্ত মামলায় পড়ে সর্বস্বান্ত হল। ফৌজদারিতে সশ্রম কারাদণ্ড হল। জেলেই রোগে পড়ে মারা গেল। তার স্ত্রী হবিষ্যান্ন করতে রান্না চাপিয়েছে, শত্রুপক্ষের লোকেরা ঢুকল বাড়ির মধ্যে, সর্বস্ব লুট করল। আধাসেদ্ধ ভাতের হাঁড়িটাকে একজন লাথি মেরে ফেলে দিল উনুন থেকে। হাঁড়িটা পেতলের বলে তাও নিয়ে গেল দস্যুরা। জমিদার-গৃহিণী কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল বাড়ি ছেড়ে।

'দুঃখ পেয়ে হাড়িনী শাপে, এড়াতে পারে না বামুনের বাপে। কথাটা খুব সত্যি।' বললেন গোঁসাইজি, 'নিতান্ত অধম অপদার্থ দুরাচার ব্যক্তিও যদি দারুণ ক্লেশ পেয়ে শাপ দেয়, একটিও দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সাত্ত্বিকতম ধার্মিক ব্রাহ্মণও তার হাত এড়াতে পারে না।'

কিন্তু ভগবান গুরুমশাই যে মারেন সে বুঝি মমতার মার। বেত মারবার সময় তিনি সংখ্যা গোনেন, কিন্তু এক দুই তিন না বলে বলেন, রাম দুই তিন।

'আচ্ছা, আপনি রাম দিয়ে আরম্ভ করে শেষে দুই তিন বলেন কেন?' বিজয় একদিন জিগগেস করলে: 'রাম দুই তিন না বলে রাম কৃষ্ণ হরি বলতে পারেন না?'

সেই গুরুমশাই পাঠশালার ছাত্রদের ডাকলেন তাঁর বাড়িতে। বললেন, 'ওরে ছেলেরা, কাল সকালে আসিস একসঙ্গে গঙ্গায় নাইতে যাব।'

কী ব্যাপার, ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

'গঙ্গায় কেন জানতে চাস?' ভগবান বুঝিয়ে দিলেন সকলকে: 'সেখানে আমি দেহত্যাগ করব।'

পরদিন প্রাতে সকলকে নমস্কার করে পুত্রটির হাত ধরে গঙ্গার ঘাটে চলে এলেন ভগবান। স্নান আহ্নিক সেরে গঙ্গার জলে গিয়ে বসলেন জপ করতে। চারদিকে শুরু হল সংকীর্তন। ঘাট-বাট জনতায় ভরে গেল। জপ শেষ করে ভগবান ছাত্রদের সম্বোধন করে বললেন, 'ছেলেসব, আমি কায়স্থ, তোমরা অনেকে ব্রাহ্মণ, কত তোমাদের আমি মেরেছি-ধরেছি, তাড়ন-তর্জন করেছি, আমার মাথায় তোমরা পা দাও, আমার সকল অপরাধ খণ্ডে যাক। আর দেরি নেই। ঐ দেখ আমার রথ এসেছে।' খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়ালেন ভগবান। নাম করতে লাগলেন। দেহত্যাগ করলেন সজ্ঞানে।

ভগবানের মৃত্যুর পর উঠে গেল পাঠশালা। শান্তিপুরের মাইল দুই দূরে হেজল নামে এক পাদ্রীর একটা ইস্কুল ছিল, তাতে ভর্তি হল ব্রজ-বিজয় দুই ভাই। সংস্কৃত বিভাগেই ভর্তি হল দু'জনে।

আয়, চল কৃপণদেব শায়েস্তা করি। বিজয় ডাকে তার অনুচরদের। পুজোর আগের দিন কৃপণদের বাড়িতে প্রতিমা রেখে আসে অলক্ষিতে—কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী। তখন আর তাদের পুজো না করে উপায় নেই। সুতরাং ভক্তজনে প্রসাদ দাও। বিজয়ীরা গিয়ে হাত পাতে।

এদিকে আবার চড়ক পুজো করে। গাজনা বসায়। মূল সন্ন্যাসী বিজয়, শিয়ালকাঁটা বিছিয়ে গড়াগড়ি খায়। শ্মশান থেকে মড়ার খুলি কুড়িয়ে এনে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে আগুন-সন্ন্যাস করে। শিব গড়ে, আশুতোষেরও পুজো করে। বাঁশের চড়কগাছ তৈরি করে বন্ধুদের নিয়ে পাক খায়, চক্কর মারে।

আবার তারণ গোস্বামীর কথকতা শুনতে ভিড় জমায়। তন্ময় হয়ে শোনে সেই কথকতা। তারণ ঠাকুরের মিষ্টিকথা এত ভালো লাগে যে তাঁর জন্যে নিজের হাতে মালা গেঁথে আনে। কৃষ্ণকথাই মিষ্ট কথা। শুনতে শুনতে দুই চোখে অশ্রুর সাগর উথলে ওঠে। আহা, এই বালকে প্রেমের সঞ্চার হয়েছে।

নারদ বলছেন ব্যাসকে, 'সাধুরা প্রত্যহ কৃষ্ণকথা গান করতেন, তাঁদের অনুগ্রহে আমি শুনতে পেতাম সে সব মনোহারিণী কথা। সশ্রদ্ধ হয়ে কৃষ্ণকথা শুনতে শুনতে আমার প্রিয়শ্রব শ্রীকৃষ্ণে রতি জন্মাল।'

মহৎ সঙ্গলাভের সৌভাগ্য যার হয়েছে তারই এই ভাব বা রতির অধিকার। 'কৃষ্ণভক্তিজন্মমূলে হয় সাধুসঙ্গ।' সাধুসংগ থেকেই সর্বমংগলের শিরোমণি পূর্ণানন্দময়ী ভক্তি। ভক্তি অহৈতুকী।

যাত্রা শুনতেও বিজয়ের নিদারুণ আগ্রহ। যদি সঙ্গী না জোটে একলাই সে একশো। ভয়-ডরের ধার ধারে না। কিন্তু এ কে যে অন্ধকার রাতে লণ্ঠন হাতে করে তাকে পথ দেখায়? রাতের পর রাত যাত্রা হচ্ছে। রোজই বাড়ি ফিরতে দেরি হয় আর রোজই লণ্ঠন হাতে লোকটা বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। বিজয় ভাবে মা-ই বোধ হয় পাঠান লোকটাকে। নইলে এত আপনা-আপনি করে কেন?

'তুই রোজ এত রাত করে ফিরিস কেন ?' ব্যাকুল হয়ে জিগগেস করলেন স্বর্ণময়ী।

'বা, গান যে খুব দেরিতে ভাঙে।'

'রাত করে ফিরতে তোর ভয় করে না ?'

'ভয় করবে কেন! তুমি আলো দিয়ে যে লোকটাকে পাঠাও সেই তো পথ দেখিয়ে ঠিক পৌঁছিয়ে দেয় বাড়ি। আমি তো ওর ভরসায় নিশ্চিন্ত থাকি।'

'কে পৌঁছিয়ে দেয়!' চমকে উঠলেন স্বর্ণময়ী। 'খবরদার তুই আর যাবি না যাত্রা শুনতে। ফিরবি না একা-একা।'

'কেন মা, কে ঐ লোকটা ?'

'কে জানি কে। শান্তিপুরে অনেক ব্রহ্মদৈত্য। তাদেরই একটা কিনা তার ঠিক কী।' স্বর্ণময়ী ছেলেকে টানলেন কোলের কাছে : 'শেষকালে তোর একটা অমঙ্গল করে বসুক।'

তবু পরের দিন দুষ্টু ছেলে মাকে লুকিয়ে গিয়েছে আবার গান শুনতে। আজ না হয় ভাঙবার আগেই ফিরব তাড়াতাড়ি। কিন্তু এমনি দুর্দৈব, ঘুমিয়ে পড়েছে বিজয়। ঘুম যখন ভাঙল দেখল আসর প্রায় ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, লোকজনও না থাকার মধ্যে। অন্ধকারে পথ চিনবে কী করে ? কই, আলো হাতে সেই লোক কই ? আসবে না আজ এগিয়ে দিতে ?

'চল বাড়ি চল।' মুহূর্তে অদৃশ্যলোক থেকে সেই আগের চেনা লোকটা আবির্ভূত হল। হঠাৎ দেখা গেল আলো। হ্যাঁ, সেই চেনা লণ্ঠন।

'তুমি কে ?' জিগগেস করল বিজয়।

'তা জেনে তোমার কাজ কী ? বাড়ি যাবে তো চল আমার সঙ্গে। অনেক রাত হয়ে গিয়েছে।'

'তুমি কি ব্রহ্মদৈত্য ? আমার মা বলেছেন অনেক ব্রহ্মদৈত্য ঘুরে বেড়ায় শান্তিপুরে। তুমি কি তাদের একজন ?'

'আমি তা হতে যাব কেন ? চল, পা চালিয়ে চল।' লোকটা আরো একটু ঘেঁসে এল : 'তোমার মা আর কী বলেন ?'

'বলেন গয়ায় পিণ্ড দিলে ব্রহ্মদৈত্যরা উদ্ধার পায়।'

'হ্যাঁ তাই বটে।' লোকটা একটু থামল। বললে, 'দেখ, রাত অনেক হয়েছে, রাস্তা দিয়ে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তার চেয়ে এই জঙ্গলটুকু পেরিয়ে চল, সময় কম লাগবে। মা কত ব্যস্ত হয়ে আছেন না জানি।'

'চল।' বিন্দুমাত্র টলল না বিজয়।

'তবে এখানকার গাছে অনেক বানর থাকে।' বললে লোকটা, 'গাছের ডাল ধরে নাড়া দিলে ভয় পেয়ো না যেন।'

'কেন তুমি ওকে মিথ্যে কথা বলছ ?' গাছের উপর থেকে কে হুঙ্কার করে উঠল : 'আমরা বানর নই। আমরা মানুষও নই। আমরা অন্যপ্রকার।'

গাছের উপর থাকা আরেকজন বলে উঠল : 'আমরা কে যদি জানতে চাও তো পরকাল দেখ। পরকাল দেখ।'

আর দেখতে হবে না। চল দ্রুত পায়ে।

ঘর বার করছেন স্বর্ণময়ী। লণ্ঠনের আলো দেখে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন বাড়ির

কাছে আসতেই আলো নিবে গেল, আর লণ্ঠনওলা সিধে উঠে গেল তালগাছে। স্বচক্ষে দেখলেন স্বর্ণময়ী। চিনতে পারলেন।

'কে মা ?'

'শ্যামসুন্দরের পূজুরি ছিলেন। নাম পুরন্দর পূজুরি। সেবার জিনিস চুরি করার অপবাধে তাঁর আজ এই গতি।'

পুরন্দর হিতৈষী আত্মা। সে শুধু পথপ্রদর্শক নয়, সে বিজয়ের শরীর রক্ষক। বিজয়ের পাড়ার সঙ্গে বেপাড়ার ছেলেদের ঝগড়া মারামারি হয়েছে। অজান্তে বিজয় একদিন বিরুদ্ধ দলের হাতে গিয়ে পড়ল। তারা ঠিক করলে মেরে বিজয়কে ছাতু বানিয়ে দেবে। আজ আব রক্ষে নেই। বিপক্ষীয়েরা লাঠি হাতে তাকে ঘিরে ধরেছে। এই এই মারল বলে।

হঠাৎ পুরন্দর এসে উপস্থিত হল। বিজয়ের চারদিকে ঘুরতে লাগল ভন ভন করে। রাশি রাশি ধুলো উড়তে লাগল। সবাই ভাবলে ঘূর্ণি বাতাস উঠেছে বুঝি। মারমুখোদের চোখমুখ ধাঁধিয়ে গেল। বিজয়কে কেউ আর দেখতে পেল না। ধুলোর ঝড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

বিজয়কৃষ্ণ পরে যখন গয়ায় যান, মনে করে পুরন্দরের উদ্দেশে পিণ্ড দেন।

মানুষ মৃত্যুব পর কোথায় যায় ?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে একদিন জিগগেস করলেন বিজয়কৃষ্ণ।

মহর্ষি বললেন, 'কেন, যে সকল গ্রহ-নক্ষত্র দেখছ সেখানে যায়।'

'জীবের কী প্রকার অবস্থায় দেহত্যাগের পরেই আবার দেহ আশ্রয় করতে হয় ?' গোস্বামী-প্রভুকে জিগগেস কবল কুলদা।

'বিষয়ে যাদের ঘোর তৃষ্ণা, ভোগেচ্ছা যাদের প্রবল', বললেন গোঁসাইজি, 'তারা দেহ-ত্যাগ মাত্রই অপর দেহ আশ্রয় করে।'

'পিতৃলোকে কারা যায় ?'

'বিষয় উপস্থিত হলে যারা ভোগ করে কিন্তু তা লাভের জন্যে তেমন স্পৃহা রাখে না তারাই পিতৃলোকযাত্রী।'

'আর ব্রহ্মলোকে ? ব্রহ্মলোকের অতীতে ?'

'বাসনা হেতুই জীবের ভিন্ন ভিন্ন লোকে গতি হয়।' বললেন গোঁসাইজি, 'সমস্ত বাসনার মূল পর্যন্ত যাদের নষ্ট হয়েছে যাদের ভগবান ছাড়া আর লক্ষ্য নেই, তারাই ব্রহ্মলোকের অতীত।'

'বাসনা-ত্যাগ হবে কিসে ?'

'ব্রহ্মচর্যে প্রধান সাধন সত্য অহিংসা আর বীর্যধারণ।' বললেন গোঁসাইজি, 'সন্ন্যাসে তেমনি প্রধান সাধন সর্বদা ভগবানকে স্মরণ ও বাসনা-ত্যাগ। বাসনাটি ত্যাগ করতে পারলেই বুঝবে এবার পাড়ি দিলে।'

'বাসনা নষ্ট হয়েছে বুঝব কিসে ?'

'নিন্দা প্রশংসা যখন মনকে স্পর্শ করবে না তখনই বুঝবে বাসনা নষ্ট হয়েছে।'

হেজেল সাহেবের পাঠশালা শেষ করে বিজয় ভর্তি হল গোবিন্দ ভটচাযের টোলে। এক বছরের মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আয়ত্ত করে ফেলল।

তারপরে ঢুকল বনমালী ভটচাযের চতুষ্পাঠীতে। সেখানে কাব্য পড়ল। সেখান থেকে এল কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রয়ে। আর কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছেই তার বেদান্তের পাঠ। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—এই মন্ত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

ন বছরে উপনয়ন হল বিজয়ের। কৃষ্ণগোপাল তর্করত্ন তাকে গায়ত্রী মন্ত্র দিল। কুলপ্রথা অনুসারে মা স্বর্ণময়ীই দীক্ষাদাত্রী কিন্তু অনুষ্ঠানগুলো শেখাবার জন্যে চাই একজন সদাচারী পণ্ডিত, একজন উপগুরু। সেই উপগুরুই কৃষ্ণ গোস্বামী। বেদান্তবিদ্বান।

পোষ্যপুত্র করে নামঞ্জুর করে দিয়েছেন কৃষ্ণমণি, কবে বা চলে গিয়েছেন পৃথিবী ছেড়ে, বিজয় এখন স্বর্ণময়ীর ষোল আনা।

দীক্ষা গ্রহণের পর থেকেই বিজয় 'হরিবোলা'। যে নামে পাপহরণ করে তাই হরিনাম। দুর্গানাম কালীনামও হরিনাম। মা নামও হরিনাম।

ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজে বাৎসরিক উৎসব হচ্ছে। বেদীতে বসে গোস্বামী-প্রভু উপাসনা করছেন। সময়টা শারদীয়া পুজোর প্রাক্কালে। পুজো আসছে তাই সর্বত্র একটা আনন্দের আভাস। মন্দিরে ও প্রাঙ্গণে অপূর্ব সমারোহ।

উপাসনায় বসে দু চার কথা বলবার পরেই ভাবাবেশে বলতে লাগলেন গোঁসাইজি: 'মা—! এই যে আমার মা এসেছেন। তাঁর কাঙাল ছেলেদের খাওয়াতে প্রসাদের থালা হাতে নিয়ে এসেছেন। মা আমাকে প্রসাদ নিতে সাধছেন। মা গো, আজ আমি একা পাব না, সকলকে তুমি হাতে ধরে তোমার প্রসাদ দাও, তবে আমি পাব।'

যেন প্রত্যক্ষ দেখছেন মাকে। করজোড়ে কাঁদ-কাঁদ স্বরে প্রার্থনা করছেন। পড়ছেন ঢলে ঢলে।

ব্রাহ্মমন্দিরে এ কী ভাব! এমনটি কেউ দেখেনি। যারা দেখতে এসেছে তাদেরও ভাবোচ্ছ্বাস। আনন্দ-ক্রন্দন। ক্রমে বিপুল ব্যাকুল কোলাহল।

জয় মা, জয় মা, বলে বেদী থেকে লাফিয়ে পড়লেন গোঁসাইজি। সংকীর্তনের মধ্যে নৃত্য করতে শুরু করলেন। শুরু করলেন হুংকার-গর্জন। তার পরেই গাঢ়স্বরে হরিবোল, হরিবোল। হরিবোল বলছেন আর ঘুরে ঘুরে সকলের মাথায় হাত রাখছেন। আর কারু অস্থিরতা নেই, ভাবালুতা নেই, উন্মথিত সমুদ্র শান্ত হল। নেমে এল গম্ভীর স্তব্ধতা।

বর্ষায় বাওড়ের বাঁধ কাটা হয়েছে, গঙ্গার জল ঢুকছে হু হু করে। ওরে গেল, গেল—কে একটা ছেলে ডুবে গেল বাওড়ে। আর্তধ্বনি আর কেউ না শুনুক, বিজয় শুনেছে। শোনা মাত্রই ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। তুলেছে শেষ পর্যন্ত। নিজের ঘাড়ে বিপদ কতখানি তার হিসেব করেনি।

'ওরে বোনো, দেখে যা, দেখে তোর নয়ন সার্থক কর।' বনমালী ভটচাযের মা ডাকছে

বনমালীকে : 'তোর ছাত্র বিজয়ের কীর্তি দ্যাখ। খড়-ভাঙা স্রোতের মুখ থেকে কেমন দ্যাখ বাঁচিয়েছে ছেলেটাকে।'

'কই, কোথায় ছেলেটা ?' বনমালী ব্যাকুল চোখে তাকাল এদিক ওদিক।

'ঐ যে পোলের উপর।'

বনমালী ছুটল পোলের দিকে। দেখল ছোট একটা ছেলে শুয়ে আছে, শ্বাস ফেলছে মৃদু মৃদু আর বিজয় তার হাত পা টিপে দিচ্ছে।

'তুমি গোঁসাইদের ছেলে, তুমি আমার ছেলের পা ধোরো না।' ছেলেটার মা কাঁদছে আর বারণ করছে। 'আমরা নিচু জাত, তুমি পা ছুঁলে যে ঘোর অপরাধ হবে আমাদের।' ছেলের জীবন রক্ষার চেয়েও যেন অপরাধ ভঞ্জনের দায় বেশি। ও সব কথায় বিজয়ের কান নেই। ছেলেটাকে সুস্থ করাই তার একমাত্র উদ্যোগ।

তারপর সেবার আগুন দেখা দিল।

আগুন! আগুন! গেল, গেল, সব গেল। পুড়ে খাক হল সর্বস্ব।

তাঁতপাড়ায় আগুন লেগেছে। আর সবাই আগুন দেখ আমরা আগুন নেবাই। বিজয় তার দলবল নিয়ে ছুটল আগুনের মতো। এই সেই তাঁতিপাড়া যেখানে রামলাল থাকে যার সঙ্গে বিজয়ের ভাব। যাকে দেখলেই ঠাট্টা করে ছড়া কাটে বিজয় : 'তাঁতি তাঁত বুনতে মন, দুটো কেষ্ট কথা শোন।' কৃষ্ণ এসেছে আজ কৃষ্ণবর্ত্মা হয়ে। তার সংহার কথা শোনাতে।

কিন্তু আমরা তাকে বশীভূত করব। শীতল করব জল ঢেলে।

এ তো না হয় বুঝি। সেদিন একটা কলেরার রুগীকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে গোলোককিশোরের নাটমন্দিরে এনে তুলল, চিকিৎসার ব্যবস্থা করে সুস্থ করে তুলল, এ সব হৃদয়ের কথা হলেও যুক্তি-বুদ্ধির কথা। কিন্তু অনাবৃষ্টির প্রতিকারে মহাদেবকে মহাস্নান করাতে হবে এ বুজরুকি ছাড়া আর কী। তুই, বিজয়, একটা লেখা পড়া জানা ছেলে, তুই এ সব অযৌক্তিকের মধ্যে যাস কেন ?

কতদিন ধরে একবিন্দু মেঘ নেই আকাশে। চাষীরা হাহাকার করছে। গ্রামবাসীরা কত ডাকছে দেবতাকে, মমতার এতটুকু একটু আভাস নেই কোথাও। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের যজ্ঞের ধোঁয়া আকাশকে আরো আতাম্র করে তুলেছে। ছন্নছাড়ার মতো ছুটোছুটি করছে সকলে, অনুপায়ের উপায় কী ?

শিবমন্দিরের গাছতলায় নতুন এক সাধু এসে বসেছে, চল তার কাছে যাই। দেখি সে কিছু বলে কি না। বিজয়কে অগ্রণী করে সবাই গিয়ে ধরে পড়ল সাধুকে। বল কিসে আকাশ দ্রব হবে। সজল-শ্যামলের স্পর্শ পাবে মৃত্তিকা। ধ্যানস্থ হল সাধু। ধ্যানভঙ্গে বললে, মন্দিরে যে মহাদেব আছেন, অনেক দিন জল পাননি, তাঁকে মহাস্নান করাও।

চল চল শিবের মাথায় জল ঢালি। গ্রামের অগণন স্ত্রী-পুরুষ জলপূর্ণ পাত্র নিয়ে এল। বিজয় সূক্তমন্ত্র বলে জল ঢালল প্রথমে। তারপর আর সকলে। আদিগন্ত মেঘ করে এল। নামল সহর্ষ বর্ষণ। মাটি স্নিগ্ধ হল। বৃক্ষলতা সবুজ হল ; মাঠ ভরে উথলে উঠল ফসলের ঢেউ। সেই থেকে সেই মহাদেবের নাম হল জলেশ্বর।

'আমার অবিশ্বাস তো কিছুতেই যায় না। কী করি ?' শ্রীচরণ চক্রবর্তী একদিন ধরলেন গোঁসাইজিকে।

'যাঁরা সাধন লাভ করেছেন, অবিশ্বাসের সময় তাঁদেরকে স্মরণ কোরো।' বললেন

গোঁসাইজি : 'তাঁরা কিছু না কিছু পেয়েছেন বিশ্বাসের বস্তু। শুধু সেই কথাটা ধরে থেকো। তাছাড়া অবিশ্বাসের সময় যদি পাঁচ ছটি নাম করতে পারো তা হলেও বাঁচোয়া। কিন্তু এমনিই দুর্দৈব তাও কেউ করে না।'

কুঞ্জ গৃহে রোগশয্যায় শুয়ে। সে বললে, 'আমি তো নাম করতেই পারি না।'

'নাম করার ইচ্ছে আছে? নাম করার ইচ্ছে হলেও হয়।' গোঁসাইজি বললেন, 'আমাদের যে যোগ তা নামের যোগ। আনন্দ না পেলে নাম করব না, যখন ভালো লাগবে তখনই কেবল করব এ ভাব ব্যবসাদারি। ভালো আমার লাগুক আর নাই লাগুক, আদেশমতো নাম করতেই হবে। নামদ্বারা ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে। ক্রুশবিদ্ধ হলেই পরে পুনরুত্থান।'

গোয়ালা শিষ্যদের বাড়ি গিয়েছে বিজয়। কিন্তু ওরা সব কোথায়? কে বললে, আপনাকে দেখে পালিয়েছে।

'কেন, কী হল? আমি কী করলাম?'

'না, আপনি নিজে কিছু করেননি। কিন্তু গোঁসাই কর্তারা ওদের ধোপা নাপিত বন্ধ করেছে। দিয়েছে একঘরে করে।'

'কেন, ওদের অপরাধ?'

'সময়মতো তিনশো টাকা দিতে পারেনি গোঁসাইদের।'

'কিসের টাকা?'

'জরিমানার টাকা।'

'সে কী, জরিমানা কেন?'

'কী এক সামাজিক অবিধি করেছিল গোয়ালারা। তাই এই শাস্তি। তিনশো টাকা জরিমানা। তখন-তখন টাকাটা দিতে পারেনি বলে এই দণ্ড।'

'কোনো ভয় নেই। ওদের আমার কাছে আসতে বলো। ধোপা নাপিত ডাকাও। ওদের সমস্ত মলিনত্বের মোচন হবে। হ্যাঁ, দায়িত্ব আমার। দণ্ড দেওয়া যদি সহজ হয়, প্রীতি দেওয়া মৈত্রী দেওয়া আরো সহজ।'

পায়ের কাছে প্রণামে লুটিয়ে পড়ল গোয়ালারা। এক থলে টাকা এনে রাখল। এতদিন ধরে যা সংগ্রহ করেছে—পাঁচশো টাকা।

'এ কী? টাকা কেন? টাকা দিয়ে কী হবে?'

'সেই জরিমানার টাকা। গোঁসাই কর্তাদের পাওনা।'

'জরিমানারও সুদ হয় বুঝি!' বিজয় হুমকে উঠল: 'খবরদার, ও টাকা আমি নিতে পারব না।'

সমাজে পতিত থাকাটা যখন উঠে গেল, তখন টাকাটা পেঁছে না দিলে কেমন হয়! একজন পড়শীর হাত দিয়ে গোপনে পাঠিয়ে দিল টাকাটা।

বাড়ি পেঁছুতে কর্তারা তেড়ে এলেন: 'তুই আমাদের মান-সম্মান রাখতে দিবি নে?'

'সেই মান-সম্মানের দাম এই পাঠিয়ে দিয়েছে গোয়ালারা।' বললে সেই প্রতিবেশী: 'এই পাঁচশো টাকা।'

বিজয় মাথায় হাত দিয়ে বসল। জরিমানা তো বটেই তার আবার সুদ!

টাকা পেয়ে কর্তারা মহা খুশি। বললে, 'এই টাকায় তোরও অংশ আছে।'

'কানাকড়ি অংশও আমার কাম্য নয়।' বিজয় চলে গেল রাগ করে।

একদিকে যেমন বিদ্যা, বিনয়, বৈষ্ণবতা, তেমনি আরেক দিকে চলেছে ঘোর অনাচার, দুর্নীতি, বীভৎসতা। চলেছে মদের ভরা জোয়ার। ভদ্র ঘরের মেয়েরা পর্যন্ত দাসী দিয়ে দোকান থেকে মদ কিনিয়ে এনে খাচ্ছে। শান্তিপুরের সরু সুতোর শাড়ি পরে স্নান করে উঠছে। বাবু লোকেরা ডাকাতের সর্দারি করছে, কেউ কেউ বা বেশ্যা আনছে বাড়িতে। চলেছে নগ্নিকা পুজা।

বিজয় তার দলবল নিয়ে মার মার করে উঠল। যদি অনুরোধ না শোনে, শেষে একেবারে নিশ্বাসরোধ। যদু পাল ছোঁড়াটা খুব দুর্ব্যবহার করছে, মিষ্টি কথা কানে তুলছে না। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। বাচ খেলবি গঙ্গায় ? প্রলোভন বুঝতে পারল না যদু, এক কথায় রাজি হল। তারপর মাঝগঙ্গায় বিজয় বললে, 'প্রতিজ্ঞা কর, কু-অভ্যাস ছাড়বি জন্মের মতো, নয় হাত পা বেঁধে ফেলে দেব নদীতে।'

যদু প্রত্যাবৃত্ত হল। যদু মধু হয়ে গেল।

ঐ লোকটা ঘরে বেশ্যা এনে রেখেছে। কে লোকটা ? খোঁজ নিয়ে জানল, বিজয়েরই আত্মীয়। হোক আত্মীয়, রেহাই দেব না। দলবল নিয়ে মার-মার করে ঢুকল বিজয়, মেয়েমানুষটা পালিয়ে গেল চটপট।

সাপ কারা এমনি পুষেছ ঘরের মধ্যে, বার করে দাও। আর, দয়া করে আপনারা একটু স্থূলে বস্ত্র পরুন। অন্তত স্নানের সময়।

কী স্পর্ধা এই গোঁসাই ছেলেটার। আমরা যা খুশি খাব পরব, তাতে ওর কী মাথাব্যথা ? আমাদের তরফ থেকে উলটে কেউ ওকে ঘায়েল করতে পারে না ?

তাই ঠিক হল। প্রত্যুষে বিজয় যখন স্নান করতে আসবে তখনই দেওয়া যাবে উত্তম-মধ্যম। সংস্কারক সাজার বাহাদুরি বন্ধ হবে। কিন্তু উলটা বুঝিলি রাম হল। একজনকে মারতে গিয়ে আরেকজনকে মেরে বসল। স্ত্রী-পুরুষের ঘাট আলাদা হয়ে গেল। আর পুরুষই যদি না থাকে দেখবার, তাহলে সাজেরই বা মানে কী, অসাজেরই বা দাম কী।

বিজয়ের এক বন্ধু মদ খায়। অনেক বারণ করেছে বিজয়, কিন্তু কে কার কথা শোনে ! সে দিনও ছোকরা টেনে এসেছে। আজ আর মিষ্টি কথার প্রলেপ নয়, বিজয় তার গাল বাড়িয়ে প্রচণ্ড এক চড় বসাল।

'তুই আমাকে মারলি ?'

'মারলাম। বেশ করলাম।'

দুঃখে অপমানে ছোকরা দেশান্তরী হয়ে গেল। প্রায় পঁচিশ বছর পর সেই বন্ধু ফিরেছে শান্তিপুরে। গোঁসাইজির বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ডেকেছে : 'বিজয় !'

গোস্বামী-প্রভু ডাক চিনতে পেরেছে। বেরিয়ে এসে চক্ষু স্থির ! 'এ কী, তুই ? তোর সন্ন্যাসী বেশ ?'

বন্ধু বললে, 'বিজয়, তোর সেই চড়ই আমার ধর্মজীবনের মূল। সে চড় চড নয়, সে চড় কৃপা।'

'পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে। উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা, পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। এর অর্থ কী ?' জিগগেস করলে কুলদা : 'এই থেকেই তো তান্ত্রিকেরা সুরাপানের মাহাত্ম্য দেখাচ্ছে।'

গোস্বামী প্রভু বললেন, 'না ! যে সুরাপানের এই ব্যবস্থা তা বাইরের সুরা নয়। না

বুঝে লোকেরা ভুল করে। ভক্তিতে দেহেই এক রকম সুরা তৈরি হয়, আর তা খেলেই অপার নেশা। তা খেলেই আর জন্ম নেই। তাই তার নাম অমৃত।'

'কী করে সুরা তৈরি হয় আর কী করেই বা খায়?'

'আমাদের যখন ক্রোধ হয় তখন রক্ত গরম হয়ে অস্বাভাবিক অবস্থায় শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। কামেও তাই। এই রকম সৎ-অসৎ সব ভাবেই মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ স্থানে এক-একরকম অনুভবে রক্তের পরিবর্তন ঘটায়। ভাব ভক্তি আনন্দেও রক্তের পরিবর্তন হয়। সে পরিবর্তনটা বেশি হলেই এক রকম রস তৈরি হয়। সে রস টাকরা দিয়ে চুঁইয়ে জিভে এসে পড়ে। ওটাকেই তান্ত্রিকেরা সুরা বলেছেন। আসলে ওটাই অমৃত।'

'যে ভক্তিতে এই অমৃত তৈরি হয় তা পাই কিসে?' জিগগেস করল কুলদা: 'এই অমৃতে কি আমাদের অধিকার নেই?'

'নিশ্চয়ই আছে।' বললেন বিজয়কৃষ্ণ, 'এই অমৃত লাভ করতে হলে শ্বাসে-প্রশ্বাসে খুব নাম করো। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করতে পারলেই দেখবে ক্রমে-ক্রমে সমস্ত লাভ হচ্ছে। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করাই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।'

'মা গো, একশোটা টাকা দাও।' স্বর্ণময়ীর কাছে হাত পাতল বিজয়: 'কাশী যাব।'

'কেন, কাশী কেন?'

'বেদান্ত পড়ব।'

একশো টাকা বার করে দিলেন স্বর্ণময়ী। কাশী তখন দুর্গমের দেশ। রেল বসেনি। হয় নৌকোয় যাও, নয়তো পদব্রজে। যদি পথেই মরো, ভাবতে পারো কাশীতেই মরলে। মায়ের আশীর্বাদ রক্ষা করবে বিজয়কে। তার জ্ঞানের পিপাসায় বাধা হই কী করে?

সতেরো বছরের ছেলে বিজয় পায়ে হেঁটেই কাশী যাত্রা করল। মাথায় জটার মতো লম্বা চুল, কপালে তিলক, গলায় মালা। চলেছে এ এক অভিনব তীর্থংকর। হ্যাঁ, সন্দেহ কী, বেদান্তই তার তীর্থ—অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

বিশেষরূপে জানলেই সত্য বলা যায়। চিন্তা না করলে জানা যায় না। শ্রদ্ধা না থাকলে চিন্তা হয় না। নিষ্ঠা না থাকলে শ্রদ্ধা হয় না। চেষ্টা না করলে নিষ্ঠা হয় না। সুখ না পেলে চেষ্টা আসে না। আর ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নেই।

ভূমা কী? অল্পই বা কী?

কখনো চটিতে কখনো ধর্মশালায় কখনো বা বৃক্ষতলে বিশ্রাম নিয়ে-নিয়ে এগুচ্ছে বিজয়। নবীন বিদ্যার্থী। বিদ্যা-তীর্থী।

পাটনা ছাড়িয়ে এক দেবালয়ে আশ্রয় পেয়েছে বিজয়। পূজুরী মেদিনীপুরের এক ব্রাহ্মণ, উপযাচক হয়ে বহুমানে ডেকে এনেছে। রাত্রে এখানে থাকুন, আহারাদি করে বিশ্রাম করুন। পরদিন প্রভাতে আবার যাত্রা করবেন। পথঘাট ভালো নয়। ডাকাতি যত্র তত্র। আর এখানকার ডাকাত লুণ্ঠন করেই ছেড়ে দেয় না, অবলীলায় হত্যা করে।

সঙ্গে টাকাকড়ি কিছু আছে তো?

তা কোন না আছে। দূরদেশে বিদ্যার্জন করতে চলেছি, একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলে চলে কী করে?

তবে থাকুন আজ এখানে। আমি অতিথির সেবা করি।

বিজয় রাজি হল।

অন্তরের গোপনে উল্লসিত হল পূজুরী। ডাকাত শুধু পথেই নয়, দেবালয়েও।

আর হত্যা শুধু নির্জনে অরণ্যেই হতে পারে না, হতে পারে মন্দিরে, বিগ্রহের সামনে। আর মৃতদেহ? মৃতদেহ মাটির তলায় পুঁতে ফেলতে কতক্ষণ?

কিন্তু অতিথি ঘুমিয়ে পড়ছে না কেন?

পূজারী এল গল্প করতে। অল্পে অল্পে তন্দ্রাবেশ আনতে।

'বাড়ি কোথায় আপনার?'

'শান্তিপুর।'

'নামটি জিগগেস করতে পারি কি?'

'আমার নাম বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।'

'গোস্বামী? আপনার বাবার নাম?'

'আনন্দকিশোর—'

থরথর করে কাঁপতে লাগল পূজারী। বিজয়ের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল কাঁদতে কাঁদতে। বললে, 'আমি পাপিষ্ঠ নরাধম, আমি আমার গুরুপুত্রকে হত্যা করবার আয়োজন করেছি। অতিথিকে আশ্রয় দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে খুন করে তার সর্বস্ব কেড়ে নেওয়াই আমার ব্যবসা। আজ সে ব্যবসার ইতি হল। আমাকে ত্রাণ করুন।'

বিজয়ের আর কাশী যাওয়া হল না। পূজারীই তাকে ফিরিয়ে দিল। তোমার বাবা মার দোহাই, তুমি ফিরে যাও। পথের ডাকাত বরং ভালো, মন্দিরের ডাকাতই ভয়ংকর। মন্দিরের ডাকাত ছদ্মবেশী। আর এ রকম মন্দির পথের দুইধারে।

মার কাছে ফিরে এল বিজয়। বললে সব বিবরণ। স্বর্ণময়ী তার বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। বাবা শ্যামসুন্দর তোকে রক্ষে করেছেন। পরমান্ন রেঁধে ঠাকুরের ভোগ দেব, তোর আধিব্যাধি সব কেটে যাবে।

এখন তবে কী করব?

বাল্য সহচর বন্ধু অঘোর গুপ্তকে সঙ্গে করে বিজয় চলে এল কলকাতা। অঘোরও টোলের পড়া সাঙ্গ করেছে, দুজনে কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হল। কিন্তু কলকাতায় থাকবার জায়গা কই বিজয়ের? সাঁতরাগাছিতে জেঠতুতো ভগ্নীপতি কিশোরী মৈত্রের বাসাবাড়ি, সেখানে এসে উঠল বিজয়। সেখান থেকে কলেজ করতে লাগল।

কী করে আসে কলেজে? তিন চার মাইল পায়ে হেঁটে, পরে নৌকোয় গঙ্গাপার হয়ে। কিন্তু কষ্টের কাছে নতিস্বীকারে সম্মত নয় বিজয়।

তখন কলকাতায় নতুন যুগের হাওয়া বইছে, আপাতরম্য পাশ্চাত্য সভ্যতার হাওয়া। খৃস্টান হবার হিড়িক পড়েছে, পান ভোজনের ধুম। হিন্দুধর্ম একটা প্রকাণ্ড ধাপ্পা, বীভৎসতম কুসংস্কার। পাদ্রীদের কাগজে ছাত্র মাধব মল্লিক প্রবন্ধ লিখল, যদি কোনো কিছুকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ঘৃণা করে থাকি তা হচ্ছে হিন্দুধর্ম।

রামময় আর কৃষ্ণময় দুজনেই ভটচায, দুজনেই বিজয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এবং স্বধর্মনিষ্ঠ। কুলপুরোহিত পণ্ডিত ননী শিরোমণির দুই ছেলে। কী আশ্চর্য, তারা দুজনেই খৃস্টান হয়ে গেল।

বিজয়ও বুঝি হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠানে আস্থা হারাতে শুরু করেছে।

ঘোর বৈদান্তিক হয়ে উঠেছে। জীবে ব্রহ্মে ভেদ নেই, দাঁড়াচ্ছে এসে এই ভূমিকায়। সমস্ত পদার্থই ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম। এই একমাত্র সত্য। আর আমিই যদি ব্রহ্ম হই তাহলে কাকে আর ভজন করব? উপাসনা অনাবশ্যক। ভক্তি নিরর্থকা।

রংপুরে আমলাগাছিতে পৈত্রিক শিষ্যবাড়িতে এসেছে বিজয়। শিষ্য যথারীতি পদপূজা করল বিজয়ের। বললে, 'গুরুদেব, আমাকে উদ্ধার করুন।'

চমকে উঠল বিজয়। আমি উদ্ধার করবার কে? কী শক্তি আমার আছে যে আমি অন্যকে উদ্ধার করব? নিজে কী করে উদ্ধার পাব তার ঠিক নেই, তা পরের জন্যে ভাবনা। হাতের ক্ষমতা নেই তো পায়ের ক্ষমতা।

এই গুরুগিরি মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়। আরো কত-কত শিষ্য ছিল সেই গ্রামে, তাদের কারু বাড়ি আর গেল না বিজয়। এ ব্যবসা ছেড়ে দেব। কলকাতায় মেডিকেল কলেজে ভর্তি হব, ডাক্তার হয়ে স্বাধীনভাবে স্বোপার্জিত অর্থে জীবিকানির্বাহ করব।

পথ দিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ আকাশবাণী হল। 'পরলোক চিন্তা কর।'

চারদিকে বিজয় তাকাল ব্যাকুল হয়ে। কে বললে এ কথা? কী অর্থ এ কথার? পরলোক—পরলোক কেন, পরলোক কোথায়?

জ্বর হয়ে গেল বিজয়ের।

মৃত্যুর পরে কী হয়? পরলোক বলে যে সকল স্থানের কথা শোনা যায় তা কি সত্য? সকলেই কি এক জায়গায় যায়?

'মৃত্যুর পরে প্রত্যেকেই পিতৃলোকে যায়। সেখানে তার সত্যিকার কী অবস্থা তাকে দেখিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে ক্রমে-ক্রমে আবার তার বাসনা জন্মায়। আর বাসনা বৃদ্ধি হলেই জন্মের ইচ্ছে হয়।' বললেন গোস্বামীপ্রভু, 'জন্ম যে কেবল পৃথিবীতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। সৌরজগৎ বলে যা জানি, তেমন সংখ্যাতীত সৌরজগৎ আছে। বিষ্ণুলোক আছে, চন্দ্রলোক আছে, আছে তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ও সব গ্রহেও তার জন্ম হতে পারে। এ পৃথিবীতে জন্ম না হলেই কেউ মুক্ত হল এমন নয়। অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহেও থাকবার মতো বাসস্থান আছে। স্ত্রী-পুরুষ আছে। এই পৃথিবীর স্ত্রী-পুরুষের মতোই তাদের সম্পর্ক নয়, তবে তারাও মোহের অধীন। সেখানেও বাসনা, আবার সেই বাসনার তারতম্যে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে জন্ম। তাই নানা প্রকার পরলোক।'

যমুনার তীরে কালীদহের কাছে এক প্রেত মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। বললে, 'প্রভু, রক্ষে করুন, আর এ যন্ত্রণা সইতে পারছি না।'

'কোন পাপে আপনার এ দণ্ড?' জিগগেস করলেন গোঁসাইজি।

'মন্দিরে পূজারী ছিলাম। ঠাকুর সেবার সমস্ত অর্থ ভোগ বিলাসে উড়িয়েছি—'

'আপনার শ্রাদ্ধ হয়নি?'

'না। দয়া করে আমার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিয়ে দিন।'

'কী করে করব?'

'শ্রাদ্ধের খরচের জন্যে দেড় হাজার টাকা রেখেছিলাম ভাইপোর কাছে। সেও বুঝি সেই টাকা ফুঁকে দিয়েছে।'

ভাইপোকে খবর করা হল। টাকা বের করে দিল। প্রেতের শ্রাদ্ধশান্তি হল। হল সেই মন্দিরের বিগ্রহের মহোৎসব।

সংস্কৃত কলেজে পড়তে পড়তে বিজয়ের বিয়ে হয়ে গেল। বিজয়ের বয়েস আঠারো আর যোগমায়ার বয়েস ছয়।

শিকারপুরের কাছেই দহকুল গ্রাম। শিকারপুরে পিত্রালয়ে এসেছেন স্বর্ণময়ী, শুনতে পেলেন দহকুলের রামচন্দ্র ভাদুড়ি অকালে মারা গেছে। দুটি শিশুকন্যা নিয়ে বড়ই আতান্তরে পড়েছে তার স্ত্রী, মুক্তকেশী।

কেন কে জানে, প্রাণে দয়া এল, স্বর্ণময়ী স্বচক্ষে দেখতে গেলেন। দারিদ্র্যের একশেষ। মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করলেন প্রথমে। কিন্তু শুধু মাসোহারায় কী হবে?

বড় মেয়েটি লাবণ্যের ছবি, শ্যামাঙ্গী, আনন্দনির্ঝর। সুলক্ষণা। একেই তবে আমার বিজয়ের বউ করে আনি।

শান্তিপুর থেকে বরযাত্রী গেল দুজন। দাদা ব্রজগোপাল আর এক বয়স্ক জ্ঞাতি, বরকর্তা হয়ে। বেশি লোক গেলে মুক্তকেশী সামলাবে কী করে?

যোগমায়া একাই পতিগৃহে এল না। তার মা আর তার ছোট বোনকেও স্বর্ণময়ী আনালেন নিজের কাছে, নইলে তাদের দেখবে শুনবে কে? খেতে-পরতে দেবার মতো আর লোক কই?

বালিকা যোগমায়া খেলছে নিজের মনে, হঠাৎ কী খেয়াল হল, ছুটে চলে এল বিজয়ের কাছে। ভীষণ খটকা লেগেছে তার, এখুনি সমাধান চাই।

'আমি তোমায় কী বলে ডাকব?' মুখ যথাসাধ্য গম্ভীর করে জিগগেস করল বালিকা।

সত্যিই কঠিন সমস্যা। মা দাদা দিদি—সবাইকে কিছু না কিছু ডাকা যায়, কিন্তু তোমাকে ডাকি কী বলে?

বহু শাস্ত্র-পুরাণ পড়া পণ্ডিত বিজয়, তার মুখ আরো গম্ভীর। বললে, 'তুমি আমাকে আর্যপুত্র বলে ডাকবে।'

তাই সই। আর্যপুত্র বলেই সম্বোধন করেছে যোগমায়া।

কলকাতায় সুকিয়া স্ট্রিটের বাসায় প্রত্যহ নির্জনে যোগমায়া দেবী গোঁসাইজির চরণ পুজো করছেন। প্রথমে চরণে তুলসী চন্দন দেন, পরে মাথায় ফুল-তুলসী দিয়ে কপালে এঁকে দেন চন্দনের ফোঁটা। তারপর মুখে কিছু তুলে দেন মিষ্টি। তারপর প্রণাম করেন সাষ্টাঙ্গে। নিত্যকার এই পুজো না করে জলগ্রহণ করেন না।

সারারাত বাতাস করেন গোঁসাইজিকে। আর শোনেন গোঁসাইজির শরীর থেকে কী একটা মধুর শব্দ বার হচ্ছে। কী এই শব্দ?

'এরই নাম অনাহতধ্বনি।' বললেন গোঁসাইজি: 'এ শুধু সাধকদের শরীর থেকেই বার হয়। এ শব্দ এত মধুর যে শুনতে পেলে সাপ একেবারে শরীর বেয়ে উঠে পড়ে।'

স্বর্ণময়ী বললেন, 'এবার একবার সাতশিমলার হারাধন নন্দীর বাড়ি ঘুরে আয়।'

সাতশিমলা বগুড়া জেলায়, সেখানে গিয়ে হাজির হল বিজয়। সেখানে কাজ সেরে

চলে এল সদরে, তিনজন ব্রাহ্ম ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল। ব্রাহ্মদের সম্পর্কে বিজয়ের কোনো উচ্চ ধারণা ছিল না। শুনেছিল তারা যা-তা করে, যা-তা খায়। কিন্তু এই তিন জনকে দেখে—কিশোরীলাল রায়, হারাধন বর্মন আর গোবিন্দচন্দ্র দাস—তার ধারণা বদলে গেল। তারা বললে, এবার কলকাতায় ফিরে গিয়ে মহর্ষি দেবেন ঠাকুরকে দেখো, আর যদি পারো তো তাঁর উপাসনাটা শুনো।

কলকাতায় ফিরে এসে নতুন বিপদে পড়ল বিজয়। এক বন্ধু তার সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে পালাল। হাতে একটিও পয়সা নেই, কী করে? কোথায় যায়? কে আশ্রয় দেয়? বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে গেলে কেমন হয়? কে বললে, ভদ্রসন্তানদের কাছে অনেক ঠকেছেন বলে উনি আর বাড়িতে কাউকে স্থান দেবেন না বলে সঙ্কল্প করেছেন। তবে, যা থাকে কপালে, দেবেন ঠাকুরের সঙ্গে গিয়ে দেখা করি।

মুখে সব বলা সম্ভব না হতে পারে তাই বিজয় একখানা আবেদনপত্র লিখল। ভয়ে-ভয়ে তাই পাঠিয়ে দিল মহর্ষির কাছে। না পড়েই মহর্ষি তা ছিঁড়ে ফেলল। যে লোকটা দরখাস্ত নিয়ে গিয়েছিল সেই এসে বললে।

শুনে বিশেষ ক্ষোভ বা রাগ হল না বিজয়ের। বগুড়ার বন্ধুদের কাছে সে শুনেছিল মহর্ষির মতো এমন লোক হয় না, তিনি যে দরখাস্তটা ছিঁড়ে ফেললেন, এ শুধু আগে-আগে এমনি আবেদন-নিবেদনে প্রতারিত হয়েছেন বলে। নইলে যদি দেখতেন বিজয়কে, জানতেন তার কী হাল, তাহলে কি থাকতেন বিমুখ হয়ে?

তবে আর কী উপায়! দীর্ঘ দিন উপবাস, রাত্রে সংস্কৃত কলেজের বারান্দায় শুয়ে থাকা। এমনি করে কাটল দু দিন। বন্ধুবান্ধব তো আছে এখানে-সেখানে, কিন্তু এখন এ অবস্থায় গেলে তাদের অবজ্ঞা হবে, বন্ধুতা আর থাকবে না। দেখি, আরো একদিন দেখি।

তিনদিনের দিন পথচারী এক ভদ্রলোকের মায়া হল। 'খাওনি বুঝি কদিন?' বলে একটা সিকি বিজয়ের হাতে দিল।

এমন সময় আয় তো আয়, সেই চোর বন্ধুটি এসে উপস্থিত। শুকনো মুখ, ম্লান বেশ, ক্লেশ-কষ্টের প্রতিমূর্তি।

'কী রে, তোর এমন অবস্থা?' জিগগেস করল বিজয়।

'কত দিন খাইনি।'

'টাকা পয়সা কী হল?'

'কিছু নেই। সব জুয়ো খেলায় উড়ে গিয়েছে।'

'আমার কাছে চার আনা পয়সা আছে। তাই দিয়ে খাবার কিনে ভাগাভাগি করে খাই, আয়।'

সর্বস্বাপহারক বন্ধুকে ক্ষমা করতে এতটুকু বাধল না বিজয়ের।

তখন দুজনে বেচু চাটুজ্জের বাড়িতে একখানা ঘর ভাড়া করে রইল।

'ভালোই করেছ, একজন নতুন সভ্য জোগাড় করে এনেছ।' বেচু চাটুজ্জে পাঁড় মাতাল, সুরাপান মহাসভার সভাপতি। সাকরেদকে বললে, 'দাও, একে একপাত্র পরিবেশন করো।'

তখনকার দিনে মদ না খাওয়াটা দারুণ অসভ্যতা, সমস্ত শিষ্টতা শালীনতার বাইরে। যে মদ খায় না সে নিতান্ত সেকেলে, পাড়াগেঁয়ে, অপদার্থ। কিন্তু বেচু চাটুজ্জের দল,

কিছুতেই বিজয়কে মদ খাওয়াতে পারল না। বরং উলটে তারা বিজয়ের মুখের গালাগাল খেতে লাগল। পাষণ্ড, কুলাঙ্গার, আমি মদ খাই না বলে আমাকে অসভ্য বলো? তোমরা তো ভূতপ্রেত।

তার চেয়ে চলো যাই ব্রাহ্মসমাজে। মহর্ষির উপাসনা শুনে আসি।

কেমন সুন্দর আলো জ্বলছে। ভিতরে, তান-লয়ে শুদ্ধ কেমন গান হচ্ছে, ভক্তিতে ভরপুর স্তবপাঠ হচ্ছে, কেমন সবাই বসেছে শান্ত হয়ে—বিজয়ের মনে হল স্বর্গধাম বুঝি একেই বলে। আশ্চর্য, এরও লোকে নিন্দে করে।

আর কী অপূর্ব সুন্দর বলছেন মহর্ষি। বলবার বিষয়ও আন্তরিক। পাপীর দুর্দশা আর ঈশ্বরের করুণা!

সহসা আগের ভক্তিভাবের কথা মনে পড়ল বিজয়ের। হৃদয় হাহাকার করে উঠল। কত, কত দিন ইষ্টদেবতার পুজো করিনি, ডাকিনি প্রাণের থেকে। কী করে বেঁচেছিলাম এতদিন? নিজেকে হঠাৎ নিতান্ত নিরাশ্রয় মনে হল, চোখ ছাপিয়ে নেমে এল অশ্রু। অজানতে প্রাণের মধ্যে পুঞ্জীভূত হল প্রার্থনা। দয়াময়, ধর্ম সম্বন্ধে আমার মতো হতভাগ্য বোধহয় আর কেউ নেই। আগে ইষ্টের পুজোয় কত আনন্দ পেতাম, এখন সে আনন্দ আমাকে ছেড়ে গেছে। কেন আমার আগের সেই বিশ্বাস তুমি হরণ করেছ? শুনেলাম তুমি অনাথের নাথ, অকূলের কূল, তবে তোমাকেই শরণ নিলাম। তুমি আমাকে রাখো আর না রাখো আমি আর কোথাও যাব না। তোমার দুয়ারেই পড়ে থাকব।

মনে-মনে মহর্ষিকেই গুরু বলে মানল বিজয়।

কী বলছে ব্রাহ্মরা?

বলছে, পরমেশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। নিরাকার, সর্বব্যাপী, অন্তর্যামী। সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত কল্যাণ ও করুণার আধার। কল্যাণ ও করুণা পাবার একমাত্র উপায় প্রার্থনা, কোনো মন্ত্রতন্ত্রের দরকার নেই। পরমেশ্বর আর সাধকের মধ্যে গুরু নিরর্থক। সরল ও ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করো, আর স্থিরচিত্তে লক্ষ্য করো তিনি অন্তরে কী প্রেরণা দিচ্ছেন। সে প্রেরণাই তাঁর আদেশ আর সেই আদেশ প্রতিপালনই ধর্মজীবন। নিরন্তর পরমেশ্বরের সহবাস ও তাঁর প্রিয়কার্য সাধনরূপ সেবাই একমাত্র লক্ষ্য। আমাদের অন্ধকার থেকে আলোতে, অসত্য থেকে সত্যে, মৃত্যু থেকে অমৃতত্বে নিয়ে যাও। হে সত্যস্বরূপ, তোমার সত্য শিব সুন্দর রূপ আমাদের কাছে প্রকাশ করো।

নিয়মিত প্রার্থনা করতে লাগল বিজয়, আর অন্তরে যে সব সাড়া আসতে লাগল, যেসব উপলব্ধি তা ধারাবাহিক লিপিবদ্ধ করলে। আর তাই একদিন ছেপে দিল 'ধর্মশিক্ষা' বলে।

শান্তিপুরে এল বিজয়। বসল তার নতুন তত্ত্বের আলোচনায়। ঈশ্বর যদি সকলের পিতা, তাহলে জাতিভেদ থাকে কী করে? এক বাপের ছেলেদের কি আলাদা-আলাদা জাত হয়? সকলের মধ্যেই যখন ঈশ্বর, তখন মানুষের মধ্যে আর উঁচু-নিচু কী! কী করে একজন আরেকজনকে ঘৃণা করে?

'তবে মশাই তুমি গলায় পৈতে রেখেছ কেন?'

চমকে উঠল বিজয়। তাকিয়ে দেখল একটা এগারো-বারো বছরের ছেলে মুখিয়ে আছে। 'এদিকে জাতিভেদ মানো না, তবে ঐ জাতিভেদের নিশানটা গলায় ঝুলিয়েছ কেন?'

সত্যিই তো! ঠিক বলেছে বালক। বিজয় তখুনি গলার পৈতে ফেলে দিল ছুঁড়ে।

স্বর্ণময়ী ছুটে এলেন। 'এ তুই কী করেছিস? শিগগির পর ফের পৈতে।'

বিজয় রাজি হল না! যা অসত্যের প্রতীক তা রাখব না কিছুতেই।

স্বর্ণময়ী গলায় দাঁড় দিতে ছুটলেন। তখন মাকে নিরস্ত করবার জন্যে পৈতে কুড়িয়ে নিল বিজয়।

চলো মহর্ষির কাছে গিয়ে দীক্ষা নিই। দীক্ষা না নিলে ধর্মভাব উচ্চারিত হয় না।

তার আগে বৃত্তি ঠিক করো। গুরুগিরি করে জীবিকার্জন করা পোষাবে না। তার চেয়ে ডাক্তার হই। লোকসেবা আর টাকা রোজগার দুইই হবে। মায়ের অনুমতি চাইতে বিজয় গেল শান্তিপুর। স্বর্ণময়ী আপত্তি করলেন: 'গোস্বামী সন্তান হয়ে কী করে মড়া কাটবে?'

'বা, শরীরতত্ত্ব জানতে হবে না?'

'মড়াকাটা যে ম্লেচ্ছাচার।'

'যে জ্ঞানে লোকসেবা হবে তা অর্জন করতে যা সাহায্য করে তা অশুচি হয় কী করে?' বিজয় তার সঙ্কল্পে দৃঢ় রইল।

অবশেষে স্বর্ণময়ী সম্মত হলেন।

মেডিকেল কলেজের বাংলা বিভাগে ভর্তি হল বিজয়। পল্লী অঞ্চলে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, 'নেটিভ ডাক্তার' হয়ে গ্রামে গিয়েই বসবে।

এবার তবে চলো যাই মহর্ষির কাছে। বিজয় একা নয়, সংগী হল অঘোর গুপ্ত আর গুরুচরণ মহলানবিশ। তিনজনেই দীক্ষা নিল। কিন্তু এই মহর্ষি তো উপবীত ত্যাগ করতে উপদেশ দিলেন না। উপবীতে অশান্তি হতে লাগল বিজয়ের। প্রার্থনা করার সময় বুক কাঁপে, পৈতে যেন সাপের মতো দংশন করছে নিরন্তর। এ তো অসত্য ব্যবহার। অসত্য ব্যবহারে কি দর্শন মেলে ঈশ্বরের?

'উপবীত রাখা কি উচিত হচ্ছে?' সরাসরি মহর্ষিকেই জিগগেস করল বিজয়।

'নিশ্চয়ই হচ্ছে। না রাখলে সমাজের অনিষ্ট।' বললেন মহর্ষি।

'কিন্তু —'

'এই দেখ না আমি রেখেছি।' মহর্ষি নিজের গলার উপবীত দেখালেন।

'আর মাছ-মাংস খাওয়া কি ঠিক?' বিজয় আবার প্রশ্ন করল।

'নিশ্চয়ই ঠিক। মাছ-মাংস না খেলে শরীর রক্ষা হবে কী করে?'

'কিন্তু—'

'মশা ছারপোকা যখন মার তখন অন্য জীবহত্যায়ই বা আপত্তি কিসের?'

মহর্ষির উত্তরে সন্তুষ্ট হল না বিজয়। ভাবল, ব্রাহ্মদের এ এক কুসংস্কার। কিন্তু তাই বলে যে-মহর্ষি তাকে পাপ-কূপ থেকে উদ্ধার করলেন তাঁকে এই বিপরীত মতের জন্যে ত্যাগ করা যায় না।

মেডিকেল কলেজের পড়া শেষ হয়েছে, উপাধি পরীক্ষা নিকটবর্তী, এমন সময় কলেজে গোলমাল বাধল। কলেজের ওষুধ চুরি করেছে এই মিথ্যা অভিযোগে কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ চিবার্স বাঙলা বিভাগের একটি ছাত্রকে পুলিশে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, সমস্ত জাত ধরে গালাগাল দিয়েছে বাঙালিদের। ছাত্রের দল বিক্ষুব্ধ হল আর বিজয়ের নেতৃত্বে বেরিয়ে এল কলেজ ছেড়ে। ছাত্রসমাজে এই প্রথম ধর্মঘট। যারা গোড়ায় ধর্মঘটে

যোগ দেয়নি তাদের উত্তেজিত করবার জন্যে বিজয় গোলদীঘিতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিল। আর সে বক্তৃতা এত তপ্ত-দীপ্ত যে বাকি ছাত্ররাও এসে হাত মেলাল। ছাত্র ছাড়া কলেজ খাঁ খাঁ করতে লাগল।

বিরোধ যখন চরমে উঠেছে তখন বিজয় ছাত্রদের হয়ে বিদ্যাসাগরের সাহায্য চাইল। বিদ্যাসাগর ছোটলাট বিডন-এর কাছে চিঠি লিখলেন। বিডন চিবার্সকে বললেন, ছেলেদের কাছে দুঃখপ্রকাশ কর আর বিনাদণ্ডে ওদেরকে ফিরিয়ে নাও কলেজে।

আদেশ পালন করল চিবার্স। ওষুধ চুরির মামলাও তুলে নেওয়া হল।

কিন্তু বিজয় সেই যে কলেজ ছাড়ল আর ঢুকল না।

শুধু এক লাভ, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল।

বিদ্যাসাগর 'বোধোদয়' লিখেছেন কিন্তু তাতে ভগবানের কথা নেই।

'যিনি সমস্ত বোধের উৎস, প্রকৃত বোধোদয়ের যিনি প্রধান অবলম্বন, সেই ভগবানের কথাই নেই আপনার বইয়ে?' বিদ্যাসাগরকে ধরল বিজয়।

বিদ্যাসাগর হাসলেন। বললেন, 'বইয়ের পরের সংস্করণে ঢুকিয়ে দেব ঈশ্বরকে।'

পরের সংস্করণে ঈশ্বর দেখা দিল। কিন্তু প্রথমে 'পদার্থ', পরে 'ঈশ্বর'।

'ভগবানের কৃপাই সার। আর কিছুই কিছু নয়।' বলছেন গোস্বামী প্রভু: 'সাধন ভজন শুধু লেগে থাকবার জন্যে, যেন তাঁর কৃপা এলে ধরতে পারি। নইলে সাধন ভজন করে কার সাধ্য ওঁকে লাভ করে? নিজের তৃপ্তির জন্যেও লোকে সাধন ভজন করে বটে। ক্ষুধা তৃষ্ণায় অন্নজল না পেলে মানুষ যেমন অস্থির হয়, নামের অভাবে পুজোর অভাবেও তেমনি কষ্ট! তাই নামার্চনা না করে থাকা যায় না। কর্ম শেষ না হলে তাকে পাওয়া যায় না এই বা কে বলে? কর্ম শেষ হতে আর কী লাগে! তাঁর কৃপা হলে মুহূর্তে শেষ হয়ে যায় প্রারব্ধ। মহারাণী যখন এম্প্রেস হলেন একটি হুকুমে কত শত কয়েদীর বহুকালের মেয়াদ একেবারে খালাস হয়ে গেল! ভগবানের কৃপাই সব। আর কিছুই কিছু নয়। শুধু তাঁর কৃপার জন্যে কাতর ভাবে তাঁরই দিকে তাকিয়ে থাকো।'

বিদ্যাসাগর যখন রোগশয্যায় গোঁসাইজি তখন ঢাকায়, গেণ্ডারিয়া আশ্রমে। বিদ্যাসাগর বহুমূত্রে আক্রান্ত এমনি একটা কথা বেরিয়েছিল কাগজে, আর বিদ্যাসাগর তখুনি প্রতিবাদ করে জানিয়েছিলেন, আমার চৌদ্দপুরুষেও বহুমূত্র রোগ নেই।

সবাই ভেবেছিল, ভালোই আছেন, ভয়ের কিছু নেই।

কিন্তু সেদিন দুপুর প্রায় একটার সময় সমাধি ভঙ্গের পর গোঁসাইজি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন, পশ্চিমের খোলা দরজার মধ্য দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন একদৃষ্টে, আর বলতে লাগলেন: 'আহা কী সুন্দর! কী সুন্দর! সোনার রথে কী শোভা। হলদে রঙের পতাকা উড়ছে। হলদে রঙের ছটায় সারা আকাশ ঝলমল করছে। দেবকন্যারা চামর দোলাচ্ছে, অপ্সরারা নৃত্য করছে, গান করছে। আহা, কত আনন্দ! গুণের সাগর বিদ্যাসাগরকে নিয়ে ওঁরা চলেছে' আকাশপথে। মহাপুরুষ আজ পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গে চললেন। হরিবোল! হরিবোল!'

সকলে ভাবল ভবিষ্যতে যা ঘটবে বুঝি তারই ছবি দেখছেন গোঁসাইজি। কিন্তু, না, পরে খবর এল ঐ দিনই দেহ রেখেছেন বিদ্যাসাগর।

মেডিকেল কলেজের কয়েকজন ছাত্র 'হিতসঞ্চারিণী' নামে এক সমিতি করেছে।

তার মন্ত্র হচ্ছে : যা সত্য বলে বুঝব তাই পালন করব। জীবনান্ত হলেও কপটাচরণ করব না। যদি পাপ বলে কিছু থাকে তবে তা কাপট্য।

সন্দেহ কী, জাতিভেদ মিথ্যাচার। আর উপবীত সে জাতিভেদের চিহ্ন। সুতরাং বিজয় উপবীত ত্যাগ করল। সেই মর্মে চিঠি লিখে দিল বাড়িতে।

শান্তিপুরে ছি ছি পড়ে গেল। এ কী কাণ্ড! কই দেবেন ঠাকুর তো উপবীত ছাড়েনি। তুই এমন কী ব্রেহ্মজ্ঞানী হয়েছিস!

কিন্তু কেউ-কেউ আবার ধন্য ধন্য করল বিজয়কে। বললে, একেই বলে সত্যসন্ধ। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'সোমপ্রকাশ' কাগজে বিজয়কে অভিনন্দন জানাল। উপবীত ত্যাগের বিরোধী বলে ব্রাহ্মসমাজকে নিন্দা করলে। সত্যের মর্যাদা রাখাই প্রধান কর্তব্য! বিজয় যে তা রেখেছে, অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে দৌর্বল্য প্রকাশ করেনি এ জন্য তাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করা উচিত।

কেশব সেন ধর্মোন্নতির জন্যে 'সংগত সভা' করেছে। নিমন্ত্রণ নেই, তা না হোক, বাৎসরিক উৎসবসভায়, কেশবের কলুটোলার বাড়িতে, হাজির হয়েছে বিজয়। এই তার প্রথম কেশবকে দেখা।

উৎসবে 'অনুষ্ঠান' নামে একটা পুস্তিকা উপহার পেয়েছে বিজয়। দেখল তাতে উপদেশের মধ্যে আছে—'উপনয়নের সময় উপবীত গ্রহণ করবে না।'

তা হলে উপবীত ত্যাগ এরা সমর্থন করে! তবে আর দ্বিধা নেই, 'সংগত সভা'য় নাম লেখাল বিজয়। ধীরে ধীরে কেশবের বন্ধু হয়ে গেল।

মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষা দিয়ে ডিপ্লোমা নিয়ে বিজয় শান্তিপুরে ফিরল। কিন্তু সেখানে সে টিকতে পারে এমন মনে হয় না। পৈতে ত্যাগ করেছে বলে সবাই বিজয়ের উপর খড়্গ হস্ত। পদে পদে অপমান। পথে বেরুলে কেউ গাল দেয় কেউ ধুলো দেয় কেউ বা একেবারে মারমুখো হয়ে ওঠে। সেদিন তো কে একজন ছাদ থেকে জুতোর মালা ছুঁড়ে মারল বিজয়ের গলা লক্ষ্য করে। কীর্তনের সভায় বিজয়ের ভাবাবেশ হয়েছে, কে একজন একটা জ্বলন্ত চিমটে বিজয়ের গায়ে চেপে ধরল। এমনি কত শত অত্যাচার। সব অম্লান মুখে সহ্য করল বিজয়। স্বর্ণময়ী এসে কেঁদে পড়লেন। একটা পৈতে কাছে রেখে পা চেপে ধরলেন ছেলের মায়ের এই কাণ্ডে বিজয় মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

মূর্ছাশেষে বললে, 'আমাকে আবার যদি পৈতে নিতে বাধ্য কর আমি ঠিক আত্মহত্যা করব। যত বড়ই প্ররোচনা হোক, আমি কিছুতেই অসত্যকে ধারণ করব না।'

স্বর্ণময়ী বুঝলেন বিজয়ের এবার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। তাই তিনি এবার গোঁ ছেড়ে দিলেন। বললেন : 'পৈতে নেবার আগে যেমন তুই ছিলি, মনে করব এখনো তুই তেমনি আছিস। তুই তেমনি থাক।'

শান্তিপুর এত সহজেই ছাড়ল না বিজয়কে। ব্রজগোপালকে দিয়ে সভা ডাকাল। সভায় সিদ্ধান্ত হল, ধর্মদ্রোহীকে বিতাড়িত করো। শুধু গৃহ থেকে নয়, গ্রাম থেকে। সেই মর্মে বিজয়ের উপর হুকুম জারি হল।

কিন্তু যাবার আগে শান্তিপুরে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করে যাব। দেখবে শ্যামসুন্দরের মন্দিরই কালক্রমে ব্রাহ্মমন্দিরে পরিণত হবে।

সবাই একে-একে ত্যাগ করল বিজয়কে। শুধু একজন করল না। সে সেই ভগ্নীপতি

কিশোরীলাল মৈত্র। কিশোরীলাল তার পটলডাঙার বাসায় বিজয়কে নিয়ে এল। বিজয় শুধু একা এল না, তার স্ত্রী আর শাশুড়ীকেও সঙ্গে নিলে। কিশোরীলালও ব্রাহ্ম হয়েছে। ছেলেকে হিন্দুমতে বিয়ে দিতে রাজি হল না। রাজি হলে হাজার টাকা পেতে পারত অনায়াসে, কিন্তু সত্যের অনুরোধে সে টাকা সে তুচ্ছ করে দিলে।

নিদারুণ সাংসারিক কষ্টে পড়েছে কিশোরীলাল, কিন্তু কিছুতেই তার ধৈর্যচ্যুতি নেই, সংশয় নেই ঈশ্বরে। ধর্মের জন্যে হাসিমুখে মানুষ কত সহ্য করতে পারে— কিশোরীলাল তারই মহৎ প্রতিচ্ছবি!

বিজয়কৃষ্ণ বললে, 'এঁদের কষ্টের কাছে আমার যন্ত্রণা যৎসামান্য বলে মনে হচ্ছে।'

৬

'সংগত সভায় গিয়ে বিজয় শুনতে পেল ব্রাহ্মসমাজে প্রচারকের অভাব। যশোর জেলার বাগআঁচড়া গ্রামের কতগুলো লোক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করবার জন্যে উৎসুক হয়েছে, লিখছে 'সংগত সভায়, কিন্তু এমন কেউ উপযুক্ত নেই যে সেখানে পাঠানো যায় প্রচারক হিসেবে।

বিজয় বললে, 'আমি যাব।'

তখন তার কলেজের শেষ পরীক্ষা অত্যন্ত কাছে, কেউ-কেউ তাকে নিরস্ত করতে চাইল, বললে, নৌকো পারের কাছে এনে ডুবিয়ে দিলে চলবে কী করে! শেষ পরীক্ষায় পাশ না করলে খাবে কী? সংসার চালাবে কী দিয়ে?

'ঈশ্বর চালাবেন।'

'তুমি না চালালে ঈশ্বর চালাবেন কেন?'

'যিনি মরুভূমিতে তৃণকণা বাঁচিয়ে রাখেন, সমুদ্রের গহনে বাঁচিয়ে রাখেন প্রাণকণা, তিনিই অনাহারে এক দুঃখী পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখবেন—এতে আশ্চর্য হবার কী আছে?' বললে বিজয়। কেশবচন্দ্রের কাছে গিয়ে প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করল: 'আমি যাব প্রচারক হয়ে।'

কেশব বললে দৃঢ়স্বরে, 'যাব বললেই যাওয়া হয় না। প্রচারক যে হবে তোমার যোগ্যতা কী।'

'পরীক্ষা নিন।'

'হাঁ পরীক্ষাই দিতে হবে তোমাকে। লৈখিক আর মৌখিক দুরকম পরীক্ষা।'

'তাই দেব।'

সসম্মানে উত্তীর্ণ হল বিজয়।

তবু ছাড়া পেল না তক্ষুনি। কেশব বললে, 'গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আয়ত্ত করতে হবে।'

দুমাসে আয়ত্ত করল বিজয়।

কেশব বললে, 'দেবেন ঠাকুরের সংগে গিয়ে দেখা করো।'

দেখে-শুনে খুশি হলেন দেবেন্দ্রনাথ। প্রচারক বলে স্বীকার ও গ্রহণ করলেন বিজয়কে। বললেন, 'আমার লেখা এই সংস্কৃত গ্রন্থ ব্রাহ্মধর্ম অধ্যয়ন করো।'

তথাস্তু। অধ্যয়ন শেষ করল বিজয়।

এবার তবে কলকাতায় আর কলকাতার কাছাকাছি জায়গায়, কোন্নগরে শ্রীরামপুরে প্রচার শুরু করো। তারপর যাও এবার বাগআঁচড়ায়।

প্রচারকের জন্যে একটা মাসোয়ারি মাইনে ঠিক করতে চাইলেন মহর্ষি। বিজয় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। ধর্মপ্রচারব্রতে পার্থিব লাভালাভের কথা অবান্তর। তবে খালি-হাতে খালি-পেটেই পাড়ি জমাও।

ম্যালেরিয়ায় উজাড়-হয়ে যাওয়া গ্রাম বাগআঁচড়া। অথচ রোগে-শোকে গ্রামবাসীদের ধর্মবল স্তিমিত হয়নি। নয় দিনে তেইশটি পরিবারকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করল বিজয়। শুধু দীক্ষা নয়, শিক্ষা দিতে বসল। সকালে ডাক্তারি সেরে দুপুরে মাস্টারি, আবার রাত্রে নাইট-ইস্কুল। দিবানিশি জনহিতচেষ্টা! ঈশ্বরের করুণার কথা যেমন বলছে তেমনি আবার বলছে মানুষের করণের কথা। পরাকৃপা পাবার আগে আত্মকৃপা করো।

প্রাণনাথ মল্লিক বললে, 'মশাই, ব্রাহ্ম তো হলাম, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে এই কাপট্য কেন?'

'সে আবার কী?'

'ব্রাহ্মমতে উপবীত ধারণ করা তো মহাপাপ। তবে কলকাতার উপাচার্য আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ আর বেচারামবাবু কী করছেন? উপবীত ত্যাগ না করেই বেদীর কাজ করছেন। এটা কী কপটতা হচ্ছে না?'

ঠিক কথা। বিজয় কেশবের কাছে নালিশ করে পাঠাল। স্বয়ং উপাচার্যরাও যদি উপবীতধারী থাকে তাহলে সে ব্রাহ্মসমাজ অসত্যের আলয় বলে সে ত্যাগ করবে।

কেশব সে চিঠি দেবেন ঠাকুরকে দেখাল। দেবেন্দ্রনাথ সমর্থন করল বিজয়কে। নিজেও তখন তিনি উপবীত ছেড়েছেন। বললেন, 'তুমি দুজন উপবীতত্যাগী ভক্তবক্তা আমাকে জোগাড় করে দাও, আমি তাদেরই বেদীর কাজে নিযুক্ত করব।'

দুজন নির্বাচিত হল। একজন অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, আরেক জন বিজয়কৃষ্ণ।

কলকাতায় ফিরল। খোদ বেদীতে গিয়ে বসল। দেবেন ঠাকুর আশীর্বাদ করে দিলেন।

'সম্পদে-বিপদে স্তুতি-নিন্দায় মানে-অপমানে অবিচলিত থেকে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করবে। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। তোমার শরীর বলিষ্ঠ হোক, অভিপ্রায় মহান হোক, ধর্ম নিঃস্বার্থ হোক, হৃদয় পবিত্র হোক। জিহ্বা মধুময় হোক, তোমার চক্ষু ভদ্ররূপ দর্শন করুক।'

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর দৌহিত্রের নামকরণের উপলক্ষে বিজয়কে উপাচার্যের কাজ করতে অনুরোধ করলেন। সেই মর্মে চিঠি লিখলেন দেবেন্দ্রনাথ, সঙ্গে পাঠালেন একখানি গরদের ধুতি ও সোনার আংটি। ধুতি আর আংটি কেন? পুরোহিতের দক্ষিণা? ক্ষেপে গেল বিজয়। ধুতি আর আংটি তক্ষুনি প্রত্যর্পণ করল। প্রতিবাদ জানাল উত্তরে। এ ভাবে যদি পুরুতি হালচাল চলে আসে তাহলে ব্রাহ্মসমাজের বৈশিষ্ট্য রইল কোথায়?

দেবেন্দ্রনাথ বিজয়ের উপর বিরক্ত হলেন।

একদিন বললে, 'যেখানে যেতে বলব সেখানেই তোমাকে যেতে হবে।'

'প্রচারের কাজে?'

'হ্যাঁ। যখন যেখানে পাঠাব। তুমি প্রস্তুত থাকবে সব সময়।'

'সব সময়ে আপনার আদেশই শিরোধার্য করতে হবে?'

'তা ছাড়া আর কী।'

'ঈশ্বরের আদেশ শুনব না?' বিজয়কে স্পষ্ট ও দৃঢ় শোনাল: 'ঈশ্বরের আদেশ যদি বিপরীত হয় তা হলে?'

দেবেন্দ্রনাথ চুপ করে রইলেন।

'প্রচার কার্যে যাওয়া ঈশ্বরের আদেশ অনুসারেই হওয়া উচিত। প্রচারের মধ্যে যেন সংসারের প্রভুত্ব না ঢোকে।'

বিজয়ের স্বাধীনচিত্ততায় খুশি হলেন দেবেন্দ্রনাথ। কথা ঘুরিয়ে নিলেন। বললেন, 'বুড়ো হয়েছি তো, সব জায়গায় যেতে পারি না। যেখানে যাবার শখ অথচ যেতে পাচ্ছি না, ইচ্ছে, সেখানে তুমি যাও, সেখানেই তোমাকে পাঠাই। সে কথাটাই বলতে চাচ্ছিলাম। নইলে তুমি স্বাধীন ভাবে ঈশ্বরের সত্য প্রচার করবে তার চেয়ে আর আনন্দ কী।' দেবেন্দ্রনাথ আত্মতন্ময়ের মতো বললেন, 'বীজ বপন করো, ঈশ্বরের কৃপাতেই সুফল উৎপন্ন হবে। ফলদাতা যখন ঈশ্বর তখন ফলের জন্যে আর কে ভাবে? ঈশ্বরই তোমার সহায় হবেন।'

'আমার আত্মার গভীরে কী এক আশ্চর্য শক্তি আছে।' বলছেন বিজয়কৃষ্ণ: 'বুঝতে পারি এ-শক্তি আমার নয়, এর উপর আমার বিন্দুমাত্র কর্তৃত্ব নেই। তবু এ শক্তিই আমাকে অন্ধের মতো চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়; কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাবে কিছুই জানি না। শুধু বলে, সমস্ত প্রবৃত্তিকে জগৎমঙ্গলে নিয়োজিত করো, শুধু অগ্রসর হও। এই তোমার ঈশ্বরের আদেশ, আত্মার মহোন্নতি সাধন করো। সে ধ্বনি এত স্পষ্ট এত সুগোচর যে লেশমাত্র দ্বিধা বা সংশয়ের অবকাশ নেই।'

শুধু অগ্রসর হও। এ আদেশই জীবনের একমাত্র সম্বল। সমস্ত প্রার্থনার ইন্ধন, সমস্ত নৈরাশ্যের চিকিৎসা।

প্রাচীন ব্রাহ্মরা দেবেন্দ্রনাথের উপর বিরক্ত হলেন। প্রধান কারণ তিনি কেন কেশবকে এত প্রশ্রয় দিচ্ছেন। বেদান্তবাগীশ আর বেচারামবাবুকে সে বরখাস্ত করিয়েছে, আচার্য পদে বসিয়েছে অল্পবয়স্ক ছোকরাদের। ওসব ছোকরারা আবার অসবর্ণ বিয়ের পাণ্ডা হয়েছে। পৌত্তলিকতা ছাড়বার জন্যে লেগেছে উঠে পড়ে। এ সবের প্রতিবিধান চাই।

দুটো দল হল। একদলে প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীলেরা—আরেকদলে বিপ্লবী সংস্কার-পন্থীরা। দেবেন্দ্রনাথ প্রথম দলে, দ্বিতীয় দলে কেশব-বিজয় আরো সব যুবক কর্মী।

বিজয় বললে, 'ব্রাহ্মসমাজ থেকে জাতিভেদের শৃঙ্খল দূর করতে হবে। শুধু পৈতে ছাড়লে হবে না। দিতে হবে অসবর্ণ বিয়ে। অসবর্ণ বিয়েছাড়া এই শৃঙ্খলমোচনের অন্য উপায় নেই।'

মুখে বলা সোজা, কাজে দেখাতে পারো তো বুঝি।

কিশোরীলালের মেয়ে, বিজয়ের ভাগ্নী রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে প্রসন্নকুমার সেনের বিয়ে হতে পারে। পাত্র পাত্রী দুই পক্ষ সকলেই রাজি। কেশবের কাছে গিয়ে কথা পাড়ল বিজয়। কেশব আনন্দে লাফিয়ে উঠল। ব্রাহ্মসমাজে অসবর্ণ বিয়ে চালু হল।

শুধু অসবর্ণ বিয়েতে হবে না, চাই বিধবা-বিয়ে। কেশব-বিজয় অগ্রণী হল। পার্বতীচরণ গুপ্ত এক বালবিধবা বৈষ্ণব কন্যাকে বিয়ে করল। শুরু হল বিধবা-বিয়ে।

দুই দলে প্রবল হল মতভেদ। মতান্তর থেকে মনান্তর।

তারপর বারো শ একাত্তরে আশ্বিনের ঝড় উঠল। তারিখটা কুড়ি, বুধবার। দিন থাকতেই প্রচণ্ড অন্ধকার, দুর্মদ ঝড় পলকে সব লণ্ডভণ্ড করে দিল। কত যে গাছ পড়ল, চাল উড়ল, দেয়াল ভাঙল তার লেখা জোখা নেই। চারদিকে ত্রাস আর ত্রাণচেষ্টা আর অসহায়ের আর্তনাদ। তাণ্ডব দেখবার জন্যে বিজয় ছাদে উঠল, ঘড়িতে বেলা আর তখন নেই, আকাশে একটানা কালিমা। হঠাৎ মনে পড়ল, এ কী, আজ বুধবার না? আজ না সমাজে আমার উপাসনার দিন! আর কথা নেই। কোমর বাঁধল বিজয়। যাব মন্দিরে, হ্যাঁ, এখনি, এই মুহূর্তে।

সবাই একবাক্যে নিষেধ করে উঠল। এই দুর্যোগে কেউ কখনো ঘরের বার হয়? উলঙ্গ ঝড় জল ছাড়া কেউ আর এখন পথে নেই।

হ্যাঁ, এই ঝড় জলকেই পথের সাথী করব। ঈশ্বর শুধু অকলঙ্ক নীল আকাশই নন, তিনি আবার বিদ্যুৎজ্বলন্ত।

প্রবল ধর্মাকাঙ্ক্ষার কাছে সমস্ত নিষেধ পরাস্ত। সমস্ত বাধা অপসৃত।

জল ভেঙে এগুলো বিজয়। হ্যালিডে স্ট্রিটের কাছে এসে দেখল জল এক গলা। ভেসে চলেছে অগণ্য মৃতদেহ। ওসব দেখে লক্ষ্যচ্যুত হবে না বিজয়। আরো এগুল। পড়ল সাঁতার জলে। সাঁতার কেটে বাকি পথ অতিক্রম করে পৌঁছুল এসে মন্দিরে। মন্দিরেরও ভগ্নদশা। একটি লোকও উপস্থিত নেই। ভাগ্যিস মন্দিরের চাকরটা পালায়নি। তাকে দিয়ে চিরকুট লিখে পাঠাল দেবেন্দ্রনাথের কাছে। এ অবস্থায় কী করব?

দেবেন্দ্রনাথ লিখলেন: 'আজ এই ঘোর দুর্যোগের মধ্যেই পরমেশ্বরের লীলা দেখ।'

পরমেশ্বরেরই লীলা। জনহীন ঘরে একাকীই উপাসনা করল বিজয়।

উপাসনা সেরে বাড়ি ফিরছে, রাস্তায় কেশবের সঙ্গে দেখা। কেশব পালকি চড়ে মন্দিরে যাচ্ছে। দুজনে একত্র উপনীত হল মন্দিরে। দুজনে একত্র বসল উপাসনায়।

ঝড়ে মন্দির ভেঙে পড়েছে, ঠিক হল সাপ্তাহিক উপাসনা দেবেন্দ্র-আলয়ে বসবে। অন্নদাবাবু পীড়িত, তাই দেবেন্দ্র বিজয়কে লিখলেন, তুমি ও পাকড়াশী আজ বুধবার বেদীর কাজ করো।

পাকড়াশী? সে কি? পাকড়াশী তো পৈতে ছাড়েনি।

সভাস্থলে গিয়ে দরজায় দুবাহু বিস্তার করে দাঁড়াল বিজয়। যারা উপাসনায় যোগ দিতে যাচ্ছে তাদের বাধা দিতে লাগল আর যারা আগেই ঢুকে পড়েছে তাদের বললে বেরিয়ে আসতে। গলায় পৈতে ব্রাহ্ম, এর চেয়ে বড় কাপট্য আর কী হতে পারে? পৌত্তলিকতার চিহ্ন বুকে রেখে নিরাকারের উপাসনা অর্থহীন।

হৈ-হৈ কাণ্ড। যারা উপাসনায় যোগ দিয়েছিল তারা বেরিয়ে এল আর যারা ঢোকেনি তারা আর গেল না। দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেল বিজয়। অনুগামী কেশব। অন্যত্র এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উপাসনা বসাল দুজনে। পুরো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। দেবেন্দ্রনাথের সমাজ আদি ব্রাহ্ম সমাজ নাম নিল আর কেশব বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রতিষ্ঠা করল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ। কেশবের দলে বিজয়, আর বিজয়ের হাতেই প্রচারের পতাকা। জ্বলন্ত প্রাণ নিয়ে অকুতোভয় বীরের মতো প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিজয়। জীবনে একমাত্র মন্ত্র: ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম। এই প্রাণ প্রভুর, এই কাজ প্রভুর, প্রতি নিশ্বাসে এই এক

উদ্দীপ্ত উৎসাহ। নিন্দা প্রশংসায় নির্বিচল, সংসার ও শরীর সম্বন্ধে উদাসীন, তীব্র বৈরাগ্যে উচ্ছ্বসিত সে এক ঈশ্বর মহিমার উজ্জ্বল মূর্তি। যে দেখে সেই আকৃষ্ট হয়, যে শোনে সেই নাম লেখায়।

এদিকে সংসারের শোচনীয় অবস্থা। কিন্তু কে তা লক্ষ্য করে। অন্নের চেয়ে অর্চনাই তখন লোভনীয়, শরীরের চেয়ে আত্মা।

কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে নির্জনে উপাসনা করতে গিয়েছে বিজয়, সকাল কখন দুপুর হয়ে গিয়েছে খেয়াল নেই। দুপুর যখন বিকেলে গড়িয়ে যাচ্ছে তখন উপাসনায় ব্যাঘাত ঘটতে লাগল। কী ব্যাপার? মনে পড়ল কিছু খাওয়া হয়নি। খিদে পাচ্ছে বলে মন স্থির হচ্ছে না উপাসনায়। উঠে পড়ল বিজয়। কিন্তু খাবে কী? খাবার কোথায়? কাছাকাছি একটা পুকুর দেখতে পেল। সেই পুকুর থেকে কিছু জল আর কাদা তুলে খেল বিজয়।

সন্ধে হলে বাড়ি ফিরল। শুনল যোগমায়া কিশোরীলালের ভুক্তাবশিষ্ট এক মুষ্টি অন্ন খেয়ে রয়েছে আর শাশুড়ি ঠাকরুণের পাতকুয়োর জল ছাড়া আর কিছু জোটেনি।

তবে আর কী করা যাবে? বিজয় শুয়ে পড়ল।

শুয়েও কি শান্তি আছে? যদুনাথ চক্রবর্তী এসেছে। এসেছে ধর্মপ্রসঙ্গ করতে। উঠল বিজয়। খালি-পেটেই ঈশ্বরকথা বলতে বসল।

যদুনাথ বললে, 'আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। উপবাসে আছেন বোধহয়।'

'ভগবান তাই রেখেছেন।' বিজয় বললে কাতর মুখে, 'অন্যদিন তাঁর উপর নির্ভর করে থাকি, কিছু না কিছু জুটে যায়, আজ নিজের উপর নির্ভর করতে গিয়েছিলাম, তাই এই দশা।'

পকেটে হাত ঢোকাল যদুনাথ। কী সম্পদ না জানি সে বার করে। আহা বেরুল দেড় পয়সা। দেড় পয়সাই অঢেল।

মুড়ি কেনা হল। তাই সন্তোষে খেল বিজয়। ভাগ দিল শাশুড়িকে।

যদুনাথ গিয়ে আরেক ব্রাহ্ম কান্তিবাবুকে খবর দিল। কান্তিবাবু একটি আধুলি পাঠিয়ে দিলেন। তবে আর কি! আজ তো তা হলে মহাভোজ!

রান্না শেষ হয়েছে, এমন সময় হালিশহরের মহেন্দ্রবাবু উপস্থিত। আর বুদ্ধিকে বলিহারি, একা আসেনি, সঙ্গে শ্বশুর আর শালাকে নিয়ে এসেছে। আর শ্বশুরটিও চমৎকার, এসেই বলেছে ছেলেটার তিনদিন আহার হয়নি।

সুতরাং সর্বাগ্রে বাপ আর ছেলেকে খাওয়াও। তারপর যা আছে তা দিয়ে তুমি আর তোমার মা ক্ষুন্নিবৃত্তি করো। যোগমায়াকে বললে বিজয়।

বিজয়ের জন্যে কিছু রেখেই তবে খেয়েছে মা-মেয়ে। কিন্তু বিজয়ের সামান্য বরাদ্দও আবার দু ভাগ হল। মহেন্দ্রও যে অভুক্ত তা কে জানত।

'যদি যথার্থ শিশুর মতো থাকতে পারি তা হলেই মা সর্বদা দৃষ্টি রাখেন।' উত্তরকালে বলছেন গোঁসাইজি: 'আমার নিজের জীবন আলোচনা করে দেখি আমি ইচ্ছে করে ভেবে চিন্তে কিছুই করিনি। টোলে পড়তাম, গোঁড়া হিন্দু ছিলাম, হঠাৎ সংস্কৃত কলেজে ঢুকলাম, অজ্ঞাতসারে বৈদান্তিক হলাম, পরে ব্রাহ্মসমাজে গেলাম, প্রচারক হলাম, চিকিৎসা করলাম, আবার ঘুরে ফিরে বর্তমান অবস্থা।

'যখন চিকিৎসা করতাম মনে হতো ওষুধ দিলে ঐ রোগের উপশম হবে। ক্রমে দেখি

তা হয় না। দেখতে দেখতে বুঝলাম ওষুধ কিছু নয়, ভগবানের কৃপা চাই। প্রচার করতে গেলাম, প্রথম প্রথম লোকে শুনত একবাক্যে, সাহায্য করত, ক্রমে দেখি লোকের সে-ভাব আর নেই, আর আমার কথায় কিছু হয় না। তখন বুঝলাম আমার শাস্ত্রজ্ঞান ও বক্তৃতার ক্ষমতা কিছুই নয়। ভগবৎকৃপাই সাব। এরূপ আঘাত খেয়ে-খেয়ে এখন বুঝছি, আমি কিছুই নয়, অসারের অসার, ভগবানই সর্বময়।'

কৃষ্ণনগর থেকে প্রচারক নগেন চাটুয্যে এসেছে।

'উঠেছে কোথায় ?'

'আর কোথায়, তোমার এখানে।'

'আমার এখানে খাবে কী ?' বিজয় জিগগেস করল কুণ্ঠিত হয়ে।

'যা খাওয়াবে তাই।'

'প্রভুর কৃপায় জুটেছে আজ শুধু তেঁতুলগোলা ভাত।'

'তাই, তাই সই।' নগেন উৎসাহভরা কণ্ঠে বলে উঠল, 'তাই অমৃত করে খাব।'

দু এক টাকা চাঁদা দিত কেউ-কেউ। তাও দাতারা প্রায়ই ভুলে যেত। খুব অভাব হলে চার আনা আট আনা করে অগ্রিম ভিক্ষে আনত তাদের থেকে। দেখ আজ কাঁটানটে শাক হয়েছে। দেখ আজ দোপাটি ফুলের বড়া করেছি।

'নিজে কিছুই স্থির করতে নেই।' বলছেন গোস্বামী প্রভু: 'ভগবৎ ইচ্ছার উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। নিজের হাতে ভার নিলেই কষ্ট। ভগবান যখন যে ভাবে রাখেন তাতেই আনন্দ করতে হবে। আমার নিজের পছন্দ করবার কিছুই নেই। প্রভু, কাঠের পুতুলী যেমন কুহকে নাচায়, আমাকে তেমনি করো।'

'তোমার আবার নিজের প্রয়োজন কী ?' কুলদানন্দকে বলছেন গোঁসাইজি: 'আজ থেকে আহারের জন্যে ভিক্ষে করবে। অর্থ কারো কাছে চাইবে না। ভিক্ষায় দৈনিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করবে না। কেউ বেশি দিলে কাউকে দিয়ে দেবে। আহারের কোন বস্তুই সঞ্চয় করবে না। নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত রান্নাও করবে না। এই ভাবে চলে যদি তেমন বৈরাগ্য জন্মে তবেই তো সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্য ঠিক হলেই তো সব হল। এসব অভ্যাস এখন না করলে আর কবে করবে ?'

'ভিক্ষে ক বাড়ি পর্যন্ত করতে পারব ?' জিগগেস করল কুলদা।

'তিন বাড়ি পর্যন্ত।'

'কোন্ কোন্ জাতির বাড়ি ভিক্ষে করা যায় ?'

'চাল ভিক্ষা সব বাড়িতেই করা চলে। শুদ্ধাব ভিক্ষান্ন সর্বত্রই পবিত্র। ব্রহ্মচারীদের ভিক্ষাই ব্যবস্থা।'

নব্যদল কেশবের কলুটোলার বাড়িতে মিলিত হল। নতুন সমাজকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করবার উদ্দেশে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পথে বেরুল কেশব। বিজয় তার ডানহাত।

কেশব বললে, 'তুমি এবার পূর্ব বঙ্গে প্রচারে চাও। আমাদের রাজ্য বিস্তৃত করো।'

বিচ্ছিন্ন হবার আগে নব্যদল দেবেন্দ্রনাথকে অভিনন্দন-পত্র দিল। সম্বোধন করল, 'মহর্ষি' বলে। অভিনন্দনের উত্তর দিলেন দেবেন্দ্রনাথ। নব্যদলের অগ্রণী কেশবকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করলেন।

বন্ধু অঘোরনাথকে নিয়ে বিজয় ঢাকায় গেল। ব্রজসুন্দর মিত্রের আরমানিটোলার বাড়িতে এসে উঠল দুজনে। ঢাকায় নতুন ব্রাহ্মবিদ্যালয় খোলা হয়েছে, অঘোর তাতে

মাস্টারি করবে আর বিজয় ব্রাহ্মধর্মের প্রচার করে বেড়াবে। বিজয়ের প্রচারের ফলে ঢাকায় অনুরাগের বন্যা নেমে এল। জাগল নতুন আশা নতুন বিশ্বাস নতুন উৎসাহ।

আনন্দ রায়ের ভাই গোবিন্দ রায় জাতিভেদের চিহ্ন উপবীত বর্জন করে ব্রাহ্ম হল। দীননাথ সেনের বিধবা মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল ব্রাহ্মমতে। আগে ব্রাহ্ম-উপাসনায় খৃস্টানরা ঘরের ভিতরে জায়গা পেত না, এখন বিজয় তাদের ডেকে নিল ভিতরে। শুধু ব্রাহ্মমতে বিশ্বাস করলে চলবে না সে বিশ্বাসকে কাজে প্রতিফলিত করতে হবে। জাতিভেদ উড়িয়ে দিতে হবে। নস্যাৎ করতে হবে পৌত্তলিকতা। আর নীতিবোধকে জাগ্রত করতে হবে জীবনে। সর্বোপরি বলবান হতে হবে চরিত্রে।

ঢাকার ঢাকা খুলে গেল। নতুন ভাবে নতুন চিন্তায় নতুন কর্মের উদ্দীপনায় উদ্বেল হয়ে উঠল।

'জয় জয় বিজয়ের জয়।' বিজয়কে চিঠি লিখল কেশব: 'ঈশ্বরকে একমাত্র নেতা জেনে উচ্চে তাঁর নামকীর্তন করো। বৈরাগী হয়ে সংসারকে পদানত করো। উৎসাহদ্বারা সকলকে বশ করো এবং দেশবিদেশ জয় করে আমাদের রাজ্য বিস্তৃত করো। তুমি যত প্রচার করবে ততই আমাদের ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হবে।

তুমি এত স্বার্থপর কেন? তুমি কি একা সমুদয় সুখভোগ করবে? ঢাকাতে যে সকল অতুল্যরত্ন ঢাকা ছিল তা কি কেবল নিজেই আহরণ করতে হয়? আমাকে কি একবারও ডাকতে নেই? নিতান্ত দরিদ্রভাবে এখানে পড়ে আছি। তোমার উৎসবে কি আমাকে অংশী হতে দেবে না?'

৭

কত জায়গায় প্রচারের কাজে গিয়েছে বিজয়। বাগআঁচড়া থেকে চলেছে শিলাইদহ। পথে সন্ধে হতেই ফুলতলায় এক মুদির দোকানে এসে উপস্থিত হল। কে বলে দিল মুদিকে, শান্তিপুরের গোঁসাই। মুদি তো মহাখুশি। গোস্বামী প্রভুর প্রসাদ পাবে। অকৃপণ সৌভাগ্যের উদয় আজ তার জীবনে।

'আপনি বিশ্রাম করুন, আমি আপনার আহারের ব্যবস্থা করি।'

তক্তপোশের উপর পরিপাটি বিছানা করে দেয় মুদি। রান্নার আয়োজনে তৎপর হয়ে উঠল।

'শোনো। আমি শান্তিপুরের গোঁসাই তা সত্য, কিন্তু আমি ব্রহ্মজ্ঞানী।' বিজয় বললে স্নিগ্ধ স্বরে।

মুদি আহতের মতো তাকিয়ে রইল।

'তার মানে আমার জাত নেই। আমি জাত মানি না। আমি সকল জাতের ভাত খাই।' বিজয় স্নিগ্ধতর হল: 'তোমাকে জানিয়ে রাখা ভালো, কী বলো?'

'তা হলে আপনাকে কী করে আমার ঘরে স্থান দিই?' মুদির স্বপ্নের প্রাসাদ ভেঙে গেল: 'আপনি অন্যত্র দেখুন।'

'তা ঘর না পাই আমার পথ আছে। তুমি আমার জন্যে ভেবো না।' বিজয় দোকান ছেড়ে বেরিয়ে গেল: 'আমার আর কিছু না থাক সত্য আছে।'

এক বটগাছের নিচে রাত কাটাল বিজয়।

কুমারখালিতে এসে দেখা হল কাঙাল হরিনাথের সঙ্গে। প্রচারসভায় বিজয়ের বক্তৃতার আগে গান ধরল হরিনাথ। প্রাণমাতানো পাষাণগলানো গান। হে হৃদয়রঞ্জন, তুমি আমার হৃদয়ে এসে বসো। আমার কাছাকাছি হও। তুমি আমার কাছে, আমি তোমার কাছে। তোমাকে দিয়ে হৃদয় পূর্ণ করে রাখি। তোমার নয়নে আমার নয়ন মিলিয়ে দেখি তোমাকে প্রাণ ভরে, দেখি অনিমেষে। আমার মাঝেই তোমার আবির্ভাব।

শান্তিপুরে এল বিজয়। অশান্ত মনকে শান্ত করতে। মন অশান্ত কেন? ব্রাহ্ম-সমাজে কপটতার প্রাদুর্ভাব হয়েছে। পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ঢুকেছে। অন্তরে সহিষ্ণুতা নেই। কে কাকে কোণঠাসা করবে শুধু তার প্রচেষ্টা। মন শুকিয়ে যাচ্ছে, দীর্ঘকাল উপাসনায় আবিষ্ট থাকা যাচ্ছে না। দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে অশান্তিতে।

প্রকৃতির স্পর্শ ছাড়া মনকে শান্ত করে কে? জাহ্নবীর মতো কে আছে আর দাহহারিণী? নির্মলসলিলা গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। আকাশে এক, নদীর ঢেউয়ে টুকরো টুকরো, কে এই সুধার ভাণ্ডার চাঁদকে সৃষ্টি করেছে? নীলনয়ন আকাশকে? এই সমীরণে কার স্পর্শ? তরঙ্গমালায় এ কার কলস্বর?

নির্জনে বসে চিন্তা করতে লাগল বিজয়। দয়াময় ঈশ্বর যে হাতে প্রকৃতিপুঞ্জ সৃষ্ট করেছেন সেই হাতেই আমাকেও সৃষ্টি করেছেন? তবে আমার মধ্যে কেন এত গ্লানি, এত শূন্যতা? শান্তি আসে আবার কেন চলে যায়?

হরিমোহন প্রামাণিকের সঙ্গে দেখা করো।

'কে হরিমোহন?'

বিশুদ্ধ বৈষ্ণব। অমানীমানদ। খালি পায়ে হাঁটেন। খোলা মনে কথা কন।

বিজয়কে বললেন, 'চৈতন্যচরিতামৃত পড়ো, মনের সমস্ত দারিদ্র্য সমস্ত দুর্দশা কেটে যাবে।'

'আমি যে ব্রহ্মজ্ঞানী।'

হরিমোহন হাসল। বললেন, 'আমিও ব্রহ্মজ্ঞানী।'

'আপনি?'

'হ্যাঁ।' বললেন হরিমোহন, 'শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ আর শ্রীমতী রাধিকা মহাভাব। সুতরাং প্রভু, আমিও ব্রহ্মজ্ঞানী।'

দগ্ধ হৃদয়ে প্রেমবারি সিঞ্চন করল হরিমোহন। বিজয় চৈতন্যচরিতামৃত সংগ্রহ করে পড়তে লাগল। মহাপ্রভুর কী বিনয় আর ভক্তি, অনুরাগ আর ব্যাকুলতা। কেমন তাঁর ঈশ্বরদর্শন, কেমন তাঁর ঈশ্বরসম্ভোগ। এ দেহ পাওয়াই তো ঈশ্বরসম্ভোগের জন্যে। আর ঈশ্বরসম্ভোগের জন্যেই তো ঈশ্বরসাধন।

উন্নতাত্মা চৈতন্যদেবকে গুরু বলে ভক্তি না করে থাকতে পারল না বিজয়। 'জীবে দয়া ও নামে রুচি'-র তত্ত্ব বুঝি হৃদয়ঙ্গম হতে লাগল।

বিজয় আবার চলল পূর্ববঙ্গে। সঙ্গে এবার অঘোর গুপ্ত আর কেশব সেন।

ব্রজসুন্দরের খালি-বাড়িতে আছে তারা। ভুবনমোহন সেন এসেছে দুধ নিয়ে। দেখল বিজয় রাঁধছে আর কেশব পান সাজছে। চাকরবাকর জুটছে না কোথাও। তিন বন্ধুই সমানে বক্তৃতা আর উপাসনা চালাচ্ছে। কেশব কখনো বা ইংরিজিতে। ঢাকা শহর উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

এক বক্তৃতা সভায় বিখ্যাত বৈষ্ণব লকীড়দাস কমলদাস উপস্থিত ছিল। বক্তৃতা শুনে সে কেঁদে ফেলল অঝোরে। সে কী কথা? ব্রাহ্মর বক্তৃতা শুনে বৈষ্ণবের কান্না? কৈফিয়ৎ দিন বাবাজী।

বাবাজী বললে, 'বক্তৃতায় যে ওরা প্রহ্লাদের নাম করেছিল, প্রহ্লাদের ভক্তির কথা বলেছিল, আমি না কেঁদে থাকতে পারলাম না।'

সাধু, সাধু! এর চেয়ে আর বড় কৈফিয়ৎ কী হতে পারে?

অঘোর ব্রাহ্ম এম-ই ইস্কুলের শিক্ষকতা করছে আর কেশব নৌকাযোগে চলে গেল ময়মনসিং। কুমিল্লায় ব্রজসুন্দরকে চিঠি লিখল বিজয়: 'আমি আপনার প্রশস্ত ভবনে একা আছি। একা কিন্তু একাকী নই। যাঁর সঙ্গে কোনোকালে বিচ্ছেদ হবে না সেই চিরজীবনের সখাই আমার সঙ্গী।'

ঢাকা থেকে বরিশাল গেল বিজয়। উঠল উকিল দুর্গামোহন দাসের বাড়ি। পৌষমাস, প্রবল শীত, কিন্তু বিজয়ের কোনো গাত্রবস্ত্র নেই। দুর্গামোহন তাকে একখানা আলোয়ান কিনে দিল। পরদিন ঠাহর হল সেই আলোয়ান নেই। চুরি করে নিয়ে গেল নাকি কেউ? না, প্রচারে বেরিয়ে পথে এক শীতার্ত দরিদ্রকে সে আলোয়ান দিয়ে দিয়েছে বিজয়। খবর শুনে অপরিমাণ খুশী হল দুর্গামোহন। আরেকখানা শীতবস্ত্র কিনে দিল বিজয়কে। ঠিক প্রথমের অনুরূপ। সেখানাও আগের পথ ধরল। এখন উপায়? দুর্গামোহন বুঝলেন শীতবস্ত্র যা দেবেন গোস্বামী প্রভুকে, তাই দরিদ্রের গায়ে উঠবে। সুতরাং কিছু অল্প মূল্যের অনেক শীতবস্ত্র কেনা হোক, তারপর বিলোনো হোক গরিবদের।

তাই হোক। প্রসন্ন হলেন গোঁসাইজি। দয়া যে করবে, বিচার করে করবে। হ্যাঁ, দয়াতেও বিচার চাই। বলছেন গোস্বামী প্রভু, বিচারহীন কখনো হবে না। যতটুকু সাধ্য, কর্তব্য, ততটুকু মাত্র দয়া করবে। অতিরিক্ত দয়া করতে গিয়ে অনেক বড় বড় সাধু মারা পড়েছেন। যোগী যখন দেখবে এ লোককে এ পরিমাণে দয়া করলে ঠিক-ঠিক উপকার হবে তখনই সে দয়া করবে।

বরিশাল থেকে নোয়াখালি হয়ে বিজয় চট্টগ্রামের দিকে চলল। সীতাকুণ্ডের কাছে এসে ক্লান্তিতে পর্বতপার্শ্বেই ঘুমিয়ে পড়ল। আশ্চর্য স্বপ্ন দেখল। দেখল আকাশ তারা জ্যোতিষ্ক সমস্ত ঘোরবেগে ঘুরছে, তার পেছনে এক মহান পুরুষ। কে তুমি? আমি পুরুষ, আর বাকি যা সব দেখছ সমস্ত প্রকৃতি। যে দীপ দেখছ তা প্রকৃতি, আর দীপসত্তা বা দাহিকাশক্তি যার তেজে দীপ জ্বলছে তাই পুরুষ। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মই পুরুষ।

'প্রতিদিনই কিছু দান করবে।' বলছেন গোস্বামী প্রভু, 'দয়া বা সহানুভূতি থেকেই প্রকৃত দান। প্রতিদিনই কারু না কারু ক্লেশ দূর করতে চেষ্টা করবে। অন্য কিছু না পারো কাউকে অন্তত দুটো মিষ্টি কথা বলবে—তাও দান।'

কিন্তু চটির লোকটা একটা মিষ্টি কথাও বলল না, তাড়িয়ে দিল। বললে, 'বিদেশী লোকের আশ্রয় নেই এখানে। একবার কটাকে আশ্রয় দিয়ে ঠকেছি। সিন্দুক ভেঙে তিন শো টাকা চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।'

'সকলেই কি আর—'

'তুমি যে সাধু তার প্রমাণ কী? চোরেরাও অমন সাজে।'

নিরুপায়ের আশ্রয়, বৃক্ষতলে এসে বসল বিজয়। দীর্ঘ পথ হেঁটে-হেঁটে ক্লান্তিতে ডুবে যাচ্ছে, সমস্ত শক্তি স্তিমিত হয়ে এল। কে জানে, অজ্ঞান হয়ে পড়ল শেষ পর্যন্ত।

পথপ্রান্তে বৃক্ষতলেই বুঝি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে বিজয়। হার্টের রুগীর আর ভরসা কী। কোথা থেকে গ্রাম্য এক পাগল এসে হাজির। চটির মালিক দোকানদারকে যাচ্ছেতাই বকে কাঠ খড় আর আগুন সংগ্রহ করে চলল সেই গাছের নিচে। আগুন করে বিজয়কে তপ্ত করতে লাগল। জ্ঞান ফিরে পেয়ে বিজয় চোখ চাইল। বললে, 'তুমি কে ?'

'বলছি—'

'তুমি আমাকে বাঁচালে।'

'আমি না, ঐ দোকানদারই তোমাকে বাঁচিয়েছে। তারই কাঠ বাঁশ আগুন।'

'কিন্তু কে তুমি ?'

'বলছি'—বলে হঠাৎ কোথায় চলে গেল পাগল।

তাড়াতাড়ি চটিতে ছুটে এল বিজয়। 'বলতে পারো কে ঐ পাগল ? কী নাম ? কোথায় বাড়িঘর ?'

'কিছুই জানিনা।' দোকানদার হতভম্বের মতো বললে, 'কেউই জানে না।'

চট্টগ্রামে কোন এক পাহাড়শিখরে উঠছেন। হঠাৎ এক দাবানল তাঁকে গ্রাস করতে এল। চারদিক থেকে ঘিরে ধরল বেড়া আগুন। পালাবার আর পথ নেই বিজয়ের। চোখ বুজে অগ্নি-আলিঙ্গনের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু এ কে সুশীতল ! কে এক বিরাট পুরুষ বিজয়কে হঠাৎ কোলে তুলে নিল। লাফ দিয়ে পড়ল এক নিরাপদ জায়গায়। কে তুমি ? চেঁচিয়ে উঠল বিজয়। বা, আমি আবার কে ! তুমি নিজেই লাফ দিয়েছ।

চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লায় এল বিজয়। ব্রজসুন্দরের বাড়ি এসে উঠল। কালীকচ্ছের আনন্দ নন্দী দীক্ষা নিল বিজয়ের কাছে। কুমিল্লার লোক খেপে গেল। ঠিক করল বিজয়কে মেরে গঙ্গা পার করে দেবে।

সন্ধ্যায় যথারীতি কীর্তন আর উপাসনা হচ্ছে, প্রায় এক শো লোক লাঠি হাতে এগিয়ে এল সভা আক্রমণ করতে।

দাঁড়াও, দু মিনিট পরে হামলা কোরো। কীর্তনটা শেষ হোক।

কী গাইছে রে গানটা ! বেড়ে গাইছে কিন্তু। কথাটা কী ?

'দয়াময় নাম বল রসনা অবিশ্রাম।'

হ্যাঁ রে গোঁসাই কোন জন ?

ঐ যে তন্ময় হয়ে নামে ডুবে আছে, সে। কী সুন্দর দেখতে, তাই না ?

মারধোর করার কথা ভুলে গেল সকলে। কারু কারু বা চোখের পাতা ভিজে উঠল।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে আবার বরিশাল। বরিশালের নবদীক্ষিত তেজস্বী ব্রাহ্মদের চেষ্টায় এক পতিতার বিয়ে হয়ে গেল।

বরিশাল থেকে কলকাতায়। কলকাতায় ফিরে ব্রজসুন্দরকে চিঠি লিখছে বিজয় : 'পরস্পর অনটন বশত আপনাকে চিঠি লিখতে পারিনি। এবার বেয়ারিং লিখছি। আমার স্ত্রী অসুস্থ। রীতিমতো ওষুধ পথ্য দিলে সেরে যেতেন নিশ্চয়। কিন্তু কোথায় কী ওষুধপথ্য ! শুধু একা আমার নয়, প্রত্যেক প্রচারকের ঘরেই এই দুর্দশা। মরুক

সকলে শুষ্ক কণ্ঠে অনাহারে, রোগবিকারে, কেবল ঈশ্বরের জন্যেই প্রাণত্যাগ করুক, তবু যেন কেউ ব্রাহ্মধর্মের জয় ঘোষণা করতে ক্ষান্ত না হয়।'

ব্রাহ্মরা কেশব সেনকে খৃস্টান বলে গাল দিতে আরম্ভ করেছে। শুরু হয়েছে নানান গোলযোগ। বিতণ্ডার তাণ্ডব।

শান্তির আশায় বিজয় আবার চলে গেল শান্তিপুর। তারপর সটান শ্রীপাট কালনায় সিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজীর আশ্রমে। কোথায় বিজয় প্রমাণ করবে, তা নয়, বাবাজীই সাষ্টাঙ্গ হল। বসতে আসন দিল এগিয়ে।

বিজয় বললে, 'বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খাব।'

বাবাজী নিজের কমণ্ডলু ধুয়ে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল এনে ধরলেন সামনে। বিজয় কুণ্ঠিত মুখে বললে, 'আমি যার তার হাতে খাই, জাতটাত মাননে। আমি ব্রহ্মজ্ঞানী। আমাকে আরেক পাত্রে জল দিন।'

বাবাজী কাতর ভাবে করজোড়ে বললেন, 'প্রভু, আমার আকাঙ্ক্ষায় বাধা দেবেন না। জাত-কুল থাকতে কি কখনো ভক্তিলাভ হয়? ব্রহ্মজ্ঞানই তো সমস্ত ধর্মের মূল। দয়া করে এই পাত্রেই জল পান করুন।'

জল খেয়ে কমণ্ডলুটা রাখতেই বাবাজী সেটা নিয়ে কপালে ঠেকালেন। কপালে ঠেকিয়েই কমণ্ডলুর বাকি জলটুকু খেয়ে নিলেন এক চুমুকে।

কয়েকজন ভদ্রলোক বসে ছিলেন সেখানে, একজন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এ কী করলে? ইনি যে পৈতে ফেলে দিয়েছেন, ব্রাহ্মসমাজে ঢুকেছেন, কিছুই মানেন না।'

'আমার অদ্বৈতেরও পৈতে ছিল না। ব্রাহ্মসমাজে ঢুকেছেন, তাই না?' বাবাজী গর্বের ভাব করলেন, 'কিন্তু দেখ সেখানে আমার গোঁসাই-ই আচার্য।'

ভদ্রলোক কথার সুরে ব্যঙ্গ মেশালেন। 'তা আচার্যই বটে! কেমন ধুতি-চাদর, কেমন জামা-জুতো। চমৎকার।'

শুনে বাবাজীর চোখে জল এল। বললেন, 'আহা, প্রভুকে সাজা না পরিপাটি করে, মনের মতো করে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা পারলাম না সাজাতে। প্রভু নিজের দরকারি জিনিস নিজেই সংগ্রহ করে নিচ্ছেন। এই আমরা সেই অল্পেই আনন্দ করব, তা নয়, আমাদের ভাগ্য মন্দ।' বলে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলেন বাবাজী।

ভগবানদাসকে বলত সিদ্ধ ভগবানদাস। সিদ্ধ শুনলেই কেমন ভয় করে। কিন্তু সিদ্ধ মানে তো নরম। ভগবানদাস সেই নম্রতার অবতার। কারু দোষ দেখতে পান না কিছুতেই। দোষের কথা কেউ বললে তিনি কাঁদতে বসেন। বলেন, ওরে আমি যে সকলের চেয়ে হীন।

এখানেই সর্বপ্রথম নাম ব্রহ্মের পট দেখে বিজয়। হিন্দুদের মঠ-মন্দিরে সাধারণত দেবদেবীর মূর্তিই থাকে, নয়তো শালগ্রাম বা শিবলিঙ্গ। কিন্তু ভগবানদাসের আশ্রমে নামব্রহ্মের পট প্রতিষ্ঠিত। নামব্রহ্মের পট কী? একটি পটে লেখা মহাপ্রভু-নির্দেশিত হরিনাম মাহাত্ম্য।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

তারপর বিজয় চলল নবদ্বীপ। সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীকে দেখে আসি।

বাবাজীর এমনি নিষ্কিঞ্চন ভাব কুকুর বেড়ালকেও ভূমিষ্ঠ হয়ে নমস্কার করেন।

সম্পত্তির মধ্যে একখানি ছেঁড়া কাঁথা, একটি নারকেল মালা আর একটি মাটির করোয়া। আর দৈন্যের নির্ঝর।

অপরিচিত অতিথিকে দেখে সানন্দ অভিনন্দন করলেন বাবাজী।

কিছুক্ষণ আলাপ করার পর বিজয় জিগগেস করল, 'বাবাজী, ভক্তি কিসে হয়?'

প্রশ্ন শুনে থমকালেন বাবাজী। একদৃষ্টে বাবাজীর দিকে চেয়ে থেকে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। রোমাঞ্চে মাথার শিখা খাড়া হয়ে উঠল। হুংকার করে উঠলেন, 'কী বললে গোঁসাই, কী বললে? ভক্তি কিসে হয়? তুমি আমাকে প্রতারণা করতে এসেছ? নচেৎ, তুমি বললে কিনা ভক্তি কিসে হয়?' বলতে বলতে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

সমাধিভঙ্গের পর বাবাজী সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে করজোড়ে বললেন, 'প্রভু, আশীর্বাদ করুন, যেন নিষ্কিঞ্চন কাঙাল হতে পারি। তা না হওয়া পর্যন্ত তো ভক্তির নাম-গন্ধও নেই। কিন্তু যাই বলুন, আমি আপনার ললাটে তিলক, মাথায় জটাভার আর গলায় তুলসীর মালা দেখছি। ভক্তি তো আপনারই ভাণ্ডারের জিনিস। আমার অদ্বৈতের ভাণ্ডারে কি ভক্তির অভাব আছে?'

বিজয় কি তখন জানত যে সত্যিই তাকে একদিন তিলক মালা নিতে হবে?

'অন্তরে একবিন্দু অহংকার থাকতে ভক্তিলাভ অসম্ভব। জলস্রোত যেমন ঊর্ধ্বে ওঠে না ভক্তিও তেমনি আসে না অহঙ্কারে।' বাবাজী আরো বললেন।

বিজয়ের ভয় করতে লাগল। ভাবল, আমার স্বভাব অত্যন্ত উদ্ধত অসহিষ্ণু—আমার মতো ক্রুদ্ধ হতে পারে এমন কজন আছে সংসারে? এই গর্বের পর্বত চূর্ণ করা সোজা নয়। তার মানেই আমার বোধহয় কোনোদিন ভক্তিলাভ হবে না। কিন্তু বাবাজী বলছেন কী? ভক্তি আমার ভাণ্ডারের জিনিস!

বিজয়কে খেতে দিলেন বাবাজী। খেয়ে থালাটা একধারে রেখেছে বিজয়, অমনি বাবাজী ভুক্তাবশিষ্ট তুলে নিয়ে মুখে পুরলেন।

'এ কী করছেন?' বিজয় লাফিয়ে উঠল: 'আমি ব্রাহ্ম হয়েছি।'

'তুমি যাই হও, তুমি অদ্বৈতবংশে জন্মেছ।' বললেন বাবাজী, 'তোমার প্রসাদ খাব না? একশোবার খাব। চিত্রগুপ্ত সাক্ষী, আজ আমার প্রভু-সন্তানের প্রসাদ পেলাম।'

কলকাতায় ফিরে এল বিজয়। মন খালি বলছে, শুধু জ্ঞান নয়, ভক্তির কথা হোক। মন আর শুষ্ক থাকতে চাইছে না, চাইছে স্নিগ্ধ হতে।

বিজয়ের দাদা ব্রজগোপাল ভালো গাইয়ে। কথকতারও ওস্তাদ। কলকাতায় বিজয়ের বাড়িতে এসে রয়েছে। সে দিন সে কীর্তন ধরল।

> কানু পরশমণি আমার।
> কর্ণের ভূষণ আমার সে নামশ্রবণ
> নয়নের ভূষণ আমার সে রূপদরশন
> বদনের ভূষণ আমার সে রূপগায়ন
> হস্তের ভূষণ আমার সে পদসেবন
> (ভূষণের আর কি বাকি আছে!)
> আমি কৃষ্ণচন্দ্র হার পরেছি গলে॥

এ কীর্তন শুনে সকলে মুগ্ধ তো বটেই, অণুপ্রাণিত হল। বিজয় কেশবকে গিয়ে বললে, 'আমাদের সমাজে কীর্তন চালু করি, কী বলো? আমার তো মনে হয় ভীষণ জমবে।'

'আমারও সেই মত।' কেশব সায় দিল।

উল্টোডিঙির মনোহর দাস বাবাজীকে ডাকানো হল। আমাদের সভায় পারবে কীর্তন গাইতে? কেন পারব না? কোনখানা গাইবো বলো তো? মনোহর বললে সুর করে 'প্রেম পরশমণি শ্রীশচীনন্দন বিলাইয়াছেন প্রেমসুধা দেখি দীনহীনরে।'

খুব ভালো লাগল বিজয়ের। কেশবেরও। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে কি চলবে? যে যাই বলুক, ভক্তি ছাড়া উপায় নেই। শুধু শাস্ত্রে শুধু ব্যাখ্যায়-বক্তৃতায় হবে না। গান চাই। আর কীর্তন ছাড়া গান কই? আর কৃষ্ণ ছাড়া কীর্তন কই? আর শচীনন্দনই তো কৃষ্ণ। এটুকু সহ্য করে যেতে হবে।

বিজয়ই প্রথম কীর্তন ঢোকাল ব্রাহ্মসমাজে। নিজেই গান বাঁধল।

পাপে মলিন মোরা চল সবে ভাই
পিতার চরণে ধরি কাঁদিয়ে লুটাই।

তারপর ক্রমে ক্রমে নগরপথে নগর-সংকীর্তনে বেরুল ব্রাহ্মরা। কেশব বিজয় চিরঞ্জীব শর্মা। আরো অনেকে। খোল করতাল মৃদঙ্গ বাজতে লাগল তালে-মানে। গান ত্রৈলোক্য সান্যালের রচনা।

এতদিনে দুঃখের নিশি হল অবসান,
নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।

মেতে উঠল কলকাতা। অনেকে ব্রাহ্ম কীর্তনে আপত্তি জানাল। ওসব হিঁদুয়ানি অচল। ব্রাহ্মধর্ম কি হিন্দুত্বছাড়া? আর বিদ্বেষ-বিচ্ছেদ ভোলাতে কীর্তনের মতো আছে কী? চলো কীর্তনে যাই। শরীরে ঈশ্বরস্পর্শের শিহরণ আনি।

'ধর্মলাভের সর্বপ্রধান উপায় শরীর।' বলছেন গোস্বামী প্রভু, 'সর্বাগ্রে এই শরীরকেই রক্ষা করতে হয়। দুধে ঘিয়ে শরীরের যে পুষ্টি তা অসার। আসল পুষ্টি বীর্যধারণে। আহারটি খুব পবিত্র ভাবে না হলে বীর্যধারণ হবে না। আর শরীর যদি সুস্থ পবিত্র না হয় সাধন করবে কী নিয়ে?'

'কিছুতেই যাচ্ছে না কামেচ্ছা। স্বপ্নেও এসে উপস্থিত হয়।'

'কে বললে? দুটি ঘণ্টা খুব স্থির হয়ে বসে নাম করো, দেখি কেমন সে আসে।'

'কিন্তু সিদ্ধি কত দিনে?'

'সিদ্ধি কী?' বললেন গোস্বামী প্রভু, 'ষড়ৈশ্বর্যলাভ সিদ্ধি নয়। মাত্র একটি বৎসর যদি বীর্যধারণ করে সত্য বাক্য সত্য চিন্তা ও সত্য ব্যবহার করতে পারো, অনেক ঐশ্বর্যশক্তি লাভ হবে। কিন্তু তাকে সিদ্ধি বলে না। যখন দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রতিক্ষণে আপনা আপনি ভগবানের নাম করবে তখনই যথার্থ সিদ্ধিলাভ হয়েছে জানবে। কোন একটি বিষয়ে লোভ বা আসক্তি থাকতে সে অবস্থা আসবে না। সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লোভ ও অনাসক্ত হলেই আসবে। তখনই সত্যিকার নামে রুচি। আর নামে সিদ্ধিই প্রকৃত সিদ্ধি।'

প্রচারের কাজে ময়মনসিং সেরপুরে যাচ্ছে বিজয়, এক বুনো মোষ তাকে তাড়া করল। কী খাড়া শিঙ, লক্ষ্যে তীক্ষ্ণ হয়ে ছুটে আসছে। বিজয় চোখ বুজে বসে পড়ল পথের উপর। একমনে ডাকতে লাগল ভগবানকে।

সরু গ্রাম্য পথ, দু পাশে কাশ বন। হঠাৎ ঝড় উঠল। আন্দোলিত কাশে ঢাকা পড়ল বিজয়। সহসা মোষ পথ খুঁজে পেল না। বিজয় দেখল অদ্ভুত একটা কুম্ভকারের গর্ত। সেখানে গিয়ে গা ঢাকা দিল। ঝড় থামতেই মোষ আগের জায়গায় পৌঁছে খুঁজতে লাগল শিকার। শিকারের নাম-গন্ধও নেই। দারুণ রোষে মত্ত মোষের শিঙ দিয়ে মাটি খোঁড়াই সার হল।

মোষ গেল তো কোত্থেকে দুটো হরিণ এসে জুটল। আর ছুটন্ত হরিণের পিছে দুরন্ত বাঘ। ভগবান বলে চোখ বুজল বিজয়। হরিণে মনোযোগী বাঘ বিজয়ে আকৃষ্ট হবার সময় পেল না। হরিণের সন্ধানেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেবার রংপুরে এক গ্রামে যাচ্ছে। মাঠে এসে পড়েছে, অমনি মুষল-বর্ষণ শুরু হল। জলের সংগী ঝড়ও এসেছে ঘনঘটায়। এখন কী করি, কোথায় আশ্রয় নেই। ভিজতে ভিজতে রাস্তায় উঠে দেখল এক সার দোকান। যেটা সামনে পেল, জিজ্ঞেস করল, 'একটু ঠাঁই দেবে?'

এখানে জায়গা কোথায়! কে না কে আগন্তুক, আশ্রয় দিয়ে শেষে বিপদে পড়ি! একে একে সবগুলি দোকানই প্রত্যাখ্যান করল। কিন্তু আমার বৃক্ষতল কে কাড়ে! বিজয় এক গাছতলায় এসে আশ্রয় নিল। দেখল কে এক পাগলি বসে আছে। শীর্ণকায়, গায়ের রঙ কালো, পিঠে দীর্ঘ কেশভার। দু চোখ জ্বলছে অন্ধকারে।

'মা, তুমি কে?' মধুস্বরে জিগগেস করল বিজয়।

'মা! তুই আমাকে মা বলে ডাকলি? ডাকে প্রাণ জুড়িয়ে গেল।' বললে পাগলি, 'আমার রামপ্রসাদ বলে এক ছেলে ছিল, সেও অমনি ডাকত মিষ্টি করে। জানিস তেল না মেখে মাথাটা জ্বলে যাচ্ছে। আগে আগে কত মাখিয়ে দিত রামপ্রসাদ। তুই দিবি?'

বিজয় এক ছুটে দোকান থেকে তেল কিনে আনল। বিজয়ের হাতের নিচে মাথা পেতে দিল পাগলি। বললে, 'রাত্রে থাকবি কোথায়?'

পাগলির মাথায় তেল ঢেলে দিল বিজয়। বললে, 'আর কোথায়! এই গাছের নিচে।'

'সে কি? একটা দোকানে গিয়ে থাকলেই তো হয়।

'ওরা দিল না থাকতে।'

'দিল না?' পাগলির চোখ থেকে আগুন বেরুল। 'কেন, দিল না কেন?'

'বিদেশী লোক, তাই বিশ্বাস হল না।'

'বটে? তোকে ওদের বিশ্বাস নেই?' কোত্থেকে একটা লাঠি কুড়িয়ে নিল পাগলি। তেড়ে গেল দোকানের দিকে। একটার পর একটা দোকানের বন্ধ দরজায় লাঠি মারতে লাগল। কি, আশ্রয় দিবি নে? দেখি তোরা নিরাশ্রয় হস কিনা। দেখি কে তোদের রক্ষা করে।

পর পর দরজা খুলে গেল দোকানের। একটাতে আশ্রয় নিল বিজয়। কিন্তু পাগলি কোথায় গেল? কেউ তার খোঁজ পেল না। যাকে দেখে ভয়, তাকে এখন না দেখে অনুতাপ!

গোঁসাই-গতপ্রাণ কুঞ্জ ঘোষের বাড়িতে রক্তবৃষ্টি হয়ে গেছে। কুঞ্জবাবুর স্ত্রী ও ছেলে প্রবল জ্বরে শয্যাশায়ী। ব্যাপার কী?

'সমস্ত তোমার শাশুড়ির অপরাধ। তাকে ডাকাও।' আদেশ করলেন গোঁসাইজি।

বৃদ্ধ শাশুড়ি দাঁড়াল হেঁট মুখে।

'কী করেছ?'

'কালীকে ঝাঁটা ছুঁড়ে মেরেছি।'

'সে কী? কালীকে পেলে কোথায়?'

'প্রায়ই আজকাল নাম করবার সময় কালীমূর্তি দেখা দেয়।' বলতে লাগল বৃদ্ধা, 'নাম যতই গাঢ় হয় কালীও ততই কাছে আসে। আমি বলি, তুমি আমার ইষ্ট নও, তুমি সরে যাও, কিন্তু কালী সরে না, দাঁড়িয়ে থাকে। আমার কথা গ্রাহ্যও করে না। সেদিন ঘর ঝাঁট দিয়ে দরজার কাছে বসে নাম করছি, দেখি কালী আবার ঠিক তেমনি এসে দাঁড়িয়েছে। বারে-বারে বললাম চলে যেতে, কথাটা কানেই তুলল না। তখন নিদারুণ রাগ হল। হাতের কাছে ঝাঁটাগাছটা ছিল, ছুঁড়ে মারলাম। বেটি তখন ভাগল। তারপর আর আসেনি কোনদিন।'

'আসেনি? এই উৎপাতটা তা হলে কী! কিন্তু আমি ভেবে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি, তুমি তাকে ঝাঁটা মারলে কী বলে?' গোস্বামী প্রভু অবাক মানলেন।

'আমি ওকে চাই না, তবু ও আমার কাছে আসে কেন?' বৃদ্ধা তড়পে উঠল।

'লোকে সাধ্যসাধনা করে একবার দর্শন পায় না, আর তিনি তোমাকে নিজের থেকে কৃপা করলেন, আর তুমি কিনা তাঁকে ঝাঁটা ছুঁড়লে!'

'আমার মনে হচ্ছিল,' বৃদ্ধা বললে, 'কালী আমার সাধনপথের প্রলোভন।'

'সে কী? কালী কি ভগবান নন?'

'শ্রীকৃষ্ণই তো ভগবান। আমি তো সেই ভাবেই দেখি, সেই ভাবেই নাম করি।'

'দীক্ষাকালে ভগবানের নির্দিষ্ট কোনো রূপের কথা তো বলা হয়নি।' বললেন গোঁসাইজি, 'তিনি দ্বিভুজ না চতুর্ভুজ কে বলবে। কোন রূপে তিনি তোমার কাছে প্রকাশ পাবেন তা তিনি জানেন। যে মূর্তিতে আসেন সেই মূর্তিটি মেনে নেবে।'

বৃদ্ধা হাঁপাতে লাগল: 'আমি এখন তবে কী করব?'

'যাও, মানসিক করে কালীপুজো করোগে।'

বুড়ি চলে গেলে কুঞ্জ ঘোষকে ডাকালেন গোঁসাইজি। বললেন, 'তোমার শাশুড়ি শুনবে না। যাও তুমি নিজে গিয়ে শিগগির কালীপুজোর ব্যবস্থা করো। নচেৎ ঘোর অকল্যাণ। শোনো। নাম করতে-করতে যা কিছু প্রকাশ পাবে তাকেই প্রণাম করে মেনে নেবে, তারই কাছ থেকে চেয়ে নেবে আশীর্বাদ।'

'কী আশীর্বাদ চাইব?'

'ভগবানের চরণে মতি-গতি হোক, ভক্তি হোক, এর চেয়ে আর বড় প্রার্থনা নেই।'

এলাহাবাদে এসেছে বিজয়। সঙ্গে কেশব সেন আর প্রতাপ মজুমদার।

একদিন ভক্তদের নিয়ে উপাসনা করছে বিজয়, এক মিশনারি সাহেব ঘরে ঢুকল।

উপাসনা শেষ হয়ে গেছে তবু বিজয় উঠছে না। কেউ খবরের কাগজ পড়ছে, কেউ বা গল্প করছে, কিন্তু বিজয় বসে আছে ধ্যানস্থ হয়ে। কিছুতেই ভাঙছে না তার তন্ময়তা।

মিশনারি কেশবকে জিগগেস করলে, 'ঐ লোকটি কে?'

'কোন লোকটি?'

'যিনি সভা ভেঙে গেলেও স্থিরভাবে বসে আছেন—ঐ যে—' পাদ্রী নির্দিষ্ট করে দিল: 'তাঁর সঙ্গে আমি কিছু কথা বলতে চাই।'

'তাঁকে ডাকব?'

'না। তিনি নীরবে উপাসনা করছেন, তাঁর উপাসনা ভাঙতে আমার ইচ্ছে নেই। আমি চেয়ারে বসি।'

ধ্যানভঙ্গের পর বিজয় এল সাহেবের কাছে।

'শোনো, যীশুখৃষ্ট ছাড়া জগতে আর কোনো উপাস্য নেই।' বললে পাদ্রী, 'আর তিনি ছাড়া কার সাধ্য জগতের পাপভার মোচন করে?'

ইংরেজ হলে কী হয়, পাদ্রী বেশ বাঙলা শিখেছে।

বিজয় বললে, 'তুমি তো অনেক দিন ধরে খৃষ্টধর্ম প্রচার করছ, বইও পড়েছ বিস্তর। আমার গোটা কতক প্রশ্নের উত্তর দেবে?'

'বেশ তো। বলো না তোমার কী প্রশ্ন?'

'ধর্ম কাকে বলে? আত্মা কাকে বলে? সত্য কী, পাপ কী, মায়া কী?'

প্রশ্ন শুনে সাহেব স্তম্ভিত। শুষ্ক মুখে বললে, 'এসব প্রশ্ন কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেনি, নিজের মনেও ওঠেনি কোনদিন। ধর্ম বলতে শুধু যীশুখৃষ্ট আর বাইবেলই বুঝি, এর বাইরে আর কিছু জানি না।'

'কিন্তু তোমার যীশু যে এশিয়ার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে এক গ্রামে জন্মেছিলেন তা জানো?' কেশব এগিয়ে এল। 'জানো আমাদের ভারতবর্ষ সেই এশিয়ারই অন্তর্গত?'

'না, না, অত শত জানবার আমার কী দরকার!'

'তোমার যীশুকে আমরা তোমার চেয়েও বেশি জানি, বেশি ভালোবাসি।'

'তবে তাকে তোমরা ভজনা কর না কেন?'

'তাকে আমরা মহাপুরুষ জ্ঞানে ভক্তি করে থাকি, কিন্তু আমাদের উপাস্য তাঁর পিতা সেই পরমেশ্বর। শোনো, যদি এদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে চাও, তা হলে দেশে ফিরে যাও, সেখানে সবার সঙ্গে চর্চা করে আমাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে এস। উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত এ দেশের লোক আকৃষ্ট হবে না। স্বধর্ম কেন ছাড়বে, কার হাতে সর্বস্ব তুলে দেবে, একটু যাচাই করে দেখবে না? সুতরাং—'

আর বাকস্ফূর্তি করল না সাহেব, দেশে পিটটান দিল।

লাহোরে এসেছে বিজয়। একদিন তার চিত্তবিকার উপস্থিত হল। সঙ্গে সঙ্গেই মনে জাগল অনুতাপ। আমি প্রচারক, ধর্মোপদেষ্টা, আর আমারই মনের এ বিভ্রম! কাঁদতে লাগল বিজয়। নিজেই একটি গান তৈরি করে গাইতে লাগল।

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে নাথ ডাকিব তোমায়
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যেথায়।
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনল সম
আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পূজিব তোমায়॥

গান করেও প্রাণে শান্তি এল না। স্থির করল আত্মহত্যা করবে। সেই সঙ্কল্পে নির্জন মধ্যরাত্রে রাভি নদীর পারে এসে দাঁড়াল। মণ দুয়েকের একটা প্রস্তর খণ্ড বাঁধল কোমরে। ঝাঁপ দিতে যাবে, হঠাৎ কোত্থেকে এক ফকির এসে জাপটে ধরল। বললে, 'শরীর ছাড়লেই পাপ প্রবৃত্তি নষ্ট হবে না।'

বিজয় থমকে তাকাল ফকিরের মুখের দিকে।

'ধৈর্য ধরো। ধৈর্য ধরলেই মঙ্গল হবে।' বললে ফকির, 'কখন পাপ দগ্ধ হয়ে যাবে টেরও পাবে না। তার এখনো অনেক দেরি আছে। কিন্তু যাবে সে একদিন, নিশ্চয় যাবে। সব কাজেরই সময় ভগবান নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছু হবার নেই। বাতাসে যে ধুলো ওড়ে তাও তাঁর ইচ্ছেতে। তাই ভাবনা কোরো না। সংসারে ভগবানের লীলা দেখ।'

'কিন্তু আপনি—আপনি কী করে জানলেন আমার মনের কথা ?'

'আমি নদীতীরে বসে ভজন করছিলাম', বললে ফকির, 'হঠাৎ দৈববাণী হল, এক মহাত্মা আত্মহত্যা করছে, তাকে বাঁচাও।'

'কিন্তু আমাকে বাঁচিয়ে লাভ কী হল ? আমার মন অশুচি।'

ফকির হাসল। বললে, 'তাই তো বলছি, অশুচি মন নিয়ে পরকালে গিয়েই বা লাভ কী ? ভগবানের নাম করো, তিনিই তোমাকে পবিত্র করবেন। যখন পরলোকে যাবে পবিত্র জীবন নিয়ে যাবে—অমনি-অমনি গিয়ে লাভ কী।'

আশ্বস্তের মতো তাকাল বিজয়।

'তুমি নিজেকে এখন অপবিত্র মনে করছ, কিন্তু তুমি আসলে কত সুন্দর, একদিন জানতে পারবে।'

'কবে ?' বিজয়ের কণ্ঠে আকুলতা ঝরে পড়ল।

'সাধন পথে অগ্রসর হলেই দেখতে পাবে চোখের সামনে একখানা আয়না ফুটে উঠেছে। সেই আয়নায় দেখবে তোমার স্বরূপ। বুঝবে তুমি কত সুন্দর।' ফকির সাধন পথের ইঙ্গিত দিতে চাইল। বললে, 'প্রত্যহ রাত্রে শোবার সময় ভগবানের মাতৃবাচক নাম জপ করবে।'

'ভগবানকে মা বলে ডাকব ?'

'হ্যাঁ। মা বলে ডাকবে। জপ করতে-করতে মন যখন তন্ময় হবে দেখবে নিদ্রা এসে গেছে। তার কোনো মলিন চিন্তা তোমাকে চঞ্চল করতে পারবে না।'

মনে অপরিমেয় বল পেল বিজয়। বাড়ি ফিরে শান্তিতে ঘুমুতে গেল।

দুর্দান্ত কামকে বশীভূত করা দূরের কথা, মন্দীভূত করা যাচ্ছে না। যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছে কুলদানন্দ। এসেছে গোঁসাইজির কাছে। বলছে স্বপ্নবৃত্তান্ত। স্বপ্ন দেখেছে এক তরুণী আত্মীয়ার সঙ্গে প্রসাদ নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। এত নিয়মনিষ্ঠার পরেও এরকম স্বপ্ন কেন ?

'স্বভাবদোষ খণ্ডন হয়নি এখনো।' বললেন গোঁসাইজি, মেয়েটির উপর যে তোমার বহুকালের আসক্তি।'

'এ আসক্তি কী করে যাবে ?'

'শুধু শ্বাসেপ্রশ্বাসে নাম জপে। কোনো অসৎ কল্পনা মনে এলেই চেঁচিয়ে পাঠ কোরো কিংবা গান ধোরো। কল্পনাতেও কামভাব না জাগলে বুঝবে শত্রু পরাভূত

হয়েছে। বীর্যরক্ষার জন্যে চাই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। সামান্য একটু অসতর্ক ফাঁক রাখলেই ঢুকে পড়বে কালসাপ।'

শ্বাসেপ্রশ্বাসে নামজপের কথা সাধারণ লোকের মুখেও শোনা যাচ্ছে। মাঝিরা গান গাইছে :

'মন পাগলা রে হরদমে গুরুজীর নাম লইও।
দমে দমে লইও রে নাম কামাই নাহি দিও।'

আর যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যেমন জপযজ্ঞ, তেমনি নামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাতৃনাম। 'মা, আমি তোমার পোষা পাখি।' মাঘোৎসবে উপাসনা করছেন গোস্বামী প্রভু : 'মা, অন্নপূর্ণা, আজ ছোট-বড় কাঙাল-ফকির সবাইকে তুমি পেটভরা অন্ন বিতরণ করছ। দেশে-বিদেশে আজ কত লোক তোমার প্রসাদ পেয়ে পরিতৃপ্ত হচ্ছে। আমাকেও অভুক্ত রাখনি, দিয়েছ অঢেল করে। আর না, মা, আর না—একটা কাণাকড়ি হলেই আমার যথেষ্ট। একটা কাঙাল ছেলের এর বেশি আর কী চাই ? বেশি হজম করি এমন সাধ্য কই ? রোজ-রোজ দিও মা, একটি করে কাণাকড়ি দিও। তার বেশি নয়, কখনো নয়।'

মথুরা হয়ে বৃন্দাবনে এসেছে বিজয়। ব্রাহ্মসভায় বক্তৃতা দিচ্ছে, হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা এসে গেল। 'সে কী মশাই! ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করতে বসে শেষ পর্যন্ত গোষ্ঠলীলা ! লোকে বলবে কী !'

'লোকে বুঝবেই বা কতটুকু ? স্থান মাহাত্ম্য যে আছে তা কে অস্বীকার করবে।'

'হাঁ, বক্তৃতার সময় চোখের সামনে যা দেখলাম তাই বললাম। এ যে বৃন্দাবন। এ যে ব্রজবালকের গোচারণের স্থান।'

একদিন তো উপাসনায় জগজ্জননীর আবির্ভাব হল। বিভোর হয়ে বিজয় ডাকতে লাগল 'মা' 'মা' বলে। গোঁড়া ভক্তেরা আপত্তি জানাল—আমরা কি ভগবতী, না, জগদ্ধাত্রীর আরাধনা করছি ?

জানি না। মাকে দেখলুম। ডাকলুম। প্রাণ-মন ভরে গেল।

বৃন্দাবন থেকে মথুরা হয়ে আগ্রায় এল বিজয়। তাজমহল দেখল। রাত্রে দেখল এক অনির্বচনীয় স্বপ্ন। দেখল, যেন তাজের প্রাঙ্গণে ঘুরছে। চার পাশে ফুলন্ত গাছ, জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে দিক-দেশ। শাদা আর সবুজ একসঙ্গে হাসছে। মনে হল, গাছ নেই, সুন্দরী তরুণী হয়ে গিয়েছে। বিহ্বল হয়ে তাকাল বিজয়। এরা কারা ? দেবকন্যা ? না কি অপ্সরী ?

'তুমি কেন এ পবিত্র জায়গায় এসেছ ?' কলকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল মেয়েরা।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকল বিজয়। বললে, 'তোমাদের কাছ থেকে একটি বিষয় জানতে এসেছি।'

'আমাদের কাছ থেকে ?' সুধাকণ্ঠীরা আবার হেসে উঠল : 'বলো, শুনি কী তোমার জিজ্ঞাসা।'

'ঈশ্বর যে সর্বব্যাপী তা কী করে বুঝি ?'

'আশ্চর্য, আজও তুমি বোঝনি ? যাঁর রাজ্যে বাস করছ, যাঁর দয়া ছাড়া এক পল বাঁচবার অবকাশ নেই তাঁর সর্বব্যাপিত্বে তুমি আজও সন্দিহান ?'

'আমি ঘোর মূর্খ, কিছুই জানি না।'

'আচ্ছা, আমাদের মতো সুন্দরী কোথাও দেখেছ ?'

'না, স্বপ্নেও দেখিনি।'

'আমাদের কে এত সুন্দর করেছে ? আমাদের এ রূপ-লাবণ্য কার সৃষ্টি, কার শিল্পকর্ম ? কার করুণা ?'

'ঈশ্বরের।'

'হ্যাঁ, ঈশ্বরের। ঈশ্বর এ দেহে বর্তমান বলেই এ দেহ এত সুন্দর। তাঁর অধিষ্ঠান ছাড়া কিছুই সুন্দর হতে পারে না। সমস্ত সুন্দরে ঈশ্বরকে দেখ।' রূপসীরা কণ্ঠস্বর উজ্জ্বলতর করল : 'তার চেয়েও বেশি করে দেখ। সমস্ত কিছুতেই ঈশ্বর আছেন বলে সমস্ত কিছুকেই সুন্দর বলে দেখ। সর্ববিশ্বে ঈশ্বরকেই পরমসুন্দর বলে জানো।'

রূপসীরা আবার বৃক্ষরূপ ধারণ করল। চমকে উঠল বিজয়। তাকিয়ে দেখল কতগুলি প্রাচীন বৃদ্ধ বসে আছে। তারা বলে উঠল, 'যে ঈশ্বরকে সুন্দর বলে জানলে সেই ঈশ্বরকেই প্রাণ বলে জানো। তিনি প্রাণরূপে আছেন বলেই আমরা এতদূর সারবান হতে পেরেছি।' বৃদ্ধেরা বৃহদাকার বৃক্ষে রূপান্তরিত হল।

ঘুম ভেঙে গেল বিজয়ের। আশ্চর্য, আগে যা মাত্র শূন্য বলে বোধ হতো এখন তা পরিপূর্ণ বলে বোধ হল। সর্বত্রই ঈশ্বর। সর্বত্র তাঁর দয়া, সর্বত্র তাঁর পবিত্রতা। সমস্ত বিশ্ব তাঁরই আবির্ভাবে নীরন্ধ্র।

প্রথমা কন্যা এল সংসারে। বিজয় তার নাম রাখল সন্তোষিণী। পরিবার বড় হচ্ছে। প্রতিপালনের ব্যবস্থা কী ? চিকিৎসাবৃত্তি তাই ছাড়তে পারল না বিজয়। কিন্তু বৃত্তিতে উন্নতি করতে হলে যে অখণ্ড মনোযোগ দরকার তার অবকাশ কোথায় ? দুর্গাচরণ বাঁড়ুয্যে স্বপ্নযোগে দেখা দিয়ে ওষুধ বলে দেয় আর সেই ওষুধে সুনিশ্চিত আরোগ্য। দুর্গাচরণ বিরাট ডাক্তার, দেশনেতা সুরেন বাঁড়ুয্যের বাবা। পরলোকে গিয়েও চিকিৎসা করছে। লাঘব করছে যন্ত্রণা।

একদিন স্বপ্নে বিজয়কে বললে, 'তোমাকে কেবল দেহরোগেরই চিকিৎসা নয়, ভবরোগেরও চিকিৎসা করতে হবে। শুধু দেহজ্বরের আরাম নয়, ভবাগ্নিদাহের আরাম।'

তবে এই তুচ্ছ চিকিৎসা ছেড়ে দিই। কিন্তু সংসার চলবে কী করে ? যাঁর সংসার তিনি চালাবেন। তার আগে একবার গুপ্তিপাড়ায় যেতে হয়। রুগী মুমূর্ষু, চলে এসেছিল, আরেকবার যাবে দেখতে, নতুন ওষুধ নিয়ে। সেই কথাটা রাখতে হয়। রুগীর আত্মীয়েরা তার জন্যে বসে আছে আকুল হয়ে। কিন্তু যাবে কী করে ? তুমুল ঝড়জল শুরু হয়ে গিয়েছে। শান্তিপুরের ওপারে গুপ্তিপাড়া। খেয়ানৌকার জন্যে বিজয় ঘাটে এসে দাঁড়াল। কিন্তু পাটনী নৌকা ছাড়তে রাজি নয়। এই দুর্জয় দুর্যোগে পারাপার অসম্ভব।

'বা, তাই বলে রুগী মারা যাবে ?'

'তা জানিনা। কিন্তু আমি মারা পড়তে রাজী নই।'

খেয়ার মাঝি প্রত্যাখ্যান করল।

কিন্তু নিবৃত্ত হবার লোক নয় বিজয়। ওষুধের শিশি মাথায় বেঁধে নদীতে ঝাঁপ দিল। ভাদ্র মাসের ভরা নদী ঝড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে, তারই মধ্য দিয়ে পথ করে এগুতে লাগল। নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে পরের প্রাণকে, রুগ্নের প্রাণকে, আর্তের প্রাণকে বেশি গৌরব দিল। পরসেবাই পরম সেবা।

এ কী। এ দুঃসময়ে আপনি ! রুগীর আত্মীয়েরা বরাভয়প্রদ ধন্বন্তরিকে দেখলে।

'হ্যাঁ, সাঁতরে পার হয়ে এসেছি, ওষুধ এনেছি মাথায় বেঁধে।'

ঈশ্বরই মহোষধি। ঈশ্বরই শিরোধার্য। চিকিৎসা ব্যবসা ছেড়ে দিল বিজয়। বন্ধু ব্রজসুন্দরকে লিখলে : 'আমি ভিখারির ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছি। ব্যবসা করা আমার কাজ নয়। আমি আবার ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিলাম। ব্রাহ্মভাইয়েরা আমাকে সাহায্য করেন, ভালোই, না করেন, তাও ভালো। ঈশ্বরের চরণে শরীর মন বহুদিন হল বিক্রয় করেছি। তিনি আমাকে পরিত্যাগ করবেন না। তিনি অন্তর্যামী, তিনিই আমাকে সস্নেহে সাহায্য করবেন। ব্রাহ্মধর্মের জয় হোক। আমার শোণিত ব্রাহ্মধর্মকে পোষণ করুক।'

৯

কন্যা পুত্রে প্রথম পুত্র হল বিজয়ের। নাম রাখল যোগজীবন।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্যে বিজয় এসেছে মুঙ্গেরে। প্রাচীনকালে এখানে মুদ্গল ঋষির আশ্রম ছিল বলে সহরের নাম মুঙ্গের। আর মুঙ্গেরের সব চেয়ে বড় আকর্ষণ কষ্টহারিণী। গঙ্গার উপরেই কষ্টহারিণী প্রতিষ্ঠিত। আর তারই নামে ঘাট কষ্টহারিণীর ঘাট। মনোরম ভজনের জায়গা। কত সাধুসন্ত নিবিষ্ট রয়েছে ধ্যানে। সমস্ত স্থান জুড়ে ভগবৎ স্পর্শ যেন প্রোজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। স্তব্ধ হয়ে একটু বসলেই আপনা-আপনি ধ্যান জমে যায়। জ্বালাযন্ত্রণার লেশমাত্র থাকে না। এই ঘাটেই এক যোগীর দেখা পায় বিজয়।

কিন্তু মুঙ্গেরে সন্তোষিণী মারা গেল। শোকের শেল হৃদয় ছিদ্র করে দিল বিজয়ের। যিনি হরণ করেন তিনিই আবার পূরণ করেন। যাঁর দেওয়া শোক তাঁরই দেওয়া সান্ত্বনা।

কেশবও চলে এসেছে মুঙ্গেরে। কিন্তু এ কী অকরুণ। কয়েকজন ব্রাহ্ম ভক্ত অবতারজ্ঞানে কেশবকে পুজো করতে লাগল। বিগলিত হল প্রণামে। খেয়ে নিল পাদোদক।

বিজয় চটে গেল। বললে, 'এ সব কী হচ্ছে ?'

'কী সব ?'

'এই সব ব্রাহ্মবিগর্হিত কর্ম। পায়ের ধুলো নেওয়া পা ধুইয়ে দেওয়া —'

'তা আমি কী করব ?'

'তুমি এর প্রতিকার করো।'

'আমি কারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারিনা।'

বিজয় চলে এল কলকাতায়। যদুনাথ চক্রবর্তীকে দলে নিল। সংবাদপত্রে শুরু করল আন্দোলন। এ সব নরপুজার প্রশ্রয় নেই ব্রাহ্মধর্মে। কলহের ধূম্রজাল ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। বিজয়ের সমর্থকেরা কেশবকে বলতে লাগল ভন্ড, কেশবের সমর্থকেরা বিজয়কে বলতে লাগল নাস্তিক। পরস্পরে শুরু হল কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি।

এ গ্লানির শেষ হবে কিসে ? তিক্ত বিরক্ত হয়ে বিজয় ফের এল শান্তিপুরে। হঠাৎ নির্জনে কুলদেবতা শ্যামসুন্দর দেখা দিল বিজয়কে। বললে, 'তোকে ঘর থেকে বের করলাম, আবার তুই সেই ঘরেই প্রবেশ করলি ?'

চমকে উঠল বিজয়। কিন্তু অলৌকিককে বেশি আমল দিল না। ভাবল অলীক

কল্পনা, হয়ত বা মস্তিষ্কের বিকার। কিন্তু এ যা ঘটল এও ভাবনাতীত। কেশব চিঠি লিখল বিজয়কে। বললে, আমার দিকের কথাটা একবার বোঝ। তারপর এস, ঝগড়া মিটিয়ে ফেলি।

প্রীতিসুন্দর চোখে সমস্ত পরিচ্ছন্ন করে দেখতে পেল বিজয়। দেখতে পেল ওটা আসলে নরপূজো নয়, ভক্তি প্রকাশের আতিশয্য মাত্র। কেশবের নিজের মনে কোনো অভিমান নেই, সে সম্মানের প্রত্যাশী নয়। সুতরাং এ আন্দোলন বন্ধ হোক।

'আমি অনুসন্ধান করে দেখে স্থির করেছি', ধর্মতত্ত্ব পত্রিকায় ঘোষণা করল বিজয়, 'কেবল বাহ্যিক কার্যে ও শব্দে আতিশয্য দোষ আছে, মতে কোনো দোষ নেই। যাঁরা এরূপ ব্যবহার করেন তাঁদের মধ্যে কেউই মানুষকে উপাসনা করেন না বা ঈশ্বর বা ঈশ্বরের মধ্যবর্তী জ্ঞানে কোন মানুষের কাছে প্রার্থনাও করেন না। কেশববাবুর প্রতি তাঁরা যেরূপ ব্যবহার করেন, তা যতই অযৌক্তিক হোক না কেন, আমি কখনোই মনে করতে পারিনা যে তাঁরা কেশববাবুকে ভক্ত পরিবারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও পরম উপকারী বন্ধু ছাড়া অন্য কোনো ভাবে দেখেন। এরূপ বাহ্যিক ব্যবহার মানুষের প্রতি যত অল্প হয় ততই ভালো কেননা তা দিয়ে অন্যের অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা।

'ভক্তিভাজন কেশববাবুর প্রতি আমি কখনো দোষারোপ করিনি। অপর ভ্রাতারা তাঁকে সম্মান দিতে যেরূপ ব্যবহার করুন না কেন তিনি তার জন্যে দায়ী নন। তিনি সেরূপ সম্মানের অভিলাষী নন। তার জন্যে কাউকে তিনি অনুরোধ করেননি, বরং এ যে তাঁর অভিপ্রেত নয় তা অনেকবার বলেছেন। তিনি স্পষ্টরূপে তৎকালে ঐরূপ সম্মান প্রকাশে নিষেধ করেননি তাঁর কেবল এইটুকু ত্রুটি আমি দেখেছিলাম। এছাড়া বর্তমান আন্দোলনে তাঁর অণুমাত্র অপরাধ নেই। এ আমি নিশ্চয় রূপে বলতে পারি।'

বিজয়ে কেশবে পুনর্মিলন হল। শুষ্কতার মহামারী দূরে গিয়ে দেখা দিল আরোগ্যের সুপ্রভাত।

ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই তখন গোঁসাইজির পিছনে। লিখছেন শিবনাথ শাস্ত্রী: 'তিনি মনে করলে নিজের একটা দল বাঁধতে পারতেন, কিন্তু সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। তিনি নিজের জয় চাইলেন না, ব্রাহ্মধর্মেরই জয় চাইলেন। এতে তিনি আমার হৃদয়ের নিকট সহস্রগুণে প্রিয় হলেন।'

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরদ্বার উদ্ঘাটিত হল। দূর হয়ে গেল মনোমালিন্য। জেগে উঠল প্রীতি-মৈত্রীর নির্মল আনন্দরৌদ্র।

রানাঘাটের কাছে কলাইঘাটায় তখন আছে বিজয়, পুনর্মিলন উপলক্ষে সেখানেও ব্রাহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হল। কেশব স্বয়ং উপস্থিত হল সে উৎসবে। সরল, উদার, সুপ্রসন্ন। লিখছেন শিবনাথ:

'একদিন সন্ধের পর কেশববাবু সশিষ্য কীর্তন করতে-করতে নৌকায় করে চূর্ণী নদীতে বেড়াতে গেলেন। প্রাতে উঠে দেখি কেশববাবু ব্রাহ্মদের পায়ের তলায় একপাশে পড়ে ঘুমুচ্ছেন। আহার করতে বসে দেখলাম, তাঁর বড়মানুষী কিছুই নেই, সামান্য ডালভাত মনের আনন্দে আহার করছেন।'

আর বিজয়? বিজয় সত্যসন্ধ। সত্যব্রতধারী। সত্যের অনুরোধে তুচ্ছ করতে পারে নিজের মানমর্যাদা। সর্বাঙ্গে নিতে পারে দৈন্যের আবরণ।

ব্রাহ্মদের হিতের জন্যে কতগুলি নিয়ম প্রবর্তন করল বিজয়।

প্রত্যহ অন্যূন তিনবার পরব্রহ্মের উপাসনা করবে। অভ্যস্ত কতগুলি বাক্য উচ্চারণ না করে জীবন্ত ভাবে উপাসনা করবে। দয়াময় নামের মধ্যে সাধন করতে হবে। নামসাধন হলে অন্তরে পিতার সঙ্গে যোগসাধন করতে বিশেষ ব্যাকুলতা হবে। অন্তরে দয়াময় পিতা প্রকাশিত হবেন। নিন্দাস্তুতিতে সাধকের মন বিচলিত হয় না, সুতরাং তার সঙ্গে বিবাদবিসংবাদ অসম্ভব। প্রত্যেক ব্রাহ্মকে এরূপ সাধন করতে হবে—সাধন না করলে মঙ্গল কোথায়? সাধন না করলে ব্রাহ্ম হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

কেউ বিশ্বাসবিরুদ্ধ কাজ করবে না। মনে যা সত্য বলে জানবে কাজে তা পরিণত করবে। সহস্র ক্ষতি হলেও কপট আচরণ করতে পাবে না। ব্রাহ্মকে ব্রাহ্ম অবিশ্বাস করতে পারবে না। সুরাসক্তি, মাদকসেবন, মিথ্যা কথা, মিথ্যা ব্যবহার, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাস-ঘাতকতা, কৃতঘ্নতা, ব্যভিচার, পরনিন্দা, উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদি পাপাচরণ করলে তাকে ব্রাহ্ম বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। ব্রাহ্ম শুধু ঘৃণা করে কাজ শুধু পরিহারই করবে না, শ্রদ্ধার সঙ্গে সৎকর্মের অনুষ্ঠান করবে। পাপ করা যেমন অধর্ম কর্তব্যপালন না করাও তেমনি অধর্ম। কারো দোষ দেখলে তার দুর্বলতা দূর করবার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে এবং গোপনে তাকে সংশোধন করতে হবে। ভাইয়ের দোষ নিয়ে উপহাস করা চলবে না। যেমন একাকী উপাসনা করবে তেমনি আবার নিয়মিত সামাজিক উপাসনা করবে। নিজের দুর্বলতাকে সমর্থন না করে বিনীতভাবে স্বীকার করবে দুর্বলতা। কেউ ঈশ্বরের নাম নিয়ে উপহাস করলে কানে হাত দিয়ে তার কথাকে অগ্রাহ্য করবে। ঈশ্বর, পরলোক, প্রার্থনা, প্রায়শ্চিত্ত, মুক্তি, অনন্ত উন্নতি ইত্যাদি ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্যে যার বিশ্বাস নেই তাকে ব্রাহ্ম বলে গণ্য করা হবে না। ব্রাহ্মধর্ম শুষ্ক ধর্ম নয়, ভক্তিই ব্রাহ্মধর্মের প্রাণ। ব্রহ্মানুরাগ থেকেই ভক্তির উৎপত্তি। 'কর সাধন ব্রহ্মের চরণ, যাতে পাবে নিত্য শান্তি নিত্য ধন।'

কেশব বিলেত চলে গেল। কমাস পর ফিরে এসে 'ভারত সংস্কার সভা' স্থাপন করল। পাঁচটা বিভাগ হল—সুলভ সাহিত্য প্রচার, স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার, দাতব্য ঔষধালয়, সুরাপান নিবারণ, শ্রমজীবীদের শিক্ষাদান, আর এক পয়সা দামের সাপ্তাহিক পত্রিকা সুলভ-সমাচার প্রকাশ।

কাজ নিয়ে বিজয় মেতে উঠল। ঢেলে দিল মন-প্রাণ।

কলকাতার বেহালায় মহামারীরূপে দেখা দিল ম্যালেরিয়া। সংস্কার সভা সেখানে এক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করল। পরিচালনার ভার নিল বিজয়। ভোরে উঠে সোজা চলে যায় পায়ে হেঁটে। দ্বারে দ্বারে ওষুধ দেয়, রুগীর শুশ্রূষা করে। কলকাতায় ফিরে আসতে আসতে দুপুর গড়িয়ে যায়। স্নানাহার সেরে স্ত্রী-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে। রাত জেগে সংবাদপত্রের জন্যে লেখে প্রবন্ধ। ক্রমাগত পরিশ্রমের ফলে হৃদরোগ দেখা দিল। একদিন হঠাৎ পড়ল অজ্ঞান হয়ে। প্রায়ই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তবু কাজের থেকে সেবার থেকে নিবৃত্ত হয় না। কেশব একজন দেহরক্ষী রেখে দিল। কখন কোথায় বিপন্ন হয়ে পড়ে তার ঠিক কী। হঠাৎ একদিন এক স্বপ্ন দেখল বিজয়।

'এই, জগন্নাথ ঘাটে যা না।' কে যেন বললে: 'সেখানে এক সাধু আছেন। তাঁর কাছে ওষুধ পাবি। যা, দেরি করিস নে।'

বিজয় গেল না। স্বপ্ন আবার কখনো সত্য হয় নাকি? মাথার গরমে এই স্বপ্ন দেখা।

অস্বাস্থ্যের নিদর্শন। কয়েকদিন পরে আবার সেই স্বপ্ন। 'কী, গেলি না? যা না, একবার দ্যাখ না পরীক্ষা করে! ব্যাধিটা যদি সারে! একবার দেখতে দোষ কী!'

এবার কেন যেন প্রত্যাখ্যান করতে জোর পেল না। মন্দ কী, অসুখের যদি কিছু সুরাহা হয়। গেল জগন্নাথ ঘাটে। হ্যাঁ, ঐ তো একজন সাধু দেখা যাচ্ছে। বিজয় তার কাছে স্বপ্নবৃত্তান্ত বললে। 'আপনার কাছে ওষুধ আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। কিন্তু আসতে এত দেরি করলে কেন?' সাধু তাকাল বিজয়ের দিকে: 'ওষুধ যে এরই মধ্যে অনেক খরচ হয়ে গিয়েছে।'

'যা আছে তাই দিন।'

'তাই দিচ্ছি। কিন্তু এতে তোমার ব্যাধির সম্পূর্ণ আরোগ্য হবে না, তবে মূর্ছাটা বন্ধ হবে।' সাধু তার ঝুলিতে হাত ঢোকাল। 'আর কদিন আগে এলে পুরো ওষুধ দিতে পারতাম। ব্যাধিরও অবসান হত।'

'মূর্ছা যদি বন্ধ হয় তাও তো অনেক।'

ওষুধ অসংকোচে খেয়ে নিল বিজয়। কী আশ্চর্য, তার পর থেকে আর মূর্ছা নেই। মূর্ছা বন্ধ হলেও ব্যাধির মূল গেল না। হৃৎপিণ্ডে ব্যথাটা ঠিক তেমনিই আছে। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ চিবার্সকে দেখাল। চিবার্স বললে যন্ত্রণা অসহ্য হলে মরফিয়া নিতে হবে। এই একমাত্র উপশমের উপায়।

'ব্যারাম নির্মূল হবে না?'

'না। বরং এই ব্যারামেই তুমি মারা যাবে।'

নিশ্চিন্ত হল বিজয়। মূর্ছা দূরীভূত হয়েছে, ব্যথাটাও প্রশমিত হবে। আপাতত তা হলেই হল। মৃত্যুর কথা কে ভাবে! তার জন্যে কে বসে থাকে! যতদিন নিশ্বাস আছে খাওয়া যাবে না হয় মরফিয়া। আগে জীবনের কাজ তো সমাধা করি।

বিজয় বেরিয়ে পড়ল প্রচারের কাজে, উত্তরবঙ্গে। হোক অনাহার, হোক অনিদ্রা, অবিচ্ছিন্ন পথক্লেশ। সমস্ত দুঃখকষ্ট, রৌদ্রবর্ষা উপেক্ষা করে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করে বেড়াতে লাগল। রংপুর, কাকিনিয়া, দিনাজপুর, কুচবিহার। কুচবিহারে শুরু হল সেই হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণা। ঈশ্বরের বিধানে দেহই যদি অক্ষম হয়, মানুষের আর কী স্পর্ধা।

কলকাতায় ফিরে এল বিজয়। কেশবের সঙ্গে দেখা করতে গেল। দেখল কেশব নিজে হাতে রান্না করছে।

কেশব চায় ব্রাহ্মদের মধ্যে বৈরাগ্য জাগুক। জাগুক মানশূন্যতা। এবার এস আমরা 'ভারত-আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করি। 'ভারত-আশ্রমের' উদ্দেশ্য হচ্ছে ভক্ত পরিবারদের একসঙ্গে একত্র বসবাস করে নিষ্ঠায় ধর্মাচরণ করা।

'একাকী ধর্মসাধন করলে মুক্তি হয় না। একাকী ধর্মপথে বিচরণ করা স্বার্থপরতা। সকলে এক পরিবারবদ্ধ হয়ে পরিত্রাণের আশায় স্বর্গরাজ্যে যেতে হবে।' আশ্রমের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করছে বিজয়, 'নরনারী একসঙ্গে ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও উপাসনা করবে। তাদের স্নানাহার পৃথক পৃথক হলেও সকলেই এক আচ্ছাদনের আশ্রয়ে আছে এই মৈত্রীর বন্ধন মানতে হবে। সর্বসময়েই সৎপ্রসঙ্গ উৎসাহে সকলে উদ্দীপ্ত হয়ে থাকবে। স্বর্গের মহাসত্যও মানুষের হাতে পড়ে বিকৃত হয়ে যায়। ভারত-আশ্রমের উদ্দেশ্য না বিকৃত হয়।'

প্রচণ্ড নিন্দাবাদ শুরু হল। প্রচারকেরা মূর্খ, অশিক্ষিত, এমন কথা বলতেও ছাড়ল

না। প্রচারকেরাও কেউ কেউ প্রতিবাদ পত্র ছাপল। বিরক্ত হল বিজয়। প্রচারকেরা কেন তাদের ব্রতভঙ্গ করবে ? গালাগাল দিক, প্রহার করুক, অম্লান মুখে সহ্য করতে হবে। প্রার্থনা করতে হবে নিন্দুকদের জন্যে। ঈশ্বরে নির্ভর করে সমস্ত রোষকে শান্ত করতে হবে। যারা ব্যাকুল হৃদয়ে দয়াময়ের নাম ঘোষণা করে তাদের বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন কী। প্রচারকেরা যদি অভিমানী হয়, নিন্দায় মুখ বিষণ্ণ করে তাহলে তারা ধর্মরাজ্যে ঢুকবে কী করে ?

কজন ব্রাহ্ম বকাবকি করে একটা গাড়োয়ানকে মারলে। তাই দেখে বিজয় নির্জনে কাঁদতে বসল। আরেকদিন উপাসনার শেষে খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করল ভক্তেরা—কে বেশি খাবে তার লালসায়। সেদিন বিজয় উপবাস করে রইল। ব্রাহ্ম শুধু উপাসনায় নয়, জীবনের ছোটখাট ব্যবহারে। শুধু মুখে ব্রহ্ম নয়, আচরণে ব্রহ্ম। ব্রহ্মেই নিয়তস্থিতি।

কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগ—সাধনের শ্রেণী বিভাগ করে দিল কেশব। যার মনের গতি যেদিকে সে সেই দিকে ব্রতী হোক।

অঘোর গুপ্ত নিল জ্ঞানযোগের সাধন। আর বিজয়ের জন্যে ভক্তিযোগ।

ব্রতের সপ্তদশ সংযম বিধি অনুধাবন করো।

প্রাতঃস্মরণ, প্রাতঃস্নান, নাম গান, নামশ্রবণ, ভক্তিগ্রন্থপাঠ, রন্ধন, দরিদ্রকে অন্নদান, সেবা, পশুপক্ষীসেবা, বৃক্ষলতাদি সেবা, বিশুদ্ধ আহার, পঠিত শ্লোকের পুনরাবৃত্তি, সৎপ্রসঙ্গ, নির্জনে স্তবকীর্তন ও ভক্তদের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা।

ভক্তিব্রত গ্রহণ করল বিজয়। নামে ভক্তি, প্রেমে ভক্তি, ভক্তি সাধুসঙ্গে। ভক্তিতেই আহ্লাদ। চিরপ্রসন্নতাই ভক্তির লক্ষণ। জীবনে প্রসন্নতাই একমাত্র জীবিকা। কায়মনোবাক্যে ব্রত পালন করতে লাগল বিজয়।

এক বছর পরে কেশব বললে, 'তুমি ভক্তিযোগে সিদ্ধ হয়েছ।'

বিজয়ের মন মানল না। বললে, 'ভক্তির অংকুর মাত্র যদি হয় তাহলে শমদম তিতিক্ষা জাগবে। জাগবে অব্যর্থকালত্ব। জাগবে বৈরাগ্য, মানশূন্যতা। আমার মধ্যে সেসব লক্ষণ কোথায় ? কোথায় আমার ভগবানকে পাবার জন্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা, না পাবার জন্যে উদ্বেগ, কোথায় তাঁর নামগানে আনন্দ, তাঁর গুণবর্ণনে অনুরাগ ? কোথায় তাঁর বিগ্রহবসতিতে বিশ্বাস ? ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ভক্তের যে লক্ষণ বলা হয়েছে আমার মধ্যে তার সুস্ফুট প্রকাশ কোথায় ?' কী বলেছে সেই গ্রন্থে ? বলেছে—

> ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
> আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা নাম গানে সদারুচিঃ॥
> আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্ বসতিস্থলে।
> ইত্যাদয়োনুভাবাস্যুর্জাত ভাবাঙ্কুরে জনে॥

কেশব অভিভূত হয়ে গেল।

ভক্তি গোপনীয়া। গোস্বামী প্রভু বলছেন ভক্তদের,—'ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্য তিনজন বৃদ্ধা ছিলেন। ভক্তিদেবী বৃন্দাবনে গিয়ে যুবতী হলেন। জ্ঞান বৈরাগ্য বৃদ্ধাই থেকে গেল। ভক্তিকে কৃপণের ধনের মতো গোপন রাখতে হবে। শাস্ত্রকারেরা যুবতীর স্তনের সঙ্গে তার তুলনা করেছেন। বালিকা মুক্তদেহে ঘুরে বেড়ায়, যুবতী হলে বস্ত্রদ্বারা স্তন আচ্ছাদন করে। স্বামী ছাড়া পিতামাতা গুরুজনও তা দেখতে পায় না। ভক্তিও সেই রকম। ভগবান ছাড়া সকলের থেকেই সন্তর্পণে গোপনে রক্ষণীয়া। প্রথম যখন ভাবের

উচ্ছ্বাস আরম্ভ হল, চোখ দিয়ে একটু জল পড়তে লাগল, ভাবলাম লোকে দেখুক। পরে মনে হত, এ কী করে গোপন করব? হৃদয়ের কোন্ জায়গায় রাখব তা গোপন করে? ভক্তি গোপনীয়া।'

নির্জনে সাধন করবার জন্যে কোন্নগরের কাছে মোড়পুকুর গ্রামে একটি উদ্যান কিনল কেশব। কিন্তু কোথায় নির্জনতা? সেইখানে দিনে-দিনে ভিড় বাড়তে লাগল ব্রাহ্মদের। সাধ্য কী থাকে কেউ অজ্ঞাতবাসে?

নির্জন সাধনের ইচ্ছায় বিজয় মাঝে মাঝে যায় ইডেন গার্ডেনে। দেখে পথের ধারে বসে একটা লোক জুতো সেলাই করে, কিন্তু কী আশ্চর্য, মজুরির দর করে না, দাবী করে না, যে যা দেয় তাই নেয় মাথা পেতে, কথাটি না বলে। বিজয় একদিন তাকে অনুসরণ করে তার বাড়ি গেল, কী ধরনের লোক দেখব গে।

খিদিরপুর অঞ্চলে লোকটার বাড়ি, থাকে সামান্য বস্তিতে। সন্ধেয় বাড়ি ফিরে যন্ত্রপাতি রেখে গংগাতীরে চলে এল লোকটা। স্নান করল, আহ্নিক করল, বাড়ি গিয়ে বিগ্রহ ও তুলসী বৃক্ষের অর্চনা করল। অর্জিত পয়সা দিয়ে ঘি-আটা কিনল, রুটি তরকারি তৈরি করে ভোগ দিল ঠাকুরকে। পরে আর সকলকে প্রসাদ ভাগ করে দিয়ে নিজে খেতে বসল। যদৃচ্ছা লাভ—ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় নেই। ভগবান যেমন রাখেন তেমনিই থাকব।

আলাপ করল বিজয়। বুঝল এ একজন উচ্চস্তরের সাধক। কর্মক্ষয়ের জন্যে গুরুর আদেশে মুচির কাজ করছে। গুরুর নিষেধ কারু কাছে পয়সা চাইতে পারবে না। যে যা দেবে তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে।

ভারত আশ্রমে দোতলায় সভা। রাত্রে একাকী বসে তন্ময় হয়ে ব্রহ্মনাম করছে বিজয়, হঠাৎ মনে হল কে যেন বন্ধ দরজায় করাঘাত করছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো বিজয় দরজা খুলে দিল। একদল জ্যোতির্ময় পুরুষ ঘরে ঢুকলেন সহসা। 'চিনতে পাচ্ছ? আমি অদ্বৈত আচার্য। বললেন একজন।'

আর এঁরা।'

'ইনিই মহাপ্রভু। ইনি প্রভু নিত্যানন্দ। আর ইনি শ্রীবাস। শোনো।' বললেন অদ্বৈত, 'তোমার ব্রাহ্ম সমাজের কাজ শেষ হয়েছে। এখন মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হও। যাও স্নান করে এস, মহাপ্রভু এখনি তোমাকে দীক্ষা দেবেন।'

বিহ্বলের মতো বিজয় নিচে নেমে গেল। পাতকুয়োয় স্নান করে দ্রুত পায়ে চলে এল উপরে। মহাপ্রভু তাকে দীক্ষা দিলেন। অদ্বৈত বললেন, 'যথাকালে এই দীক্ষা স্ফূর্ত হবে তোমার মধ্যে। তখন তুমি বুঝবে এর সার্থকতা।'

সকলে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

পরদিন প্রাতে অসময়ে পাতকুয়োর কাছে স্বামীর সিক্ত বস্ত্র দেখে যোগমায়া অবাক হয়ে গেল। রাত্রে হঠাৎ স্নান করলেন, কেন, কী ব্যাপার?

স্ত্রীকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বললে বিজয়।

নির্জনে নিয়ে গিয়ে বললে কেশবকে। কেশব বললে, 'একথা কাউকে বোলো না। কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না, তোমাকে পাগল বলে উপহাস করবে।'

পুরোপুরি বিজয়ই কি পারছে বিশ্বাস করতে? মনে হচ্ছে পরলোকগত কতগুলি আত্মা এসেছিল পরীক্ষা করে দেখতে। দীক্ষার নামে সে বিচলিত হয় কিনা। ব্রাহ্মধর্ম থেকে হয় কিনা বিভ্রান্ত বিচ্যুত। না কি পরব্রহ্মের ধ্যানেই সে আরূঢ় থাকে?

ব্রাহ্মধর্মের প্রচারে বিজয় কাশী এসেছে। উঠেছে কেদারঘাটে ডাক্তার লোকনাথ মৈত্রের বাসায়।

'আমাকে একটি নির্জন ঘর দিতে পারবেন?' জিগগেস করল বিজয়।

লোকনাথ সবিস্ময়ে তাকাল মুখের দিকে।

'কখন কোথায় যাই কখন ফিরি কিছু ঠিক নেই, তাই কাউকে বিরক্ত না করে একটা আলাদা ঘর যদি নিজের এক্তিয়ারে পাই তো এখানে থাকি। নচেৎ অন্যত্র জায়গা দেখতে হবে।'

নির্জনে সাধনা করবার জন্যে নয়, টো-টো করে ঘুরে যখন খুশি এসে বিশ্রাম করবার জন্যে। লোকনাথ বললে, 'বা, পাবে বৈকি ঘর।'

টো-টো করেই ঘুরছে বিজয়। ঘুরছে মানে তৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গ করছে।

দুপুর হয়ে গিয়েছে, তবু বিজয়ের বাড়ি ফেরবার নাম নেই। ঈশারা করে জিগগেস করছেন, 'কি রে, খিদে পেয়েছে?'

'পেয়েছে বৈকি।'

তৈলঙ্গস্বামী কাকে কী ঈশারা করলেন, রাশি রাশি খাবার এসে পৌঁছুল।

'এত কি খাওয়া যায়?' আপত্তি করল বিজয়। প্রশ্ন করল, 'আপনি খাবেন?'

'দাও।' হাঁ করলেন তৈলঙ্গ।

যত খাবার মুখে পোরে তত নিঃশেষ করে নিমেষে। বিজয় দেখল মহাবিপদ, তার জন্যে কিছুই থাকবে না। তাই সে কিছু খাবার বেঁধে করে সরিয়ে রাখল নিজের জন্যে। খাবার যখন শেষ তখন তৈলঙ্গ ইঙ্গিতে জিগগেস করলেন, 'তোমার? তোমার কী হবে?'

বিজয় বললে, 'আমার ভাগটা আগেই সরিয়ে রেখেছি।'

হেসে উঠলেন তৈলঙ্গ। মাটিতে লিখলেন কাঠি দিয়ে: 'বাচ্চা সাচ্চা হ্যায়।'

নির্জন কালীমন্দিরে ঢুকেছেন। হঠাৎ প্রস্রাব করে কালীর গায়ে ছিটিয়ে দিলেন।

'এ কী?' চমকে উঠল বিজয়।

তৈলঙ্গ মাটিতে লিখলেন: 'গঙ্গোদকং।'

'তা কালীর গায়ে ছিটিয়ে দেবার মানে কী?' বিরক্ত হল বিজয়।

'পুজো।'

'এ আবার কোন ধরনের পুজো? এর দক্ষিণা কী?'

'যমালয়।'

'যমালয়?'

'হ্যাঁ, দক্ষিণে যমালয়।'

মন্দিরে লোকজন আসতেই বিজয় নালিশ করল: 'উনি প্রস্রাব করে কালীর গায়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন। আর বলছেন, গঙ্গোদকং।' আশ্চর্য, কেউ রুষ্ট হল না। বরং বললে ভক্তি গদগদ স্বরে, 'অমন করে বলতে নেই। উনি তো সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর। ওঁর প্রস্রাব গঙ্গাজল ছাড়া আর কী।'

একদিন হঠাৎ মৌনভঙ্গ করে বসলেন তৈলঙ্গ। বললেন, 'স্নান করে আয়।'

'কেন, স্নান করব কেন ?'

প্রায় জোর করে ধরে স্নান করালেন বিজয়কে। বললেন, 'তোকে দীক্ষা দেব।'

'আমি ব্রহ্মজ্ঞানী, আমি গুরুবাদ মানিনা।' বললে বিজয়। 'আর আপনি তো সাকার উপাসক। গঙ্গাজল শিবের মাথায় চড়ান—'

খুশি হলেন তৈলঙ্গ। বললেন, 'বাচ্চা সাচ্চা হ্যায়।' পরে গম্ভীর হলেন : 'শোন, তোকে দীক্ষা দেবার আমার অন্য কারণ আছে—এ পুরোপুরি দীক্ষা নয়। সে পূর্ণ দীক্ষা পরে হবে, পরে সে গুরুর সাক্ষাৎ পাবি। গুরুগ্রহণ না করলে শরীর শুদ্ধ হয় না—আমি শুধু তোর শরীরশুদ্ধির গুরু হব। আমার উপর ভগবানের যে আদেশ হয়েছে তা আমাকে পালন করতে হবে।'

বিজয়কে মন্ত্র দিলেন তৈলঙ্গ।

'শিষ্য যেন গর্ভস্থ সন্তান।' বলছেন গোস্বামী প্রভু : 'মা যা কিছু খায় তারই একটু-একটু রস নাড়ীর মধ্য দিয়ে সন্তান গ্রহণ করে। তাতেই গর্ভস্থ শিশু পুষ্ট হয়। তেমনি গুরু যা কিছু লাভ করে তাই প্রয়োজনমতো শিষ্যে সঞ্চারিত হয়। গুরুর উন্নতিতে শিষ্যেরও উন্নতি। মার গর্ভে জন্মে ভালো শুশ্রূষা পেলে সন্তান ভালো হবে না কেন ? সকলেরই যে এক মা হবে এমন কোনো কথা নয়। ভিন্ন ভিন্ন মার গর্ভে ভিন্ন ভিন্ন সন্তান জন্মে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকুক এই সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছে। তাই সকল মায়ের প্রতিই শ্রদ্ধাভক্তি রেখো। সাম্প্রদায়িক হয়ো না।'

'গুরুতে যতদিন নির্বিচল নিষ্ঠা না আসে ততদিন অন্য সাধুর সঙ্গ করা চলে ?' জিগগেস করল কুলদা।

'অন্য কোথায় ? সব সেই এক গুরুশক্তি।' বললেন গোস্বামীপ্রভু, 'অন্য ভেবে কেন অন্যের সঙ্গ করবে ? জানবে সমস্ত বিশ্বে এক গুরুশক্তিই পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। রক্তাধারের রক্তই সমস্ত দেহে সঞ্চালিত। শরীরে যত রক্ত সব সেই রক্তাধারের। শোনো, সংকীর্ণ ভাব কিছু নয়। সংকীর্ণ ভাবেই মহতী বিনষ্টি।'

'গুরুতে একনিষ্ঠতাও কি সংকীর্ণ ভাব নয় ?'

'না, তাকে সংকীর্ণ ভাব বলে না। যে রক্তাধারকে চেনে সে ঠিকই জানে সর্বত্র সেই এক রক্ত, এক বস্তু।'

'ভারত-আশ্রমে' টি'কতে পারল না বিজয়, চলে এল বাগআঁচড়ায়। এই গ্রাম্য পরিবেশই ভালো, এই শ্যামল নির্জনতা। এই শান্তিই যেন একটি তন্ময়ী প্রার্থনা। কী দরকার দলে, কোলাহলে ? এই নিঃসঙ্গতাই সর্বপূর্ণকারক। একদিন নির্জনে বসে প্রার্থনা করছে বিজয়, হঠাৎ একটা জ্যোতি তার মধ্যে প্রবেশ করল, যেন দৈববাণী হল, 'তুই আর নিজেকে বদ্ধ করে রাখিসনে। গণ্ডির মধ্যে থাকলে ধর্ম হয় না।'

বিজয়ের মনপ্রাণ শীতল হল। নীল আকাশে সে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম, খাঁচায় বন্দী হয়ে শেখানো বুলিতে সে অস্বীকৃত।

কলকাতার বন্ধুদের পছন্দ হল না এই গ্রাম্যতা। লিখে পাঠাল : 'কলকাতায় চলে এস। নির্জনে থেকে তুমি শুষ্ক হয়ে যাবে। মাতৃস্তন্য না পেলে বাঁচবে কি করে ?'

'মাতৃস্তন্য' মানে কেশবের সঙ্গ। কেশবই ভক্তিরসের উৎস। মনে মনে হাসল বিজয়। এই তো আমি বেশ আছি। শান্তিতে আছি, আছি অচ্ছিন্ন পূর্ণতায়। এরা আবার আমাকে টানে কেন ? কেন আবার চায় দলের দড়িতে গ্রন্থি দিতে ?

না, বুঝি যেতে হল কলকাতায়। সে-বুঝি অন্য ভূমিকা। অন্য প্রসঙ্গ।

ব্রাহ্মবিধি ত্যাগ করে কেশব কুচবিহারের রাজার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিল। ব্রাহ্মবিধিতে বিয়ের বয়েস ছেলের পক্ষে অন্যূন আঠারো ও মেয়ের পক্ষে অন্যূন চৌদ্দ বলে ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু কেশবের মেয়ের বয়েস চৌদ্দর চেয়ে কম। তাতে কী, হিন্দুশাস্ত্রমতে বিয়ে দিল কেশব।

আগুন জ্বলে উঠল। যখন ব্রাহ্মবিবাহ আইন পাশ হয় তখন কেশব বলেছিল বেদীতে বসে, 'এ বিধি শুধু রাজবিধি নয়, এ ঈশ্বরবিধি, এ আইন ঈশ্বরের আদেশেই প্রবর্তিত হয়েছে।' কিন্তু নিজের মেয়ের বেলায় এ বিধি খাটল না। সবচেয়ে আশ্চর্য, এ বিধি লঙ্ঘনকেও সে ঈশ্বরেরই আদিষ্ট কার্য বলে প্রচার করল। যত অসন্তোষ-আন্দোলন এরই জন্যে।

বিজয় স্থির থাকতে পারল না। নিজে নিয়ম করে নিজেই তা আবার অমান্য করবে। এ কী স্বার্থান্ধতা! তীব্র প্রতিবাদ করে পাঠাল বিজয়। কেশবের অনুগত লোকেরা পাল্টা আক্রমণ করল বিজয়কে। তুমুল গোলমাল শুরু হয়ে গেল। যোগমায়ার কাছে পত্র এল কলকাতা থেকে: 'তোমার স্বামীকে সাবধান করো যেন কেশবের বিরুদ্ধাচরণ না করে। করলে বিপদ আছে।'

চিঠি দেখে হেসে উঠল বিজয়। 'এরা কি পাগল? এদের হাতেই কি ভুবনের কর্তৃত্বের ভার? কেশব কি আমার সৃষ্টিকর্তা না পালনকর্তা? আমি কি কেশবকে দেখে ব্রাহ্মসমাজে এসেছি? যে যাই বলুক, সত্যের অবমাননা আমি কিছুতেই সহ্য করব না। আর যাই হোক, লোকমুখপ্রেক্ষিতা আমার নয়।

এ বিয়ের ফলে দুই দলে ভাগ হয়ে গেল ব্রাহ্মসমাজ। কেশবকে যারা আঁকড়ে রইল তাদের দল 'নববিধান' আর কেশবকে যারা ত্যাগ করল, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু আর দুর্গামোহন দাস, তারা গড়ল 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'। এই সম্পর্কে বিরাট সভা হল টাউন হলে। বিজয়ের অগ্রবর্তিতায় স্বতন্ত্র সমাজের প্রতিষ্ঠা হল। মহর্ষি তাঁর সম্মতি দিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ও প্রচারকরূপে নিযুক্ত হল বিজয়। জ্বলন্ত উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজের সমুদ্রে।

'যা সত্য বুঝব তাই নির্ভয়ে প্রতিপালন করব।' লিখছে বিজয়: হিন্দু সমাজে আদরে ও সম্ভ্রমেই অবস্থান করছিলাম। ঈশ্বর যতই আমাকে সত্যের দিকে আকর্ষণ করতে লাগলেন ততই হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। মনে করলাম ব্রাহ্মসমাজ শান্তিনিকেতন, সেখানে অসত্য-অশান্তির ঠাঁই নেই। কই, সেখানে শান্তি নেই, সত্যেরও সমাদর নেই। অশান্ত ও অসত্যের প্রশ্রয়স্থলকে কে আর ব্রাহ্মসমাজ বলে গণ্য করবে?

'ব্রাহ্মসমাজের দুর্গতি হল কেন? কারণ ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের সম্মানের চেয়ে মানুষের সম্মান ও মানুষের প্রতি ভালোবাসাই বেশি হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত সাধু ভক্তের কাছে মাথা নত করব, কিন্তু ঈশ্বরের সিংহাসনে কাউকে বসতে দেব না। ঈশ্বরের রাজত্ব বিস্তৃত হোক। ব্রাহ্মসমাজে শান্তিসদ্ভাব বিস্তৃত হোক।'

বিজয়ের সঙ্গে অঘোর গুপ্ত এসে হাত মেলাল। প্রগাঢ় বৈরাগ্যে প্রেরিত হয়ে দুই বন্ধু লাগল ধর্মপ্রচারে।

মেছুয়াবাজার রোড ধরে যাচ্ছে, একদিন বিজয় দেখল সামনেই এক সৌম্যোজ্জ্বল

সন্ন্যাসী। নমস্কার করল বিজয়। সাধু তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করল। সেই স্পর্শে বিজয়ের দেহ মন স্নিগ্ধ হয়ে গেল। ব্রাহ্মসমাজের কথা উঠল। ধর্মান্দোলনের কথা। নতুন যে এক অভ্যুত্থান হবে বাংলা দেশে তারই আশ্বাসের আভাস।

একদিন আসুন না আমাদের সমাজমন্দিরে। দেখুন না কেমন কী হচ্ছে?

বেদীতে বসে উপাসনা করছে বিজয়, একদিন দেখতে পেল, এক কোণে সেই সাধু বসে। একমনে শুনছে উপদেশ। মুখে বিনম্র আবিষ্টতা।

'কেমন লাগল উপাসনা?' সভাশেষে সাধুকে জিগগেস করল বিজয়।

'চমৎকার। সব তো শাস্ত্রের কথা।' বললে সাধু।

'শাস্ত্রের সঙ্গে সমতা রেখে, তাকে অতিক্রম না করে বলাই তো ভাল।'

'ঠিক। শাস্ত্রের মর্যাদা কখনো লঙ্ঘন করা উচিত নয়।' সমর্থন করল সাধু।

'কিন্তু, সাধুজী, শাস্ত্রীয় জ্ঞানে কিছু হচ্ছে না, যাচ্ছে না প্রাণের অশান্তি।' বিজয়ের স্বরে বুঝি কাতরতা ফুটে উঠল: 'এই অভাব এই শুষ্কতা কী করে যাবে? কবে, কোথায় পাব সেই স্থির নিরাপদ ভূমি?'

সাধু কিছুক্ষণ চুপ করে কী ভাবল। জিগগেস করল, 'তোমার গুরু হয়েছে?'

'আমি গুরুবাদ মানিনা।' বিজয় বললে গম্ভীর হয়ে।

সাধু হাসল। 'তুমি এত শাস্ত্র জান আর এই সার কথাটাই খেয়াল করোনি। যে অদীক্ষিত তার সমস্ত পণ্ডশ্রম। কর্ণধার ছাড়া সংসারসাগর পার হবে কী করে?'

'তা হলে আপনিই আমার গুরু হোন।' বিজয় ব্যাকুল স্বরে বললে, 'আপনিই আমাকে দীক্ষা দিন।'

'না, না, আমি তোমার গুরু হব না। তোমার গুরু আসছেন। কাল পরিপক্ব হলেই তিনি উপস্থিত হবেন।' উদার আশ্বাসে বললে সাধু: 'দীক্ষা দিয়ে তোমাকে পূর্ণ করবেন।'

'কাল পরিপক্ব হবে কবে?'

'যখন অন্তরে দৈন্য আসবে। অহংকার ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।'

'ধূলিসাৎ হয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ, সকলের পদধূলি নিতে-নিতেই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।' সাধু বললে, 'বিচলিত হয়ো না। প্রতীক্ষা করো।'

'ধৈর্যই ধর্ম, ধৈর্যই মানুষের মনুষ্যত্ব।' বলছেন গোস্বামী-প্রভু, 'চঞ্চলতাই অশান্তি। সকল বিষয়ে ধৈর্য অবলম্বন করাই সাধন। আগুন সর্ব অবস্থাতেই উত্তপ্ত, তেমনি যে ধার্মিক সে সর্ব অবস্থাতেই ধীর, নম্র, সমবুদ্ধি। বিপদে সম্পদে, নিন্দায় প্রশংসায়, দুই অবস্থাতেই পরীক্ষা হয় মানুষের সত্যি ধর্মলাভ হয়েছে কিনা। যদি দুই অবস্থাতেই সে অচঞ্চল থাকতে পারে, তার বিনয় ও সমতার ভাবান্তর না হয়, তা হলেই বুঝবে তার ধর্মলাভ হয়েছে।' আবার বলছেন, 'ধর্ম কি অমনি সহজ জিনিস? অভিমানশূন্য হতে হবে। গাছের যেমন বীজ না পচলে অঙ্কুর বার হয় না তেমনি মানুষের অভিমানটি একেবারে বিনষ্ট না হলে ধর্মের অঙ্কুর গজায় না। অভিমান যতকাল আছে ততকাল ধর্মের নামগন্ধও নেই। আসল কথা, জীয়ন্তে মৃত হতে হবে।'

কিন্তু কোথায় সদগুরু? দেশে বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করছে বিজয়, কিন্তু সব সময়ে উদগ্রীব হয়ে রয়েছে কোথায় সেই ভাবার্ণবের নাবিক?

প্রথমে কর্তাভজাদের দলে গিয়ে ভিড়ল। ওদের দলপতি জগচ্চন্দ্র গুপ্তের কাছে দীক্ষা নিল। ওদের করবার মধ্যে এক কর্ম, তা হচ্ছে প্রাণায়াম। প্রাণায়ামে তো শরীরের উন্নতি কিন্তু অন্তরবস্তু কই ?

কর্তাভজাদের ছেড়ে গেল এবার অঘোরপন্থীদের আস্তানায়। এদের ছেড়ে ধরল কাপালিকদের। হীনাচারের বীভৎসতায়ই বা চিত্তের প্রসন্নতা কই ? বাউল রামাইত দরবেশ ফকির বৌদ্ধলামা একে একে সকলের দ্বারস্থ হল, কিন্তু কোথায় সেই পারাপারের মাঝি, কোথায় বা সেই তাপহরণ ঔষধের সন্ধান ? ঘুরতে-ঘুরতে এসেছে বিজয়। আছে সাহেবগঞ্জে। অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল বিজয়। যেন বিরাট এক নদীর পারে বসে আছে। কত শত লোক পার হচ্ছে নৌকোয়, কেউ তাকে ডাকছে না, ফিরেও তাকাচ্ছে না। হঠাৎ কে একজন এসে তাকে নৌকোয় তুলে নিয়ে এল ওপারে। ওপারে কতগুলো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা। তারা তাকে এক বাগানে নিয়ে গেল। বিচিত্র ফুল ফুটে আছে চারপাশে। ফুলগুলো একত্র হয়ে নিমেষে স্ত্রীরূপ ধারণ করল। বললে, 'তোমার হৃদয়নাথকে অন্বেষণ কর।'

কোথায় হৃদয়নাথ ? উন্মনা হয়ে চারদিকে খুঁজছে, হঠাৎ একটা কুকুর ছুটে এসে বললে, 'এই ফল খাও।' ফল খেল বিজয়। কুকুর চলে গিয়ে এল এক জটাজুটধারী ঋষি। বললে, 'হাত ধরো।' হাত ধরতেই সে বিজয়কে নিয়ে আকাশে উঠতে লাগল, গ্রহ-তারা অতিক্রম করে, ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বলোকে। ক্রমশ নিয়ে গেল এক জ্যোতির্ময় ধামে। দেখল সেখানে আরো সব ঋষি বসে আছে। একজন জিগগেস করল, 'তুমি কে ?' বিজয় বললে, 'পৃথিবীতে গঙ্গাতীরে শান্তিপুর নামে এক জনপদ আছে। সেইখানে অদ্বৈত আচার্য নামে এক সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। আমি অকিঞ্চন নরাধম সেই কুলেই জন্মগ্রহণ করেছি।' 'এখানে এসেছ কেন ?' 'ভগবানকে দেখতে। ওঁকে দেখবার লালসায় মনপ্রাণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।'

'বৎস ধৈর্য ধরো। তিষ্ঠ। দেখবে সেই দুর্নিরীক্ষ্যদর্শনকে।' বলে ঋষিরা সমস্বরে স্তোত্র পাঠ করতে লাগল। পাঠ করতে-করতে নাচতে লাগল। ভগবান প্রকাশিত হলেন। অত শোভা সৌন্দর্য বুঝি কল্পনায়ও আনা যায় না। বিজয় মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

জ্ঞান পেয়ে দেখল সেই বাগানে পড়ে আছে। কাঁদতে কাঁদতে ছুটতে লাগল। কেন আমি মূর্ছা গেলাম ? কেন প্রভুকে দেখলাম না চোখ ভরে ? কোথায় তিনি ? তাঁকে না দেখে বাঁচব কী করে ? কেন সেই জ্যোতির্ধামেই আমার প্রাণ গেল না ? কোথায়, কোথায় আমার সেই দয়িত দয়ানিধি, আমার করুণাঘন কমলনয়ন ? কে একজন বললে আকাশ থেকে : 'বৎস, স্থির হও। প্রভুর চরণ ধ্যান করো। তোমার আশা পূর্ণ হবে।'

আরো একটা স্বপ্ন দেখল বিজয়। কোথায় ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসব হচ্ছে। সাধারণ সমাজের লোকদের নিমন্ত্রণ হয়নি। বিজয় চলে যাচ্ছে, কতগুলো লোক তার পথ আটকাল। কে বললে, এ ব্রহ্মজ্ঞানী। বীরবেশী এক পন্ডিত এগিয়ে এসে বিজয়ের একটা দাঁত ভেঙে দিল। জিগগেস করলে, 'আমাকে চেন ?' 'আজ্ঞে না।' 'আমি বীর হনুমান। এখানে এসেছ কেন ?' 'আমি যে ব্রহ্মজ্ঞানী।' 'ব্রহ্মজ্ঞানী তো আমিই।' হনুমান বললে, 'আমি কি রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রকে পুজো করি নাকি ? আমি সেই আত্মারাম পরব্রহ্মেরই পুজো করি। দেখবে ?' বুক চিরে ফেলল হনুমান। বিজয় দেখল পঞ্জরের অস্থিতে, মাংসে, সোনার অক্ষরে ওঁ রাম লেখা।

বিজয় প্রণাম করে বললে, 'আমায় কিছু উপদেশ দিন।' হনুমান বললে, 'চলো, তোমাকে যোগদীক্ষা দেব।' বলে বৃক্ষতলে এক কুটিরে নিয়ে গেল। বললে, 'ইচ্ছে করলে এক মুহূর্তে এই কুটিরের জায়গায় একটা অট্টালিকা তৈরি করতে পারি। প্রয়োজন থাকে তো বলো।' 'না, প্রয়োজন নেই।' 'তবে এই কুটিরে প্রবেশ করো, তোমার তপস্যা হবে।' কুটিরে প্রবেশ করল দুজনে। হনুমান বললে, "ওঁ তৎসৎ ওঁ রামঃ" 'এই নাম জপ করো, এই নামের ভাব ধ্যান করো। মন্ত্রসাধনের পর আমি আবার আসব।'

অনেকদিন কেটে গেল। হনুমান এসে বললে, 'তুমি সিদ্ধ হয়েছ। তোমার শরীরের লোমকূপ দিয়ে আনন্দস্রোত বয়ে যাচ্ছে। নয়নে প্রেমাশ্রু ঝরছে। কী, আত্মা পূর্ণ হয়েছে তো?' 'হয়েছে।' 'তবে অন্য সাধনের উপদেশ নাও।' বিজয় বললে, 'অন্য সাধন আবার কী!' হনুমান বললে, 'ব্রহ্মে প্রবেশ। আর এরই নাম সন্ন্যাস।' বিজয় আপত্তি জানাল। বললে, 'ব্রাহ্মধর্মে সংসারত্যাগ নিষিদ্ধ। তা ছাড়া প্রচারের কাজে আমি বেরিয়েছি, দেশে ধর্মের বড় অভাব।' 'বেশ, তবে দেশে আনন্দধর্ম প্রচার করো, তাতেই ব্রহ্মের বিস্তার হবে। পরে না হয় ব্রহ্মে প্রবেশ করবে। এস এখন আমরা সংকীর্তন করি।'

সর্বশরীরে ওঁ রাম, হনুমান, বিরাট বানরদেহ ধারণ করে দুই বাহু ঊর্ধ্বে বিস্তার করে নাচতে লাগল। বললে, 'আমার বানরদেহের মূল কী জান?' 'না।' 'আমার মুখখানা ওঁ। অই [illegible] পুরুষ, আর পুচ্ছ প্রকৃতি। এই পুচ্ছ দিয়েই রাবণের সর্বনাশ করেছি। সাধন করে ব্রহ্মে প্রবেশ করলে তুমিও পুরুষ-প্রকৃতি হয়ে যাবে।'

দেবতারা এসে কীর্তনে যোগ দিল। সহসা এক অপরূপ জ্যোতি প্রকাশিত হল কুটিরে। জ্যোতির মধ্যে লুটোতে লাগল বিজয়। হনুমান জিগগেস করলে, 'কী করছ?' 'গায়ে জ্যোতি মাখছি।' 'খুব মাখো। ও ব্রহ্মজ্যোতি। খানিকটা কাপড়েও বেঁধে নাও।' বিজয় বললে, 'নিরাকারকে কী করে বাঁধব?' 'এ জড় কাপড় নয়, হৃদয় কাপড়।'

কিছুক্ষণ কীর্তনের পর দেবতারা বিদায় নিল। জ্যোতির্ময় ব্রহ্মও অন্তর্হিত হলেন। 'এখানে রোজ এরকম হয়।' বললে হনুমান, 'এতদিনে তুমি তপস্যামগ্ন ছিলে তাই জানতে পারনি।' 'আমার খুব ইচ্ছে এখানে থাকি। কিন্তু থাকবার উপায় নেই। কেশব সেন ব্রাহ্মসমাজের খুব অনিষ্ট করছে, তার প্রতিরোধে আমাকে যেতে হবে।' 'কেশব ভুল করছে। আমি যদি ব্রহ্মে প্রবেশ না করতাম তা হলে তাকে সংশোধন করে আসতাম। মহাভারত পড়েছ? কেমন নষ্ট করেছিলাম ভীমের অহংকার, মনে আছে?'

'আমি তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করব?' জিগগেস করল বিজয়।

'অসত্যের সঙ্গে সংগ্রাম করো কিন্তু কেশবকে ভালবাসো। শুধু প্রেম করো, প্রেম করো। প্রেম —প্রেম ছাড়া কিছু নেই।'

ঘুম ভেঙে গেল বিজয়ের।

বিন্ধ্যাচলে, তিব্বতে, হিমালয়ে, স্থানে অস্থানে, গুরুর সন্ধানে ফিরতে লাগল বিজয়। কবীরপন্থী, দাউদপন্থী, গোরখপন্থী, সুন্দরপন্থী সব পথে ধাওয়া করলে। সকলের মুখেই এককথা, আমরা কেউ নই, গুরু তোমার অন্যত্র ঠিক আছে, সময়ে পাবে। কোথায় সেই গুরু? কোথায় চাতক পাখির ফটিক জল?

'স্বপ্নে দেবদর্শন যদি প্রকৃত হয়', বলছেন গোঁসাইজি, 'বিষয়াসক্তি দূর হয়ে যায়। মনে হয় আমি ধন্য, আমি উদ্ধার পেয়ে গেছি, আমার আর ভয় নেই। যদি এমন ভাব না জাগে, জানবে স্বপ্নও অবাস্তব।'

'কলিতে সাক্ষাৎ দর্শন ও সিদ্ধিলাভ একই কথা। এজন্যেই স্বপ্নে দর্শন দিয়ে থাকেন। স্বপ্নেই চরিত্রের পরীক্ষা হয়। যদি দেখ প্রলোভনে পড়েও মন স্থির আছে, বুঝবে দৃঢ়ভূমিতে এসেছ আর যদি চাঞ্চল্য জাগে, বুঝবে ভিতরের দুর্বলতা জয় করতে পারনি। গুরু বা দেবতা সম্পর্কে যে স্বপ্ন দেখা যায়, সন্দেহ করবে না, তা সত্য বলে জানবে। স্বপ্নের মধ্যে যদি অসংলগ্নও কিছু মনে হয়, জানবে তারও তাৎপর্য আছে। ভালো স্বপ্ন দেখা মহাসৌভাগ্যের বস্তু। বহুকাল সাধন ভজন করে যে অবস্থা আয়ত্ত করা কঠিন তা কখনো কখনো এক মিনিটের স্বপ্নে লাভ হয়ে যায়। আমি যখন ডাক্তারি করতাম, তখন রোগ শক্ত দেখলে পরলোকগত দুর্গাচরণ বাঁড়ুয্যে আমাকে স্বপ্নে ওষুধ বলে দিতেন। তাতে রুগীর অব্যর্থ উপকার হত।'

তৈলঙ্গ স্বামীর কথা বলুন।

'বিশ্বাস বনযায়।' এই বলেছিল বিজয়কে। বলেছিল, 'তোর গুরু নির্দিষ্ট আছে, যথাকালে তার দেখা পাবি।'

দীক্ষা লাভের পর তৈলঙ্গর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হল বিজয়ের। হাতের তেলোতে লিখে তৈলঙ্গ জিগগেস করলে, ইয়াদ হ্যায় ?'

কী রে, ঠিক বলিনি ? তাকাল চোখের মধ্যে।

ক্রমে ক্রমে অজগরব্রত নিয়ে সমস্ত ছাড়ল তৈলঙ্গ। একস্থানে বসে থাকে, নড়ে না চড়ে না, কোন রকম ইঙ্গিতও করে না। জীবন্ত শিব মনে করে সবাই তার মাথায় দুধ আর গঙ্গাজল ঢালে। হুঁ-হাঁও করে না। রাত চারটে থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত পৌষ মাসের শীতেও জল ঢালার বিরাম নেই।

দেহের ধর্ম, দেহ পচে গেল। একভাবে নির্বিকার অবস্থায় থেকে দেহ ছেড়ে দিল তৈলঙ্গ। গঙ্গায় তার জলসমাধি হল।

১১

ধর্মের ভিত্তি কোথায় ? নিশ্চিন্ত হবার উপায় কী ? সম্পূর্ণ নিরাপদভূমি কি কোথাও নেই ?

নিরন্তর এ জিজ্ঞাসায় ছিন্নভিন্ন হচ্ছে বিজয়। সমাধান ঠিক বার করে ফেলল। ব্রহ্মলাভ ও দিনযামিনী তাঁর সহবাস ছাড়া অন্য উপায় নেই। তাঁর সঙ্গে সমস্ত প্রাণের যোগ ছাড়া এই মহাব্যাধির ওষুধ নেই কোনোখানে।

ওষুধের খোঁজে নানা জায়গায় ঘুরতে লাগল বিজয়। ঘুরতে-ঘুরতে বিন্ধ্যাচল চলে এসেছে। খবর পেয়েছে একজন মহাপুরুষ আছেন এ অঞ্চলে, তিনি খাইয়ে দিতে পারেন ওষুধ। কিন্তু কোথায় সেই মহাপুরুষ ? খুঁজতে খুঁজতে ঢুকে পড়েছে এক বনের মধ্যে। ভাঙা পুরনো একটা বাড়ি দেখতে পেয়ে এগুলো বিজয়। পরিত্যক্ত, মানুষ বসতির চিহ্ন নেই। ঠিক করল এইখানে, এই মহারণ্যের নির্জনেই রাত কাটাবে। গভীর রাতে সেই পোড়ো বাড়িতে একদল ডাকাত এসে উপস্থিত হল। ডাকাতি করতে নয়, লুট-করা সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করতে। কিন্তু এ কী উৎপাত! এই লোকটা এখানে এল কী করে ? দেখলে সাধু-টাধু বলে মনে হয়, কিন্তু কে জানে কী আসল মতলব ? এই, ওঠ। শালা, ভাগ এখান থেকে।

বিজয়কে তাড়িয়ে দিল ডাকাতেরা। জিনিসপত্র ভাগ বাঁটোয়ারা করবে কী, ডাকাতদের ভাবনা ধরল। লোকটা যদি পুলিশকে গিয়ে খবর দেয়। যদি দেখিয়ে দেয় আমাদের আড্ডা। যদি আমাদের ও সনাক্ত করে!

'ওকে কেটে ফেল।' ডাকাতেরা হুঙ্কার করে উঠল।

দলপতি বুঝি চাইল বাধা দিতে। সাধুকে হত্যা করলে বিপরীত কিছু না ঘটে বসে। দলপতির কথা কেউ গ্রাহ্য করল না। বিপদ এড়াতে হলে সাধুকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াই উচিত। দুজন ডাকাত খোলা তলোয়ার নিয়ে এগুলো সাধুর সন্ধানে। দূরে ঝোপজঙ্গলের পাশে ঐ বুঝি বসে আছে। কিছুদূর এগিয়েই ডাকাতেরা থমকে দাঁড়াল। সাধুর মুখোমুখি একটা বাঘ বসে আছে। কী ভয়ঙ্কর! সাধু যেমন নিশ্চল বাঘও তেমনি নিশ্চল। দরকার নেই সামনে থেকে আক্রমণ করে। ঘুরে যাই, পিছন দিক থেকেই কোপ বসাব। ডাকাতেরা ঘুরে পিছন দিকে হাজির হল। কী সর্বনাশ, সেখানেও একটা বাঘ বসে। সাধুকে রক্ষা করবার জন্যে যেন দুই দুর্দান্ত প্রহরী মোতায়েন।

ফিরে গেল ডাকাতেরা। দলপতিকে বললে, মারতে পারলাম না।

কে কাকে মারে। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি শুরু হল, ধসে পড়ল ডাকাতে আড্ডার ছাদ। দলপতি ছাড়া বাকি কজন ডাকাত প্রাণ হারাল।

বহুক্ষণ পরে, কোথায় বজ্রবিদ্যুৎ, গগনের হাসি চাঁদ উঠল। ইতিমধ্যে কোথায় কী হয়ে গেছে বিজয় বিন্দুবিসর্গও টের পেল না, ঘাসের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে রইল। ভোরে উঠে শুনল কোথায় যেন মঙ্গল আরতির বাজনা বাজছে। বাজনা লক্ষ্য করে চলতে-চলতে পৌঁছুল এসে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে।

ডাকাতদের দলপতি খুঁজতে-খুঁজতে চলে এসেছে। এই সেই সাধু, চিনতে পেরেছে বিজয়কে। চিনতে পেরেই কাঁদতে-কাঁদতে পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বিজয় তো হতবাক। তখন সমস্ত বৃত্তান্ত বললে সর্দার। 'সাধুজী, বহুৎ গুণা হুয়া, মাপ কিজিয়ে।'

যে অহিংসক তাকে কেউ হিংসে করে না।

'পড়েছ তো মহাভারত? তাতে কী লিখেছে?' বলছেন গোঁসাই-প্রভু, 'লিখেছে যাদের ভেতরে হিংসে নেই তাদের বাইরেও হিংসে নেই। হিংস্রজন্তুরাও তাদেরকে গাছ-পাথরের মতোই মনে করে।'

একটা ঘটনা বলি শোনো। এণ্ডারসন সাহেবকে চিনতে তো? হাতিখেদার সাহেব। হাতিতে চড়ে গারোপাহাড়ের জঙ্গলে শিকার করতে গেছে। নিবিড় বন, এণ্ডারসন একা। ভারি বাতাসে বাঘের গন্ধ পাওয়া গেল। হাতি ভয় পেয়ে হাওদা থেকে এণ্ডারসনকে ফেলে দিয়ে ছুটে দিল। বাঘ একেবারে এণ্ডারসনের চোখের সামনে। বাঘকে লক্ষ্য করে দু তিনবার গুলি ছুঁড়ল এণ্ডারসন। লক্ষ্য ব্যর্থ হল। বাঘ ধাওয়া করতেই এণ্ডারসন ছুট দিল, এখানে-ওখানে, নানান দিকে, কিন্তু সঙ্গ ছাড়বার পাত্র নয় বাঘ। উপায় কী! হঠাৎ এণ্ডারসন দেখতে পেল অদূরে এক উলঙ্গ সাধু চুপচাপ বসে আছে। আমাকে বাঁচাও, সাধুকে ধরে পড়ল এণ্ডারসন। কী হয়েছে? অত ছুটোছুটি করছ কেন?

'বাঘ!'

'বাঘ? তাতে কী?' সাধু একবিন্দু চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না। শান্ত স্বরে বললে, 'স্থির হয়ে বোস।'

'বসব কী, বাঘ যে আমাকে ধরে ফেলল।'

হাত নেড়ে বাঘকে অগ্রসর হতে বারণ করল সাধু। বললে, 'বৈঠ বাচ্ছা, আউর নাগিজ মৎ আও।'

আশ্চর্য, বাঘ থেমে পড়ল ; মুখে গোঁ-গোঁ শব্দ, লেজ নাড়তে লাগল। কতক্ষণ নিশ্চেষ্ট হয়ে থেকে চলে গেল একদিকে।

'বাঘ পেলে কোত্থেকে ?' এন্ডারসনের মুখের দিকে তাকাল সাধু।

'শিকার করতে চেয়েছিলাম।' বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল এন্ডারসন : 'সব গুলিই ব্যর্থ হল, বাঘ পালিয়ে গেল না। ক্রুদ্ধ হয়ে আমার পিছু নিল।'

'তা তো নেবেই। তুমি ওকে গুলি মারতে গেলে কেন ? তুমি কি বাঘ খাও ?'

'তা নয় '

'তোমার আমোদ হবে বলে তুমি তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে।' সাধু হাসল, 'কিন্তু সে যদি সুযোগ পায় সে একটু আমোদ করবে না ?'

'তাই তো ভাবছি। আপনাকে দেখে সে স্তব্ধ হয়ে গেল। আশ্চর্য, কী করে আপনি বনের বাঘকে বশ করলেন ?'

'কোনো মন্ত্রে-তন্ত্রে নয়, শুধু ভালোবেসে।' সাধু স্নিগ্ধস্বরে বললে, 'শুধু মনের থেকে হিংসাকে বিসর্জন দিয়ে। যতক্ষণ হিংসা ততক্ষণই প্রতিহিংসা। অন্যে তোমাকে হিংসা করে যেহেতু তোমার নিজের মনের মধ্যেই হিংসা আছে। হিংসাশূন্য হও, দেখবে সাপে বাঘেও কিছু করবে না।'

এন্ডারসনের কী হল কে জানে, কাতর হয়ে সাধুর আশ্রয় প্রার্থনা করল। সাধু তাকে দীক্ষা দিল, শিখিয়ে দিল ভজন সাধন। বাবুর্চি তুলে দিয়ে রাঁধুনে বামুন রাখল এন্ডারসন, নিরামিষ খেতে লাগল। এখন সে বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছে।

আর একবার গহন অরণ্যে পথ হারিয়েছিল বিজয়। পথশ্রমে দেহ অবসন্ন। একটা বৃক্ষের নিচে আশ্রয় নিয়েছে। হিংস্র পশুর গর্জন কানে আসছে, অন্ধকারে পথ দেখিয়ে কে নিয়ে যাবে বাইরে ? যা হবার হবে, নির্জন বনেই করবে রাত্রিযাপন। মাটির উপর ঘুমিয়ে থাকবে। হঠাৎ কোত্থেকে লাঠি হাতে একটা লোক এসে উপস্থিত, বলা নেই কওয়া নেই বিজয়ের পা টিপতে বসল।

'কে, কে তুমি ?'

লোকটা কোন উত্তর দিল না। বিজয় ছাড়িয়ে নিতে চাইলেও ছাড়ল না পা, আঁকড়ে রইল।

'এ কি, পাগল নাকি ?'

তবু লোকটা উচ্চবাচ্য করল না, পা টিপতে লাগল। ঘুমিয়ে পড়ল বিজয়। মাঝ-রাতে ঘুম ভেঙে গেল চেয়ে দেখল লোকটা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। পাহারা দিচ্ছে। ভোর হতেই ধড়মড় করে উঠে বসল বিজয়। কোথায়, কোথায় সেই প্রহরী ? কখন কোন দিকে চলে গিয়েছে কে জানে।

বিজয় তখন লাহোরে, হঠাৎ বাড়ি থেকে চিঠি এল তার মা স্বর্ণময়ী পাগল হয়ে গৃহত্যাগ করেছে। বিজয় অস্থির হয়ে উঠল। তখুনি ফিরে চলল বাড়ি। সন্দেহ কী, সংসারের জ্বালাযন্ত্রণায়ই মার এই উন্মাদ অবস্থা। দুঃখী দেখলেই তাঁর মন গলে, বাড়ির লোক কী খাবে না খাবে হিসেব না করেই সব খাদ্য-দ্রব্য বিলিয়ে দেন। কারু মুখ মলিন দেখলেই হল, স্বর্ণময়ীর কাছে এলেই তিনি তা সোনা করে দেবেন।

বাড়িতে এসে অনেক খোঁজাখুঁজি করল বিজয়, কিন্তু মার কোনো সন্ধান পেল না। ঘোষণা করে দিল যে মাকে এনে দিতে পারবে তাকে যাতায়াতের খরচ ও পঁচিশ টাকা পুরস্কার দেবে।

রাণাঘাটের পথে চলেছে বিজয়, শুনতে পেল রাস্তায় একজন আরেকজনকে বলছে, 'পাগলি কিন্তু অদ্ভুত, নক্ষত্রবেগে ছুটে চলে।'

'কোথায়, কোথায় সেই পাগলিকে দেখলে ?' ব্যাকুল হয়ে জিগগেস করল বিজয়।

বনগ্রামের কাছে কী একটা গ্রামের নাম করল। বিজয় চলল সেই গ্রামের দিকে। কানে এল রাস্তার কতগুলো কাঠুরে বলাবলি করছে 'কী অসম্ভব ব্যাপার, পাগলি বাঘের গায়ে শিয়র দিয়ে ঘুমুচ্ছে।'

'সত্যি ?' বিজয় থমকে দাঁড়াল।

'বনে কাঠ কাটতে গিয়ে নিজের চোখে দেখে এলাম। আপনি যান না ওদিকে, আপনিও নিজের চোখে দেখতে পাবেন।'

বনের মধ্যে গিয়ে সত্যি বিজয় দেখল, মা একটা বাঘের গায়ে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। বাঘ অনুগত ভৃত্যের মতো শান্ত হয়ে বসে আছে।

গ্রামে গিয়ে লোকজন নিয়ে এল বিজয়। দেখল মা উঠেছেন ঘুম থেকে। বাঘকে জিগগেস করছেন, 'বাঘ তুই কার ?'

বাঘ স্থির হয়ে রইল।

'বল, তুই কার ? আমার ? যদি আমার হোস, আমাকে পিঠে করে দিবিনি !' স্বরে অভিমান আনলেন স্বর্ণময়ী : 'বুঝেছি তুই আমার নোস। আমি উলঙ্গিনী কালী কিনা তাই তুই ভয় পাচ্ছিস। আমি যদি দুর্গা হতাম, দশভুজা হতাম, তাহলে তুই ঠিক আমাকে চড়াতিস।'

বাঘের এতটুকু হিংসা নেই, জ্বালা নেই, চাঞ্চল্য নেই।

'তুই এখানে থাক, তোর জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আসি।' বন থেকে বেরিয়ে এলেন স্বর্ণময়ী। বিজয় ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে পড়ল। চমকে উঠে জিগগেস করলেন, 'তুই কে ?'

বিজয় বললে, 'আমি আপনার দাস।'

'দাস কী রে ? দাস হওয়া কি সোজা কথা ?' স্বর্ণময়ী তাকালেন মুখের দিকে : 'আরে, তোকে যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।'

'আপনি তো ত্রিজগতে সকলকেই চেনেন।'

'না, না, সে চেনা নয়, তোকে কোথায় যেন একদিন দেখেছি।'

মাকে বারে-বারে প্রণাম করতে লাগল বিজয়।

কিছুক্ষণ পরে স্বর্ণময়ী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন। মনে হল যেন দেহ-জ্ঞান ফিরে আসছে। জিগগেস করলেন, 'এত দিন কোথায় ছিলি ?'

'লাহোরে।'

'তা তো জানি, এখানে এলি কবে ?'

'বাড়ি এসে দেখি তুমি নেই, তাই তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েছি।' বিজয় ছুটে গিয়ে তেল জোগাড় করে আনল, মার মাথায় মাখিয়ে দিল সস্নেহে, তারপর মাকে তিন-তিনবার স্নান করাল। নববস্ত্র পরিয়ে তুলসীতলায় আসন পেতে দিল। বললে, 'মা, আহ্নিক কর।'

স্বর্ণময়ী শুধোলেন, 'আহ্নিক কাকে বলে ?'

'আহ্নিক কি তোমার মনে নেই ? মা, আমি বলে দেব ?'

'বল তো।'

বাল্যকালে মা যে মন্ত্র দিয়েছিলেন, বিজয় তাই এখন মার কানে দান করল। ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলেন স্বর্ণময়ী।

সুস্থ হলে মাকে ঘোড়ার গাড়িতে করে শান্তিপুর নিয়ে এল বিজয়।

স্বর্ণময়ীর বাবা গৌরীপ্রসাদ। বহুদিন সন্তান হয় না, গ্রামে কোথায় এক সিদ্ধ ফকির এসেছে, একদিন তার কাছে গিয়ে বর চাইলেন।

ফকির বললে, 'সন্তান হবে, কিন্তু দ্বিতীয় সন্তান আমাকে দান করবে বলো।'

'দেব।'

দ্বিতীয় সন্তান এই মেয়ে, স্বর্ণময়ী। কিন্তু মুসলমান ফকিরকে মেয়ে দেব কী করে ? প্রতিশ্রুতি রাখলেন না গৌরীপ্রসাদ। ফকির ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিল : 'এ মেয়ে তোমার স্ববশে থাকবে না, উন্মাদিনী হয়ে যাবে।'

'মার প্রাণে যেরূপ দয়া তার এক আনাও আমার নেই।' বলছেন গোস্বামী প্রভু 'ছেলেবেলায় দেখেছি, ঝিয়ের ছেলেটিকে মা আমাদের সঙ্গে বসিয়ে প্রত্যহ খাওয়াচ্ছেন। তারও ঠিক আসন ছিল আমাদের মতো। থালা বাটি গ্লাশ আমাদেরই মতো মা তাকে কিনে দিয়েছিলেন। কোনোরকম আলাদা মনে করতেন না। আমাদের যেমন ধুতি চাদর জামা জুতো, তারও।'

'ওরে বিজয়, নে, পেরনাম কর।' শ্যামবাজারে থাকতে স্বর্ণময়ী ভোরে উঠে গঙ্গা-স্নানে বেরবারে আগে ডাকছেন ছেলেকে, 'ভোর হয়েছে দেখছিস না ?'

মাকে প্রণাম করে কাচ শিশুর মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন প্রভু।

'ঠাকুমার দিকে আপনি ওভাবে চেয়ে থাকেন কেন ?' কে এক জন জিগগেস করল, 'আপনার ওরকম চাউনি দেখে আমাদের ভেতরে কেমন যেন করে ওঠে।'

'মা যখন এসে দাঁড়ান', বললেন গোস্বামী-প্রভু, 'দেখতে পাই মার প্রতি রোমকূপে ব্রহ্মজ্যোতি ফুটে বেরুচ্ছে।'

১২

মানবশরীর স্বর্গবাসী দেবতাদেরও লোভনীয়। জ্ঞান আর ভক্তি শুধু মানবদেহেই সম্ভব। এ মানবদেহই ভবার্ণব পার হবার তরণী। কিন্তু কর্ণধার কে ? কর্ণধার গুরু। আর বাতাস ? ঈশ্বরের করুণাই বাতাস, বাতাসের আনুকূল্য।

যে মানুষ গুরুহীন এবং সেই কারণে উত্তরণে অসমর্থ, সে আত্মঘাতী।

ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শশিভূষণ বসুকে সঙ্গে নিয়ে বিজয় এসেছে মধুপুরে। প্রত্যহ চলছে উপাসনা, বক্তৃতা, কীর্তন। কিন্তু সব সময়েই লোকসংঘট্ট ভাল নয়। তাই বিজয় মাঝে মাঝে চলে যাচ্ছে জঙ্গলে, আত্মীয়তম স্তব্ধতায়, নিবিড়তম নিঃসঙ্গে। রাত হয়ে গেলেও বাড়ি ফিরতে মন চায় না। মনে হয় বাড়িতে যিনি আছেন তিনি যেন বনে-নির্জনে বেশি করে আছেন।

মধুপুর থেকে গিরিডি হয়ে চলে এল পচম্বায়। তিনকড়ি বসুর অতিথি হল। সেখানে পাঠ আর ব্যাখ্যা করে চলল তুলসীদাসী রামায়ণের আর গ্রন্থসাহেবের। যে

একবার শোনে সেই লেগে থাকে, আর উঠতে চায় না। কালাকাল ভুলে যায়। হাতের কাজ উড়ে পালায় হাত থেকে।

সেখান থেকেই গয়া। নামজাদা উকিল গোবিন্দ রক্ষিত তত্ত্বাবধানের ভার নেয়। ব্রাহ্মসমাজের কাজ ভালো ভাবে চলবে তারই জন্যে বাড়ি নেওয়া হয় আলাদা। কিন্তু সমাজের কাজ আর হচ্ছে কই? বাড়ির ছাদে সারা সন্ধ্যা ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকলে প্রচার হবে কোত্থেকে? আর আলোচনা যা করে তা আর যাই হোক, ব্রাহ্ম আদর্শের সহযোগী নয়। আর, ঝানু উকিল গোবিন্দ, সে পর্যন্ত ওকালতিতে ইস্তফা দিতে বসেছে। আদালত থেকে মন কেড়ে নেয় এ কী ভীষণ মাদকতা। বিজয়ের থেকে প্রচারের আশা করা নিষ্ফল।

'আকাশগঙ্গায় যাবেন?' গোবিন্দই একদিন বললে।

'আকাশগঙ্গা?' নাম শুনে চমকাল বুঝি বিজয়।

'হ্যাঁ, পাহাড় আকাশগঙ্গা। বেশি দূরে নয়। যাবেন একদিন সেখানে?'

'সেখানে কী?'

'সেখানে এক সাধু থাকেন। রামায়েত বৈষ্ণব, নাম রঘুবর দাস। ভক্তিতে টইটম্বুর। একবার যাবেন দেখতে?'

'যাব।' ভক্তির নাম শুনেছে, বিজয় লাফিয়ে উঠল।

পরদিন সূর্যোদয়ে আকাশগঙ্গায় উপস্থিত হল বিজয়।

আকাশগঙ্গা নাম কেন? পাহাড়ে একটি প্রস্রবণ আছে, তারই নাম আকাশগঙ্গা, আর সেই নামেই পাহাড়ের নাম। পাথরের মধ্যে গাছের শেকড়ের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম শিরা আছে, তা দিয়েই জল টেনে এনেছে মাটির গহন থেকে। নইলে জল কখনো পাহাড়ের উঁচুতে উঠতে পারে? আকাশ থেকে গঙ্গা নেমে এসেছে এ জনপ্রবাদ ঠিক নয়। তবে গঙ্গার মতো এও যে বিষ্ণুর চরণ থেকেই উদ্ভূত তাতে সন্দেহ কী। পাহাড়ের উপরে মানুষের বসতি, সেখানে জল না থাকলে তারা বাঁচবে কি করে? তাই ভগবান দয়া করে পাথরের শিরা উপশিরা দিয়ে জল টেনে নিয়ে লোকালয়ের তৃষ্ণা নিবারণের ব্যবস্থা করেছেন। সর্বত্র ভগবানের দয়া, ভগবানের ব্যবস্থা। আর ভগবানের চরণস্পর্শই সমস্ত শীতলতা সমস্ত পবিত্রতার উৎস।

আশ্রমের দুয়ারে বাবাজি এগিয়ে এল।

বিজয় ছুটে গিয়ে বাবাজির পায়ে পড়ল। কাঁদতে-কাঁদতে বললে, 'বাবাজি, বলে দিন কেমন করে উদ্ধার হব?'

রঘুবর বিজয়কে দু'হাতে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল। বললে, 'এইছে সাধু হাম কভি নেহি দেখা। দয়াল রামজি তোমকো আলবৎ কৃপা করেগা।'

বিজয়ের সঙ্গে শশী আর গোবিন্দও এসেছে, আর গোবিন্দ নিয়ে এসেছে চাল-ডাল। নিজের হাতে রান্না করল রঘুবর। সবাইকে খাইয়ে সর্বশেষে নিজে খেল।

অপরাহ্নে রঘুবর বললে, 'সূক্ষযোনিতে চলুন। সেখানে চমৎকার এক সাধু আছেন।'

'চলুন।'

পাহাড়ে দূর থেকেই সাধু দেখতে পেয়েছে আগন্তুকদের। দেখতে পেয়েই ওদের উদ্দেশ্যে ছুটেছে। ছুটে এসেই জড়িয়ে ধরেছে বিজয়কে। আর বলতে শুরু করেছে, 'আনন্দে রহো, আনন্দে রহো।'

অনেক সি'ড়ি ভেঙে পাহাড়ের উপরে উঠল সকলে। নেমে এসে পথ দিয়ে চলতে-চলতে হঠাৎ এক জায়গায় থামল বিজয়। শশীকে বললে, 'জানো শশী, এইখানে, ঠিক এইখানেই মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্তি হয়েছিল। এইখানেই তিনি কৃষ্ণবিরহে উন্মাদ হয়ে কে'দেছিলেন—'

বলেই ডুকরে কে'দে উঠল : 'কৃষ্ণরে বাপরে, তুমি কোথায় ? কোনদিকে পালালে ?'

শশী স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল। এ কে কাঁদছে ? আরেকজনের কান্না দেখাতে গিয়ে নিজেই সেই আরেকজনের মতো কাঁদছে ? তবে এই একজন ও সেই আরেকজন কি এক—তাদের একই কাতরতা ?

'কৃষ্ণ বাপ আমার, জীবন-শ্রীহরি, তুমি আমার প্রাণ চুরি করে কোথায় অন্তর্হিত হলে ?'

সেই থেকে রোজ আকাশগঙ্গায় আসে বিজয়। শশীভূষণও সঙ্গ নেয়।

একদিন শশীকে বললে, 'শশী, আমি আজ সমস্ত রাত ভজন করব, তুমি আমার পাশে চুপটি করে ঘুমোও।'

গায়ের চাদর পাকিয়ে শশীর জন্যে বালিশ করে দিল বিজয়।

'কী, ভয় করবে নাকি ?'

শশী হাসল। বললে, তুমি পাশে থাকলে ভয় নেই।'

অরণ্যে পর্বতে কোথায় কে হিংস্র জন্তু গর্জন করছে, মাতৃপার্শ্বে পরিতৃপ্ত শিশুর মতো নির্ভয়ে ঘুমল শশী। আর খাড়া হয়ে বসে ধ্যানে বিজয় মগ্ন হয়ে রইল। ব্রাহ্মমুহূর্তে তুলল শশীকে। চলো, নির্ঝরের জলে স্নান করি। পরে গুহামুখে বসি উপাসনায়। করতাল বাজিয়ে ললিতকণ্ঠে গান ধরল বিজয় :

প্রভু হৃদিরঞ্জন মনোমোহনকারী।
ভগবজ্জন-প্রাণ-প্রাণ হৃদয়বিহারী ॥
তুমি প্রাণ-রমণ হৃদ-ভূষণ পাপহরণকারী।
আমার সাধ সতত হয় যে মনে ওরূপ নেহারি।
দরশন করি মোহ আঁধার নিবারি ॥
(সেদিন কবে বা হবে !)

দেখতে পেল একটা প্রকাণ্ড সাপ বিজয়ের উরু বেয়ে উঠছে উপরে। উঠুক। চঞ্চল হয়ো না। নিশ্চল থাকো। মনে যখন হিংসা নেই, যখন তুমি ভক্তিতে বিগলিত তখন বিষধরও নির্বিষ হয়ে যাবে।

আস্তে-আস্তে সাপ নেমে গেল গা থেকে।

'শশী, আমি আর কলকাতায় ফিরব না।' বললে বিজয়, 'তুমি একলাই ফিরে যাও।'

এমনি ধারা কথা বুঝি গৌরহরিও বলেছিল তার সঙ্গীদের। বলেছিল, 'তোমরা ঘরে ফিরে যাও। আমি আর ফিরব না। আমি আমার প্রাণেশ্বরকে দেখতে চললাম ব্রজধামে।'

ঠিক সেই কান্না সেই সুর। সেই উন্মাদনা।

একদিন শশীকে সঙ্গে করে বুদ্ধগয়ায় গেল। নিরঞ্জনার তীরে বুদ্ধচিন্তায় নিমগ্ন হলেন। সারাদিনে আর গৃহে ফেরার নাম নেই। আহার্য প্রস্তুত করে বসে আছে শশী, কিন্তু কী আহার্য পেয়েছে বিজয় যে দৈব ক্ষুধা বিস্মৃত হয়েছে।

রঘুবরকে যত দেখে ততই অবাক মানে বিজয়। ইষ্টে, রামচন্দ্রে, তার কী ঐকান্তিকতা। সাধনার বলে অনেক কর্তৃত্ব আয়ত্ত করেছে। ডাকলে ঝাঁক বেঁধে পাখিরা উড়ে আসে, কাঁধে বসে, ঠুকরে ঠুকরে জটা পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। সাপ গা বেয়ে উঠে আবার নেমে যায়, বাঘ দূরে মাথা নুইয়ে চুপ করে বসে থাকে।

মন্দ কী, এঁর থেকেই দীক্ষা নি।

'গুরু না পেলে কি ধর্মলাভ করা যায় না?' গোস্বামী-প্রভুকৃত 'আশাবতীর উপাখ্যান'-এর আশাবতী জিগগেস করল যোগীকে।

যোগী বললে, 'না মা, গুরু না পেলে ধর্মলাভ হয় না। ক-খ শিখতে গুরুর দরকার, অঙ্ক ভূগোল জ্যোতিষ শিখতে গুরুর দরকার, কৃষি বা বাণিজ্য শিখতেও গুরুর দরকার। গুরু ছাড়া রান্না বা গৃহকর্মও শেখা যায় না। শুধু ধর্মের বেলাই গুরুর দরকার হবে না এ বড় আশ্চর্যের কথা। যদি বলো ধর্ম আমার মধ্যেই আছে তা আবার কার কাছে শিখব? তেমনি ক-খও তো বইয়ের মধ্যে আছে, শিখে নিলেই হয়। অন্যকে তবে খোশামোদ করা কেন? বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে-খনিতে তো রোগের ওষুধ পড়ে আছে, তা শিখবার জন্যে কী দাক্তারের স্মরণ হও কেন? যদি পিপাসা পায়, পিপাসার্ত উন্তো-কোদাল নিয়ে বুনো খুঁড়তে বসে না, যেখানে জলাশয় আছে সেখানে পাত্র নিয়ে গিয়ে জল আহরণ করে। তেমনি জ্ঞানস্বরূপ ভগবান স্বয়ং গুরুশক্তি রূপে সর্বভূতে বিরাজ করছেন। সেখানে যেমনি প্রকাশ পাচ্ছেন সেখান থেকে তেমনি শিক্ষালাভ করতে হয়। যেখানে প্রেম ভক্তি বিশ্বাস রূপে প্রকাশমান সেখান থেকে প্রেম ভক্তি ও বিশ্বাস গ্রহণ করো। ধর্ম বাক্য নয়, মত নয়, দল নয়—ধর্ম স্বয়ং ভগবান, ভগবানের পরাশক্তি। যিনি এই পরাশক্তিকে দেখিয়ে দেন তিনিই গুরু। সকলের পদধূলি নিতে-নিতে অহঙ্কার নষ্ট হলে হৃদয় বিনীত হলেই গুরুদর্শন সম্ভব।'

ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের নিচেই গোড়ধোয়া। দ্বাপরে কৃষ্ণ এইখানে এক ক্ষুদ্র জলাশয়ে পা ধুয়েছিলেন বলে এই নাম। এইখানে প্রতি বৎসর স্থানীয় ব্রাহ্মরা চৈতন্যোৎসব করে। এবার বিজয় আছে আকাশগঙ্গায়, তার চেয়ে যোগ্যতর উপাসক আর কে আছে, তার ডাক পড়ল। উপাসনায় বসল বিজয়। কিন্তু কয়েকটি কথা বলতে না বলতেই তার কণ্ঠ ভাববিকারে রুদ্ধ হয়ে গেল। সকলে বিমূঢ় হয়ে গেল। ও কে বসেছে উপাসনায়? উপাসক, না স্বয়ং উপাস্য? বিজয় উঠে পড়ল। বললে, 'আপনারা কেউ বসে উপাসনা করুন। আমার পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠেছে।'

কিন্তু রঘুবর দাস তার গুরু নয়। প্রাণ বলছে এখানেই কাছাকাছি কোথাও তিনি আছেন। স্মরণে স্পষ্ট হচ্ছে, এ আশ্রম এ মন্দির সে স্বপ্নে দেখেছিল। হ্যাঁ, মন্দিরে ঐ মহাবীরের মূর্তি। মহাবীর তাকে হাত দিয়ে ইশারা করে জানিয়েছিল, আরো উপরে যাও, আরো উপরে।

আশ্রমে একজন ব্রহ্মচারী আছেন তার সঙ্গে হৃদ্যতা জন্মাতে দেরি হয়নি বিজয়ের। রঘুবর আছেন, একদিন ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা হচ্ছে, কটা রাখাল ছেলে এসে সংবাদ দিল, পাহাড়ের চূড়ায় এক সাধু বসে আছেন।

কে সাধু, ব্রহ্মচারীকে নিয়ে বিজয় চলল উপরে। সত্যিই তো মহিমময় মূর্তিতে আলো করে বসে আছেন। এমন দিব্যদীপ্তকান্তি আর কোনোদিন দেখিনি, তন্ময়ের মতো তাকিয়ে রইল বিজয়। ইচ্ছে হল প্রাণ ঢেলে দিয়ে প্রণাম করি। হাতের ইশারা করে সাধু

বললেন তাদের চলে যেতে। সাধুবাক্য লঙ্ঘন করা ঠিক নয়, ফিরে গেল দুজনে। কিন্তু বিজয়ের সাধ হল আরেকবার যাই। মনে হল, চলে এসেছে বটে কিন্তু মন সেই সাধুর কাছে ফেলে এসেছে।

পরদিন, রঘুবর আশ্রমে নেই, ব্রহ্মচারীও কোথাও বেরিয়ে গেছে, বিজয় সাধুর উদ্দেশে একা-একা যাত্রা করল। নিয়ত ঝড়বৃষ্টি শীততুষারের সঙ্গে সংগ্রাম করেন, কত দেশের কত রকম জল তাঁকে খেতে হয়, সাধুজী নিশ্চয়ই খুশী হবেন, কিছু গাঁজা নিয়ে গেল বিজয়।

'হিমালয়ের উপরে যে সকল যোগী মহাত্মা আছেন, নিয়তই তাঁদের ধুনিতে চায়ের জল চড়ানো থাকে।' বলছেন গোস্বামী-প্রভু, 'দশ কি পনেরো মিনিট অন্তর তাঁরা একটু-একটু চা খেয়ে থাকেন। সেই চা আমাদের চায়ের মতো নয়। ঐ চায়ের গাছ খুব বড় হয়। সাধুরা পাতা এনে শুকিয়ে রাখেন। পাতাগুলোও খুব বড়-বড়।'

জিগগেস করা হল: 'চায়ে কি সাধুরা দুধ দেন না?'

'খুব ভাল দুধ দেন।'

'ঐ পাহাড়ের ওপরে বরফের মধ্যে দুধ পান কী করে?'

'পালানে দুধ ভার হলেই পাহাড়ি গরুরা এক-একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দুধ ছেড়ে যায়। ঐ দুধ বরফময় প্রস্তরে পড়া মাত্রই জমাট হয়ে যায়। সাধুরা ঐ দুধ চিমটে দিয়ে খুঁড়ে নিয়ে আসেন। গরম জলে ফেললেই ভালো দুধ হয়। চায়েতে ওঁরা মিষ্টি দেন না যদিও, প্রয়োজন হলে তাও যোগাড় করতে পারেন অনায়াসে। আখের মতো মিষ্টি রসের লতা-পাতা পাহাড়ে বিস্তর জন্মায়, সাধুরা তার সন্ধান রাখেন।'

বিজয় সাধুর সামনে এসে দাঁড়াল। স্থির যোগাসনে বসে আছে সাধু। গায়ে গা থেকে জ্যোতি বেরুচ্ছে। মাথার চারদিকে জ্যোতির্মণ্ডল। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে কেন কে জানে, বিজয়ের দুচোখ বেয়ে নিরর্গল অশ্রু নেমে এল।

'আও বেটা আও।' সাধু বিজয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

বাবা যেমন সন্তানকে টেনে নেয় তেমনি সাধু বুকের মধ্যে টেনে নিল বিজয়কে। স্পর্শে শক্তি সঞ্চার করে দিয়ে দিল দীক্ষামন্ত্র। সর্বস্ব নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে বিজয় সাধুকে প্রণাম করল। আর প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে বিজয় চোখ মেলে দেখল, সাধু কোথাও নেই। কোথায় তুমি? সাড়া নেই শব্দ নেই পায়ের চিহ্নটুকু পর্যন্ত নেই। স্থান শূন্য কিন্তু প্রাণ পূর্ণ, টলতে-টলতে নামতে লাগল বিজয়। আশ্রমে মহাবীরজীর মূর্তির সামনে বাঁধানো আঙিনা। আঙিনার পুবে একটা বেলগাছ। তার নিচে আঙিনা থেকে কিছুটা উঁচুতে পরিষ্কার একখানি পাথর পাতা। ভাবোন্মত্ত অবস্থায় দুলতে-দুলতে এই পাথরের চটানের উপর এসে বসল বিজয়।

ব্রহ্মচারী জিগগেস করল 'কী হল?'

বলতে কী আর পারে, তবু তারপর মাতোয়ারা হয়ে বললে তার গুরুপ্রাপ্তির কথা।

'এতদিনে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।' বললে ব্রহ্মচারী, 'তুমি যোগেশ্বরের কৃপা লাভ করেছ।'

কিন্তু এ কী হল, বিজয়ের সমাধি ভাঙে না। পাথরের চটানের নিচে সুন্দর একটি গোফা, সেখানে সযত্নে রাখা হল বিজয়কে। রঘুবর নিজে নিয়ত কাছে থেকে বিজয়ের

দেহরক্ষা করতে লাগল। এগারো দিন এগারো রাত্রি কাটল এই অবিচ্ছেদ সমাধিতে। সমাধিভঙ্গের পর বিজয়ের শুরু হল চৈতন্যভাব। ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে মহাপ্রভুর যে ভাবোন্মাদ হয়েছিল এও সেই বিহ্বলতা। কোথায়, কোথায় আমার সেই আনন্দের আকর, আমার অভীষ্টপ্রদ ? হে অনাথবন্ধো, করুণৈকসিন্ধো, হা হন্ত, হা হন্ত কথং নয়ামি ? কী করে কাটবে আমার দিনরাত্রি ? বলো কী করে ?

'কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি ! কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল।'

পাহাড়ে পাহাড়ে সেই সাধুকে খুঁজে বেড়াতে লাগল বিজয়। অদর্শনে চিত্ত আর ধৈর্য মানতে চাইছে না। বিজয় ঠিক করল, এ প্রাণ দেব। ঠিক করল, পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে পড়ব মাটিতে। এ অধন্য জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ গুরুদেব, সেই জ্যোতির্ময় সাধু উপস্থিত হল। বিজয়ের হাত ধরে ফেলল। বললে, 'ঘাবড়াও মৎ। ভজন করো, বখত্‌মে সব মিল যায় গা !'

'কিন্তু আপনি কে ? আপনার পরিচয় দিন।'

সাধু হাসল। 'আমার পরিচয় ? শোনো।'

নাম ব্রহ্মানন্দ স্বামী। সকলে ডাকে পরমহংসজী বলে। পাঞ্জাবি ব্রাহ্মণ। সিপাই বিদ্রোহের সময় সন্ন্যাসী হয়। প্রথমে নানকপন্থী ছিল, পরে বৈদিক পন্থায় প্রবেশ করে সিদ্ধি লাভ করে। বাস করত মানস সরোবরে। বিজয়ের জন্যে চলে এসেছে আকাশগঙ্গায়।

'আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।'

'না, আমার সঙ্গে তোমার থাকা চলবে না। তোমাকে যে আনন্দ দিলুম তা তোমাকে ঘরে-ঘরে জনে-জনে বিতরণ করতে হবে।' বললে পরমহংস, 'তুমি অদ্বৈত সন্তান, আচার্যের ধারা তোমার রক্তে, তোমাকে দিয়েই এই কাজ ভালো হবে। যাও সাধন করো, ঠিক মিলে যাবে সিদ্ধি। আমার জন্যে কাতর হয়ো না। যখনই চাইবে তখনই আমার দেখা পাবে। আমি সব সময়ে আছি তোমার কাছে-কাছে।'

সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা, এ সম্পূর্ণ কৃপাসাপেক্ষ। বলছেন গোস্বামীপ্রভু। এ দীক্ষা যে কোনো অবস্থায় যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময়ে একমাত্র ভগবানের কৃপাতেই হয়ে থাকে। ভগবানই সদ্‌গুরু। ভগবানের পদাশ্রিত ভগবজ্জন মহাপুরুষেরাই সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরু কি শিষ্য করেন ? না। তিনি গুরু করেন। শিষ্যের মধ্যে নিজের ইষ্টকে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁরই সেবা-পূজা করেন। শিষ্যের দেহ তাঁর দেবমন্দির। দেবমন্দিরে কোনো রকম অপচার বা অনাচার দেখলে সেবক যেমন লজ্জিত হয়, সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতির জন্যে নিজেকেই অপরাধী মনে করে, তেমনি শিষ্যের কোনো দুর্দশা দেখলে গুরুও মলিন হয়ে যান, নিজেরই সেবাপূজায় ভ্রংশভ্রান্তি হয়েছে ভেবে নিজেকেই দোষী করেন। সেবক যেমন মন্দির সংস্কারে প্রবৃত্ত হয় তেমনি গুরুও ছোটেন শিষ্যের উদ্ধারণে। সদ্‌গুরুদত্ত নাম শুধু নাম নয়, শব্দ নয়, অক্ষর নয়, ধ্বনি নয়। এ নামে ভগবানের অনন্ত শক্তি। শিষ্যের মধ্যে এই শক্তিসঞ্চারই সদ্‌গুরুর দীক্ষা। এই দীক্ষা, ভগবানের কৃপায়, যদি একবারও কারু লাভ হয় তা হলে তার আর নিজের কিছুই করবার থাকে না। তার জীবনের সমস্ত কাজ—প্রত্যেকটি শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত সেই একজনেরই ইচ্ছাধীন হয়ে পড়ে। কুমুরে পোকার আরশুলা ধরার মতো সদ্‌গুরু শক্তি সঞ্চার করেন, দীক্ষা দিয়ে, শিষ্যকে ক্রমে-ক্রমে আত্মসাৎ করে নেন।

কী বলেছে শাস্ত্র ? বলেছে, দীক্ষাগ্রহণমাত্রেণ নরোনারায়ণো ভবেৎ।
সাধন করো। সাধন ছাড়া সাধ্যবস্তু পাবার নয়।

'সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য-সাধন তত্ত্ব জানিবে সে তবে।'

১৩

খুব ভোরে স্নান-পুজো সেরে আশাবতী আশ্রমের সাধুদের প্রণাম করল। প্রণাম করল যোগীকে। বললে, 'প্রভু, আগে আমি সাধুদের পদধূলির মাহাত্ম্য কিছু বুঝতাম না। এখন দেখছি আমার মতো পাপীর পক্ষে এ মহৌষধ। সময় সময় মন ভীষণ অবসন্ন হয়ে পড়ে, ভগবানের নামস্মরণেও উৎসাহ থাকে না। প্রাণের মধ্যে ঘোর জড়তা, হাসিও নেই কান্নাও নেই, গভীর অন্তর্দাহ—সে এক শোচনীয় অবস্থা। এই অবস্থায় মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করতে প্রবৃত্তি হয়, শুধু পাপভয়ে নিবৃত্ত থাকি। ভাবি, এই অন্তর্জ্বালার বুঝি কিছুতেই নিবারণ নেই। কিন্তু যখনই আপনার বা বাবাজীর চরণধূলি নিয়েছি, তখনই সকল জ্বালাযন্ত্রণার অবসান হয়েছে। প্রাণে জেগেছে গভীর প্রশান্তি, অব্যক্ত আনন্দোচ্ছ্বাস। প্রভু, আর কারু পায়ের ধুলো নিলে কি অমনি শান্তি হবে ?'

যোগীবর বললে, 'মা, তুমি যে ভক্তিপদরজের মাহাত্ম্য অনুভব করছ তার মানেই তোমার যোগশিক্ষার সময় সন্নিহিত। যতদিন অহংকার প্রবল থাকে ততদিন সাধুদের পদধূলির প্রতি ভক্তি হয় না। সাধু কে ? যাঁর নিকটবর্তী হলে হৃদয়স্থ ধর্মভাব প্রস্ফুটিত হয়, নিজের থেকেই চিত্তে শুভকামনা আসে, পাপপ্রবৃত্তিগুলি লজ্জিত হয়ে মুখ লুকোয়, তিনিই সাধু। তাঁর পদধূলি নিলেই উপকার। শুধু সাধুর পায়ের ধুলো বলে নয়, মানুষ মাত্রেরই পায়ের ধুলোর অনেক ফল। প্রত্যেক মানুষেই দীননাথ দীনবন্ধু বিরাজ করছেন। সুতরাং প্রত্যেক নরনারীই এক একটি দেবমন্দির। যার অন্তরে দেবভক্তি আছে, সে দেবমন্দির দেখলেই দণ্ডবৎ প্রণাম করে। একবার প্রণাম করলে আর সে লোভ ছাড়তে পারে না। আশাবতী, এই প্রণামের মাহাত্ম্য না বোঝা পর্যন্ত গুরুলাভ হয় না। সুতরাং তার ধর্মজীবনের সূচনাও হয় না।'

গয়া-ফল্গুর পরপারে রামগয়া। দীক্ষার কিছু পরে একদিন রামগয়ায় চলে এল বিজয়। এ কী ? এ জায়গায় কি আমি আগে একবার এসেছিলাম ?

'চলো আমরা রামগয়ায় যাই।' আশাবতীকে বললে যোগীবর। 'ফল্গু পার হয়ে ঐ যে পাহাড় দেখছ ওর নাম রামগয়া। রামগয়া নাম, যেহেতু ঐখানে রাম পিতৃশ্রাদ্ধ করেছিল। পাহাড়ের একটা গোফাতে এক সাধু থাকত, কেবল দুধ খেয়ে তপস্যা করত বলে নাম দুধাধারি বাবা। ঐ দেখ ওপারে শ্মশান। পাহাড়ের নিচে ঐ গুহায় সীতা দশরথের হাতে পিণ্ড দিচ্ছে। মাটির তলা থেকে হাত বেরিয়ে এসেছে দেখবে। আগে নৃসিংহ মন্দিরে যাই চলো।'

আশাবতী বিহ্বল চঞ্চল হয়ে উঠল। বললে, 'প্রভু, এ কি, আমার প্রাণ এমন করছে কেন ? আমি যেন এখানে ছিলাম।' একজন সন্ন্যাসীকে দেখে আরো অস্থির হয়ে উঠল : 'ওর মতো আরো তিনটি সাধু ছিল এখানে।'

সন্ন্যাসী চমকে উঠল : 'কী বললে ? তুমি এখানে ছিলে ? কই তোমাকে তো দেখিনি কখনো।'

'আর সেই তিনজন সাধু ?

'তারা তো এইখানে ছিল।'

'ছিল ?' আশাবতী ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করল সন্ন্যাসীকে। বললে, 'আপনাকে আমি এখানে অনেকবার দর্শন করেছি। চরণসেবা করে কৃতার্থ হয়েছি। ঐ বৃক্ষতলে আমার আসন ছিল। ঐ বৃক্ষের উত্তরের শাখায় আমার একটি চিহ্ন আছে।'

'চলো দেখি তো আছে কিনা।'

সকলে চিহ্ন দেখে অবাক।

'কিন্তু তুমি স্ত্রীলোক, তুমি এ আশ্রমে থাকবে কী করে ?' বললে সন্ন্যাসী, 'এ আশ্রমে স্ত্রীলোক থাকবার নিয়ম নেই। মনে হচ্ছে তোমার ভুল হচ্ছে। কোনো সময়ে তুমি স্বপ্ন দেখে থাকবে হয়তো। আজ তা সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করলে।'

যোগীবরও তাই বললে। 'আমারও তাই ধারণা। স্বপ্নদর্শনই সত্য হল।'

গুরুকৃপালাভের পর একটানা এগারো দিন একমনে সমাহিত হয়ে বসে ছিল বিজয়। তবে আগে কয়েকদিন কেটেছে প্রবল বৈরাগ্যে। কখনো অট্ট অট্ট হেসেছে, হুঙ্কার-গর্জন করেছে, কখনো বা কেঁদেছে নিদারুণ আর্তিতে। কখনো বা নামসুধারসে মগ্ন হয়ে রয়েছে। কিন্তু এ কী অবস্থা! বাহ্যজ্ঞানের লেশমাত্র নেই। আগে আগে দুধে বেলপাতা ভিজিয়ে মুখে কোনরকমে ঢুকিয়ে দিয়েছে বন্ধুরা, এখন স্নান নেই, আহার নেই, শয়ন নেই, নিদ্রা নেই, নেই এতটুকু আসনবিচ্যুতি।

সমাধি ভাঙবার পর বাহ্যজ্ঞান এলে কে একজন জিগগেস করলে, 'কোথায় ছিলেন ?'

'কী জানি কোথায়! সাধন করতে বসেছি, দেখলাম মা সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী এসেছেন।' বললে বিজয়, 'বলছেন, মায়ার ওপর পারে যেতে হলে পরীক্ষা দিতে হবে। আমি বললাম, আমি পরীক্ষার উপযুক্ত নই, আমায় দয়া করো। না, না, পরীক্ষা। মা শুধু পরীক্ষার কথাই বলতে লাগলেন। আমি শুধু কাতর প্রাণে কাঁদতে লাগলাম। মা প্রসন্ন হয়ে আমাকে কোলে করে আকাশপথে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে এক স্বর্গোজ্জ্বল দিব্যলোকে এসে উপস্থিত হলাম। সেই বুঝি মায়ার পার।'

'বরাবর' পাহাড়ে একজন মহাপুরুষ অবস্থান করছেন — বিজয়ের কাছে খবর এল। ব্রহ্মচারী বন্ধুকে বললে, চলো গিয়ে দেখে আসি।

পাহাড়ে মন্দির আছে, কিন্তু দুয়ারে যে দাঁড়িয়ে আছে, ঐ কি মহাপুরুষ ? সর্বাঙ্গে কালি মাখা, মুখমণ্ডলে সিঁদুর, কে ঐ ভয়ংকর ?

'আমি ভৈরব।' বললে সেই ভীমাকৃতি : 'আমি এ মন্দিরের প্রহরী। খবরদার, এগিয়ো না মারা পড়বে।'

ভৈরব অট্টহাস্য করে উঠল। সে হাসিতে পাহাড় কেঁপে উঠল। কিন্তু বিজয়ের ভয়-ডর নেই। যখন এসেছি তখন শেষ পর্যন্ত উপনীত হব।

বিজয় আর ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে লাগল ভৈরব।

তাতেও ওদের ভয় নেই। ওরা ভৈরবের স্তব শুরু করল। হে ভৈরব, ভূতনাথ, হে করাল, কালশমন, পিঙ্গললোচন, শূলপাণি, প্রসন্ন হও।

স্তবে শান্ত হল ভৈরব। ওরা এগিয়ে এসে ভৈরবের পদতলে লুটিয়ে পড়ল। বললে, 'দয়া করুন, আমাদের মহাপুরুষ দর্শন করান।'

'দর্শন হবে খন। আগে তোরা সুস্থ হ।' ভৈরব স্নিগ্ধ হল : 'তোদের ক্ষুধার্ত বলে মনে হচ্ছে। কিছু প্রসাদ খাবি।'

'আপনি যা করুণা করে দেবেন তাই প্রসাদ বলে মেনে নেব।' বললে বিজয়।

ভৈরব প্রসাদ এনে দিল। ধরল তাদের সামনে। বিজয় আর ব্রহ্মচারী দুজনেই শিউরে উঠল। এ যে দেখি নরমাংস।

বিনয় করে বিজয় বললে, 'আমরা যে আমিষ খাই না।'

হা-হা-হা করে হেসে উঠল ভৈরব। 'তবে অঘোরীদের আশ্রমে এসেছিস কেন ?'

'আমাদের আর পরীক্ষা করবেন না।' বিজয় অবনত হয়ে বললে, 'আমরা তোমার সন্তান, তোমার মতো শক্তি আমাদের কী করে হবে ? আমাদের মহাপুরুষ দর্শনে নিয়ে চলুন।'

'মহাপুরুষ না দেখলে তোদের চলছে না ? তবে আয় আমার সঙ্গে।'

সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম দিয়ে ভৈরব ওদের এক গুহার মধ্যে নিয়ে এল। সেখানে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে চার কোণে চারজন সাধু নির্বিচল সমাধিতে বসে আছে। কী স্থৈর্য, কী প্রশান্তি। সন্ধ্যাগমে সাধুদের সমাধিভঙ্গ হল। স্নানাদি সেরে বসল আসনে।

ভৈরব বললে, 'এরা আপনাদের দর্শন করতে এসেছে।'

সেটা যেন বড় কথা নয়, যিনি মহাপুরুষ, সকলের চেয়ে প্রদীপ্ত জিগগেস করলেন, 'এঁদের সেবা হয়েছে ?'

'মহাপ্রসাদ দিয়েছিলাম, নরমাংস বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।' বললে ভৈরব, 'কিঞ্চিৎ ফল মূল খেয়েছেন।'

'এ কী অন্যায়! এঁদের তুমি নরমাংস দিতে গেলে কেন ?' মহাপুরুষ রুষ্ট হলেন : 'তোমার অঘোর পন্থে এ চলে বলে ভিন্ন মার্গীদের তা দিতে হবে ? এ তো অতিথিকে অপমান করা।'

ভৈরবের ভঙ্গি কিছুমাত্র নরম হল না।

বিজয় জিগগেস করলে, 'নরমাংসাহার কি ধর্মের অঙ্গ ?'

'না, না, তা ধর্মের অঙ্গ হতে যাবে কেন ? রুচিভেদে নানা পথ নানা মত। যে যে-পথে যেতে চায় সে সেই পথের আচার ব্যবহার অবলম্বন করে, সেই পথের খাদ্য-পানীয়।' বললেন মহাপুরুষ, 'কোনো পথের খাদ্য ফল-দুধ, কোনো পথের বা অন্নব্যঞ্জন, আবার কোনো পথের বা মদ্য-মাংস। পথ দিয়ে কী হবে, মত দিয়ে কী হবে, আসল হচ্ছে গন্তব্যে পৌঁছুনো। গন্তব্যে পৌঁছুলে আর কোনো ভেদ নেই, ব্যবধান নেই। দেখ না আমরা এই চার সাধু', অন্যান্য সাধুদের লক্ষ্য করলেন মহাপুরুষ, 'আমাদের মধ্যে একজন রামাৎ, একজন কাপালী, একজন নানকী, আর আমি অঘোরপন্থী। আমাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র পথ, কারু সঙ্গে কারু মিল ছিল না। মিল ছিল না কী, ঘোরতর বিরোধ ছিল। কিন্তু আজ আমরা চারজনই ভিন্ন পথ ধরে একই গন্তব্যে একই সত্যগৃহে এসে পৌঁছেছি। আর আমাদের ভেদ-বিবাদ নেই, আজ আমাদের ঐকতান। আমরা সবাই আজ একবস্তু দেখছি, একবস্তু শুনছি—আজ আমাদের এক আস্বাদন আজ আর ফলমূলে আর নরমাংসে কোনো তফাৎ নেই। নেই কোনো ভেদবুদ্ধির ক্লেশ।'

মহাপুরুষ হাসলেন : 'যতক্ষণ লক্ষ্যে না পেঁছনো যায় ততক্ষণই দলাদলি, সম্প্রদায়, ততক্ষণই আমি-তুমি-ওরা-আমরা।'

কথা শুনে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। আসল হচ্ছে লক্ষ্যে পেঁছনো। আসল হচ্ছে স্থির হওয়া। স্থিতিই পরম গতি। শূন্যতাই পরম পূর্ণতা।

'শাস্ত্রে ভগবানলাভের ব্যবস্থা ও সাধন-প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কেন ?' একজন জিগগেস করল গোঁসাইজিকে।

গোস্বামী-প্রভু বললেন, 'শিশুর আহার একপ্রকার, বালকের একপ্রকার, যুবকের একপ্রকার, বৃদ্ধের একপ্রকার, আবার রোগীর একপ্রকার। প্রত্যেকে আপন আপন আহারে পুষ্টি লাভ করে। একজনের আহার অন্যজনকে দিলে জীবন নষ্ট হয়। সকলের এক নিয়মে হয় না। শরীরের প্রকৃতি, মানসিক প্রকৃতি আলাদা, সুতরাং বিধি-নিয়মও আলাদা।'

যে মহাপুরুষ দর্শন করে এলাম তাঁর নাম কী ? তাঁর নাম গম্ভীরানাথ বাবাজি। চল, গম্ভীরানাথকে দেখবে চল।

কুলদানন্দকে নিয়ে গোস্বামীপ্রভু গেলেন দর্শনে। গায়ে যেমন শীত লাগে তেমনি মহাপুরুষের প্রভাব কুলদার গায়ে লাগল। ভিতরের নাম চেষ্টার অপেক্ষা না করে ছুটে বেরুতে লাগল ফোয়ারার মতো। বাবাজিকে গোঁসাইজি প্রণাম করলেন সাষ্টাঙ্গে। শতচ্ছিদ্র একখানি মলিন কাপড়ের টুকরো বিছিয়ে দিলেন বাবাজি। তাতে বসলেন গোস্বামী-প্রভু। স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলেন বাবাজির দিকে। বাবাজিও রইলেন মৌনে।

কী তপোদীপ্ত শরীর। দীর্ঘ ঋজু শিখায়িত। প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাক, চোখ উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। অবিশ্রান্ত অশ্রুবর্ষণ হচ্ছে চোখ থেকে। কোমরে শুধু একখানি কালো রঙের কম্বল জড়ানো। শরীর একেবারে স্থির, নিক্তির কাঁটার মতো নিস্পন্দ। ছেঁড়া একখানা চাটাই ধুলো-বালি আর ধুনির ভস্মে মলিন, তার উপর বসে আছেন পরিতৃপ্তের মতো।

বললেন, 'এঁদের চা খাওয়াও।'

পেস্তা বাদাম আখরোট প্রভৃতি কাবুলি মেওয়া দিয়ে চা তৈরি হল। বাবাজি নিজে পরিবেশন করলেন। খেতে যেমন সুস্বাদু গুণেও তেমনি উত্তেজক। খাওয়ামাত্র শরীর আগুন হয়ে উঠল।

'ইনি কে ?' ফিরতি পথে জিগগেস করল কুলদা।

'ইনি নাথ যোগীদের মহান্ত। ঐশ্বর্যপথে অতি কঠোর সাধন করে সিদ্ধ হন, পরে মহাসিদ্ধ অবস্থা লাভ করেন।' বললেন গোস্বামী-প্রভু, 'হিমালয়ের নিচে এমন শক্তিশালী সাধু আর নেই। পলকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করতে পারেন। কিন্তু এখন ইনি মাধুর্যে একেবারে ডুবে গেছেন। জানো তো এঁর সঙ্গে আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। 'বরাবর' পাহাড়ে যে চারজন মহাপুরুষ দর্শন করেছিলাম তাদের মধ্যে ইনি একজন। গোরখপন্থী—কানফাট্টা যোগী, এদের মধ্যে অঘোরীও আছেন। এদের সাধন ভীষণ কঠিন।'

কুলদা বলছে, 'প্রয়াগে কুম্ভমেলায় এসে এ পর্যন্ত যত সাধু মহাপুরুষ দর্শন করলাম গম্ভীরানাথের মতো কাউকে লাগল না।'

ঐশ্বর্য নিয়ে কতক্ষণ থাকবে ? শেষ পর্যন্ত আসতেই হবে মাধুর্যে। শঙ্করাচার্যের

কী হয়েছিল ? বলছেন গোস্বামী-প্রভু, 'শঙ্করাচার্য প্রথমে অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করে তাই প্রচার করেছিলেন। পরে হালে পানি না পেয়ে দ্বৈতভাব আশ্রয় করলেন। আর, দ্বৈতভাব আশ্রয় করেই তাঁর প্রাণ সরস হল। আমাকেই কেন দেখ না। কালাপাহাড় তো হয়েছিলাম। কেবল গর্জন করতাম, ভাঙ, ভাঙ রে, ভেঙে ফেল। ঠাকুরদেবতা কিছু নয়, অবতার কিছু নয়, তীর্থ-টীর্থ কিছু নয়। এখন দেখ কী অবস্থায় এসে পড়েছি। শুষ্ক মতের উপর মানুষ কতদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ?'

আকাশগঙ্গা আশ্রমে ফিরে এল বিজয়। গুরুদত্ত মন্ত্র নিয়ে জপ করতে বসল। আসন থেকে বিচ্যুতি নেই, শুরু কবল কঠিনতর তপস্যা। হঠাৎ একদিন গুরুদেব পরমহংসজি এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, 'তোমাকে সন্ন্যাস নিতে হবে।'

'সন্ন্যাস ?'

'হ্যাঁ, কাশীতে চলে যাও। সেখানে হরিহরানন্দ সরস্বতী নামে এক প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী আছে, তিনি তোমাকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দেবেন।'

গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য। বিজয় তক্ষুনি কাশীর দিকে পা বাড়াল।

'শোনো।' পরমহংসজি আবো বললেন, 'তাঁর কাছে তোমার পূর্বের সমস্ত কার্যকলাপ বিবৃত করো। তোমার ব্রাহ্ম হওয়া, পৈতে বর্জন করা, সর্ব বর্ণের অন্ন খাওয়া —সব জানিও খোলাখুলি।'

কাশীতে এসে হরিহরানন্দের শরণ নিল বিজয়। আনুপূর্বিক বললে সব বৃত্তান্ত। সরস্বতী বললেন, 'তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

'প্রায়শ্চিত্ত ?'

'যদিও তুমি অত্যন্ত উচ্চ অবস্থা লাভ করেছ, তোমার দেহ-মন গঙ্গাজলের মতো পবিত্র ও নির্মল, যদিও ব্যক্তিগতভাবে তোমার প্রায়শ্চিত্তের কোনো প্রয়োজন নেই, তবুও শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করা যাবে না। তুমি নিজে যদি শাস্ত্রের মর্যাদা না রাখ, তা হলে অপরে রাখবে কেন ? সুতরাং লোক-শিক্ষার জন্যেই তোমাকে করতে হবে প্রায়শ্চিত্ত, আবার নিতে হবে পৈতে। যদি সানন্দে সম্মত হও তা হলেই দেব তোমাকে সন্ন্যাস, নচেৎ নয়।'

সানন্দে সম্মত হল বিজয়। দ্বাদশবার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করালেন স্বামীজি। পরে উপবীত সংস্কারে সংস্কৃত করলেন। তিন দিন পরে যথাশাস্ত্র বিরজা-হোমে শিখাসূত্রের আহুতি দান হল। অর্পণ করলেন সন্ন্যাসাশ্রম। নতুন নামকরণ হল —স্বামী অচ্যুতানন্দ স্বরস্বতী।

শ্রীকৃষ্ণ কী করলেন ? সনাতন পুরুষোত্তম হয়েও সান্দিপনী মুনির শিষ্যত্ব স্বীকার করলেন। আর শ্রীগৌরাঙ্গ ? পূর্ণ ভগবান হয়েও ঈশ্বর পুরীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা আর কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করলেন। লোকশিক্ষার জন্যেই আবার এই আচরণ করতে হল। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায় !'

> 'ধরিয়া যোগীর বেশ যাব দূর দেশে।
> যথা গেলে পাও প্রাণনাথের উদ্দেশে॥
> ইহা বলি কান্দে প্রভু ধরণী পড়িয়া।
> নিজ অঙ্গ উপবীত ফেলিল ছিঁড়িয়া॥'

আকাশগঙ্গায় ফিরে এল বিজয়। ইষ্ট সাধনায় মন দিল।

কিন্তু রঘুবরের বুদ্ধি-অভিমান জাগল। বললে, 'এক জঙ্গলে দুই বাঘ থাকতে

পারে না। এখানেও এই এক বাঘই আছে। তোমার যা কিছু হল জানবে আমার জন্যেই হয়েছে। তোমার জন্যে আমিই এখানে যমুনা নিয়ে এসেছি, আর কেউ নয়।'

এ কী দুর্জয় অভিমান।

'রঘুবর বাবাজি তো খুব বিনীত সাধু ছিলেন, তাঁর আবার অভিমান কিসে হল?' জিগগেস করল কুলদা।

গোস্বামী-প্রভু বললেন, 'অভিমান তো একরকম নয়। নানারকম। অনেক টাকায় অভিমান হয়, অনেক বিদ্যাতে অভিমান হয়। এরূপ অভিমান নষ্ট করা যায় সহজেই। কিন্তু আরেক রকম অভিমান আছে যা ঠিক উলটো, মানে না-থাকার অভিমান, আর এই অভিমান এড়ানোই খুব শক্ত।'

'কী রকম?'

'নির্ধন মনে করে ধনী তাকে ঘৃণা করছে, সুতরাং তার ধনীর উপরে অভিমান। মূর্খ মনে করে বিদ্বান তাকে অগ্রাহ্য করছে, তার বিদ্বানের উপর অভিমান। সংসারাসক্ত কামী ব্যক্তিও ধার্মিক উদাসীন সন্ন্যাসীর উপর অভিমান করে, কেন তার নিজের ধর্মে মতি হল না।'

'সদ্‌গুরুর কাছে যারা সাধন করে তাদেরও কি ভগবান দয়া করবেন না?'

'করবেন যদি নিজেকে সে দীনহীন কাঙাল বলে বুঝতে পারে। একমাত্র কাঙালকেই দীননাথ দয়া করে থাকেন। অভিমানী কখনো দয়ার পাত্র নয়।'

'কিন্তু রঘুবর বাবাজির তো অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, অদ্ভুত বিভূতি—'

'ছিল। স্বচক্ষে দেখেছি বাবাজি আটার টিক্কর তৈরি করে রাখতেন, রাত্রে বাঘ এলে হাতে করে তাই খাওয়াতেন। গোখরো সাপ বাবাজির চারদিকে খেলা করছে আর বাবাজি নিশ্চল হয়ে নাম জপ করছেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে পাখিদের বলছেন, আরে তু রামজিকা জীব হো, মৈ ভি উনহিকা দাস; ইঁহা আয়কে মেরা কান সাফা কর দে। পাখিরা উড়ে এসে বাবাজির ঘাড়ে বসত আর কান খুঁচে দিত। দুতিনশ লোক এসেছে আশ্রমে, বাবাজি আসন হতে না উঠে তাদের লুচি মণ্ডা দিয়ে ভোজন করাতেন। পাহাড়ে জলাভাব, মহাবীরের কাছে ধনা দিয়ে পড়লেন বাবাজি। মহাবীর বললে, লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর, ঝরনা বেরিয়ে পড়বে। বাবাজি লাঠি নিয়ে যেই পাথরে ঠুকলেন অমনি প্রকাণ্ড এক পাথরের চাঙড় বিরাট শব্দে ভেঙে পড়ল আর সেই ফাঁক দিয়ে কলকল করে জল ছুটল। ঐ ঝরনার নামই যমুনা রেখেছিলেন।'

'কিন্তু বাবাজির পতন হল কেন?'

'বললাম তো, অভিমানে। আরো এক কারণে—দয়ায়।'

'দয়ায়? দয়ায় আবার পতন হয় নাকি?'

'কখনো কখনো দয়া যে জাগে সেই অভিমান থেকেই। সেকথা বলবখন আরেক দিন।'

সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনে গিয়ে সাধন করবে মনে মনে এমনি সঙ্কল্প করল বিজয়। পরমহংসজি আবার এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, 'না, সংসার ত্যাগের দরকার নেই। যেমনটি ছিলে তেমনটি থাকো। স্ত্রীপুত্র পরিবারের সঙ্গে একত্র থেকে সাধন করো। সংসার তোমার কোন বিঘ্ন ঘটাবে না।'

'আর ব্রাহ্মসমাজ?'

'ব্রাহ্মসমাজ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ো না। এখন তা ত্যাগ করবার সময় হয়নি।'

বললেন পরমহংসজি, 'যখন সময় হবে তখন তা সাপের খোলসের মতো আপনিই খসে পড়বে।'

'সন্ন্যাস নিয়েও সংসার ?'

'হ্যাঁ, তোমাকে দিয়ে ভগবান নতুন ধর্ম স্থাপন করবেন।'

'আমাকে দিয়ে ?'

'হ্যাঁ,' বললেন পরমহংসজি, 'তুমিই ভগবানের নির্বাচিত।'

১৪

বিন্ধ্যাচলে নির্জনে সাধন করতে লাগল বিজয়। গুরুবলে তার অন্তরে জ্বলে উঠল নামাগ্নি। আর এই নামাগ্নিই আসল পঞ্চতপা। এই আগুনেই বিষয় বাসনা নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে যায়। এরই নাম অবলম্ব নির্মল। কিন্তু এ বড় ক্লেশকর অবস্থা। বলতে পারা যায়, ভয়ঙ্কর অবস্থা। শুধু দাহ আর দাহ। সমস্ত বাহ্যজগৎ বিষতুল্য। যেন রৌদ্রে কোথাও বৃক্ষছায়া নেই, নেই বা জলরেখা। শুধু এক নিরন্ত যন্ত্রণা। একমাত্র যা ইচ্ছা জাগে তা আত্মহত্যার। এই অবস্থায় পড়ে সনাতন জগন্নাথের রথের নিচে পড়তে চেয়েছিল, রঘুনাথ চেয়েছিল পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিতে। মহাপ্রভু সনাতনকে নিবৃত্ত করেন, রঘুনাথকে স্বয়ং সনাতন। নামাগ্নিতে দগ্ধ হতে-হতে বিজয়ও বুঝি উন্মাদ হয়ে গেল। ঠিক করল আত্মহত্যা করবে। তারও পিছনে সক্রিয় গুরুশক্তি। টেনে রাখল বিজয়কে।

'শোনো। জ্বালামুখী চলে যাও। সেখানে গিয়ে সাধন করো।' পরমহংসজি আবির্ভূত হয়ে বললেন বিজয়কে, 'এ জ্বালাযন্ত্রণা থাকবে না, সরস হয়ে উঠবে।'

বিজয় তখুনি চলল জ্বালামুখী। আর কিছুদিন নামসাধনের ফলে যন্ত্রণার অবসান হল। চিত্তে নামল জ্যোতির্ময় আনন্দ-অবস্থা।

'নাম করতে-করতে এমন হয় যে শরীরের প্রতি রক্তবিন্দু প্রতি অণু-পরমাণু পর্যন্ত নাম করে।' বলছেন গোস্বামী-প্রভু, 'এ অবস্থায় মহাত্মারা কাপড় দিয়ে দেহ ঢেকে রাখেন, নয়ত বা বিভূতি মাখেন। আর, জানো তো, নামসাধনের সমস্ত তত্ত্ব শ্বাসে-প্রশ্বাসে। প্রথমে শ্বাসে-প্রশ্বাসে লক্ষ্য রেখে নাম করো। পরে দেখবে শ্বাস-প্রশ্বাসেই নাম, নামই শ্বাস-প্রশ্বাস।

'একমাত্র শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপ দ্বারাই আত্মার সমস্ত পাপ সমস্ত সংশয় নষ্ট হবে। প্রতি শ্বাসে নাম করাই একমাত্র উপায়।'

আবার আকাশগঙ্গায় ফিরেছে বিজয়। পরমহংসজি প্রায়ই উপস্থিত হচ্ছেন আর সাধনবিষয়ে উপদেশ দিচ্ছেন।

সাধন করবার প্রকৃষ্ট সময় কে...? গোস্বামী-প্রভু নিজেই বলছেন : 'ব্রাহ্মমুহূর্তে অর্থাৎ রাত চারটেয়, বেলা এক প্রহরের পর এক দণ্ড আর সন্ধে—এই সময়ই ভজনের পক্ষে প্রশস্ত। আর রাত সাড়ে দশটা থেকে রাত চারটের মধ্যে আরেক বার। এই সব সময়েই দেবতা আর সাধু মহাত্মারা বিচরণ করেন। মহাপুরুষেরা রাত সাড়ে

দশটায় বার হন আর চারটে পর্যন্ত থাকেন। এই সময় রাত্রি-জাগরণ অভ্যেস করা দরকার। তখন দু একবার প্রাণায়াম করে নাম করবে। মশারির মধ্যে বসে করলেও হয়। নাম করবার সময় মহাপুরুষেরা কাছে এসে দাঁড়ান, সাহায্য করেন। কোনো মহাপুরুষ এলেই চন্দনের গন্ধ ও ধূপের গন্ধ পাওয়া যায়। কখনো বা গাঁজার গন্ধ। মহাত্মাদের গাত্র গন্ধে মন অত্যন্ত প্রফুল্ল হয়।'

'শাস্ত্রে অষ্ট সিদ্ধির কথা পড়ি, সে সব কি সত্যি?' পরমহংসজিকে জিগগেস করল বিজয়।

'নিশ্চয়ই সত্যি।' বললেন পরমহংস। 'তপস্যায় এই অষ্ট সিদ্ধিও লাভ হয়।'

'আমাকে দেখাতে পারেন?'

'পারি।'

অষ্ট সিদ্ধি অর্থ অণিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব, ও যত্রকামাবসায়িত্ব। অণিমা হচ্ছে অণু-পরমাণুর মতো সূক্ষ্ম হবার শক্তি। লঘিমা হাওয়ার মতো লঘু হবার ক্ষমতা। গরিমা পাহাড়ের মতো বড় হবার সামর্থ্য। আর ইচ্ছামাত্র দূরের জিনিসকে কাছে নিয়ে আসবার শক্তির নাম প্রাপ্তি। যা ইচ্ছা করা যাবে তাই ফলবে, অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির অব্যাঘাতের নাম প্রাকাম্য। আর বশিত্ব হচ্ছে বশীকরণের ক্ষমতা। ঈশ্বরের মতো সর্ববস্তুর উপর কর্তৃত্ব করবার শক্তির নাম ঈশিত্ব। আর যত্রকামাবসায়িত্বের আরেক নাম সত্যসংকল্পতা। অর্থাৎ বিষকে অমৃত করা, মৃতকে বাঁচিয়ে তোলার শক্তি।

'এস আমার সঙ্গে।' পরমহংসজি বিজয়কে নিয়ে গেলেন নির্জনে।

একে-একে সব প্রত্যক্ষ করালেন। এমন কি পরকায়-প্রবেশন পর্যন্ত। পাহাড়ের নিচে কারা সৎকারের জন্যে মড়া নিয়ে এসেছে। মড়া রেখে সবাই গিয়েছে কাঠের সন্ধানে। কখন ফেরে তার ঠিক কী। পরমহংসজি সেই মৃতদেহে প্রবেশ করলেন। মৃতদেহ নড়ে চড়ে উঠল, উঠে বসল, আর পরমহংসজি মৃতবৎ পড়ে রইলেন। আর পাহাড়ি গাঁয়ের লোকদের কাঠ নিয়ে ফিরে আসবার আগেই পরমহংসজি সজীব হলেন আর যে মড়া সে মড়াই পড়ে রইল। বিজয় উল্লসিত হয়ে উঠল। শাস্ত্রবাক্য তাহলে কিছুই মিথ্যে নয়। যে তপস্যাসিদ্ধ, যোগপরাগ, তার পক্ষে এই অষ্টৈশ্বর্য অর্জন অসম্ভব নয়।

'শাস্ত্রই যথার্থ অবস্থার সাক্ষ্য দিচ্ছে।' বলছেন গোস্বামী প্রভু, 'তবু যা কিছু প্রত্যক্ষ করবে, বাজিয়ে নেবে। তোমাদের তো একটা কিছু প্রত্যক্ষ করলেই বিশ্বাস। আমার কিন্তু তা নয়। আমি যে পর্যন্ত দশ ইন্দ্রিয় দিয়ে তিন বার করে বাজিয়ে সত্য বলে না বুঝি, সে পর্যন্ত তাকে সত্য বলে নিই না। কোনো বিষয় শুধু দেখে শুনে বা স্পর্শ করেই সত্য বলে মেনো না, সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে তিন বার করে বাজিয়ে সত্য বুঝলে—আরেকবার শাস্ত্র দেখো। তাতেও যদি প্রমাণ পাও তবেই নিঃসংশয়। নচেৎ নয়, কিছুতে নয়।'

পরমহংসজি বললেন, 'চলো, এবার তোমাকে সিদ্ধতান্ত্রিকের সাধন পদ্ধতি দেখাই। তাহলে বুঝবে ঠিক-ঠিক তন্ত্রসাধনে কী ফল!'

বরাবর পাহাড়ে এলেন দুজনে। দেখলেন নির্ধারিত গুহার সামনে খোলা তরোয়াল হাতে নিয়ে এক প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। পরমহংসজিকে দেখে প্রহরী পথ ছেড়ে দিল। অন্দরের প্রকোষ্ঠে ঢুকলেন দুজনে। রাত গভীর। পর্বতের চেয়েও পর্বতায়িত স্তব্ধতা। প্রায় পনেরো জন সাধক চক্রে বসেছেন। তাঁর মধ্যে, এ কী আশ্চর্য, একজন স্ত্রীলোক!

কতক্ষণ পরে চক্রেশ্বর সকলের গায়ে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিলেন। আর তৎক্ষণাৎ সকলের মধ্যে বালক-ভাব উপস্থিত হল। সকলে অনুভব করল, যিনি স্ত্রীলোক বসে আছেন তিনি সকলের মা, আর সকলে অপোগণ্ড শিশু। বিজয়ের মধ্যেও বালক-ভাব প্রবল হয়ে উঠল। মা-মা বলতে বলতে হামাগুড়ি দিতে লাগল। নিষ্কলুষ শিশুর মতো স্তন্য পান করল।

স্ত্রীলোকটি বিজয়ের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'আজ থেকে তুমি জিতেন্দ্রিয় হলে।'

পরে স্ত্রীলোকটি ছিন্নমস্তা-সাধনের প্রক্রিয়া দেখালেন। ভাবাবেশে নাচতে-নাচতে ডান হাতের খড়্গ দিয়ে নিজের মাথা ছিন্ন করলেন। ছিন্ন মাথা ধরলেন বাঁ হাতে। কর্তিত কণ্ঠ থেকে ফোয়ারার মতো রক্ত ছুটেছে, ছিন্ন মুণ্ড মুখ ব্যাদান করে তাই পান করছে সানন্দে। আবির্ভূত হয়েছেন মহাদেব। সাধকেরা কেউ স্তব পাঠ করছে, কেউ বা অর্চনা করছে পত্রে-পুষ্পে। ছিন্ন মুণ্ড গলায় এসে বসতেই আবার দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। সমস্ত আবার স্বভাবসুন্দর হয়ে গেল। সমস্বরে 'জয়' দিয়ে উঠল সকলে। মহাদেব সকলকে আশীর্বাদ করে অন্তর্হিত হলেন।

বিজয় বুঝল শাস্ত্রোক্ত তান্ত্রিক সাধনও সত্য।

'ঘরে-ঘরে মঙ্গল চণ্ডীর পূজা হোক।' বলছেন গোস্বামী প্রভু: 'আনন্দময়ীর ঘট স্থাপন করো। দেহে ঘট স্থাপন করো। পূজা করো, মর্যাদা করো, সেবা করো। মর্যাদা না করলে মা চলে যান। পূজা না করলে থাকেন না।

আবার বলছেন, 'স্ত্রীজাতিকে যত সম্মান করবে তত নিজে পবিত্র হবে। যাঁকে সম্মান করি তাঁকে দূষিত ভাবে দৃষ্টি করা যায় না। ইংরেজ কেবল নারী জাতিকে সম্মান করেই জগতের মধ্যে বরেণ্য হয়ে উঠল। পুরাণে আছে, যেখানে নারীজাতির সম্ভ্রম সেখানেই লক্ষ্মী-নারায়ণ বর্তমান। ইংরেজ জাতির মধ্যে লক্ষ্মী-নারায়ণ বিরাজ করছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, জনকের সভায় গার্গী উপস্থিত হলে ঋষিরা উঠে তাঁকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করলেন। গার্গীর পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান, পরনে বস্ত্র নেই, উলঙ্গিনী। শাণ্ডিল্যাতপস্বিনী। গরুড় তাঁর প্রভাব দেখে স্থির করলেন, রাত্রি প্রভাত হলে এঁকে পিঠে করে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাব। শাণ্ডিল্যা তাঁর অন্তর জানলেন। অমনি গরুড়ের দুই পাখা খসে পড়ল। গরুড় তখন তাঁর স্তব করতে লাগলেন। নারীকে সম্মান না করলে কোনো সাধনই ফলপ্রদ হবেনা।'

'স্ত্রীলোকের মধ্যে মাকে দেখ।' বলছেন আবার গোঁসাইজি। 'মাকে দেখে প্রণাম করো। মা আনন্দময়ীকে যদি সমস্ত নরনারীর মধ্যে দেখ, কি, যদি একটি নারীকে সেই ভাবে ভালোবাসতে পারো, তাহলে সেই দেবী, আর সেই দেবীকে প্রণাম করলেই সমস্ত পাপের খণ্ডন। এরকম যদি পারো তাহলে এক দিনেই সিদ্ধিলাভ। চণ্ডীদাস যেমন করেছিল রজকিনীকে দিয়ে। নারীর প্রতি যে কুদৃষ্টি করে তার মরণ ভালো।'

বিজয় ফিরল কলকাতায়, নিজের বাসায় পরিবারের মধ্যেই বাস করতে লাগল। সবাই ভেবেছিল সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে যাবে লোটা-চিমটা নিয়ে। কী আশ্চর্য, সংসারেই থেকে গেল বিজয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন চুঁচুড়ায়, বিজয় তার সঙ্গে দেখা করতে গেল। তাঁকে দেখে মহর্ষি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন: 'লোকে বলে কিনা গোঁসাই পাগল হয়ে গিয়েছে,

পৌত্তলিকের মতো ব্যবহার করছে ! কিন্তু কই, আমি তো এঁকে ধূপ-ধুনোর সুগন্ধ সমাবৃত উজ্জ্বল দুর্গা প্রতিমার মত দেখছি।' পরে আরো সন্নিহিত হলেন বিজয়ের, প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় পেলে এ দেবদুর্লভ বস্তু ?'

'গয়ার পাহাড়ে এক মহাপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে,' বললে বিজয়, 'তিনিই এ অবস্থা করে দিয়েছেন।'

'চমৎকার। যে অমূল্য বস্তু পেয়েছ তাতেই তুমি ধন্য হয়ে যাবে। এ রত্ন আর তুমি ছেড়ো না।' মহর্ষির দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল : 'হয়তো ব্রাহ্মসমাজ তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে, তা হোক, তবু এ রত্ন যেন না যায়।'

কতগুলি চিঠি এসেছে মহর্ষির কাছে। একটাতে একজন লিখেছে : 'আপনি তো নির্জনে অনেক দিন ধরে ধর্ম সাধন করলেন, কিন্তু কী লাভ করলেন আর সেই সম্পর্কে আমাদের প্রতিই বা আপনার কী উপদেশ জানাবেন দয়া করে।'

তাঁর অনুগত ভক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে মহর্ষি বললেন, 'লিখে দাও, এখন থেকে গোঁসাই যা বলবেন তাই আমার কথা।'

মহর্ষি তখন তাঁর পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে, প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে দিয়ে বিজয়কে ডেকে পাঠালেন। 'ওঁকে নিয়ে এস। ওঁর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

প্রিয়নাথ এসে বিজয়কে বললে, 'মহর্ষি দেখতে চেয়েছেন আপনাকে।'

'কেমন আছেন তিনি ?' বিজয় উন্মনার মতো বললে।

'অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কানে ভালো শোনেন না, দৃষ্টিশক্তিও কমে এসেছে। আপনি এখন কলকাতায় জেনে আপনার জন্যে ভারি ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। কী যেন বলবেন আপনাকে।'

'আমার কী সৌভাগ্য, তিনি আমাকে স্মরণ করেছেন। বলুন কবে যাব, কখন ?'

নির্ধারিত দিন-ক্ষণে বিজয় চলল পার্ক স্ট্রিটে। সঙ্গে কতক অনুরাগী শিষ্যও জুটে গেল। কেউ আমরা দেখিনি মহর্ষিকে। আজ চক্ষু সার্থক করব। প্রকাণ্ড হলঘরের মাঝখানে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন মহর্ষি। বিজয় নত হয়ে মহর্ষির পা দুখানি মাথায় ধরল আর অঝোরে কাঁদতে লাগল।

মহর্ষির মুখমণ্ডল লাল হয়ে উঠল। করপুটে বুকে রেখে গদগদস্বরে বলতে লাগলেন : 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ্য হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।' তারপর আর তিনবার বললেন, 'গোবিন্দায় নমো নমঃ, গোবিন্দায় নমো নমঃ, গোবিন্দায় নমো নমঃ।' তাঁর দুগাল বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমে এল।

বিজয় ভাবাবিষ্ট হয়ে মহর্ষির বাঁ দিকে চেয়ারে বসে পড়ল। কারু আর কোনো কথা নেই, দুজনেই স্তব্ধ, গভীরবিভোর। বিজয়ের শিষ্যেরা আভূমি প্রণাম করল মহর্ষিকে। লম্বা একটা বেঞ্চি ছিল সামনে, তাতে সকলে বসল।

'এঁদের দেখে আমার বড় আনন্দ হচ্ছে।' বললেন মহর্ষি : 'এঁরা কারা ?'

মহর্ষির কানের কাছে মুখ রেখে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সজোরে বললে, 'এরা সব গোঁসাইয়ের শিষ্য।'

'আহা, মানুষ যখন ভালো খাবার জিনিস পায়, শুধু নিজে না খেয়ে অন্যান্যকেও তার ভাগ দিতে ইচ্ছে করে। গোঁসাইজি নিজে যা ভোগ করছেন তাই আবার শিষ্যদের দিচ্ছেন ভাগ করে। এই না হলে মহাপুরুষ। বিন্দুমাত্র স্বার্থ নেই, শুধু শিষ্যদের

কল্যাণেই এই রস বিতরণ। গোঁসাইই ধন্য, শিষ্যদের যথার্থ সন্তাপহারক। ওঁকে দেখে সেই প্রাচীন ঋষিদের কথাই মনে আসে।'

বোলপুরের আশ্রম নিয়ে কথা উঠল। নিয়ম প্রণালী কী রকম হওয়া উচিত বলে মনে করো। দেশে অসাম্প্রদায়িক ভাবের কোনো আশ্রম নেই। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত, ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডি রচনা করে সঙ্কুচিত হয়ে আছে। ইচ্ছে করে একটা উদার অঙ্গনে সকল ধর্ম এসে একত্র হোক। সাধু সন্ন্যাসী ফকির দরবেশ সুফী বৈষ্ণব সমস্ত ভগবৎ-উপাসক যদি সেখানে স্থান পায়, আশ্রয় পায়, তা হলেই শান্তিনিকেতন নাম সার্থক হয়।

'সাধু! সাধু!' মহর্ষি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন: 'যাদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেম তাদের কথাই অন্তর স্পর্শ করে, তাদের কথায়ই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। 'তুমি যা বললে,' বিজয়কে লক্ষ্য করলেন মহর্ষি: 'তাই ঠিক, তাইই হওয়া উচিত। কিন্তু শান্তিনিকেতনের ভার যাঁদের হাতে, তাঁরা এই অসাধারণ উদার ভাব গ্রহণ করতে পারবেন না। আমার প্রাণের কথা কেউ বোঝে না। বলিও না কাউকে। তুমি বুঝবে, তোমাকেই তাই বলব।' মহর্ষি হাফেজের কবিতা আবৃত্তি করে তার ব্যাখ্যা করতে লাগলেন আর কাঁদতে লাগলেন বিহ্বল হয়ে। বললেন, 'ভগবানকে যেমন ভাবে পেতে চাই তেমন ভাবে পাচ্ছি না, পাচ্ছি না—' কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল মহর্ষির।

বিজয় শুনছে তন্ময় হয়ে।

'মাঝে মাঝে তিনি দর্শন দিয়ে বিদ্যুতের মতো অদৃশ্য হয়ে যান—আবার যতক্ষণ তাঁকে না দেখি, প্রেমময়ের সেই উজ্জ্বল রূপ, ততক্ষণ উন্মত্তের মতো থাকি—' মহর্ষি কাঁদছেন আর বলছেন, 'প্রাণ আমার ছটপট করে, সময় যে কী ভাবে কাটাই তিনি জানেন। তাঁর দয়া না হলে কি আর দর্শন মেলে। জ্ঞান একটা কথার কথা মাত্র, শুধু জ্ঞান দিয়ে কি আর পাওয়া যায় তাঁকে? আসল হচ্ছে প্রেম ভক্তি। প্রেমভক্তি হলেই যদি তিনি কৃপা করেন!'

'কৃপা, কৃপা।'

'হাঁ, কৃপা। ঈশ্বরদর্শন চেষ্টাসাধ্য নয়, পুরুষকার নিরর্থক।' বলছেন আবার মহর্ষি: 'তাঁর চরণে নির্ভরই সার। শুধু তাঁর দয়ার দিকে চেয়ে পড়ে থাকা—' বালকের মতো অধীর হয়ে কাঁদতে লাগলে মহর্ষি।

বিজয় 'জয়গুরু' 'জয়গুরু' বলতে লাগল।

চোখ মুছে মহর্ষি আবার বললেন, 'কোথায় ভগবান অবতীর্ণ হবেন তা বোধহয় লক্ষণ দেখেই বোঝা যায় আগে থেকে। জন্ম সঙ্গ শিক্ষা ও সাধন, এই চার বস্তুর যেখানে সমাবেশ সেখানেই পরিপূর্ণ ধর্ম। তোমাতে এই চারবস্তুই প্রোজ্জ্বল। তুমি বিশুদ্ধ অদ্বৈত বংশে জন্মগ্রহণ করেছ, সৎগুরুর আশ্রয় পেয়েছ, পেয়েছ উপযুক্ত শিক্ষা, তারপর সাধনও করেছ ষোল আনা। গোঁসাই, তুমিই ধন্য, তুমিই বৈষ্ণবোত্তম।' একটু থেমে মহর্ষি আবৃত্তি করতে লাগলেন: 'কুলং পবিত্রং, জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন। নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরস্তু তেষাং যেষাং কুলে বৈষ্ণব-নামধেয়।'

'আপনিই তো আমাকে হাতে ধরে মানুষ করেছেন।' কৃতজ্ঞতায় উচ্ছল হয়ে বললে বিজয়: 'আমার সবই তো আপনার থেকে। আপনিই তো আমার গুরু।'

'গুরু নয় গুরুমশায়।' হাসলেন মহর্ষি: 'পাঠশালায় প্রথম যেমন গুরুমশাই ছেলেকে ক-খ শেখায় তেমনি। কালক্রমে ঐ ছেলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষা পেয়ে ঐ গুরুমশায়ের গুরু হয়।'

'না, না, আমি আপনার বালক,' বিজয় বললে বিনম্র হয়ে, 'আমাকে আপনি আশীর্বাদ করুন।'

'আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব কী, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি। তোমার জয় হোক।'

বিজয় ও তার সঙ্গীশিষ্যরা সকলে একে-একে মহর্ষিকে প্রণাম করল। সঙ্গীশিষ্যদের লক্ষ্য করে মহর্ষি বললেন, 'গোঁসাইকে কখনো ছেড়ো না, গোঁসাই তোমাদের সকলকে অনন্ত উন্নতির পথে নিয়ে যাবেন।'

চলে এল সবাই। পথে একজন বিজয়কে জিগগেস করলে, 'সদ্‌গুরুর কৃপা না হলে তো এমন অবস্থা হয় না। মহর্ষি এমন অবস্থা পেলেন কী করে?'

'সদ্‌গুরুকৃপায়। কে বলে সদ্‌গুরুকৃপা হয়নি তাঁর উপর?' বিজয় জোর দিয়ে বললে, 'নিশ্চয়ই হয়েছে।'

একদিন বিজয় বসেছে ভজনে, কেন কে জানে, মন কিছুতেই স্থির করতে পারছে না। চার দিক শুষ্ক লাগছে, অন্তরেও দাহ। কী করে এ-জ্বালার নিবারণ হবে? কোথায় গেলে কী করলে স্নিগ্ধ হবে শীতল হবে? চারদিকে অস্থির হয়ে তাকাতে লাগল বিজয়। হঠাৎ কেন কে জানে, একছুটে বেরিয়ে এল রাস্তায়। একটা ঝাঁকামুটে চলে যাচ্ছিল পাশ দিয়ে বিজয় হঠাৎ তার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল, তার পা থেকে ধুলো নিয়ে মাখতে লাগল সর্বাঙ্গে আর কাঁদতে লাগল অবুঝের মতো। মুটে তো অপ্রস্তুত। সেও বিজয়ের পায়ের ধুলো নিয়ে গায়ে মাখতে লাগল আর আকুল হল কান্নায়। এ কী অদ্ভুত ব্যাপার, ধুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি, রাস্তায় ভিড় হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ঝাঁকামুটেকে আলিঙ্গন করল বিজয়। সমস্ত দাহ জুড়িয়ে গেল। শুষ্কতা দ্রবীভূত হল। পদধূলিতে এত শান্তি তা কে জানত। পদধূলিই সমস্ত দাহের মহৌষধ।

গোঁসাইজি নিজেই বলছেন: 'কলকাতা ব্রাহ্মসমাজে একদিন উপাসনায় বসেছি, ভাবভক্তি কিছুই আসছে না। প্রাণ শুকনো কাঠের মতো মনে হচ্ছে। কী করব কিছু ঠিক করতে না পেরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। একটা কুলি যাচ্ছিল, তার পায়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ সরস হয়ে উঠল। ফের বসলাম উপাসনায়। উপাসনা ভীষণ ভালো হল। আরেক দিন সেই শুষ্ক অবস্থা, উপাসনায় মন বসছে না। কী করি —এক দারোয়ানকে এক ছিলিম তামাক সেজে দিলাম। অমনি মন আনন্দময় হয়ে উঠল। জমে উঠল উপাসনা।'

মন যখন বিক্ষিপ্ত হবে বা উদ্বিগ্ন হবে, মন যখন নামে বসবে না, বিরক্তিতে বিষিয়ে থাকবে, তখন আর কিছু না পারো, অন্যের কল্যাণ কামনা করো। অন্যের কল্যাণ কামনায়ও চিত্ত সুস্থির হবে। মাঝে মাঝে শুষ্কতাও ভালো। শুষ্কতারও দরকার আছে। 'গ্রীষ্মকাল এমনিতে ভয়ানক,' বলছেন গোস্বামী-প্রভু, 'কিন্তু গ্রীষ্ম ছিল বলেই তো বর্ষায় এত সুখ এত সৌন্দর্য। সাধনের সময় যদি নৈরাশ্য ও শুষ্কতা না থাকত তাহলে ধর্ম যে এত আনন্দময় তা বোঝা যেত কী করে? শুষ্কতার মরুভূমি পেরিয়ে একবার শান্তির শ্যামলতায় চলে আসতে পারলে আর কোনো ভয় নেই।'

কিন্তু এদিকে কেশবের খুব অসুখ। কেশবের এখন অন্যরকম অবস্থা। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাকে একদিন বললেন, 'মায়ের মূর্তি দেখে তোমার মনে চিন্ময়ীর ভাব না জেগে পাথর মাটি খড় এসব জাগে কেন?' না, এখন কেশব ঈশ্বরকে মা বলে ডাকছে। ডাকতে-ডাকতে কাঁদছে অনর্গল।

কিন্তু দলকে তার ভীষণ ভয়। মনে সাধ, রামকৃষ্ণকে পুজো করে। একদিন করলও সেই পুজো, কিন্তু গোপনে করল, ঘরের দরজা বন্ধ করে।

রামকৃষ্ণ বললে, 'আজ কেশব আমার পুজো করেছিল, ঘরের দোর বন্ধ করে, পাছে ওর লোকেরা টের পায়।' হাসল রামকৃষ্ণ : 'ও যেমন দোর বন্ধ করে পুজো করলে, তেমনি ওর দোরও বন্ধ থাকবে।'

বিজয় এসে দেখল, নিস্তেজ নিষ্প্রভ দেহে শুয়ে আছে কেশব। বিজয় পাশে বসল। কেশব বললে, 'গোঁসাই, যা ভেবেছিলাম তা হল না।'

বিজয় বেদনায় নম্র হয়ে রইল।

'পথহারা হয়ে শুধু ঘুরে-ঘুরেই বেড়ালাম, তারপর যখন পথের সন্ধান পেলাম বলে আশা হল তখনই এই ব্যাধি এসে ধরলে। হ্যাঁ হে,' বিজয়ের দিকে তাকাল কেশব : 'তুমি নাকি কী এক নতুন পথ আশ্রয় করেছ ?'

'নতুন কি পুরোনো তা তো জানিনা,' স্নিগ্ধ স্বরে বললে বিজয়, 'ভগবানকে লাভ করা নিয়ে কথা। তারই জন্যে এসেছি ব্রাহ্ম সমাজে, বাইরের বিষয় নিয়ে গোল করতে নয়। ভগবানকে পেলাম এই প্রত্যক্ষ বোধ না হওয়া পর্যন্ত ফিরব না। পথ প্রশ্ন নয়, প্রাপ্তিই প্রশ্ন। উপেয়ই প্রশ্ন, উপায় নয়। মৃত্যুকালে বলে যেতে পাবব, আমি কৃতার্থ, পূর্ণমনোরথ, আর, প্রভু, তুমিই সত্য—এই শুধু আকাঙ্ক্ষা।'

কেশব ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, 'এ সম্বন্ধে আমার অনেক কিছু বলবার আছে। যদি ভালো হই তোমায় ডাকব।'

কেশব আর ভালো হল না। লীলা সংবরণ করলে।

১৫

বরানগরে মণি মল্লিকের বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে গেল বিজয়।

'এ কি, তোমার যে গর্ভলক্ষণ হয়েছে।'

তার দীক্ষালাভের সমস্ত কথা তখন ব্যক্ত করল বিজয়। রামকৃষ্ণের আনন্দ আর ধরে না। সন্দেহ কী, বিজয়ই বাসা পাকড়েছে। ফোয়ারা চাপা ছিল, খুলে গিয়েছে এবার।

সেবার গেল দক্ষিণেশ্বরে পশ্চিমের ভ্রমণ সেরে। রামকৃষ্ণ জিগগেস করলেন, 'এত তো ঘুরে এলে, কোথায় কী রকম দেখলে বলো তো !'

বিজয় বললে, 'কোথাও চার আনা, কোথাও আট আনা। চৌদ্দ আনাও দেখেছি, কিন্তু ষোল-আনা এখানে।'

ভাবাবেশে জ্ঞানশূন্য রামকৃষ্ণ।

সেবার রামকৃষ্ণের অসুখ, ভক্তেরা কাউকে আসতে দিচ্ছে না কাছে। বিজয়কেও বাধা দিল। দূরে দাঁড়িয়ে দেখুন। রামকৃষ্ণ হাততালি দিয়ে ডাকতে লাগলেন বিজয়কে। আর বিজয় কাছে আসতেই গদগদ ভাবে বলে উঠলেন, 'আহা, তোমাকে দেখে আমার হৃৎপদ্মটি ফুটে উঠল !'

আরেকবার গেল সহধর্মিণী ও শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে নিয়ে। পরিবারের আরো কেউ ছিল হয়তো সঙ্গে।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তুমি এতগুলি আত্মীয়স্বজনের মধ্যে থেকেও ধর্মের এই উচ্চাবস্থা লাভ করেছ, তুমিই ধন্য। তুমিই একালের জনক রাজা। আমি তো ভেবেছিলাম সংসারে উদাসীন হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ। তুমি যে আদর্শ দেখালে তা জগতে দুর্লভ।' যোগমায়ার মধ্যেও দেখলেন মহাশক্তি। বললেন, 'কবে দীক্ষা দিলে এঁকে? সাক্ষাৎ মহাশক্তির কাছে এলে যেমন ভাব ও অবস্থা হয় এঁকে দর্শন করে আমার সেই ভাব সেই অবস্থা।'

শ্বশ্রূমাতা মুক্তকেশীকে ডাকলেন। বললেন, 'তুমি একজন নীতিপরায়ণা ব্রাহ্মিকা হয়ে এই ন্যাংটা মানুষের কাছে কেন এসেছ?'

মুক্তকেশী বললে, 'আপনার আবার ন্যাংটা কাপড়-পরা কী!'

'বটে? তুমি তা বুঝেছ?' রামকৃষ্ণ সস্নেহে বললেন, 'তবে কাছে এসে বোস।'

মুক্তকেশী বসল।

'সংসার কেমন দেখছ?'

'সংসারের কথা আর বলবেন না, এক ঢেউ যাচ্ছে আরেক ঢেউ আসছে।' বললে মুক্তকেশী।

'তোমার তাতে কী। তোমার তো জ্ঞান হয়েছে!' স্নিগ্ধ চোখে তাকালেন রামকৃষ্ণ: 'কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের শুকনো বাঁশের মুড়ো আর কদ্দিন চিবুবে? এখন ভক্তির আশ্রয় নাও জ্ঞান ভক্তি ছাড়া দাঁড়াবে কোথায়? যাঁকে তুমি জামাই ভাবছ, তিনি ভক্তির ভাণ্ডারী, তাঁর কাছে প্রেম-ভক্তি লাভ করে ধন্য হও।'

মুক্তকেশী গোস্বামী-প্রভুর থেকে নিল যোগদীক্ষা।

বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীও বলে দেন, 'যাও, গোঁসাইয়ের কাছে যাও, সাধন নিয়ে এস।'

এক গোড়ীয় বৈষ্ণবের আখড়ায় গিয়ে দেখলেন গৌরাঙ্গের দারুমূর্তি। বললেন, 'তোদের ও গৌরাঙ্গ তো অচল, নিম কাষ্ঠের।' আর, বিজয়কৃষ্ণকে লক্ষ্য করলেন: 'আর ও আমার সচল গৌরাঙ্গ, রক্তমাংসের।'

ব্রহ্মচারী বিজয়ের নাম রেখেছেন, জীবনকৃষ্ণ। যে কৃষ্ণ জীবিত, সে জীবন্তকৃষ্ণ, তার বিজয় দিক-দিগন্তে।

'বহু দেশ পর্যটন করেছি, বহু পাহাড়-পর্বত ঘুরেছি, কিন্তু এত অদ্ভুত যোগৈশ্বর্য দেখিনি।' বলছে বিজয়, 'ব্রহ্মচারীর চোখে পলক নেই। পাঁচ মিনিট চোখের দিকে চেয়ে থাক, মূর্ছিত হয়ে পড়বি। হিমালয় থেকে তিব্বত থেকে প্রাচীন যোগীরা রাত্রিকালে ব্রহ্মচারীর কাছে আসে। কেন আসে জানিস? যোগশিক্ষা করতে। সন্ধেতেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। কেউ যেতে পারে না।'

বিজয়ের প্রপিতামহের সহোদর, এই ভাবে ব্রহ্মচারী নিজের পরিচয় দেন। আশি বছর ধরে বনে-পর্বতে তুষারে-হিমবাহে কঠোর সাধন করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। বয়েস প্রায় দেড়শো। যেদিন পৈতে নেন সেইদিনই ব্রহ্মচারীর বেশে বেরিয়ে পড়েন বাড়ি ছেড়ে। সঙ্গে নিজের আচার্য গুরু ভগবান গাঙ্গুলি আর সতীর্থ বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই যে বেরুলেন, আর ফিরলেন না সংসারে। কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে যোগাসনে

বসে দেহ ছাড়লেন ভগবান। ছাড়বার আগে আরেক ব্রহ্মচারীর হাতে লোকনাথ আর বেণীমাধবকে স'পে দিলেন। সেই ব্রহ্মচারীই প্রসিদ্ধ তৈলঙ্গস্বামী।

সুমেরু পর্বত দেখবার অভিলাষে লোকনাথ আর বেণীমাধবকে নিয়ে যাত্রা করল হিতলাল। বদরিকাশ্রম উত্তীর্ণ হয়ে উত্তরে হাজার-হাজার মাইল গিয়ে সুমেরুর সন্ধান মিলল না। দেখি উদয়াচল মেলে কিনা—সঙ্গীদের থেকে বিদায় নিয়ে হিতলাল চলল পূর্বদিকে। আর লোকনাথ ও বেণীমাধব পাহাড় ভেঙে-ভেঙে অবশেষে উপস্থিত হল বাংলাদেশে, চন্দ্রনাথে। তারপর বেণীমাধব কোথায় গেল কে জানে, লোকনাথ এসে ঠাঁই নিল বারদীতে।

এক ব্রাহ্ম-ভক্ত এসেছে ব্রহ্মচারীর কাছে। মনে অগণন প্রশ্ন, কিন্তু কী আশ্চর্য, উচ্চারণ করে বলতে হয় না। নিজের থেকে উত্তর বলে দেন ব্রহ্মচারী। তোমার মনে তো এই প্রশ্ন, তবে শোনো এই তার সমাধান। উত্তর যাই হোক, হৃদয়স্থ গোপনীয় প্রশ্নটা উনি জানেন কেমন করে? ব্রাহ্ম-ভক্তের ইচ্ছে হল ব্রহ্মচারীর কাছে দীক্ষা নেবে।

অমনি ব্রহ্মচারী জেনে ফেলেছে মনের কথা। প্রবল-কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'না, না, তা হতে পারে না। তোমার গুরু অপেক্ষা করে আছেন। তিনিই তোমাকে ডেকে নেবেন।'

কে গুরু! কবে? কোনখানে?

কী এক উপলক্ষে গোস্বামী-প্রভুর কাছে এসে বসেছে সেই ভক্ত। অমনি গোঁসাইজি বলে উঠলেন, 'পাবেন, আপনি সাধন পাবেন।'

ভক্তের সর্বদেহ পুলকিত হয়ে উঠল। বুঝল ব্রহ্মচারী কার কাছে পাঠিয়েছেন ব্রাহ্ম-ভক্তের ইচ্ছে দীক্ষার সময় তার বাল্যগুরু নগেন্দ্রবাবু উপস্থিত থাকে। কিন্তু কে তাকে খবর দেবে? তাছাড়া মনের এ চাঞ্চল্য পরিস্ফুটই বা করে কী করে?

স্নান করে ক্ষেত্রের ঘরে দীক্ষার আশায় বসে আছে ভক্ত, গোঁসাইজি হঠাৎ বলে উঠলেন 'ক্ষেত্র, নগেন্দ্রবাবুকে ডাকো।'

আশ্চর্য, নগেন্দ্রবাবু উপস্থিত! ভক্তের মনশ্চাঞ্চল্য দূর করে দিলেন প্রভু। নির্বিঘ্ন শান্তিতে দীক্ষা হল।

'সাধন নিলে যিনি যে অবস্থার লোক,' বললেন গোঁসাইজি, 'তাঁকে সেই অবস্থার সব কাজ করতে হবে ঠিক-ঠিক। মানে যিনি সংসারী তিনি সংসার কার্য অবহেলা করতে পারবেন না, যিনি ছাত্র তাকে নিয়মিত মনোযোগ করে পড়াশোনা করতে হবে—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, করব পড়াশোনা।'

প্রভু হাসলেন। বললেন, 'আরো একটা কথা আছে। অভিভাবকের অনুমতি নিতে হবে।'

সর্বনাশ! অনুমতি পাবে কী করে? বড়দা হরকান্ত তো ফয়জাবাদে ডাক্তার। আর মেজদা তো এ-সবের উপরে ভীষণ চটা। ছোড়দাকে বলতে তো তেড়ে এল। বললে, 'যোগ করলে ভীষণ রোগ হয়। মানুষ ভেড়া হয়ে যায়।'

ছোড়দা বলে দিল মেজদাকে। বরদাকান্ত কুলদাকে ডেকে পাঠাল। কুলদাকে দেখে চটি জুতো নিয়ে তেড়ে এল। বললে, 'ফের যদি যোগ শব্দ তোর মুখে শুনি জুতিয়ে পিঠের ছাল-চামড়া তুলে দেব।'

পালাল কুলদা। প্রতিজ্ঞা করল যদি দীক্ষা পাই তা হলে যোগশক্তি প্রথমে মেজদা ও

ছোড়দার উপরে প্রয়োগ করব, গোঁসাইয়ের পায়ে বলি দেব দুজনকে। আর যদি দীক্ষা না পাই তা হলে আত্মহত্যা।

গোঁসাইজিকে গিয়ে বললে, 'অনুমতির কথা বলছেন, অনুমতির ব্যবস্থা আপনিই করে দিন।'

গোঁসাইজি বললে, 'তুমি তোমার বড়দাকে লিখে দাও।'

বড়দা মত দিলেন বটে কিন্তু লিখলেন, 'মা যখন বর্তমান আছেন তখন সর্বাগ্রে তাঁর মত নেওয়াই সমীচীন।'

'মা, আমি দীক্ষা নেব, আমাকে অনুমতি দাও।' মায়ের পায়ে এসে পড়ল কুলদা।

'তুই পৈতে ফেলে ব্রাহ্ম হবি ?'

'না না, আমি গোঁসাইয়ের কাছে সাধন নেব। তুমি অনুমতি না দিলে কিছু হবে না।'

মা কুলদার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। বললেন, 'আমি তো নিজে কিছু ধর্ম-কর্ম করলাম না, তোরা যদি করিস নিষেধ করব কেন ? তুই ধর্ম-কর্ম করবি তাতে আমার খুব অনুমতি আছে, খুব আনন্দ। শুধু বাপ পৈতেটি ফেলিসনে আর আমি যদ্দিন আছি নিরুদ্দেশ হয়ে যাসনে।'

সাধন পেল কুলদা। কিন্তু বড়দা হরকান্ত এসেছে বারদীর ব্রহ্মচারীর কাছে দীক্ষা নিতে। সঙ্গে বরদা কুলদাও এসেছে।

হরকান্ত বললে, 'আমার যথার্থ কল্যাণ কিসে হবে বলে দিন।'

ব্রহ্মচারী বললেন, 'তাহলে গোঁসাইয়ের কাছে গিয়ে দীক্ষা নাও। তিনি আশ্রয় দিলেই তুমি পরম কল্যাণ লাভ করবে।'

মেজদা বরদাকান্ত জিগগেস করলে, 'আর আমি ? আমি কোথায় যাব ?'

'তুমি অর্থোপার্জন করো আর লোকসেবায় তা ব্যয় করো, তাতেই হবে।' ব্রহ্মচারী তাকালেন কুলদার দিকে : 'কি হে, তোমাকে কিছু বলতে হবে না ?'

'বলুন।'

তাঁর আসনের পাশে কুলদাকে বসতে বললেন ব্রহ্মচারী। জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁ রে, তুই তো নিত্যি নোট লিখিস, তাই না ?'

ব্রহ্মচারী তা কী করে জানলেন ?

'তবে তোর খাতায় তোর সম্বন্ধে আমার দুটো কথা লিখে রাখ—বিলাসিতা ত্যাগ কর। বিদ্যা হবে না। কি রে, কথা দুটোর মানে বুঝলি ?'

'মানে আর এমন শক্ত কী,' বললে কুলদা, 'সমস্ত সুখভোগ ত্যাগ হলেই ধর্মে মতি হবে আর ধর্মে মতি হলে লেখাপড়া গোল্লায় যাবে।'

'না রে লেখাপড়া করবি না কেন। খুব লেখাপড়া কর।' বললে লোকনাথ, 'লেখাপড়া করলেই পাশ হবি। কিন্তু বিদ্যা কী অবিদ্যা কী— জানিস না তুই ? সেই বিদ্যার কথা বলছিলাম। আর বিলাসিতা ছাড়বি মানে একখানা কাপড় ও একখানা চাদর মাত্র সম্বল করিস আর পায়ে এক নেড়া চটি-জুতো। শোন তোর ধর্মকর্ম সব হবে। তুই একটা বেদনায় খুব কষ্ট পাচ্ছিস, তাই না ? আমি তোর বুকে হাত বুলিয়ে দি, এখুনি সেরে যাবে।'

কুলদা বললে, 'আমার বেদনা সারিয়ে দেবেন আমি তার জন্যে আসিনি। আমি শুধু আপনাকে দর্শন করতে এসেছি।'

'চলো এ'ড়েদার মন্দিরের চিত্রপট দর্শন করে আসি।' একদিন রামকৃষ্ণ বললেন বিজয়কে।

'আজকাল ভগবানের বিগ্রহ আর চিত্রপট ভাবশুদ্ধরূপে নির্মিত হয় না।' বললে বিজয়।

'কিন্তু এ'ড়েদার মন্দির তার ব্যতিক্রম। যাবে একদিন দেখতে?'

'আপনিও চলুন।'

দুজনে গেলেন এ'ড়েদা। গিয়ে দেখলেন মন্দির বন্ধ। সামনের দরজায় খিল দিয়ে পিছনের দরজা তালাবন্ধ করে চলে গিয়েছে পূজুরী।

আঙিনার প্রান্তে মহাপ্রভুর আমলের এক বৈষ্ণবের সমাধি। তাই দেখতে গেলেন দুজনে। বিজয়ের ভাবাবেশ হল, লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। রামকৃষ্ণ গান ধরলেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে বিজয় আবার এগুলো মন্দিরের দিকে। দেখলেন দরজা তখনো বন্ধ, পূজুরীর দেখা নেই। মন্দিরের সামনে সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়ল বিজয়। আস্তে-আস্তে মন্দিরের সামনের দরজা খুলে গেল। রামকৃষ্ণ আর বিজয় ঢুকলেন মন্দিরে। সে কী, পূজুরী তো আসেনি। পিছনের দরজা তো যেমন তালাবন্ধ ছিল তেমনিই আছে। ঘুরে ঘুরে দুজনে দেখতে লাগলেন। এই সেই চিত্রপট।

কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এল পূজুরী। এ কী, কে খুলল দরজা? কে খুলল তা কে জানে। পূজুরী তখন কী করে, প্রসাদী মালা উপহার দিল দুজনকে।

সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের পাটে ষড়ভুজ মহাপ্রভু দর্শন করতে গিয়েছেন গোঁসাইজি। সঙ্গে আছে শিষ্য ভক্ত। দূর থেকে তাদের দেখে পূজুরী দরজা বন্ধ করে দিল।

'আমরা দর্শন করব।'

'পাঁচ সিকে প্রণামী লাগবে।'

গোঁসাইজি বললেন, 'তা হলে করব না দর্শন।'

মন্দিরের আঙিনায় বন্ধ দরজার সামনে গোঁসাইজি সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়লেন। আর, দেখ কী অপরূপ, মন্দিরের বন্ধ দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেল। গোঁসাইজি সকলকে ডাকতে লাগলেন ব্যাকুল হয়ে: 'আয়, আয়, মহাপ্রভু দরজার পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে ডাকছেন!'

রামকৃষ্ণের ডান হাতখানা ভেঙে গিয়েছে, খুব যন্ত্রণা। একজন ব্রাহ্ম-ভক্ত বললে, 'আপনি তো জীবন্মুক্ত, এই যন্ত্রণাটুকু ভুলতে পাচ্ছেন না?'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তোদের সঙ্গে কথা বলে ভুলব? তোদের বিজয়কে আন। তাঁকে দেখলে আমি নিজেকে ভুলে যাই।'

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অনেক ব্রাহ্ম এসে বিজয়ের কাছ থেকে যোগদীক্ষা নিতে সুরু করল। ব্রাহ্মদের মনে আতঙ্ক জাগল। এ কী অনাচার। প্রকাশ্য সভায় নয়, গোপনে সাধন দেওয়া কী ব্যাপার! তারপর রাধাকৃষ্ণ ও শ্যামা বামা নিয়ে গান? শুনি উনি দেবদেবীর মূর্তির সামনে প্রণত হন, বাড়িতে রেখেছেনও নাকি ও জাতীয় বিগ্রহ? এ সব তো ব্রাহ্মধর্মবিরুদ্ধ। এই লোকের কাছে আবার যোগশিক্ষা কী। ব্রাহ্মরা সমস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল। যোগসাধন করব্যর ইচ্ছে হয়ে থাকে সমাজ হতে পৃথক হয়ে করুন।

বিজয়কৃষ্ণের মত ও সাধনপ্রণালী সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার জন্যে কমিটি বসল। কমিটি বিজয়কে তলব করল অভিযোগের উত্তর দিতে। বিজয় বললে, কৈফিয়ৎ চাইলে

তিনি কোনোই উত্তর দেবেন না, তবু যদি বন্ধুভাবে কেউ আমার বাড়ি এসে আমার সাধন ভজন সম্বন্ধে জানতে চান যথাযথ উত্তর দেব।

কমিটির সভ্যরা বিজয়ের বাড়ি এল। সবিস্তার জেনে নিল তার সাধন প্রণালীর বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য। পরে তারা রিপোর্ট করল। না, ব্রাহ্মমতে চলতে পারে না সাধন প্রণালী। ও সুনিশ্চয় ব্রাহ্মধর্মের অনিষ্টকারী। এর প্রতিকার দরকার। কেন, কী ওর ধরনধারন? প্রথমত সাধনের কথা তার রীতিনীতির কথা কারু কাছে বলা যাবে না। দীক্ষা গোপনে হবে। কেন, যদি তাতে সত্য থাকে তা হলে তার প্রকাশ্য প্রচারে ভয় কী? যে কৃতনিশ্চয় হবে গ্রহণ করবে, যে হবে না সে করবে না। এই তো সাধুতা। ব্রাহ্ম সমাজে কোনো গুপ্ত দল তৈরি হবে এ বাঞ্ছনীয় নয়। তা হলেই ব্যাঘাত হবে ভ্রাতৃভাবের।

গোস্বামীর সাধনে কেবল ভাবুকতা। তাতে মানুষকে স্বাধীনচিন্তাশূন্য ও গুরুমুখাপেক্ষী করে তুলবে। এই মতে উচ্ছিষ্ট ভোজন আধ্যাত্মিক উন্নতির বিঘ্নকারক। উচ্ছিষ্ট ভোজন অন্য কারণে দূষনীয় হোক কিন্তু তার সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্বন্ধ আছে বলে আমাদের বিশ্বাস নয়। এই মতে মাছ খাওয়া চলবে কিন্তু মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। মাছ খেলে ধর্মের হানি হবে না মাংস খেলে হবে এ এক অদ্ভুত যুক্তি। এদিকে বলছে, মানুষগুরু নেই, গুরু একমাত্র পরমেশ্বর অথচ পরোক্ষে প্রচার হচ্ছে গুরুবাদ। গোস্বামীর শিষ্যরা মনে করে গোস্বামীর সাধনই অভ্রান্ত, এইই তো গুরুবাদ। গোস্বামীকে প্রণাম করলে, তার পদধূলি মাথায় নিলে, তার পায়ে মাথা দিয়ে পড়ে থাকলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়—এ অতি মারাত্মক কথা। তাছাড়া গোস্বামীর কাছে রাধাকৃষ্ণের ছবি। যতই তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা থাক ওতে ব্রাহ্ম সমাজের ঘোর অনিষ্ট হয়েছে। সুতরাং তা সম্পূর্ণ বর্জন করা উচিত। আবার বলছে কিনা ভগবানকে কালী দুর্গা কৃষ্ণ বলেও ডাকা যায়। কালী-দুর্গা নামের সঙ্গে দেশপ্রচলিত পৌত্তলিকতা ওতপ্রোত ভাবে সংশ্লিষ্ট। ঐ নাম উচ্চারণ করলে সেই সব প্রতিমাকে মনে পড়ে। ব্রাহ্মগণ ব্রহ্মনামের পরিবর্তে কালী দুর্গা কৃষ্ণ প্রভৃতি পৌত্তলিক নাম ব্যবহার করতে পারবে না। সুতরাং গোস্বামীমত চলতে পারে না কিছুতেই। এর প্রতিকার না হলে ব্রাহ্মধর্মের বিলক্ষণ ক্ষতি। প্রত্যুত্তরে বিজয়ের কী বলবার আছে বলুক।

১৬

বিজয় পদত্যাগপত্র দাখিল করল। থাকব না প্রচারক।

সেই পত্রে লিখল: 'সত্যস্বরূপ জ্ঞানপ্রেমমঙ্গলময় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে দিব্যচক্ষে দর্শন করা যায় আর তাই ব্রাহ্মধর্মের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। ঈশ্বরের সত্তাসাগরে নিমগ্ন থেকে জীবন যাপন করাই একমাত্র কাজ।

ব্রহ্মলাভ শুধু মানুষের নিজের চেষ্টায় হয় না। ঈশ্বরের কৃপার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে যথাসাধ্য সাধন ভজন করাই একমাত্র পথ। আমি পরমহংস বাবাজির প্রদর্শিত যোগসাধনের পথ অবলম্বন করেছি। এই সাধনে বাহ্যিক কোনো সংশ্রব নেই, এ সম্পূর্ণ আভ্যন্তরিক আধ্যাত্মিক বস্তু। তবে ভূতশুদ্ধির জন্যে কিছুদিন প্রাণায়াম

করতে হয়। কিন্তু সেটা আমাদের সাধন নয়। তাই বাইরের লোকের সামনে আমরা সাধন করি না। বাইরের লোক আসল তত্ত্বকথা কিছুই বুঝবে না, শুধু বাইরের প্রাণায়ামটুকু দেখবে। তাই দেখে যদি তাদের প্রাণায়ামে অশ্রদ্ধা হয় তাহলে তাদেরই আধ্যাত্মিক অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা।

আমরা কোনো সম্প্রদায় মানি না। যে কেউ আন্তরিক ব্যাকুল হন, হিন্দু ব্রাহ্ম মুসলমান খৃষ্টান, সকলেই এ সাধন পেতে পারেন। পাপ আচার পাপ চিন্তা পাপ কল্পনা আর অহঙ্কারই এ সাধনার ব্যাঘাত।

এতে গুরুবাদের লেশমাত্র নেই। ঈশ্বরই একমাত্র গুরু আর সকলে তাঁর নির্বাচিত উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক। যেমন বৃক্ষ লতা নদী পর্বত গ্রহ নক্ষত্র নানা উপায়ে শিক্ষা দেয় তেমনি মানুষও এক অনুরূপ উপায়। মানুষের মধ্যেই যোগশক্তি প্রবলতম। তাই শক্তিশালী মানুষকে গুরু বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই। স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি তো ঈশ্বরের দান কিন্তু তাতে একটা কুটো পড়লে তা তুলে নিতে মানুষ লাগে।

গুরুজনদের শ্রদ্ধাভক্তি করা ধর্মসংগত। পদধূলি নেওয়া সম্বন্ধে আমাদের কোনো নিষেধ নেই। আত্মার যে অবস্থায় পদধূলি নিতে ইচ্ছে হয় সেই বিনীত অবস্থা অত্যন্ত সুন্দর ও উপকারী। এইজন্য কারু উপকার হচ্ছে দেখলে পদধূলি নিতে বাধা দিই না। আমিও সকলের পদধূলি নিয়ে থাকি। আমাকে যিনি যখনই প্রণাম করেন, এ প্রণাম বিশ্বগুরুর প্রাপ্য এই অর্থে আমি 'জয় গুরু' উচ্চারণ করে থাকি। একটি প্রণামও নিজে পাই না, নিজে নিই না।

উচ্ছিষ্টভোজন উচিত মনে করি না, তবে বাপ-মা যদি আদর করে উচ্ছিষ্ট দেন আর যদি কোনো শ্রদ্ধেয় ধর্মাত্মার ভুক্তাবশেষকে প্রসাদ বলে মনে হয় তবে তা আহার করি। সে আহারে ক্ষতি নেই বরং উপকার আছে।

আমার ঈশ্বর সর্বব্যাপী। যদি দেবতার মন্দিরে কালী দুর্গা বা অন্য প্রতিমার সামনে আমার ব্রহ্মস্ফূর্তি হয়, আমি আত্মহারা হয়ে সেখানেই গড়াগড়ি দিই। যেখানে তাঁর দর্শন পাই সেখানেই আমি তন্ময় হই, ক্ষুদ্র স্থান-বিচার থাকে না।

কালী দুর্গা নামে ভগবানকে ডাকতে আমি কোনো দোষ দেখি না। যখন যে নামে প্রাণে আরাম পাই তখনই সে নামে ডাকি। তবে ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনার সময় ঐ সব নাম ব্যবহার করেছি বলে মনে হয় না।

রাধাকৃষ্ণ ভাব যোগপথের শ্রেষ্ঠ সহায়। এত বড় ভাব আর কোথাও দেখিনা। রাধা ভক্ত কৃষ্ণ উপাস্য। সর্ব প্রযত্নে আমি ঐ ভাবসাধনের চেষ্টা করি। যারা ঐ আধ্যাত্মিক ভাবে উপকার পায় তাদের নিয়ে আমি একত্র রাধাকৃষ্ণের গান গাই। তবে ব্রাহ্মমন্দিরে ঐ নাম গ্রহণ করিনি।

যাই হোক, যদিও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আন্তরিক যোগ ক্ষুণ্ণ হবার নয়, আমি সামাজিক সম্বন্ধ প্রচারকপদ পরিত্যাগ করলাম। এখন থেকে যা ধর্ম প্রচার করব তা সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে।

বিজয়ের কৈফিয়ৎ গ্রাহ্য হল না। পদত্যাগপত্র গৃহীত হল।

কলকাতার ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করলেও পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করল গোঁসাইকে। ঢাকার প্রচারনিবাসে এসে উঠল বিজয়। রাষ্ট্র হয়ে গেল বিজয় পৌত্তলিক হিন্দু হয়ে গিয়েছে, ব্রাহ্মসমাজে তার স্থান হয় কী করে?

'সাধারণের নিকট নিবেদন' এই নামে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করল বিজয়। লিখল, আমি পৌত্তলিক হিন্দু হয়ে গিয়েছি এ কথা সম্পূর্ণ অসত্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্যেই তার সঙ্গে বাইরের সম্পর্ক ছিন্ন করেছি, কিন্তু মনে প্রাণে আমি এখনো ব্রাহ্ম। আমার কোনো সম্প্রদায় নেই, সব সম্প্রদায়ই আমার। আমি সকলের সেবক, সব সমাজের। যেখানে যতটুকু সত্য ততটুকুই আমার ব্রাহ্মধর্ম।

আমি জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার বিরোধী। একমাত্র পরমেশ্বরকেই উপাসনার লক্ষ্য ও সাধন বলে জানি। তিনিই একমাত্র গুরু, তবে বিশ্ব-সংসারের আর সকল পদার্থের মতো মানুষের থেকেও ধর্ম শিক্ষা করি। যারা ধর্মোপদেশ দেয় তাদের যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা করা উচিত বলে মনে করি। কালী দুর্গা বা রাধাকৃষ্ণের নাম আমি সজনে কি নির্জনে কখনো জপ করি না। রাধাকৃষ্ণের পৌরাণিক অশ্লীল ভাব অত্যন্ত ঘৃণা করি কিন্তু রাধাকৃষ্ণের মধ্যে সাধক ও পরমেশ্বরের প্রেম-সম্বন্ধীয় যে আধ্যাত্মিক রূপক আছে তার ভাব অত্যন্ত উঁচু বলে মনে হয়। নিরাকার পরমব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করে যে কেউ যে নামে ডাকুক সে সেই নামে তাকে লাভ করবে। ঈশ্বরের আবার নাম কী। যে নামে ডাকুক ঈশ্বরকে বোঝালেই হল। অর্থ অন্য কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করলেই তা বর্জনীয়। সকল প্রকার অবতারবাদ, অভ্রান্তগুরুবাদ ও মধ্যবর্তীবাদে মানবাত্মার অধোগতি হয় বলে বিশ্বাস করি।'

মাঘোৎসবে সকালে কীর্তনের দল নিয়ে হরিনাথ মজুমদার এসে হাজির। চলতি নাম কাঙাল ফিকিরচাঁদ। গান বাঁধতে যেমন ওস্তাদ তেমনি গান গাইতে। প্রচারনিবাস লোকে লোকারণ্য।

কাঙাল গান ধরেছে, 'মা নই আমি সে ছেলে। যার আছে সাধনের জোর, সে কি মা তোর ভয় করে তুই ভয় দেখালে?'

ঘরের ভিতরে বাইরে সবাই বসে, শুধু গোঁসাই দাঁড়িয়ে আছে তার আসনে। দু গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে। বাঁ হাত বুকের উপর, ডান হাত মুদ্রাবদ্ধ হয়ে ব্রহ্মতালুতে। থেকে থেকে শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে। মাঝে মাঝে 'হরিবোল' বলে লম্ফ দিয়ে উঠছে, স্থির হয়ে দাঁড়ালেই কাঁপছে থর থর করে। পড়ে যাবার উপক্রম হলেই শ্যামাকান্ত পণ্ডিত ধরে ফেলছেন হাত বাড়িয়ে। কতক্ষণ পরে গোঁসাই খলখল করে হেসে উঠল। এমন উদ্দাম দীর্ঘ হাসি শোনেনি কেউ কোনো দিন।

হঠাৎ ডান হাত নামিয়ে নিয়ে এসে সামনের দিকে ইঙ্গিত করে গোঁসাই বললে, 'ঐ দেখ ঐ দেখ, তোমরা সকলে দেখে নাও, পাগলা এসেছে। ঐ যে পাগলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেতে চায়। ধর ধর ধর—' সামনের দিকে এগুলো গোঁসাই, পরে আবার নিরস্ত হয়ে বললে, 'না, ফিরেছে। বাব্বাঃ কত বড় গরু। ওটা কেমন দেখ, কপালে একটা চোখ, সেটার জ্যোতি কত, সূর্যের মতো মতো আবার কী, সূর্যই তো! উঃ, কত বড় শিং। আর আহা, ঐ দেখ নন্দী-ভৃঙ্গী, প্রথমে মনে করেছিলাম ওরা কেউ নয়, এখন দেখছি—পাগলার সঙ্গেই আসছে!' সামনের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে নমস্কার করছেন আর বলছে: 'আবার দেখ আমার মা এসেছেন। আহা, কত যোগী কত ঋষি মার চার দিকে নাচছে, শ্রীচৈতন্য, বাল্মীকি, নারদ, বশিষ্ঠ—বাড়ির সামনে সবটা ভরে গেল। মাকে নিয়ে সবাই আনন্দ করছে। তামাসা দেখ, মাও নাচছেন। ঐ দেখ, ডাকছেন, মা আমাকে ডাকছেন—' মাটিতে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল গোঁসাই।

প্রণাম করে বসল স্থির হয়ে। ক্ষণে-ক্ষণে হাসছে আর কাঁদছে নিরর্গল। তারপরেই সমাধিশান্ত হয়ে গেল। এগারোটা বাজে তবু সমাধি ভাঙে না।

কে আর কত বসে থাকবে, যে যার বাড়ি ফিরে চলল গোঁসাই নির্বিচল।

কুলদানন্দ ছিল সেখানে, তার মনে সংশয় জাগল, এ কী কাণ্ড! নিরাকার ব্রহ্মবাদীদের প্রধান আচার্য হয়ে তাদেরই মন্দিরে এ কী পৌত্তলিকতা! নইলে নন্দী-ভৃঙ্গী কী, নারদ-বাল্মীকিই বা কে। ব্রাহ্মরা এ সব সহ্য করছে কী করে?

ব্রাহ্ম নবকান্তবাবুর কাছে গিয়ে নালিশ করল। রজনীবাবুর কাছেও।

তাঁরা বললেন, 'মাঘোৎসবটা হয়ে যাক, তারপর দেখে নেব।'

দুপুরে আবার গেল কুলদা। দেখলে সবাই পাত পেড়ে খেতে বসেছে, কিন্তু কেউ খাচ্ছে না। বারদীর কুঞ্জলাল নাগ খোল বাজিয়ে গান করছে। খোলে নানারকম আওয়াজ বেরুচ্ছে, মনে হচ্ছে একটা খোল নয়, যেন অনেক খোল একসঙ্গে বাজছে একতালে। ভাতের গ্রাস হাতে ধরা, সবাই বাহ্যজ্ঞানহীন নিস্পন্দ হয়েছে। কেউ কাঁদছে, কাঁপছে, ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে, কেউ কেউ বা উচ্ছিষ্ট পাতার উপর গড়িয়ে পড়ছে। এ কী ভূতের কাণ্ড! কুঞ্জলাল উন্মত্ত হয়ে লাফাচ্ছে আর খোল বাজাচ্ছে। ফিকিরচাঁদ পড়ে আছে সাষ্টাঙ্গ হয়ে। গোঁসাই তার আসনে সমাহিত।

কতক্ষণ পরে চোখ চাইল গোঁসাই। বললে, 'অতলস্পর্শ মহাসাগরে এক গণ্ডূষ মাত্র জলে গিয়ে পড়েছিলাম। সাগরের যে ঢেউ, এক ধাক্কায় আবার তীরে এনে ফেলেছে। আহা, যাঁরা এই সাগরে গিয়ে পড়েছেন, ঢেউয়ে-ঢেউয়ে কত তাঁরা নাচছেন, কত তাঁরা আনন্দ করছেন—'

সন্ধ্যার সময় আবার সেই মা-মা, সেই শৈশবকাতরতা। মা, তুমি আমাকে কেন ডাকছ? তুমি আমাকে হাত ধরে কোথায় নিয়ে যাবে? ঐ মুনি-ঋষিদের মধ্যে গিয়ে কি আমি বসতে পারি? আমার সাধ্য কী সেখানে বসি। আমি যে পাপী—নিতান্ত পাপী—

বলতে-বলতে ডাকতে-ডাকতে কাঁদতে-কাঁদতে আবার সমাহিত গোঁসাই।

রাত বাড়তে লাগল, মন্দিরগৃহ ফাঁকা হয়ে গেল, তবু বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল না, বেদীর উপর বসে রইল নিশ্চেতন। কিংবা কে জানে, চৈতন্যময়!

কিন্তু গোঁসাইয়ের বক্তব্য কী স্পষ্ট করা দরকার। কুলদা ও আরো অনেকে তাকে ধরল আপনার বক্তব্য বক্তৃতায় প্রাঞ্জল করুন। 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা' সম্পর্কে বলুন। ও সব বলতে পারব না, গোঁসাই 'না' করে দিল। তা হলে, বেশ, 'পৌত্তলিকতা ও ব্রহ্মজ্ঞান' সম্বন্ধে বলুন। সাম্প্রদায়িক ভাবের কোনো কথাই বলতে পারব না। গোঁসাই দৃঢ় থাকল।

'তা হলে ব্রহ্মোপাসনা নিয়ে বলুন।'

'বেশ, আমি ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মবাদী বিষয়ে বক্তৃতা দেব।'

সন্ধ্যায় প্রচণ্ড ভিড় হয়েছে। মন্দিরের ঘরে-বারান্দায় তিলধারণের স্থান নেই। চার পাশের মাঠও ভরে গিয়েছে। ক্যাথলিক চার্চের পাদ্রী বার্ণার্ড'ও এসেছে, দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে। কী না জানি বলে। কী না জানি তার ব্যাখ্যা ব্যঞ্জনা!

কিন্তু দু-এক কথা বলতে-না-বলতেই বালকের মতো কাঁদতে লাগল বিজয়কৃষ্ণ: 'যে ব্রহ্মের মহিমার কণিকামাত্র বর্ণনা করতে গিয়ে, পার না পেয়ে, বেদ উপনিষদ, অনির্বচনীয় বলে ক্ষান্ত হয়েছে, সেই ব্রহ্মের কথা আমি বলব? তুচ্ছাদপি তুচ্ছ আমি, অজ্ঞান আমি—

আমার মুখে আপনারা সেই ব্রহ্মের কথা শুনবেন ?' বলেই আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল। কিছুতেই ভাবের আবেগ রোধ করতে পারলেনা। শেষে নিরস্ত হয়ে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে বসে পড়ল। যুক্তকরে সবাইকে বললে, 'আমাকে আপনারা আশীর্বাদ করুন। দয়া করে আমার মাথায় সকলে পদাঘাত করুন, আমার অহংকার চূর্ণ করে দিন। আমি ভয়ানক অভিমানী—তাঁর কথা বলব ? তাঁর কথা বলতে আমি স্পর্ধা করি ? আমি তাঁর কী জানি ! আমি ছাই ! আমি ছাই !'

পুরাণপুরুষের স্তব করতে গেল, কয়েকটা শ্লোক বলেই কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল। শুধু হুং হিং হুং হি বলতে বলতে চলে গেল সমাধিভূমিতে !

চন্দ্রনাথ হার্মোনিয়ম বাজিয়ে গান ধরল, তবু গোঁসাইয়ের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল না।

লোক উঠে যেতে লাগল। কেউ-কেউ বললে, 'বক্তৃতা শুনে যে উপকার হত তার চেয়ে ঢের বেশি উপকার হল গোঁসাইজিকে প্রত্যক্ষ করে।'

ব্রাহ্মসমাজ থেকে ভীষণ প্রতিবাদ উঠল। যে লোক পৌত্তলিকতাকে প্রশ্রয় দেয়, শাস্ত্র অভ্রান্ত বলে, হিন্দুদের আচারপন্থীকে প্রশ্রয় দেয়, তাকে দিয়ে সমাজের কোনোই শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। সুতরাং প্রচারকের আসনে সে কী করে বসে ? গোঁসাই সরে দাঁড়াল। প্রচারক থাকতে চাই না। নির্জনে সাধন ভজনে দিন কাটিয়ে দেব।

ঘরে গোঁসাই নেই, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা তাঁর শূন্য আসনকে নমস্কার করল। মনোরঞ্জন তেজী ব্রাহ্ম তবে এ কী পৌত্তলিকতা ?

কুলদা ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, 'আপনি না আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ?'

'তাতে কী ?'

'তাতে কী মানে ? আসনে কেউ নেই, তবু ওখানে নমস্কার করলেন কেন ?'

'আমি কি আসনকে নমস্কার করলাম ?' মনোরঞ্জন বললে, 'আমি গোঁসাইকে নমস্কার করলাম। ব্রাহ্ম হয়ে কি গোঁসাইকে নমস্কার করা যায় না ?'

'ওখানে গোঁসাই কোথায় ? গোঁসাই তো পাশের ঘরে।'

'তা হোক। গোঁসাই স্মরণ করে আমি ওখানে নমস্কার করেছি।'

'তা হলে তো সেই বিগ্রহকেই প্রণাম করা হল। ব্রাহ্ম হয়ে আপনি তা বলতে সাহস করেন ? তা হলে হিন্দুদের কুসংস্কারী বলেন কেন ?'

তুমুল তর্ক চলছে, পাশের ঘর থেকে গোঁসাই বলে উঠলেন : 'শূন্য আসনের সামনে কেউ যেন না নমস্কার করেন। মিছে আলোচনা ও অশান্তি বাড়িয়ে লাভ নেই।'

আবার আরেক দিন শূন্য আসনের সামনে কুলদা দেখতে পেল এক জোড়া খড়ম। যেমন বড়ো তেমনি পুরোনো।

'এ খড়ম কার ?'

মুক্তকেশী দেবী বললেন, 'ব্রহ্মচারী গোঁসাইকে দিয়েছেন।'

'কে ব্রহ্মচারী ?'

'ব্রহ্মচারীকে চেন না ? বারদীর ব্রহ্মচারী।'

'তার কথা গোঁসাই কী করে জানলেন ?' কুলদা কৌতূহলে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

'সমাধি অবস্থায় জানলেন যে একজন মহাপুরুষ বারদীতে গোপন হয়ে আছেন, তাই তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন।'

'কিন্তু খড়ম ?'

মুক্তকেশী বললেন, 'ব্রহ্মচারী বললেন তিনি গোঁসাইয়ের পিতামহের খুড়ো হন। পূর্ণ পুরুষের চিহ্ন বলে ঐ খড়ম তাঁকে দিয়েছেন।'

'পিতামহের খুড়ো—ব্রহ্মচারীর বয়েস কত ?'

'একশো ছাপ্পান্ন বছর।'

ঢাকা ছেড়ে বিজয়কৃষ্ণ চলে এল কলকাতা। কলকাতা থেকে বর্ধমান। বর্ধমানে দেখল পলাশ গাছে অজস্র ফুল ফুটে আছে। প্রগাঢ় রক্তিম সমারোহ। বিজয়ের ভগবতী দর্শন হল। ভাবাবেশে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। আরেক দিন মহারাজার গোলাপবাগানে গিয়ে গোলাপবৈচিত্র্য দেখে অনুরূপ ভাবাবেগ।

বর্ধমান থেকে গোঁসাই চলে এল দ্বারভাঙ্গা। উঠল রাধাকৃষ্ণবাবুর বাড়িতে। আর সে বাড়িতেই তার ডবল নিমোনিয়া হল।

ঢাকায় খবর এসে পৌঁছুল, দুটো ফুসফুসই পচতে আরম্ভ করেছে। অবস্থা খারাপ। বাঁচবার আশা নেই বললেই চলে।

গোঁসাইয়ের ভক্ত শ্যামাচরণ বক্সি তখুনি ছুটল বারদীতে। ব্রহ্মচারীর পায়ে লুটিয়ে পড়ল : 'আমার গুরুদেবকে দয়া করে বাঁচান।'

ব্রহ্মচারী হাসল। বললে, 'তা, তিনি গেলেনই বা। আমিই তো রয়েছি।'

'আমরা আপনাকে চাইনা। তাঁকে চাই।'

'গুরুর জন্যে কী স্বার্থত্যাগ করতে পারিস ?'

'গুরুর জন্যে আমার অর্ধেক পরমায়ু দিয়ে দিতে পারি।'

ব্রহ্মচারী নিশ্বাস ফেলে বললে, 'সময় শেষ করে এসেছিস। এখন আর কী হবে ?'

শ্যামাচরণ আকুল চোখে কেঁদে ফেলল।

'তার ঘরে তো কই তাকে দেখতে পেলুম না।' বললে ব্রহ্মচারী, 'হয় হয়ে গেছে, নয়তো তার গুরু তাকে দেহ ছেড়ে থাকবার শক্তি দিয়েছেন। আচ্ছা, তুই যা। দেখি কী করতে পারি।'

ব্রহ্মচারী ঘর বন্ধ করে দিল। সবাইকে ডেকে বললে, 'যত দিন ভিতর থেকে দরজা না খুলি কেউ দরজায় ঘা দিও না বা খুলতে চেষ্টা কোরো না।'

টেলিগ্রাম পেয়ে যোগজীবন, কুঞ্জ, প্রসন্ন—সবাই রওনা হয়ে গেছে। হঠাৎ যোগজীবন আকাশপথে ব্রহ্মচারীকে দেখতে পেল।

'ঐ দেখ ব্রহ্মচারীও যাচ্ছেন দ্বারভাঙ্গায়।' বলে উঠল যোগজীবন।

আর তবে ভয় নেই।

এদিকে গোঁসাইয়ের জ্ঞান নেই। নাড়ি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ডাক্তার বললে, 'বড় জোর আর আধঘণ্টা।'

রাধাকৃষ্ণবাবু একতারা বাজিয়ে সজল কণ্ঠে কাতর প্রাণে ভগবানের নাম গান করতে লাগল। আর সকলে গাইতে না পেরে কাঁদতে লাগল। কারা যেন সব এসেছে। একবার দেখা দিচ্ছে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। একজন তো বারদীর আরো দুজন সূক্ষ্মদেহী মহাপুরুষ। গোঁসাইয়ের দেহ স্থির, অসাড়, নিস্পন্দ। হঠাৎ কী হল কে জানে, দু একবার মাথা নাড়া দিয়েই চকিতে গোঁসাই লাফিয়ে উঠল। হরিবোল! বলে নাচতে লাগল উদ্দাম হয়ে।

এ কী হল ? এ কী অসম্ভব ব্যাপার !

ডাক্তারবাবুদের ডেকে নিয়ে এস !

আর ডাক্তারবাবু। সবাই হুঙ্কারে গর্জনে মেতে উঠল হরিকীর্তনে। হরিবোল ! হরিবোল ! সমস্ত ব্যথা ও ব্যাধির হরীতকী—হরিবোল ! হরিবোল !

ডাক্তারবাবুরা এল হন্তদন্ত হয়ে। তারা তো হতবাক। মরে যাওয়া রুগী শুধু উঠে দাঁড়ায়নি, উদ্দণ্ড নৃত্য করছে।

আমরা কোথায় আছি ! বিজ্ঞান কোথায় আছে !

১৭

দ্বারভাঙ্গায় গুরুদেব পরমহংসের সঙ্গে দেখা হল বিজয়ের। জিগগেস করল, 'আমার এ কী অবস্থা হল বলুন দেখি।'

'এ অবস্থা সাধনলব্ধ। বলতে পারো সাধনের ফল।' বললেন পরমহংস, 'তুমি হঠযোগপ্রদীপ ও বিচারসাগর বই দুখানি এনে পড়ো, দেখবে অবিকল মিলে গেছে।'

কোথায় পাওয়া যাবে বই ? পরমহংস দোকানের নাম বলে দিলেন। দাম কত ? তাও বলে দিলেন। আর এও বলে দিলেন, একখানা করেই আছে দোকানে।

চিহ্নিত দোকানে নির্দিষ্ট মূল্যে পাওয়া গেল বই।

'মলাট কেমন ময়লা-ময়লা লাগছে। বদলে দিন।'

দোকানদার বললে, 'ঐ একখানা করেই আছে। বদলানো যাবেনা।'

বই পড়ে দেখল, যে যে অবস্থা সে উপলব্ধি করছে সবই বর্ণিত আছে গ্রন্থে। সত্যি, আগে এ বই পড়া থাকলে ভাবত ও সব অবস্থা বই পড়ার ফল। এখন ফলের পর বই দেখলে বিশ্বাস হল ফলটা আমার করে-পাওয়া, পড়ে-পাওয়া নয়। তাই বারে বারে বলি, আগে লাভ পরে শাস্ত্র।

সিদ্ধাই বা শক্তি চেয়ো না। শক্তিলাভ অত্যন্ত তুচ্ছ। যে ঈশ্বরকে চায়, ব্যাকুল হতে ব্যাকুলতর হয়ে চায়, তার আপনিতেই শক্তি জোটে, কিন্তু তাতে সে আকৃষ্ট হয় না, তার সমস্ত লক্ষ্য ঈশ্বর, 'পরানুরক্তিরীশ্বরে'। তার বাজীকরে লক্ষ্য, দু দণ্ডের ভেলকিবাজীতে নয়।

দ্বারভাঙ্গা থেকে বিজয় চলে এল বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথ থেকে হুগলি জেলার নৈপাড়া গ্রামে। সেখান থেকে কোন্নগর। কোন্নগরে তখন ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হচ্ছে। প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম ও ভক্ত নগেন চট্টোপাধ্যায় প্রচারকনিবাসে আছেন, সঙ্গে স্ত্রী মাতঙ্গিনী দেবী। একদিন সন্ধের দিকে গোঁসাই এসে উপস্থিত। সঙ্গে শ্রীধর ঘোষ, শ্যামাকান্ত আর নবকুমার।

কী আশ্চর্য, কোত্থেকে একটা কুকুর এসে হাজির। দুটো পা ভাঙা, ছেঁচড়াতে-ছেঁচড়াতে এসে, কে জানে কেন, গোঁসাইকে পরিক্রমণ করল। শেষে তার পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রইল। যথারীতি আরম্ভ হল কীর্তন। এ কী, কীর্তনান্তে দেখা গেল, কুকুর দেহ রেখেছে।

'ওকে গঙ্গায় বিসর্জন দাও।' বললে গোঁসাই।

রাতে মাতঙ্গিনী স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন, গোপাল এসেছে, বালগোপাল।

গোপালের সারা গায়ে অলঙ্কার, পায়ে নূপুর, উঠোনে ছুটোছুটি করছে। মাতঙ্গিনী তাকে ধরতে ছুটলেন সেই যশোদার মতো। ধরে ক্লান্ত শিশুর মুখ চুম্বন করতে লাগলেন। কিন্তু এ কী, এ গোপাল কোথায়? কী আশ্চর্য, এ যে গোঁসাই।

ঘুম থেকে উঠে সকালে নতুন কাজললতা কিনে আনলেন মাতঙ্গিনী। কাজল তৈরি করলেন। গোঁসাইয়ের কাছে এসে বললেন, 'এস আমার গোপালকে কাজল পরিয়ে দি।' গোঁসাই বাধা দিলেন। চোখে কাজল তো এঁকে দিলেনই, মাথায় চুড়ো বেঁধে দিলেন। ছোট ধামাতে করে মুড়ি-মুড়কি বাতাসা খেতে দিলেন, তারপরে গান ধরলেন :

'দেখ সবে আসি যত নদেবাসী আমার গৌরাঙ্গ চাঁদে।
গোরা প্রভাতে উঠিয়া অঞ্চল ধরিয়া ননী দে মা বলে কাঁদে॥
ননী কোথা বা পাব?
আমি নহি আহিরিণী কোথা পাব ননী, পড়িনু বিষম ফাঁদে॥'

গোপালকে বুকে টেনে নিলেন যশোমতী। গোঁসাই বললে, 'মা, আমাকে পরিয়ে দাও। আমি যেন বিশ্বচরাচরে সর্বত্র তোমার ভুবনমোহিনী রূপ দেখি।'

নগেনবাবুদের বাসার ঝি-র দারুণ ইচ্ছে গোঁসাইয়ের কাছ থেকে দীক্ষা নেয়। মাতঙ্গিনী গোঁসাইকে বললেন, 'তুমি তো কত পতিতকে উদ্ধার করেছ, এ দীনহীনাকেও দয়া করো।'

এক কথায় রাজি হয়ে গোঁসাই ঝিকে দীক্ষা দিল। দীক্ষা পাওয়ামাত্রই ঝি-র নিদারুণ ভাবাবেশ হল, মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল; লজ্জাসরমের ধার ধারলনা। উন্মত্তের মতো ব্যবহার করতে লাগল। সন্দেহ নেই তার কুলকুণ্ডলিনীর ঘুম ভেঙেছে।

মাতঙ্গিনী গান ধরলেন :

'ভবপারে যেতে ভয় কি আছে রে।
ঐ দেখ নামতরী লয়ে হরি নাবিক সেজেছে
পারের ভয় নাই, ভয় নাই।
ঐ দেখ পতিতপাবন দয়াল হরি কাণ্ডারী সেজেছে॥

গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসেছে সেই ঝি। এক সাধু কাছে এসে তাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল। বললে, 'মা, এই জিনিস তুই কোথায় পেলি?'

ঝি হাসতে লাগল।

'এ যে দেখি তোর উপর সদগুরুর কৃপা হয়েছে।'

কুসুম মাতঙ্গিনীর বাল্যসখী। দুজনে মিলে ভোগ রসুই করছে। রান্নার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে কীর্তন। ভাবের আবেশে ভুষিসহ খিচুড়ি পাক করেছে। আবার সোনায় সোহাগা, তাতে আবার পোড়া লেগেছে।

'আমরা কী করব', ভোগের সময় গোঁসাইকে বললে মাতঙ্গিনী, 'রান্নার সময় তুমি আমাদের বিহ্বল করলে কেন? তাই ভুষিওলা খিচুড়ি হয়েছে আর তাও পোড়া লেগেছে। এখন ভালোমন্দ জানিনা, যেমন করেছ তেমনি খাও।

'কী বলো, এই খিচুড়ি স্বয়ং গোলোকের লক্ষ্মী রেঁধেছেন।' বললে গোঁসাই, 'এ সুধার চেয়েও সুস্বাদু।' পরম তৃপ্তিতে খেতে লাগল গোঁসাই।

কোন্নগর থেকে চলে এল শান্তিপুরে। শান্তিপুর থেকে বাগেরহাট। 'মানুষের প্রাণ অনন্তকেই চায়'—বাগেরহাটে এই বিষয়ে বক্তৃতা করে সকলকে অভিভূত করল।

অন্তরে ঈশ্বরকে চিন্তা করো। সেই আন্তর চিন্তার নামই ধ্যান। তিনি আমার অন্তরে আছেন অনর্গল এই চিন্তা করতে করতেই অন্তরে ঈশ্বরপ্রকাশ ঘটে। তখন তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে হয় অনিমেষে। এই অনিমেষদর্শনই ধ্যান। কী অপরিসীম দয়ায় তিনি আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। পৃথিবীতে কোনো দয়ালু মানুষ আমাকে কিঞ্চিন্মাত্র সাহায্য করলে আমি তাকে কত কৃতজ্ঞতা জানাই। কিন্তু যাঁর সাহায্য ছাড়া এক মুহূর্তও বাঁচতে পারি না, তাঁকে প্রাণভরে প্রণাম না করে থাকতে পারি কই? আমি পাপী তাপী অপরাধী, আমাকে লোকে ঘেন্নায় ছুঁতে পর্যন্ত চায় না. কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি পরমেশ্বর আমাকে ঘৃণা করেন না, বরং আমাকে স্পর্শ করেন, নিবিড় প্রেমে স্পর্শ করেন। আমার যা কিছু আত্মগ্লানি সেও তাঁর করুণা। আমার পাপবৃত্তি ভস্মীভূত হবে বলেই এই আত্মগ্লানি। আর এই আত্মগ্লানিতে নির্মল হবার পরেই আত্মসমর্পণ। ঈশ্বরসহবাসই চিরন্তন যোগাবস্থা।

বিজয় তারপর বরিশালে এল। উঠল রাখালদাসবাবুর বাসায়। রাখালদাসের মা-মরা মেয়ে চারুকে দীক্ষা দিল। দীক্ষার পরেই মেয়ে উপরে-নিচে ছুটোছুটি করতে লাগল। কী যেন খুঁজছে, কাকে যেন ধরতে-ছুঁতে চাইছে, নাগাল পাচ্ছে না।

'এমন করছিস কেন?' রাখালদাস ব্যস্ত হয়ে জিগগেস করলে।

চারু কিছুই বলে না. কেবল ছুটোছুটি করে বেড়ায়। মেয়েটা পাগল হয়ে গেল না কি? গোঁসাই কোথায়? গোঁসাইকে ডাকো। গোঁসাই বাইরে কোথায় বেরিয়েছে। চারু ক্লান্ত হয়ে তার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। দরজায় খিল চাপিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছে তারস্বরে। এ কী হল? কাঁদছিস কেন? রাখালদাস দরজায় ধাক্কা মারতে লাগল। দরজা খোল লক্ষ্মীটি।

চারু দরজাও খোলে না, কান্নাও থামায় না।

গোঁসাই বাড়ি ফিরেছে। গম্ভীরমুখে বললে, 'চারু তার মাকে দেখতে পেয়েছে। কিছু চিন্তা করবেন না। এখুনিই শান্ত হয়ে যাবে।'

শান্ত হয়ে গেল চারু। দরজা খুলে বেরিয়ে এসে রাখালদাসকে প্রণাম করলে। বললে, 'বাবা, মা এসেছিলেন। শেষকালে ধরা দিলেন, আমার কাছে এসে বসলেন।'

'কিছু বললেন না?'

'বললেন, কেঁদ না, আমি এখন যাই, আবার সময়মত আসব, দেখা দেব।'

মনে হয় গোঁসাইয়ের কাছেও কেউ আসে। একা ঘরে বসে তার সঙ্গে গোঁসাই সরবে আলাপ করে। অথচ যার সঙ্গে আলাপ করে তাকে দেখা যায় না, শোনা যায় না।

'কার সঙ্গে বসে কথা কন?' রাখালদাস জিগগেস করল।

গোঁসাই হাসতে লাগল।

'কে আসে আপনার কাছে?'

'আমার গুরুদেব—পরমহংসজি।'

'কই আমরা তো দেখিনা।'

'এক-এক দিন এক-এক বেশে আসেন।' বললে গোঁসাই, 'ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করে যান।'

'শুধু ধর্ম?'

'একবার মোকামাঘাট স্টেশনে পাকা লিচু নিয়ে এসেছিলেন—' হাসল গোঁসাই।

'পাকা লিচু ? সে আবার কী !'

যখন দ্বারভাঙ্গা ছাড়ে তখন যোগজীবন বললে, 'আমাদের অদৃষ্টে লিচু খাওয়া হল না। ক দিন পরেই লিচু পাকবে কিন্তু তার আগেই আমরা চলে যাচ্ছি।'

মোকামা স্টেশনে গাড়ি বদল হবে, কে একজন হিন্দুস্থানী ব্যবসায়ী এসে লিচু দিয়ে গেল।

'এ কটা রাখো তোমার পকেটে।' বললে হিন্দুস্থানী, 'নিজে খেও, আর সকলকে দিও।'

পকেটে কটা লিচুই বা ধরে, কটাই বা নিজে খাব আর কটাই বা বিলোব অপরকে। কিন্তু যোগজীবন যত খায় ততই পকেট বোঝাই হয়ে ওঠে। একে ওকে সকলকে বিলিয়েও পকেট শূন্য করা যায় না। আর, আরো আশ্চর্য, অকালেও পরিপক্ব ফল।

'এ লিচু কে দিয়ে গেল ?'

'পরমহংসজি দিয়ে গেলেন।' বিজয় বললে, 'দ্বারভাঙ্গায় থাকতে লিচু খাবার ইচ্ছে হয়েছিল না ? তাই দিয়ে গেলেন।'

বরিশাল থেকে মাদারিপুর। মাদারিপুর থেকে মাণিকদহ। মাণিকদহে জমিদার বিপিন রায়ের অতিথি হল বিজয়। বিপিন রায় সপরিবারে দীক্ষা নিল।

একদিন বিজয় স্থানীয় গণ্যমান্যদের নিয়ে বসে আছে, কোত্থেকে এক পাগলী এসে বিজয়ের সামনে নাচতে লাগল আর হাততালি দিয়ে গান সুরু করল :

'দ্যাখ দ্যাখ জলের মাঝে মেঘ লুকায়ে রয়েছে, সখি,
আমার ইচ্ছা হয় যে ঐ মেঘেরে সদা হৃদয়ে রাখি।
আমি যা দেখিলাম এই চিত্রপটে
তাই দেখিলাম জল আনিতে যমুনার ঘাটে —
আমার ঘাটে-বাটে সমান হল
এখন প্রাণ বাঁচানোর উপায় কি ?'

কাকিনার রাজা মহিমারঞ্জন রায় ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন, সেই উৎসবে ডাক পড়ল বিজয়ের। তখুনি চলল বিজয়। সঙ্গে শ্যামাকান্ত, নবকুমার আর মনোরঞ্জন গুহ। আরো একজন। ব্রাহ্মসমাজের সুগায়ক ব্রজ গাঙ্গুলি। ওদিক থেকে যাচ্ছে কাঙাল হরিনাথ। কাকিনা সরগরম।

বিরাট নগরকীর্তন বার করেছে রাজা। শত খোল, ততোধিক করতাল, পঁচিশ দলে বিভক্ত হয়ে বেরিয়েছে কীর্তন। গোঁসাইই কীর্তনের অগ্রনায়ক। তার উদ্দাম নৃত্যে মেদিনী কাঁপতে লাগল, উদাত্ত হরিধ্বনিতে সমাচ্ছন্ন নীলাকাশ। চারদিক থেকে অসংখ্য লোক ছুটে এসে কীর্তনে জুটে গেল। গোঁসাইয়ের পায়ে পড়তে লাগল লুটিয়ে। একী আশ্চর্য, যে শোনে সেই হরিধ্বনি তোলে, আর যেই ধ্বনি তোলে সেই নাচতে সুরু করে দেয়। এ কী অদম্য আকর্ষণ ! খোলে বোলে বোঝে সে এক মহামহিম হরির লুট।

উপাসনার সময় এক আধ্যাত্মিক দৃশ্য প্রকট হল গোঁসাইয়ের কাছে। দেখল শ্রীমনমহাপ্রভুকে বেষ্টন করে অবতারগণ নৃত্য করছে। বুদ্ধ মহম্মদ যীশু নানক শঙ্কর এবং আরো অনেকে। সর্বধর্মসমন্বয়ের দৃশ্য। শুধু ভক্তিপথেই যে সমন্বয় তাই বোঝাবার জন্যেই বুঝি কেন্দ্রে গৌরহরি।

'আচ্ছা, আজ আমার উপাসনায় মন বসছে না কেন? কেন ভাব আসছে না?' জিগগেস করল বিজয়, 'এখানে নিশ্চয়ই কেউ অবিশ্বাসী আছেন -'

'আমিই সেই অবিশ্বাসী।' মহিমারঞ্জনের ভগ্নীপতি বললে করজোড়ে, 'আপনি বলছিলেন, ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়, আমি মনে মনে হাসছিলাম, এ কখনো সম্ভব হতে পারে? যদি দর্শনই হবে, তখন তবে কথা বলা চলে কী করে?'

'চলেই না তো।' বললে গোঁসাই, 'দর্শন একটু ঘন হলেই স্বর গদগদ হয়, পরে ঘনতর হলে কথা বন্ধ হয়ে যায়।'

ছাত্রসমাজে একদিন বক্তৃতা দিতে হবে গোঁসাইকে। দিনক্ষণ ঠিক হয়েছে। একদল বৈষ্ণব এসে তাকে কীর্তনে ধরে নিয়ে গেল, আশ্বাস দিল, কীর্তনান্তে গোঁসাইকে ছাত্র-সভায় পৌঁছিয়ে দেবে! কিন্তু, ভগবানের বিধান, গোঁসাই কীর্তনে আত্মহারা হয়ে পড়ল, সভার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে তবু বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলনা। সভাস্থ সকলে গোঁসাইয়ের নিন্দা করতে লাগল— কথা দিয়ে কথা রাখেনা এ কেমন কথা? কেউ বললে মিথ্যেবাদী। কেউ বা আরো কদর্য তিরস্কার।

কতক্ষণ পরেই সম্বিত ফিরে পেয়ে দ্রুত চলে এল গোঁসাই। বক্তৃতা আরম্ভ করেই বলতে লাগল: মা, এ কী, তোমার গায়ে আঘাতের চিহ্ন কেন? আমাকে যে এরা গালি দিয়েছে সেই আঘাতই কি তুমি সর্বাঙ্গে বহন করছ? এখন আমি কাঁদব, না, তোমার পুজো করব?'

নিন্দুকের দল ভয়ে-বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। অনুতপ্ত হয়ে সকলে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলে।

উৎসবের আরেক দিন বিজয় মনোরঞ্জন গুহকে বললে, 'তুমি আজ কিছু বলো।'

পাঁচ-ছ' দিন জ্বর ভোগ করে আজই একমুঠো 'পোড়ে'র ভাত খেয়েছে মনোরঞ্জন। শরীর অত্যন্ত দুর্বল, বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার মতো শক্তি নেই, আর কণ্ঠস্বরও নিস্তেজ। সেই কথাই সবিনয়ে বললে গোঁসাইকে।

গোঁসাই বললে, 'যা পারো বলো।'

মনোরঞ্জন তবু আপত্তি করল। 'কিন্তু কী বলব—'

'যা মুখে আসে বলবে। উঠে দাঁড়াও তো একবার।'

মনোরঞ্জন উঠে দাঁড়াল। সুস্থ সমর্থ শক্তিমানের মতো দাঁড়াল। ঋজু দৃঢ় তপ্ততেজ। পা এতটুকু টলল না। ক্ষীণ কণ্ঠ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। ভাষায় জেগে উঠল গম্ভীর গর্জন। একটানা দাঁড়িয়ে তিনঘণ্টা নিবর্গল ঈশ্বরকথা বলে চলল মনোরঞ্জন। ঈশ্বরের জন্যে বলিপ্রদত্ত হবার কথা। কে এই শক্তি জোগাল, পঙ্গুকে কে পাঠাল গিরিলঙ্ঘনে? মনোরঞ্জন নিজেই অভিভূত। কী করে এই ভগ্নদেহে এতক্ষণ ধরে বললাম আবিষ্টের মতো? আর, কী বললাম!

রাজা মহিমারঞ্জন বললেন, 'থামলেন কেন? আহা, এমন বক্তৃতা আমি সারারাত জেগে শুনতে রাজি আছি।'

রাজপণ্ডিত শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কারের ছেলে কোকিলেশ্বর। কলেজের ছাত্র, অথচ এ বয়সেই উদ্দাম ধর্মপিপাসা। বাপকে না জানিয়েই দীক্ষা নিলে গোঁসাইয়ের কাছে। বাড়িতে গেলে শ্রীশ্বর ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। বললে, 'তোর কী হল? তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন?'

'কী হবে ?' কোকিলেশ্বর তো অবাক : 'কেমন আবার দেখাচ্ছে ?'

'তোর মুখে অপূর্ব শ্রী দেখছি।'

'সে আবার কী ?'

'হ্যাঁ, ব্রহ্মজ্ঞান হলে মুখের যেমন শোভা হয়, শাস্ত্রের সেই বর্ণনার সঙ্গে তোর মুখশ্রী মিলে যাচ্ছে।' রাজপণ্ডিত ব্যাকুল হয়ে উঠল : 'তোর কী হল ? কোন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তোকে কৃপা করল ?'

তখন কোকিলেশ্বর দীক্ষার কথা বললে।

স্নানের আগে গায়ে তেল মাখছিল শ্রীশ্বর, উঠে পড়ল। কুলোজ্জ্বল পুত্রকে আশীর্বাদ করল, এতবড় সৌভাগ্যবান আর কে আছে। কিন্তু আমার কী হবে ? বস্তুলাভের ব্যাকুলতায় তেল মাখা গায়েই বেরিয়ে পড়ল।

'এ কী, কোথায় চললেন ?' ডাক দিল কোকিলেশ্বর।

'দেখি প্রভু আমাকেও কৃপা করেন কিনা।'

'সে কী, স্নান করে যান।'

'না, দেরী সইছেনা আমার।' বললে শ্রীশ্বর, 'দীক্ষার কালাকাল বা শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার নেই। যদি সদগুরু মেলে তা হলে সেই মিলনেই সর্বশুচি।'

প্রখর রোদ, তার মধ্যেই স্নিগ্ধ তেলাক্ত গায়ে বেরিয়ে পড়ল শ্রীশ্বর। সে কী, তার পিছু-পিছু তার স্ত্রী, কোকিলেশ্বরের মা-ও চলেছে।

গোঁসাইয়ের পায়ে গিয়ে পড়ল দুজনে। বললে, 'আমাদেরও বস্তু দিন।'

করুণার্দ্রহৃদয় গোঁসাই তাদের দীক্ষা দিল।

ধর্ম কিরূপে লাভ হবে ? গোঁসাই বললে, 'জীবনকে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে অভ্যস্ত করো। প্রতিদিন নিয়মিত অল্প সময়ের জন্য হলেও সাধন করা উচিত। ভালো না লাগলেও ওষুধ গেলার মতো করলে তবে রুচি হয়। ভোরে উঠে স্নান করে একঘণ্টাকাল প্রাণায়াম ও নাম। পরে একঘণ্টা ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তারপর বৃক্ষলতা পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গের সেবা। নিকটে আর্ত-আতুর কেউ থাকলে তার তত্ত্বাবধান। আহারের পর নিদ্রা ঠিক নয়। দিবানিদ্রায় বুদ্ধিনাশ ও আয়ুক্ষয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে অধ্যয়ন। অপরাহ্ণে অল্প ভ্রমণ। সন্ধ্যায় নামগান প্রাণায়াম ও নাম জপ। তারপর পরিমিত আহার করে শয়ন। এতে অভ্যস্ত হলেই সহজে ধর্মলাভ।'

অন্তরের চিন্তা কুকল্পনা যাবে কিসে ? কে একজন জিগগেস করলে।

'শুধু নামে। যে নাম পেয়েছে তার আর ভাবনা কী। শ্বাসে-প্রশ্বাসে ঐ নামজপই একমাত্র উপায়।'

'কিন্তু আপনার কৃপা ছাড়া কী হবে ? আমাদের আর কী ক্ষমতা আছে ?'

'ও সব ভাবুকতা ছাড়ো।' বললেন গোঁসাইজি। 'অধিক ভক্তি দেখালে নিজের ক্ষতি হয়। কৃপার কথা অনেক পরে। যতদিন মান-অপমান সুখ-দুঃখ কাম-ক্রোধ আছে, ততদিন নিজের চেষ্টা করতে হবে। এই চেষ্টাই সাধন—নাম করা। আমি পারিনা, তোমার কৃপাই সম্বল, এ সব কথা ভাবুকতা মাত্র। যতদিন মানুষের নিজের ইচ্ছা চেষ্টা ও ক্ষমতা আছে ততদিন ও সব কৃপার কথা কিছু না। নিজেকেই পরিশ্রম করতে হবে—আপ্রাণ পরিশ্রম।'

কাঁকিনা থেকে বিজয় চলে এল কামাখ্যায়। 'রক্তপাষাণরূপিণী'র পীঠস্থানে। অম্বুবাচীর রাত্রি। অন্ধকারে তীরবেগে মন্দিরের দিকে ধাবিত হল বিজয়। মন্দিরের ধারে সশস্ত্র প্রহরী, কিন্তু কেন কে জানে, বিজয়কে বাধা দিতে চাইল না। মুখে জলদগম্ভীর বম্ বম্ ধ্বনি, বিজয় পীঠস্থান পরিক্রমণ করল। পরে প্রণাম করল সাষ্টাঙ্গ হয়ে। আর যেই প্রণাম করল, মনে হল, পিচকারির ধারার মতো কি-এক তরল বস্তু মাটি ফেটে নির্গত হচ্ছে। ভাসিয়ে দিচ্ছে সর্বাঙ্গ। বিজয় লক্ষ্য করে দেখল এ দিব্য রক্ত। 'যোনিপীঠং কামগিরৌ।'

গেল উমানন্দ ভৈরব দর্শন করতে। কামাখ্যাগিরির শিখরে ভুবনেশ্বরের মন্দিরে। অদূরে বশিষ্ঠাশ্রমে। পরিচয় হল অচলানন্দ তীর্থাবধূতের সঙ্গে।

অবশেষে ঢাকায় ফিরে এল। ধরল ম্যালেরিয়ায়। ডাক্তাররা বলল, পদ্মায় কিছুদিন নৌকোয় বাস করুন। সপরিবার নৌকোয় আছে বিজয়।

ছোট মেয়ে প্রেমসখী বললে, 'তুমি তো গঙ্গার কতকথা বলো, তেমনি এই পদ্মায় কোনো কথা নেই ?'

'কই শুনিনি তো !'

'আচ্ছা, বাবা এই পদ্মাটা গঙ্গা হয়ে যেতে পারে না ?'

'তা পারে।'

'পারে ?' প্রেমসখী উৎসাহিত হয়ে দিদি শান্তিসুধাকে ডাক দিল : 'ও দিদি শোন, বাবা বলছেন, এ পদ্মানদীটা গঙ্গা হয়ে যেতে পারে।'

শান্তিসুধার বেশি বুদ্ধি, সে বললে, 'জল দেখে কি করে বুঝবে গঙ্গার জল ! গঙ্গা কি স্বয়ং দেখা দেবেন ?'

'দেবী স্বয়ং দেখা দেবেন। কেন দেবেন না ? মা পদ্মা তাই গঙ্গা।' শান্তিসুধাকে লক্ষ্য করল বিজয় : 'একটা নৈবেদ্য তৈরি করে নিয়ে আয়।'

শান্তিসুধা নৈবেদ্য তৈরি করে আনল। দে আমার হাতে দে। নৈবেদ্যের পাত্র বিজয় নিল হাত বাড়িয়ে। তারপর জলের দিকে তাকিয়ে গঙ্গাস্তব করতে লাগল :

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে
ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিবিহারিণি বিমলে
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে।

যেদিকে স্থিরলক্ষ্য হয়ে তাকিয়ে ছিল সেইদিককার জল হঠাৎ উদ্বেলিত হতে সুরু করল। কিছুক্ষণ পরে সেই উদ্বেলিত জলের মধ্য থেকে একখানা পরমসুন্দর রমণীর অলঙ্কারমণ্ডিত হাত উঠল। নৈবেদ্যের পাত্র সেই উত্থিত হাতে দিয়ে দিল গোঁসাই। পাত্রসহ হাত জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। বিস্ময়ে দু-বোন কাঠ হয়ে রইল। সন্দেহ কী, পদ্মাই গঙ্গা হয়ে গিয়েছে।

'শ্রদ্ধা করে সেবা পুজো করলে বিগ্রহ জীবন্ত হন।' বলছেন গোঁসাইজি : 'কথা কন, হাত বাড়িয়ে খাবার চান। কোনো প্রকার অনাচার অত্যাচার হলে বলে দেন। ওরা

আমার পুজো করে কিন্তু খাবার দেয় না। কত বাড়ির বিগ্রহ আমার কাছে এসে নালিশ করে যায়। তখন তাদের আবার খবর পাঠাই।'

নবদ্বীপে মহেন্দ্র ভট্টাচার্যের বাড়িতে গৌরাঙ্গপ্রতিষ্ঠা হবে, সশিষ্য গোঁসাইজিকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছে। প্রতিষ্ঠান্তে, সকালে গোঁসাইজি চা খাচ্ছেন, বালক গৌরাঙ্গ কাঁদতে-কাঁদতে এসে তাঁকে বললে, ওরা আমাকে প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু আমাকে নূপুর-বালা দেয়নি।

গোঁসাইজি বালককে আশ্বাস দিলেন: 'দেবে। আমি যাচ্ছি, বলে দেব—দেবে।'

মহাপ্রভুর মন্দিরে কীর্তন করলেন গোঁসাইজি, দুপুর পর্যন্ত চলল সেই কীর্তন। রোদ চড়ে গিয়েছে, পথের তপ্ত বালি আগুন হয়ে উঠেছে, সেই পথ মাড়িয়ে মহেন্দ্রের উৎসব-বাড়িতে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়ালেন একেবারে নবগৌরাঙ্গের মুখোমুখি। বললেন স্নেহার্দ্রকণ্ঠে: 'আহা, এত গরম বালির উপর দিয়ে কি লাফিয়ে লাফিয়ে আসতে হয়? হাঁপাসনে, চুপ কর, আমি বলে দেবখন, সোনার বালা-নূপুর গড়িয়ে দেবে।' তবু বুঝি কান্না থামেনা গৌরহরির। গোঁসাইজি হাত নেড়ে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'ওরে থাম, কাঁদিসনে, দেবে, এক্ষুনি দেবে।'

কী ব্যাপার? সকলে এগিয়ে এসে দেখল জীবন্ত বালকের মতো বিগ্রহের দু-চোখ জলে ছল ছল করছে। কাঁদছে বিগ্রহ! আর সেই উত্তেজনায় বুকের মালাগুলোও কাঁপছে মৃদু-মৃদু। কেন, কাঁদছে কেন গৌরাঙ্গ?

'কাঁদছে কেন!' গোঁসাইজি নাটমন্দিরের সাজ-সজ্জার আড়ম্বরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ সব ঝাড়লণ্ঠন ফানুষের কী দরকার ছিল? যাকে যা দিয়ে সাজানো দরকার তা দেবে না, বাজে জিনিসে খরচ করবে! বলে রাখছি', গোঁসাইজিও ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে কাঁদতে লাগলেন: 'যে ছেলেকে স্থান দিয়েছ তাকে যদি সোনার বালা-নূপুর না দাও, তা হলে ঘরের সমস্ত হাঁড়ি-কুঁড়ি ভেঙে চুরে জলে ভাসিয়ে দেবে দেখো।'

বিজয় তারপর একদিন চাঁচুবতলা কালীবাড়ি দেখতে গেল। তার সঙ্গে আরো অনেকে মন্দিরে গিয়ে দেখল, জগদ্ধাত্রী বসে আছেন। পুরোতকে জিগগেস করতে বললে, 'মন্দিরে তো কোনো মূর্তি নেই, ঘটস্থাপন আছে মাত্র।'

সে কী? সকলে আবার মন্দিরে গিয়ে দেখল, সত্যিই তো, মূর্তি কোথায়, একটি ঘট শুধু বসানো আছে।

'এখানে কীর্তন হয়?' জিগগেস করল বিজয়।

পুরোত বললে, 'আমরা জীবনে কখনো কীর্তন শুনিনি।'

অনেক দূরে বাড়ি, চাল-কলা যা পেয়েছিল তাই গামছায় বেঁধে মন্দিরে একটু আলো দেখিয়ে, বেলা থাকতে-থাকতে চলে গেল পুরোত। কেন কে জানে, বিজয় সকলকে বললে, এস আমরা একটু বসে যাই। স্থানটি ভারি মনোরম। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে, সন্ধেসন্ধি, কোত্থেকে একদল কীর্তনে এসে হাজির।

'তোমরা কারা? তোমাদের কে ডেকেছে?' স্থানীয় লোকেরা জিগগেস করল সবিস্ময়ে।

'আমাদের কেউ ডাকেনি। আমরা অমনি এসে পড়েছি।'

'অমনি এসে পড়েছ?'

'হ্যাঁ, আমরা আমাদের আখড়ায় বসে গান করছিলাম,' দলের অধিকারী বললে, 'হঠাৎ

সকলের মনে হল মায়ের বাড়ি গিয়ে গান করি। মায়ের বাড়িতে বসে গান করলেই প্রাণ ঠাণ্ডা হবে।'

গান ধরল কীর্তুনেরা। অঙ্গনে কি একটা গাছের থেকে 'ঢেপের খই'-এর মতো ছোট ছোট শাদা ফুল টুপটাপ ঝরে পড়তে লাগল। সমস্ত ফুলে ফুলময় হয়ে গেল।

'কী ফুল ?'

কেউ বলতে পারল না। এমন সুন্দর গন্ধ, গন্ধের থেকেও মিলল না পরিচয়। গাছটাকে চেন না কেউ ? চিনি বই কি। একটা বুনো গাছ। জন্মে কোনো দিন ফুল ফোটায়নি। আজ, কেন কে জানে, অজস্র ঝরিয়ে দিয়েছে। শুধু ফুলই ফুটছে না গাছের ডালে বসে কী একটা পাখিও গান গাইছে। এমন মিষ্ট আওয়াজ কোন পাখির ? কে জানে কী। জীবনে আমরা শুনিনি এমন স্বর। কোত্থেকে, কী দেখে উড়ে এসেছে কে বলবে ?

নৌকোতেই আছে, চলো তবে এবার একদিন বারদী যাই, লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে দেখে আসি।

যেন বিদুরের কুটিরে শ্রীকৃষ্ণ এসেছে—তেমনি আনন্দে আত্মহারা লোকনাথ। ওরে আমার 'জীবনকৃষ্ণ' এসেছে। তাকে আমি এখন কী দিই, কী খাওয়াই, কোথায় বসাই !

আর, গোঁসাই দেখল, এ কে অমর্ত মহাপুরুষ যাঁর প্রতি রোমকূপে দেবতার প্রকাশ।

নিভৃতে দুজনের কি কথা হল তা কে বলবে।

নৌকো ছেড়ে ঘর নিল বিজয়। কোথায় তার ঘর ? প্রচারক আশ্রমেই স্থান পেয়েছে আপাতত।

চেত্রের সন্ধ্যায় হঠাৎ কালবোশেখির ঝড় উঠল। এমন ঝড় ও-অঞ্চলে এক শতাব্দীতেও কেউ দেখেনি। মানুষ-ওড়ানো ঝড়। একটা লোককে গাছের উপর তুলে দিয়েছে, আরেকটাকে নদীর ওপার থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এপারে একটা দোতলা বাড়ির ভিতরের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে, তার গায়ে একটাও আঁচড় লাগেনি। একটা আড়াইমনি সিন্দুক উড়িয়ে নিয়ে পাঁচ-ছ মিনিটের দূর পথের এক ঘরে এমন নিটোল ঢুকিয়ে দিয়েছে যে এখন তাকে না ভেঙে দরজা দিয়ে বার করা যাচ্ছে না। একটা লোহার থামকে উপড়ে নিয়ে সেই গর্তেই মাথার দিকটা নিচে দিয়ে উলটো করে পুঁতে রেখেছে। এক বাড়ির মাচা থেকে কলসী-ভর্তি মুড়ি আরেক বাড়ির মাচাতে নিয়ে বসিয়েছে—কলসীর মুখের সরা তো সরেইনি, একটি মুড়িরও নড়চড় হয়নি। এক হাত লম্বা বাঁশের বাঁখারি একটা শুপুরি গাছকে এফোঁড় ওফোঁড় করে বিঁধে রয়েছে, প্রকাণ্ড পালোয়ানেরও সাধ্য নেই হাতের জোরে টেনে সে বাঁখারিটাকে খুলে নেয়।

কী ঝড় ! কী ঝড় ! যেন বিশাল কালো এঞ্জিন আগুনের গোলা ছুঁড়তে-ছুঁড়তে সশব্দে ছুটছে। কত গাছ পড়ছে কত বাড়ি উড়ছে লেখাজোখা নেই। কত মানুষ আর পশুও যে চক্ষের নিমেষে বলি হয়ে যাবে তার হিসেব কে করে।

আসন ছেড়ে গোঁসাই বাইরে এসে দাঁড়াল। আর্তস্বরে ডাকতে লাগল মহাকালীকে : জয় মা কালী, জয় মা কালী, দয়া করো দয়াময়ী, প্রসন্ন হও। আবার ডাকতে লাগল মহাবীরকে : জয় মহাবীর, জয় মহাবীর, ও সব অগ্নি-গোলা আমার বুকে নিক্ষেপ করো। আর সকলকে বাঁচাও।

দু'তিন মিনিটের মধ্যেই ঝড় শান্ত হল। কিন্তু এর মধ্যে যা হয়ে গেল তা ভয়ঙ্কর

হয়েও মনোহর। প্রচণ্ড তাণ্ডবের মধ্যেও যেন ছন্দ আছে, মাত্রা আছে, লাস্য আছে, প্রাবল্যের মধ্যেও দেখা গেল লাবণ্য। তার অর্থ কী? তার অর্থ অন্ধ জড়শক্তি ভগবৎ-ইচ্ছার চৈতন্যে নিয়ন্ত্রিত হল। সর্বনাশ যতটা বিস্তীর্ণ ও গভীর হতে পারত তা হল না।

একদিন সকালে প্রচারক-আশ্রমের ঘরের বারান্দায় এসে গোঁসাই দেখল দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। যখন ভিতর থেকে বন্ধ তখন নিশ্চয়ই কেউ ঘরে আছে। মেয়েদের নাম ধরে ডাকতে লাগল গোঁসাই, কোনো সাড়া নেই। করাঘাত করল, করাঘাতেও নিরুত্তর। এই অবেলায় সকলে ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? নইলে কোথায় গেল? উচাটন হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে গোঁসাই হঠাৎ দরজা কে খুলে দিল। দেখল ঘরের মধ্যে সবাই রয়েছে।

'বাইরে থেকে এত ডাকাডাকি করছি কেউ শুনতে পাও না?'

'কী আশ্চর্য, বিন্দুমাত্র শুনিনি তো।' মেয়েরা হতবাক।

'শোনোনি, দরজা তবে খুলে দিল কে?'

'সত্যিই তো, কী আশ্চর্য, আমরা তো কেউ খুলে দেইনি, আমরা তো ওদিকে কাজে কর্মে তন্ময় ছিলাম—

'তাহলে কি দরজা নিজের থেকেই খুলে গেল?' বলে অদৃশ্য কাকে দেখে গদগদ কণ্ঠে বলে উঠল গোঁসাই 'মা গো এই বুঝি তোর রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধা?' বলেই কাঁদতে লাগল বালকের মতো।

ঢাকার ব্রাহ্মরা গোড়ায় গোঁসাইয়ের প্রতি অনুকূল থাকলেও ইদানীং তারাও বিরক্ত হয়ে উঠেছে। ব্রাহ্মসমাজে হরিনাম চালাচ্ছেন, চলুক, কিন্তু তাই বলে কালী, মহাবীর, রাধা-কৃষ্ণ—এসব কী উৎপাত? আর, গানও যা হচ্ছে তা মোটেই রুচিকর নয়। 'জলে ঢেউ দিও না গো সখি আমি কালো-রূপ নিরখি।' এসব নিতান্ত নিম্নস্তর! তারপরে এটা—'হারে দিয়ে প্রাণ কুলমান চরণ পেলাম না সন্ধান, আমি হলেম গোরকলঙ্কিনী'—এতো একেবারে নিতাইগৌর পর্যন্ত নিয়ে এল। আর এসব গানেই গোঁসাই ডগমগ! ব্রাহ্ম সমাজের বারোটা বাজিয়ে দিলে!

তারপর বেদীতে বসে এসব আবার কী প্রলাপোক্তি!

'ঐ দেখুন মা আসছেন। হাতে প্রসাদের থালা। রোজ লুকিয়ে আমাকে প্রসাদ খাওয়াও, আর এদের কেন দাও না? সবাই তো তোমার ছেলে তবে সকলকে দাও না কেন? একলা আমাকে দিলে আমি আর নেব না প্রসাদ। এরা যে উপবাসী থাকে। যদি না দাও, তোমার সকল কথা ফাঁস করে দেব। কী ভাবে চললে তোমার প্রসাদ পাওয়া যায়, সকলকে বলে দেব। তখন তুমি কী করবে? আপনারা সবাই শুনুন, আপনাদের বলে দিচ্ছি। তিনটি নিয়মরক্ষা করে চললেই মায়ের প্রসাদের অধিকারী হবেন। মা তখন রাজী না হয়ে পারবেন না। শুনুন বলে দিচ্ছি—তিনটি নিয়ম। প্রথম যখন যা কিছু গ্রহণ করবেন, আহার করবেন, মাকে নিবেদন করে নেবেন। দ্বিতীয় নিয়ম, অনিবেদিত বস্তু কখনো গ্রহণ করবেন না, আর তৃতীয় নিয়ম, কারু কুৎসা-নিন্দা করবেন না—কখনো না, কখনো না। ঐ দেখুন, মা আমার মুখ চেপে ধরছেন—বলতে দিচ্ছেন না—হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরছেন। জয় মা, জয় মা—'

চারদিকে কান্না ও ভাবের ধুম পড়ে গেল। কিন্তু এই কী ব্রাহ্মরীতি? নবদীক্ষিত কুলদারই এতে বেশি আপত্তি! তা ছাড়া এসব কী! প্রচারক-নিবাসে গাঁজারও ধোঁয়া

উঠছে। কে এক জটিল উদাসী সাধু এসেছে গোঁসাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে, এখন দিব্যি গাঁজায় দম মারছে। কী আশ্চর্য, গোঁসাই দেখে-শুনেও কিছু বলছে না। দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি। কুলদা তেড়ে গেল। সাধুকে দেখতে বেশ তেজস্বী, ভজনানন্দী, কিন্তু তাই বলে সমাজগৃহে অনাচার! শূন্যে সিঁড়ি অনুমান করে ত্বরান্বিত পা ফেলতে গিয়ে পড়ে গেল কুলদা। এমন পড়ল তিন দিন বিছানা থেকে উঠতে হল না।

গোঁসাই শান্তিপুরে এসেছে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা ঢাকায়, এমনি একদিন ঢাকার ব্রাহ্ম-সমাজের কর্তা নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় গোঁসাইয়ের উপর নোটিশ জারি করল, প্রচারক-নিবাসে থেকে ইচ্ছেমত বক্তৃতা বা উপাসনা করা চলবে না। কতগুলি আবশ্যিক নিয়ম তাকে মানতেই হবে। রোগের প্রতিকারার্থে ছাড়া তামাক ও নস্যির বাইরে আর কোনো মাদক দ্রব্য প্রচারগৃহে গ্রহণ বা সেবন করা চলবে না। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার যে দেশীয় রীতি প্রচলিত আছে, তার বাইরে প্রণামকে প্রসারিত করা যাবেনা, অর্থাৎ চলবেনা সাষ্টাঙ্গ, কিংবা চরণধারণ। যাতে পৌত্তলিক বা অপবিত্র ভাবের উদয় হতে পারে প্রচারগৃহে থাকতে পারবেনা এমনি মূর্তি বা চিত্রপট। ইত্যাদি ইত্যাদি।

গোঁসাই তক্ষুনি সহধর্মিণী যোগমায়াকে চিঠি লিখল: তুমি সবাইকে নিয়ে পত্রপাঠ প্রচারক-নিবাস ত্যাগ করবে এবং যে কোনো একটা ভাড়াটে বাড়িতে উঠে যাবে। টাকার কথা ভাববে না। যিনি এত দিন চালিয়ে এসেছেন তিনিই চালাবেন।

শ্যামসুন্দরকে উদ্দেশ্য করে বললে, 'শুকনো মরুভূমির মধ্য দিয়ে এত দীর্ঘ পথ তুমি আমাকে টেনে নিয়ে এলে!'

শ্যামসুন্দর হাসল: 'কে কাকে টানল, কেন টানল, তার আমি কী জানি!'

সমাজের কর্তৃপক্ষকে সরকারী ভাবে প্রতিবাদ জানাল গোঁসাই। আমার বিশ্বাস, আমার প্রণালীতেই সার্বভৌমিক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্মের প্রচার হচ্ছে।

যোগমায়া একরামপুরে এক বাড়ি ভাড়া করে উঠে গেল।

প্রচারক-নিবাস থেকে বিচ্যুত করেও সমাজ কর্তৃপক্ষ গোঁসাইকে রেহাই দিল না। আগের কার্যকলাপের জন্য কৈফিয়ত তলব করল।

বারদীর ব্রহ্মচারী গোঁসাইকে চিঠি পাঠাল, ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ত্যাগ করো। আরেক দিন স্বপ্নযোগে দেখা দিলেন অদ্বৈত। বললেন, সংকীর্ণ সম্প্রদায়বুদ্ধি ছেড়ে দাও। নিজের গুরু পরমহংসজিকে আহ্বান করল গোঁসাই। তিনিও ছাড়তে বললেন।

গোঁসাই ব্রাহ্মসমাজ থেকে সর্বসম্পর্ক ছিন্ন করে নিল। 'কিন্তু', শেষ চিঠিতে জানাল শেষ কথা: 'আমি যা প্রচার করছি তাই চিরন্তন ব্রাহ্মধর্ম'

একরামপুরের বাড়ির কাছেই কদম গাছ। প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র এই বৃক্ষ-মূলে আশ্রম স্থাপন করে কিছুকাল সাধন-ভজন করেছিলেন সেই থেকে এ স্থানটির নাম বীরভদ্রের আসন বলে চলে আসছে।

ঘরে বসে আছে গোঁসাই, দূর থেকে কীর্তনের খোল-করতাল শুনতে পেল। শোনা-মাত্রই তালে তালে মাথা নাড়তে লাগল। এই নামধ্বনি শুনতে পেলে আর কথা নেই, শুধু উন্মনা নয় বিহ্বল হয়ে পড়ে। রাত্রে যে ঘুম হয় এও গোঁসাইয়ের কষ্ট। ভগবৎপ্রেমরসে সব সময়েই থাকতে চায় জাগ্রত, উদ্দণ্ড-উদ্দাম। তর্কে-বাদানুবাদে কত সময় অপচয় হয়ে গিয়েছে, কত সময়, ঘুমিয়ে। বলছে, 'আগে-আগে রাত জেগে সাধন করবার জন্যে

কত চেষ্টা করেছি, সময়-সময় অভিভূত হয়ে পড়েছি। এখন শুনতে হবে এ কথা ভাবলেই কান্না পায়।'

কীর্তন কদমতলার কাছে আসতেই গোঁসাই লাফিয়ে উঠল, আর বলা নেই কওয়া নেই, দলের মধ্যে ঢুকে নাচতে লাগল। দল এগিয়ে চলল, গোঁসাইও এগিয়ে চলল। যার কীর্তন, বিহারী মালাকার, একেবারে তার বেনেটোলার বাড়িতে গিয়ে থামল। থেমেই বেহুঁস হয়ে পড়ল।

বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে গোঁসাই জিগগেস করলে, 'এ কী, এ কদমতলা না? আমি এখানে এলাম কী করে?'

সামনেই রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। মাটিতে পড়ে গোঁসাই তখুনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল। বিহারী মালাকার যুক্তকরে বললে, 'প্রভু, আজই আমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হল। মনে বড় সাধ ছিল, আপনার চরণধূলি পড়ে আমার মন্দিরে। বলতে গিয়েছিলাম কিন্তু মুখ ফুটে বলতে সাহস পেলাম না। আপনি অন্তর্যামী, আপনি দয়াল, আপনি আমার আকাঙ্ক্ষা জেনে নিয়ে তা পরম করুণায় পূর্ণ করলেন।' বলে গোঁসাইয়ের পদতলে লুটোপুটি খেতে লাগল।

বিগ্রহের সামনে গোঁসাইয়ের সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত—কুলদা ভাবল, এ কোন ব্রাহ্মধর্ম! মনে মনে বললে, হায় ভগবান, আমাকে তুমি এ দৃশ্য দেখালে কেন? অথচ ভাবুকতার তরে নিজেরই কত শাসন।

রাধাকৃষ্ণের একখানি পট নিয়ে কে একটি যুবক এসেছে গোঁসাইয়ের কাছে, বারে-বারে পায়ে লুটিয়ে পড়ছে, আর পট দেখিয়ে বারে-বারে বলছে, 'গোঁসাই, বলে দাও, আহা কী সুন্দর মূর্তি, বলে দাও, কী করে পাব? আমি আর কিছুই চাই না শুধু বলে দাও, কী করে পাব?'

গোঁসাই বললে, 'স্থির হও।'

কিন্তু যুবক আরো উন্দাম হয়ে উঠল। কী সুন্দর মূর্তি, আহা, কী সুন্দর!

'বটে? চালাকি?' গোঁসাই গর্জন করে উঠল 'আর কিছু চাও না? নবাবের বাগানে নির্জনে সুন্দরী যুবতী পেলে চাও কিনা বলো। এখানে চালাকি করছ?'

যুবকের মুখ ম্লান হয়ে গেল। কতক্ষণ পরে চলে গেল নিঃশব্দে।

বলো, গান ধরো

'হরি বলব মুখে যাব সুখে ব্রজধাম।
কলিতে তারকব্রহ্ম হরিনাম॥'

১৯

একরামপুরের বাসাতেই আশ্রয় নিল গোঁসাই। বললে, এবার ধুলট করব। সে আবার কী? মাঘী সপ্তমী তিথিতে অদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাব। সেই উপলক্ষে শান্তিপুরে ধুলট হয়। দোলে যেমন ফাগ ওড়ে ধুলোটে তেমনি ধুলো। কীর্তনের সময় ভাবোন্মত্ত হয়ে রাস্তা থেকে ধুলো কুড়িয়ে উড়িয়ে বেড়ানোর নামই ধুলট। নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব

মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে। সেদিন ধুলট হয় অম্বিকা কালনায়। আর মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়েছিলেন মাঘী পূর্ণিমায়, কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছ থেকে। সেদিন ধুলট হয় নবদ্বীপে। এবার আমরা ঢাকায় মাঘী সপ্তমীতে অদ্বৈতের ধুলট করব।

সকাল আটটায় নগরকীর্তন বেরুল। অগ্রনায়ক স্বয়ং গোঁসাই। কীর্তনের গান হল :

'হরি বলব মুখে যাব সুখে ব্রজধাম
কলিতে তারকব্রহ্ম হরিনাম ॥
এ নাম, শিব জপেছেন পঞ্চমুখে
নারদ করেন বীণায় গান।
এবার গুরু নামে দিয়ে ডঙ্কা
রাধানামে দাও বাদাম ॥'

শ্রীহট্ট থেকে এক অন্ধ বাবাজি এসেছে। কণ্ঠে যেমন সুর তেমনি সুধা। সে গান ধরেছে, 'নগর ভ্রমণ করে আমার গৌর এল ঘরে, আমার নিতাই এল ঘরে।'

রাস্তায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে গোঁসাই ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে লাগল। পরে উঠে দুই হাতে ধুলো নিয়ে চারদিকে ছুঁড়তে লাগল উন্মত্তের মতো আর বলতে লাগল : 'জয় সীতানাথ, জয় সীতানাথ।' এ ধুলো গায়ে লাগতেই বিপুল জনতা প্রবল আবেগে আলোড়িত হল। তারাও রাস্তায় ধুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে ছুঁড়তে লাগল মুঠো-মুঠো। সকলেরই মুখে উন্মত্ত হুঙ্কার। হরিবোল, হরিবোল। এখান-ওখান থেকে কত লোক এসে যে যোগ দিল তার ইয়ত্তা নেই। যেখান দিয়ে কীর্তন যাচ্ছে তার দুপাশের লোক, স্ত্রী-পুরুষ ছেলে বুড়ো সবাই ভাববিহ্বল হয়ে পড়ল। কে কার নিষেধ শোনে! সমস্ত ধুলোয় ধুলোকার।

মিছিল মোটেই তাড়াতাড়ি এগোতে পাচ্ছে না। কী করে পারবে? গোঁসাই বারে বারেই নামমদিরায় ঢলে ঢলে পড়ছে, সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছে। পাঁচ-সাত মিনিটের পথ চলতে তিন ঘণ্টা। পথ নিয়ে কথা নয়, পথের সম্বল নাম নিয়ে কথা। সূত্রাপুর, ফরাসগঞ্জ, বাঙলাবাজার, পটুয়াটুলি, শাঁখারিবাজার আর লক্ষ্মীবাজার ঘুরে বিকেলের দিকে ফিরে এল একরামপুর। অন্ধ বাবাজি এবার নেচে-নেচে গান ধরল : 'নগর ভ্রমণ করে আমার গৌর এল ঘরে, আমার নিতাই এল ঘরে।'

কিন্তু আমাদের অশ্বিনীর এ কী অবস্থা হল? তার উপায় করে দিন। চৌদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে অশ্বিনীকুমার মিত্র, জগন্নাথ স্কুলে পড়ে। কী তার মতি হল ধুলট উৎসবে যোগ দিলে। সারাক্ষণ মেতে রইল ভাবাবেশে। এখন থেকে-থেকে সে রাস্তায় ছুটে যাচ্ছে, আর কেঁদে-কেঁদে একে-ওকে জিগগেস করছে, আমার কৃষ্ণ কই? আমার কৃষ্ণ কোথায় লুকোল? আমার কৃষ্ণকে এনে দে। নয়তো আমাকে কৃষ্ণের কাছে নিয়ে চল।

'কদ্দিন হয়েছে এ অবস্থা?'

'ছ সাত দিন হল, আপনার সেই কীর্তনে যোগ দেবার পর থেকে।' অশ্বিনীর আত্মীয়-অভিভাবকেরা সকাতরে অনুনয় করতে লাগল : 'এখন এর একটা বিহিত করুন।'

'আর কী ভাবান্তর হয়েছে?'

'একটা প্রাচীন ভাঙা মন্দিরের কাছে গিয়ে বসে আর সন্ধে থেকে গভীর রাত পর্যন্ত

আপন মনে গান গায়। যত রাজ্যের শুক পাখি ছিল ও এলেকায়, ওর সামনে বসে অনড় হয়ে গান শোনে।'

'আহা, কী সুন্দর ভাব।'

'এখন আপনি এ পাগলামির প্রতিকার না করে দিলে তো ছেলেটা বাঁচে না।'

'ভক্ত বৈষ্ণবদের মাঝে থাকলে এ ছেলেটির ভাবের আদর হত।' বললে গোঁসাই, 'যা হোক, এক কাজ করুন। কোনো যাজনিক ব্রাহ্মণকে নেমন্তন্ন করে এনে খাওয়ান আর তার ভুক্তাবশেষ ছেলেটিকে খাইয়ে দিন, তা হলে ছেলেটির ভাব ছুটে যাবে।'

যেমন বলা তেমনি করা। আর অমনি অশ্বিনী স্বাভাবিক হয়ে গেল।

আরো একটি ছেলের খবর এসেছিল গোঁসাইয়ের কাছে। আপনার সেই কীর্তন শুনে অবধি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। দশ-বারো ঘণ্টা হয়ে গেল, এখনো সংজ্ঞাশূন্য।

'চলো তাকে দেখে আসি।'

গোঁসাই ছেলেটির বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল। স্পর্শ করল ছেলেটিকে। ছেলেটি চোখ চাইল। হাসল। উঠে বসল।

'শুধু কি আমরা কীর্তন করেছি?' গোঁসাই বললে, 'দেখলাম দলে-দলে দেবতারা আকাশ থেকে নেমে এসেছেন, আমাদের সঙ্গে তাঁরাও কীর্তন করছেন।'

একটি গৃহস্থবধূ এসেছে গোঁসাইয়ের কাছে। বললে, 'আপনি তো সবকিছু করতে পারেন, আমার অবস্থাটা খুলে দিন না।'

গোঁসাই মৃদু হাসল। বললে, 'সময় হলে হবে, অকালে কিছুই হয় না।'

'বেশ তো, সময়টাই পরিপূর্ণ করে দিন না।'

'তা হয় না। সময় তার নিজের নিয়মেই পরিপূর্ণ হবে।' বললে গোঁসাই, 'ডিম পাড়লেই ছানা বেরোয় না। পাখি আগে তাতে তা দেয়, অসময়ে ডিমে চঞ্চুর আঘাত করে না। ভগবানের কৃপাবলে পাখি ঠিক বোঝে কখন সময় হয়েছে, তখন চঞ্চুর আঘাত করে। তবেই বাচ্চা বেরোয় আর বেঁচে থাকে। সাধন সম্বন্ধেও তাই। সময় পরিপক্ব হলেই অবস্থা লাভ হয়, অসময়ে হয় না।'

শান্তিপুরের লালবিহারী বসু, বয়সে বালক, কিন্তু জাতিস্মর। আট বছর বয়সে ধর্মের তৃষ্ণায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। বহু বিচিত্র সাধুসন্তের সঙ্গ করেছে। যে কাউকে অগ্রণী দেখেছে, হোক না সে বাবাজি সন্ন্যাসী বা ফকির-দরবেশ, সকলের কাছ থেকেই দীক্ষা নিয়েছে। যার যেমন উপদেশ, করেছে সাধন-ভজন। কঠোরে-কঠিনেও পেছপা হয়নি। কিন্তু কোথাও যেন সেই পরমা নিবৃত্তিকে খুঁজে পায়নি। ঘুরত-ঘুরতে শেষে চলে এসেছে বিজয়কৃষ্ণের কাছে। বিজয়কৃষ্ণ ইছাপুরায় চলেছে, সেখানেও লাল-বিহারী তার সঙ্গী। ইছাপুরায় হরিচরণ চক্রবর্তীর বাড়িতে মহাপ্রভুর উৎসব। সেই উপলক্ষেই বিজয়ের আসা।

উঠোনের উত্তরপ্রান্তে মহাপ্রভু প্রতিষ্ঠিত। অঙ্গনে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে বিজয়। যুক্তকরে তৃষিত চোখে তাকিয়ে আছে। সহসা ভাবাবেশে তার সর্বশরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। তাই দেখে সোল্লাসে কীর্তন সুরু করে দিল বৈষ্ণবেরা।

তালে-তালে কয়েকবার তুড়ি দিল বিজয়, তারপর কী হল কে জানে, লাফিয়ে উঠল, পাশে দাঁড়ানো লালবিহারীর হাত ধরে উদ্দণ্ড নাচতে লাগল। ও মা, তারপর এ কী দৃশ্য! দুজনে মল্লের মতো যোধ্ভাবে আস্ফালন করছে। একজন আরেকজনকে আক্রমণ

করছে, আরেকজন হটে গিয়ে আবার ধাবমান হচ্ছে প্রতি-আক্রমণে। এমনি চলেছে দুর্দান্ত যুদ্ধনৃত্য। সঙ্গে-সঙ্গে উচ্চণ্ড কীর্তন।

'কি শুনি কি শুনি সিংহরব রে নদীয়ায়।
জগা বলে মাধা ভাই, পালাবার আর স্থান নাই,
সংসার ঘেরিল হরিনাম রে (নদীয়ায়)!
শ্রীচৈতন্য মহারথী, নিত্যানন্দ সারথি,
শ্রীঅদ্বৈত যুদ্ধে আগুয়ায় রে (নদীয়ায়)!'

লালবিহারী বিজয়ের পায়ের কাছে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। কয়েকবার উচ্চে হরিধ্বনি করে গোঁসাইও সংজ্ঞাহীন। হরিচরণ আর কুলদা একখানা কাপড় দিয়ে গোঁসাইয়ের পা দুখানি ঢেকে রাখল। যাতে ব্যাকুল জনতা না স্পর্শলালায়িত হয়ে গোঁসাইকে অসুস্থ করে ফেলে।

কিন্তু বিজয়ের বাসায় এ কে মুসলমান ফকির? গৌর-নিতাইয়ের গান গাইছে, গান গাইছে রাধাকৃষ্ণের। গুরুভক্তি, গুরুমাহাত্ম্যের কথা শোনাচ্ছে! সাঙ্কেতিক ফকিরি ভাষায় আলাপ করছে গোঁসাইয়ের সঙ্গে। সকলে হতবাক। যেমন অনাহূত এসেছিল তেমনি অযাচিত চলে গেল। গোঁসাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। দেখ তো ফকিরসাহেব কোন দিকে যান। কোন দিকে! সবাই দ্রুতচকিত বেরিয়ে এল রাস্তায়। এদিক ওদিক দু'দিকই খুঁজতে লাগল তীক্ষ্ম চোখে, ফকির নিরুদ্দেশ!

একজন মহাপুরুষ এসেছিলেন।' বললে গোঁসাই।

তাতে আর সন্দেহ কী। ঘর থেকে বেরুতে-না-বেরুতেই স্থূলদেহে অদৃশ্য হয়ে গেলেন!

'কত মুসলমানই তো রাস্তা দিয়ে চলে যায়, এ-স্থানে এ-ভাবে কে আর আসে! শুধু আসে না, গৌর-নিতাই রাধাকৃষ্ণের গান গায়। দেখলে, সকল ধর্মের সকল উপাস্য দেবতাকেই কেবল অকৃত্রিম ভক্তি! আর গুরুতে কেমন নিষ্ঠা! কত মহাত্মা যে ছদ্মবেশে চলাফেরা করছে, এখানেও আসছে-বসছে তা কে বলবে। চিনতে হয়, মানুষ চিনতে হয়!

'মানুষ চেনবার উপায় কী?' এক ভক্ত জিগগেস করলে।

'মানুষ চেনবার উপায়,' বললে বিজয়কৃষ্ণ, 'নিজেকে ছোট আর অন্যকে বড় মনে করা। নিজেকে অধম আর অন্যকে অধমতারণ বলে ভাবা। রাস্তায় মুটে-মজুরকেও মহাপুরুষ ভেবে নমস্কার করা। এরূপ ভঙ্গিতেই যথার্থ মহাপুরুষের সাক্ষাৎলাভ ঘটে।'

লালবিহারী একবার এক মসজিদের সামনের চত্বরে বসে ক'জন সতীর্থের সঙ্গে ধর্মালাপ করছিল, মসজিদের ইমাম তা শুনতে পেয়ে আপত্তি জানাল। স্পষ্ট উর্দুতে লালবিহারী বললে, 'ঈশ্বরের কথা তাঁর মন্দিরের সামনে বললে দোষ কী।'

ইমাম বললে, 'আমাদের কোরানে নিষেধ আছে।'

কোরানের আরবী আয়ৎ বিশুদ্ধরূপে উচ্চারণ করল লালবিহারী, তারপর উর্দুতে ব্যাখ্যা করল: 'যে ঈশ্বর-অবিশ্বাসী নাস্তিক, কোরান তাকেই কাফের বলেছে, হিন্দু-মাত্রকেই নয়।'

ইমাম মৌলভীকে ডেকে আনল। একাধিক আরবী আয়ৎ আউড়ে গেল লালবিহারী। পার্শি টিকা উল্লেখ করল আর ব্যাখ্যা করল প্রাঞ্জল উর্দুতে। শুধু নাস্তিকেরাই কাফের

পদবাচ্য। প্রতিমার মাধ্যমে হিন্দু তো ঈশ্বরকেই মানছে, ঈশ্বরকেই ডাকছে, তবে সে কাফের হয় কী করে? কোরান তাকে কাফের বলে না।

একটি হিন্দু বালকের কোরানে গভীর জ্ঞান দেখে মৌলভী বিস্ময় মানল। ভাবল ছদ্মবেশে এ পীর ছাড়া কেউ নয়। তাকে সেলাম করল, ইমামকেও বললে সেলাম করতে।

লালবিহারীর অনেক যোগৈশ্বর্য হয়েছে। ওসব নিয়ে নাড়াচাড়া করতে তার বিশেষ আগ্রহ। মন্দ কী, যদি একটু শক্তি-টক্তি দেখিয়ে লোককে তাক লাগিয়ে দেওয়া যায়! কিন্তু বিজয়ের তাতে ঘোর আপত্তি। বললে, 'যার ভাণ্ডারে স্পর্শমণি আছে তার কেন ক্ষুদ্র কাচখণ্ডের প্রতি লোভ হবে?'

ঢাকার পূর্বাঞ্চলে গেণ্ডারিয়ার নির্জন প্রান্তে একটি আশ্রম তৈরি হল। উঠল একটি ছোট মাটির ঘর, 'ভজন কুটির', গোঁসাইয়ের নিঃসঙ্গ সাধনের জন্যে। আশ্রম বলতে দু'কুটুরির একটি বাসগৃহ, একটি রান্নাঘর, আরেকটি ভাঁড়ার ঘর। আর একটি আমগাছ। আশেপাশে জঙ্গলের জটিলতা।

সেই আশ্রমে এসে রয়েছে গোঁসাই, তার সহধর্মিণী যোগমায়া, পুত্র যোগজীবন, কন্যা শান্তিসুধা আর প্রেমসখী, শিষ্য শ্যামাকান্ত ও নবকুমার আর লালবিহারী ও শ্রীধর ঘোষ। আর এক সর্পমূর্তি যোগীপুরুষ।

সেই সাপ কখনো আসনের নিচে বসে থাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে, কখনও মাথার উপর ফণা তুলে আনন্দ জানায়। অন্য কোনো সাপকে ঢুকতে দেয় না। কটা ইঁদুর যদি আসতে চায় তো আসুক কিচিমিচি করুক।

বিজয় সাপের জন্যে দুধ-কলা রাখে আর ইঁদুরের জন্যে রুটির টুকরো।

ভজন-কুটিরের উত্তর দেয়ালের বাইরের গায়ে গোঁসাই খড়ি দিয়ে নিজের হাতে একটি নিশান আঁকল আর তার উপরে লিখল: ওঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ। আর ভিতরের দেয়ালের গায়ে লিখল সাতটি উপদেশ: (১) এইছা দিন নেহি রহেগা। (২) আত্মপ্রশংসা করিও না। (৩) পরনিন্দা করিও না। (৪) অহিংসা পরমো ধর্মঃ। (৫) শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর। (৬) শাস্ত্র ও মহাজনদের আচরণের সহিত যাহা মিলিবে না তাহা বিষবৎ ত্যাগ কর। (৭) নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ।

যেদিন প্রথম আশ্রম-প্রবেশ হল সেদিন খোলে-করতালে কীর্তনে বিপুল উৎসব হল। এক ধামা বাতাসা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল গোঁসাই, পরে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে ছড়িয়ে দিল চারদিকে।

প্রকাশ্যে এই প্রথম হরির লুট গোঁসাইয়ের।

পরদিন আবার আশ্রম-সঞ্চার উৎসব হল। সেইদিনও গৌরকীর্তন, নামগান, সেদিনও হরির লুট। হিন্দু ব্রাহ্ম বৈষ্ণব তো কতই এসেছে, এসেছে মুসলমান ফকির। তাই আনন্দ অধিকতর। আনন্দ অদ্ভুততর।

অনেক রাতে বাড়ি ফিরছে কুলদা, সঙ্গে ব্রাহ্ম গুরুভাই শ্যামাচরণ বক্সি। কুলদাকে শ্যামাচরণ বললে নিম্নস্বরে, 'আমি ব্রাহ্ম সমাজের লোক, তাই প্রকাশ্যে ঠাকুরের চরণামৃত নিতে সাহস পাই না! কিন্তু প্রত্যেক রাত্রে শোবার সময় মাথার কাছে একটি খালি বাটি রাখি আর মনে-মনে প্রার্থনা করি যেন তাতে তিনি চরণামৃত রেখে যান।'

কুলদা শ্যামাচরণের মুখের দিকে তাকাল। আশা করল শুনতে পাবে যে খালি বাটি খালিই থাকে।

'আশ্চর্য', শ্যামাচরণ বললে তন্মগত হয়ে, 'প্রতিদিনই শেষ রাত্রে উঠে দেখি যে বাটিতে চরণামৃত। এক-আধ দিন নয়, প্রত্যহ।'

'আর কেউ জানে?' সন্দিগ্ধ সুরে প্রশ্ন করল কুলদা।

'আর কেউ জানেনা। এই প্রথম আপনাকে বললাম। আপনি যদি ইচ্ছে করেন দেখতে পারেন পরীক্ষা করে।'

'তার মানে খালি বাটি চরণামৃতে ভরে উঠবে?'

'নিশ্চয়ই উঠবে। একবার দেখুন না ওঠে কিনা। কী দেখবেন পরখ করে?'

কুলদা গম্ভীর হয়ে বললে, 'যা কখনো হতে পারে না তার আবার পরখ করব কী?' ভাবল বঙ্কিম নিশ্চয়ই মতিভ্রম হয়েছে, নয় তো আর কোনো রহস্য আছে অন্তরালে। আজগুবি বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী?

বিষম অসুখে পড়েছে কুলদা। প্রায় মনোবিকারের অবস্থা। কাউকে বলাও যায় না এ বিকারের প্রতিকার কী? মনে পড়ে একবার শ্যামাচরণ বলেছিল, গুরুর চরণামৃত নিলে শারীরিক ও মানসিক দুই বিকারেরই শান্তি হয়। একবার দেখি না, ধরি না গোঁসাইকে। ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষা তো কুলদা তাঁরই কাছে পেয়েছে।

মন্দ কি, গুরুর চরণামৃত রাখি না সংগ্রহ করে। বিদেশে বিভুঁয়ে কখন কী ভাবে গুরুসান্নিধ্যচ্যুত হয়ে থাকতে হয় কে বলতে পারে। বিপাকে-উৎপাতে কখন বিপর্যস্ত হই তার ঠিক নেই। কার মধ্যে কী আছে কে জানে। গোঁয়ারের মতো সব নস্যাৎ না করাই ভালো।

আশ্রমে এসে দেখল ঘরে বিস্তর লোক। গোঁসাইয়ের সঙ্গে একটু নির্জন হই কী করে? মনের অনুক্ত অভিলাষটি শুনতে পেয়েছে গোঁসাই। বাইরে বেরিয়ে এসেছে। আর কথা নেই, নির্জনে ধরেছে কুলদা, প্রণাম করে পাদোদক গ্রহণ করেছে।

'আমার যেন গুরুতে, সত্যবস্তুতে নিষ্ঠা হয়।'

'নিশ্চয়ই হবে। শোনো,' গোঁসাই আরো সন্নিহিত হল: 'চরণামৃত গোপনে ব্যবহার করবে, তবেই ফল পাবে। লোকের সামনে কখনো নেবে না, আর কাউকে জানতেও দেবে না।'

না, কাউকে জানতেও দিই না কী ভাবে চলছে এ আশ্রম, কে চালাচ্ছে। কোনো নির্দিষ্ট আয় নেই, চাঁদার খাতা নেই, নেই বা দীক্ষান্তিক দক্ষিণা। তবু যে আসছে, সেই আহার করে যাচ্ছে। কোথাও কোনো অভাব ঘটছে না। না অন্নের, না আনন্দের।

দীক্ষার পর এক শিষ্য নটা টাকা দিতে চাইল গোঁসাইকে।

করজোড় করল গোঁসাই। বললে, 'আমি ক্ষুদ্র জীব, আমাতে সব দোষই সম্ভব। আমার কোনো ব্যবহারে এমন যদি কিছু প্রকাশ পেয়ে থাকে যে আমি যাচ্ঞা করছি, তাহলে আমার ত্রুটি হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি অর্থের প্রত্যাশায় দীক্ষা দিই না। দীক্ষার বিনিময়ে যিনি টাকা দেন ও যিনি টাকা নেন, দুজনেই নরকস্থ হন।'

গুরুদত্ত মন্ত্রের কি কোনো দাম হয় যে টাকায় তার বেচাকেনা হবে? আশ্রমে এসে কী দেখছ? কী শিখছ? দেখছি, আশ্রমের সমস্ত কাজ ঘড়িধরা। চা খাওয়া থেকে সুরু করে পাঠ পূজা কীর্তন সাধন ভজন আহার—সমস্ত কাঁটায় কাঁটায়। শিখছি সময়নিষ্ঠাই ধর্মের প্রথম পাঠ। আশ্রমে নিত্য পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান। দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, প্রাণীযজ্ঞ আর মনুষ্যযজ্ঞ। দেবযজ্ঞ মানে উপাসনা, প্রার্থনা, হোম, পূজা, গুরুদত্ত

নামসাধন। ঋষিযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞ মানে শাস্ত্রপাঠ সন্ধ্যা গায়ত্রী জপ। পিতৃযজ্ঞ মানে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রাদ্ধতর্পণ। প্রাণীযজ্ঞ বা ভূতযজ্ঞ মানে পশু-পাখিদের খাওয়ানো, বৃক্ষলতার জল দেওয়া। আর মনুষ্যমাত্রকেই যথাসাধ্য কিছু দান করার নামই মনুষ্যযজ্ঞ বা নৃযজ্ঞ। এক কথায় অতিথিসেবা। দিন এইভাবে কাটিয়ে অপরাহ্নে সমবেত জিজ্ঞাসু লোকদের সঙ্গে ধর্মালাপ। তারপর সন্ধ্যায় কীর্তন। শোনো গোঁসাইয়ের কণ্ঠ কী অমৃতনির্ঝর!

'মন রে, সদাই হরিবোল, মধুর হরিনামের নাই তুলনা।
যদি বিষয়েতে সুখ হত রে, তবে লালাজি ফকির হত না॥
নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল রে, তারে যমদূত ছুঁতে পেল না,
মধুর হরিনাম রে—
নামে জগাই-মাধাই তরে গেল রে! ভবে অপার নামের মহিমা।
হরিনামের গুণে রে
নামে রূপ-সনাতন ফকির হল রে, কি দিব নামের তুলনা॥'

এক দিন সশিষ্য ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে উপস্থিত হল গোঁসাই। গোঁসাইকে দেখে আনন্দের ঢেউ পড়ে গেল। ভাবোচ্ছ্বাস কেউ রুখতে পারল না। মহোৎসাহে সুরু হল সংকীর্তন।

গোঁসাইয়ের সঙ্গে শ্রীধর এসেছে। শ্রীধর ঘোষ, ফরিদপুর জেলায় ভাঙ্গার কাছাকাছি সদরদি গ্রামে বাড়ি। সামান্য লেখাপড়া শিখে কিছুকাল পুলিসের চাকরি করেছিল। শিশুকাল থেকেই প্রবল ধর্মস্পৃহা, যুগের হাওয়ায় পড়ে ব্রাহ্ম হয়েছিল। কিন্তু মহতের আশ্রয় ছাড়া কোনো উপলব্ধিই স্থায়ী হবে না, তাই বেরুল গুরুর সন্ধানে। এল দক্ষিণেশ্বরে, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে।

'আমি সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেতে এখানে এসেছি, আমাকে দীক্ষা দিন।'

'সদগুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হলে সেই বিজয়ের কাছে যা।' বললেন রামকৃষ্ণ।

শ্রীধর সটান চলে এল ঢাকায়, প্রচারক-নিবাসে, গোঁসাইয়ের থেকে দীক্ষা নিল।

এখন ব্রাহ্ম সমাজে কীর্তনে উত্তাল মেতে গিয়ে শ্রীধর বলতে সুরু করল: 'ঐ দ্যাখ—ঐ দ্যাখ' বলে আকাশের দিকে হাত তুলে লাফাতে লাগল।

ব্রাহ্ম চণ্ডীচরণ কুশারী খেপে গেল। শ্রীধরের সামনে এসে চিৎকার করতে লাগল: 'ঐ দ্যাখ, ঐ দ্যাখ কী করে? ব্রহ্ম জগৎময়, ব্রহ্ম জগৎময়।'

প্রচারক নগেন্দ্রনাথ চাটুজ্জে বেদীতে উপাসনায় বসলেন। বললেন, 'উপাসনা সাকারই করো বা নিরাকারই করো, এই শুধু দেখবে ইষ্ট দেবতাকে যথার্থ ব্যাকুলতার সঙ্গে ডাকছ কিনা।'

এ উপদেশ শুনে ব্রাহ্মরা চটে গেল। ভাবল, গোঁসাই এসে ছুঁয়ে দিয়ে গিয়েছে।

যেমন পাগল শ্রীধর তেমন পাগল সতীশ। সতীশ মুখুজ্জে। ঢাকা বাঘিয়াগ্রামে বাড়ি, বি-এ পর্যন্ত পড়েছে। উপবীত ত্যাগ করে ব্রাহ্ম হয়েছে। পরে আবার দীক্ষা নিয়েছে গোঁসাইয়ের কাছে।

সাধন-ভজনেও দেহের কাম বশীভূত হচ্ছে না, সতীশের এই এক উদ্দাম যন্ত্রণা। সাধন-ভজনে উৎপাত থেকে নিষ্কৃতি তো ঘটলই না, বরং, সত্য কথা বলতে গেলে, উত্তেজনা আরো বেড়ে চলল। ঠিক করল, সাধন আর করব না, যাব না গোঁসাইয়ের কাছে।

পাশের ঘর থেকে গোঁসাই হঠাৎ ডাকল সতীশকে। বললে, 'আমার মাথায় একটু তেল দিয়ে দাও তো।'

'না, তা আমি পারব না।' সতীশ স্পষ্ট স্বরে বললে।

'রাগ করছ কেন ? আমার মাথা যে জ্বলে গেল।'

গোঁসাইয়ের কোনো কালেও মাথায় তেল দেওয়ার অভ্যেস নেই, তবু আজ এ কী আচরণ। এক গণ্ডূষ তেল নিয়ে গোঁসাইয়ের মাথায় রগড়াতে লাগল সতীশ।

'দাও দাও, ভালো করে দাও, আমার মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

থরথর করে কাঁপতে লাগল সতীশ।

'যতটা তেল আছে সবটা বেশ করে ধীরে-ধীরে বসিয়ে দাও।'

তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দেখছে সতীশ। একে-একে সব অপসৃত হয়ে যাচ্ছে সমুখ দিয়ে। যে সব নারীমূর্তিকে এতদিন লোভনীয় মনে হত, এখন সবাইকে দেখাচ্ছে কী আতঙ্ককর। যে দৃশ্যে কামনা জাগত তাই এখন বিতৃষ্ণা জাগাচ্ছে। কোথায় রক্তমাংসের সমাহার, এ এক বিনগ্ন কঙ্কাল !

'সব তেলটা শুষেছে ?'

'হ্যাঁ, শুষেছে।'

'তবে, যাও, এবার তোমার ছুটি।'

'যাব ?' চমক ভাঙল সতীশের। তাকিয়ে দেখল গোঁসাইয়ের মাথায় এক বিন্দু তেল নেই। যেমন শুকনো ছিল তেমনি শুকনো। সতীশের সমস্ত যন্ত্রণা গোঁসাই নিজে মাথা পেতে টেনে নিয়েছে। শুষে নিয়েছে সমস্ত দুষ্কাম।

২০

শান্তিসুধার বিয়ে হল জগবন্ধু মৈত্রের সঙ্গে। আর জগবন্ধুর বোন বসন্তকুমারীর সঙ্গে বিয়ে হল যোগজীবনের। এদের চেয়ে ঢের-ঢের ভালো পাত্র-পাত্রী জোটানো যেত। পরিবারের অনেকেই প্রতিবাদ করল। কিন্তু গোঁসাই নিজের নির্বাচনে নির্বিচল। জগবন্ধুর আগেই দীক্ষা হয়েছিল তার কাছে। জগবন্ধুর সমস্ত কিছুই তার জানা। সবচেয়ে বড় কথা, গুরু পরমহংসজির আদেশ। আর, জেনে রাখো, দুটো বিয়েই হবে ব্রাহ্মমতে রেজেস্ট্রি করে।

'কেন, এখন আর অন্য মতে কেন ?' ঢাকায় নামকরা উকিল ঈশ্বর ঘোষ আপত্তি করল। বললে, 'হিন্দু বিয়েতে ঋষিদের গন্ধ আছে, সুতরাং হিন্দু-মতে হলেই ভালো।'

গোঁসাই বললে, 'না। ব্রাহ্মণের একটি সংস্কারও যোগজীবনের হয় নি। আর জগবন্ধু নানারকম অনাচার করেছে। এদের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া কঠিন, আর তার এখন সময় কই ? কাজে কাজেই ব্রাহ্ম মতই প্রশস্ত।'

বিয়েতে অনেক সাধু সন্ত মহাপুরুষ এসেছে। এসেছে ব্রাহ্ম ভক্তের দল। আর এসেছে ধামরাই-এর অন্ধ সাধক পরশুরাম। 'আকাশগঙ্গা'-র রঘুদাস বাবাজি। পরশুরাম জাতে তাঁতী, তেজারতি কারবার করে অবস্থা বড় করে ফেলেছে। আট ছেলে, সকলেই

রোজগেরে। ছয় মেয়ে, প্রত্যেকেরই ভালো ঘরে বিয়ে হয়েছে। আর কী চাই। সুখে সৌভাগ্যে পরশুরাম গমগম করতে লাগল। কিন্তু এমনই নিয়তির পরিহাস, সংসারে শোক দেখা দিল। অল্প সময়ের মধ্যে দেখতে-দেখতে আট-আটটা ছেলে মরে গেল একে-একে। ছটা মেয়ের মধ্যে পাঁচটাই পঞ্চত্ব পেল। আর যেটা বাকি রইল সেটা বিধবা হল। কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হল পরশুরাম। তাকে একা ফেলে স্ত্রী-ও পিটটান দিলে।

বিধবা কন্যাকে কাছে ডাকল পরশুরাম। বললে, আমার কাছে থাক।

সেই মেয়ে প্রাণপণ যত্নে বাপের সেবা করতে লাগল। দুর্বৃত্ত দেনদাররা ভাবল, বুড়োর সব টাকাই বুঝি মেয়েটা গ্রাস করবে। তাই সবাই তার উপর অকথ্য অত্যাচার চালাল। নিঃসহায় বিধবা আত্মহত্যা করল। অন্ধের শেষ নড়িটাও ভেঙে গেল। তবু এততেও রেহাই নেই। পাপিষ্ঠেরা পরশুরামের ঘরে ডাকাতি করল। তার সিন্দুক ভেঙে সমস্ত দলিলপত্র খত-তমশুক নিয়ে গেল চুরি করে। নগদ টাকা যা ঘরে ছিল তার একটা কপর্দকও রেখে গেল না। শূন্য ঘরে অন্ধ পরশুরাম হাহাকার করতে লাগল।

তার দুর্দশা দেখে প্রতিবেশী এক ব্রাহ্মণের দয়া হল। আশ্চর্য, দয়া বলে কোনো বস্তু আছে নাকি পৃথিবীতে! ব্রাহ্মণ বললে, আমার বাড়ি চলুন। আমি যদি দু-মুঠো খেতে পাই, আপনাকে দেব এক মুঠো।

পরশুরামকে ব্রাহ্মণ তার ঘরে নিয়ে এল। কিন্তু দুর্বৃত্তেরা শাসাতে লাগল ব্রাহ্মণকে: 'ঐ নির্বংশকে বাড়িতে স্থান দিলে আপনিও নির্বংশ হবেন। আর আপনার সঙ্গে আমাদের যদি সংস্রব ঘটে আমরাও নির্বংশ হব। ওকে এখুনি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিন, নইলে সবাই মিলে আপনাকে একঘরে করব।'

ব্রাহ্মণ বললে সব পরশুরামকে। পরশুরাম বললে, 'ঠিকই তো, আমার জন্যে আপনি কেন বিপন্ন হবেন? আমাকে আপনি মাধবের মন্দিরে রেখে আসুন।'

গ্রামের আরাধ্য দেবতা মাধব। তারই মন্দিরচত্বরের এককোণে ব্রাহ্মণ পরশুরামকে রেখে এল। যারা মাধবকে ভোগ দিতে আসে তারাই প্রসাদের কিছু অংশ দেয় পরশুরামকে আর তাই খেয়ে পরশুরামের দিন কাটে। আর কী করে পরশুরাম? আর তো তার করবার কিছুই রাখেননি ঠাকুর। তাই সে দিবারাত্র 'মাধব' 'মাধব' জপ করে। একদিন স্বয়ং মাধব তার সামনে এসে দাঁড়াল।

'পরশুরাম, আমাকে তুমি দেখবে?'

'কে তুমি?'

'আমি মাধব। যাকে তুমি অহর্নিশ ডাকছ, সে।'

'তোমাকে বলিহারি!' বললে পরশুরাম, 'তোমাকে যে দেখব, আমার চোখ কই?'

'তুমি আমার দিকে মুখ তুলে তাকাও, দেখতে পাবে।'

নত মুখ ধীরে ধীরে তুলল পরশুরাম। এ কী, সত্যি যে সে দেখতে পাচ্ছে। শুধু মর্মচোখে নয়, চর্মচোখে। তার সামনে মন্দিরের বিগ্রহ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাসছে! সত্যি, না, স্বপ্ন দেখছে পরশুরাম? পরশুরাম চোখ কচলাল। এখনো ঠিক দেখতে পাচ্ছে মাধবকে। দেখতে পাচ্ছে সমস্ত বস্তুতে মাধব। আগে শুধু 'মাধব' 'মাধব' বলত। এখন বলতে লাগল, দয়াল মাধব, দয়াল মাধব।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে খুঁজতে খুঁজতে পরশুরাম গোঁসাইয়ের আশ্রমে এসে উপস্থিত হল। বললে, 'আমি এখানে থাকব।'

'কেন, এখানে কেন ?' জিগগেস করল কুলদা।

'আজ্ঞে, জানতে পারলাম, মাধব গেণ্ডারিয়ায় আছেন।'

'গেণ্ডারিয়ায় আছেন ! কই মাধব ?'

আশি বছরের বুড়ো পরশুরাম হাসতে লাগল। বললে, 'ঐ যে আমার মাধব। আমার দয়াল মাধব।' বলে বিজয়কৃষ্ণকে দেখিয়ে দিল।

আর রঘুবর বাবাজি ? তার বিপরীত কাহিনী। তার কাহিনী সর্বার্পণ শরণাগতির নয়, তার কাহিনী অহঙ্কারের। ফল্গুর অপর পারে রামগয়া পাহাড়ের নিচে বাবাজির এক গুরুভাই থাকে। মৃত্যুকালে গুরুভাই রঘুবরকে ডেকে পাঠাল। বললে, আমার স্ত্রী আর নাবালক ছেলে দুটিকে তুমি দেখো।

গুরুভাই মরে গেলে তার অনুরোধ ঠেলতে পারল না রঘুবর। দেখল দারুণ দুরবস্থার মধ্যে রেখে গেছে স্ত্রী-পুত্রকে। দু-বেলা দুটি অন্নের পর্যন্ত সংস্থান নেই। রঘুবরের দয়া হল। ভাবল, আমি ছাড়া কে ওদের দেখবে ? প্রত্যহ দুবেলা নিজে রান্না করে রঘুবর। দুক্রোশ হেঁটে নিজে গিয়ে খাবার পৌঁছে দিয়ে আসে। হায়রানির একশেষ। শেষে ভাবলে, ওদেরকে আশ্রমে নিয়ে আসি। এখানে থাকলে গরম গরম খেতে পায়। আমার পরিশ্রমটা কমে।

গুরুভাইয়ের স্ত্রী ও ছোট ছেলে দুটিকে আশ্রমে আশ্রয় দিল রঘুবর। আমি না হলে ওদের কে দেখবে ! কে একটু সেবা স্নেহ করবে।

পাহাড়ে এসেই বড় ছেলেটি মারা গেল। ছোটটার প্রতি আরো আকৃষ্ট, আসক্ত হল রঘুবর। ভাবতে লাগল, ওর ভবিষ্যতে কী হবে ! কে ওকে মানুষ করবে ? আগে কত শত টাকা প্রণামী পড়ত, স্ত্রীলোকটিকে আনা অবধি কম পড়তে লাগল। তেমন একটা ভাণ্ডারাও কেউ দেয় না। সবাই উল্টো বুঝল। ভাবল, বাবাজি ছেলেটার জন্যে টাকা জমাচ্ছে। দানে-ধ্যানে তার আর মতিগতি নেই।

'ছেলে আর তার মাকে আশ্রমে রাখবেন না।' বাবাজির এক শিষ্য এসে বললে, 'শহরে কোনো বাড়িতে রেখে দিন। নইলে বিপদের সম্ভাবনা।'

'মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুর কাছে আমি প্রতিশ্রুত, যতদূর সাধ্য ওর স্ত্রী-পুত্রকে নিরাপদে রাখব।' বললে বাবাজি, 'তাতে যদি আমার কোনো বিপদও আসে, ভয় করব না।'

'লোকেরা বলাবলি করছে ওদের ভরণপোষণের জন্যে আপনি বিস্তর টাকা জমিয়েছেন। শেষে আশ্রমে না ডাকাত পড়ে।'

'পড়তে দাও। দেখি কার ঘাড়ে কটা মাথা।'

ক-দিন পরে সত্যি-সত্যিই আশ্রমে ডাকাত পড়ল। মার-মার রব তুলে সুরু করল লুটপাট। একটা লাঠি হাতে করে বার হল বাবাজি। দোহাত্তা পিটিয়ে ভাগিয়ে দিল ডাকাতদের। ডাকাতেরা আরেক দিন চড়াও হল। এবার দলে আরো ভারী হয়ে। এবারও বাবাজি লাঠি ঘুরোতে ঘুরোতে সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। কিন্তু হঠাৎ লাঠির ঘা পাথরে পড়ে লাঠি দু-টুকরো হয়ে গেল। আর যায় কোথা ! ডাকাতেরা পাকড়াও করল বাবাজিকে। মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলল। পায়ে একটা গামছা বেঁধে টেনে হিঁচড়ে পাহাড়ের উপর তুলল আর বুকের উপর একটা পাথর চাপা দিয়ে সরে পড়ল।

সকালবেলা শূন্য আশ্রম দেখে যাত্রীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল, বাবাজি কোথায় ? খুঁজতে খুঁজতে পেল তাকে পাথরের নিচে, অজ্ঞান, মুমূর্ষু। অনেকে মিলে পাথরটা

সরিয়ে ফেলে বাবাজিকে এনে আশ্রমে, মহাবীরের কাছে ফেলে রাখল। ভাবল প্রাণ নেই। গেল পুলিশে খবর দিতে।

হাড়-পাঁজরা টুকরো-টুকরো, বাবাজি হঠাৎ গা-নাড়া দিয়ে মহাবীরের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়ল। মাটিতে মাথা ঠুকতে-ঠুকতে বলল, 'জয় মহাবীর, জয় মহাবীর। যেমন অপরাধ করেছি তেমনি দণ্ড পেয়েছি। তুমি দয়াল, তুমি বড় দয়াল।'

পুলিশ-সাহেব এসে বাবাজির জবানবন্দি নিলে। ডাকাতদের মধ্যে কাউকে চেনেন?

'সবাইকেই চিনি।'

'নাম বলুন।'

'মাপ করবেন। যা শাস্তি দেবার ভগবানই দেবেন। আমি কেন আর স্পর্ধা করি?'

পুলিশ-সাহেব অনেক সাধাসাধি করল, বাবাজি মুখ খুলল না।

তারপর একদিন চলে গেল পাহাড় ছেড়ে।

পরের উপকার করতে গিয়ে, অহঙ্কারে বাবাজির পতন হল। এখন মুষ্টিভিক্ষার জন্য দ্বারে-দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে সব অলৌকিক প্রভাবের লেশমাত্র আর অবশিষ্ট নেই।

যোগজীবনের বিয়েতে আচার্যের কাজ করলেন প্রচারক নগেন চাটুজ্জে। আর শান্তিসুধার বিয়েতে সমাজের সম্পাদক রজনী ঘোষ। বিবাহ সভায় বক্তৃতা দিল গোঁসাই। যোগজীবনকে আদেশ করল এক বছর ব্রহ্মচর্য পালন করতে। শান্তিসুধাকেও নানা উপদেশ দিল।

'তুই রাজরাণী হতে চাস, না, আমাদের ফকিরি খাতায় নাম লেখাবি?' গোঁসাই জিগগেস করল মেয়েকে, 'ঠিক করে বল। যদি ঐশ্বর্য চাস আমি তোকে দেব অতুল বৈভব, কিন্তু তাতে তোর ধর্মলাভে দেরি হবে। আর যদি—'

সিদ্ধান্ত করতে এক মুহূর্ত দেরি হল না শান্তির। বললে, 'ধর্মলাভে বিলম্ব আমার সহ্য হবে না। আমার ঐশ্বর্যে কাজ নেই। তুমি তোমাদের ফকিরি খাতাতেই আমার নাম লেখাও।'

মেয়ে কী বলে! এমন সাধা লক্ষ্মী কি কেউ পায়ে ঠেলে? উপস্থিত সকলে অবাক মানল। কিন্তু গোঁসাইয়ের আনন্দ আর ধরে না। শান্তির সুধার মতোই মেয়ের এ কথা। বললে, 'তাই হোক। ভোগৈশ্বর্য পেলে না, পেলে ফকিরির সাম্রাজ্য।'

বিয়ের পরদিন সকালেই শ্রীকীর্তন সুরু হল। নামমদিরায় বিভোর হয়ে গোঁসাই নাচতে লাগল। কেন কে জানে, হঠাৎ সেখানে সহধর্মিণী যোগমায়া দেবী এসে উপস্থিত হল। কেন কে জানে, দাঁড়াল স্বামীর পাশ ঘেঁষে।

কে অমনি ধ্বনি তুলল: 'জয় রাধারাণী জয় ব্রজেন্দ্র নন্দন।'

ভাবে-প্রেমে দুজনেই সমাহিত। চিন্তাহরণ মুখুজ্জে তখুনি গান ধরল:

> 'শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
> শারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ।
> নইলে শুধুই মদন।
> শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।
> শারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,
> নইলে পারবে কেন?'

নগেন চাটুজ্জের স্ত্রী মাতঙ্গিনীর গোপী-আবেশ হল। কাঁখে একটা জল-ভর্তি ঘড়া নিয়ে যুগলমূর্তিকে প্রদক্ষিণ করতে লাগল আর নেচে-নেচে গান গাইতে লাগল :

'হরি বলব আর মদনমোহন হেরিব গো।
যাব ব্রজেন্দ্রপুর গোপীপায় হব নূপুর
রাঙা পায়ে রুনুঝুনু বাজিব গো।
তোমরা সব ব্রজবাসী আমায় কর এই আশিস
নিতুই নিতুই শ্যামের বাঁশি শুনিব গো ॥

আর পরশুরাম কী করছে ? প্রেমনেত্রে দেখছে তার মাধবকে। আর বলছে, এই তো সেই—আহা, কেমন চূড়া, কেমন বনমালা ! চরণে লুটিয়ে পড়ে বলছে, তুমি কেমন মানুষ গো ! আমার মাধবকে সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াও। আবার আমার মাধবকে লুকিয়ে ফেল ! আহা, দেখ আমার মাধবকে। কেমন বাঁশি, কেমন যমুনা-পুলিন ! অধরং মধুরং বদনং মধুরং—মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং।

কীর্তনান্তে অন্নমহোৎসব আরম্ভ হল। দীয়তাং ভুজ্যতাং, ঢেলে দিচ্ছি, যে যত পারো খাও। সমস্ত দিন ধরে খাওয়া চলল, কিন্তু সন্ধের দিকে দেখা গেল দই নেই। নগেন চাটুজ্জে ও তার দলের গণ্যমান্যেরা খেতে বসেছে। 'গোঁসাই, দই না খেয়ে উঠব না, দই নিয়ে এস।'

যোগমায়া চুপিচুপি গোঁসাইকে বললে, 'দই নেই।'

'ও সব শুনছি না,' নগেন আবার আওয়াজ তুলল : 'যেখান থেকে পারো নিয়ে এস।'

গোঁসাই জিগগেস করল, 'এক বিন্দুও নেই ?'

যোগমায়া বললে, 'একটা হাঁড়ির তলাতে যৎসামান্য কিছু আছে, তা দিয়ে এত লোকের খাওয়া হয় না।'

কত লোক ? পঙক্তির দিকে তাকাল গোঁসাই। ষাট-বাষট্টি জন হবে। তা হোক। তুমি নিয়ে এস সেই দইয়ের হাঁড়ি। যোগমায়া সেই হাঁড়ি স্বামীর হাতে তুলে দিল। গুরু পরমহংসজিকে স্মরণ করল গোঁসাই। দেখল হাঁড়ি দাঁখতে ভরে উঠেছে। একবার নিঃশেষ হয় তো আবার ভরে ওঠে। কে কত খাবে খাও। গণ্ডূষে-গণ্ডূষে খাও, তবুও সমুদ্র শুষ্ক হবে না। এ কী অপরূপ !

'হ্যাঁ, আমার গুরুজির এক কণা যোগৈশ্বর্য।' বললে গোঁসাই।

'কী কৃপা, কী শক্তি !' ভাবাবিষ্ট নগেন সেই দই তার সারা গায়ে লেপতে লাগল।

গোঁসাইয়ের সাধ হল বারদীর ব্রহ্মচারীকে দেখে আসে।

'ওরে, জীবনকৃষ্ণকে দেখতে বড় ইচ্ছে হয়।' বলছে লোকনাথ ব্রহ্মচারী, 'কিন্তু বুড়ো হয়েছি, নৌকোয় যাবার সামর্থ্য নেই।'

গোঁসাই তা টের পেয়েছে। সঙ্কল্প করেছে সেই যাবে।

'ওরে, আমার জীবনকৃষ্ণ আসছে।' লোকনাথ আনন্দে টলমল করে উঠল।

অনুচর ভক্ত বললে, 'কই কোনো খবর পাঠায়নি তো।'

'পাঠিয়েছে।' লোকনাথ হাসতে লাগল : 'তোরা শুনিসনি, আমি শুনেছি।' কতক্ষণ পরে হাত তুলে শিশুর মতো উল্লাস করে উঠল, 'ঐ দ্যাখ, ঘাটে তার নৌকো ভিড়ছে। ওরে সঙ্গে আমার মা আসছে, দিদিমা আসছে।'

লোকনাথকে দেখে গোঁসাই তো চমৎকার। দেহের প্রতি রোমকূপ থেকে আগুনের শিখা বেরুচ্ছে। তার মধ্যে কোষে-কোষে বসে আছে দেবতারা।

লোকনাথ দুই বাহু প্রসারিত করে গোঁসাইকে তার বুকের মধ্যে চেপে ধরল। বললে, 'চুপ কর, চুপ কর, এতদিন এখানে আমি বেশ ছিলাম, শান্তিতে ছিলাম, তুই হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলি। গোপনে থাকতে দিলি নে। সকলের সামনে প্রকাশ করে ফেললি।'

গোঁসাই অভিমানের স্বরে বললে, 'এতদিন তবে আমার প্রতি দয়া হয়নি কেন?'

ততোধিক অভিমানের সুরে লোকনাথ বললে, 'তুইও তো সমান পাষাণ।'

দুজনে তারপর অন্তরঙ্গ আলাপ করতে বসল। তার বুঝি তটও নেই তলও নেই।

আশ্রমের গয়লানী ব্রহ্মচারীকে জিগগেস করলে, 'এ কে?'

ব্রহ্মচারী সস্নেহে হাসল। বললে, 'এ ঘরের ছেলে।'

হাতে একখানা গরদের কাপড় নিয়ে যোগমায়া সলজ্জ ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে। লোকনাথ পরিহাসের স্বরে বললে, 'বলি গজেন্দ্রগামিনি, একটু হেঁটেই এস না।'

যোগমায়া কাছে এসে লোকনাথের পায়ের উপর গরদখানি রেখে প্রণাম করল।

'এ কি, এটা পরতে হবে নাকি?' বলে লোকনাথ গরদখানা ফালা দিয়ে ছিঁড়ে চার টুকরো করলে। এক খণ্ড মাথায় বাঁধল, আরেক খণ্ড কোপীন করল। বাকি দুখণ্ড দান করে দিল।

মুক্তকেশীকে জিগগেস করলে, 'মেয়ের নাম কী রেখেছ?'

'যোগমায়া।'

'বা, চমৎকার হয়েছে। যোগমায়ার অর্থ কী জানো?'

'না। কে অর্থ বলবে?'

'যে অপ্রাকৃত মায়া আশ্রয় করে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে লীলা করেছিল তাই হচ্ছে যোগমায়া। নাম রাখাটি ঠিক হয়েছে।'

হঠাৎ যোগমায়াকে লক্ষ্য করে বললে, 'আমাকে নিজের হাতে বেঁধে খাওয়াবি?'

'হ্যাঁ, দিচ্ছি রান্না করে।'

রান্না শেষ হলে লোকনাথ বললে, 'আমাকে নিজের হাতে খাইয়ে দিবি তো?'

যোগমায়া ইতস্তত করতে লাগল।

গোঁসাই বললে, 'দাও না খাইয়ে।'

লোকনাথের থালার কাছে বসল যোগমায়া। লোকনাথ বললে, 'তোমার বাঁ হাতে আমার ঘাড় ধরে ডান হাতে খাইয়ে দাও। মা যেমন করে ছোট-ছেলেকে খাওয়ায়। আর বলো, বাছা, খাও, নইলে মারব। তবেই খাব তোমার হাতে।'

তথাস্তু। যেমন ছেলে বলল তেমনি মা খাইয়ে দিল।

খেতে-খেতে লোকনাথ বললে, 'মা, আমিও খাই, তুমিও খাও।'

যোগমায়া দু-এক গ্রাস মুখে তুলল।

'বেশ, এখন আমি নিজের হাতে খাই।' লোকনাথ থালায় হাত লাগাল। বললে, 'খানিকক্ষণ খাবার পরেই তুমি আমার হাত চেপে ধরবে। বাধা দিয়ে বলবে, বাছা, আর খাসনে, অসুখ করবে।'

দু-চার গ্রাস খাবার পরেই যোগমায়া লোকনাথের হাত চেপে ধরল। বললে, 'বাবা, আর খাস নে, অসুখ করবে।'

স্বরে যেন অকৃত্রিমতার সুধা। অহো, অহো, বলতে-বলতে সমাধিস্থ হল লোকনাথ। বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে উপস্থিত মেয়ে-ভক্তদের জিগগেস করলে, 'বলতে পারিস যোগমায়াকে এত ভালোবাসে কেন?'

'পারি।'

'কেন?'

'পৃথিবী শুদ্ধু সবাই যে তাকে ভালোবাসে।'

'ঠিক বলেছিস। সবাই যাকে ভালোবাসে সেই তো জগতের মা, রাধাঠাকুরাণী।'

নাগবাবুদের বাড়ি থেকে গোঁসাইকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছে।

গোঁসাই তাকাল লোকনাথের দিকে। লোকনাথ বললে, 'শ্রীনন্দের নন্দন কি আমার একার বস্তু? যা, দেখা দিয়ে আয়। তোকে দেখবার জন্যে ছেলে-বুড়ো সবাই লালায়িত।'

দেখা দিয়ে এল। আখড়ায় গৌর-নিতাইয়ের মূর্তির সামনে দাঁড়াল স্তব্ধ হয়ে। কাঁদতে লাগল।

আখড়ার মোহন্ত এলে লোকনাথ তাকে জিগগেস করল, 'ওহে মোহন্ত, আমাদের মহাপ্রভুকে দেখেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তোমাদের মহাপ্রভু কথা কন না। লোকনাথের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: 'কিন্তু আমাদের মহাপ্রভু কথা কন।'

'আমাদের মহাপ্রভু ভক্তের সংগে কথা কন।' বললে মোহন্ত।

'কিন্তু আমাদের মহাপ্রভু সকলের সংগেই কথা কন।'

গোঁসাই লোকনাথ সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত। বলছে, 'কত বনজংগল পাহাড়-পর্বত ঘুরেছি কিন্তু এত বড় শক্তিধর সিদ্ধ মহাপুরুষ কখনো দেখিনি। চন্দ্রনাথ পাহাড়ে দাবানল থেকে যে মহাপুরুষ এসে আমাকে বাঁচিয়েছিলেন, নিরাপদ স্থানে রেখে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন সেই মহাপুরুষই এই লোকনাথ ব্রহ্মচারী।'

মধ্যরাতে উঠে লোকনাথ ভজন গাইছে: 'পাগৌরাংগ, নিত্যানন্দ, জীবনকৃষ্ণ, জীবনকৃষ্ণ।'

কুলদানন্দ লোকনাথের কাছে এসেছে নিবৃত্তির সন্ধান নিতে।

লোকনাথ বললে, 'আমি তোকে নিবৃত্তির কথা বলব না। তোর কর্মই তোকে নিবৃত্ত করবে। কর্মশেষ না হলে কিছুতেই কিছু হবে না। আগে প্রারব্ধ শেষ কর। পরে ধর্মলাভ।'

গোঁসাইয়ের কথা উঠল।

'আর বলিস নে তোর গোঁসাইয়ের কথা।' বললে লোকনাথ, দেশবিদেশে আমাকে মহাপুরুষ বলে প্রচার করে আমার সর্বনাশ করলে। এখানে বেশ ছিলাম পঁচিশ বছর, এখন রুগীর চিৎকার, আর মামলা-মোকদ্দমার কথা উদয়াস্ত শুনছি। এই জন্যেই কি আমার থাকা? শালা অন্ধ মুরুখ্খু। কচি-কচি ছেলেগুলোকে যোগশিক্ষা দিচ্ছে আর বলছে পরমহংসজি, পরমহংসজি।'

গুরুনিন্দায় কুলদা কেঁদে ফেলল। বিরক্ত হয়ে আখড়া ছেড়ে চলে এল গোঁসাইয়ের কাছে। সমস্ত বললে।

'বা, তাঁর কাছে গেলে তিনি নাড়াচাড়া করে দেখবেন না ?' বললে গোঁসাই, 'এ হচ্ছে আমাকেই পরীক্ষা করা। আমাকে তিনি বলেছিলেন, তোর নাড়িভুঁড়ি আমি টেনে বের করব। তাই তিনি করছেন। যত পারেন করুন। কিন্তু তিনি ঠিক জানেন আমিই তাঁর জীবনকৃষ্ণ।'

২১

ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিয়ে গোঁসাই রামপুরহাটে গেল।

উৎসবের আয়োজন হয়েছে, কিন্তু গোঁসাই অসুস্থ। সবাই বলাবলি করতে লাগল, নগেন চাটুজ্জে যদি এসময় আসত। বেশ তো, তাঁকে লেখ না আসতে। তাই লেখা হল—দয়া করে যদি আসেন।

উত্তরে নগেন জানাল, সে অক্ষম, তার এখন সময় হবে না।

'ভাবছ কেন ?' বললে গোঁসাই, 'নগেন ঠিক আসবে।'

'কী করে আসবে ? চিঠিতে জানিয়েছে তার পক্ষে আসা এখন অসম্ভব।'

'না, না, আমি যে দেখলাম হাওড়া স্টেশনে এসে ও ট্রেনের টিকিট কাটল !'

সবাই হেসে উঠল। কোথায় রামপুরহাট, কোথায় হাওড়া স্টেশন !

'ও ট্রেনে উঠল। এই ট্রেন ছেড়ে দিল।' তন্দগতের মতো গোঁসাই বললে। কেউ কেউ গেল রেল-স্টেশনে, সত্যি কী ব্যাপার ! আর কী ! ঠিক এসে গিয়েছে নগেন। বাক্স-বিছানা নিয়ে নামছে প্ল্যাটফর্মে।

'বা, এই যে লিখলেন, আসতে পারবেন না, অনেক কাজ পড়ে গিয়েছে, সময় নেই এক ফোঁটা—'

নগেন হাসল। বললে, 'কাজকর্ম হঠাৎ চুকে গেল, সময় এসে গেল হাতে—বেরিয়ে পড়লাম।'

'বেশ করেছেন। আমরা জানতাম আপনি আসবেন, তাই তো স্টেশনে এসেছি আপনাকে নিয়ে যেতে।'

'তাই দেখছি।'

রামপুরহাট থেকে বিজয় গেল শান্তিপুরে। কতদিন মাকে দেখিনি। দেখিনি বিরাবাহিনী নিরাবিলা গঙ্গাকে।

দুপুরে ভাগবত পড়ছে গোঁসাই, অন্যান্য শিষ্য-ভক্তের সঙ্গে মহেন্দ্র মিত্রও শুনছে। শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে। দারুণ গ্রীষ্মে ঘামছে সর্বাঙ্গ। পাঠ বন্ধ করে গোঁসাই পাখা নিয়ে মহেন্দ্রকে হাওয়া করতে লাগল। ঘুমের পরম আরামে তলিয়ে গেল মহেন্দ্র। পাঠ বন্ধ, পাঠের চেয়েও মধুর এই ভক্তসেবা, এই শিষ্যস্নেহ।

জ্যোৎস্নারাতে ছাদে আসন করে বসেছে গোঁসাই। ধ্যান করছে। ভাইপো জগবন্ধু দেখল কোত্থেকে একটা সাপ এসে গোঁসাইয়ের মাথার উপর ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। কী সর্বনাশ। জগবন্ধু চেঁচাতে চেয়েও চেঁচাতে পারল না ! তাড়াতাড়ি চলে গেল কাকিমার কাছে। শিগগির আসুন, কাকার মাথার উপরে সাপ ফণা নাচাচ্ছে।

যোগমায়া এতটুকু বিচলিত হল না। বললে, 'ভয় নেই। কামড়াবে না, শুধু খেলা করবে।'

'খেলা করবে! বলেন কী, কত পোষা সাপ সাপুড়েকে পর্যন্ত কামড়ে দেয়।'

'ও দেবে না। ও হয়তো ওঁর গা জড়িয়ে শুয়ে থাকবে।' যোগমায়া আশ্বস্ত করল।

ক দিন পরে গোঁসাই চলে এল কলকাতা। সুকিয়া স্ট্রিটে ছোট একখানি দোতলা বাড়ি ভাড়া করে রইল। খবর পেয়ে কুলদা দেখা করতে এল।

'এখন কোত্থেকে আসছ?' জিগগেস করল গোঁসাই।

'অযোধ্যা থেকে।'

বলে দিয়েছিল গোঁসাই, কাশী বৃন্দাবন অযোধ্যাদি তীর্থে মহাপুরুষেরা ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায়। তাদের চেনা শক্ত। হয়ত বেশবাস দেখে ভাবলে মুটে মজুর, কিন্তু আসলে হয়তো সাধুসন্ত।

'কোন্ কোন্ সিদ্ধপুরুষকে দেখলে?'

কুলদা প্রথমে ল্যাংগা বাবার কথা বললে। সরযূর ধারে ফয়জাবাদ ক্যান্টনমেন্টের কাছাকাছি এক নির্জন মাঠে আসন করেছেন। শীতে-গ্রীষ্মে বসে আছেন স্থির হয়ে। সরযূ থেকে ছোট একটা খাড়ি বেরিয়ে আসনকে বেষ্টন করে আবার সরযূতে গিয়ে পড়েছে। শীর্ণ-শুষ্ক খাল, হঠাৎ একবার জলোচ্ছ্বাস দেখা দিল। জল বাড়তে বাড়তে বাবাজির আসন প্রায় ধরো-ধরো হল। মায়ি, ইধর মত আও। খালকে উদ্দেশ করে বারে বারে বলতে লাগল বাবাজি। অবাধ্য খাল নিষেধ মানলনা, এগিয়ে চলল।

বাবাজি বিরক্ত হয়ে বললে, 'ক্যা? য়্যাসা! যাও, বন্ধ হো যাও।' খালের স্রোত পলকে বন্ধ হয়ে গেল। শুকিয়ে গেল আস্তে আস্তে।

মাঠে গোলন্দাজ সৈন্যেরা গোলাবাজি করবে, বাবাজিকে নোটিশ দেওয়া হল। সরে যাও। শুধু তোমাকে নয়, আশেপাশের সমস্ত গ্রামবাসীদেরই নোটিশ দেওয়া হয়েছে, দুচার দিন ফারাক থাকো, গুলি-গোলার চাঁদমারি হবে।

গ্রামবাসীরা যাক, আমি যাচ্ছি না। আমার আসন অচঞ্চল।

এই বাবা, হঠ যাও। এইখানে গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি হবে। মাথার খুলি উড়ে যাবে তোমার!

বাবাজি কথা কানেও তুলল না।

সে কী, আমাদের গোলাবাজি বন্ধ করে দেবে নাকি?

'নেহি, বাচ্চা, তু খেলা কর। হামরা আসন সিদ্ধ হ্যায়, ছোড়নে নেহি সেকতে।' বাবাজি বললে শান্তস্বরে।

'মারা যাবে যে।'

'কুচ হোগা নেই। তু খেলা কর।'

অনেক ভয় দেখানো হল তবু বাবাজি নড়ল না। চূড়ান্ত নোটিশ পড়ল, যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাবাজি না সরে, কৃতকর্মের জন্যে সরকার দায়ী হবে না। বাবাজি যেমন স্থির, তেমনি। হিমালয় নড়ুক, আমি নই।

চালাও গুলি-গোলা। দেখি কতক্ষণ ঠিক থাকে। মাঠ ভরা আগুন, তার উত্তরে বাবাজির সাম্রাজ্য ধুনি। মাঠময় এত চাঞ্চল্য, তার উত্তরে বাবাজির স্থিরাসনের দৃঢ়তা। কর্ণেল কুলি থেকে-থেকে দূরবীন দিয়ে দেখছে সাধু কী করছে, এখনো আস্ত আছে

কিনা। না কি পালিয়েছে। দেখল, বসেই আছে। শুধু বাঁ হাতটা ঢালের মতো সামনে ধরা। যেন ঐ হাত দিয়েই সমস্ত গুলি-গোলা ঠেকাচ্ছে, কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। ক্ললি তো স্তম্ভিত। এ যে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করা কঠিন।

'বাবাজির কাছে আশীর্বাদ চাইলে ?' গোঁসাই জিগগেস করল।

'চাইলাম। তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'আরে, তোম তো ভগবানকি আশ্রয় লিয়া হ্যায়। তোমরা গুরুজি বহুৎ দয়াল, বহুৎ দয়াল। মালিক তো ওহি হ্যায়। বিশ্বাস-ভক্তি দেনেওয়ালা ওহি হ্যায়। পুরা বন যায়ে গা।'

'আর কাকে দেখলে ?'

পতিতদাস বাবাজিকে দেখলাম। কথায় কথায় কাঁদেন, চারদিকে শুধু ভগবানের কৃপা দেখেন। তান্ত্রিক সাধক, অথচ মহাপ্রেমী। জিগগেস করলাম আমার কল্যাণ কিসে হবে ? বাবাজি বললেন, 'সব তো পূরণ হো গিয়া। দুর্লভ সদগুরুকা আশ্রয় মিলা। ওহি কালাকো ধ্যান কর।'

আরো দেখলাম গোপালদাস বাবা, প্রায় দেড়শো বছর বয়েস, একটা অন্ধকার গোফার মধ্যে পড়ে আছে, কতকাল আছে কেউ বলতে পারে না। নমস্কার করে আশীর্বাদ চাইতেই করজোড়ে বললে, রামজি বড় দয়াল, উনহিকা নাম লেকে উনহিকা স্থানমে পড়া রহা হ্যায়। অব যো করে রামজি। বাচ্চা বহুৎ ভাগমে রামজিকা আশ্রয় পায়া। অব আনন্দ করো।

আর নামজপে নিমজ্জিত তুলসীদাসকে দেখলাম। হাতে মালা, কিন্তু মন যেন অন্য কোথাও নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে। কত লোক ভিড় করে বসেছে কিন্তু বাবাজির সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা দেখতে এসেছে বাবাজিকে, নিস্তল নীরবতাকে। বাবাজি মাঝে মাঝে চমকে উঠছে আর স্নেহনেত্র নিক্ষেপ করছে। যেন সবাইকে বলছে, নামকে দেখ, নামের নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্রকে দেখ।

শেষ সাধু যাকে দেখলাম সে অন্ধ। অগাধ পণ্ডিত, বহুশাস্ত্র কণ্ঠস্থ। কিন্তু শাস্ত্র নয়, শ্রুতে নয়, মেধায় নয়, শুধু কঠোর সাধন আর তীব্র বৈরাগ্যেই খুলে যাবে অন্তশ্চক্ষু, সমস্ত কিছুরেই আবির্ভূত দেখতে পাবে—ইহকাল পরকাল, সর্বভুবন সর্বজ্যোতির্মণ্ডল।

কীর্তনীয়া রেবতীমোহন এসেছে। আর কথা নেই। গান ধরো।

রেবতী গান ধরল :

> 'তব শুভ সম্মিলনে প্রাণ জুড়াব, হৃদয়স্বামী,
> কবে বসিব একান্তে প্রাণকান্ত তোমারে নিয়ে আমি।
> মধুর বৃন্দাবনে গোপীজনগণসনে
> তোমার নিত্যপদ সেবি কৃতার্থ হইব আমি।
> হৃদয়ে ধরি শ্রীপদ বিপদ ঘুচাব হে
> আমার পাপ-পরিতাপ যাবে, জুড়াব তাপিত প্রাণী।।
> অখিল লীলারসে ডুবাব মানস হে,
> আমি সকলি ভুলিব, কেবল হৃদয়ে জাগিবে তুমি।
> (আমার আঁধার ঘরের মাণিক হয়ে)
> পিরীতির সেজ হৃদয়ে বিছাব হে
> রসে মিশামিশি হয়ে, হব আমি-তুমি, তুমি-আমি।।'

গোঁসাই চোখ বুজে শুনছিল তন্ময় হয়ে, হঠাৎ তার সর্বশরীরে পুলকের তরঙ্গ উঠল। উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ গৌর হয়ে গেল, মুখ অরুণাভ। উঠে দাঁড়াল, নাচতে লাগল ব্রজাঙ্গনার ভঙ্গিতে। গোঁসাইয়ের ভাবে সবাই মোহিত হয়ে গেল, কাঁদতে লাগল কেউ-কেউ।

দেখ দেখ প্রভুর দীর্ঘাকৃতি স্থূলতনু কেমন খর্ব ও লঘু হয়ে গিয়েছে, তিনি সুন্দরী গোপনারী হয়ে গিয়েছেন। শ্রীঅঙ্গের স্ত্রী-ভঙ্গিটি দেখ। কখনো ডান হাত কপালে রেখে লজ্জার চোখ ঢাকছেন, কখনো বাঁ হাত কটিতে রেখে হেলছেন দুলছেন, কখনো কোঁচার খুঁটটি মাথায় তুলে দিয়ে ঘোমটা টানছেন। কখনো বা আঁচল থেকে তুলে-তুলে ধনরত্ন বিলিয়ে দিচ্ছেন এমন অভিনয় করছেন। স্পর্শমণির ছোঁয়া লেগে সবাই যেন সোনা হয়ে যাচ্ছে, আর এ যেন কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়ি নয়, এ যেন বৃন্দাবন-বিলাসে।

গিরিশ ঘোষ 'চৈতন্যলীলা' দেখতে নিমন্ত্রণ করে পাঠাল। সশিষ্য গোঁসাই তাই একদিন গেল স্টার-থিয়েটারে। প্রেক্ষাগৃহের প্রথম সারিতে বসল সকলে। গান সুরু হল:

'কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জ কাননচারী
মাধব মনমোহন, মোহনমুরলীধারী।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার।
ব্রজকিশোর কালিয়হর কাতরভয়ভঞ্জন
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকা-হৃদি-রঞ্জন।
গোবর্ধন ধারণ, বনকুসুমভূষণ
দামোদর কংসদর্পহারী
শ্যামরাসরসবিহারী॥
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার॥'

গোঁসাই আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। 'জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন' বলে উদ্দণ্ড নৃত্য সুরু করে দিল। শিষ্যরাও হরিধ্বনি করতে লাগল। দর্শকদেরও কেউ কেউ যোগ দিল কীর্তনে।

'থেমে যাও, থেমে যাও, বসে পড়ো—' পিছনের দর্শকেরা কোলাহল করে উঠল। কে কার কথা শোনো। রঙ্গমঞ্চ থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও প্রতিধ্বনিত হল: হরিবোল, হরিবোল। সমস্ত নাট্যালয় দেবমন্দির হয়ে উঠল। এ যেন আরেক চৈতন্যলীলা। অভিনয় নয়, বাস্তব রূপায়ন।

অমৃত বোস বললে, 'বইয়েই পড়েছিলাম চারশো বছর আগে মহাপ্রভুর কীর্তন-তরঙ্গে ভারতবর্ষ প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। সেই তরঙ্গ কী, আজ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম। আমাদের রঙ্গভূমি দেবভূমিতে পরিণত হল।'

কিন্তু সংসারভূমি বড় কঠিন। চার মাসের জন্যে বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল, ফুরিয়ে গেল চার মাস। সস্তায় চলনসই একটা বাসা নাও। কোথায় বাসা? একটা খোলার ঘর পেলেও হয়। তাই দেখ না। শুধু একটু মাথা রাখবার মতো জায়গা। দারুণ অনটনে দিন যাচ্ছে। যোগমায়া শুচ্ছে ছেঁড়া মাদুরে, বাহুই তার উপাধান। আর গোঁসাইয়ের সম্বল একখানা মাত্র দিশি কম্বল। আর উপাধান বলতে চাদরে-মোড়া একটা শাস্ত্রগ্রন্থ। ভক্ত-শিষ্য কুঞ্জ গুহ একটা বালিশ এনে দিল।

আরেক ভক্ত বৃন্দাবন বিদ্রূপ করে উঠল : 'উনি সন্ন্যাস নিয়েছেন আর তুমি ওঁকে ঘুমের আরামের জন্যে বালিশ দিচ্ছ। বেশ, তা হলে একখানা তোষকও এনে দাও— আর, আর একটা ছাতা—'

লজ্জায় মরে গেল কুঞ্জ। ভাবল গোঁসাই বুঝি ফেলে দেবে বালিশ। ভক্তের আকূতি উপেক্ষা করবে। কিন্তু না, বৃন্দাবন যাই বলুক, শোবার সময় সেই বালিশ নিজের বালিশের নিচে টেনে নিল গোঁসাই। নিজের আরামের জন্যে নয়, ভক্তের আরামের জন্যে।

হঠাৎ একদিন সকালবেলা শ্রীধরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল গোঁসাই। বললে, 'মায়ের অসুখ খুব বেড়েছে, আমি শান্তিপুর চললাম। তুমি বাড়িতে গিয়ে খবর দাও।'

শ্রীধর গিয়ে খবর দিতেই সকলেই অবাক হয়ে গেল। তবে মায়ের যখন অসুখ তখন আমরাই বা এখানে থাকি কেন? যোগজীবনের সঙ্গে যোগমায়াও শান্তিপুর রওনা হল। সঙ্গে নিজের মা মুক্তকেশী চলল।

স্বর্ণময়ী তখন ভয়ংকর উন্মাদ। মাঝে মাঝে শান্ত হন যখন বিজয়কে দেখেন। কিন্তু পাগলকে নিয়ে সংসারে অশান্তি দেখা দিল। ঘর-দোর নোংরা করে রাখে, কে তাড়াতাড়ি অত পরিষ্কার করে! গোঁসাই বললে, আমি সব পরিষ্কার করব। এই নিয়ে আবার গোলমাল।

হঠাৎ আসন ছেড়ে উঠে পড়ল গোঁসাই। স্ত্রীকে বললে, 'আমাকে আটটা টাকা দাও, আমি এখনি কাশী চললাম।'

থ হয়ে গেল যোগমায়া। বললে, 'আমাকেও তা হলে সঙ্গে নাও।'

'টাকা দাও শিগগির, নইলে এই লোহার ডাণ্ডা দিয়ে ট্রাংক ভেঙে ফেলব।' গোঁসাই উগ্রমূর্তি ধরল।

'খুলে নাও টাকা।' চাবি ফেলে দিল যোগমায়া : 'বেচারা ট্রাংটাকে ভেঙো না।'

টাকা নিয়ে একলা রানাঘাটের দিকে যাত্রা করল গোঁসাই। নদী পার হবার সময় পাটনির হাতে একটি টাকা দিয়ে বললে, 'একটু পরেই একটি বাবাজি আমার খোঁজ করতে এখানে আসবে। তাকে টাকাটি দিয়ে বোলো যেন সে কাশী যাবার বন্দোবস্ত করে। সেখানে গেলেই আমার সঙ্গে তার দেখা হবে।'

বাড়ি এসেই শ্রীধর শুনল কাশী যাবার নাম করে গোঁসাই বেরিয়ে পড়েছে। তখুনি খেয়াঘাটের দিকে ছুটল সে প্রাণপণে।

'আপনিই কি সেই বাবাজি?' পাটনি বললে তখন গোঁসাইয়ের কথা।

'হ্যাঁ, আমিই তার খোঁজ করছি—'

'তবে এই টাকাটি নিন, রানাঘাটে চলে যান।'

তা তো যাব কিন্তু এক টাকায় তো কাশী হবে না। আর কাশী না গিয়ে প্রভুছাড়া হয়ে থাকব কী করে? রানাঘাট স্টেশনে যাত্রী-বোঝাই ট্রেন দাঁড়িয়ে। ছাড়ো-ছাড়ো অবস্থা! কিন্তু কোথায় গোঁসাই?

'এই যে, আমি কাশী যাচ্ছি।' ট্রেনের কামরার ভিতর থেকে গোঁসাই চেঁচিয়ে উঠেছে : 'তুমি কলকাতা চলে যাও। সেখান থেকে টাকা জোগাড় করে একেবারে কাশী। গেলেই আমার সঙ্গে সেখানে দেখা হবে।'

কাশীতে অগস্ত্য কুণ্ডের কাছে মানিকতলার মাতাজির ভাড়াটে বাড়িতে আস্তানা নিল গোঁসাই। আশে-পাশের বাঙালিবাবুরা, উকিল আর অধ্যাপক, তাকে নিয়ে উপহাস

করতে লাগল। হিন্দু ছিল ব্রাহ্ম হল, পরে সন্ন্যাসী, এখন পরম বৈষ্ণব। সর্ব বাণিজ্যের ব্যাপারী এ আবার কেমনতরো সাধু ?

কৃষ্ণানন্দ স্বামীর কাশীতে তখন খুব নামডাক। সবাই তাকে ধরল ধর্মসভা করে নতুন সন্ন্যাসীকে ডেকে আনা হোক। দেখি তত্ত্বকথা কী বলে। শরীর অসুস্থ, তবুও সভায় গেল গোঁসাই। তত্ত্বকথা পরে হবে, আগে কীর্তন হোক। কীর্তন আরম্ভ হতেই গোঁসাই হরিনামের সিংহনাদ করে উঠল। সুরু করল উদ্দণ্ড নৃত্য। কিসের তত্ত্বকথা ! মহাভাবের বন্যায় সমস্ত বাক্য-কাব্য ভেসে গেল। কিসের অস্বাস্থ্য। নামরসায়নে সর্ব ক্লেশকষ্টের আরোগ্য হয়ে গেল। ভাবাবেশে মাটিতে আছড়ে পড়ল গোঁসাই। সমাধিতে ডুবে গেল। স্বয়ং কৃষ্ণানন্দ এসে গোঁসাইয়ের পায়ের ধুলো নিল। দেখাদেখি বাঙালিবাবুরাও —উকিল আর অধ্যাপক।

বিশ্বনাথের আরতি দেখতে গিয়েছে গোঁসাই। কত সন্ন্যাসীই তো আসে, কেউ বিশেষ লক্ষ্য করেনি। কিন্তু হঠাৎ বোম-ভোলা বলে কে হুংকার করে উঠল। সবাই তাকিয়ে দেখল সেই নিরীহ সাধুটি আরতির তালে-তালে নাচতে আরম্ভ করেছে। এমন নাচ কেউ কোনোদিন দেখেনি। নাচতে দাও, জায়গা দাও নাচতে। পাণ্ডারা নাচের অবাধ সুবিধে করে দিল, হটিয়ে দিল জনতা। আরো জোরে, আরো বেশি ভাব দিয়ে স্তব পড়ো, যত বেশি স্তবের আবেগ তত বেশি নাচের গৌরব। ভাবাবেশে মূর্ছা হল গোঁসাইয়ের। তখন তাকে ছোঁবার জন্যে হুলস্থুল।

আরেকদিন আরতি দেখতে-দেখতে গোঁসাই বালকের মতো কাঁদতে লাগল। প্রথমে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে, শেষে একেবারে তারস্বরে। চোখ হতে জল পিচকিরির ধারার মতো দীর্ঘ বেগে ছিটকে বিশ্বনাথের সামনে গিয়ে পড়ছে। এমন অদ্ভুত কান্না কেউ কোনো-দিন দেখেনি। বৈষ্ণবগ্রন্থে পড়া গেছে এমন কাঁদতে জানত শুধু মহাপ্রভু। তবে এ কে নবীন সন্ন্যাসী ? ছদ্মবেশে কে তবে এই মহাজন ? সমস্ত কাশী মেতে উঠল। বাঙালি-টোলার বাবুরাও মারতে লাগল উঁকিঝুঁকি।

দুর্গাবাড়িতে ভাস্করানন্দ স্বামী আছে, গোঁসাই দেখা করতে গেল।

'ও দিকে যাবেন না।' চেলাচামুণ্ডাদের একজন বাধা দিল গোঁসাইকে : 'স্বামীজি এখন ধ্যানে আছেন।'

বেশ, যাব না অদূরে একটা গাছের নিচে বসে পড়ল গোঁসাই। চোখ বুজল। ওরে, এও দেখি ধ্যান করে। কতক্ষণ পরে ধ্যান ছেড়ে এগিয়ে এল ভাস্করানন্দ। আনন্দ হ্যায়, আনন্দ হ্যায়, বলতে বলতে গোঁসাইয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। যেই গোঁসাই প্রণাম করতে যাবে অমনি ভাস্করানন্দ তাকে বুকে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করে ধরল, দু-জনেই ডুবে গেল ভাবসমাধিতে।

তারপর চলো সাধু দ্বারকাপালের সঙ্গে গিয়ে দেখা করি।

নির্জন বাগানে ছোট একটি কুটিরে বসে অহোরাত্র ভজন করে সাধু। কুটিরের দরজা বাইরে থেকে তালা-বন্ধ, লোকে যাতে বোঝে ঘরে কেউ নেই, থাকলেও এখন অনুপস্থিত। ছোট একটি জানলা আছে, সেটিই আগম-নির্গমের রাস্তা। সেটি বন্ধ থাকলেই একেবারে নিশ্ছিদ্র অব্যাহতি।

গোঁসাই কাউকে না পেয়ে দেয়ালে নিজের নাম-ঠিকানা লিখে রেখে এল। পরদিন দ্বারকা নিজে এল গোঁসাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। এত বড় একটা পণ্ডিত সাধু,

থুত্থুড়ো বুড়ো, সে এই সন্ন্যাসীর টানে তার অসংগের গর্ত ছেড়ে এত দূরে চলে এসেছে। উকিল-মাস্টারদের মাথা ঘুরে গেল। তা হলে এ গোঁসাই সামান্য নয়।

কাশী ছেড়ে এবার তবে অযোধ্যা।

'আচ্ছা, মাঠাকরুনের সংগে ঝগড়া করেই কি আপনি শান্তিপুর ছাড়লেন?' কুলদানন্দ জিগগেস করলে।

'না, আমি নিজের ইচ্ছায় কিছু করিনি।' বললে গোঁসাই, 'আমাকে পরমহংসজি ডাক দিলেন। ঝগড়ার সময় বললেন, কাশী চলে যাও। কাশীতে যদি আমার দেখা না পাও তা হলে অযোধ্যায়। অযোধ্যায় দেখা না পেলে বৃন্দাবনে। সমস্ত আমার গুরুর ইঙ্গিতে।'

কার সংগে ঝগড়া? যোগমায়া ছেলেকে নিয়ে চলে এসেছে কাশী। আর তুমি যদি অযোধ্যা যাও আমিও তোমার সংগী হব।

ফয়জাবাদে এসেই ল্যাংগা বাবার সংগে দেখা করতে গেল গোঁসাই।

আনন্দে বিহ্বল হয়ে বাবা বললেন, 'এখানে একরাত্রি থাকো।'

'কোথায় থাকব?'

'কেন, ছাপরের মধ্যে।'

সরযূর অনাবৃত চড়াতে কতগুলি ভাঙা ছাপর, দুদিকে দুটিমাত্র বেড়া, সামনে-পিছনে খোলা—চমৎকার ব্যবস্থা বটে। নিদারুণ শীত, সম্বল একখানি করে কম্বল। গোঁসাইয়ের সংগী-সাথিরা পরস্পরের দিকে বিমর্ষ চোখে তাকিয়ে রইল।

'মোটা চালের ভাত আর রসুন দেওয়া জল খেতে দেব', ল্যাংগা বাবা হাসল 'কোনো কষ্ট হবে না।'

আশ্চর্য, কারু এতটুকু কষ্ট হল না। শীত কী বস্তু, তাই কেউ অনুভব করতে পেল না। ল্যাংগা বাবা নিজের সাধনশক্তিতে সমস্ত উত্তপ্ত করে রেখেছেন।

'তাঁর কী সাধন?' কে একজন জিগগেস করল।

'শবসাধন।' বললে গোঁসাই, 'এসব সাধনপন্থীরা সাধারণত খুব উগ্র হয়, কিন্তু ল্যাংগা বাবা খুব শান্ত।'

তারপর অযোধ্যায় এসে পৌঁছুতেই গোঁসাইয়ের উপর পরমহংসের আদেশ হল বৃন্দাবনে গিয়ে নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মতো এক বৎসর বাস করো। লীলাতত্ত্ব না দেখে কখনো কোনোদিন আসন ছাড়বে না।

যোগমায়াকে বললে, যোগজীবনকে নিয়ে ঢাকায় ফিরে যাও।

পতিসেবা ছেড়ে দূরে সরে যেতে যোগমায়ার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কে জানে কে আদেশ হয়েছে, ফিরে গেল ঢাকায়। কিন্তু কত দিন থাকবে একাকিনী?

২২

বৃন্দাবনে গোপীনাথবাগে দাউজির মন্দিরে এসে উঠল গোঁসাই। সেখানে মিলল গৌরদাসের সংগে। কাটোয়ায় বাড়ি, পূর্বনাম গৌর শিরোমণি। স্মৃতি পুরাণ ষড়দর্শন নানা শাস্ত্রে কৃতবিদ্য। হঠাৎ কী হল, ভক্তির পথ ধরে চলে এল বৃন্দাবন।

কী হল ? কাটোয়ায় এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে ভাগবত পাঠ হচ্ছে। অনেক গণ্যমান্য পণ্ডিত শ্রোতাদের মধ্যে শিরোমণি বসে। ভক্ত পাঠক পাঠের আগে গৌরবন্দনা পড়তে লাগল।

সর্বত্রই এই প্রথা, কিন্তু শিরোমণি চটে উঠল। প্রশ্ন করল : 'আপনার ভাগবতে এইসব লেখা আছে ?'

'তার মানে ?'

'তার মানে আপনার সামনে ভাগবত খোলা আপনি তার দিকে চোখ রেখে পড়ছেন, মুখস্ত বলছেন না। তার মানে, ওসব আছে ভাগবতে ?'

'আছে বৈকি।' বুকভরা সাহস নিয়ে বললে পাঠক।

'আছে ? অনর্পিতচরীং আছে ?' শিরোমণি আগুন হয়ে উঠল : 'মিথ্যে কথা বলার আর জায়গা পাননি ?'

'বা, মিথ্যে বলতে যাব কেন ?' ভক্ত পাঠক জোর দিয়ে বললে, 'আছে ভাগবতে।'

'কোন জায়গাটায় আছে একবার দেখান দেখি।' অনেককে নিয়ে শিরোমণি ঝুঁকে পড়ল ভাগবতের উপর।

গ্রন্থের প্রতি দু লাইনের মধ্যেকার ফাঁক দেখিয়ে পাঠক বললে, 'এই শাদা জায়গাটা দেখুন। এইখানেই তো—দেখছেন ?'

'দেখছি।' শিরোমণি হেসে উঠল : 'এ তো শাদা জায়গা। এখানে গৌরবন্দনা কোথায় ?'

'এই যে এখানে।' আবার শ্লোকের দু ছত্রের মাঝেকার শূন্য জায়গা নির্দেশ করল পাঠক : 'এই যে।'

'এখানেও শাদা।'

'আপনার দৃষ্টিশক্তি নেই, কী করে দেখবেন ?' পাঠক হতাশ মুখে বললে, 'দৃষ্টি পরিষ্কার করে আসুন। পরে দেখবেন।'

'শালগ্রাম সামনে রেখে ভাগবত স্পর্শ করে মিথ্যে কথা বলতে আপনার এতটুকু বাধল না ? আপনি ব্রাহ্মণ ?' শিরোমণি বিষিয়ে উঠল।

'আমি ব্রাহ্মণ তো বটেই, আর সত্যবাদী ব্রাহ্মণ।' পাঠকও সতেজে বললে, 'আপনি কোনো সিদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মার কাছ থেকে দীক্ষা নিন, পরে আমি যে নিয়ম বলে দেব সেই নিয়মে এক সপ্তাহ চলুন। তারপর অষ্টম দিনে এখানে আসুন, তখন আপনাকে ঠিক দেখিয়ে দেব ভাগবতের প্রতি দু ছত্রের ফাঁকে স্পষ্ট গৌরবন্দনা।'

'তখনো যদি দেখাতে না পারেন ?'

'তখনো যদি দেখাতে না পারি তবে সকলের সামনে শপথ করছি, আমার জিভ কেটে ফেলব।'

'ঠিক মনে থাকে যেন।'

শিরোমণি মহা তেজস্বী লোক, তখুনি সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজির কাছে গিয়ে দীক্ষা নিল। দীক্ষা নিয়ে এসে পাঠকঠাকুরের কাছ থেকে জেনে নিল নিয়মাবলী। নিয়মমাফিক চলল এক সপ্তাহ। পরে উপনীত হল যোদ্ধৃভঙ্গিতে।

'কী, এবার ভাগবতে গৌরবন্দনা দেখাতে পারবেন তো ?'

'নিশ্চয়ই পারব।' পাঠকঠাকুর ভাগবত মেলে ধরলেন : 'এবার দৃষ্টি করুন।'

এ কী, মুগ্ধ বিস্ময়ে নিষ্পলক চোখে শিরোমণি দেখল ভাগবতের শ্লোকের প্রতি দু ছত্রের মধ্যে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে গৌরবন্দনা লেখা রয়েছে। মাটিতে আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল শিরোমণি। সর্বস্ব ছেড়ে পদব্রজে চলল বৃন্দাবনে। সেই থেকেই ব্রজবাসী। নাম নিয়েছে গৌরদাস। গৌরে-গোঁসাইয়ে ভীষণ ভাব। দুজনেই মহাপ্রেমিক। মহাবৈষ্ণব।

বৈষ্ণব তো, গোঁসাই ভেক ধরেনি কেন? আগে ব্রাহ্মসমাজে ছিল, এখন গৈরিক ধরেছে, দণ্ডকমণ্ডলু ধরেছে, জটা রেখেছে—এ কী অভিনয়! তার উপর গলায় তুলসী আর রুদ্রাক্ষ দু' রকমেরই মালা। আর কপালে ও কোন দেশী তিলক! গোঁড়া বৈষ্ণবসমাজ গোঁসাইয়ের উপর খেপে গেল। গোঁসাই তাদের চাইল বোঝাতে। কিন্তু তারা বুঝতে রাজী নয়।

ভেক ধরতে হবে এমন কথা কোন শাস্ত্রে লিখেছে? আর গৈরিক বসন আর দণ্ড-কমণ্ডলু তো স্বয়ং মহাপ্রভুই ধরেছেন। তাঁর দ্বারা কি কোনো অশাস্ত্রীয় কাজ সম্ভব? হরিভক্তিবিলাসেই তো আছে তুলসী আর রুদ্রাক্ষ একত্র ধারণ করা চলে। প্রভু নিত্যানন্দের গলায় তো ছিল রুদ্রাক্ষ। আর এ তিলক আমার সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রতীক। এতে বিষ্ণুচক্র আছে, শিবশূল আছে, আছে খৃস্টক্রুশ আর মহম্মদ অর্ধচন্দ্র। আমি বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের নই, আমি সকলের।

বন্ধু গৌরদাসের আপত্তি তিলক সম্পর্কে। আর কোনো কারণে নয়, নিছক নতুনত্বের কারণে। বললে, 'আপনি যা বলবেন বা করবেন তাই লোকে শাস্ত্রসদাচার বলে মানবে, নির্বিচারে অনুসরণ করবে। তার ফলে আরেকটা সম্প্রদায় সৃষ্টি হবে। আপনি দল-সৃষ্টির বিরুদ্ধে, এই তিলকে আপনিই দলসৃষ্টি করে বসবেন। সুতরাং প্রার্থনা করি শাস্ত্রবিধিমতই তিলক ধারণ করুন।'

কথাটার মধ্যে যুক্তি আছে। তাই গোঁসাই বললে, 'ভেবে দেখি।'

দামোদর পূজারির কুঞ্জে আছে গোঁসাই, নিঃসঙ্গ নির্জন স্তব্ধ রাত্রি, অদ্বৈত আচার্য কজন সঙ্গী নিয়ে গোঁসাইয়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তোমার তিলকধারণের কোনো দরকার নেই। তবে যদি একান্তই ইচ্ছে হয়, আমি যেমন তিলক করেছি, চেয়ে দেখ আমার দিকে, তেমনি করে পরো।'

'দাঁড়ান, আপনার মতোই তিলক করছি।'

ধুনির ভস্ম আর কমণ্ডলুর জল নিয়ে কপালে তিলক কাটল গোঁসাই। দেখুন ঠিক হয়েছে?

'ঠিক হয়েছে।' বলে অদ্বৈত সদলে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

সেই তিলক নিয়ে গৌরদাসের কাছে এসে হাজির হল গোঁসাই। গৌরদাস তো অবাক। এ তিলক আপনি কোথায় পেলেন? গোঁসাই বললে কী হয়েছিল। গৌরদাস ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। তবে আর কী! এই যথার্থ হয়েছে।

তবু গোঁড়া বৈষ্ণবের দল মানতে চায় না। গেরুয়া কেন, রুদ্রাক্ষ কেন, কেন দণ্ড-কমণ্ডলু। নিমাই-নিতাইয়ের ছিল বলে ওঁরও থাকবে—উনি কে? ঠিক হল গোঁসাইকে অপমান করা হবে। গোবরগোলা জল তার মাথায় ঢালবে।

ষড়যন্ত্রের নেতা গোবিন্দজিউর সেবায়েত। সে রাত্রে স্বপ্ন দেখল। দেখল এক প্রচণ্ড বরাহ তার বুকের উপর চড়ে বসেছে। গর্জন করে বলছে, 'তোদের এত বড় স্পর্ধা, তোরা গোঁসাইকে অপমান করবি? জানিস ও কে?'

'কে ?'

'তোরা যে গোবিন্দজিকে পুজো করিস ও সেই গোবিন্দ।' বললে বরাহ, 'শিগগির যা, তার পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে নে, নইলে তোদের দুর্দশার অন্ত থাকবে না।'

বুকে দন্তচিহ্ন রেখে বরাহমূর্তি অদৃশ্য হল। ভয়ে কাঁপতে লাগল সেবায়েত। ষড়-যন্ত্রীরাও ম্লান হয়ে গেল। এখন উপায় ? পায়ে পড়ে মুখে ক্ষমা চাইতে না পারো, গোঁসাইয়ের গলায় গোবিন্দের প্রসাদী মালা অর্পণ করো। আর বোঝো এই ক্ষমাবতার কে ! কে এই দয়ানিধি !

পরদিন গোবিন্দমন্দিরে যাচ্ছে, গোঁসাইকে গোবিন্দের মালায় ভূষিত করল সেবায়েত।

মধুর মুখে হাসল গোঁসাই। কেন এ দৃশ্যান্তর কে বলবে।

গৌরদাস এসে বসল গোঁসাইয়ের কাছে। বললে, 'আজ দয়া করে ক-জন বৈষ্ণব আমার কাছে এসেছিলেন—'

গৌরের মুখের দিকে উৎসুক চোখে তাকাল গোঁসাই।

'কোথায় শ্যামা পুজো হবে, জিগগেস করতে এসেছিলেন, সেখানে তাঁদের যোগদান করা সংগত হবে কিনা।'

'আপনি কী বললেন ?' গোঁসাই কৌতূহলী হল।

'বললাম হবে।'

'মানলেন তাঁরা ?'

'বুঝিয়ে দিলাম। প্রশ্ন করলাম, আপনারা কার ভজনা করেন ? কৃষ্ণচন্দ্রের। এই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় কী ? গোপীর অনুগত হয়ে ভজনা। গোপীর অনুগতি ! বেশ, ভালো কথা। গোপীরা কী করে কৃষ্ণকে পেয়েছিল ? বনে গিয়ে কাত্যায়নীর পুজো করে। কী, তাই নয় ? তাই যদি হয় তবে কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্যে বৈষ্ণবের শ্যামাপুজোয় বাধা নেই। বরং শ্যামাপুজো বৈষ্ণবের বিহিত পুজো।'

'ঠিক বলেছেন।' আশ্বস্ত হল গোঁসাই।

চলো এবার তবে কৃষ্ণকীর্তন নিয়ে নগরপরিভ্রমণে বেরোই। প্রেমাবেশে গগন-ভুবন প্লাবিত করি।

'হাড়াবাড়ি'র দিকে কীর্তন যাচ্ছে, গোঁসাই বিভোর হয়ে নাচছে। এ কী, সংগে-সংগে ঐ গাছটাও নাচছে ! নাচছে মানে গোঁসাইয়ের তালের সংগে তাল রেখে দোলাচ্ছে ডালপালাগুলো। ভালো করে তাকিয়ে দেখ, হয়তো কোনো বানরের কাণ্ড। না, না, বানর কী, কোথাও একটা পাখি পর্যন্ত নেই। গাছই নাচছে। শাখাগুলি একবার উঁচুতে তুলছে আবার নামাচ্ছে নিচুতে। একেবারে নিখুঁত ছন্দ, নিখুঁত ভঙ্গি। যেমনটি নেচেছিল ঝাড়িখণ্ডে, মহাপ্রভুর বৃন্দাবনযাত্রায়। ভাগবত বৃক্ষ বুঝি চিনতে পেরেছে গোঁসাইকে।

বৃন্দাবনে কুলদানন্দ এসেছে। তাকে নিয়ে গোঁসাই একদিন চলল কালীদহের দিকে। একটি প্রাচীন গাছের নিচে এসে বললে, 'এটি সেই কেলিকদম্বের গাছ। কালীয়দমনের সময় এই গাছের থেকেই কৃষ্ণ যমুনায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন। ভালো করে চেয়ে দেখ এই গাছে আপনা-আপনিই রাধাকৃষ্ণ নাম লেখা হয়ে রয়েছে।'

সকলেই দেখল গাছের গুঁড়িতে ও শাখা-প্রশাখায় শত-শত নাম লেখা—বাংলায় আর সংস্কৃতে।

'ছুরি দিয়ে কেটে কেটে পাণ্ডারা লেখে নি তো ?' সন্দেহের সুরে জিগগেস করল কুলদা।

'কিছু কিছু তারাও কোন্ না করেছে! সে তো দেখামাত্রই বোঝা যায়।' বললে গোঁসাই। 'কিন্তু স্বাভাবিক নাম ছিল বলেই তো তাদের করা। আর নকল করতে গিয়েই তারা মূল বস্তুতে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। পয়সা রোজগারের ফিকিরে এই অপচেষ্টা ঘোরতর অপরাধ।

'কোন লেখাটাকে আপনি স্বাভাবিক বলবেন ?' কুলদা বললে, 'ছুরিতে কাটা অক্ষরও তো বেশিদিন জীবন্ত গাছে থাকলে স্বাভাবিকের মতোই দেখাবে।'

'তা ঠিক। আচ্ছা এক কাজ করো।' গাছের আরো কাছাকাছি হল গোঁসাই। বললে, 'গাছের কতগুলো ছাল শুকিয়ে আলগা হয়ে ফুলে রয়েছে, তার মধ্যে লক্ষ্য করো। ওখানে তো আর ছুরি দিয়ে লেখা চলবে না।'

একটা আলগা ডাল টেনে ছিঁড়ে ফেলল কুলদা।

গোঁসাই যন্ত্রণায় শিউরে উঠল : 'উঃ, এ কী করলে।'

কী করল কে জানে, কুলদা ছালের ভিতরের দিকটা দেখল মনোযোগ করে। সন্দেহ কী, সেখানেও রাধাকৃষ্ণ লেখা। শুধু সেখানে কী, মগডালে যেখানে কেউ ছুরি চালাতে পারবে না, সেখানেও।

'কত দেবদেবী ঋষি মুনি বৈষ্ণব মহাপুরুষ বৃন্দাবনের ধুলো পাবার আশায় বৃক্ষলতা হয়ে আছেন। কিংবা আছেন বৃক্ষ আশ্রয় করে।'

এতদূর বিশ্বাস করবার অধিকার থাক বা নাই থাক, সকলের সঙ্গে ঠাকুরের সঙ্গে, কুলদা বৃক্ষকে প্রণাম করল।

'একদিন বেড়াতে-বেড়াতে যমুনাতীরে নির্জনে একটি বৃক্ষের নিচে গিয়ে বসেছি,' বললে গোঁসাই, 'সর-সর করে একটা শব্দ আমার কানে আসতে লাগল। চেয়ে দেখি আমার সামনে একটা গাছ কাঁপছে। গাছের দিকে চেয়ে রইলাম একদৃষ্টে। এ কি, গাছ কোথায় ? গাছ নেই, একটি পরম সুন্দর বৈষ্ণব মহাত্মা সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দ্বাদশাঙ্গে তিলক, গলায় কণ্ঠি তুলসীর মালা, হাতেও জপমালা। তিনি আমাকে তাঁর পরিচয় দিলেন, বললেন, এখানে বৃক্ষরূপে আছি। বলে অন্তর্হিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে বৃক্ষ আবার প্রকাশিত হল। কজন বৈষ্ণবকে বলতে গেলাম এ কথা, তারা বিশ্বাস তো করলই না বরং উপহাস করতে লাগল।'

'আর আপনার গৌরদাস ?'

'তাঁকে গিয়ে বলতে তিনি বিশ্বাস তো করলেনই, রজে পড়ে গড়াগড়ি করে কাঁদতে লাগলেন। বললেন, এসব কথা যাকে-তাকে বলবেন না, উপহাস করবে।'

'কিন্তু কেন, মহাত্মারা এখানে বৃক্ষরূপে থাকেন কেন ?' বাঁকা করে জিগগেস করল কুলদা।

বৃন্দাবন অপ্রাকৃত ধাম। এখানে নিত্য লীলা হচ্ছে। সেই লীলা নিরুদ্বেগে দর্শন করবার জন্যে মহাপুরুষেরা বৃক্ষরূপ ধরে আছেন। বৃক্ষরূপেই ভজন করছেন আনন্দে।'

'সাধারণ লোকে তো তা জানেনা। তারা যদি বৃক্ষের উপর কোনো অত্যাচার করে বসে ?'

'এই জন্যে তো ব্রজে বৃক্ষলতার উপরেও হিংসা নেই।'

'কিন্তু কেউ যদি অত্যাচার করে ?'

'বৃক্ষের অনিষ্ট হয়। এমনকি বৃক্ষ মরে যায়।'

কাছেই একটি কুঞ্জে অনেকদিনের একটি সুন্দর নিম গাছ ছিল, কুঞ্জের বৈষ্ণব বাবাজি অগাধ যত্নে তার সেবা করতেন। ঘন পত্রপুঞ্জে কী শীতল স্নেহছায়া। হলে কী হবে, একদিন একটি যুবতী রজঃস্বলা অবস্থায় বৃক্ষটিকে আলিঙ্গন করে ধরল। রাত্রে বাবাজি স্বপ্ন দেখলেন, এক বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী তাকে বলছে, তোমার কুঞ্জে বৃক্ষ আশ্রয় করে এত কাল বেশ আরামে ছিলাম, কাল তোমাদের বৈষ্ণবী অশুচি কাম-কলঙ্কিত অবস্থায় বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরেছে, তাই আমার আর এখানে থাকা চলল না। আমি চললাম।

পরদিন সকালে উঠে বাবাজি দেখলেন—নিমগাছটি শুকিয়ে গিয়েছে। এতবড় সতেজ-সমৃদ্ধ গাছ ক্ষণকালের কামস্পর্শেই মারা গেল।

বৃন্দাবনেই মহাপ্রভুর সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ হল গোঁসাইয়ের। যমুনাতীরে একাকী বেড়াচ্ছে, গোঁসাই দেখল একজন উজ্জ্বলগৌর দীর্ঘকায় মহাপুরুষ মাটি থেকে আধ হাত উঁচু শূন্যের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন। গোঁসাই তার পরিচয় জানতে চাইল। মহাপুরুষ বললেন, 'আমি নিমাই পণ্ডিত।'

গোঁসাইয়ের মুখে কথা নেই, দুচোখে শুধু আকুল অশ্রুবর্ষণ।

সেই কথাই আবার গৌরদাসকে এসে বলছে। শুনে গৌরদাস কাঁদতে লাগল, বললে, 'আপনিই একমাত্র অধিকারী। আপনি ছাড়া আর কে দেখবে।'

কুঞ্জে এক বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী ছিল, তারাও শুনল।

'এ বলে কী?' বৈষ্ণবী স্তম্ভিত হবার ভাব করল।

বৈষ্ণব বিদ্রূপ করে উঠল: 'এ সব বায়ুর কাজ।'

অবিশ্বাস করতে হয় করো কিন্তু বিদ্রূপ করা কেন? বৈষ্ণবের শূলবেদনা দেখা দিল আর তিন দিনেই তার সকল যন্ত্রণার অবসান হয়ে গেল।

কৃষ্ণদাস এসেছে। রোজ আসে, তার অবারিত দ্বার। রাত্রে খাবার আগে গোঁসাই একখানা রুটি রেখে দেয়, সেইটে নেবার জন্যে সকালে আসে। গোঁসাইয়ের কাছে বসে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। যদি রুটি দিতে দেরি হয় তা হলে তুমুল করে কৃষ্ণদাস। ঠাকুরের হাত-পা ধরে টানাটানি করে, কখনো কোলে কখনো একেবারে ঘাড়ের উপর উঠে বসে। খাবার না পাওয়া পর্যন্ত গোঁসাইকে বসতে দেবে না আসনে। গোঁসাইয়ের বড় আদুরে কৃষ্ণদাস। খুব শান্ত না হোক, ভারি চালাক-চতুর।

কৃষ্ণদাস না হয় ছোট বানর, একটা বুড়ো বানরও আছে। যেমন বিজ্ঞ তেমনি ভক্ত। যখন ভাগবত পাঠ হয় তখন গালে হাত রেখে শোনে আর গোঁসাইয়ের দিকে তাকায়। পাঠ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আসন ছাড়ে না। পাঠের সময় যদি কেউ খাবার ছুঁড়ে দেয় তা ছোঁয় না, পাঠ শেষ হলে তবে তাতে মনোযোগ করে। অন্যান্য কুঞ্জে বানরদের কী উৎপাত কিন্তু বুড়োর ভয়ে এখানে কারু সাধ্য নেই কিছু গোলমাল করে। দেখতে বেশ বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায়। নিঃসন্দেহে দলপতি।

শত কাজ থাকলেও ভাগবত শোনা বন্ধ নেই বুড়োর। আর যে জায়গায় একবার বসেছে প্রত্যহ ঠিক সেই জায়গাটুকুতেই তার বসা চাই।

একদিন কোথাকার একটা বানর এসে আশ্রমের ঘটি নিয়ে উধাও হল।

গোঁসাই বুড়োকে সম্বোধন করে বললে, 'তোমার দলেরই হবে হয়তো, একটি এসে আমাদের ঘটিটা নিয়ে গেছে। সবার খুব অসুবিধে হচ্ছে। পারবে এনে দিতে?'

বুড়ো তখুনি গাছের ডালে উঠল, দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখতে লাগল। দু তিন লাফে একটা বাড়ির ছাদে গিয়ে পড়ল। সেখান থেকে কুড়িয়ে আনল ঘটি। যে বানর ঘটিটা নিয়েছিল সে তো বুড়োকে দেখে সাত যোজন দূরে।

গোঁসাই বুড়োকে লক্ষ্য করে বললে, 'ইনি কোনো বৈষ্ণব মহাত্মা। ব্রজবাস আকাঙ্ক্ষা করে বানরদেহ ধারণ করে আছেন।'

নারায়ণস্বামী গোস্বামী কেশীঘাটে থাকে, সিদ্ধ সাধু বলে খুব তার নামডাক। একদিন গোঁসাইয়ের সঙ্গে দেখা হলে বললে, 'সাধন-ভজন করে কেন বৃথা সময় নষ্ট করছেন? আমার কাছে আসুন, আমি একদিনেই আপনাকে ভগবান দেখিয়ে দেব।'

'আমিও পাব দেখতে?' বিনয়লাবণ্যে বললে গোঁসাই।

'নিশ্চয়ই পাবেন। কেন পাবেন না? কাল সন্ধের সময় আসুন।'

পরদিন সন্ধ্যায় ঠিক গেল গোঁসাই। নারায়ণস্বামী একখানি আসন দেখিয়ে বললে, 'এখানে বসুন।'

বসল গোঁসাই।

'চোখ বন্ধ করুন।'

কতক্ষণ পরে নারায়ণস্বামী বললে, 'এবারে চোখ মেলুন। ভগবান প্রকাশিত হয়েছেন।'

গোঁসাই চোখ মেলে দেখল চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি দাঁড়িয়ে।

কিন্তু কই, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ দেখে প্রাণে যেমন আনন্দ হয় তেমনি এখন হচ্ছে না কেন? কেন প্রেমস্রোতে ভেসে যাচ্ছি না?

তারপর, এ কী, বিগ্রহ কাঁপছে কেন? বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে কেন?

'পুড়ে মরলাম, পুড়ে মরলাম।' বিগ্রহ আর্তনাদ করে উঠল: 'আমাকে এ কার কাছে নিয়ে এসেছিস? তার মন্ত্রতেজে পুড়ে মরলাম।'

নারায়ণস্বামী বিগ্রহকে ধমকে উঠল: 'আপনি ইষ্টমন্ত্র জপ করছেন নাকি?'

'আমি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ইষ্টমন্ত্র জপ করি, তা আমি বন্ধ করি কী করে?' বললে গোঁসাই, 'আর উনি যদি ভগবানই হবেন তবে মন্ত্রকে তিনি ভয় করবেন কেন? ভগবানকে লাভ করবার জন্যেই তো মন্ত্র।'

নারায়ণস্বামী অধোমুখে বসে রইল।

'এসব ভৌতিক কাণ্ডে থেকো না।' বললে গোঁসাই, 'প্রতারণা কদিন চলবে? প্রেতকে বিষ্ণুমূর্তি ধরাতে শেখালে, কিন্তু সে মূর্তিতে শ্রীবৎসচিহ্ন কই? শোনো, প্রতারণা ছাড়ো, দিনরাত্রি নাম নাও।'

নারায়ণস্বামী ক্ষমা চাইল। বললে, 'আর করব না এ বুজরুকি। মার্জনা করুন আমাকে। কাউকে বলবেন না আমার এ পাপকথা।'

কিন্তু সেদিন সত্যি-সত্যি এক ভূত এসে ধরল গোঁসাইকে। যন্ত্রণায় ছটফট করে মরছি, আমাকে বাঁচান। কোন পাপে আপনার এই দণ্ড? মন্দিরে পুজুরি ছিলাম। ঠাকুরের সব টাকা নিজে খেয়েছি, ঠাকুরকে দিইনি।

কী হলে আপনার শান্তি হবে?

আমার শ্রাদ্ধ হয়নি। আমার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিয়ে দিন।

শ্রাদ্ধ হয়নি কেন?

আমার দেড় হাজার টাকা আমার ভাইপোর কাছে গচ্ছিত ছিল। সে সে-টাকা ফুঁকে দিয়েছে। আমি মেরেছি ঠাকুরের টাকা, ও মারল আমার টাকা।

গোঁসাই বললে, 'আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আপনি শুধু নাম করুন। হ্যাঁ নাম, হরিনাম। হরিনামেই সমস্ত অরিষ্টের শান্তি। সমস্ত জ্বালার প্রশমন।'

২৩

আদৌ শ্রদ্ধা। সর্বপ্রথমেই শ্রদ্ধা, শাস্ত্রে ও সদাচারে বিশ্বাস। তারপরেই সাধুসঙ্গের অধিকার। সাধুসঙ্গ থেকে আকাঙ্ক্ষা জাগে আমিও অমনি জীবন লাভ করি। তখন শুরু হয় ভজনক্রিয়া। ভজনের ফলে অনর্থনিবৃত্তি, সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার অবসান। সেই থেকে নিষ্ঠা রুচি ভক্তি। তারপরেই ভাব। সর্বশেষে প্রেম।

প্রকৃত সাধুর লক্ষণ কী? বলছেন বিজয়কৃষ্ণ, 'প্রকৃত সাধু কখনো আত্মপ্রশংসা করে না। পরনিন্দা করে না। কোনোরকম বুজরুকি দেখায় না। কারু বিশ্বাসে আঘাত দিয়ে কথা বলে না। কাউকে নিজের মতে টানতে চেষ্টা করে না। সর্বদা ভগবানে নির্ভর করে থাকে। অনাহারে প্রাণ গেলেও কারু কাছে কিছু যাচ্ঞা করে না। কায়মনোবাক্যে শাস্ত্র ও সদাচারের মর্যাদা রক্ষা করে চলে। সর্বজীবে দয়া করে, মানুষ পশুপাখি কীটপতঙ্গ তো বটেই, বৃক্ষলতার দুঃখেও সহানুভূতি করে, অন্যের সমস্ত অবস্থা নিজের বলে অনুভব করে, কারুরই উদ্বেগের কারণ হয় না। আর সর্বদা সন্তুষ্ট থাকে, কখনো কোনো কারণে চঞ্চল হয় না।'

আশ্চর্য জায়গা এ বৃন্দাবন। ময়ূর-ময়ূরী খেলা করছে, আনন্দে নাচছে পেখম মেলে। মানুষ দেখেও ভয় নেই এতটুকু। হরিণ তো একেবারে নিঃসঙ্কোচ, মানুষকে মানুষই মনে করে না। কেন এমন হবে না? বৃন্দাবনে যে হিংসা নেই। কোথাও একটা কাক দেখা যাচ্ছে না। আমিষ ভক্ষণ নেই বলে কাকও দেশান্তরী। সব গাছেরই ডালপালা নিম্নমুখী। কোথাও পাতার শিরায় শিরায় দেবনাগরী অক্ষরে রাধাকৃষ্ণ লেখা। গাছের গায়ে কোথাও 'র', কোথাও বা 'কৃ' মাত্র হয়ে আছে, পরে ধীরে ধীরে পুরো নাম স্পষ্ট হবে।

আর পাখি দেখেছ? রাধাশ্যাম পাখি? কোন উত্তর দেশ থেকে উড়ে আসে আর রাধাশ্যাম রাধাশ্যাম বলে ডাকে। একবার এক ব্রজবাসী দুটো পাখি ধরল। একটা উড়ে গেল। অন্যটাও উড়ে যায় সেই ভয়ে সেটাকে খাঁচায় পুরল। বাস, সে পাখির আর ডাক নেই। চাঞ্চল্য নেই। খেতে দিলেও কিছু খায় না, চায় না মুখ তুলে। কী হল রাধাশ্যামের? পরদিন সকালে ঝাঁকে-ঝাঁকে রাধাশ্যাম পাখি ব্রজবাসীর কুঞ্জে এসে হাজির। সমস্বরে তাদের ডাক শুধু রাধাশ্যাম, রাধাশ্যাম। সে আর কলস্বর নয়, আর্তনাদ। 'পড়শিরা সবাই তিরস্কার করল ব্রজবাসীকে। রাধাশ্যামকে কখনো খাঁচায় পোরে? শিগগির ছেড়ে দাও, নইলে তোমার সর্বনাশ হবে। ব্রজবাসী ভয় পেল। খুলে দিল খাঁচার দরজা। বন্দী পাখি মুক্তি পেল। নিমেষে বন্ধ হল কোলাহল।

পুলিশ সাহেব ঘোড়ায় চড়ে যমুনা পার হয়ে চলেছে বেলবাগের দিকে। মতলব সেখানকার জঙ্গলে পাখি শিকার করবে। বৃন্দাবনে শিকার করা সরকারের বারণ, সেটা সাহেব গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না। বৃন্দাবনে কাউকে আঘাত করতে নেই, গ্রামের

লোক অনেক নিষেধ করল, কিন্তু একে ইংরেজ, তায় পুলিশ, সমস্ত উড়িয়ে দিল। একটা বুনো শুয়োর দেখে ঘোড়া ভীষণ ঘাবড়ে গেল। সাহেবকে মাটিতে ফেলে দিয়ে চার পা তুলে ছুট দিলে। আর দেখতে হলনা, সাহেবকে শুয়োর টুকরো টুকরো করে ফেলল। কেমন, তখন বলছিলাম না? বৃন্দাবনে হিংসা করেছ কি মরেছ।

কুঞ্জের একটি গাছকে কুঞ্জের কর্তা কেটে ফেলবে ঠিক করল। কাঠের দরকার। রাত্রে কর্তা স্বপ্ন দেখল একটি বৈষ্ণববেশধারী ব্রাহ্মণ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বলছে, 'আমি তোমার কুঞ্জে ঐ বৃক্ষরূপে অনেকদিন ধরে আছি। শুধু বৃন্দাবনের রজলাভের জন্যে। তুমি গাছটাকে কেটে ফেললে আমি নিরাশ্রয় হয়ে যাব। আমার আর রজলাভ হবে না।'

'তোমার কথা বিশ্বাস করি না।' স্বপ্নের মধ্যেই কর্তা বললে।

'বেশ তোমার বিশ্বাসের জন্যে কাল সকালে গাছের নিচে আমি একবার দাঁড়াব। ইচ্ছে করলেই আমাকে দেখতে পাবে।'

ঘুম ভাঙতেই কর্তা সেই গাছের কাছে এসে দাঁড়াল। দেখল একটি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে আছে। চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে চাইল না। ভাবল কে না কে দাঁড়িয়ে আছে। যেমন সংকল্প করেছিল, গাছ কেটে ফেলল। দেখিনা কী হয়। যারা স্বপ্নকে অমূলক ভেবে গাছের গায়ে কুড়ুল চালিয়েছিল তারা আগে মরল। পরে কয়েক দিনের মধ্যে একে-একে মরল কর্তার স্ত্রী পুত্র কন্যা। কর্তা দর্শনশাস্ত্রের পণ্ডিত। কত আলোচনা কথকতা করত, হাবা হয়ে গেল।

'মশাই, দেশে থাকতে বৃন্দাবনের কত মাহাত্ম্যের কথা শুনেছি', এক বাঙালী ভদ্রলোক বললে এসে গোঁসাইকে, 'কিন্তু কই কিছুই তো দেখতে পেলাম না।'

'কী দেখতে পেলেন না?'

'ব্রজের কত গুণ শুনেছিলাম, কিছুই তো বুঝতে পারলাম না।'

'আপনি একবার ব্রজে পড়ে দেখুন দেখি।'

'এই তো পড়লাম।' ভদ্রলোক নিচু হয়ে ব্রজে মাথা ঠেকাল : 'কই, কী হল? কিছুই হলনা।'

'গায়ের জামাটা খুলে ফেলুন দেখি।'

'খুলে ফেলব?' ভদ্রলোক দোনামনা করতে লাগল।

'হ্যাঁ, খুলে ফেলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে ব্রজে একবার গড়াগড়ি দিন', গোঁসাই বললে, 'তারপর দেখুন কী হয়?'

'কী আবার হবে! কিছু হবে না।' ভদ্রলোক গায়ের জামা খুলে ফেলল। যা থাকে অদৃষ্টে, ব্রজে লুটিয়ে পড়ল, গড়াগড়ি খেতে লাগল। ও মা, কতক্ষণ পরেই ভদ্রলোক হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল। আমার এ কী হল? আমি তো ঘোর অবিশ্বাসী। আমার এ কী আনন্দ! আমার এ কী রোমাঞ্চ! আনন্দরোমাঞ্চ তো আমি কাঁদছি কেন? জয় রাধারাণীর জয়!

সতীশ মুখুজ্জে, জামালপুর স্কুলের শিক্ষক, উপবীত ত্যাগ করে ব্রাহ্ম হয়েছিল। বাপের মৃত্যু-সংবাদ শুনে বৃন্দাবনে এসে মিলল গোঁসাইয়ের সঙ্গে। ঝগড়া করতে লাগল।

গোঁসাই বললে, 'তোমার পিতার প্রেতাত্মা সর্বদা তোমার উপর রয়েছে, তাই এই অশান্তি।'

'কী করে এই অশান্তি যাবে ?'

'শাস্ত্রমত শ্রাদ্ধ করলে যাবে।'

'শাস্ত্রমত করব কী করে ? পৈতে কই ?'

'আবার উপবীত গ্রহণ করো।' গোঁসাই বললে গভীরস্বরে।

সতীশ হাসল। বললে, 'যা একবার ছেড়েছি তা আবার নিই কী করে ?'

'না, নাও। উপবীতের অনেক গুণ।'

'বাজে কথা। যদি গুণই থাকত তবে আর তা ত্যাগ করা যেত না। গুণ ছিল না বলেই—'

'গুণ ছিল না যেহেতু তেমন ব্রাহ্মণের কাছ থেকে পাওনি। তেমন ব্রাহ্মণের কাছ থেকে পেলে আর ছাড়তে পারতে না।'

'ছাড়বার মালিক তো আমি, ব্রাহ্মণ কী করবে ?' সতীশ আবার হাসল।

'বেশ, আমি তোমাকে দিচ্ছি', গোঁসাই হুঙ্কার করে উঠল : 'দেখি কেমন ওটা তুমি ত্যাগ করতে পারো।'

একটা পৈতে গোঁসাই নিজের হাতে করে সতীশকে পরিয়ে দিল। সতীশ তখুনি তা ছিঁড়তে গেল। কিন্তু কী আশ্চর্য, তার হাত বেঁকে গেল, উপবীত স্পর্শ করতে পারলনা। আবার চেষ্টা করল, আবার বেঁকে গেল হাত। এ কী দুর্বলতা ! সতীশ সর্ব-শক্তিতে ধরতে গেল উপবীত, হাতে অসহ্য ব্যথা করে উঠল, যন্ত্রণায় বেরিয়ে এল আর্তনাদ।

না, থাক। ছিঁড়ব না, ছাড়ব না। শ্রাদ্ধ করব।

আর যন্ত্রণা নেই। বুঝতে পারল সূত্রের মাহাত্ম্য। গোস্বামী-প্রভুর পায়ে প্রণত হল সতীশ। ঘোর দুঃস্বপ্নেও কখনো ভাবতে পারেনি আর উপবীতত্যাগের কথা।

'আমাদের খুব কষ্ট।'

তোমরা কারা ? গোঁসাই ফিরে তাকাল।

'আমরা কতগুলি প্রেতাত্মা। কিছুতেই আমরা মুক্তি পাচ্ছি না। আপনি যদি দয়া করেন—' ছায়ামূর্তিগুলি গোঁসাইকে ঘিরে ধরল।

'আমি কী করতে পারি ?'

'আপনি শুধু যমুনায় নামুন। আমরা জানি কিসে আমরা উদ্ধার পাব।'

যমুনায় নামতে আর দোষ কী। গোঁসাই যমুনায় ডুব দিয়ে সিক্ত গায়ে উঠে এল। প্রেতাত্মারা তার পাদোদক লেহন করল। সঙ্গে-সঙ্গেই তাদের ঘুচে গেল প্রেতত্ব। জ্যোতির্ময় দেহ ধরে আকাশে অন্তর্হিত হল।

আরেকদিন যমুনায় স্নান করতে যাচ্ছে গোঁসাই দেখল চড়ায় একখণ্ড অস্থি পড়ে আছে। কুড়িয়ে নিয়ে দেখল অস্থির গায়ে 'হরে কৃষ্ণ' দেবনাগরী অক্ষরে আঁকা হয়ে আছে। সন্দেহ নেই, এই অস্থি কোনো এক উচ্চস্তরের মহাজন বৈষ্ণবের। সকলকে দেখাল গোঁসাই। দেখ কী অপূর্ব কীর্তি। শ্বাসে-প্রশ্বাসে এ মহাপুরুষের নাম অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই নাম রক্তে মিশে শিরায়-শিরায় প্রবিষ্ট হয়ে মেদ মাংস ভেদ করে অস্থি স্পর্শ করেছিল। দেখ নামের কী নিদারুণ শক্তি ! শ্যামের নাম হাড়ে এসে বাসা বেঁধেছে।

বৈষ্ণবের দল কীর্তন লাগাল। অস্থিকে সমাধি দিল।

গোপীনাথজির মন্দিরে কীর্তন-মহোৎসব হচ্ছে, গোঁসাই নর্তনোন্মত্ত, দেখা গেল যোগজীবন ছুটে আসছে। আসছে দু হাত প্রসারিত করে গোঁসাইকে আলিঙ্গন করবার জন্যে। গোঁসাই উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনি করে উঠল। যোগজীবন ভাবাবেশে মূর্ছিত হল।

ঢাকা থেকে চলে এসেছে যোগজীবন। একা নয়, সঙ্গে মা আর ছোট বোন কুতু, প্রেমসখী। যোগমায়াকে দেখে গোঁসাই কি খুব প্রসন্ন নন? যোগমায়া চলে এলে গেণ্ডারিয়া আশ্রম কে দেখবে? শাশুড়ি ঠাকরুন অসুস্থ, যোগজীবনের স্ত্রী ছেলেমানুষ, এই অবস্থায় চলে আসা কি ঠিক হয়েছে? তবু ব্রজপরিক্রমায় গোঁসাই যোগমায়াকে ডেকে নিল।

জন্মাষ্টমীর পরে দশমী তিথি থেকে পরিক্রমণ সুরু। বৃন্দাবন থেকে প্রথম এল মথুরায়। মথুরায় ভুতেশ্বর মহাদেব, জন্মস্থলী, ধ্রুবটিলা, বিশ্রামঘাট দেখল। পরদিন তালবন মধুবন কুমুদবন দেখে শান্তনুকুণ্ড। এইখানেই গঙ্গাদেবীকে আরাধনা করে শান্তনু ভীষ্মকে পেয়েছিল। জলাশয় ভরে পদ্ম ফুটে আছে, মাঝখানে উঁচু টিলা আর তার উপরে মন্দির। মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ। জীবন্তসদৃশ বিগ্রহ, দেখলেই মনে হয় এখুনিই কথা কয়ে উঠবে।

কে এক গোপাঙ্গনা ফল আর দধি-দুধ নিয়ে এসেছে। এ কার জন্যে? আর কার জন্যে! আমার কৃষ্ণ রাখালের জন্যে। গোপবালা গোঁসাইকে স্বহস্তে খাইয়ে দেয়, কতক্ষণ ধরে পথ চেয়ে বসে আছি শূন্যমনে। মাঠে-মাঠে কোথায় খেলা করছিলি এতক্ষণ?

সেখান থেকে বেহুলাবন।

এক বৃদ্ধা গোঁসাইয়ের সঙ্গ ধরল।

'কে মা তুমি?' জিগগেস করল গোঁসাই।

'আমি শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্তা, তা হোক, আমি তোমার সঙ্গে ধুরব।'

'তুমি যে মা খুব অসুস্থ, জরাজীর্ণ, কী করে হাঁটবে?'

'তুমি শুশ্রূষা করবে।' বৃদ্ধা সস্নেহে বললে, 'তুমি সঙ্গে থাকলে আমার আর ভয় কী।'

'চলো।'

বেহুলাবনে রাত কাটিয়ে চলল রাধাকুণ্ডের দিকে। জয় রাধে শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণপ্রাণবল্লভে। পথে রাঢ়গ্রাম অতিক্রম করে প্রথমে সূর্যকুণ্ডে উপস্থিত হল। অদ্বৈত আচার্য ভারতবর্ষের চারধাম ঘুরে এই কুণ্ডে এসে বিশ্রাম করেছিলেন। তাঁর বংশধর বিজয়কৃষ্ণ এই কুণ্ডে স্নান করে তীরে বসে স্মরণ করল পূর্বকথা। সেখান থেকে দ্বিপ্রহরে রাধাকুণ্ডে এসে পৌঁছুল। রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডে দুকুণ্ডেই স্নান করল নতুন করে। প্রদক্ষিণ করল। দেখল রঘুনাথের ভজনকুটির। আর এই দেখ কবিরাজ গোস্বামীর কুঞ্জ, এইখানে বসেই তিনি চৈতন্যচরিতামৃত লিখেছিলেন।

তারপর সদলে গিরিগোবর্ধন চলে এল। দলছাড়া হয়ে একা হয়ে গেল গোঁসাই। হঠাৎ পর্বতের নির্জনে একটা গোফার কাছে এসে দেখল একটা কঙ্কাল তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এগিয়ে গেল গোঁসাই। দেখল কঙ্কালের চোখ দুটো জ্বলছে আর মুখগহ্বরে জিভ নড়ছে। এ কী রকম কঙ্কাল! কঙ্কাল তো চোখ আর জিভ জীবন্ত কেন?

কঙ্কাল কথা কয়ে উঠল। বললে, 'চোখ রেখেছি রূপ দেখতে, লীলা দেখতে, আর জিভ রেখেছি হরিনাম করতে।'

'কতকাল আছেন এমনি ?' জিগগেস করল গোঁসাই।

'চারশো বছরেরও বেশী।' বললে কঙ্কাল, 'মহাপ্রভুকে দেখেছি, নিত্যানন্দকে দেখেছি। দেখেছি অদ্বৈতকে, হরিদাসকে। গৌরাঙ্গলীলাদর্শনের পর আরেক অবতারলীলা দেখবার আশায় বসে আছি।' বলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল গোঁসাইকে।

বছরের মধ্যে একদিন একবার সেই কঙ্কাল উচ্চঘোষে হরিবোল বলে ওঠে—সে ধ্বনি সাত-আট মাইল দূরে থেকে শোনা যায়।

দলের সঙ্গে এসে মিলল বিজয়কৃষ্ণ। গোবর্ধন প্রদক্ষিণ করতে বেরুলে। পথিমধ্যে 'দাউজি'র পদাঙ্ক দেখল। কেউ কেউ বললে, শিশু বলরামের পদচিহ্ন এত প্রকাণ্ড হয় কী করে ?' গোঁসাই বললে, না, এ গৌরপদচিহ্ন। হ্যাঁ, পাষাণের বুকেও পা রাখতে কুণ্ঠা করেন নি গৌরহরি। নীলাচলে জগন্নাথমন্দিরেও তাঁর পদচিহ্ন পাবে। আর দানঘাটে এই যে দেখছ প্রস্তরখণ্ড, এইখানে শ্রীকৃষ্ণ বসেছিল আর তাই ধরে কত কেঁদেছিলেন মহাপ্রভু। এখন আবার কাঁদতে বসল বিজয়কৃষ্ণ।

সেখান থেকে বলদেবকুণ্ড হয়ে গোবিন্দকুণ্ড। এই গোবিন্দকুণ্ডেই মাধবেন্দ্র পুরী গোপালদেবের মন্দির স্থাপন করেছেন। নিকটেই তাঁর সমাধি। কাছাকাছি এক মন্দিরে রাধিকাপ্রসাদ দাস নামে এক বৈষ্ণব মহাজন বাস করছেন। গোবর্ধনে একাসনে চল্লিশ বছর সাধন করে সিদ্ধ হয়েছেন। গোঁসাইকে দেখেই সানন্দে বলে উঠলেন, 'আমাকে কৃপা করে একবার দর্শন দিলেন, আরো একবার দেবেন। সেই আশায় দেহ ধরব।'

কী এক অপূর্ব দর্শন হল গোঁসাইয়ের। রজে লুণ্ঠিত হল। কতক্ষণ পরে দেখল লোকসমাগম হচ্ছে। ভাব সম্বরণ করে উঠে পড়ল।

গোবর্ধন পরিক্রমা শেষ করে দেখতে চলল মানসী গঙ্গা। সেখান থেকে যশোদাকুণ্ড, হরদেবজি, গুলালকুণ্ড, সাক্ষীগোপাল আর রূপসরোবর। শেষে অলকাগঙ্গা। অলকাগঙ্গায় যোগমায়া দেখতে পেল এক বৃহৎকায় হনুমান যাত্রীদের সঙ্গে ঘুরছে।

'ইনি কে ?' জিজ্ঞেস করল গোঁসাইকে।

'ইনি মহাবীর। অলক্ষ্যে যাত্রীদের রক্ষক হয়ে চলেছেন। যার অন্তশ্চক্ষু খুলে গেছে সেই শুধু দেখতে পায় তাঁকে।'

সেখান থেকে আদিবদ্রী হয়ে কাম্যবন গেল সকলে। কাম্যবন থেকে বিমলাকুণ্ড, লুকলুকিকুণ্ড। লুকলুকিকুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলত। সেখান থেকে লঙ্কাকুণ্ড হয়ে চরণপাহাড়ী। চরণপাহাড়ীতে পাথরে গরু বাছুর মানুষের অসংখ্য পদচিহ্ন। ত্রিজগন্মানসাকর্ষী শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে প্রগাঢ় প্রেমে পাহাড় দ্রবীভূত হত, আর যারা তখন পাহাড়ে থাকত তাদের পায়ের চিহ্ন বসে যেত পাথরে। তখন আর পাথর কোথায়, তখন মোম। বাঁশি নীরব হলে গলা মোম আবার শক্ত পাথর হয়ে উঠত, কাঁচা পায়ের দাগ পাকা হয়ে যেত। দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এ সব পদচিহ্ন মানুষের খোদা নয়। কতগুলি পদচিহ্নে স্পষ্ট ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ। সন্দেহ কী, সেগুলি বৃন্দাবনচন্দ্রের। গোঁসাই পদচিহ্নগুলি পরীক্ষা করে দেখছে আর যেখানেই ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ পাচ্ছে পড়ে পড়ে প্রণাম করছে। আর কাঁদছে। কী আনন্দ এই প্রণামে, এই প্রেমে, এই প্রেমাশ্রুতে।

সেখান থেকে চলো যাই কদমখণ্ডী। দোনা বা ঠোঙার গাছ দেখে আসি। একবার বন্ধুদের নিয়ে খেলতে-খেলতে বৃন্দাবনবিহারী তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিল। কদমগাছের কাছে প্রার্থনা করেছিল, দুধ খাব, পানপাত্র পাঠাও। বলতে বলতে গাছের অনেক পাতা

নিজের থেকে সঙ্কুচিত হয়ে দোনা বা ঠোঙার আকার ধারণ করল। দুধ খাওয়া হয়ে গেলে গাছের পাতা আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেল।

খুঁজে-খুঁজে সকলে হয়রান, দোনার গাছ কই ? একটা কদম গাছকে প্রণাম করে সবাই প্রার্থনা করল, সেই গাছ দেখাও। অমনি সেই গাছে পাতায়-পাতায় দোনা বা ঠোঙা ফুটে উঠল।

চলে এল মানগড়ে। সেখানে সারি-সারি অনেক নুপুরের গাছ। যশোদা-দুলালের ইচ্ছে হল ব্রজবালকদের সঙ্গে নাচে। কিন্তু নুপুর কই ? বৃক্ষকে বললে, নুপুর ফোটাও। বকফুলের ছড়ার মতো ছড়া বের হল বৃন্ত থেকে, ছড়ার অগ্র ও অন্তভাগ জুড়ে গেল মুখোমুখি। ভিতরের বীজগুলো পেকে আলগা হয়ে খসে পড়ল ভিতরে আর হাওয়ার দোলায় বাজতে লাগল ঝুমুর-ঝুমুর। স্বভাবশিশুদের ঐ স্বভাবনুপুর।

তখন থেকে একটা ময়ূর সঙ্গ নিয়েছে। গোঁসাই যদি কোথাও বসে, শিখী নৃত্য করে। যদি চলে শিখীও পিছু ধরে। গোঁসাইয়ের মনোরঞ্জন করার জন্যেই তার আসা। বহুদূর এসে পরে সে অদৃশ্য হল—সে ময়ূর না কে, আর দেখা হল না।

চলে এল নন্দঘাট, রামঘাট, বলরামকুণ্ড, পাণিগ্রাম। অবশেষে ভাণ্ডীর-বন। সেখানে পৌঁছে গোঁসাই হঠাৎ 'শ্রীদাম' 'শ্রীদাম' বলে চেঁচিয়ে উঠল। 'আমি আছি' 'আমি আছি' উঠল এই প্রতিধ্বনি। কিছুই হারায়নি, সবাই আছি, সব কিছুই আছে।

সেইখান থেকে লোহবন। লোহবন থেকে নন্দের রাজধানী মহাবন। মহাবনে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে ব্রহ্মাণ্ডঘাট। এই ব্রহ্মাণ্ডঘাটেই শ্রীকৃষ্ণ মা-যশোদাকে মুখমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়েছিল। তারপর দধিমন্থনের স্থান দেখল, সেখান থেকে যমলার্জুন হয়ে চলে এল নতুন গোকুলে। তারপর যমুনা পার হয়ে আবার মথুরা।

দ্বাদশী তিথিতে গোঁসাই আবার বেরুল। এবার ব্রজমণ্ডল নয়, এবার শুধু বৃন্দাবন পরিক্রমা। কেশীঘাট, জ্ঞানগোথুরী, রাধাবাগ হয়ে রাজঘাটে উপস্থিত হল। পরে ক্রমে ক্রমে দাবানলকুণ্ড, কালীয় হ্রদ, কিশোরঘাট, শৃঙ্গারঘাট। শৃঙ্গারঘাটে প্রভু নিত্যানন্দ বিগ্রহ দর্শন করল। সেখান থেকে বস্ত্রহরণ ঘাট, গোবিন্দঘাট ও ভ্রমরঘাট দেখে কেশীঘাটে ফিরে এল।

গৃহে প্রত্যাবর্তন করে বিজয়কৃষ্ণ যোগমায়াকে বললে, 'তুমি এবার ঢাকায় ফিরে যাও।'

'তা কী করে হয় ? স্বামীই স্ত্রীর চরম আশ্রয়, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব ?' যোগমায়া দৃঢ় হল।

'তবে আলাদা বাড়িতে গিয়ে থাকো। আমার কাছে তোমার থাকা হবে না।'

'না, না, আমি তোমার কাছেই থাকব।'

'আমি যে আশ্রম নিয়েছি তুমি আমার সঙ্গে থাকলে সে আশ্রমের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। এ কুঞ্জে তোমার স্থান নেই।' বিজয়কৃষ্ণ কঠিন হল : 'তবু যদি তুমি জেদ করো, আমি অন্যত্র চলে যাব, উত্তরকুরুতে চলে যাব।'

যোগমায়া স্তব্ধ হয়ে গেল। আলাদা একটা ঘরে রাত কাটাল। যোগজীবনকে বললে, যত শিগগির সম্ভব তুই কুতুকে নিয়ে ঢাকায় চলে যা।

ভোর হতে যোগমায়া নিরুদ্দেশ। কোথায় আর যাবে, যমুনায় স্নান করতে গিয়েছে

হয়তো। যোগজীবন শ্রীধর সতীশ কুলদা কত ঘাটে-অঘাটে খোঁজাখুঁজি করল, সন্ধান পেলনা। দিন গিয়ে সন্ধ্যা হয়ে এল তবু ফিরলনা যোগমায়া।

সন্ধ্যায় 'হরিবংশ' পাঠ করতে বসেছে কুলদা, পুঁথির মধ্যে দেখতে পেল একটা চিরকুট। তাতে যোগমায়ার নিজের হাতে লেখা : 'আমি চললাম, আমার কেউ অনুসন্ধান কোরো না।'

'তবে আর সন্দেহ নেই', যোগজীবন কেঁদে উঠল : 'মা যমুনায় ডুবে আত্মহত্যা করেছেন।'

কুলদা বললে, 'ঠাকুরকে তো জানাতে হয়। শ্রীধর, তুমি গিয়ে বলো।'

শ্রীধর বললে, 'আমার সাহস হয় না। তুমিই যাও।'

কুলদা গোঁসাইয়ের কাছে গিয়ে বসল। অনেকক্ষণ পর গোঁসাই চোখ মেলল। কুলদা বললে, 'মা ঠাকরুনকে পাওয়া যাচ্ছে না। কুঞ্জ থেকে একলা তো কোনোদিন যান না কিন্তু জানিনা আজ কোথায় চলে গেছেন। সারা বৃন্দাবন আমরা খুঁজেছি, কোথাও সন্ধান পেলাম না।'

গোঁসাই নির্বিচল রইল। সহজ স্বরে বললে, 'কোথায় আর যাবেন। যমুনাতীর দেখেছ ?'

'কোথাও দেখা আর কিছু বাকি নেই।'

গম্ভীর হয়ে গেল গোঁসাই। জিগগেস করল, তুমি আজ পাঠ শুনতে যাবে ?'

'যাব।'

'যখন যাবে কুতুকে হাতে ধরে নিয়ে যেও।' গোঁসাইয়ের স্বরে কেমন যেন একটু উদ্বেগ ফুটে উঠল : 'যখন পাঠ শুনতে বসবে কুতুকে কাছে বসিও। সর্বদাই দৃষ্টি রেখো ওর উপর। ওকে আবার নিয়ে না যান।'

কেমন ভয় হল কুলদার। কিন্তু কুতুর এতটুকু ভয় নেই, উদ্বেগ নেই, বিমর্ষতা নেই। সে যেমন হাসি-গল্পে ছিল তেমনি হাসি-গল্পেই আছে।

এ অন্তর্ধানের কী রহস্য তা কে বলবে।

২৪

'কুতু, তোর কি মার জন্যে কষ্ট হয় ?'

'বা, কষ্ট হবে কেন ? মা যে পাঠ শুনতে আসেন। মাকে দেখতে পেলে আর কষ্ট কোথায় ?'

পাঠ শুনতে আসেন ! সবাই নিদারুণ অবাক মানল। কই আর তো কেউ দেখতে পায় না তাকে।

কুতুর চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হল : 'আজও তো এসেছিলেন।'

'কোথায় বসেছিলেন ?' জিগগেস করল গোঁসাই।

'আমার পাশটিতে।'

'কেমন দেখলি ?'

'এই শরীরে নয়।' কুতু গম্ভীর হল।

কী ব্যাপার ? কুলদা নিভৃতে গিয়ে ধরল গোঁসাইকে।

কী আর ব্যাপার ! আমার পরমহংসজি সূক্ষ্ম শরীরে এসে তাঁকে নিয়ে গেছেন।

'কিন্তু মা তো আর সূক্ষ্ম শরীরে যাননি ?' কুলদা অভিভূত হল : 'পরমহংসজি স্থূল শরীর নিয়ে গেলেন কী করে ?'

'যোগীরা সবই পারেন।' বললে গোঁসাই, 'ইচ্ছেমাত্র স্থূলকে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মকে স্থূল করতে পারেন। দেহের পঞ্চ ভূতকে পঞ্চভূতে মিশিয়ে স্থূলকে সূক্ষ্মে পরিণত করে মুহূর্তমধ্যে তাঁকে নিয়ে গিয়েছেন।'

'কোথায় নিয়ে গিয়েছেন ?'

'মানসসরোবরে।'

'তিব্বতের মানসসরোবরে ?'

'সে তো মানতলাও।' সে মানসসরোবরে নয়। বললে গোঁসাই, 'এ মানসসরোবর অনেক দূরে, হিমালয়েরও উপরে। কৈলাস যাবার পথে।'

'সেখানে কি আমি যেতে পারি না ?'

'এই শরীরে কী করে যাবে ? অনেক যোগৈশ্বর্য হলে তবে যাওয়া যায়।'

কিন্তু দামোদর পূজারি দাউজির যা ভোগ লাগাচ্ছে তার প্রসাদে স্থূল শরীরই টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠছে। শুকনো খরখরে আটার রুটি আর কুমড়ো-সেদ্ধ। অথচ গোঁসাইয়ের সেবায় যে টাকা আসে তার সমস্তই দামোদরকে দাউজির ভোগে ব্যয় করতে দেওয়া হয়। পাথরের ঠাকুর, তার কুমড়ো-সেদ্ধতে অরুচি নেই, কিন্তু গোঁসাইয়ের শিষ্যরা এই অত্যাচার সহ্য করতে আর রাজি হল না। গোঁসাইয়ের শরীরও কেমন দিন-দিন কাহিল হয়ে যাচ্ছে।

'তোমার ভোগ তো আর গেলা যায় না।' দামোদরকে গিয়ে ধরল চেলারা।

দামোদর বিরক্ত হয়ে বললে, 'ভকতকা লোভ নেহি চাহি !'

কুমড়ো সেদ্ধ না দিয়ে কুমড়োর চোকলা সেদ্ধ দিতে লাগল দামোদর। বললে, যা টাকা আসছে তাতে ওর বেশি পোষায় না।

বটে ? হিসেব দাও। নয়তো এবার থেকে টাকা পয়সা নিজেদের হাতে রেখে নিজেরাই ভোগের ব্যবস্থা করব।

দামোদর তখন নিজে বাজারে গেল। বাছা-বাছা পোকাধরা শুকনো বেগুন আর 'বারো মিশালি' শাক কিনে আনল। তাই সেদ্ধ করে ভোগ লাগাল। উল্লাস করে বললে, 'ক্যায়সা খিলায়া।'

সবাই গিয়ে তখন গোঁসাইকে ধরল। এর একটা বিহিত করুন।

গোঁসাই মিষ্টি হেসে বললে, 'দাউজি জাগ্রত দেবতা। তিনিই বিহিত করবেন।'

তোমরা পাষণ্ড ! তোমরা আবার গোঁসাইকে লাগাতে গিয়েছ। তাঁর ক্লেশ তোমাদের একটু প্রাণে লাগে না ? বলছি বাঙলা মুলুকে চিঠি পাঠাও, আরো টাকা আনাও, তা নয়, উলটে যত সব ঘোঁট পাকানো। ভজন ছেড়ে যত সব ভোজনবাদী হয়ে উঠেছ।

দামোদর মালা নাড়ে আর বুলি ঝাড়ে। কিন্তু পাথরের দেবতাও বুঝি আর নিশ্চল থাকতে প্রস্তুত নয়। দু গালে হাত বুলোতে-বুলোতে দামোদর এসে হাজির। মুখখানি কাঁদো-কাঁদো।

'কী হল ?' জিগগেস করল গোঁসাই।

'বাবা, দাউজি হামকো বহুত মারা হায়।'

'কেন, মারলেন কেন?'

দামোদর তখন স্বপ্নবৃত্তান্ত বললে। শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে আছে, দাউজি এসে দামোদরকে চেপে ধরল। দুই গালে চড় মারতে লাগল। তাতেও হল না। সর্বাঙ্গে মারতে লাগল। চড় কিল ঘুষি।

কী করেছি?

কী করেছিস? পাষণ্ড, ভালো করে ভোগ দিচ্ছিস না। সব নিজে খাচ্ছিস, আমার গোঁসাই শুকিয়ে যাচ্ছে, তোকে আজ কিলিয়েই শেষ করব।

দেব, দেব, ভালো করে খেতে দেব। তখন দাউজি ছেড়ে দিল। দেখুন গাল দুটো ফুলে রয়েছে। সর্বাঙ্গে ব্যথা।

গোঁসাই বললে, 'তুমি ভাগ্যবান। দাউজি তোমাকে শাসন করেছেন। আর কী, প্রাণ ঢেলে সর্বস্ব দিয়ে দাউজির সেবা করো, তিনি তোমার কোনো অভাব রাখবেন না।'

স্বপ্নের প্রহার শরীরে ফোটে—সকলে দেখে অবাক হয়ে গেল। অবাক হয়ে গেল ভোগের ব্যবস্থা দেখে। এখন থেকে পেট ভরে দুটি খেয়ে 'হরেকৃষ্ণ' বলা যাবে।

কুতুবুড়ি এসে বললে, 'মা আজ আসবেন।'

'কী করে বুঝলে?'

'জানিনা। আমি যেন দিনের বেলাতেও স্বপ্ন দেখি।' গোঁসাইয়ের কাছে এসে কুতু বললে, 'আমার এমন কেন হয় বাবা?'

'কী হয়?'

'মনে হয় যা কিছু দেখছি শুনছি করছি, সব মিথ্যে, সব স্বপ্ন।'

'তোর খুব সৌভাগ্য তুই ঠিক-ঠিক দেখছিস।' গোঁসাই বললে, 'সমস্তই মিথ্যে সমস্তই স্বপ্ন। পরব্রহ্ম জ্ঞানে এ জানতে পারলেই তো হয়ে গেল।'

সন্ধের কিছু আগে বৃদ্ধা অনঙ্গ বৈষ্ণবী এসে হাজির। ওগো মা-গোঁসাই যে আমাদের ঘরে।

কোত্থেকে এলেন? কার সঙ্গে এলেন?

তা কে জানে।

যোগজীবন ছুটল মাকে দেখতে। ছুটল শ্রীধর আর সতীশ।

কী আশ্চর্য, দেবী ফিরে এসেছেন। যোগজীবন মায়ের পায়ে পড়ল। মা গো, ঘরে চলো।

যোগমায়া ফিরে এল। পরনে গেরুয়া বসন। গোঁসাইকে প্রণাম করল। পাশে বসে বাতাস করতে লাগল। যেন আগে যেমন ছিল তেমনিই আছে। গোঁসাই একবার জিগগেস করল না, কোথায় ছিলে, কী করে ফিরে এলে?

কিন্তু যোগজীবন পেড়াপেড়ি সুরু করল—বলো, কী করে অদৃশ্য হয়ে গেলে?

'পরমহংসজি এসেছিলেন।' বললে যোগমায়া, 'সঙ্গে পাঁচজন মহাপুরুষ। সবাই ছ সাত হাত লম্বা। মাথায় পাগড়ি বাঁধা। আমাকে বললেন, যমুনায় স্নান করবে চলো। যমুনায় স্নান করতে নামলাম। তারপর কী করে কী হল কিছুই বুঝতে পারলাম না। দেখলাম একটা পাহাড়ের উপরে আছি। সে যে কী আনন্দের স্থান কী

বলব। ফিরে আসতে ইচ্ছে করে না, শুধু কুতুর কথা মনে করেই মাঝে মাঝে উতলা হয়ে উঠি।' কুতুকে কাছে টেনে নিল যোগমায়া।

'বৃন্দাবন থেকে আর উনি নড়বেন না কোথাও।' বললে গোঁসাই, 'তাই ওঁকে এখানে আসতে বারণ করেছিলাম।'

পাঁজি দেখে দিন ঠিক করল যোগমায়া। নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবের দিন মাঘী ত্রয়োদশী তিথিটি শুভ। সকালে তার দেহে বিসূচিকা প্রবেশ করল আর সন্ধ্যায় সে প্রবেশ করল নিত্যলীলায়।

ব্যাধির প্রকোপে দেহ অবসন্ন হয়ে এসেছে, পাশে বসে আছে গোঁসাই, হঠাৎ পরমহংসজি আবির্ভূত হলেন। গোঁসাইকে বললেন, 'তুমি কুঞ্জ ছেড়ে বাইরে কোথাও যাও। তুমি এখানে থাকলে ওকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। দেহত্যাগ হয়ে গেলে পরে এস।'

কিন্তু যোগমায়া ছেড়ে দিতে রাজি নয়। গোঁসাই উঠি-উঠি করছে দেখে হাত ধরল। তুমি চলে যেও না।

কিন্তু পরমহংসজির আদেশ। জোর করেই উঠে পড়ল গোঁসাই। কুঞ্জ ছেড়ে চলে গেল অন্যত্র। যোগমায়ার দেহাবসান হল। গোঁসাই ফিরে এসে দেখল, সবাই কাঁদছে, বেশি কাঁদছে কুতুবুড়ি, যেন শোকে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটা তো শোকের ব্যাপার নয়, এটা উৎসবের ব্যাপার।

যোগজীবনকে লক্ষ্য করে বললে, 'মৃতদেহ এখানে এতক্ষণ রেখেছিস কেন? যা যমুনার তীরে নিয়ে সংস্কার করে আয়।'

যোগমায়ার দেহ কেশীঘাটে নিয়ে যাওয়া হল।

আসনে প্রশান্ত মূর্তিতে স্থির হয়ে বসল গোঁসাই। শুধু কুতুবুড়িরই বিন্দুমাত্র স্থৈর্য নেই, আর্তনাদ করে কাঁদছে।

'আর্তনাদ করে কাঁদা ভালো, তাতে শোক পাতলা হয়ে যায়।' বললে গোঁসাই। কুতুকে কাছে ডাকল, পিঠে রাখল সান্ত্বনার হাত।

হাত রাখতেই যন্ত্রণায় চমকে লাফিয়ে উঠল কুতু। সত্যি সে শোকে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে—হাত রাখতেই তার পিঠে আগুনে-পোড়া ফোস্কার মতো পাঁচটা আঙুলের দাগ বসে গেছে।

'এ হচ্ছে ভক্ত-বিচ্ছেদের জ্বালা।' বললে গোঁসাই, 'মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর রূপ সনাতনের এরকম হয়েছিল। বাইরে কারো কোনো শোক নেই দেখে অনেকের সন্দেহ হয়েছিল এরা কেমন ভক্ত। একদিন বৃক্ষতলে বসে ভাগবত পাঠ হচ্ছে, অনেকে শুনছে। গাছের একটা শুকনো পাতা হাওয়ায় উড়ে এসে রূপ গোস্বামীর গায়ে পড়ল। গায়ে পড়েই দপ করে জ্বলে উঠল। পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তখন সকলে বুঝল কাকে বলে বিরহদহন।'

ঢাকায় কুঞ্জ ঘোষকে চিঠি লিখল গোঁসাই :

'গত ১০ই ফাল্গুন সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী তাঁহার চির প্রার্থনীয় সিদ্ধদেহ লাভ করিয়াছেন। অবিশ্বাসী লোকে ইহাকে মৃত্যু বলে, কিন্তু একবার বিশ্বাস নয়নে চাহিয়া দেখ। যোগমায়া আজ সখীবৃন্দের মধ্যে কি অপূর্ব শোভা সৌন্দর্য লাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী শান্তিসুধাকে বলিবে যে, যেন শোক না করে, ইহা শোকের ব্যাপার নহে, বহু সৌভাগ্যে মানুষ ইহা প্রাপ্ত হয়। আগামী ২১শে ফাল্গুন এখানে তাঁহার নামে মহোৎসব হইবে। তাহার পর আমরা ঢাকায় যাত্রা করিব। শ্রীমতী শান্তিসুধা যদি শ্রাদ্ধ

কাঁদতে চায় তবে আনন্দ-উৎসব করিয়া যেন দুঃখী কাঙালীদিগকে খাওয়ায়। মা, শান্তি, শোক করিও না, আনন্দ করো। যত শীঘ্র পারি আমরা ঢাকা যাইতেছি।'

উৎসবশেষে গোঁসাই বৃন্দাবন ছেড়ে হরিদ্বার এল। যোগমায়ার একখানা অস্থি বৃন্দাবনে সমাহিত করা হয়েছে, আরেকখানা ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে এসে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিল। তৃতীয়খণ্ডটি গেণ্ডারিয়া আশ্রমে সমাহিত করে তার উপরে সমাধিমন্দির স্থাপিত করতে হবে।

সে বছর কুম্ভমেলা, লক্ষ-লক্ষ সাধু আর ধর্মার্থীর সমাগম হয়েছে হরিদ্বারে। ব্রহ্মকুণ্ডের কাছে এক পাণ্ডার বাড়িতে আছে গোঁসাই। সঙ্গে যোগজীবন, শ্রীধর, শ্যামাকান্ত, আরো অনেকে। হরিদ্বার আর হরিদ্বার নেই, হরিঘর হয়ে উঠেছে।

কনখলে সাধুদর্শন করছে গোঁসাই, দূর থেকে একজন বৈষ্ণব বাবাজি গোঁসাইকে লক্ষ্য করে গেয়ে উঠল :

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে
ঐ দেখ তারা দুভাই এসেছে রে।
যারা প্রেমে জগৎ ভাসাইল
যারা নামে জগৎ মাতাইল
তারা দুভাই এসেছে রে ॥

গোঁসাই উদ্দণ্ড নৃত্য করতে সুরু করল। মুহূর্তে চারদিকে ভাবের প্রবল স্রোত উদ্বারিত হল—কেউ ঐ কীর্তনে যোগ দিল, কেউ বা তুলল তারক ব্রহ্ম হরিনামের জয়ধ্বনি। নানা দেশের নানা দলের নানা সাধু—যারা সমবেত হয়েছিল—তারা বিস্ময় মানল, এমন নাচ এমন ভাব এমন দৃশ্য দেখিনি তো কোনোদিন। কে এ উজ্জ্বলন্ত পুরুষ। চলো কাছে গিয়ে দেখি। প্রাণ-মন-চক্ষু সার্থক করি। রাধাকুণ্ডবাসী বেনীমাধব পাণ্ডা কাছে গিয়ে দেখল গোঁসাইয়ের বুকে স্বর্ণাক্ষরে হরিনাম প্রস্ফুটিত।

লক্ষসাধুর মধ্যে কজন বা তত্ত্বদর্শী। গোঁসাই ঘুরে ঘুরে শুধু তিনজনকে আবিষ্কার করল। একজনকে জিগগেস করল, 'এত কঠোরতা করছে তবু সাধুদের তত্ত্বলাভ হচ্ছেনা কেন?'

সাধু হিন্দিতে বললে, 'আমি কীটানুকীট আমি কী করে বলব?'

'না, আপনি বলতে পারবেন।'

শেষকালে সাধু বললে, 'আজকাল সাধুরাও ভগবান চায়না। মান মর্যাদা মোহন্ত-গিরি চায়। আর কেবল সম্প্রদায় আর মতামত নিয়ে মাতামাতি করে। কিন্তু ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।'

একদিন নিমাই-নিতাই অদ্বৈতের কথা হচ্ছে হঠাৎ এক গুজরাটি প্রাচীন সাধু গোঁসাইকে লক্ষ্য করে বললে, 'প্রায় চারশো বছর আগে আমাদের দেশে এক বাঙালি সাধু গিয়েছিল, তার নাম কমলাক্ষ।'

'চারশো বছর আগে!' সবাই চমকে উঠল : 'আপনার তখন বয়েস কত ছিল?'

'আমার বয়েস তখন কত আর হবে! পনেরো-ষোলো।'

গোঁসাই জিগগেস করল : 'সেই সাধুর বাড়ি কোথায় ছিল?'

'বলেছিল নদীয়া শান্তিপুর। তাঁর একখানা গীতা আমার কাছে আছে।'

সেই কমলাক্ষই তো অদ্বৈত।

'কী উপায়ে এত দীর্ঘজীবন লাভ করেছেন ?'

'হঠযোগে। প্রাচীন সাধুটি উঠে দাঁড়াল। বললে, 'নির্জনে চলো, তোমাকে প্রক্রিয়া দেখিয়ে দিচ্ছি। এমন সাধু আছে যারা আমারও বয়োজ্যেষ্ঠ।'

কিন্তু শুধু দীর্ঘজীবন লাভ করলেই কি ঈশ্বর মিলবে ?

তিনটে স্কুলে-পড়া ছেলে সন্নেসী হতে এসে এক সাধুর খপ্পরে পড়েছে। বাইরের ভেক দেখে ভেবেছিল এ না জানি কত বড় মহাপুরুষ! বললে, আমরা ভগবানের জন্যে ঘর ছেড়েছি, আমাদের দীক্ষা দিন।

সাধু সানন্দে দীক্ষা দিল ও ছোকরা তিনটেকে কৌপিন পরিয়ে চাকরের কাজে লাগাল। কেউ বাসন মাজো, কেউ লাকড়ি ফাড়ো, কেউ জল টানো। কখনো বা গা-হাত-পা টেপো। খাটতে-খাটতে ছেলে তিনটে রোগা হয়ে গেল। অসুস্থতায়ও রেহাই নেই। কাজ না করলে প্রহার পড়তে লাগল। যাতে পালিয়ে না যায় তার জন্যে দলের আর-আর পাষণ্ডদের নিযুক্ত করলে। বিপন্ন ছেলেগুলো চারদিক অন্ধকার দেখল।

কেউ খবর দেয়নি, সহসা গোঁসাই একদিন সেই আশ্রমে এসে উপস্থিত হল। ছেলেগুলো যেন দুস্তর সমুদ্রে ভেলা পেল। কেঁদে পড়ল গোঁসাইয়ের কাছে। আমাদের উদ্ধার করুন।

গোঁসাই সাধুকে বললে, বাচ্চা কটাকে ছেড়ে দিন।

সাধু তেড়ে এল, ঠেসে গালাগাল দিল গোঁসাইকে। বললে, 'এ লোক মেরা চেলা হুয়া হ্যায়, মন্ত্র লিয়া হ্যায়, এ লোগোঁকো কভি নেহি ছোড়েঙ্গে।'

এই কথা ? গোঁসাই পুলিশকে খবর দিল। পুলিশ এসে উদ্ধার করল ছেলেগুলোকে। গোঁসাই বললে, 'মায়ের ছেলে মায়ের কাছে ফিরে যাও।'

আরেক দিন মেলার মধ্যে গিয়েছে একটি নেংটি-পরা পাহাড়বাসী সন্ন্যাসী গোঁসাইকে দেখতে পেয়ে দূর থেকে ছুটে এগিয়ে আসতে লাগল। ভিড়-ভাড় কিছু মানছে না, একে-ওকে ঠেলা ধাক্কা মেরে পথ করে নিচ্ছে আর মুখে উন্মত্ত চিৎকার—আজ মেরা মিলা রে মিলা। আজ আমি পেয়ে গেছি রে পেয়ে গেছি।

কি পেয়েছ ? কাকে মিলেছে ?

পাহাড়বাসী সাধু কোনো উত্তর করে না, গোঁসাইকে ঘিরে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নাচতে লাগল: মেরা মিলা রে মিলা! আজ আমি পেয়ে গেছি রে পেয়ে গেছি।

প্রদক্ষিণ করছিল, নাচছিল, হঠাৎ আর সাধুকে দেখা গেল না। হারাধন পেয়ে আবার কোথায় নিঃস্ব হয়ে হারিয়ে গেল। কেউ সন্ধান পেল না।

আরেক সাধু গোঁসাইকে দেখে টলতে-টলতে এগিয়ে আসতে-আসতে স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। কাঁদতে লাগল আকুল চোখে। গদগদ স্বরে বলল, 'সব মেরা আজ পূরণ হো গিয়া, আজ হাম ধন্য হো গিয়া। আমার সমস্ত আজ পূরণ হয়ে গিয়েছে, আমি কৃতার্থ হয়েছি।'

শ্রীধর সেই সাধুকে নমস্কার করে বললে, 'মহারাজ, আশীর্বাদ করুন।'

সাধু বললে, 'তোমাদের মহাভাগ্য, তোমরা ভগবানের সঙ্গ পেয়েছ। আর কী চাও ? সব চেয়ে যা দুর্লভ তাই পেয়ে গেছ। সব সময় পিছু থাকো। সঙ্গ কখনো ছেড়ো না। ধন্য হয়ে গেছ, কৃতকৃতার্থ হয়ে গেছ।'

এ সব সাধুরা লোকালয়ে থাকে না, পাহাড়ে জঙ্গলে সাধন ভজন করে, অথচ গোঁসাইকে দেখে এমন করছে যেন গোঁসাই সকলের কত অন্তরঙ্গ।

কুম্ভমেলা যেখানেই হোক, হরিদ্বারে কি প্রয়াগে, নাসিকে কি উজ্জয়িনীতে, এত সাধু-সমাগম হয় কেন ? শুধু স্নানের জন্যে ?

গোঁসাই বললে, 'আরো এক উদ্দেশ্য আছে। সাধুদের সাধন-ভজনে যে সমস্ত সংকট ও সংশয় দেখা দেয় তারই নিরাকরণের জন্যে এই সাধুসভা। কখনো কখনো উপযুক্ত উপদেশ বা শিক্ষা লাভের জন্যেও নানা জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা চলে। কোন অঞ্চলে কী রকম ধর্মভাব চলছে তারও খবর নেওয়া হয়। কোন অঞ্চলের ভার কোন মহাত্মার উপর দেওয়া হবে তারও সিদ্ধান্তের দায়িত্ব এই সভায়। এবার যেমন, চুরাশি ক্রোশ ব্রজমন্ডলের ভার রামদাস কাঠিয়া বাবাকে দেওয়া হয়েছে।'

'আর বাঙলা দেশের ভার ?'

গোস্বামী-প্রভু কিছু বললেন না, ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন।

২৫

হরিদ্বার থেকে গোঁসাইজি ফিরে এলেন গেণ্ডারিয়া। কোলে ছেলে, নাম দাউজি, শান্তিসুধা এসে কেঁদে পড়ল : 'বাবা, মা কই ?'

'তোমার মাকে বৃন্দাবনে রেখে এলাম।' গোঁসাইজি বললেন স্নিগ্ধকণ্ঠে, 'তিনি এলেন না, ওখানেই থেকে গেলেন। ভয় কী, আমরা একদিন সবাই যাব সেই বৃন্দাবনে।'

শান্তিসুধা ভেঙে পড়ল। গোঁসাইজি তাকে স্পর্শ করলেন। সেই স্পর্শে সমস্ত তাপদাহের নিবৃত্তি হল, শান্তিসুধা শান্তশীতল হয়ে গেল। মৃত্যু নেই সর্বত্র মধু- শোক নেই সর্বত্র সুধা।

কুলদানন্দ গোঁসাইজির কাছ থেকে ব্রহ্মচর্যের প্রথম দীক্ষা নিয়েছিল বৃন্দাবনে। এক বছরের জন্যে। বৎসর পূর্ণ হতে এসেছে গেণ্ডারিয়ায়, দ্বিতীয় বৎসরেও দীক্ষা পায় কিনা।

'শিখামাত্র অবশিষ্ট রেখে মস্তক মুণ্ডন করো।' বৃন্দাবনে থাকতে বললেন গোঁসাইজি, 'তারপর ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে এসে আমার সামনে পূর্বমুখ হয়ে আসনে বসো, আমি তোমাকে এক বছরের জন্যে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা দেব।'

যথাদিষ্ট আসনে বসে হু-হু করে কাঁদতে লাগল কুলদা। পারব কি ব্রত রাখতে ?

'নিষ্ঠাই ব্রহ্মচর্যের মূল। যে সব নিয়ম বলে দিচ্ছি গভীর নিষ্ঠায় সেগুলি রক্ষা করে চলবে। নিয়মগুলি শুনে রাখো।

ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে সাধন করবে। শৌচের পর আসনে বসে গায়ত্রী জপ করবে। তারপর গীতা অন্তত এক অধ্যায় পড়বে। পাঠান্তে আবার সাধন করবে। স্নানান্তে আবার গায়ত্রী জপ আর তর্পণ।

স্বপাকে অথবা সদব্রাহ্মণ দিয়ে রান্না করিয়ে খাবে। বেশি ঝাল অম্ল মিষ্টি মধু ও ঘি খাবেনা। আহার পরিমিত ও শুদ্ধ হবে। আর যা খাবে তাই ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করে খাবে। আহারান্তে কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম করবে। শোবেনা, ঘুমুবেনা দিনের বেলায়। বিশ্রামান্তে ভাগবত, মহাভারত বা রামায়ণাদি পড়বে। পাঠের পর নির্জনে কিছুক্ষণ ধ্যান করবে। বিকেলে, যদি ইচ্ছে করে, একটু বেড়াবে। সন্ধ্যায় আবার গায়ত্রী জপ। পরে যেমন সাধন করো তেমনি করবে। খুব ক্ষুধাবোধ হলে সামান্য জলযোগ

করবে। দুবেলা অন্নগ্রহণ করবে না। নিতান্ত সামান্য বসন পরবে। সামান্য শয্যায় শোবে। বসন আর শয্যা নির্দিষ্ট রাখবে। মাঝে মাঝে সাধুসংগ করবে, সাধুদের উপদেশ সশ্রদ্ধ হয়ে শুনবে। পরনিন্দা করবেনা, পরনিন্দা শুনবেনা। যে স্থানে পরনিন্দা হচ্ছে সে স্থান ত্যাগ করবে। কোনো সাম্প্রদায়িক ভাব রাখবে না, যে যেভাবে সাধন করছে তাকে সেইভাবে সাধন করতে উৎসাহ দেবে।

কারু মনে কষ্ট দেবে না। সকলকে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করবে। মানুষ পশু পাখি বৃক্ষলতা সকলেরই যথাসাধ্য সেবা করবে। নিজেকে অন্যের চেয়ে ছোট মনে করে অন্যকে মর্যাদা দেবে। প্রত্যেকটি কাজ বিচার করে করবে। বিচার করে করলে কোনো বিঘ্ন হবে না। সর্বদা সত্য কথা বলবে, সত্য ব্যবহার করবে। অসত্য কল্পনা মনে আসতে দেবে না। কথা কম বলবে।

যুবতী স্ত্রীলোক স্পর্শ করবে না। দেবস্থানে পথেঘাটে অজ্ঞাতে স্পর্শ হয়ে গেলে গ্রাহ্য করবে না। সর্বদা শুচিশুদ্ধ হয়ে থাকবে। পবিত্র স্থানে পবিত্র আসনে বসবে। নিজের যা কাজ তা অতি গোপনে করে যাবে। এ সব নিয়ম রক্ষা করে চলতে পারলে আগামী বছর আরো নিয়ম বলে দেব।'

দ্বিতীয় বৎসরের জন্যেও কুলদাকে ব্রহ্মচর্য দিলেন গোঁসাইজি। নিজের হাতে সাজিয়ে দিলেন নীলকণ্ঠ বেশে। 'এ বৎসরে তোমার বিশেষ নিয়ম, জিজ্ঞাসিত না হলে কথা বলবে না। জিজ্ঞাসিত হলেও প্রয়োজনবোধে উত্তর দেবে। উত্তর সংক্ষিপ্ত হবে। আর তুমিও প্রয়োজনীয় বিষয়েই কেবল জিজ্ঞাসা করবে। সর্বদা পদাঙ্গুষ্ঠের দিকে দৃষ্টি রাখবে। অন্ধকারেও তাই। তারপরে নিত্য হোম আর গায়ত্রী।'

'ব্রহ্মচর্য কি এক বছর করে নিতে হয়?'

'তার কোনো নিয়ম নেই। ব্রহ্মচর্যের মোট কাল বারো বৎসর। তবে এবারও তোমাকে এক বছরের জন্যে দিলাম। বেশিদিনের জন্যে দিতে সাহস হয় না যদি নিয়ম ভেঙে ফেল। নিয়ম ভেঙে গেলে বিষম দোষ। নিয়ম রেখে চলতে পারলে পরের বছর আবার দেব।'

ভজন কুটিরের গর্তের মধ্যে একটা সাপ এসে ঢুকেছে। গোঁসাইজি তাকে দুধ কলা খেতে দেন। মাঝে মাঝে সাপ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে গোঁসাইজির জটা বেয়ে একেবারে মাথার উপর উঠে বসে আবার নিজের থেকেই নেমে যায়। সাপ যে বিষধর তাতে সন্দেহ কী। কুঞ্জ ঘোষ একদিন একটা সুন্দর রক্তপদ্ম নিয়ে এসেছিল, দিয়েছিল গোঁসাইজিকে, গোঁসাইজি সেটিকে তার গ্রন্থের উপর রেখেছিলেন। রাত্রে বেরিয়ে সাপ সেই ফুলটিকে জড়িয়ে ধরল। দেখা গেল বিষস্পর্শে সেই রক্তপদ্ম কালো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সাপের আলিঙ্গন সত্ত্বেও গোঁসাইজির গাত্রবর্ণ যেমন উজ্জ্বল তেমনি উজ্জ্বল।

'সাপ আপনার গায়ে-মাথায় ওঠে কিন্তু আমাদের তো ধারে কাছেও আসে না। এর রহস্য কী?' একজন ভক্ত জিগগেস করল।

'নামের সঙ্গে স্বাভাবিক প্রাণায়ামের ক্রিয়া যখন চলতে থাকে তখন শরীরের মধ্যে একটা অব্যক্ত মধুর ধ্বনির সৃষ্টি হয়।' বললেন গোঁসাইজি, 'সেটা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান থেকে শোনা যায়। সে ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে সাপ মাথায় চড়ে বসে। সাপ বুঝতে পারে এ দেহে হিংসার স্থান নেই, তাই নিশ্চিন্ত হয়ে বিশুদ্ধ গান শুনতে উঠে পড়ে গায়ের উপর।'

'এ সাপ কে ?'

'একজন ফকির সাধক।' গোঁসাইজি বললেন, 'কালবশে দেহ নষ্ট হয়ে যাবার পর সর্পদেহ ধরে সাধন করছে। আমাকে বললে, মনোমত আসন পাচ্ছি না, তাই সাধনার ব্যাঘাত হচ্ছে। আপনি যদি কৃপা করে আমাকে আশ্রয় দেন আমি রক্ষা পাই। সেই থেকে ওকে থাকতে দিয়েছি ভজন কুটিরে।'

দুটো কোলাব্যাঙ আসে। গোঁসাইজির আসনের কাছাকাছি এসে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে থাকে। শত গোলমালেও নড়ে না। অব্যক্ত স্বর করে গলা ফুলিয়ে। তারপর স্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে যেন সমাধি হয়েছে। আর কুকুর কালু তো আছে চেয়ারে শুয়ে। তারই জন্যে তার নাম চেয়ারম্যান।

একটি গরু আছে আশ্রমে। দেখতে রাঙা বলে নাম ছিল 'রাঙী'। 'রাঙী' শেষে দাঁড়াল 'রানী'তে। গরু গর্ভ ধরেনি কোনোদিন অথচ প্রয়োজনমত দোহন করলেই দুধ দেয়। আরো এক আশ্চর্য গুণ, কেউ মন্দ অভিসন্ধি নিয়ে আশ্রমে ঢুকলে রানী তাকে তেড়ে যায়। সেবার একটা কীর্তনের দল এসেছে আশ্রমে, বিকৃত স্বরে সুরু করেছে কীর্তন। কারু কাছেই শ্রবকর্ণ রসায়ণ বলে লাগছেনা, তবু কীর্তন, উচ্চবাচ্য করতে পারছেনা কেউ। রানীর কাছে অসহ্য লাগল। সে সহসা দড়ি ছিঁড়ে উর্ধ্বপুচ্ছ হয়ে কীর্তনের দলকে আক্রমণ করল। দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। বন্ধ হল কীর্তন।

এ আবার কে এল আশ্রমে। রানী যে তাকে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। শিঙ বাগিয়ে চাইছে আক্রমণ করতে। কী ব্যাপার ?

লোকটা পালিয়ে যাবার পর গোঁসাইজি বললেন, 'রানীর পূর্বজন্মের স্মৃতি আছে। ঐ লোকটি পূর্বজন্মে কসাই ছিল তাই গোজন্মের সংস্কার-বশে ক্রোধে ওকে তাড়া করেছিল।'

আশ্রমে একটি আমগাছ আছে, তারই নিচে গোঁসাইজি অনেক সময় পুজো পাঠ সাধন ভজন করেন। একদিন দেখা গেল সে গাছে পিঁপড়ে জমেছে, কোত্থেকে ভ্রমরের দল শাখায়-শাখায় সুরু করেছে সুরগুঞ্জন।

কী ব্যাপার ? গাছ হতে মধু ঝরছে। হরিনাম শুনে শুনে কঠিন বৃক্ষপঞ্জর থেকেও আনন্দরস উথলে উঠেছে।

'আমগাছ থেকে যে মধুক্ষরণ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ ?' গোঁসাইজি শিষ্য ভক্তদের জিগগেস করলেন।

শিশিরবিন্দুর মতো গাছ থেকে ঝরে পড়েছে ফোঁটা ফোঁটা। যেখানে পড়ছে পিঁপড়েরা ভিড় করছে, ছুটে আসছে মৌমাছি। গাছের নিচে শুকনো ঘাস ভিজে উঠেছে। তুলসী গাছগুলোও নিষিক্ত।

'কী, মধু বলে বুঝতে পারছ ?'

আমগাছের পাতায় জিভ ঠেকাল শ্রীধর। বলল, 'সত্যিই তো, বেশ মিষ্টি।' আরেক পাতা দস্তুরমত চাটল অশ্বিনী : 'সত্যিই তো, মধু, স্পষ্ট মধু।'

কুলদা অসন্দিগ্ধ হতে চায়। গাছের দুটো পাতা সে সহসা টেনে ছিঁড়ে নিল। গোঁসাইজি শিউরে উঠলেন : 'উঃ, এ কী করলে ? ওভাবে কি পাতা ছিঁড়তে আছে ?'

ছিঁড়েছি তো ছিঁড়েছি। পাতা দুটো হাতে নিতেই দেখা গেল তাতে তরল আঠার মতন কী মাখানো আছে। কুলদা একটা পাতা লেহন করল জিভ দিয়ে। মধু, মধু,

নিদারুণ মিষ্টি। আরেকটা পাতা টুকরো করে ছিঁড়ে উপস্থিত দশ-বারো জনের মধ্যে বিলিয়ে দিল। সবাই দেখল আম পাতার মধুর স্বাদ।

'বৃন্দাবনে দেখেছি নিমগাছ থেকে মধু ঝরছে।' বললেন গোঁসাইজি, 'দেখলাম তার নিচে বসে একজন অকিঞ্চন ভক্ত ভজন করছেন।'

'সব গাছ থেকেই মধু ঝরে?'

'যে সব গাছের নিচে বহুদিন ধরে হোম যজ্ঞ সাধন ভজন তপস্যা হয়, কিংবা যে সব গাছের নিচে ভক্ত মহাত্মাদের আসন থাকে সে সব গাছ মধুবর্ষী মধুময় হয়ে যায়।' বললেন গোঁসাইজি, 'ভক্তির সঙ্গে পুজো করলে জলও মধুময় হয়। একবার শান্তিপুরে গঙ্গাজলে দেখলাম মধুপোকা—জল তুলে নিয়ে খেয়ে দেখলাম মিষ্টি। শোনোনি সেই বেদমন্ত্র—ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ। ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। মধুমান্নো বনস্পতির্ম্মধুমান অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। কী মানে? বায়ু মধু বহন করছে। সমুদ্রগুলি মধু ক্ষরণ করুক, আমাদের ওষধিগুলি মধুময় হোক। রাত্রি উষা পার্থিব ধূলি ও আকাশ মধুময় হোক। মধুময় হোক আমাদের পিতৃগণ, আমাদের সূর্য ও বনস্পতি। আমাদের ধেনুগণ মধুমতী দুগ্ধবতী হোক।'

শুধু তাই নয়, কুলদা ও অন্যান্য ভক্তরা লক্ষ্য করে দেখল, গাছের গায়ে চটা উঠে নানা জায়গায় ওঁকার ফুটেছে, কোথাও বা দেবদেবীর মূর্তির আভাস। গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রোদ অথচ গাছের তলাটি কী ঠাণ্ডা! উদয়াস্ত শীতল ছায়া বিছানো। সর্বত্র শান্তি আর স্নিগ্ধতা।

'আমার মাথাটা একবার দেখ তো।' গোঁসাইজি বললেন কুলদাকে, 'বড্ড পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে।'

প্রভুর জটা থেকে অনেক সময় উকুন ও ছারপোকা বার করেছে কুলদা—পিঁপড়ের কথা এই নতুন শুনছে। মাথায় হাত দিয়ে দেখে ভিজে চপচপ করছে। এ তো ভেজার অবস্থা নয়। তাছাড়া মাথা ভরা অদ্ভুত সুগন্ধ।

'এ কিসের গন্ধ?' অবাক হয়ে জিগগেস করল কুলদা।

'বুঝতে পাচ্ছিস না? এ পদ্মগন্ধ। এ গন্ধেই পিঁপড়ে এসেছে।'

'কিন্তু চুলের গোড়ায় এসব কী? সাদা সাদা পাতলা মোমের মতো দেখছি—'

'হ্যাঁ, মোম। জমাট হয়ে রয়েছে।'

'ঘাম জমে হয়েছে?'

প্রভু হাসলেন। বললেন, 'ঘাম জমে কি মোম হয়? ও মধু।'

'মানুষের শরীর থেকে কি মধুক্ষরণ হয়?'

'হ্যাঁ, গাছের যেমন হয় তেমনি মানুষেরও।'

শিষ্য মহাবিষ্ণু জ্যোতি গোস্বামী প্রভুকে নিয়ে গান বেঁধেছেন:

অপরূপ শ্রীগুরুরূপ হৃদয়ে সদা ভাব না রে
ভবন বন সমান হবে, শমন ভয় আর রবে না রে।
তরুণ-রবি-কিরণ দুটি চরণ পাশে পরকাশে,
ধন্য সে জন ও-চরণ (যার) হৃদি-সরসে সদা ভাসে,
কোটি জন্মের পাপ নাশে, ও রাঙা-পদ-পরশে

মজ ও পদে মন-ভৃঙ্গ রস-রঙ্গ ছাড় না রে ।
কটিতে ঝাঁপি কৌপীন বহির্বাসন শোভে সুন্দর
দণ্ড-কমণ্ডলু করে শোভে কিবা মনোহর
জিনি মদমত্ত কুঞ্জর, গমন কিবা মন্থর,
মধুর হাস মধুর ভাষ, মধুমাখা সব ব্যবহারে ॥
সুবিশাল বক্ষে শোভে সপ্ত-লহরী মাল
ঊর্ধ্ব তিলক-রেখা ভালে কিবা শোভে ভাল
মৌলী রচিত চূড়া, যেন শ্যামের মোহন চূড়া
কিংবা ফণিফণা যেন ধরে গঙ্গাধর শিরে ॥
পৃষ্ঠে দোলে বেণী—যেন ভানু রাজনন্দিনী
প্রেম-নীরে ভাসে সদা, শ্রীমুখ-কমলখানি
আনন্দময় সব, আনন্দ-রস-খনি
মগন দিবা-রজনী কিবা আনন্দ সায়রে ॥'

কুঞ্জ ঘোষের বাড়িতে রক্তবৃষ্টি হল, গোঁসাইজি তাকে কালীপুজো করতে বললেন। তোমার শাশুড়ি কালীকে ঝাঁটা মেরেছে তাই এই উৎপাত ।

বুধো শাশুড়ি বললে, 'আমি কৃষ্ণ ভজনা করি, কালী আমার কাছে আসে কেন ? তাই ঝাঁটা ছুঁড়ে মেরেছি।'

ঠিক করনি । তারই জন্যে এই রক্তবৃষ্টি ।

কালীপুজো করল কুঞ্জ । গোঁসাইজির নির্দেশে আখ আর কুমড়ো বলিদান হল । করজোড়ে দাঁড়িয়ে দেবীকে দর্শন করলেন গোঁসাইজি ।

বললেন, 'দেখলাম মা কালী নৈবেদ্যের আমটি মাথায় নিয়ে বসে আছেন । পরে দেখলাম রামচন্দ্রকে কাঁধে নিয়ে মহাবীর দাঁড়িয়ে আছেন । তারপর দেখলাম, বিষ্ণু দাঁড়িয়ে গরুড়ের স্কন্ধে । তারপর দেখি মহাদেবের উপরে কালীমূর্তি । শেষে দেখলাম, বলদেবের বুকের উপর রাধাকৃষ্ণ । মায়ের অনন্ত ভাব, কে বোঝে ?'

কে বোঝে !

গোঁসাইজি অসুখে পড়লেন । সামান্য সর্দি থেকে রোগ গিয়ে দাঁড়াল নিমোনিয়ায় । বড় ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ ঘোষকে ডাকা হল । সে বললে, দুটো ফুসফুসই ধরে গিয়েছে, বাঁচবার আশা নেই ।

ষোল দিন কেটে গেছে, জীবনদীপ প্রায় নির্বাপিত, গোঁসাইজি বললেন, 'দই খাব ।'

সর্বনাশ । ডাক্তার বললে, তাহলে এ মুহূর্তেই শেষ ।

ডাক্তারের নিষেধ শুনলেন না গোঁসাইজি । জোরজার করে দই খেলেন ।

পরের দিনেই অন্ন পথ্য ।

২৬

গেণ্ডারিয়াতে শঙ্খঘণ্টা কাঁসর বেজে উঠল । কী ব্যাপার ? নাম-ব্রহ্মের মন্দির স্থাপিত হল । যোগমায়া দেবীর সমাধি-মন্দির । যোগমায়া দেবীর দেহরক্ষার পর বৃন্দাবনেই গোঁসাইজির কাছে নিত্যানন্দ প্রভু প্রকাশিত হয়ে আদেশ করেছিলেন গেণ্ডারিয়া আশ্রমে

যোগমায়া দেবীর অস্থি সমাধিস্থ করে তার উপর মন্দির তুলে নাম-ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করো। নাম-ব্রহ্মই কলির একমাত্র দেবতা।

কী—কে নাম-ব্রহ্ম?

গোঁসাইজির চোখের সামনে আকাশপটে স্বর্ণাক্ষরে প্রস্ফুটিত হল: 'ওঁ হরি। নাম-ব্রহ্ম। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥'

যোগমায়া দেবীর পুণ্যাস্থির সমাধির উপর মন্দির উঠল। বেদীর উপর রাখা হল তাঁর ব্যবহৃত আসন ও শয্যা, শাঁখা ও সিঁদুরের কৌটো, আর তাঁর ফটো ও নাম-ব্রহ্মের পট। মহাষ্টমীর দিনে মন্দির প্রতিষ্ঠা। সারাদিন যোগযাগ ভোগ চলল, সন্ধ্যা হতেই সুরু হল কীর্তন।

'নাচে আর হরি বলে গৌর নিতাই,
আমার গৌর নিতাই, নাচে অদ্বৈত গোঁসাই,
নাচে হরিবোল, হরিবোল বলে রে
তোরা দেখবি যদি ত্বরায় আয়, দরশনের সময় যায়—
যারা জেতের বিচার নাহি করে, যারে তারে প্রেম বিতরে।
এমন দয়াল ঠাকুর আর দেখি নাই—'

কীর্তনান্তে গোঁসাইজি নিজে হরির লুট দিলেন।

'তোরা কে নিবি লুটে নে, নিতাই চাঁদের প্রেমের বাজারে।
হাটের রাজা নিত্যানন্দ, পাত্র হলেন শ্রীচৈতন্য
মুন্সিগিরি দিলেন অদ্বৈতেরে,
হরিদাস খাজাঞ্চি হয়ে লুট বিলালো নগরে॥'

কলিহত দুর্বল জীবের জন্যে সহজসাধ্য পুজো এই নাম-ব্রহ্মের পুজো। ভক্তিই এ পুজোর শ্রেষ্ঠ উপকরণ। আর কিছু নয়, দিনান্তে ভক্তিভরে একটি প্রণামই যথেষ্ট। 'হরি' এই কথাটিই শুধু হরিনাম নয়। যে নামে পাপহরণ করে তাই হরিনাম। কালী কৃষ্ণ রাম দুর্গা সবই হরিনাম। গায়ত্রীও হরিনাম। ঈশ্বরের নাম অক্ষর নয়, স্বয়ং ঈশ্বরই নাম। তিনি শক্তি, নামও শক্তি। নামস্পর্শমাত্র প্রাণে যদি প্রেম ভক্তি পবিত্রতা না জাগে বুঝবে তা ঈশ্বরের নাম নয়, কটি অক্ষরমাত্র। হরিনামে প্রেম-লাভের ক্রম কী? প্রথম পাপবোধ, দ্বিতীয় পাপকর্মে অনুতাপ, তৃতীয় পাপে অপ্রবৃত্তি, চতুর্থ কুসঙ্গে ঘৃণা, পঞ্চম সৎসঙ্গে অনুরাগ, ষষ্ঠ নামে রুচি ও গ্রাম্য কথায় অরুচি, সপ্তম ভাবোদয় আর অষ্টম প্রেম।

কী ভাবে নাম করলে নামের ফল সহজে পাওয়া যায়? তৃণের মতো নীচ হয়ে, বৃক্ষের মতো সহিষ্ণু হয়ে, নিজের অভিমান ত্যাগ করে মান্য ব্যক্তিকে মান দিয়ে—আর এই অবস্থা লাভ করতে হলে দরকার সৎসঙ্গ, ধর্মগ্রন্থপাঠ, গুরু-আজ্ঞা-পালন আর ভক্তসেবা। কাম আর প্রেমে পার্থক্য কী? কাম নষ্ট হোক একথা ঠিক নয়। কাম থাকুক, কিন্তু ত্রিগুণের অতীত হয়ে। শারীরিক গুণের সঙ্গে মিশে থাকলেই কাম আর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেই প্রেম। তখন প্রেম আত্মার অংশ, তার মানেই আত্মা।

মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রায় একমাস পর গোঁসাইজি হঠাৎ একদিন খুব ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন: 'মাকে দেখতে কাল ভোরেই আমি শান্তিপুর যাব।'

কেন, কী হল, মা কোনো খবর পাঠিয়েছেন না কী, কাউকে কিছু ভাঙলেন না। তবে বুঝি স্বর্ণময়ী মৃত্যুশয্যায় তাই গোঁসাই শেষ দেখা দেখতে ছুটেছে। কজন ভক্ত-শিষ্যও গোঁসাইজির সংগী হল।

বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে স্বর্ণময়ী যেন বিজয়েরই অপেক্ষা করছিলেন, ছেলেকে দেখে অভাবনীয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন : 'এ কী, তুই ? তুই এলি ?'

'বা, না এসে করি কী !' গোঁসাইজি মায়ের পায়ে সাষ্টাংগ প্রণাম করলেন : 'তুমি যে বিজয়, বিজয় বলে আমাকে ডাকলে ? কী, ডাকো নি ? ডাক শুনেই তো চলে এলাম। কী হয়েছে তোমার মা ?'

স্বর্ণময়ীর গায়ে প্রহারের দাগ। বললেন, 'আমাকে ওরা মেরেছে।'

ব্যাপারটা বুঝে নিতে দেরি হল না গোঁসাইজির। স্বর্ণময়ীর উন্মাদরোগ সম্প্রতি বেড়ে গিয়েছিল। যে আত্মীয়টি তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করছিল সে পাগলামি সহ্য করতে না পেরে নিদারুণ প্রহার করে বসেছিল। প্রহারের ফলে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন স্বর্ণময়ী, কিন্তু মূর্ছা যাবার আগে প্রহারের প্রথম প্রতিক্রিয়ায় তিনি অনুপস্থিত ছেলেকে পারত্রাতারূপে ডেকে উঠেছিলেন : বিজয়, বিজয়। আর শান্তিপুরের ডাক গেণ্ডারিয়ায় বসে শুনেছিলেন বিজয়কৃষ্ণ।

মাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে চলে এলেন গোঁসাই। বললে, 'আর তোমাকে কাছছাড়া করব না।'

আজ রাসযাত্রা। গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরকে আগে দর্শন করি, কেমন না জানি আজ সেজেছেন, তার মাথার চূড়ো না জানি কেমন ঝিলিক দিচ্ছে !

মন্দির-প্রাঙ্গণে এসে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে গোঁসাই শ্যামসুন্দরের দিকে তাকালেন। নয়নের নিমেষ আর পড়ল না, কাঁদতে লাগলেন অঝোরে। আমি তোমাকে মানিনি কিন্তু তুমিও আমাকে ছাড়োনি। কেবল ঘোরালে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবার নিয়ে এলে স্বস্থানে।

বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে গোঁসাইজি রাসযাত্রা দেখলেন। কত বিগ্রহ, কী বিচিত্র বেশভূষা, সাজসজ্জার কী সমারোহ ! ভগবৎবুদ্ধিতে নিজের নিজের বিগ্রহকে যারা প্রাণের সমস্ত ঐশ্বর্য দিয়ে সাজিয়েছে ভগবানের সংগে সংগে সেসব ভক্তদেরও দেখ।

গোঁসাই বললেন, 'ঢাকার জন্মাষ্টমী, বৃন্দাবনের দোল, অযোধ্যার ঝুলন আর শান্তিপুরের রাস দেখবার জিনিস। কোথাও এর তুলনা নেই। এসব উৎসবে যারা যোগ দেয় তাদের মনে অশান্তি বলে কিছু থাকে না।'

অবিশ্বাসেই অশান্তি। অবিশ্বাস কেন ? অবিশ্বাসের মূলে স্বার্থবুদ্ধি, পরনিন্দা, হিংসাদ্বেষ। এসব থেকেই নানা দুর্গতি উপস্থিত হয়। এজন্য ধার্মিকের একটি প্রধান লক্ষণ, প্রাণান্তেও পরনিন্দা করেন না। আত্মপ্রশংসা বিষতুল্য মনে করেন। হিংসা হৃদয়ে স্থান পায় না। ভগবানের কাজে অবিশ্বাস হলেই অসন্তোষ।

এক ভদ্রলোকের বাড়িতে নীলকণ্ঠের যাত্রা হচ্ছে, শিষ্য-ভক্তদের নিয়ে গোঁসাইজি সেখানে উপস্থিত হলেন। গণ্যমান্য গোস্বামীরাও এসেছেন। আসর খুব জমজমাট। কিন্তু কী হল ? নীলকণ্ঠ না কোকিলকণ্ঠ ! গান শুনে গোঁসাইজির ভাবসাগর উথলে উঠল, সমস্ত সাত্ত্বিকচিহ্ন প্রস্ফুটিত হল, তিনি আবেশে ঢলে ঢলে পড়তে লাগলেন। নীলকণ্ঠকে তখন দেখে কে, সে প্রবলতর উৎসাহে মেতে উঠল কীর্তনে। ভাবসংবরণ করতে না পেরে গোঁসাইজি লাফিয়ে উঠলেন ও উচ্চে হরিনাম তুলে উদ্দণ্ড নৃত্য করতে

লাগলেন। যাত্রা ফেলে নীলকণ্ঠ তখন গোঁসাইজিকে আরতি সুরু করল। দেখতে দেখতে শিষ্যভক্তদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল ভাবস্রোত।

যাত্রার মধ্যে এসব কী অবান্তর প্রসঙ্গ। গোস্বামী বিরক্ত হয়ে বললে, 'এসব কী অযথা গোলমাল। এসব বন্ধ করে দাও।'

নীলকণ্ঠকেই উদ্দেশ করে বলছে। তোমার ওসব আরতির গান তো পালার বাইরে।

'আমার খুশি মতো আমি গাইব।' নীলকণ্ঠ কঠিন হল: 'আমার মধ্যে যদি এখন আরতির ভাব এসে থাকে আমি ভক্ত মহাপুরুষের আরতিই করব।'

'কিন্তু তোমার ঐ ভক্ত মহাপুরুষের যাত্রায় কোনো পার্ট আছে?'

'নেই, তাই যাত্রা বন্ধ।' নীলকণ্ঠ রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'যেখানে মহাভাবের আদর নেই, ভক্ত মহাপুরুষকে যেখানে মর্যাদা দেওয়া হয় না সেখানে আমি গান করি না।'

গান বন্ধ করে দিল নীলকণ্ঠ।

কীর্তন করতে করতে রাস্তা দিয়ে চলেছেন গোঁসাইজি। ভাবাবেশে নৃত্য করতে করতে পড়ে গিয়েছেন মাটিতে। উদ্ধত কতগুলো যুবক তাই দেখে বিদ্রূপ করে উঠল। বলল, সমস্ত ঢং, ভণ্ডামি।

দাঁড়াও, ভাব বার করছি। রাস্তার পাশেই একটা কামারশালা ছিল, সেখানে ঢুকে তারা একটা লোহার শলাকে আগুনে পুড়িয়ে আনল। চারপাশে শিষ্য-ভক্তদের ভিড়, মাঝখানে মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছেন গোঁসাইজি, একটা ছোকরা সেই তপ্ত লোহার শলা তাঁর গায়ে চেপে ধরল। দেখি কেমন ভাব! দেখি ভাব এবার তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে কিনা।

না, প্রভু যেমন স্থির হয়ে পড়েছিলেন তেমনি স্থির হয়ে রইলেন। যেমন করছিল, ভক্তদল হরিধ্বনি করতে লাগল। এ কী ভয়াবহ ব্যাপার! গোঁসাইজি নড়লেন না, তাঁর গায়ে তপ্ত লোহার দাগ পর্যন্ত পড়ল না। এমন কী দেহে আগুনের দাহিকাশক্তি লোপ পেয়ে গেল। ছোকরারা একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল। ওরাও লাগল হরিনাম করতে। বুঝল যিনি আগুনে দগ্ধ হন না, যাঁর স্পর্শে আগুন পর্যন্ত শীতল হয়, তিনি নরদেহে ভগবান ছাড়া আর কী!

সেদিন গোঁসাইজি বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূরে চলে এসেছেন। জায়গাটা নির্জন, শুধু একটি জীর্ণকুটির দাঁড়িয়ে আছে।

গোঁসাইজি বললেন, 'সেই বাবাজিটি আর নেই।'

'কার কথা বলছেন?'

'এখানে আগে একজন ভজনানন্দী বৈষ্ণব বাবাজি থাকতেন, আমি তাঁকে মাঝে মাঝে শ্যামসুন্দরের প্রসাদ এনে দিতাম। আনন্দ করে খেতেন আমার হাত থেকে।'

'সে কত দিনের কথা?'

'অনেকদিন। আমার ছেলেবেলা।' গোঁসাইজি একটু হাসলেন: 'আমার বয়স তখন ন বছর।'

'আপনার সঙ্গে আলাপ হল কী করে?'

'বলি সে কথা।' গোঁসাইজি বলতে লাগলেন: 'আমাদের বাড়িতে সেদিন কী এক সমারোহের ব্যাপার, বাবাজিও এসেছেন প্রসাদ নিতে। কিন্তু তিনি বাড়ির মধ্যে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে না বসে বসেছেন বাইরে, দোরগোড়ায়। তিনি খাবার চাইলেন—একবার

নয়, দু-তিন বার। তাঁকে বলা হল, অপেক্ষা করুন, ব্রাহ্মণদের আগে হয়ে যাক, পরে আপনাকে দেয়া হবে।'

'পরে কেন ?'

'আর বোলোনা, বাবাজি ছিলেন অব্রাহ্মণ, হীনজাতি।'

'হীনজাতি! বৈষ্ণবে আবার জাতি কী!'

'সেই তো কথা।' বিজয়কৃষ্ণ উদ্দীপ্ত স্বরে বললেন, 'সেদিনের সেই ন' বছরের বালকের কণ্ঠে সেই প্রতিবাদই তো মুখর হয়ে উঠল। আমি বললাম, একজন বৈষ্ণব ক্ষুধার্ত হয়ে খাবার চাচ্ছেন—প্রচুর খাবার তো রয়েছে, দিয়ে দিলেই হয়—তার মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ-শূদ্র কী! ক্ষুধার কাছে আবার জাত কিসের।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কী! আমি নিজেই উদ্যোগী হয়ে এগুলাম। বাবাজি বসুন, আমি দিচ্ছি আপনাকে। কিন্তু কোথায় বাবাজি! খাবার নিয়ে এসে দেখি বাবাজি নেই, ওই চলে যাচ্ছেন। খাবার রেখে ছুটলাম তার পিছনে, ধরে ফেললাম। কত সাধ্যসাধনা করলাম, কিছুতেই ফিরলেন না। বললেন, কুটিরে ফিরে যাচ্ছি, গোপালজি যদি আজ না খাইয়ে রাখেন, না খেয়েই থাকব।'

'চমৎকার!'

'আমি কায়দা করে বাবাজির ঠিকানাটি যোগাড় করে নিয়েছিলাম, খাবার নিয়ে বাবাজির সেই কুটিরে এসে হাজির হলাম। বললাম, বাবাজি আপনার প্রসাদ।'

বালকবয়সেই কী দয়া, কেমন পরসেবা বৈষ্ণবসেবায় তৎপর! সেই দয়ার শরীরের আশ্রয়-পাওয়া ভক্ত-শিষ্যের দল মুগ্ধকণ্ঠে বলে উঠল: 'অপূর্ব'।'

'তারপর যদ্দিন বাড়িতে ছিলাম খিদে পেলেই আমার বাবাজির কথা মনে হত। শ্যামসুন্দরের প্রসাদ চেয়ে এনে বাবাজিকে দিয়ে যেতাম!'

পথের দিকে তাকিয়ে ভক্ত-শিষ্যরা বললে, 'বলেন কী, এ তো প্রায় দেড় মাইল রাস্তা—'

'তা হোক।' দয়াভরা উদার চোখে বিজয়কৃষ্ণ বললেন, 'কিন্তু বাবাজিকে না খাওয়ালে আহারে আমার রুচি হত না। কিন্তু আজ কোথায় সেই বাবাজি!'

একদিন একটি আকুল অন্তরিক আর্তি প্রকাশ করেছিলেন বাবাজি, তাইতেই সে নিত্য প্রসাদ ভোজনের অধিকারী হল। প্রসাদ ভোজন প্রকাণ্ড ভাগ্যের কথা। কিন্তু রান্না করে অন্ন ঠাকুরের কাছে ধরে দিলেই তা প্রসাদ হয় না। এমনও হতে পারে ঐ অন্নে ঠাকুরের প্রবৃত্তি হল না। গ্রহণ করলেন না তিনি। তাহলে আর প্রসাদ হল কী করে। ঠাকুরই যদি প্রসন্ন না হন তাহলে সে অন্ন প্রসাদ না হয়ে প্রমাদ হয়ে ওঠে।

শ্যামাক্ষেপা গন্ধ শুঁকে ঠিক বলে দিতে পারত রান্নার কোথায় কোন রাঁধুনির কী অনাচার ঘটেছে। খোঁজ নিয়ে দেখা যেত অভিযোগ অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কী, ঠিক বলেছি তো ? তাই ঠাকুর আজ এ অন্ন সেবা করেন নি, অনাহারে রয়েছেন। তখন আবার নতুন করে শুদ্ধমত রান্না করো।

একদিন সকলে মিলে বাবলায় গেলেন, অদ্বৈত প্রভুর মন্দিরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বসলেন প্রাঙ্গণে।

'স্থির হয়ে বসে নাম করো।' বললেন বিজয়কৃষ্ণ, 'তাহলেই বুঝবে স্থানমাহাত্ম্য।'

স্থির হয়ে বসে সকলে নাম করতে লাগল। কতক্ষণ পরে শুনতে পেল দূরে থেকে এক সংকীর্তনের দল এদিকে এগিয়ে আসছে, খোল করতালের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। গোঁসাইজি এখানে এসেছেন জেনেই হয়তো এই আয়োজন। এগিয়ে আসছে ক্রমশ। বাদ্যধ্বনি স্পষ্টতর হচ্ছে।

চলো আমরাও গিয়ে কীর্তনে যোগ দিই। আবাহন করে নিয়ে আসি।

গোঁসাইজিকে একা রেখে আর সকলে এগিয়ে গেল। কিন্তু এ কী আশ্চর্য, যতই তারা গোঁসাইয়ের থেকে দূরে যাচ্ছে ততই কীর্তনের ধ্বনি মৃদু হয়ে আসছে। কোন দূর পথে পাড়ি জমাল কীর্তনের দল? আরো কিছু দূর এগুলো ভক্তশিষ্যরা—এ কী, আর শব্দ নেই। সমস্ত বাদ্যধ্বনি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

ফিরে এসে তারা চুপচাপ বসল গোঁসাইয়ের পাশে। বললে সব গোঁসাইকে। গোঁসাইজি বললেন, 'বোসো স্থির হয়ে। নাম করো। স্থির হয়ে বসে নাম করলেই সংকীর্তনে ভাল করে যোগ দিতে পারতে। এ সাধারণ কীর্তন নয়, মহাপ্রভুর কীর্তন।'

সকলে অবাক হয়ে গেল।

'ছেলেবেলায় বাবলায় এসে আমিও অমনি কীর্তন শুনতাম।' বললেন গোঁসাই, 'আর কোথায় কীর্তন, কোনদিকে, এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতাম। এ কীর্তন যে কিভাবে শোনা যায় তখনো আমার কাছে ব্যক্ত হয়নি। সঙ্গ ধরে থাকো, স্থির হও আর নাম করো, তবেই এ অপ্রাকৃত কীর্তন শুনতে পাবে।'

কী কুবুদ্ধি হয়েছিল দূরে সরে গিয়েছিল তাদের গোঁসাইজিকে ফেলে। তাঁর কৃপাশক্তিতে একবার শোনা গিয়েছিল কীর্তন, তাঁর কৃপাশক্তিতে কতবার আবার শোনা যাবে।

শান্তিপুর থেকে কলকাতা ফিরলেন গোঁসাই। মসজিদবাড়ি স্ট্রিটে একটা বাড়িতে এসে উঠলেন। দর্শনার্থীর ভিড়ে ভরে গেল ঘরদোর।

স্যালভেশান-আর্মি বা মুক্তিফৌজ নিয়ে একখানা বই লিখেছে শ্রীচরণ চক্রবর্তী, ব্রাহ্মসমাজের প্রাক্তন সহকারী সম্পাদক, বর্তমানে গোঁসাইজির শিষ্য। এই ফৌজের অধ্যক্ষ জেনারেল বুল। এদের কাজ কী? দুঃস্থ-দুর্গতের সেবা। এরা কাঙালে বেশে ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। রাস্তার নিরাশ্রয় অন্ধ খঞ্জ রুগ্ন আতুর পরিত্যক্তদের তুলে নিয়ে আসে, স্বাস্থ্যকর বাসস্থানে রেখে সযত্নে শুশ্রূষা করে। শুধু সেবা আর চিকিৎসাই দেয় না, ভালোবাসাও দেয়।

স্বার্থহীন ভালোবাসার কথা শুনে গোঁসাইজি কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'পরদুঃখে যাদের প্রাণ কাঁদে তাঁরা সাকার তীর্থ। তাঁদের দর্শনেও লোকে পবিত্র হয়। চলো তাঁদের দেখে আসি।'

কালবিলম্ব নয়, দুপুরবেলাতেই মুক্তিফৌজের আস্তানায় গিয়ে হাজির হলেন। তীর্থদর্শনের-সুযোগ কে উপেক্ষা করবে? ঐখানে যে ভগবান প্রকাশিত—দয়ারূপে, সেবারূপে, অহেতুক পরহিতরূপে। চলো যাই চিত্তের প্রসাদ নিবেদন, পরম প্রণামটি রেখে আসি।

ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন এসেছে। বিজয়কৃষ্ণ তাঁকে উদার বন্ধুতায় সম্বর্ধনা করলেন। 'আসুন, আসুন, কী মনে করে?'

বিদ্যারত্ন গম্ভীর স্বরে বললে, 'আপনাকে আমার নির্জনে কিছু বলবার আছে।'

'বেশ তো বলুন।'

ঘরে যারা উপস্থিত ছিল বারান্দায় চলে গেল।

নির্জন দেখে বিদ্যারত্ন বললে, 'গঙ্গোত্রী গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে কিছুদিন ছিলাম হিমালয়ের উপরে। ব্যাসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি আপনার কাছ থেকে আমাকে গৈরিক বস্ত্র নিতে বললেন। বললেন যেন বাকি জীবন আপনার উপদেশ মতো চলি। দয়া করে আমাকে গৈরিক বস্ত্র দিন।'

গোঁসাইজি তাঁর একখানা বহির্বাস বিদ্যারত্নকে দিলেন।

'আর উপদেশ?'

'এই গৈরিক বস্ত্রই মূর্তিমন্ত উপদেশ।' বললেন গোঁসাইজি, 'সত্যকে লক্ষ্য রেখে সরল ভাবে চলাই গৈরিকবস্ত্র।'

বেশ শীত পড়েছে। ঠাণ্ডা ঘরে আসনে একটানা বসে থাকার দরুনই হয়তো গোঁসাইয়ের পায়ে বাত ধরেছে। বৃন্দাবন একটা উলের ট্রাউজার কিনে এনে গোঁসাইকে বললে, 'এটা পরুন, আরাম পাবেন।'

গোঁসাই রাজি হননা পরতে।

বৃন্দাবন পিড়াপিড়ি করতে লাগল। 'আপনার জন্যে কিনে আনলাম আর আপনি একটুও গায়ে ঠেকাবেন না?'

আচ্ছা দাও। গোঁসাইজি পরলেন ট্রাউজার। পাঁচ সাত মিনিট গায়ে রেখে ফিরিয়ে দিলেন বৃন্দাবনকে। বললেন, 'তুমি পরো, তুমি পরলেই আমার পরা হবে।'

কোথায় ট্রাউজার মাথায় বেঁধে রাখবে, তা নয়, পা ঢুকিয়ে দিয়ে কোমরে আঁটল বৃন্দাবন। পরমুহূর্তেই কাঁপতে লাগল। এ কী, সমস্ত শরীরে যে আমার বিদ্যুৎ-তরঙ্গের শিহরণ হচ্ছে। তাকাল গোঁসাইয়ের দিকে। এ কী, অচেতন বস্তুতেও বিদ্যুৎ-শিহরণ! তাড়াতাড়ি ট্রাউজার ছেড়ে ফেলল বৃন্দাবন।

নগেন চাটুজ্জের স্ত্রী মাতঙ্গিনীকে গোঁসাই 'আনন্দময়ী' বলেন, 'মা আনন্দময়ী'। গোঁসাইয়ের আহারান্তে রাত্রে একদিন এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, এস তোমাকে গান শোনাই। তানপুরা বাজিয়ে গান শোনাতে বসলেন মাতঙ্গিনী। আর সে কী গান! সে তো গান নয় অমৃতনির্ঝর। যে শুনল সেই কাঁদল, ভাবে বিভোর হয়ে গেল, রাত ভোর হয়ে গেলেও কেউ ঘুমুতে গেল না। আর গোঁসাই মাঝে মাঝে ভাবাবেশে হুঙ্কার ছাড়তে লাগলেন। তাঁর শব্দের সেই শক্তি সকলকে ভাবোদ্দীপ্ত করতে লাগল। সে বুঝি গানের চেয়েও শক্তিশালী।

সত্য কীভাবে লাভ হয়!

'গণ্ডির মধ্যে থাকলে জীবনে সত্য লাভ হবেনা।' বললেন বিজয়কৃষ্ণ, 'সত্য অনন্ত, সত্যের ভাব অনন্ত, সত্যের রূপ অনন্ত। সর্বসংস্কার বর্জিত হলেই সত্যে সন্ধিৎসু হওয়া চলে।'

আর ব্রহ্মচর্য কী।

'আনুগত্যই ব্রহ্মচর্য।'

বিজয়কৃষ্ণ কালীঘাটে গেলেন। কালীকে মালা-ডালি দিয়ে মা, মা, বলে কাঁদতে লাগলেন! তাঁর কান্না দেখে কেউ চাপতে পারলনা চোখের জল।

'মার কত দয়া! সকলকেই মা দয়া করছেন।' বললেন বিজয়কৃষ্ণ, 'আমার মায়ের দয়ার তল নেই সীমা নেই। মা, মা,—'

'এস বাবা, এস, আমার জন্ম আজ সার্থক হল।' এক বৃদ্ধা কাঙালিনী ঠাকুরের পায়ের কাছে বসে পড়ল, একটি পয়সা দিতে হাত বাড়াল, বললে, 'আমার কাছে এই একটিমাত্র পয়সা আছে, এটি তুমি নাও।'

বিজয়কৃষ্ণ পয়সাটি হাতে নিয়ে মাথায় রাখলেন, মহেন্দ্রকে দিয়ে বললেন, 'এটি রাখুন। কারু অযাচিত দান অগ্রাহ্য করতে নেই।'

নমস্কার করে কোথায় কোন পথে চলে গেল ভিখারিনী কেউ জানল না।

'উনি কে?' শিষ্য জিগগেস করল।

'মায়ের সঙ্গিনী। মা-ই পাঠিয়ে দিয়েছেন অভ্যর্থনার জন্যে।'

মসজিদবাড়ি স্ট্রিটের বাসা ছেড়ে শ্যামবাজারের তে-মাথার উপর একটা তেতলা বাড়ির উপর তলায় উঠে এলেন গোঁসাই।

রামকুমার বিদ্যারত্ন এসে বললে, 'কালীকৃষ্ণ ঠাকুর আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'আমার সঙ্গে। কেন?'

'জানেন তো উনি প্রতি মাসে হাজার হাজার টাকা দান করেন—'

'আমাকেও কিছু দিতে চান বুঝি?'

'হ্যাঁ, লক্ষ টাকা।'

'বলো কী!' প্রভুর দু-চোখে জল এসে গেল।

'হ্যাঁ, তিনি আপনার সমস্ত খবর রাখেন।' রামকুমার বললে, 'আপনার উপর তাঁর অটল শ্রদ্ধা। যদি একবার আপনি ওঁর বাড়ি গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করেন তাহলেই ঐ টাকাটা আপনাকে উনি অর্পণ করেন! আমাকে তাই বলে দিলেন অনেক করে।'

গোঁসাই হাত জোড় করে ভগবানকে প্রণাম করলেন। অশ্রুসজল কণ্ঠে বললেন, 'ঠাকুরমশাইকে বলবেন, আমার এখানে যা যথার্থ প্রয়োজন ভগবান তা কড়ায় গণ্ডায় হিসেব করে প্রত্যহ পাঠিয়ে দেন। একটি কানাকড়িরও অভাব রাখেন না। ভগবানের নাম নিয়ে তাঁর দ্বারে দীনহীন কাঙাল হয়ে যেন পড়ে থাকতে পারি তাঁকে এই আশীর্বাদ করতে বলবেন—'

রামকুমার অভিভূতের মতো তাকিয়ে রইল।

নবীন ঘোষ সরকারী ডাক্তার। চাকরিতে থাকলে যথাবিহিত ধর্ম করা যাবে না এই আশঙ্কায় চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন, গোঁসাইজির কাছে দীক্ষা নিয়ে পরমবৈষ্ণব হয়ে গিয়েছেন, এখন তাঁর দিন-রাত মানেই একটানা সাধন-ভজন। নিয়মিত আহ্নিক সেরে অবসরক্ষণটি বেছে নিয়ে রোজ তিনি চন্দন তুলসী হাতে গোঁসাইয়ের কাছে আসেন ও পুজো করেন। বলেন, আপনি আমার ইষ্ট, আমার পুরুষোত্তম।

প্রথম দিন যখন আসেন, চন্দন তুলসী গোঁসাইয়ের পায়ে দিতে চেয়েছিলেন। গোঁসাই বললেন, 'না, তুলসী পায়ে দেবেন না, আমার মাথায় দিন।'

যথাদিষ্ট তুলসী দিতেই মুহূর্তমধ্যে গোঁসাইজি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

এই বিজয়কৃষ্ণই তো একদিন ব্রাহ্মভক্তদের পায়ের ধুলো দিতেন বলে কেশবচন্দ্রের প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু আজ? আজ তো তিনিই ইষ্টের আসনে বসে পুজো নিচ্ছেন। কোনো কোনো ব্রাহ্ম হয়তো টিপ্পনি কাটল।

হ্যাঁ, তিনি তো আজ ব্রাহ্মনিয়মে অনুশাসিত নন, তিনি আজ সনাতন হিন্দুধর্মের সম্পূজিত গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। তিনিই আজ গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। অক্ষর পরমব্রহ্ম।

'এ কী, নোংরা কাপড়ে ঠাকুরকে খাবার দিচ্ছেন?' গুরুভাই বৃন্দাবন রাত্রিবাস কাপড়ে গোঁসাইকে খাবার দিতে যাচ্ছে দেখে নবীন ঘোষ তিরস্কার করে উঠলেন। বৃন্দাবন থমকে গেল। খাবার দিল না গোঁসাইকে।

পরে বৃন্দাবন জিগগেস করল গোঁসাইকে, 'এটা কি ডাক্তারবাবু ঠিক করলেন?'

সব শুনে গোঁসাইজি বললেন, 'তার ভাবের দিক থেকে তিনি ঠিকই করেছেন। তুমি তোমার ভাবমত কাজ করলেনা কেন? তুমি তো ঠকে গেলে।'

'কি জানি। শেষে আপনি যদি না খান!'

'আমি না খেলেও তুমি ছাড়বে কেন?' করুণাসুন্দর চোখে গোঁসাইজি হাসলেন: 'তুমি আমার মুখ টিপে জোর করে খাইয়ে দেবে। তোমার ভালোবাসার কাছে কিসের শুচি-অশুচি?'

ভালোবাসাই তো নিয়ম ভুলিয়ে দেয়। আচারের বিচার করতে দেয় না।

একটি নামহীন গরিব ভক্ত দু-আনামাত্র জোগাড় করেছে। ইচ্ছে হয়েছে গোঁসাইজিকে কিছু খাবার খাওয়াবে। কিন্তু দু আনায় কী কিনবে কিছু ঠাহর করতে পারছে না। এ-দোকান ও-দোকান ঘুরছে তবু কিছুই মনোমত হচ্ছে না। হয় মনে হচ্ছে নিতান্ত বাজে, নয়তো নিতান্ত তুচ্ছ। এ কি কখনো দেয়া যায়, কিংবা এই এতটুকু? সকাল সাতটা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত ঘুরছে পথে পথে, দোকানে-দোকানে, তবু সুরাহা নেই। আর, এমন আশ্চর্য, সংকল্পও ত্যাগ করতে পারছে না। শেষকালে, যা থাকে অদৃষ্টে, দু আনার খাবার দিন তো, বলে দাঁড়াল শেষ দোকানীর দুয়ারে। কী দোকানী দিল চেয়েও দেখল না, ঠোঙাটি হাতে করে গোঁসাইজির বাসার সিঁড়ির নিচে দাঁড়াল কুণ্ঠিত হয়ে। সমস্ত মুখে সন্দেহ আর ভয়, এই ক্ষীণ উপচার প্রভু নেবেন কিনা।

অকস্মাৎ তেতলার ঘরে গোঁসাইজি তাঁর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন ভক্তের কাছে। 'ওগো আমার জন্যে কী এনেছ! কী এনেছ!' মুখে এই গদগদ ভাষ: 'ওগো শিগগির আনো, শিগগির। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

ভক্তের হাত থেকে নিজেই ঠোঙাটি তুলে নিলেন। খেতে লাগলেন তৃপ্ত মুখে। চোখ ছলছল করে উঠল। দেখল ভক্তও অবিরল কাঁদছে। খাবারের প্রায় সবটাই খেয়ে বাকিটা ভক্তকে খেতে দিলেন। বললেন, 'চমৎকার খাবার। চমৎকার খাবার।' বলে ভক্তের চোখের জল মুছে দিলেন স্বহস্তে।

নির্ধারিত সময়ে গোঁসাইয়ের আহার। কিন্তু ভক্তের অনুরাগ তাঁকে যেন নিয়মে ধরে রাখতে পারল না, করুণাধারায় নিম্নে টেনে নিয়ে গেল।

'কিন্তু ওরা যে আমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে ছাড়বে দেখছি।' একদিন মগ্নাবস্থায় বললেন গোঁসাইজি।

'কারা তাড়াবে?'

'নবীনবাবুরা।'

'কেন আমরা কী করলাম!' নবীনবাবু ধরে পড়লেন।

'এত অঢেল খরচ করছ! দিনরাত এত ভক্ত সমাগম, পঞ্চাশ-ষাট জন তো এখানেই রয়েছে, সকলের খাওয়াবার ভার নিয়েছ।' গোঁসাইজি কাতরস্বরে বললেন, 'আর কিছুদিন আমি এখানে থাকলে তোমরা যে একেবারে রাস্তায় দাঁড়াবে।'

'টাকা বুঝি আমাদের!' বললেন নবীন ঘোষ, 'সব আপনার টাকা। আপনার টাকা আপনারই প্রয়োজনে লাগছে। আমরা তো শুধু হাতে করতে পেয়ে ধন্য হচ্ছি। আপনি থাকতে কে আমাদের রাস্তায় দাঁড় করায়।'

শ্যামবাজারের বাসায় পাগলী মা স্বর্ণময়ী এসে হাজির।

এসেই প্রথমে রান্নাঘরে ঢুকলেন। ভক্ত মেয়েরা রান্না করছিল, তাদের লক্ষ্য করে হুংকার করে উঠলেন: 'তোরা কে? তোরা এখানে কেন! গোঁসাই বাড়ির রান্নাঘরে শুদ্দুর! তোরা তো এঁটো মুক্ত করবি আর বাসন মাজবি। তোরা রান্নার কী জানিস! যদ্দিন বিজয়ের একটা বিয়ে না দেব আমি নিজেই রান্না করব। তোরা দূর হ।'

সকলকে তাড়িয়ে দিলেন স্বর্ণময়ী। ফেলে দিলেন সব কুটনো-বাটনা। নিজেই খোসাশুদ্ধ তরকারী কুটলেন, রাখলেন সব আধসেদ্ধ করে। আধোয়া চাল ফুটিয়ে পিণ্ড পাকালেন। ডাল আর জল আলাদা হয়ে রইল।

বিজয়কে খেতে দিয়ে স্বর্ণময়ী জিগগেস করলেন, 'বল দিকিনি কেমন রেঁধেছি।'

হাসিমুখে গোঁসাই বললেন, 'ঠিক যেন জগন্নাথের ভোগ! কিন্তু' আশ্রমবাসীদের লক্ষ্য করলেন, 'ওরা সব কেমন খাচ্ছে?'

'ওরা সব পাতে ফেলে রেখেছে।' ঝামটা দিয়ে উঠলেন স্বর্ণময়ী: 'ওরা খাবে কী! ওদের কী ভক্তি আছে? আমরা হলুম শান্তিপুরের গোঁসাই, আমাদের হাতে দেবতারা খায়! আমরা তেল-ঘিও দিই না বাটনা-কুটনোরও ধার ধারিনা—যা সাদা জলে সেদ্ধ করে দি, তারই কত স্বাদ!'

'জগন্নাথের রান্না তো সাদা জলেই হয়।'

রান্নাবান্না ভাঁড়ারের ভার নিয়ে স্বর্ণময়ী বিপর্যয় কাণ্ড শুরু করলেন। একদিনের জিনিস অন্য দিনের জন্য রাখবেন না কিছুতেই, সেদিনই সব খরচ করে ফেলবেন। যা কিছু উদ্বৃত্ত চাল ডাল তরকারী থাকবে সব নতুন করে রান্না করে কাঙাল দুঃখীদের ডেকে এনে খাওয়াবেন। আশ্রমে কিছুই সঞ্চিত হতে দেবেন না।

'সবারই তো খাওয়া হয়ে গিয়েছে, আবার কেন রান্না করলেন?' কেউ হয়তো বাধা দিতে চাইল।

স্বর্ণময়ী মুখিয়ে উঠলেন: 'তোরা কি মানুষ না পশু? ভগবান একমুঠো দয়া করে দিলে তার থেকে একগ্রাস অন্যকেও দিতে হয়। ভগবানের দান যার প্রয়োজন তারই জন্যে, সকলের জন্যে, পুঁজি করবার জন্যে নয়।'

'কিন্তু একটু হিসেব করে না চললে চলবে কী করে', শেষ পর্যন্ত বৃন্দাবন এল শাসন করতে।

স্বর্ণময়ী বললেন, 'দেখ আমরা গোঁসাই বাড়ির বউ, আজকের যা এল তো হল, কালকে—কালকে গোবিন্দ আছেন।'

গোঁসাইয়ের জন্যে এক সের দুধ বরাদ্দ করা আছে। সেই দুধই স্বর্ণময়ী সকলকে এক হাতা করে বিতরণ করেন। বিজয়ের জন্যেও এক হাতা।

বাসার ঝি কাজ সেরে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাচ্ছে, স্বর্ণময়ী তাকে আটকালেন। জিগগেস করলেন, 'এত শিগগির পালাচ্ছিস যে?'

'মা, ছেলেটার বড্ড অসুখ, তার জন্যে একটু দুধ যোগাড় করতে হবে! তাই একটু সকাল-সকাল বেরুচ্ছি দেখি পাই কিনা।'

'আচ্ছা, দাঁড়া।' স্বর্ণময়ী টের পেয়েছেন কে একজন লুকিয়ে বিজয়ের জন্যে বাড়তি দুধ জোগাড় করেছে, সেই বাড়তি দুধের সমস্তটাই ঝিয়ের হাতে তুলে দিলেন। বললেন, 'এই নিয়ে যা। কোথায় খুঁজে মরবি, পাস কি না পাস তা কে জানে।'

'এ তুমি কী করলে।' একটি ভক্ত মেয়ে আপত্তি করল: 'দুধ না পেলে তোমার ছেলের যে কষ্ট হয়, তা তুমি জানো না?'

'সব জানি।' রুখে উঠলেন স্বর্ণময়ী। 'অসুখ হলে ঝিয়ের ছেলের কষ্ট হয় না? বিজয়ের তো তবু তোরা দশজন আছিস, দরকার হলে দশদিকে ছুটোছুটি করবি. কিন্তু ঝিয়ের ছেলের কে আছে, কে তার জন্যে করতে যাবে?'

ভক্ত মেয়েও ছাড়ে না, স্বর্ণময়ীও গলা চড়ান। শেষে এসে ছেলেকেই সালিশ মানলেন। জিগগেস করলেন, 'বিজয়, তোর সঙ্গে সর্বদা থেকেও এদের এমন বুদ্ধি হল কেন? ওদের কি দয়ামায়া বলতে কিছুই থাকতে নেই?'

গোঁসাইয়ের দুচোখ জলে ভরে উঠল। বললেন, 'আমার মায়ের মতো এত দয়া আর কারুতে দেখলাম না।'

কিন্তু কলকাতায় থাকবার দিন সংক্ষিপ্ত হয়ে এল। খবর এল যোগজীবনের স্ত্রী বসন্তকুমারী কঠিন জ্বরবিকারে ভুগছে। খবর শুনেই ছেলেকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিলেন গোঁসাই। বললেন, 'যা, স্ত্রীর সেবা কর গে। চিকিৎসার কোনো ত্রুটি রাখিসনে। চিকিৎসাতেই দৈহিক ভোগের প্রায়শ্চিত্ত হবে। যা, আমিও শিগগির যাচ্ছি।'

ক দিন পরে গোঁসাইজিও যাত্রা করলেন। গোয়ালন্দে স্টিমারে উঠে গোঁসাই বললেন, 'গঙ্গার প্রবলতর ধারাটিই পদ্মা। ওর হাওয়ায় শরীরের জড়তা দূর হয়ে যায়, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সতেজ হয়ে ওঠে। জলের অশেষ গুণ। পদ্মার বিস্তৃতি দেখলে চিত্তে আপনিই প্রশান্তি জাগে।'

ডেকে আসন করে বসেছেন গোঁসাই, ধ্যানের গাঢ়তায় ঢলে ঢলে পড়ছেন। একটা সাহেব দূর থেকে দেখতে পেয়ে ভেবেছে বুঝি মাতালের কাণ্ড। কাছে এসে রসিকতা করে জিজ্ঞেস করছে, 'ক্যা জী, দারু পি... কেৎনা পিয়া?'

'হাঁ সাব, দারু পিয়া, বহুত পিয়া।'

'ক্যায়সা দারু পিয়া?'

গোঁসাইজি হাসিমুখে বললেন, 'তুমহারা যীশুখৃস্ট যো দারু পিতে থে হামতো আভি ওহি দারু পিয়া।'

সাহেব হকচকিয়ে গেল। টুপি তুলে গোঁসাইকে সেলাম ঠুকে স্বস্থানে প্রস্থান করল।

গেণ্ডারিয়ার আশ্রমে পে'ছে দেখলেন বসন্তকুমারীর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

বসন্তকুমারী জিগগেস করল, 'বাবা, আর কত দুঃখ দেবে ?'

'মা, তোমার ক্লেশের অবসান হল বলে।' গোঁসাইজি আশ্বাস দিলেন।

'এ কষ্ট আর তো দেখা যায় না!' স্বয়ং ডাক্তারই অনুনয় করল গোঁসাইকে, 'তিনদিন যাবৎ শ্বাস চলছে, এখন যবনিকাপাত হয়ে গেলেই পারে।'

'হবে। একটু শুধু বাকি আছে। বুড়োঠাকরুন মাঝে মাঝে বউমাকে গালিগালাজ করতেন তারই জন্যে বুড়োঠাকরুনের উপর বউমার এখনো একটু বিরক্তি ভাব আছে. সেটুকু কেটে গেলেই আর বাধা থাকবে না।'

'সে ভাব যাবে কিসে ?'

'যদি বুড়োঠাকরুন একটু হঠাৎ দয়া করে বসেন।'

সঙ্গে সঙ্গেই বুড়োঠাকরুন কাঁদিতে কাঁদিতে বধূর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হলেন। বললেন, 'বউ, আমি যদি কিছু অন্যায় করে থাকি, মনে কষ্ট দিয়ে থাকি, আমাকে ক্ষমা করো।'

বসন্তকুমারী পরমতৃপ্তিতে হাসল। বুড়োঠাকরুনের গলা জড়িয়ে ধরে বললে, 'দিদিমা, আপনি তো কোনো অপরাধ করেন নি। অপরাধ আমার হলে আমাকেই আপনি ক্ষমা করুন।'

ধীরে ধীরে চোখ বুজল বসন্তকুমারী। শ্বাস মৃদু হতে হতে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। বসন্তকুমারীর অকাল মৃত্যুতে সবাই বিষন্ন কিন্তু যোগেজীবন নির্বিকার। 'এবার সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হলাম। এখন থেকে ঠাকুরের সঙ্গে নিরুদ্বেগে থাকতে পারব।'

একটু কি নিষ্ঠুর ঠেকল গোঁসাইয়ের কাছে ? একদিন নিরালায় যোগজীবনকে পেয়ে গোঁসাইজি বলে উঠলেন: 'ওরে যোগজীবন, জেনে রাখিস ব্রহ্মা মহেশ্বরও বড়জোর সাময়িক একটা আনন্দের ঢেউ প্রাণে তুলে দিতে পারেন, প্রারব্ধের ভোগ নষ্ট করে দিতে পারেন না। সে শুধু একজনেরই হাতে।'

স্ত্রীর শ্রাদ্ধ করল যোগজীবন। রুদ্ধদ্বার ঘরে স্বয়ং গোঁসাইজি মন্ত্রপাঠ করলেন। বসন্তকুমারী দুটি হাত বাড়িয়ে পতিদত্ত পিণ্ড গ্রহণ করল।

২৮

গোঁসাই-প্রভু মৌনাবলম্বন করলেন।

মৌনীবাবার চিঠি এসেছে। লিখেছেন, 'নির্জন পাহাড়ে-পর্বতে এতকাল সাধন-ভজন তপস্যা করে কাটালাম, কিন্তু আসল বস্তু কোথায় ? নিদ্রা জয় করেছি, সারাদিনে আধপোয়া দুধ আমার একমাত্র আহার। চব্বিশ ঘণ্টা মৌনে একাসনে বসে আছি। সবই তো হল কিন্তু যার জন্যে এলাম সে কোথায় ? কোথায় তার সন্ধান ? সকলে বলে, সদগুরুর আশ্রয় নাও, নইলে আর একপাও অগ্রসর হতে পারবেনা। কৃপা করে আপনি আমাকে উপদেশ করুন, কী করে আমার ব্রহ্মদর্শন হবে ?'

কে এই মৌনীবাবা ? মৌনীবাবার পূর্বাশ্রমের নাম প্যারীলাল ঘোষ। আগে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক ছিলেন, গোঁসাইজির সঙ্গে প্রচারের উদ্দেশ্যে এককালে গিয়েছিলেন

হিজলে-কাঁথি। সেখানে সেবার কী কাণ্ড! বেড়াতে-বেড়াতে দুজনে এক দীঘির পারে এসে দাঁড়ালেন, বিজয়কৃষ্ণ আর প্যারীলাল। জলে অসংখ্য রক্তকমল ফুটে আছে। পদ্মের দিকে অনিমেষে তাকিয়ে আছেন বিজয়, খানিক পরে দেখলেন পদ্মের উপর পা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন কামিনী। এই সেই 'কমলে-কামিনী'—শ্রীমন্ত সওদাগরের দৃষ্ট দেবী-প্রতিমা। দেবীচরণলাঞ্ছিত সেই পদ্মটি ধরবার জন্যে বিজয়কৃষ্ণ জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সাঁতার কেটে এগুলেন পদ্মের দিকে। যেই পদ্মটি ধরলেন তাঁর বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হল। উপায়? প্যারীলাল তখুনি লাফিয়ে পড়ল, বিজয়কৃষ্ণকে ধরে টেনে নিয়ে এল পারে। দেখ দেখ বিজয়ের মুঠোর মধ্যে সেই পদ্মটি ধরা। প্যারীলালেরও দেবী দর্শন হল। তার সেই দেবীদর্শন বিজয়কে দর্শন করে। স্পর্শে কী এক প্রচণ্ড শক্তি বিজয় সঞ্চারিত করে দিয়েছে। পারে এসে বিজয় সুস্থ হলেও প্যারীলাল মূর্ছিত। সেই থেকে প্যারীলালের মনে তীব্রতর বৈরাগ্য উপস্থিত হল। ব্রাহ্মসমাজের ক্ষুদ্র বেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে সে আর ধরে রাখতে পারল না। নির্জন তপস্যার আকাঙ্ক্ষায় চলে গেল সে ওংকারনাথে, নর্মদাতীরে। সেখান থেকেই তার চিঠি: কী করে ঈশ্বর দর্শন করব?

গোস্বামী-প্রভু নিজ হাতে উত্তর লিখলেন: 'বাইরে ধর্মলাভের জন্যে যা প্রয়োজন সবই হয়েছে, সাক্ষাৎভাবে জীবন্ত সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত না হলে ঈশ্বরদর্শনে অধিকার হয় না। ধ্রুব পাঁচ বছরের শিশু, বনে বনে পদ্মপলাশলোচন বলে কাঁদিলেন, তবু গুরুকরণ না হওয়া পর্যন্ত দর্শন পেলেন না। যীশু জন দি ব্যাপটিস্টের কাছে দীক্ষিত, চৈতন্য ঈশ্বরপুরীর কাছে। আমি নিশ্চয় বুঝেছি গুরুকরণ ছাড়া ব্রহ্মদর্শন হয় না। আহার যাবে, নিদ্রা যাবে, মৌনী হবেন, লোকে সাধু বলে ভক্তি করবে, তাতে প্রকৃত বস্তু লাভ হবে না। যদি ব্রহ্মদর্শন করতে চান তবে অন্তরের সমস্ত পূর্ব সংস্কার দূর করুন। গুরুকরণেই সমস্ত বাসনা দূরীভূত হবে আর তখনই দর্শন সম্ভব। এখন, এ অবস্থায়, অন্তরে যে বাসনা আছে তা পাবেন, ব্রহ্ম পাবেন না। ধর্মপ্রচার প্রভৃতি বাসনাও ছাড়তে হবে। নিজের ইচ্ছেয় কোনো কার্য করবেন না। যতক্ষণ নিজের ইচ্ছে আছে ততক্ষণ ব্রহ্ম-সহবাস অনেক দূর।

আপনার পত্র পেয়ে সুখী হলাম। মানুষ নিজের চেষ্টায় যতদূর করতে পারে তাই আপনি করেছেন। এখন গুরুকরণ ছাড়া অগ্রসর হতে পারবেন না। ভগবান সমস্ত কাজ নিয়মে করেন। বাহ্যজগতে কোনো কাজ যেমন অনিয়মে চলে না, সেরূপ অন্তর্জগতেও নিয়ম ছাড়া চলে না। ব্রহ্মদর্শনের পক্ষে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ অব্যর্থ নিয়ম। আপনাকে বড় ভালোবাসি, তাই এত লিখলাম।'

প্যারীলালের—মৌনীবাবার কোথায় সেই সদ্‌গুরু? কয়েক বছর পর গোঁসাইজি যখন প্রয়াগে এসেছেন কুম্ভমেলায় যোগ দিতে তখন মৌনীবাবার আরেকখানা চিঠি এসে পৌঁছুল। সে চিঠি আর্তি দিয়ে ভরা এক অকূল আকুলতার চিঠি।

'তিনিই বর্তমানে আমাকে এই অবস্থায় এনেছেন। তিনিই আমার সম্পূর্ণ রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, বিধানকর্তা শিক্ষাদাতা, উপদেষ্টা—এক কথায় তিনিই আমার সর্বস্ব। প্রতিদিনের ঘটনাদ্বারা তাই জানাচ্ছেন। আমার ফলাকাঙ্ক্ষাকে চূর্ণ করেছেন। আমার জন্যে তপস্যাস্থান প্রস্তুত করে দিয়েছেন। নিজে প্রত্যহ আমার জন্যে আধসের দুধ আর আধপোয়া চিনি আমার স্থূল শরীর রক্ষার্থে প্রেরণ করেন এবং এই আহারই আমার পক্ষে উপযুক্ত করেছেন। আমার হৃদয়ের অপবিত্রতা দিন দিন অপসারিত

করছেন। আমার নিদ্রা প্রায় পূর্ণরূপে হরণ করেছেন। বদ্ধ পদ্মাসন আমার আসন করে দিয়েছেন। আমার মনের উদ্বেগও আর নেই, কেবল ভক্ত সঙ্গে প্রেমতরঙ্গে মেতে তাঁর নাম-গান করবার প্রবৃত্তি, ধর্ম প্রচার করবার প্রবৃত্তি আর এই পাঁচ বছর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁর যে অপূর্ব করুণা লাভ করেছি তা বলবার প্রবৃত্তি আমার মনকে চঞ্চল করছে। আপনি বলে দিন আমার প্রতি আমার পিতার আদেশ কি? কি হলে আমি তাঁতে নিমগ্ন হয়ে যেতে পারব? আপনি ধ্যানযোগে আমার মঙ্গলামঙ্গল সমস্তই জানতে পারছেন। আপনি ছাড়া আর কারু উপর বিশ্বাস আনতে পারছি না। এ পর্যন্ত ভগবানের কৃপা ছাড়া গুরুরূপে আর কাউকেও গ্রহণ করিনি, পিতা স্বয়ং না দিলে গ্রহণ করতেও ইচ্ছা নেই। এই পাঁচ বছর আপনার জন্যে কেঁদেছি, কিন্তু কোথায়, সন্তানকে তো দেখা দিলেন না। এখন আবার আপনার চরণে পড়ে কাঁদছি, কি হলে হৃদয়মাঝে ভগবানকে দেখতে পাব তা বলে দিন। কত মহাত্মা মহাপুরুষের কাছে নিত্য চোখের জল ফেলেছি, কথাও বলেননি, আপনার কাছেও কত কাঁদলাম, আপনিও নীরব। বুঝেছি পিতার দয়া না হলে কেউই দয়া করে না। মূল প্রস্রবণ থেকে যতক্ষণ দয়ার স্রোত না আসে ততক্ষণ সমস্ত স্রোতই বন্ধ থাকে। আমার শরীরের যে অবস্থা, তাতে দেশে-দেশে গুরু-গুরু করে বেড়াতে পারব না। আপনি যদি না দেবেন তবে এ স্থানেই দেহরক্ষা করে পিতার রাজ্যে চলে যাব। অধিক লেখা বাহুল্য। মৌনব্রতও প্রায় আড়াই বছর গ্রহণ করেছি। গীতাজি, ব্রাহ্মধর্ম, উপনিষদ এবং বাইবেল পাঠ্য, একবার দুগ্ধপান, একবার মলত্যাগ এবং শৌচাদি কর্ম ভিন্ন আর কর্ম নেই। শয়ন করে নিদ্রা যাওয়া প্রায় পরিত্যাগ করেছি। সমস্তই পিতা করছেন কিন্তু যার জন্যে এ সমস্ত, তিনি কোথায়? তিনি কোথায়? ইতি আপনার—অনুগত সন্তান, প্যারীলাল—মৌনীবাবা।'

মৌনীবাবার চিঠি আদ্যন্ত পড়লেন গোঁসাই। বললেন, 'মৌনীবাবা অত্যন্ত পীড়িত, এখানে আসবার তাঁর ক্ষমতা নেই। আমাকেই ওঁকারনাথে যেতে হবে।' বলে চোখ বুজে স্থির হয়ে রইলেন।

ওঁকারনাথ যাবেন! সে কবে?

পরদিন ভক্তসেবক জিগগেস করল, 'ওঁকারনাথে কী করে যাবেন?'

গোস্বামী-প্রভু মৃদু হাসলেন, বললেন, 'আর যাবার দরকার নেই। মৌনীবাবার দীক্ষা হয়ে গিয়েছে।'

বিঘ্ন কী? বিঘ্ন এই যে নামে রুচি হয় না। চারদিকে দুঃখকষ্ট রোগশোক অভাব দারিদ্র্য—সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বসেই নাম করতে হবে। প্রহ্লাদচরিত্রই তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। আহার্যে বিষ, আগুনে সমুদ্রে হস্তীপদতলে নিক্ষেপ—চারদিকে বিপক্ষ, অস্ত্রাঘাত, দৌর্জন্য—সহায় কেবল হরিনাম।

গোস্বামী-প্রভু বললেন, 'প্রথমে যন্ত্রণায় শুকিয়ে-পুকিয়ে নীরস হবে। বিষয়রস একবিন্দু থাকতে ব্রহ্মানন্দ আসে না।'

'বিষয়রস যাবে কিসে?' কে একজন প্রশ্ন করল।

'শুধু নাম করে, শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করে।'

বালক নরেন ঘোষ প্রভুতে খুব অনুগত, বয়সে অল্প হলেও অনেক জ্ঞান ধরে! দিব্যকান্তি, বচনে সুধা ঢালা, ভক্তিতে ভরপুর। যা প্রশ্ন করে প্রভু তাই গম্ভীর মুখে উত্তর দেন।

'আপনাকে যখনই স্মরণ করি আপনি বুঝতে পারেন ?' প্রশ্ন করল নরেন।

'পারি।' উত্তর দিলেন গোস্বামী।

'গুরু কি সর্বত্র বিদ্যমান ?'

'হ্যাঁ, সর্বত্র।'

'আচ্ছা, আপনার কাছে সাধন নিলে নাকি রিপুর উত্তেজনা বাড়ে ?'

'যেমন নির্বাণকালে আগুনের তেজ বাড়ে।'

'রিপুর উত্তেজনা বাড়লে উপায় ?'

'নামের উত্তেজনা বাড়ানো। নামের কাছেই কাম জব্দ।'

'দেখুন, কেউ-কেউ আপনার নিন্দে করে।' বালক বললে কাতর মুখে, 'শুনলে আমার বুক ফেটে যায়. কিন্তু কী ভাবে এর প্রতিকার করব বুঝতে পারি না।'

গোঁসাইজি বললেন, 'চুপ করে শুনে যাবে, জিহ্বাগ্রেও প্রতিবাদবাক্য আনবে না। যদি একান্তই অসহ্য হয় স্থানান্তরে চলে যাবে। শুধু নামাশ্রয় করে থাকবে। যে নামাশ্রয়ী তার কেউ ক্ষতি করতে পারে না। না, সাপ-বাঘও নয়, প্রেত-পিশাচও নয়।'

'আচ্ছা, শ্রীচৈতন্য কে ?' বালকের সরল অথচ অগাধ প্রশ্ন : 'তিনি কি স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ ?'

'হ্যাঁ, তিনিই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি নারায়ণ, যোগমায়া অবলম্বন করে মানুষরূপে পৃথিবীতে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।'

'নিত্যানন্দ কে ?'

'অংশাবতার। বলরাম।'

'অদ্বৈত কে ?'

'অংশাবতার। মহাবিষ্ণু। দুইজনেই গৌরাঙ্গলীলার সাথী।'

'গৌরাঙ্গলীলাই বোধহয় শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তখন দুই অংশাবতার আর স্বয়ং অবতীর্ণ।'

'হ্যাঁ,' বললেন গোস্বামী-প্রভু. 'এমন লীলা আর হয়নি।'

'কিন্তু পৃথিবীর কতটুকু জায়গা জুড়ে !'

'সে লীলার শেষ এখনো হয়নি। দেখছ সকল সম্প্রদায়েই এখন কেমন মৃদঙ্গ বাজছে। সমস্তই মৃদঙ্গময় হয়ে যাবে।'

'আপনি একবার আমাদের দেশে চলুন।'

'ভগবান যখন নেবেন তখন যাব।'

বালকের বাড়ি বানারিপাড়া, বরিশাল। বাড়ির লোক যখন জানল নরেন বিজয়কৃষ্ণের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে এসেছে, সবাই ক্ষেপে গেল। যেহেতু বিজয়কৃষ্ণ একদা ব্রাহ্ম ছিলেন সেহেতু ঘোষ পরিবার তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ ছিল না। নরেনের উপর নিগ্রহ সুরু করল। চরমতম হল যখন বিজয়কৃষ্ণের ফটো নরেনের ঘর থেকে সরিয়ে নিল। শুধু তাই নয়, ভেঙে দিল টুকরো টুকরো করে।

কান্নায় ভেঙে পড়ল নরেন। প্রভুকে বললে, 'আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যান।'

নরেনের কলেরা হল। মৃত্যুকালে প্রভু সন্ন্যাসীরূপে দেখা দিলেন।

'জয়গুরু। জয়গুরু।' উচ্চে ধ্বনি তুলে চিরতরে নীরব হয়ে গেল নরেন।

তখন শোকে সমস্ত পরিবারের টনক নড়ল। বাপ নারায়ণ ঘোষ পাগলের মতো হয়ে গেলেন। পিতৃব্য যোগেন ঘোষ প্রভুর চরণে গিয়ে পড়ল। বললে, 'আমরা অবিশ্বাসী, আমরা আপনার মহিমা বুঝতে পারিনি, আমাদের মার্জনা করুন। পাষণ্ডদের শাস্তি দেবার জন্যেই আপনি কেড়ে নিয়েছেন নরেনকে। আপনার চরণে আমাদের শুধু এই ভিক্ষা, একবার তাকে দর্শন করিয়ে দিন।'

গোস্বামী প্রভু বললেন, 'তা হয় না। আপনাদের এখন শোক সংবরণ করা দরকার। তাঁকে দেখলে আপনাদের শোক আরো বেড়ে যাবে। যাকে আর ফিরে পাবেন না তাকে আর অনুসন্ধান কেন?'

এক বাউল আসে আশ্রমে। অহঙ্কারের স্তূপ। কুতর্কের কণ্টক।

'জানেন আমার কুড়ি-পঁচিশ হাজার শিষ্য।'

'হবে।'

'তারা সকলেই আমাকে অবতার বলে।'

'ভালো কথা।'

'কিছু না জেনে শুনেই যে বলে তা বলা যায় না।'

'না, তা কি করে বলা যায়?'

'আপনার দৃষ্টি অনেক পরিষ্কার হয়েছে।' বাউল এগিয়ে এল: 'আপনি আমার মধ্যে কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন?'

'কই, বিশেষ কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।' গোঁসাইজি বললেন।

'দেখতে পাচ্ছেন না? তাহলে আপনার দৃষ্টি এখনো পরিষ্কার হয়নি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ চান? এই দেখুন।' বাউল আরো এগিয়ে এসে তার নাকের ডগায় একটি ছোট্ট তিল দেখাল। বললে, 'কী, পেলেন তো প্রমাণ?'

গোঁসাইজি স্তব্ধ হয়ে রইলেন। কিন্তু আশপাশের লোক উচ্চ হাস্য করে উঠল। বাউল লজ্জিত মুখে প্রস্থান করলে।

বাউল ক্ষান্ত হয় তো তার শিষ্য ক্ষান্ত হয় না।

'তোমার বুঝি শহরে কলকে মিলল না তাই এই জঙ্গলে আশ্রম খুলে বসেছ!' গোস্বামী প্রভুর উপর সে মুখিয়ে এল 'ব্রহ্মজ্ঞানী আবার সাধু সেজেছ। অদ্বৈতবংশের কুলাঙ্গার, পৈতে ফেলে জাতিধর্মভ্রষ্ট হয়ে লোকের সর্বনাশ করে বেড়াচ্ছ। গোঁসাইরা কে কবে পৈতে ফেলেছে?'

চোখ বুজে বসে ছিলেন গোঁসাইজি, হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। প্রচণ্ড স্বরে ধমকে উঠলেন 'পৈতে নেই বলছ, সোনার পৈতে আছে। দশ গণ্ডা পৈতে এখুনি বের করে দিতে পারি। কিন্তু তুই কী করে দেখবি? তুই যে অন্ধ।'

যদুবাবু নামে একটি সাধু প্রকৃতির লোক সেখানে বসে ছিলেন। হঠাৎ এ দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন: এ কি রে! আর সঙ্গে সঙ্গেই পড়লেন মূর্ছিত হয়ে।

আর সেই বাউল শিষ্য সোজা ছুটে পালাল।

যদুবাবু গৃহে স্থানান্তরিত হয়েছেন, সমস্ত আশ্রমে শান্তি ফিরে এসেছে, সবাই প্রভুকে জিগগেস করলে, 'আপনার এ রুদ্র রূপের কারণ কী?'

গোস্বামীজি হাসলেন, বললেন, 'ও আমি নয়, আরেকজন। ভগবানের আশ্রিতজনের উপর কোনো প্রকার অত্যাচার অপমান হলে মহাপুরুষেরা তা সহ্য করেন না, গুরুতর

শাসন করেন। যখন ঐ লোকটা এসেছিল তখন একজন মহাপুরুষ আসনের কাছে বসে ছিলেন। তিনিই দৃপ্তকণ্ঠে আমার মুখ দিয়ে ঐ লোকটাকে শাসন করেছিলেন, তার একটা কথাও আমার নয়।'

পরদিন যদুবাবু এলে তাকে জিগগেস করা হল : আপনি কী দেখলেন?

'ওরে বাবা, সে কী ভীষণ মূর্তি! লোকটা যখন গোঁসাইকে গালাগালি করছিল দেখলাম এক গৌরবর্ণ তেজস্বী ব্রাহ্মণ গোঁসাইয়ের ডান দিকে এসে দাঁড়িয়েছে আর প্রচণ্ড কণ্ঠে বলছে, পৈতে নেই, সোনার পৈতে আছে। তুই দেখবি কী করে, তুই যে অন্ধ। এ দাউ-দাউ করে জ্বলা আগুনের মতো লোকটা কোত্থেকে এল! দেখে শুনে আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম!'

স্বর্ণময়ীর পাগলামি দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। সেদিন আশ্রমের আমতলায় বহু গণ্যমান্যের সমাগম হয়েছে, গোস্বামী-প্রভু সকলের সঙ্গে ধর্ম প্রসঙ্গ করছেন, হঠাৎ সেখানে পাগলী গান গাইতে গাইতে এসে পরিধানের বস্ত্র মাথায় বেঁধে নাচতে সুরু করলেন। প্রভুর হর্ষোৎফুল্ল চোখ ছল ছল করে উঠল। আর দেখ কী অপূর্ব দৃশ্য, ভক্তিগদগদ ভাবে প্রভু উলঙ্গ মায়ের নৃত্যের সঙ্গে তুড়ি দিয়ে তাল দিচ্ছেন!

কতক্ষণ পরে স্বর্ণময়ী চলে গেলেন অন্য দিকে। সকলেই এই দৃশ্য দেখে অবাক। গণ্যমান্যদের মধ্যে ছিলেন হরিনারায়ণ রায়, বললেন, 'এই একটি ঘটনা দেখেই আমি গোঁসাইকে চিনে নিলাম। আর কোনো সংশয় বা পরীক্ষা করবার প্রবৃত্তি রইল না। মানুষ কখনো কি এরকম করতে পারে?'

কুলদানন্দকে প্রায়ই তাড়া করেন স্বর্ণময়ী। 'যেমন পেট ভরে খাস না, ভালো জিনিস খাস না, মহাপ্রাণীকে কষ্ট দিস, মৃত্যুকালে মহাপ্রাণী তোর মুখে লাথি মেরে চলে যাবে। ব্রাহ্মণের ছেলে, সারাদিন উপোস করে থাকিস? আমার ছেলের অকল্যাণ হবে। যাঃ, আশ্রম থেকে চলে যা।'

শেষে নিজেই তিনি চলে গেলেন। বলে গেলেন তাঁর শ্রাদ্ধ যোগজীবন করবে। আর সেই উপলক্ষে গোস্বামী-প্রভু চলে এলেন কলকাতা।

২৯

কলকাতায় মেছুয়াবাজার স্ট্রিটে অভয়নারায়ণ রায়ের বাড়িতে উঠলেন। গঙ্গাতীরে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে যোগজীবন যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধ করলে। গোঁসাইও তিন গণ্ডূষ জল দিলেন মাকে।

বাসায় ফিরে আসতেই ভক্ত মুকুন্দ দাসের কীর্তন সুরু হয়ে গেল। মহাভাবে বিভোর গোঁসাই ঊর্ধ্বে হাত তুলে হুঙ্কার করে উঠলেন: 'জয় শচীনন্দন। জয় শচীনন্দন! কলি-জীবের আর ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্‌। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।'

স্বর্ণময়ীর মৃত্যুতে অনেক পারলৌকিক তত্ত্ব প্রকাশ পেল গোঁসাইয়ের কাছে, তাই তিনি এবার ব্যক্ত করলেন।

'মা বিধুর কোলে দুধ খাচ্ছিলেন, এমন সময় আমাকে ডাকলেন। গিয়ে দেখি এখন

বাইরে নেওয়া দরকার। বাইরে নিয়ে গিয়ে শোয়ালাম মাকে। মুখে সুন্দর শোভা ফুটল, মনে হল সমস্ত কষ্ট চলে গিয়ে শান্তি নেমে এসেছে। চারদিকে হরিনাম হচ্ছে, আমার দিকে তাকালেন। কেলে কুকুর এসে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল মাকে।'

'তারপর কী হল? দেহত্যাগের পর ঠাকুরমা কী করলেন? সাধারণ মানুষই বা দেহত্যাগের পর কী করে?' ভক্তশিষ্যের দল জিগগেস করল।

গোঁসাইজি বলতে লাগলেন, 'মৃত্যুর তিন ঘণ্টা আগে আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে এসে ঘরের মধ্যে ঘুরতে থাকে। দেহ ঘর থেকে বাইরে আনলে আত্মা ঊর্ধ্বে দৃষ্টি করে। দেখে তার পূর্বপুরুষেরা এসেছে। আত্মা যদি পুণ্যবান হয় পূর্বপুরুষেরা তাকে পিতৃলোকে বা মাতৃলোকে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে নিয়ে তারা একবছর আনন্দ করে। একবছর পরে যার যেমন কর্ম তেমনি অবস্থা লাভ করে। ঐ এক বছর শ্রাদ্ধের ফলভোগ করে। পাপীদের কিন্তু ঐ এক বছরও পাপযন্ত্রণার থেকে নিস্তার নেই।'

'পরলোকে গিয়েও কি জীবাত্মার ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে?'

'আছে বৈ কি। জীবের স্থূল সূক্ষ্ম কারণ—তিন দেহেই ক্ষুধা তৃষ্ণা বর্তমান। স্থূল দেহ খাদ্যদ্রব্য প্রত্যক্ষ ভাবেই গ্রহণ করে, প্রতি গ্রাসেই তার পুষ্টি তুষ্টি ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়ে থাকে। সূক্ষ্ম দেহে কেবল আহার্য বস্তু দর্শনমাত্রই তৃপ্ত হয়। কারণ-শরীর নিজে কিছু করতে পারে না, তাই কোনো ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণ যদি আহার্য বস্তু নিয়ে নিজের জঠরাগ্নিতে হোম করে তবেই তার ক্ষুন্নিবৃত্তি।'

এদিকে বাড়িতে এত বেশী ভক্ত অতিথির সমাগম হয়েছে যে তাদের জঠরাগ্নির হোম বুঝি হয় না। বাড়ির মেয়েরা বলাবলি করছে, 'কী হবে? আজকের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ। এদিকে ভাঁড়ারে চাল বাড়ন্ত।'

কথাটা গোঁসাইয়ের কানে গেছে। তিনি মেয়েদের ডেকে বললেন, 'দেখ গে জালায় চাল আছে।'

'আমরা দেখে এসেছি, চাল নেই।' মেয়েরা বললে অপ্রতিভ হয়ে।

'আরেকবার গিয়ে দেখ।'

ঠাকুর বলেছেন তাই মেয়েরা দেখতে গেল। কিন্তু ও হরি, এ যে দেখি আধখানা জালাই ভর্তি। এত চাল এরই মধ্যে এল কী করে? কোন পথ দিয়ে? কে নিয়ে এল? পেল কোথায়? কোন বাজারে?

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক নগেনবাবুর স্ত্রী বললে, 'সেবার আমাদের গোয়াবাগানের বাসায় গোঁসাই তাঁর ভক্তদের নিয়ে উপস্থিত। দিন-রাত মহোৎসব চলল। এক খোরা দই, তাই দিয়ে তিন দিন মহোৎসব, কিন্তু দই ফুরোল না। গোঁসাইকে জিগগেস করলাম, এ কেমনতরো? তিন দিনেও যে দই ফুরোয় না। গোঁসাই বললেন, এ স্বয়ং মধুসূদন জোগাচ্ছেন, এ ফুরোবে কেন?'

কিন্তু বালিকা সত্যদাসীর এ কী কাণ্ড? সত্যদাসী অভয়বাবুর ভাগ্নী, যুক্তবর্ণ পড়তে পারে না, অথচ বিশুদ্ধ সংস্কৃতে স্তব পড়ে, আবৃত্তি করে। পূর্বজন্মে কোন এক পাহাড়বাসী মহাপুরুষের কৃপা পেয়েছিল, সেই কৃপায় এ জন্মে মাঝে মাঝে তার গুরুস্মৃতি ঘটে। তখন গুরুর আসন সামনে রেখে সে পুজো করে। পুজো করতে করতে কখনো তার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়। যখন স্তবস্তুতি করে তখন আসনে কখনো কখনো গুরুর পায়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

সেই সত্যদাসী গোঁসাইজিকে বললে, 'আপনি আমাকে দীক্ষা দিন।'

'সে কী, তোমার তো গুরু আছেন।'

'হ্যাঁ, তিনিই বললেন আপনার কাছ থেকে দীক্ষা নিতে। আমি তাঁকে বললাম, আপনি থাকতে অন্যের দ্বারস্থ হব কেন? তিনি বললেন, হতে হবে, তাই ভগবানের বিধান।'

গোঁসাইজি হাসলেন, বললেন, 'তোমার গুরুর আদেশ আমার শিরোধার্য। দেব তোমাকে দীক্ষা।'

দীক্ষা দেওয়ার সময় দেখা গেল সত্যদাসী আসন থেকে কিছুটা উপরে উঠে শূন্যে বসে আছে। আরো অনেক সব অলৌকিক অবস্থা হয় সত্যদাসীর। তার বাপ-মা অভিভাবকেরা মনে করে এ সমস্ত ব্যাধি, চিকিৎসার জন্যে তারা ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়।

'ব্যাধি কে বলে? এসব দিব্য লক্ষণ।' বললেন গোঁসাই, 'একে যদি ব্যাধি বলা হয় তবে তাতে মহাপুরুষদেরই অবজ্ঞা করা হয়।'

নগেনবাবুর স্ত্রী মাতঙ্গিনী দেবী আবার বললেন, 'বাঁশবেড়ে ব্রহ্মমন্দিরের উৎসব উপলক্ষে যে কীর্তন হয়েছিল তাতে গোঁসাই যে নেচেছিল শূন্যে উঠে নেচেছিল।'

কিন্তু, ওসব থাক, আসল কথা হচ্ছে মনের স্থৈর্য। মনের একাগ্রতা।

'কিন্তু কী করে মন স্থির হবে? কী করে একাগ্র হব?' ভক্তের দল আবার গোঁসাইকে ঘিরে ধরল।

'ভগবান আছেন এটি একটি জ্বলন্ত বিশ্বাসে জাগ্রত রাখো।' বললেন গোঁসাইজি, 'তারপর স্মরণ মনন নিদিধ্যাসন—এই তিন উপায় অবলম্বন করো। প্রথম স্মরণ—সর্বস্থানে সর্বঘটনায় স্মরণ; দ্বিতীয় মনন, মনকে সর্বসময়েই সংযুক্ত করে রাখা, চোখ ফিরিয়ে না নেওয়া, আলো দেখলে সাপ যেমন আর চোখ ফেরাতে পারে না; তৃতীয় নিদিধ্যাসন, গরুর মতন জাবর কাটা, স্মরণে-মননে যা স্বাদ পেয়েছে বারে বারে তা সম্ভোগ করা। এই তিন একত্র হলেই একাগ্রতা।'

'কিন্তু মনের উপর কর্তৃত্ব আসেনা কেন?'

'কী করে আসবে? সব সময়ে মনে যে সংকল্প বিকল্প হচ্ছে। এতেই তো মনের চঞ্চলতা, তাতেই আসেনা কর্তৃত্ব। এই সংকল্প বিকল্পের কারণ দুটি ইন্দ্রিয়—জিহ্বা আর উপস্থ। উপস্থ লোকে অনায়াসে দমন করতে পারে কিন্তু জিহ্বাকে বশে আনাই কঠিন। কেউ নিন্দে করল কটু কথা বলল, জিহ্বা তক্ষুনি প্রতিবাদ করে বসল। নিন্দা প্রশংসায় চঞ্চল হবে না—জিহ্বাকে বশীভূত রাখা কি সামান্য কথা?'

'বশীভূত কী করে করি?'

'সাধুসঙ্গ করো, সর্বদা নিত্যানিত্যবিচার করো অর্থাৎ সংসারের অসারতা চিন্তা করো, আর', গোঁসাইজির কণ্ঠ গাঢ় হয়ে উঠল, 'আর সর্বক্ষণ ভগবানের নাম জপ করো।'

শ্রাদ্ধ শেষে গোঁসাই আবার ফিরলেন ঢাকায়। বেশি দিনের জন্যে নয়, আবার চলে এলেন কলকাতায়, উঠলেন সুকিয়া স্ট্রিটে রাখাল রায় চৌধুরীর বাড়ি। পোস্ট অফিসের ডেপুটি কনট্রোলার জেনারেল, উমাচরণ দাস এসে হাজির। বললেন, 'সেবার আপনি বলেছিলেন আমার বাড়িতে একদিন পায়ের ধুলো দেবেন। অনুমতি করুন, একদিন আপনাকে নিয়ে যাই। কবে যাবেন বলুন?'

'যেদিন বলবেন সে দিনই যাব।' এক বাক্যে রাজি হলেন গোঁসাই।

হ্যাঁ, সেবার কথা দিয়েছিলেন, কথার খেলাপ করবেন না। সত্য কথাই তো কলির ধর্ম। সেবার সেই আশ্বিনের ঝড়ের কথা মনে নেই? দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে কথা দিয়েছিলেন সপ্তাহে দু-দিন, বুধবার আর রবিবার, সমাজের উপাসনায় যোগ দেব। শুধু বিজয় নয়, কেশবসহ আরো কজন ব্রাহ্ম স্বীকার করে এসেছিল। সেই প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে কে পথে বেরুবে? গাছ পড়েছে, পোস্ট উপড়েছে, নদী ছেড়ে ডাঙায় উঠে এসেছে নৌকা। রাস্তায় এক গলা জল, যানবাহন নিশ্চিহ্ন। বিজয় একবার ছাদে উঠেছিল আকাশ দেখতে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আজ বুধবার। আর কথা নয়, কোমর বেঁধে বাড়ির বার হয়ে গেল। রাস্তায় নদী বইছে, তাতে কী, সাঁতরে পার হয়ে যাব। মৃতদেহ ভেসে যাচ্ছে তাতে কী, যতক্ষণ আমি না মৃত হই জল ঠেলে এগিয়ে চলি।

ঠিক সমাজে গিয়ে পেঁছিুল বিজয়। বাড়ি-ঘর ভেঙে-চুরে গিয়েছে তবু বিজয়েব ব্রতভঙ্গ হয়নি। আর কেউ গিয়েছিল?

'না, আর কেউ যায়নি। যখন ভাঙা ঘরে উপাসনা সেরে ফিরে আসছি দেখি কেশববাবু পাল্কিতে করে যাচ্ছেন।'

তখন একসঙ্গে গিয়ে আবার উপাসনা করল দু-জনে। সর্বভাবেই সংকল্প রক্ষা করল বিজয়।

উমাচরণ দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করে দিল। আর সেই নির্দিষ্ট দিনক্ষণে নিতে এল গোঁসাইকে। উমাচরণের বাড়ি পেঁছিুতে না পেঁছিুতে প্রবল জ্বর হল গোঁসাইয়ের। তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এলেন। তিন দিন তিন রাত রইলেন প্রায় বেহুঁসের মতো, প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি। পরে আবার আপনা আপনিই জ্বর ছেড়ে গেল।

'এ জ্বর ভোগের হেতু কী?' জিগগেস করল ভক্ত।

'গুরুবাক্যলঙ্ঘন।' গোঁসাইজি বুঝিয়ে বললেন, 'ঐ সময় পরমহংসজি একটা নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত আসন ত্যাগ করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু উমাচরণবাবু এসে অনুরোধ করায় দ্বিধায় পড়লাম, এখন কী করি? নিজের বাক্য রক্ষা করে সত্যপালন করি, না, পরমহংসজির আদেশ পালন করে ঐ বাক্য অগ্রাহ্য করি। ভাবলাম সত্যপালন করাই বুঝি ঠিক হবে। না, গুরুদেব বুঝিয়ে দিলেন গুরুবাক্যলঙ্ঘন করে সত্যপালনও অপরাধ।'

মহরমের মিছিল যাচ্ছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছেন গোঁসাই। হোসেন হোসেন বলে বুক চাপড়ে কাঁদছে লোকেরা আর তাদের পিপাসাশান্তির জন্যে রাস্তায় জল ঢালছে। বেদনায় দ্রবীভূত হলেন গোঁসাই। বললেন, চলো আমরাও গিয়ে জল দিই।

কিন্তু যার বাড়িতে আছে সেই রাখালবাবুকেই মেরে বসল মহেন্দ্র।

গোঁসাই ভিতর বাড়িতে গেছেন, এই ফাঁকে মহেন্দ্র তাঁর ঘর পরিষ্কার করতে লেগেছে। আসনের ধারের ফুল-পাতা ফেলে দিয়ে আসনের কিছুটা তুলে তার নিচেটা ঝাঁট দিতে যাচ্ছে, রাখালবাবু রুখে এলেন: 'এ কী করছেন? ঝাঁটা যে ঠাকুরের আসনে লাগবে।'

মহেন্দ্র রাখালের কথা গ্রাহ্যই করলনা।

'সে কী মশাই, শুনছেন না নাকি? আসনে যে ঝাঁটা লাগছে।' মহেন্দ্রের হাত থেকে রাখাল ঝাঁটাটা কেড়ে নিতে চাইল।

এতবড় স্পর্ধা। ক্রোধান্ধ মহেন্দ্র ঝাঁটা দিয়ে কয়েক ঘা বসিয়ে দিল রাখালকে।

রাখাল একেবারে স্তব্ধ। লাখুটিয়ার জমিদার, কত তার প্রবল প্রতাপ, একটা কড়ে আঙুলও তুলল না। মহেন্দ্র তো ঠাকুরেরই ভক্ত, তার অমর্যাদা ঘটাল না। কে জানে কেন এই প্রহার, কে জানে এই প্রহারে কোন অপরাধের স্খালন হল।

গোঁসাই শুনে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। বললেন, 'মহেন্দ্রবাবুর আচরণ অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। রাখালবাবু ইচ্ছে করলে অনায়াসে দারোয়ান দিয়ে অপমান করতে পারতেন, কিন্তু তা করেন নি। এতে বোঝা যাচ্ছে রাখালবাবু কত মহৎ, কী অমানুষিক তাঁর সহিষ্ণুতা!'

গোঁসাইকে মেনে রাখালবাবু আগে ব্রাহ্মমত ধরেছিলেন, এখন আবার সেই গোঁসাইকে মেনেই আরেক রকম হয়েছেন। এখন রোজ সকালে গায়ত্রী জপ করেন, পিতৃপুরুষের তর্পণও তাঁর নিত্যক্রিয়া।

একদিন গোঁসাইকে বললেন, 'কী দেখলাম বলুন তো।'

'কী দেখলে?'

'দেখলাম অন্তরীক্ষে একটি জ্যোতির্ময় গোলাকার চক্র।'

'হ্যাঁ, ওটা দেবতার ছাঁচ।' বললেন গোঁসাই, 'বিশেষ ভাবে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালে ওর মধ্যে দেবতার মূর্তি দেখা যায়।'

'আর দেখুন তো, সাধনকালে মাঝেমাঝে ধূপধুনা গুগগুলের গন্ধ পাই। এর অর্থ কী?'

'এর অর্থ আপনার কাছে কোনো মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে।' বললেন গোঁসাই, 'কোনো মহাপুরুষ এলে ওরকম সুগন্ধ পাওয়া যায়। ওটা তাদের গাত্রগন্ধ। কিন্তু শুনুন, একথা কাউকে প্রকাশ করবেন না। প্রকাশ করলে আর আসবেন না তাঁরা। ওঁদের আসতে দিন, ঐ গন্ধই ক্রমে ক্রমে আনন্দলোকে নিয়ে যাবে আপনাকে।'

'আচ্ছা, আপনার প্রতি আমার সংকোচভাব যায় না কেন?' শিষ্য শ্যামাকান্ত একদিন জিগগেস করলেন গোঁসাইকে।

'নিজেকে যেমন পাপী মনে করেন আমাকেও তেমনি পাপী মনে করবেন, তাহলেই আর সংকোচভাব থাকবে না।' গোস্বামী-প্রভু বলতে লাগলেন তন্ময়ের মতো: 'যেমন নন্দ-যশোদা গোপালকে দেখতেন তেমনি চোখে দেখবেন। শ্রীমতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ অনুগ্রহ দেখালে শ্রীমতী গর্বিতা হলেন, ফলে অন্তর্হিত হলেন শ্রীকৃষ্ণ। তখন সখীদের নিয়ে শ্রীমতী কাঁদতে বসলেন, শ্রীকৃষ্ণকে তখন প্রকাশিত হতে হল। প্রকাশিত হয়ে করলেন রাসলীলা। তখন শ্রীকৃষ্ণের বামে শ্রীমতীকে দেখে সখীরা আত্মহারা, আবার সখীদের পাশে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে শ্রীমতী আত্মহারা। গুরু-শিষ্য সমান, গুরু-শিষ্য একত্র হয়ে কাঁদলেই ভগবান প্রকাশিত হন। তখন গুরু শিষ্যকে ভগবানের পাশে দেখে কৃতার্থ, আর শিষ্যও গুরুকে ভগবানের পাশে দেখে আপ্তকাম।'

আরেকজন সমবেত ভক্তদের দেখিয়ে বলে, 'এরা কি সবাই আপনার শিষ্য?'

'আমরা সবাই এক—সকলেই ধর্মার্থী হয়ে একত্র বাস করছি।' বললেন গোঁসাই, 'ভগবানই একমাত্র গুরু। তিনিই একজনের মধ্য দিয়ে অন্যকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এই জন্যে গুরু যদি মনে করে আমি গুরু আর এ আমার শিষ্য তা হলেই গুরুর পতন।'

প্রতাপ মজুমদারের ছোট ভাই এসে হাত পেতেছে গোঁসাইয়ের কাছে। মানে কিছু

পয়সা চায়। গোঁসাই তাকে দিলেন কিছু পয়সা। প্রণাম করে লোকটা চলে গেল হৃষ্ট মনে।

রাখালবাবু বললেন, 'এ পয়সা দিয়ে তো ও মদ খাবে।'

'জানি।'

'জানেন ? কী আশ্চর্য, জেনে শুনে একটা মাতালকে প্রশ্রয় দিলেন ?'

সহানুভূতি-মাখানো স্বরে প্রভু বললেন, 'ওর মদ যে এখন দারুণ প্রয়োজন। মদ না পেলে যে ওর এখন জীবনধারণ কষ্টকর হবে। একটা অভ্যাস করে ফেলেছে, এখন আর তার কী করা!'

রাখালবাবু বুঝে উঠতে পারলেন না এ রহস্যের ব্যাখ্যা কী।

গোঁসাই তখন গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমি যদি ওকে পয়সা না দিতাম, ও চুরি করত। চুরির পাপ থেকে ওকে রক্ষা করলাম।'

ভবানীপুরে মনোরঞ্জন গুহের ছেলের অন্নপ্রাশনে গোঁসাই নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। আর এসেছেন এক বামাচারী সাধু।

সাধুকে খেতে দেওয়া হয়েছে, সে বললে, 'ক্রিয়া না করে ভোজন করা যাবে না।'

'বেশ তো ক্রিয়া করে নিন।' সবাই বললে সাধুকে।

'ক্রিয়া করতে হলে কারণ লাগবে।'

সকলে বিরক্ত হল। এখানে কারণ মিলবে কোথায় ? মদের আমদানি হলে ক্ষেপে যাবে অতিথিরা।

গোঁসাইজি শুনলেন। মনোরঞ্জনকে বললেন, 'এ সাধু অভ্যাগত। দেবতার মতো এঁকে সেবা করবে। যা উনি চান তাই এনে দেবে।'

'উনি যে মদ চান।'

'হ্যাঁ মদ নিয়ে এসেই এঁর চিত্ত বিনোদন করবে।'

গুরু-আজ্ঞা মানল মনোরঞ্জন। তন্ত্রমতে সাধু ক্রিয়া করলেন। ক্রিয়ার শেষে ফুল্ল মনে বসলেন ভোজনে।

হঠাৎ মাঝরাতে উঠে গোঁসাই কুলদাকান্তকে বললেন, 'দারুণ খিদে পেয়েছে, শিগগির কিছু খেতে দাও।'

কুলদা সামনে খাবার নিয়ে এল। তাই খেয়ে আবার শুয়ে পড়লেন গোঁসাই। কী রহস্য তা কে জানে!

জানে শুধু সেই মাদারিপুরের শিষ্যটি যে প্রভুকে দর্শন করবার জন্যে গৃহ থেকে যাত্রা করেছে। প্রতিজ্ঞা করেছে গুরুদেবের দর্শনের আগে জল গ্রহণও করবে না। সারাদিন স্টিমারে অভুক্ত কাটিয়ে ঘোর সন্ধ্যায় গোয়ালন্দে পৌঁচেছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় সমস্ত দেহ ভেঙে পড়েছে তবু প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হচ্ছে না, রাত দশটায় গোয়ালন্দ থেকে কলকাতার ট্রেন ছাড়ল, ট্রেনের কামরার একটা বেঞ্চির উপর শুয়ে শিষ্য ক্ষুধার যন্ত্রণায় ককাতে লাগল, তবু, না, কিছু খাব না। প্রাণ যদি যায় তো যাবে, প্রভুকে দর্শনের আগে দেহের আবার খাদ্য কী! মধ্যরাত্রে শিষ্যের হঠাৎ মনে হল, ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছু নেই, সমস্ত দেহে অগাধ তৃপ্তি, দু চোখ ভরে সুখদ শান্ত সুনিদ্রা। কে ক্ষুধামোচন করল ? কে এনে দিল উপশম ? পরদিন মধ্যাহ্নে শিষ্য এসে হাজির। প্রভুকে দর্শন করে প্রণাম করে দাঁড়াতেই প্রভু তাকে তাঁর প্রসাদের থালা এগিয়ে দিলেন।

কী আশ্চর্য, প্রভুর কৃপায়, এখন, হ্যাঁ, এখনিই শিষ্যের প্রথম ক্ষুধাবোধ হচ্ছে। যাঁর ক্ষুধা তাঁরই তৃপ্তি।

৩০

গোঁসাই প্রভু বললেন, আমি এবার কুম্ভমেলায় যাব।

'সেখানে কেন ?' ভক্ত জিগগেস করল।

'অতি প্রাচীন কজন মহাপুরুষ এবার কুম্ভমেলায় আসবেন, তাদের দেখতে যাব।'

গেণ্ডারিয়ার আশ্রমে এসে কুলদানন্দ দেখল সমস্ত নিঝুম। যে আশ্রম সর্বদা ভজনে-কীর্তনে মুখরিত ছিল তা এখন প্রায় জনমানবশূন্য। সমস্ত আকাশ বাতাস দীনমলিন। গোঁসাই কোথায় ? গোঁসাই প্রয়াগে গিয়েছেন, ত্রিবেণী সঙ্গমে।

'আপনি এলেন, আমাদের গোঁসাই কই ?' পাড়ার স্ত্রী-পুরুষ ছুটে এল কুলদাকে দেখে : 'গোঁসাই কবে আসবেন ?'

'গোঁসাই ছাড়া আমাদের দিন যে কাটে না।'

'গোঁসাই ভালো আছেন তো ?'

'বৃন্দাবনে কি আর ফিরবেন না শ্রীকৃষ্ণ ?'

কুলদানন্দ বললে, 'আমি যাইনি প্রয়াগে। এবার যাব। তোমাদের কাছে প্রভুর সংবাদ এনে দেব।'

নিষ্প্রাণ আশ্রম, নিস্তেজ জীবনযাত্রা। সকালবেলা দেবী যোগমায়ার একবার পুজো হয়, ঠাকুরের ভজনকুটিরে একটু ধূপধুনো জ্বলে, সন্ধ্যায় নিয়ম রক্ষার আরতি। আরতির সময় কেউ বিশেষ আসে না। যদি বা কেউ আসে আমতলায় মন্দিরের রোয়াকে বা পুকুরের ধারে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে যায়। সকলের মুখ বিষণ্ণ, দৃষ্টি উদাস, মন-প্রাণ স্বস্তিহীন। যে গাছের নিচে গোঁসাই দাঁড়াতেন, পত্রমর্মরে তার অন্তরের কথা শুনতেন, সেই গাছ পাতা ঝরিয়ে দিয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। যেখানে পাখিদের জন্যে চাল ছড়িয়ে দিতেন সেখানে ঘাস গজাচ্ছে। এখন চাল ছড়িয়ে দিলেও পাখিদের আর দেখা নেই। গাছেও আর পাখি বসে না। যেখানে নামগান নেই সেখানে পাখিরা কার কাকলি করবে ? গাছ নেই পাতা নেই চাল নেই পাখি নেই।

কুলদানন্দ প্রয়াগ চলল। কুঞ্জ আর অশ্বিনী সঙ্গী হল। এলাহাবাদ স্টেশনে নেমে তিনজনে একটা গাড়ি নিল। গাড়োয়ান জিগগেস করল, 'কোথায় যাব ?'

অশ্বিনী কুঞ্জকে ঠেলা মারল : 'বল না কোথায় যাবে ?'

'তুই বল না—' কুঞ্জ পালটা গুঁতো মারল।

'আহা, গোঁসাই কোথায় আছেন তা বলবি তো ?'

'তোকেও তো তাই বলতে বলছি গোঁসাই কোথায় আছেন—'

এ নিয়ে তুমুল ঝগড়া। এ বলে তুই বল, ও বলে তুই বল। এ বলে তোর বলতে বাধা কী, ও বলে তোরই বা কোন বাধা ? ঝগড়ার কিনারা হয় না দেখে কুলদা গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

'একি তুই নেমে যাচ্ছিস কেন ?' অশ্বিনী চেঁচিয়ে উঠল : 'গোঁসাই কোথায় !'

'গোঁসাই সর্বত্র।' বলে কুলদা রাস্তার পাশে একটা গাছের নিচে আসন করে বসল।

'শালারা সব হস্তিমূর্খ।' তড়পে উঠল অশ্বিনী : 'গোঁসাইয়ের কাছে যাবে বলে বেরিয়েছে অথচ তাঁর ঠিকানা জেনে আসেনি।'

'তুইও তো বেরিয়েছিস তুই কেন আনিস নি ?' পালটা হুংকার ছাড়ল কুঞ্জ।

'বা, আমি তোর সঙ্গে এসেছি, আমি কী জানি। তুই যেখানে যাবি আমিও সেইখানে যাব।'

'চমৎকার। এদিকে আমিও তো তোর উপরে ভার দিয়ে বসে আছি। তুই যেখানে নিয়ে যাবি নিশ্চিন্ত মনে সেইখানে গিয়ে উঠব।'

'এখন কী করা ! ও-ও তো ঠিকানা জানে না, দিব্যি গাছতলায় গিয়ে বসেছে।'

'না, না, বসতে দেওয়া হবে না, চল রাস্তা ধরে বেরিয়ে পড়ি ! পথই আমাদের পথ দেখাবে।'

গাছতলা থেকে তুলে নিল কুলদাকে। চলো রাস্তায় জিগগেস করতে-করতে পেয়ে যাব ঠিকানা।

'চলো আমরা তাঁকে খুঁজছি না, তিনিও আমাদের খুঁজছেন।' কুলদা উঠে পড়ল।

কিন্তু রাস্তায় কাকে জিগগেস করবে ? শীতের রাত, দশটা প্রায় বাজে, রাস্তায় লোকজনই বা তেমন কোথায় ? যে কজন বা প্রশ্ন শুনে দাঁড়ায় কোনো হদিস দিতে পারে না। অজানা পথ, শীত, ঘাড়ে বোঝা, নিরুদ্দেশের মতো চলতে লাগল সবাই।

'আর কত হাঁটব ? আর কত ?'

হঠাৎ রাস্তার দক্ষিণ দিকের একটা বাড়ি থেকে কে বলে উঠল : 'ব্রহ্মচারী, আমি এইখানে।'

এ কী, গোঁসাইপ্রভুর কণ্ঠস্বর !

দরজা খুলে গেল। মিলে গেল ঠিকানা। মিলে গেল ঠাকুর। আর কী, প্রণাম করো, পেট পুরে ভোজন করো, তারপর সুখে নিদ্রা দাও।

পরদিন বিকেলে গোঁসাই-প্রভু সবাইকে নিয়ে চললেন গঙ্গাতীরে। আর এই তো ত্রিবেণী—গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর মিলনক্ষেত্র। গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী যমুনা পূর্ববাহিনী আর সরস্বতী অন্তঃসলিলা। দুই নদীর মাঝখানে বিস্তীর্ণ চড়া, সেখানে যত রাজ্যের সাধু সন্ন্যাসী এসে ভীড় করেছে। বৈষ্ণবরাও এসেছে দলে-দলে। নানকসাহী উদাসীরাও কম যায় না। শুধু তাই ? এসেছে কবীরপন্থী, গোরোখনাথী, নির্বাণী, নিরঞ্জনী। কেউ কুঁড়েঘর বানিয়েছে, কেউ আছে তাঁবুতে, কেউ বা শুধু ছাতার নিচে, আবার কেউ বা সম্পূর্ণ অনাবৃত হয়ে, ধুনি জ্বালিয়ে। কেউ গৈরিকধারী, কারু বা শুধু কোপীন আর বহির্বাস, কেউ বা শুধু ভস্মের আচ্ছাদনে। যেন বসে গেছে নৈমিষারণ্যের ঋষিসভা।

গোঁসাই-প্রভু শিষ্যদের নিয়ে নাম গান করতে করতে এগোতে লাগলেন।

'নাম-ব্রহ্ম নাম-ব্রহ্ম নাম-ব্রহ্ম বল ভাই।
হরিনাম বিনা জীবের আর গতি নাই ॥'

কে এই পুরুষোত্তম ? সাধুদের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে গেল। হরিনামের এমন সিংহনাদ তারা কেউ শোনেনি। সবাই তাঁর পদধূলি নেবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল।

এমনটি বুঝি আর কেউ আসেনি এবার। হঠাৎ একজন খর্বাকৃতি জ্যোতিষ্মান মহাপুরুষ ছুটে এল গোঁসাইয়ের কাছে, 'আও মেরে প্রাণ' বলে গোঁসাইকে জড়িয়ে ধরল। মহাপুরুষের সর্বাঙ্গে মহাভাববিকার দেখা দিল, সুরু হল অশ্রুবর্ষণ।

ক্ষণকাল পরে আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হলেন মহাপুরুষ আর নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

'উনি কে?' জিগগেস করল মহেন্দ্র।

গোঁসাইজির দুচোখ ছলছল করে উঠল। বললেন, 'উনি আমার গুরুদেব, পরমহংসজি।'

'পরমহংসজি তো গৌরবর্ণ কিন্তু তাঁকে তো শ্যামবর্ণ দেখলাম।'

'তিনি অন্যদেহ আশ্রয় করে প্রচ্ছন্নভাবে এসেছিলেন।'

পরদিন গোঁসাইজি বেণীমাধব দর্শন করলেন। এক টাকার বাতাসা কিনে ভোগ দেওয়ালেন। বললেন, 'এইখানে কিছুদিন ছিলেন মহাপ্রভু। আর ঐ যে দশাশ্বমেধ ঘাট দেখছ ঐখানে তিনি রূপ গোস্বামীকে দশ দিন ধরে শিক্ষা দিয়েছিলেন।'

গোঁসাইজি ঠিক করেছেন বাড়িতে আর থাকবেন না, চড়ায় গিয়ে থাকবেন আর সাধুসন্তদের ভাণ্ডারা দেবেন। গোয়ালিয়রের প্রাক্তন মন্ত্রী দীনকার রাও তাঁবু পাঠিয়ে দিয়েছেন। চড়ায় খাটানো হয়েছে। তিরিশ-চল্লিশজন ভক্ত শিষ্য থাকতে পারবে। শুধু মেয়েরাই বাড়িতে থাকবে। আসা-যাওয়া করবে। কিন্তু এতগুলো ভক্ত শিষ্যের চলবে কী করে? তারা খাবে কী?

'আমি ভিক্ষে করে খাওয়াব।' বললেন গোঁসাই-প্রভু, 'খাওয়াবার ভার আমার উপর।'

প্রথম দিনেই প্রায় পোনে দুশো টাকা মিলে গেল। সবাই ভাবল এ নিয়ে দিনকতক বেশ স্বচ্ছন্দে চলে যাবে, কিন্তু গোঁসাইজি বললেন, 'মনে রাখবে আমার আকাশবৃত্তি। দিনের জিনিস দিনেই ব্যয় করে ফেলব, পরের দিনের জন্যে সঞ্চয় করে রাখব না।'

সাধুদের মধ্যেই আবার কত ভিক্ষুক। মহারাজ, দুরোজ কিছু খাইনি। মহারাজ, ধুনির কাঠ নেই। কেউ বললে, জল খাবার লোটা নেই। কেউ বললে গাঁজা কিনতে পাচ্ছি না, ভজন বন্ধ হবার উপক্রম। কেউ বললে, প্রচণ্ড শীতে মারা যাচ্ছি, একটা করে কম্বল কিনে দিন। সব টাকা সন্ধের আগেই নিঃশেষ করে দিলেন গোঁসাই। কিন্তু দেখি কাল তিনি কেমন করে খাওয়ান!

ভোরবেলা এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক হাজির। 'স্বামীজি, যদি কৃপা করে আদেশ করেন সেবার জন্যে কিছু পাঠিয়ে দিই।'

গোঁসাইজি সম্মতি দিলেন। দুটো মুটের মাথায় প্রচুর জিনিস এসে উপস্থিত হল। চাল ডাল আটা ঘি থেকে সুরু করে দুধ দই মিষ্টি মায় তামাক টিকে পান শুপুরি।

গোঁসাইজি বলে দিলেন, 'আজকের মতো রেখে বাকি সমস্ত কাঙালীদের বিলিয়ে দাও। আকাশবৃত্তির কথা ভুলো না। একটা জিনিসও যেন কালকের জন্যে না থাকে।'

দেখি কাল কে পাঠায়! কাল কী করে খাওয়ান সবাইকে। কালকের কথা কালকে। চলো মাধোদাস বাবাজিকে দেখে আসি। মাধোদাসের আশ্রমে মহাপ্রভুর মন্দির। গোঁসাই গিয়ে দাঁড়াতেই মাধোদাস সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়লেন। গোঁসাই মহাপ্রভুর সামনে সাষ্টাঙ্গ হলেন ও সাধুর পদধূলি নিলেন। দুজনে বসলেন বারান্দায়। মাধোদাস বললেন, 'আপনি যে আজ এখানে আসবেন তা আমি জানতাম।'

'কী করে জানতেন ?'

'পুজোর সময় মহাপ্রভু আমাকে বলে দিলেন, বিজয় আজ আমাকে দেখতে আসবে। ওর জন্যে আমার প্রসাদ রেখে দিস।'

'কই দিন।' গোঁসাই হাত পাতলেন।

মালপো আর লাড্ডু প্রসাদ এনে দিলেন মাধোদাস। গোঁসাই নিজে কিছু নিয়ে বাকিটা ভক্তদের বিলিয়ে দিলেন।

'আমরা চড়ায় যাচ্ছি, আপনি আশীর্বাদ করুন।'

সাধু হাসলেন, বললেন, 'বীজ তুমিই বুনেছ, এখন গাছ হোক ফুল-ফল ধরুক, সব তোমার।'

'এই মাধোদাস কে ?' জিগগেস করল মহেন্দ্র।

'আমার গুরুভাই। তিরিশ বছর ঐ নির্জনে বসে ভজন করছেন।' বললেন গোঁসাইজি, 'কোথাও যান না। কেউ তাঁর খবর রাখে না।'

গোঁসাইয়ের তাঁবুর বাইরে প্রশস্ত দরজায় লেখা হল : 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।' শুধু তাই নয়, ভিতরে বেদী স্থাপন করে তার উপর বসানো হল গৌর-নিতাইয়ের বিগ্রহ। কীর্তন লাগাও। কিন্তু কীর্তন কি আজ জমছে না ? কারু মন কি আজ উদাসী হয়ে রয়েছে ?

'ভগবানের দিকে চোখ রেখে গান করো।' বললেন গোঁসাইজি, 'আর তাঁর দৃষ্টির এক কণা করুণা যদি পাও দিক-দেশ ভেসে যাবে।'

অন্যান্য সাধুরাও এসে জড় হতে লাগল।

গোঁসাইজি হঠাৎ হুঙ্কার করে উঠলেন : অবধূত ! অবধূত !

অমনি কোত্থেকে এক উলঙ্গ সন্ন্যাসী এসে হাজির, মুণ্ডিত মাথা, গায়ে ভস্মপ্রলেপ। এসে দু-হাত তুলে গোঁসাইয়ের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন। যে যে অবস্থায় ছিল সে ঠিক সেই অবস্থায় নিশ্চল হয়ে রইল। সকলের হাত পা অনড় কিন্তু খোল করতাল আপনা আপনি বাজতে লাগল। সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ বিগ্রহের মালা এনে গোঁসাইয়ের গলায় পরিয়ে দিলেন। তারপর ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে মিশে গেলেন কেউ দেখল না।

গোঁসাইজি বললেন, 'নিত্যানন্দ প্রভু অন্যদেহে প্রকট হয়ে এসেছিলেন। সংকীর্তনের সময় গৌর-নিতাই কী ভাবে দাঁড়াতেন সেই সচ্চিদানন্দ রূপে আমার দর্শন হল।'

ক্ষ্যাপাচাঁদ অর্জুন দাস বললে, 'আমি কী জানি কেন তাঁর পা টিপে দিলাম।'

প্রথম দিনই দেখা গেল বালির উপর পড়ে আছে ক্ষ্যাপাচাঁদ। কে এ ? 'অসাধারণ মহাপুরুষ'। বললেন গোঁসাই, 'সারা গা থেকে শুভ্র রশ্মি ছড়িয়ে পড়ছে। দেহমুক্ত ব্যোমচারী।'

বাইরে চেহারা দেখে তেমন কিছু মনে হবার উপায় নেই। কালো কদাকার কুলি-মজুরের মতো দেখতে। ছেঁড়া মাফলারের টুকরো দিয়ে কৌপীন করা। জটা নেই তিলক নেই মালা নেই বিভূতি নেই—কোনো সংস্কারেরই ধার ধারে না। সম্পত্তি বলতে একটা মাত্র লোহার কড়া, তাতেই পান, আহার ও শৌচ-ক্রিয়া চলে। গোঁসাই বলেন, 'জড়োন্মত্ত পিশাচবৎ। আসলে ত্রিকালজ্ঞ। শুধু জ্ঞানমার্গে নয় রাগমার্গেও এঁর অবস্থা অসাধারণ। পঞ্চভাবের যে কোনো ভাব ইচ্ছামাত্র সম্ভোগ করতে পারেন।'

গোঁসাইজির দেখা পাবার পর থেকে ক্ষ্যাপা গোঁসাইজির সঙ্গলিপ্সু। দিনমানে

যেখানে থাকুক সন্ধ্যা হলেই গোঁসাইজির তাঁবুতে বসে সে আড্ডা জমায় আর ছুটি নেয় ভোর রাতে। গোঁসাইকে দোঁহা পড়িয়ে শোনায়। রোজ প্রায় কুড়িটি দোঁহা পড়ায়, নিত্য নতুন দোঁহা, আর দোঁহার শেষ পাদে বলে, কহে অর্জুন, শোন ভাই সাধু।

শুধু দোঁহা? যে কোনো শাস্ত্র-পুরাণের একটি চরণ পাঠ করো, অর্জুন দাস আগে পিছে দশ বারোটি চরণ অনর্গল বলে যাবে।

বাঙলা না পড়েও মহাপ্রভুর তত্ত্ব তার জানা। 'বৈষ্ণবসাধনের কথা আপনি কী করে জানলেন?'

'ধ্যানমে মিলা।'

আর তার কী প্রেম! মানবপ্রেম—ঈশ্বরপ্রেম! কেউ কাউকে মারলে সে আঘাত নিজের প্রাণে অনুভব করে অর্জুন দাস আর বালকের মতো কাঁদে। আর সকল মানুষের মধ্যেই তার ইষ্টদেবের প্রকাশ এই উপলব্ধিতে যে-কাউকে সে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আরতি করে।

একদিন ক্ষ্যাপা দেখল পোল-বরাবর রাস্তা দিয়ে পুলিশ সাহেব ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে। কী মনে হল ক্ষ্যাপার, বড় বড় পা ফেলে ফেলে ঘোড়ার সঙ্গে ছুটতে লাগল। কী আশ্চর্য, কোত্থেকে ছুটে এসে ঘোড়ার সঙ্গ ধরেছে লোকটা, সমান বেগে চলেছে, সাহেব তীব্রতর গতিতে ঘোড়া ছোটাল। কী অভাবনীয় ব্যাপার, লোকটারও সেই সমান ক্ষিপ্রতা। শুধু ক্ষিপ্রতা নয়, যেন শূন্যের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। সাহেব বিমূঢ় হয়ে ঘোড়া থামালেন। ক্ষ্যাপাচাঁদও থামল। কী চাও তুমি? গর্জে উঠল সাহেব। ক্ষ্যাপা কিছু বলল না, ঘোড়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াল আর হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সাহেবের আরতি করতে লাগল।

'এ কী করছে?' পথচারী একটি ভদ্রলোককে সাহেব জিগগেস করল।

ভদ্রলোক বললে, 'এ এক পাগল।'

আরেকজন বললে, 'মোটেই পাগল নয়। এ একজন সাধু। তোমার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তির বিকাশ দেখে তোমাকে এ পুজো করছে।'

ক্ষ্যাপাচাঁদ বালকের মতো হাসতে লাগল।

সাহেবেরও মনে হল এ কখনোই পাগল নয়। পাগল কখনো ঘোড়ার সঙ্গে ছুটতে পারে! সাহেব ক্ষ্যাপাকে সেলাম করল; বললে, 'এ সাচ্চা সাধু হ্যায়—'

কিন্তু ক্ষ্যাপা গোঁসাইজির কাছে বসে কেবল কাঁদে কেন? চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিয়ে কাঁদে। গোঁসাইজি গ্রাহ্যও করেন না, চুপ করে বসে তার কান্না দেখেন। গোঁসাই যখন ইঙ্গিত করেন তখন একটু থামে আবার কতক্ষণ পরে সংস্কৃতে হিন্দিতে নানা অজানা ভাষায় স্তবস্তুতি সুরু করে। কখনো বা আরতি করতে করতে নাচতে সুরু করে। লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে: 'তাতা ধাইয়া তাতা ধাইয়া তাতা ধাইয়া। বৃন্দাবনমে বংশী বাজে নাচে কিষন কানহাইয়া।'

আবার কাঁদতে বসে বলে, 'তুমি আমার রামজি। তোমার সঙ্গে আমার তিন যুগ কেটে গেল—ত্রেতা দ্বাপর আর কলি—তুমি দর্শনই দিলে, চরম কৃপা তো করলে না। আমাকে তোমার করে নাও, আর যেন পুনর্জন্ম না হয়।'

চলো বৈষ্ণবশিরোমণি রামদাস কাঠিয়াবাবাকে দেখে আসি।

কাঠের কৌপীন পরেন বলে নাম কাঠিয়াবাবা। একটা বড় ছাতার নিচে সামান্য

কম্বলাসনে বসে আছেন, উজ্জ্বল দেহ ভস্মাবৃত। মাথার সরু সরু পিঙ্গল জটা পিঠের দিকে ঝুলে রয়েছে। শরীরে এত তেজ অথচ হৃদ্য স্নিগ্ধ আভা। দুটি চোখে মমতার মাধুরী। মনে হয় যেন কত কালের কত আপনার লোক, দেখলেই মন-প্রাণ যেন শীতল হয়ে যায়। প্রেমে স্নান করে উঠে।

কাঠিয়াবাবার আর এক নাম ব্রজবিদেহী। দেহে থেকেও তিনি দেহশূন্য।

গোঁসাই বাবাজিকে প্রণাম করলেন। বাবাজি প্রতিনমস্কার করলেন গোঁসাইকে। বসতে আসন দিলেন।

চড়ার উপরে তাঁবুর ভিতরে শুয়ে ভক্ত বলছে গোঁসাইকে, কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম!

'কোথায় ছিলে?'

'ব্রাহ্মসমাজে টানা পাখার নিচে ছিলাম এখন এই উন্মুক্ত গঙ্গার চড়ার উপরে কম্বল সম্বল করে শুয়ে আছি।'

'দেখ না আরো কতদূর যেতে হয়! কোন সর্বস্বান্তের কিনারে।' গোঁসাইজি অভয় দিলেন: 'ভগবান যার কাছে ধরা দেন তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়েই ধরা দেন।'

৩১

আরো এক কাঠিয়াবাবার সঙ্গে দেখা হল, নাম ছোট কাঠিয়াবাবা। এরও পরিধানে কাঠের কোপীন, গা খোলা, রেশম-পশম-তুলো তন্তুমাত্র আচ্ছাদন নেই, না জটা বা মালাতিলকের আড়ম্বর। মুক্ত আকাশের নিচে ছেঁড়া একটা চ্যাটাইয়ের উপর বসে আছে। শরীর শক্ত ও মজবুত কিন্তু মুখখানি শিশুর মতো সুকুমার। কথাও শিশুর মতো আধো-আধো। বারে বারে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। যত দেখা যায় মনে হয় আরো একবার দেখি।

কিন্তু সাধু দেখে শুধু গোঁসাইকে। রোজ দু-তিনবার করে গোঁসাইয়ের আড্ডায় আসে আর ধুনির ওপারে ঠাকুরের মুখোমুখি হয়ে বসে। দুটি হাত জোড় করে ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আর কাঁদে।

গোঁসাইজি বলেন, 'ইনি এক সিদ্ধ মহাপুরুষ, ভরতের ভাবে রামের উপাসনা করেন। পাঁচ শো বছর আগে দেহকল্প করেছিলেন, এখনো অটুট আছেন। একটিও চুল পাকেনি, দাঁত পড়েনি। শরীরের কোনো গ্রন্থি ঢিলে হয়নি এতটুকু।'

'থাকেন কোথায়?'

'পাহাড়ে। কোনো আশ্রয় নেই অবলম্বন নেই। এমনকি গাঁজা-চরস পর্যন্ত খান না। আগে খেতেন, তবে ওসব সংগ্রহ করতে হলে লোকালয়ে আসতে হয় আর তাতে অনেক সময় নষ্ট হয় বলে ছেড়ে দিয়েছেন।'

কিন্তু এই ছাউনিতে বারে বারে আসে কেন? কিসের লোভে?

'বা, এই তাঁবুতে যে আমার রামজি থাকেন। যখনই আসি তখনই রামজির দেখা পাই। আসব না আমি? আমাকে আসতে কি কেউ বারণ করছেন?'

যেন বারণ করলে শুনবে। যেন কারু সাধ্য আছে তার রামপ্রণাম বন্ধ করে!

সাধু নরসিংহ দাসকে দেখ। আরেক নাম পাহাড়ীবাবা। 'তুহি মেরা প্রাণ' বলে যাকে খুশি আলিঙ্গন করে ধরে, আর যে সেই আলিঙ্গন পায় নিমেষে পুলকপ্রাবল্যে প্রায় বিহ্বল হয়ে পড়ে। খিদে পেলে সামনে যাকে পায় তারই কাছে হাত পাতে, কিছু না দিয়ে পালায় এমন সাধ্য কী। সাধু থাকে কোথায় ? মানস সরোবরে। মানসেই সরস হয়ে আছে। নইলে এমনি করে প্রাণের আলিঙ্গন বিলোয় কী করে !

আর একে চেন ? এর নাম ভিখন দাস, পাটনার কাছাকাছি কোথাও আশ্রম। বহির্বাস সাধারণ কৌপীন, গলায় তুলসীর মালা, গোপীচন্দনের তিলক। প্রেমঘন প্রসন্ন দৃষ্টি। এরও বৈশিষ্ট্য আকাশবৃত্তি। আজকের বস্তু কালকের জন্যে সঞ্চয় করে না। যদি ভাণ্ডারার অভাব হয়, রঘুনাথজীর দরজায় গিয়ে ধন্না দেয়। বলে, ধন্না পাবার জন্যেই রঘুনাথজির এই কৌশল। ধন্নার সঙ্গে-সঙ্গেই কোত্থেকে কে জানে খাদ্যবস্তু এসে পড়ে। বলে, মা গঙ্গা নিরবচ্ছিন্ন বয়ে চলেছেন, কারু অপেক্ষা না রেখে, তেমনি ভগবৎকৃপা বিশ্বময় বয়ে চলেছে। আমি গঙ্গাস্রোতে হাত রাখছি স্পর্শে পবিত্র হবার জন্যে, তেমনি ভগবানের কৃপাস্রোতে আমার প্রার্থনাটি রাখছি ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে। এস এস। গোঁসাইজি নিজের আসনের পাশটিতে ভিখন দাসকে বসালেন আদর করে।

আর ইনি নাথ যোগীদের মোহান্ত, গম্ভীরনাথ। ইনিও গয়ার কাছে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের সানুতে কপিলধারায় যোগসাধন করে সিদ্ধ হয়েছেন। এমন নিত্যযুক্ত যোগী কম মেলে। গোঁসাইজি বলেন, অভিমন্যুকে সপ্তরথী মিলে মেরেছে। অভিমন্যু হচ্ছে অভিমান। আর আমার সপ্তরথী হচ্ছে গয়ার গম্ভীরনাথ, অযোধ্যার মাধোদাস, নবদ্বীপের চৈতন্যদাস, কাশীর তৈলঙ্গস্বামী, মেছুয়াবাজারের সন্ন্যাসী, দার্জিলিঙের লামা আর মানসসরোবরের পরমহংস। গায়ে যেমন শীত বা তাপের অনুভব হয় তেমনি গম্ভীরনাথের কাছে গিয়ে বসলে হয় যোগানুভব।

এ কে, এক উগ্রতেজী সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত। গোঁসাইজিকে বললে, 'তুমি অহর্নিশ যে সমাধিতে থাকো তা শাস্ত্রসম্মত নয়। শাস্ত্রে বলে—' বলে একগাদা সংস্কৃত আওড়াতে লাগল।

পনেরো-ষোলো বছরের একটি হিন্দুস্থানী বালকসন্ন্যাসী অদূরে এসে বসল। কতক্ষণ শুনে বিদ্রূপের হাসি হেসে বালক বললে, 'আরে! কাকে আপনি শাস্ত্র শোনাচ্ছেন ? শাস্ত্রের আপনি জানেন কী !'

'বটে।' বালকের স্পর্ধায় সন্ন্যাসী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল : 'তুমি কী বোঝ ! কোথাকার চ্যাংড়া ছোকরা, তুমি শাস্ত্রের নাম শুনেছ কোনোদিন ?'

বালক গম্ভীর হয়ে বললে, 'সমস্ত শাস্ত্র আমার মুখস্থ।'

মহাশব্দে হেসে উঠল সন্ন্যাসী। বললে, 'এটা কোন শাস্ত্রে আছে বলতে পারো ?'

'ব্যস, খুব হয়েছে।' বালক টিটকারি দিয়ে উঠল : 'উচ্চারণ ঠিক নেই, ছন্দজ্ঞান ঠিক নেই, শাস্ত্র বাতলাতে এসেছেন !'

'তুমি ছন্দের কী জানো ! মুখ দিয়ে ভালো করে এখনো কথা ফোটেনি, উচ্চারণ শেখাতে এসেছে।' সন্ন্যাসী প্রায় মারমুখো হয়ে উঠল : 'শাস্ত্র তো মুখস্থ বলছ কিন্তু এক চরণ আবৃত্তি করো তো।'

'বেশ, তবে শুনুন। বসুন চুপ করে।'

বালক তখন শাস্ত্রশ্লোক আবৃত্তি করতে লাগল। যেমন ছন্দজ্ঞান তেমনি উচ্চারণ। যত রকম সমাধির কথা শাস্ত্রে বলা আছে তা বললে অনর্গল, ব্যাখ্যা করে বোঝালে।

সন্ন্যাসী তো হতভম্ব। যারা এতক্ষণ বালকের প্রতি উপেক্ষমান ছিল তারাও বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। এ কী অকাট্যপ্রকটন।

বালক গোঁসাইজিকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি যে অবস্থায় আছেন তার চেয়ে উচ্চতর অবস্থা নরদেহে সম্ভব নয়। এর চেয়ে এক রেণু উপরে উঠতে গেলেই দেহ ছুটে যাবে। এঁর এখনো দেহ ছেড়ে যাবার সময় হয়নি।'

গোঁসাইজি বালককে এগিয়ে আসতে ইশারা করলেন। বালক ধুনির সামনে এসে বসল। গোঁসাইজি তাকে প্রণাম করলেন। সন্ন্যাসী পালিয়ে গেল।

অন্তরঙ্গ ভক্ত গোঁসাইজিকে জিগগেস করল, বালকটি কে ?

গোঁসাইজি বললেন, 'কাশীর তৈলঙ্গ স্বামী। মৃত একটি ব্রাহ্মণ বালকের দেহে আবির্ভূত হয়েছিলেন।'

তখন উপস্থিত সকলে হায়-হায় করে উঠল। ঠাকুর নিজে প্রণাম করলেন, তা জেনেও আমাদের মাথা নোয়াবার মতি হল না। আমাদের গতি কী হবে !

আর ঐ দেখ হরিদ্বারের মহাত্মা। দণ্ডী সন্ন্যাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যেমন ঐশ্বর্য তেমনি মাধুর্য। নাম বলে দিতে হবে ? নাম ভোলা গিরি।

আজ উত্তর সংক্রান্তিতে মকরস্নান। শুরু হয়েছে সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রা। প্রথমে নাগাসন্ন্যাসীদের দল, তাদের অগ্রণী ভোলা গিরি, চলেছেন ঘোড়ায় চড়ে। সন্ন্যাসীদের কাঁধে ঝাণ্ডা, আবার কারু হাতে চামর, সেই ঝাণ্ডাকেই ব্যজন করতে-করতে চলেছে। তাদের পিছনে ত্রিপুণ্ড্রধারীর দল, হাতে দণ্ড-কমণ্ডলু। তাদের পিছনে জটিল ব্রহ্মচারীরা, চলেছে নতশিরে। এর পর দিগম্বর উদাসীদের দল। ক্রমে ক্রমে দশনামা, নির্মলা, আকালী, কত রকম সম্প্রদায়। এগুচ্ছে আর স্নান করে করে ফিরছে। তুমুল আনন্দনাদে স্বর্গ মর্ত একাকার হয়ে যাচ্ছে।

সন্ন্যাসীদের পরে বৈষ্ণবের দল আর তাদের অগ্রনায়ক রামদাস কাঠিয়াবাবা। তাদের কারু কারু কণ্ঠে 'সীয়ারাম' 'সীয়ারাম', কারু কারু কণ্ঠে বা 'রাধেশ্যাম' 'রাধেশ্যাম'। কখনো গর্জন কখনো বা গদ্গদস্বভাষ।

তীর্থগুরু ভক্তদের স্নানমন্ত্র পড়াচ্ছে। বলো, ধন দাও জন দাও স্বর্গ দাও মোক্ষ দাও।

গোঁসাইজি শুনতে পেয়ে আপত্তি করলেন। ও সব কী চাইতে বলছেন ? ও সব কি চাইবার মতো ?

সে কি ? সংকল্পমন্ত্র পড়াব না ?

না। আমাদের সংকল্প বিকল্প নেই। শুধু ভগবৎপ্রীতির জন্যেই আমাদের এই স্নান। এর বাইরে আমাদের কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, থাকতে পারে না।

কিন্তু স্নানশেষে কথা উঠল গোঁসাইজিকে নিয়ে। বৈষ্ণবদের মাথার উপরে উঠে আড্ডা গেড়েছেন, কী এঁর অধিকার ? অনেক কুম্ভমেলায় আমরা এসেছি, চড়ায় থেকেছি কিন্তু কোনো বাঙালী সাধুকে ছাউনি করে এমনি জাঁকিয়ে বসতে কোনোদিন দেখিনি। আগে ব্রাহ্ম ছিল পরে সাধু হয়েছে এমনি এক বাঙালী বন্ধু গোঁসাইয়ের বিরুদ্ধে দল পাকাল।

দেখুন না, বৈষ্ণবদের মধ্যে স্থান নিয়েছে অথচ বৈষ্ণবদের প্রচলিত বেশ পরেনি। পরেছে গেরুয়া। গলায় শুধু তুলসী নয়, তুলসীর সঙ্গে রুদ্রাক্ষের মালা। তিলক ধারণ করেছে অথচ আবার জটা রেখেছে, দণ্ড-কমণ্ডলুও বাদ দেয় নি। আরো দেখুন, আশ্রমে দুটি বিগ্রহ স্থাপন করেছে দশাবতারের মধ্যে যাদের নামোল্লেখ নেই। নাম শুনবেন তাদের? সীতা-রাম বা রাধা-কৃষ্ণ নয়, তাদের নাম গৌর-নিতাই। গৌর-নিতাইয়ের পূজা কি শাস্ত্রবিহিত? আরো দেখুন কাণ্ড, আশ্রমে মহিলাদের স্থান দিয়েছে। হলই বা না তারা শাশুড়ি বা কন্যা, কিন্তু সন্ন্যাসীর সঙ্গে সংসারের সংশ্রব হয় কী করে?

এ সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের অপমান। এর মীমাংসার জন্যে সভা বসুক। সভা যদি সমর্থন না করে মেলা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক গোঁসাইকে।

'গোঁসাইজি যে বেশ ধারণ করেছেন শাস্ত্রে তার উল্লেখ আছে।' বললে অমরেশ্বরানন্দ, 'তার নাম অবধূতবেশ। পদ্মপুরাণেও আছে তুলসী আর রুদ্রাক্ষের সহাবস্থিতির কথা।'

'পদ্মপুরাণ বৈষ্ণবদের প্রামাণ্য গ্রন্থ।' সমর্থন করল বৃদ্ধ পরমানন্দ।

'আর গৌর-নিতাই?' অমরেশ্বরানন্দ আবার বললে, 'নবদ্বীপে আমি শাস্ত্র পাঠ করেছি। আমি জানি বাঙলাদেশে শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা হয়। আর গৌর নিতাই যে কৃষ্ণ আর বলরামের অবতার সে কথার প্রমাণ শাস্ত্রেই দেওয়া আছে।'

তাই বলে আশ্রমে স্ত্রীলোক রাখবে? এবার উঠলেন স্বয়ং ভোলা গিরি। বললেন, 'সন্ন্যাসী-আশ্রমে স্ত্রীলোক রাখা নিষিদ্ধ বটে কিন্তু তা সাধারণের পক্ষে, সামর্থ্যবানের পক্ষে নয়। গোস্বামী-প্রভু সমর্থতম পুরুষ, সাক্ষাৎ শিবচ্ছবি। যে জীবন্মুক্ত সে সমস্ত বিধিনিষেধের অতীত। দেখছ না অহর্নিশ ইনি কেমন সমাধিমগ্ন! কেমন প্রেমদ্রব!'

'সাক্ষাৎ মহেশ্বর।' বললেন কাঠিয়াবাবা, 'এঁর কপালে আগুন জ্বলছে, যা কিছু এতে পড়ছে, পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে! যেমন তেজস্বী তেমনি প্রেমিক। বৈষ্ণবদের মহাভাগ্য যে ইনি তাদের মধ্যে ছাউনি করে রয়েছেন।'

সমগ্র সন্ন্যাসীমণ্ডলে হৈ-চৈ পড়ে গেল। সমস্ত সম্প্রদায়ের নেতারাই গোঁসাইকে শিবতুল্য বলে মেনেছেন। কোথায় মেলা থেকে তিনি বিতাড়িত হবেন, তা নয়, দলে দলে সকলে গোঁসাইকে দর্শন করতে ভিড় করে দাঁড়াল। স্থির হয়ে পূজাবিনম্র হয়ে দাঁড়াল। কৌতূহলীর দৃষ্টি নিয়ে নয়, ভক্তি-পবিত্র শরণাগতের দৃষ্টি নিয়ে।

'এ সাধুর নাম কী?'

ঠাকুরের সন্ন্যাসনাম অচ্যুতানন্দ। তাই এবার প্রচার হল।

'আপনারা কোন সম্প্রদায়?'

'মাধ্বাচার্য সম্প্রদায়।'

সমস্ত সন্দেহ নিরস্ত হল। নিষ্পত্তি হল সমস্ত তর্কের। স্থাপিত হল অখণ্ড মহিমা। দয়ালদাস স্বামী তার ছাউনিতে গোঁসাইকে সশিষ্য নিমন্ত্রণ করল। বললে, 'আমার এক শিষ্য বাঙালী শিষ্য, আপনাকে তাড়াবার চেষ্টায় অগ্রণী ছিল, তাতে মনে আমি ভীষণ ক্লেশ পাচ্ছিলাম। এখন আপনার মহিমা যখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে তখন আপনাকে বিশেষ সম্মান দেবার জন্যেই আমার নিমন্ত্রণ।'

গোঁসাই বললেন, 'আমি সম্মানের ভিখারি নই।'

'তা কি আমি জানিনা? এ সম্মান গৌর-নিতাইকে। সংকীর্তনকে! চলুন আমার ছাউনিতে কীর্তন করবেন চলুন।'

কীর্তনের নাম শুনলে কে স্থির থাকে ? চলো দয়ালদাসের ছাউনিতে ভিক্ষে নিই গে। নামগানের বন্যা আনি। চড়ার উপর দিয়ে যাচ্ছেন দেখতে পেলেন তাঁবুর একধারে তক্তপোষের উপর মখমলের গদিতে এক সাধু বসে আছে। রাজার মতো চেহারা, রাজার মতো সাজগোজ। গলায় হীরে-মুক্তোর মালা, মাথায় দামি সিল্কের পাগড়ি, গায়ে গেরুয়া রঙের আলখাল্লা। এপাশে ওপাশে পিছনে মোটাসোটা মখমলের তাকিয়া। তাঁবুর ভিতরে বাইরে ধনী মাড়োয়ারী শিষ্যদের ভিড়। পুঞ্জীকৃত উপহারের দ্রব্য।

'এ রকম বিলাসী আবার সন্ন্যাসী নাকি ?' এক ভক্ত নালিশ করল গোঁসাইয়ের কাছে : 'কোথায় ত্যাগের আগুন হয়ে থাকবে, তা নয়, আসক্তির আঠা হয়ে আছে।'

গোঁসাইজি কোনো কথা কইলেন না।

'নবাব সাধুর নাম জানেন ?'

'নাম জানি। তবে সাধু নবাব কিনা তা জানি না।'

'কী নাম ?'

'নাম সঙ্করাণ্য।'

সেদিন সন্ধ্যায় চারদিক আঁধার করে দুর্দান্ত ঝড় উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নামল প্রচণ্ড বৃষ্টি। সমস্ত ছাউনি-ছাতা উড়ে গেল। হাজার হাজার সাধু সেই অনাবৃত আকাশের নিচে শুয়ে রইল। কোথায় বা কম্বল, কোথায় বা ধুনি। পরদিন ঝড় থামলেও বৃষ্টি থামল না।

তাঁবুর বাইরে এক দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী এসে হাজির। বললে, 'আপনাদের ভাণ্ডারে কোনো জিনিস লাগবে ? বৃষ্টিতে সব তছনছ করে দিয়েছে। যদি লাগে তো বলুন পাঠিয়ে দেব। সমস্ত রাত ধরে সকলের কাছে গিয়ে গিয়ে জানছি কার কী লাগবে, আর যার যা দরকার তাই দিচ্ছি পাঠিয়ে। সর্বক্ষণ ছুটোছুটির উপর আছি, বলুন, দেরি করবেন না।'

'ধরুন চাল লাগবে আর কাঠ আর ঘি—' ভক্ত বলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। শুধোল : 'এ কী, আপনার পায়ে রক্ত কেন ?'

'ও কিছু নয়।' সাধু পাশ কাটাতে চাইল : 'জলকাদায় ছুটোছুটি করতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেছি বারকতক, তাই খানিক কেটেকুটে গিয়েছে। ও কিছু নয়। ঐ নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে আর কাজ হয় না। যত শিগগির সম্ভব আপনাদের জিনিস আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।' বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতেই বেরিয়ে গেল সন্ন্যাসী।

'এ কে মহাপুরুষ ?' ভক্ত জিজ্ঞেস করলে গোঁসাইকে : 'নিজের শরীরকে তুচ্ছ করে পরোপকার করে বেড়াচ্ছে। আঘাতের দিকে পর্যন্ত তাকাচ্ছে না। কে এ ?'

'সে কী ? এঁকে চিনতে পারলে না ?'

'আগে দেখেছি কি কখনো ?'

'দেখেছ বৈ কি। ইনিই তোমার সেই বিলাসী সাধু সঙ্করাণ্য। যাকে তোমার সন্ন্যাসের অনুপযুক্ত মনে হয়েছিল।'

'বলেন কী ! এত বড় ত্যাগী, এত বড় পরোপকারী !'

'হ্যাঁ, শুধু বাইরেটা দেখেই বিচার কোরো না।' বললেন গোঁসাই প্রভু, 'ভক্তশিষ্যেরা যদি গুরুকে সাজিয়ে সুখ পায় তা হলে গুরু কি তাদেরকে বঞ্চনা করবে ? নিরাসক্ত পুরুষের কী আসে যায় দুটো তুচ্ছ সাজসজ্জায় ? শুধু ভক্তচিত্তবিনোদনের জন্যেই গুরুর এই বিলাসভাব।'

সংকল্পাগ্নের উদ্দেশে প্রণাম করল ভক্ত। যেন কাউকে বিচার না করি। যেন চোখের দেখাকেই না সার বলে মানি।

এ আবার কে এল তাঁবুতে? রাত তখন প্রায় এগারোটা, তখনো সমানে বৃষ্টি চলছে। ধুনির সামনে গোঁসাইজি আসনে বসে আছেন, আর সকলে কেউ ঘুমুচ্ছে নয়তো বসে বসে ঢুলছে। এ অসময়ে কে এই রসময়? সাধু-সন্ন্যাসী নয়, মাথায় টুপি, কোট-প্যাণ্ট পরা সাধারণ এক দিশি সাহেব। কিন্তু ঠাকুরের এ কী ব্যবহার! একেবারে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, বুকে জড়িয়ে ধরলেন সাহেবকে, আর যা অসাধারণ, নিজের আসনে তাকে বসালেন। তারপর দুজনে ঘন হয়ে বসে নিম্নস্বরে কথা বলতে লাগলেন। বাইরে তখনো ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টির শব্দে তাদের কথা ভক্তেরা কেউ শুনতে পেল না। দিশি সাহেব হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমি এখন যাব।

সে কি, এই বৃষ্টির মধ্যেই? ভক্তদল চঞ্চল হয়ে উঠল। যদি একান্তই যাবেন, ছাতা দিই, ছাতা নিয়ে যান।

একজন ছাতা দিতে যাচ্ছিল, ঠাকুর বাধা দিলেন। বললেন, 'ওঁর ছাতার দরকার হবে না। দেখলে না বৃষ্টির মধ্যে এলেন, গায়ে এক ফোঁটাও জল লাগেনি!'

সত্যিই তো, এ আমরা লক্ষ্য করিনি এতক্ষণ।

'ইনি কে? নাম কী?'

'ইনি আমার গুরুভাই। নাম সা-সাহেব।' বললেন গোঁসাইজি।

'মুসলমান?'

'ছিলেন। বলতেন, হিন্দু-মুসলমান সকলেরই সেই এক উৎস। যিনি বৃন্দাবনে ধেনু চরিয়েছিলেন তিনিই আবার আরবদেশে ছাগল চরিয়েছিলেন।' বললেন গোঁসাইজি, 'এখন পরমহংস অবস্থা। এখন ওঁর শক্তি অসাধারণ। জল ওঁকে সিক্ত করতে পারে না। আগুন পারে না দগ্ধ করতে। এলাহাবাদে খুব গোপনে আছেন, আমরা কী ভাবে আছি, খবর নিতে এসেছিলেন।'

তারপর মেলার শেষে গোঁসাইজি যখন কলকাতায় ফিরছেন ছুটতে-ছুটতে রেল স্টেশনে সা-সাহেব এসে হাজির। একটা কামরায় সবাইকে নিয়ে গোঁসাইজি উঠেছেন, সা-সাহেব সেখানে গিয়ে পড়ল। এ করেছেন কী? এ কামরায় নয়, পিছনের কামরায় গিয়ে উঠুন। সে আবার কী কথা! তাছাড়া গাড়ি ছাড়তে চার পাঁচ মিনিট মাত্র বাকি আছে। এখন কী আর এ হাঙ্গামা পোষায়? মোটঘাটই বা কত! কিন্তু ঠাকুর উঠে পড়লেন। গুরু ভাইয়ের, সা-সাহেবের, নির্দেশ তিনি অগ্রাহ্য করতে রাজি নন।

মগরা স্টেশনে মুখোমুখি একটা ট্রেনের সঙ্গে ঠাকুরদের ডাউন ট্রেনের প্রচণ্ড কলিশন হল। ঠাকুরদের কামরার আগের ও পিছের কামরা দুটো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, মাঝখানের কামরাটার কিছু হল না! যেমন নিটুট, তেমনি নিখুঁত রইল। এখন বুঝতে পারলে সা-সাহেবের কতখানি শক্তি! গুরুভাইয়ের জন্যে কতখানি ব্যাকুলতা।

কলিশনে গোঁসাই ও তাঁর শিষ্যদের কামরাটা অটুট থাকল বটে কিন্তু গোঁসাই তাঁর পদতলে আঘাত পেলেন। কেন, তাঁর আবার আঘাত কেন? রহস্যটা কী? গোঁসাই বললেন বটে সা-সাহেবের আশ্চর্য শক্তি, লোকেও তাই জানল বটে, কিন্তু আসল শক্তি গোঁসাইয়ের। যখন সংঘর্ষ হল গোঁসাই-ই পদভরে সমস্ত শক্তি নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে কামরাটাকে স্থির রাখলেন। তাইতেই তাঁর পায়ে আঘাত। সা-সাহেবের তিনি অমর্যাদা ঘটাতে পারেন না বলেই সা-সাহেবের শক্তির প্রশংসা করলেন, আত্মপ্রচার করলেন না।

কলকাতায় এসে উঠেলেন কবিরাজ বিজয়রত্ন সেনের বাড়ি। সেখানে কদিন থেকে গেলেন কালনা। কালনা থেকে নবদ্বীপে এসে সশিষ্য উঠলেন টোলবাড়িতে, রঘুনাথ বিদ্যারত্নের হরিসভায়। হরিসভায় মহাপ্রভুর বিগ্রহ। এমন মনোহর ভঙ্গিমা তো দেখিনি কোথাও। কী করে দেখবে? যে ভঙ্গিমায় বিদ্যারত্নের অন্তরে প্রকাশিত হয়েছিলেন এ বিগ্রহ তারই প্রতিরূপ। আজ ফাল্গুনী পূর্ণিমা। তার উপর আবার সন্ধ্যাতেই চন্দ্রগ্রহণ। আজ একেবারে হুবহু মহাপ্রভুর অবতরণের লগ্ন।

কী না জানি হয়! কে না জানি আসে! হাজার হাজার ভক্ত স্নানার্থী গঙ্গাতীরে এসে জমেছে। শতশত দলে সুরু হয়েছে কীর্তন, আর্তনাদ, হুংকার-গর্জন—তুমি এস, তুমি দেখা দাও, তুমি আবার সেই হরিনামের বন্যা আনো! জয় শচীনন্দন! জয় শচীনন্দন! গদগদ কণ্ঠে মহাপ্রভুকে আহ্বান করতে করতে গঙ্গাতীরে এসে দাঁড়ালেন গোঁসাই। তাঁর সঙ্গের শিষ্যভক্তদল নৃত্য কীর্তনে মুখর হয়ে উঠল। লোকারণ্য গঙ্গার ঘাট, সকলে অনুভব করল সপার্ষদ মহাপ্রভুই সংকীর্তন করছেন। আর কথা নেই, সর্বব্যাপী আনন্দ-ক্রন্দন, এ আমাদের মহাপ্রভুরই নবাবির্ভাব। এ আবার তাঁর নতুন করুণা। দু-বাহু প্রসারিত করে সাধু হরবোলানন্দ ছুটে এলেন। গোঁসাইও দু-বাহু মেলে ধরলেন। পরস্পরের আলিঙ্গনে গাঢ়বদ্ধ হলেন দুজনে। তারপর সুরু করলেন উত্তাল নৃত্য।

'ওগো আমাদের সেই গৌর-নিতাই নাচছে গো।' সকলে বলে উঠল একবাক্যে: 'ওগো এই যে আমাদের দুই আরাধনার ধন।'

'এই যে এ্যাদ্দিন পরে পেয়েছি সামনে।' কোত্থেকে একটা লোক ছুটে এল গোঁসাইয়ের দিকে। তার হাতে একটা বাঁশ। বলছে, 'তোকে আজ বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে ঠিক করব।'

কী হল? কী হল? ভক্তদল তাকে রুখতে এগিয়ে এল। কেন কী ব্যাপার?

'কী ব্যাপার! ও এ্যাদ্দিন আসেনি কেন? কেন এত দেরি করল? কোথায় ছিল এ্যাদ্দিন? আজ ওর একদিন কি আমার একদিন!'

গোঁসাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাঁশকে কী করে বাঁশি করতে হয় গোঁসাই ছাড়া আর কে জানে। ক্ষিপ্তপ্রায় লোকটা হঠাৎ বাঁশ ফেলে দিয়ে গোঁসাইয়ের পায়ের নিচে লুটিয়ে পড়ল। কোথায় তর্জন-গর্জন, হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল। কতক্ষণ পরে উঠে পড়ে নাচতে সুরু করল। গান ধরল স্বতঃস্ফূর্ত।

'গোলোক হতে অবনীতে, জীবে প্রেম বিলাইতে
উদয় হল রে।

উত্তম অধম নাই, যারে দেখে আপন ঠাঁই
ধরিয়া ধরিয়া প্রেম করে ॥'

শুধু বংশকেই বাঁশি করেন না ঠাকুর, উদ্ধতিকে নিয়ে আসেন শ্রদ্ধায়, হুঙ্কারকে ক্রন্দনে, আস্ফালনকে নৃত্যে, সমস্ত অস্তিত্বকে বিনম্র শরণাগতিতে।

গ্রহণ লেগেছে। গ্রহণ লেগেছে।

'ঐ দ্যাখ, ঐ দ্যাখ।' গোঁসাই আঙুল তুলে দেখালেন চাঁদের দিকে। নিজেই অনিমেষে তাকিয়ে রইলেন। কী দেখলেন কী দেখালেন কে বলবে। দেখতে দেখতে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। শিষ্যভক্তেরা তাঁকে ধরে বসিয়ে দিল। চাঁদ যতক্ষণ রাহুগ্রস্ত, রাহুস্পৃষ্ট থাকল, উঠলেন না সমাধি থেকে। তিনঘণ্টা পর চাঁদের মোচন হল। তখন গোঁসাই জাগ্রত হলেন।

চলো চলো এবার সকলে স্নান করি।

শুধুই কি স্নান? সুরু হল সেই জলকেলি, এর ওর গায়ে জল ছিটোনোর খেলা। বালকের মতোই গোঁসাইয়ের দৌরাত্ম্য, বালকের মতোই আবার আনন্দে ভোলানাথ। স্নানান্তে তীরে উঠতেই কে একটি বালিকা গোঁসাইয়ের জন্যে সরবৎ নিয়ে এল। নাও, প্রসাদ পাও।

'কে রে মা তুই?'

মেয়েটি কিছু বলে না, মুখ টিপে টিপে হাসে।

'শুধু আমাকেই দিবি, আমার ভক্তদের দিবিনে?'

'বা, সবাইকে দেব। ভয় নেই, আমার টান পড়বে না।'

ভক্তরাও প্রসাদ পেল। কিন্তু এ যে কে, কার মেয়ে, কেউ বলতে পারে না। সরবৎ খাইয়ে চলে গেল মেয়ে। কোথায় তুমি থাকো? কোথাও না।

পরদিন সকালে এক বুড়ি এক ভাঁড় দুধ নিয়ে উপস্থিত। এ আবার কী মূর্তি!

গোঁসাইয়ের ভক্তশিষ্যদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'এ কী, তোরা এখানে কী করে এলি? তোরা যে সব ব্রজের লোক। কী আশ্চর্য, তোদেরই দেখব বলে কবে থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তোরা এখানে? বোস, তোদেরকে দুধ খাওয়াচ্ছি।'

একটা গ্লাসে ভাঁড় থেকে দুধ ঢালল বুড়ি। আগে গোঁসাইকে খাওয়াল। পরে আবার এক গ্লাস ভরল। এক ভক্ত খেতে আবার আরেক গ্লাস।

'কতজন ভক্ত এখানে দেখেছ?'

'দেখেছি। আমার টান পড়বে না। আমার ভাঁড় অফুরন্ত।'

ভক্তদের মধ্যে বসে আছে হারমোহন পণ্ডিত। সে বললে, 'আমি খাব না।'

'কেন?'

'পাত্র এঁটো হয়ে গেছে।' বললে পণ্ডিত।

'এঁটো কি হে? এ যে প্রসাদ। প্রসাদ কখনো এঁটো হয়?' বললেন গোঁসাই, 'নিন, খেয়ে নিন।'

তখন পণ্ডিত চোখ বুজে খেয়ে নিল।

'পাতে মোড়া ও কী?' গয়লানিকে জিজ্ঞেস করল এক ভক্ত।

'ও আছে এক জিনিস।'

'দেখি না!'

'ও তোমাদের দেব না। তোমরা দুধ খাও।'

'ও কাকে দেবে?'

'দুটো ছেলে অনেক ঘুরে-টুরে হয়রান হয়ে আসে আমার কাছে, খেতে চায়। এই ক্ষীরটুকু ওদের জন্যে রেখেছি। এখানেও তো ওরা আসে—তাই না?' গয়লানি তাকাল গোঁসাইয়ের দিকে।

'আসে।' গোঁসাই সম্মতিতে মাথা নাড়লেন।

'আজ এলে একটু তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিও।' বুড়ি পরে আপন মনে বললে, 'বড় ছেলেটি বেশি ভালো, কেমন আলভোলা, হাঁকডাক করে খায়। আর ছোটটি ঠান্ডা।'

দেব পাঠিয়ে।'

বুড়ি চলে গেল ডগমগ হয়ে। গোঁসাই বললেন, 'যশোদাভাবে আছেন। খুব উচ্চ স্তরের সাধিকা।'

মহাপ্রভুর বাড়িতে রসিক দাসের কীর্তন হবে। গোঁসাই সেখানে চললেন সদলে। পৌঁছুতেই রসিক এসে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল ঠাকুরকে। আশীর্বাদ ভিক্ষা করল সংকীর্তন যেন সার্থক হয়। গোঁসাই তার মাথায় হাত রেখে বললেন, মঙ্গল হোক।

আর রসিককে পায় কে। কয়েক মিনিটের মধ্যে কীর্তন তুমুল জমিয়ে ফেলল রসিক। ঐ তো, ঐ তো—মহাপ্রভুর বিগ্রহের দিকে আঙুল দেখিয়ে লাফিয়ে উঠলেন গোঁসাই—যেন পলকে সকলের দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল, সভামধ্যে দেখতে পেল মহাপ্রভুকে। আকাশস্পর্শী হরিধ্বনি উঠল। জয় শচীনন্দন। জয় শচীনন্দন! রসিক সার্থক। রসিকের কীর্তন সার্থক। রসিকের সর্বত্র মঙ্গল। চলো রাইমাতার বাড়ি যাই। সে আবার কে? এক তপস্বিনী বৈষ্ণবী। শুনে কী বুঝবে? দেখবে চলো। 'ওগো আমার বাড়ি অদ্বৈত এসেছে গো।' সশিষ্য ভক্ত গোঁসাইকে দেখে বৃদ্ধা বৈষ্ণবী রাইমাতা উল্লাসে হাঁক পাড়ল। 'তোরা কে কোথায় আছিস দেখে যা—যার ডাকে মহাপ্রভু নেমে এসেছিলেন বৈকুণ্ঠ থেকে—ওরে সে, সে আমার বাড়ি এসেছে—'

কী করবে, লোক ডাকবে না আগে বসতে দেবে, কোথায় বা বসতে দেবে—ব্যাকুল হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল রাইমা।

গোঁসাই নিজের থেকে সকলকে নিয়ে দাওয়ায় বসলেন। বললেন, 'আমরা বেশ বসেছি। তুমিও বোসো চুপচাপ।'

'ওরে তুইই তো মহাপ্রভুকে এনেছিলি, আচণ্ডালে হরিনাম বিলিয়ে জীবোদ্ধার করেছিলি—ওরে তোকে পেয়ে আমি স্থির থাকি কি করে? আমার ছেলেদের মুখ শুকনো—তাদের আমি কী খেতে দিই? তুইও তো ঐ দলে। বল কী খেতে তোর ইচ্ছে করছে? সেদিন দূর থেকে তোদের দেখে এলাম। বড় আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল সবাইকে নিয়ে আমার বাড়িতে একদিন আসিস। তুই আমার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলি, চলে এলি সদলবলে, আপনজনের মতো বসলি আমার দাওয়ায়। এখন আমি তোদের কী খেতে দিই, আমি গরিব মানুষ, আমার কী আছে!'

গোঁসাই বললেন, 'তোমার ঠাকুরঘরে প্রসাদ বলতে যা আছে তাই আমাদের দাও, আমরা কণা কণা করে ভাগ করে খাব।'

রাইমাতা ঠাকুরঘরে প্রবেশ করল। ফিরে এল হাতে এক থালা রসগোল্লা। নিজেই সবাইকে দিল বিতরণ করে। সাহস বেড়ে গিয়েছে রাইমার। বললে, ওঠা চলবে না।

এখানে দুটি অন্ন পেয়ে যেতে হবে। কত মেয়েছেলে এসে জড়ো হয়েছে বাড়িতে, রাইমা নিজের হাতে সব রান্না করল। চোখ দুটি ঊর্ধ্বে টানা, ভাবের ঘোরে ঢুলুঢুলু, ছুটোছুটি করে একাই একশো হয়ে কাজ করতে লাগল। কখন যে নিজের থেকে দুচোখ জলে ভরে ভরে ওঠে, টের পায় না, বুকের আঁচল ভেসে যায়। দুহাত কাজ করছে বটে কিন্তু চোখ রয়েছে ভাবলোকে, কী দেখছে, কেন এত সুখেও তার কান্না, তা কে বলবে। বেলা বারোটার মধ্যে ভোগ হয়ে গেল। সব্বাই তারপর বসল আসন করে। এর মধ্যে কত কী ব্যঞ্জন তৈরি করেছে রাইমা। তৃপ্ত করে সবাই আকণ্ঠ খেল—এত বিস্তৃত আয়োজন যে ফেলব না ফেলব না করেও ফেলল কিছু কিছু। সে সব অবশিষ্ট একত্র করে নাড়ু পাকাল রাইমা, আশ্রমে যত লোক তত নাড়ু। প্রত্যেকে পেল একটা করে। উচ্ছিষ্ট পাতা কাউকে তুলতে দিল না রাইমা। যদি কেউ তোলো তো ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।

বিদ্যারত্নের ছেলে মথুরানাথ পদরত্ন বললে, 'একটি অদ্ভুত তমাল গাছ দেখবেন আসুন।'

বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল পদরত্ন। একটা গাছ নয় তো শ্যামসমারোহের মন্দির! ডাঁডা তুলে উঠে গেছে উপরে আর শাখা-প্রশাখা এমন ছত্রাকারে ছড়িয়ে রয়েছে যেন মাটির উপরে একটি নিভৃত ঘর তৈরি হয়েছে। গাছের নিচেটা দিনের বেলাও অন্ধকার। রহস্যসুন্দর। মনে হয় ঐ গোপনের ঘরে ঢুকলে কোন এক অনির্বচনীয়ের সঙ্গে চেনা হয়ে যাবে।

কিন্তু লতামণ্ডপের বাইরে ও কে দাঁড়িয়ে!

একটি তিন বছরের ছেলে। পদরত্ন বললে, আমার ছেলের ঘরের নাতি।

কিন্তু গোঁসাইকে দেখে ছেলেটি লজ্জায় হাত দিয়ে চোখ ঢাকছে কেন, আবার হাত একটু সরিয়ে নিয়ে আড়চোখে মুচকে হাসছে কেন? ও কে? কই শুধু হাসছেই না তো! এখন যে দেখছি কাঁদছে নিঃশব্দে।

'তোমরা এই ছেলেটিকে ভালো করে দেখে রাখো।' শিষ্যভক্তদের বললেন গোঁসাই, 'যার জন্যে লোকে ছুটোছুটি করছে তিনি যে কখন, কোন অলিতে-গলিতে কী ভাবে লীলা করছেন, তাঁর কৃপা ছাড়া কারু সাধ্য নেই জানতে পারে। তোমরা ধন্য হলে।'

সমবয়সী একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল ছেলেটির গা ঘেঁষে। এটি কে? এ আমার দৌহিত্রী, মেয়ের ঘরের নাতনি। মেয়েটি ডান হাত দিয়ে ছেলেটির গলা জড়িয়ে ধরে দাঁড়াল বাঁ দিকে। কত যেন খেলার সাথি, কত তাকে ভালোবাসে, এমনি স্নেহঢালা সেই দাঁড়াবার ভঙ্গি।

'জয় রাধারাণী।' এক ভক্ত উল্লাস করে উঠল!

মেয়েটি ছুট দিল। পদরত্ন নাতিকে নিয়ে এল গোঁসাইয়ের কাছে। সে গোঁসাইকে প্রণাম করল। গোঁসাই তাকে বুকে তুলে নিলেন। গায়ে পিঠে মাথায় আশীর্বাদের হাত বুলিয়ে দিলেন। আর কাউকে প্রণাম করতে হবে না। তুমিই নমস্য হয়ে থাকবে। ছেলেটি ক'দিন পরেই নরদেহ ত্যাগ করল।

কিন্তু শ্রীবাসের আঙিনায় ভেট চায় কেন? এ কী অনাচার! যারা দ্বারে দ্বারে বিনামূল্যে প্রেম বেচে গেল তাদের বিগ্রহ দেখতে পয়সা লাগবে? যাদের পয়সা নেই যারা কাঙাল, তারা কাঙালের ঠাকুরকে দেখতে পাবে না? দরকার নেই দেখে! আমি বাইরে থেকেই প্রণাম করছি। তার চেয়ে চলো পুরোনো বন্ধু রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি

যাই। রাজকুমার ব্রাহ্মসমাজে গান গায়, আমার কত দিনের চেনা। গোঁসাইকে পেয়ে রাজকুমার আনন্দে উথলে উঠল। রাজকুমারের মা এসে প্রণাম করল গোঁসাইকে।

'সে কী ?' গোঁসাই বললে, 'রাজকুমার আমার ভাই। সে সূত্রে আপনি আমার মা। মা কি ছেলেকে প্রণাম করে ?'

রাজকুমারের মা বললেন, 'বাবা, আমি যে তোমাকে মহাদেবের মতো দেখছি ।'

গোঁসাই বললেন, 'তা হলে আপনি মহাদেবকে প্রণাম করুন, আমি মাকে প্রণাম করি।'

রাজকুমার বললে, 'রামপুরহাটে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে আপনি আমাকে আলিঙ্গন করে বলেছিলেন, আমার হৃদয় তোমার হোক, তোমার হৃদয় আমার হোক। কই আমার হৃদয়ে তো আপনার হৃদয়ের ছায়াটুকুও পড়ল না। আমি যেমন ছিলাম তেমনিই রয়ে গেলাম। আমার দুর্গতিতে আপনি আর চুপ করে থাকতে পারবেন না। একটা বিহিত আপনাকে করতেই হবে।'

'কী চান বলুন।'

'আমাকে এমন কোনো সহজ উপদেশ দিন যা পালন করে আমার কলুষিত চিত্ত অন্তত এক মিনিটের জন্যে ভগবৎচিন্তায় নিমগ্ন হতে পারে।'

'বেশ, তাই দিচ্ছি' বরাভয়ময় কণ্ঠে বললেন গোঁসাই, 'সহজও বটে আবার শক্তও বটে। সহজ কেননা অল্প মনোযোগেই পালন করা সম্ভব আর শক্ত কেননা লোকে জেনেও এতে আকৃষ্ট হয় না।'

'আপনি বলুন। আমি করব।'

'আপনি ওঙ্কার সাধন করুন।'

'ওঙ্কার !'

'হ্যাঁ, ওঙ্কার কী ? অ, উ আর ম। অ সৃষ্টি, উ স্থিতি আর ম প্রলয়। মানে কী ? যা আগে ছিল না, এখন আছে, পরে থাকবে না। যা দেখছেন সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা স্থল জল মানুষ পশু পাখি কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা তৃণ গুল্ম—সমস্ত স্থাবর জঙ্গম—আগে কিছুই ছিল না, এখন আছে, পরে আবার থাকবে না। চরাচরে যা দেখবেন তাতে এই ভাব এই অর্থ আরোপ করুন। ছিল না, আছে, থাকবে না—শুধু এই মন্ত্র এই ধ্যানজ্ঞানে নিবিষ্ট হতে হতে আপনার চোখ খুলে যাবে। কিছুতেই আর মমতা থাকবে না, সব অসার মিথ্যে বলে মনে হবে। ক্রমে ক্রমে হৃদয় শূন্য বোধ হবে। কী সে চির-স্থায়ী জিনিস যা দিয়ে এই শূন্যতা পূরণ করা যাবে আর অভাববোধ থাকবে না ? তখনই আপনার ব্যাকুলতা জাগবে।' গোঁসাই আশ্বাসে বদান্য হলেন : 'তখনই বুঝবেন আপনার দীক্ষা নেবার সময় হয়েছে। ওঙ্কার মন্ত্রের সাধনে আপনার ঠাকুরঘরের আবর্জনা আগে দূর করুন।'

'ঠাকুরঘর ?'

'হ্যাঁ, আমাদের হৃদয়ই আমাদের ঠাকুরঘর।'

গংগাপথে নৌকো করে গোঁসাই-প্রভু শান্তিপুরে এলেন। নিজগৃহে, শ্যামসুন্দরের আলয়ে এসে উঠলেন। যে শান্তিপুর একদিন নির্যাতনের একশেষ করেছিল, আজ বরণডালা সাজিয়ে আনল। মন্ত্রকণ্ঠে জয় দিল সকলে। সজ্জন সুহৃদ গোস্বামীদের সম্মান দিলেন, মাতৃস্থানীয়াদের পা ধুয়ে দিলেন স্বহস্তে।

শ্রীমূর্তিখানি দেখ! দেখলেই মন-প্রাণ ভক্তিতে ভরে ওঠে।

এই আমার শ্যামসুন্দর! প্রণাম করলেন গোঁসাই। বললেন, 'কত খেলাই খেলল আমার সংগে। ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করছি, হঠাৎ চোখের সামনে এসে হাজির হত। বলত, কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলো তো। আমি বলতাম, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী, আমি কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বিশ্বাস করি না। শ্যামসুন্দর ছাড়ত না, আবার আসত, আবার কৃষ্ণনাম গুঞ্জন করত। শেষে একদিন মরীয়া হয়ে জিগগেস করলাম, তবে আমাকে ব্রাহ্মসমাজে আনলে কেন? শ্যামসুন্দর বললে, আবার তোকে ভেঙে গড়ব বলে। ভেঙে গড়লেই জিনিস সুন্দরের চেয়েও সুন্দর হয়ে ওঠে।'

চৌদ্দমাদলের নগরকীর্তন করে গোঁসাই-প্রভুকে নিয়ে গেল বাবলায়। শোনা গেল আবার সেই অপ্রাকৃত কীর্তন। গৌরহরি এখানে যে সপার্ষদ কীর্তন করেছিলেন তাই যেন প্রকৃতিতে রেকর্ড হয়ে আছে, গোঁসাইয়ের মতো শক্তিশালী সাউন্ড-বক্স পাওয়া যেতেই ভক্তবৃন্দের একাগ্রতার পিন-এ লেগে বেজে উঠেছে। কোনো শব্দই হারিয়ে যায়নি। কার্যকারণের যথার্থ সংযোগ হলেই শুনতে পাবে সে উজ্জীবিত হরিনাম।

অদ্বৈতপ্রভুর ভজনস্থান কোথায়? সকলে ইতস্তত খুঁজছেন, বিচার করে দেখছেন, কিন্তু একমত হতে পারছেন না। কোথাকার একটা কুকুর কখন থেকে সংগ ধরেছে, কিছুতেই ফিরে যাচ্ছে না, সে হঠাৎ একটা অচিহ্নিত জায়গা আঁচড়াতে শুরু করল। এ কী আচরণ! জায়গাটা খোঁড়ো তো, গোঁসাই-প্রভু আদেশ করলেন। খুঁড়ে মাটির নিচে একখানা খড়ম, পঞ্চপাত্র ও একটি পেতলের হাঁড়ি পাওয়া গেল। এ সমস্তই অদ্বৈতপ্রভুর ব্যবহৃত জিনিস। সুতরাং, সন্দেহ নেই, এ আঁচড়কাটা জায়গাই তাঁর ভজনস্থান। কিন্তু কুকুরবেশে এ কে দেখা দিল?

গোঁসাইজি বললেন, 'পূর্বজন্মে সাধক ছিলেন, সাধনাভ্রষ্ট হয়ে কুকুর হয়ে জন্মেছেন। কিন্তু ভয় নেই, শিগগিরই এ দেহ ছেড়ে দেবেন।'

পরদিন সকলে দেখল দেহের অর্ধাংশ গংগায় ডুবিয়ে দিয়ে তীরে মরে পড়ে আছে কুকুর।

তারপর কলকাতায় এলেন গোঁসাই। উঠলেন সুকিয়া স্ট্রিটে রাখাল রায়ের বাড়িতে। প্রয়াগে পতিগৃহে ছিল, বাবার সংগে দেখা করতে চলে এল প্রেমসখী। এসেই জ্বরে পড়ল। সে জ্বর আর ছাড়ল না। প্রেমসখীর মৃত্যু আসন্ন, পাশের ঘরে গোস্বামী-প্রভু যেমন রোজ করেন, তেমনি পাঠ করে চলেছেন। কান্নার রোল উঠেছে তবু অর্ধপথে পাঠ থামালেন না। পাঠ শেষ করে যখন রুগীর ঘরে এলেন, তখন সামান্য কটা নিশ্বাসই আর বাকি আছে। বললেন, কীর্তন শুরু করো। কীর্তন শুরু হতেই গোঁসাই

নাচতে লাগলেন। কতক্ষণ পরে প্রেমসখীর মাথায় ডান পা রেখে দাঁড়ালেন স্থির হয়ে। একটা পবিত্র বিভায় সমস্ত ঘর আলোকিত হয়ে উঠল।

'তুমি কি নিষ্ঠুর!' প্রেমসখীর দিদিমা, গোঁসাইজির শাশুড়ি কেঁদে উঠলেন: 'মেয়েটা মরে যাচ্ছে আর তুমি নাচছ? তুমি আনন্দ করার আর সময় পেলে না?'

গোস্বামী-প্রভু বললেন, 'আমি যে দেখছি কুতুর মা এসেছেন, তাঁর সঙ্গে বৃন্দাবনের নিত্যলীলার সহচরীরা, তাঁরা যে কুতুকে কোলে করে নিত্যধামে নিয়ে যাচ্ছেন—এ দেখে আমি কাঁদব, না নৃত্য করব?'

সমস্ত শোক শান্ত হয়ে গেল। মা এসে নিয়ে গেলেন মেয়েকে রাধাগোবিন্দের পায়ে সমর্পণ করে দিতে, এর পরে কার কী কথা?

রাখাল রায়ের খুব ইচ্ছে প্রভুর একখানা মূর্তি তৈরি করে রাখে। সেই উদ্দেশ্যে কৃষ্ণনগরের এক কুম্ভকারকে ডেকে এনেছে। সরাসরি সামনে বসে গড়তে গেলে প্রভু বিরক্ত হবেন অনুমান করে কুম্ভকারকে বলেছে গোপনে সম্পূর্ণ করতে। কী, পারবে তো? দক্ষ কুম্ভকার একবাক্যে স্বীকার পেল—পারব। প্রভুকে এক নজর দেখলেই মূর্তি মনের মধ্যে বসে যায় দাগ কেটে। আপনি ভাববেন না, গোপনে থেকেই নির্মাণ করে দেবো আপনাকে।

প্রভুর কাছে গোপন কিছুই নেই। তিনি রাখালকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'মূর্তি কদ্দুর হয়েছে?'

রাখাল অপ্রতিভ হয়ে গেল। বললে 'প্রায় সম্পূর্ণ।'

'মূর্তি ভেঙে ফেল।'

রাখাল হয়তো ভাবল মূর্তি অবিকল হয়নি বা কারিগর কুশলী নয়, প্রভু তারই ঈঙ্গিত করছেন। তাই বললে, মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে। একেবারে আপনার প্রতি-রূপ। আপনি একবার দেখবেন আসুন।'

'না, আমি দেখব না।' বললেন গোঁসাইজি, 'তুমি মূর্তি ভেঙে ফেল।'

'ভেঙে ফেলব?' মর্মাহতের মতো বললে রাখাল।

'হ্যাঁ, ভেঙে ফেলবে। এ নশ্বর দেহ কিসের গৌরব করে, কিসের অহঙ্কার? কীটের চেয়েও নীচ, ধুলোর চেয়েও মূল্যহীন তাকে কে চায় পাথরে ধরে রাখতে? ওসব কপটতা ছাড়ো, মূর্তি ধুলো করে দাও।'

দেহই যখন ধুলো হয়ে যাবে তখন মূর্তিও ধুলো হোক। কুম্ভকার মূর্তি ভেঙে ফেলল।

'অভিমান যাবে কিসে?' গোঁসাইজিকে শিষ্যভক্ত জিগগেস করলে।

'অভিমান যাওয়া কি সহজ কথা?' বললেন গোঁসাইজি, 'একেবারে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অভিমানের মোচন নেই। তবু, অভিমান তাড়াবার জন্যে সাধন দরকার। সকলের চেয়ে নিজেকে হীন বলে জানতে হয়, কাঙাল বলে। মুটে মজুর এমন কি জঘন্য ইতর জনও আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এই অকপট শ্রদ্ধাভক্তি রাখতে হয় মনের মধ্যে। সকলের কাছেই মাথা নত করে থাকতে হয়। তা হলেই যদি শাসন হয় অভিমানের।'

'বড় কঠিন শাসন।'

'নিশ্চয়। ধর্ম বিষয়ে অভিমান তো সব চেয়ে খারাপ। সামান্য ধর্ম-অভিমানে কত যোগী-ঋষির পতন হয়েছে।'

'আমাদের তাহলে কী হবে ?'

'একটা সাধারণ সহজ উপায় বলে দি ।'

'কী ?' শিষ্যভক্ত উৎসাহিত হয়ে উঠল ।

'শুধু নিজের সাধন ভজন নিয়ে পড়ে থাকো । আর নির্জনে চলে যাও । লোকালয়ে থাকলেই অভিমানের কারণ এসে দেখা দেয় । পাহাড়-পর্বতে থাকতে পারলেই শান্তি ।'

'কিন্তু খাওয়া জুটবে কী করে ?'

'জানি এই আহারের জন্যেই আবার লোকালয়ে ফিরতে হয় । এক আহার-চিন্তাতেই সাধন নষ্ট । তাই সর্ব প্রথমে আহার সংযম করতে হয়, পরে ধীরে ধীরে আহারত্যাগ । প্রথমে ডালভাত তরকারি, তারপরে শুধু ডালভাত বা তরকারি-ভাত, তারপরে সেদ্ধ ভাত । তারপরে জল ভাত । তারপরে নুন ত্যাগ । নুন ত্যাগ হলে জল ভাতের সঙ্গে ফল । শেষে ভাত ফেলে দিয়ে শুধু জল ফল । তারপরে ফলের পরিমাণ কমিয়ে নিমপাতা ও বেলপাতা ধরবে । তারপরে শুধু জল আর পাতা । মিষ্টি কদাচ নয় । মিষ্টি বলতে শুধু ফলের মিষ্টি । আসল রহস্য কী জানো ? আসল রহস্য হচ্ছে বীর্যধারণ । যার বীর্য আছে তার অন্য অভিমানে কী দরকার ?'

স্টকিয়া স্ট্রিট ছেড়ে গোঁসাইজি কম্বুলিটোলায় এসে বাসা নিলেন ।

'গৌর-নাচা বাবা এখানে আছে ?'

'আরে এ যে দেখি আমার ক্ষ্যাপাচাঁদ ।' গোস্বামী-প্রভু হাত বাড়িয়ে ক্ষ্যাপাচাঁদকে বুকের মধ্যে আলিঙ্গন করে ধরলেন : 'তুমি কোত্থেকে এলে ?'

সেই প্রয়াগে দেখা হয়েছিল । ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর থেকেই মনে আকাঙ্ক্ষা আবার সেই গৌর-নাচা বাবাকে দেখে । গোস্বামী-প্রভুর নাম ভুলে গিয়েছে, একমাত্র পরিচয় সংগ্রহ করে রেখেছে, গৌর-নাচা । অর্থাৎ যে গৌরনাম শুনলেই নাচতে শুরু করে । কিন্তু তার ঠিকানাও তো জানা নেই । কোথায় গেলে গৌর-নাচা বাবার সংবাদ পাব ? কিছু হদিশ দিতে পারে ভেবে ক্ষ্যাপাচাঁদ পায়ে হেঁটে চলে এসেছে বাঙলাদেশে । গিয়েছে নবদ্বীপে, গিয়েছে শান্তিপুরে—গৌর-নাচাকেই লোকে নির্দিষ্ট করতে পারে না, তারপর তার ঠিকানা দেবে !

শেষ পর্যন্ত ক্ষ্যাপাচাঁদ কলকাতায় চলে এল । কলকাতা তো আরো জটিল আরো কুটিল । তারা গৌরকেই চেনে না তো গৌর-নাচাকে চিনবে ।

তবু, এমন প্রাণের টান, সন্ধান ছাড়ছে না ক্ষ্যাপাচাঁদ । যাকে পাচ্ছে তাকেই জিগগেস করছে । আমার গৌর-নাচা বাবাজি কোথায় আছে বলতে পারো ? শেষে একদিন রাস্তায় বাণীতোষ বাগচীর সঙ্গে দেখা । গোস্বামী-প্রভুর জামাই বাণীতোষ । বুঝতে পারল কাকে চায় । বললে, আসুন আমার সঙ্গে । সটান নিয়ে এল কম্বুলিটোলায়, গোঁসাইজির কাছে । আরে এই তো আমার সেই গৌর-নাচা বাবা ।

'গোঁসাইজি, হাম তুমহারা হো গিয়া ।' ক্ষ্যাপাচাঁদ প্রভুর কাছে কেঁদে পড়ল ।

'কী যে বলেন, আমিই আপনার হয়ে গিয়েছি ।' প্রভু বললেন বিনীত হয়ে ।

'নেহি । তু মেরা রামজি হো । তুহার লিয়ে হাম ত্রেতাযুগমে পড় রহা হ্যায় । তিন যুগ হামার গুজাড় গিয়া । আবতো কৃপা করকে তু হামকো সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া । আব হামকো কৃপা কর । হামকো তোহার কর লে ।'

গোস্বামী-প্রভু কাঁদতে লাগলেন ।

'মেরা বাত শুনো। হাম তুমহারো মাফিক জটা রাখেঙ্গে, মালা-তিলক ধারণ করেঙ্গে, আউর সব দেশমে এছা বাত হাজির করেঙ্গে কি, নবদ্বীপমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হুয়ে হ্যায়, উনকো ভজন করো।'

প্রেমাশ্রুতে উদ্বেল হয়ে উঠলেন প্রভু। ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠে গোঁসাইজির সঙ্গে রামনাম করতে শুরু করল ক্ষ্যাপাচাঁদ। সেদিন তো গলা মিলিয়ে কথা মিলিয়ে ভরপুর গলায় গান ধরল রীতিমত।

'চল ভাই ভার নিয়ে যাই অযোধ্যায় রাম রাজা হবে।
দিব তার চরণে ভার, রাম বিনে ভার কে বা লবে ॥
পাপে হয়েছি ভারী, আর তো ভার সইতে নারি।
বিনা সেই ভূ-ভারহারী, সে বিনে ভার আর কে ববে ॥
দিয়ে ভার নিয়ে শরণ, বলব দুটি ধরে চরণ,
এবার যেমন বইলেম ভার এমন ভার আর দিও না ভবে ॥'

কারা ঠোঙায় করে গোঁসাইজির জন্যে সন্দেশ নিয়ে এসেছে। বাড়ির ঝিয়ের হাতে ঠোঙাটা দিয়ে বললে, প্রভুকে দিয়ে এস। বোলো এক ভক্তবন্ধু পাঠিয়েছে। গঙ্গাস্নান করে ফিরছেন, প্রভু ঠোঙা নিলেন হাতে করে। ভক্তবন্ধুর পাঠানো, নিঃসন্দেহে খেলেন একটা সন্দেশ। খেয়েই কী হল, প্রভু অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

ক্ষ্যাপাচাঁদ বললে, সন্দেশের মধ্যে বিষ দিয়েছে।

তা হলে কী হবে? কে দিল সন্দেশ? ঝিকে ধরো। পুলিশ ডাকো।

'ও সব কিছু হাঙ্গামা করতে হবে না। আমি যোগক্রিয়ায় সারিয়ে দিচ্ছি।' বললে ক্ষ্যাপাচাঁদ।

ক্ষ্যাপাচাঁদের যোগপ্রভাবে বিষশক্তি খর্ব হল, প্রভু নিরাময় হয়ে উঠলেন।

কম্বুলিটোলা ছেড়ে চলে এলেন সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে। কিন্তু সেখানে আবার অন্য উপদ্রব। সামনে বাড়ির ভাড়াটের হরিনামে আপত্তি। রাত্রেও যদি ওরা ধেই-ধেই করে নাচে আর চেঁচায় তা হলে বেচারার মদের নেশাটা ঘন হয়ে জমতে পারে না। দু বাড়ির একই বাড়িওয়ালা। তাকে ডাকিয়ে সামনের ভাড়াটে বললে, চেঁচামেচি বন্ধ করে না দিলে তো প্রাণে বাঁচিনা। রাত্রেও যদি কেলেংকারি চালায় তাহলে ঘুমুই কী করে? ওদের থামতে বলুন, না থামে তো থামিয়ে দিন।

'কেলেংকারি কী মশাই। কীর্তন হচ্ছে। আমার বাড়িঘর পল্লী শহর ধন্য হয়ে যাচ্ছে। হিন্দু হয়ে হিন্দুর ধর্মীয় আচরণ বন্ধ করে দেব?'

'ধর্ম না মুন্ডু!' লোকটা খেঁকিয়ে উঠল: 'হরি হরি বলে না চেঁচালে ধর্ম হয় না? মনে মনে ইষ্ট নাম করুক না যত খুশি। পাড়ার লোকের শান্তিভঙ্গ করা কেন মশাই?'

'আপনার না পোষায় আপনি অন্য পাড়ায় উঠে যান। আমি কিছু করতে পারব না।' চলে গেল বাড়িওয়ালা।

আচ্ছা, আমি একাই পারব। নিজের মেয়েকে শিখিয়ে দিল কুলকুচো করে মুখের জল ওদের রান্নাঘরের মধ্যে ছিটিয়ে দিতে। খুব ঘেঁষাঘেঁষি রান্নাঘর। জল ছিটিয়ে ফেলা কঠিন নয়। বাপের কথামত মেয়ে মুখের উচ্ছিষ্ট জল গোঁসাইদের রান্নাঘরে ছুঁড়ে দিল। পড়ল গিয়ে রান্নাকরা জিনিসের উপর। দিনের খাওয়াই নষ্ট হয়ে গেল।

এই মহৎ-লাঞ্ছনার প্রতিকার কী? লোকটা তার মনিবের কাজে বাইরে বদলি হয়ে

গেল। সেখানে একদিন ঠেসে মদ খেল। এত খেল যে হার্টফেল করে মারা গেল। শবদেহ বাক্সে পুরে কলকাতায় আনা হল। যে-সে ধরল সেই বাক্স, কুলির মাথায় করে নিয়ে গেল শ্মশানে। ভক্তকে দ্রোহ করলে ভক্ত ক্ষমা করতে পারে কিন্তু ভক্তবৎসল ভগবান সেই ভক্তদ্রোহীকে ক্ষমা করেন না।

পার্বতীচরণ রায় গোঁসাইজির সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আরো একবার এসেছিল গেণ্ডারিয়ায়। বলেছিল, 'গোঁসাই, ভগবানের অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস নেই কিন্তু তোমার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস। তুমি যদি বলো ভগবান আছেন তা হলেই মানব, নচেৎ মানব না।'

স্থির শান্ত সহজ স্বরে গোঁসাইজি বললেন, 'ভগবান আছেন।'

'তাঁকে দেখা যায় ?'

'হ্যাঁ, দেখা যায় !'

'তুমি তাঁকে দেখেছ ?'

'হ্যাঁ, দেখেছি।'

আমাকে দেখাতে পারো ?'

'পারি। কিন্তু তুমি তা বিশ্বাস করবে না। বলবে ভেল্কিবাজি। তার চেয়ে নিজে উপলব্ধি করে প্রত্যক্ষ করবে আর তখনই তাকে মানবে দর্শন বলে।'

পার্বতীচরণ ব্রাহ্ম ছিল, ডেপুটিগিরি করত। বিটায়ার করে বিলেত গেল আর সেখানে এক ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করল। কিসের ধর্মকর্ম ! যতদিন আছি, ঘুরি ফিরি আর স্ফূর্তি করি।

কিন্তু সহজে ত্রাণ পেল না পার্বতীচরণ। একদিন রাতে শোবার ঘরে দেখতে পেল এক জ্যোতির্ময়ী হিন্দু দেবী ঘর আলো করে বসে আছে। কে দুর্গা না লক্ষ্মী না জগদ্ধাত্রী ! এ আবার কেমনতরো দর্শন ! ব্রাহ্ম অবস্থায় নিরাকার মানত, তারপর মেম বিয়ে করে নাস্তিক হয়েছে, তার কাছে কেন এক হিন্দু দেবীর আবির্ভাব পার্বতীচরণ ভাবনায় পড়ল। তারপর আরেকদিন দেখল তিনজন ভারতীয় সাধু তার ঘরে বসে আছেন। তাদের মধ্যে একজন, কী আশ্চর্য, আমাদের গোঁসাইজি। তাঁরা বললেন, স্পষ্ট ইংরেজিতে বললেন, গো ব্যাক টু ইণ্ডিয়া। ভারতে ফিরে যাও।

মন চাইল না আদেশ উপেক্ষা করে। বিলেত থেকে চলে এল তাড়াতাড়ি, ধরল এসে গোঁসাইকে। জিগগেস করল, 'আর দুজন সাধু কে ? কোথায় গেলে তাদের দেখা পাব ?'

'হরিদ্বারে যাও। গঙ্গাতীরে দেখা পাবে।'

গোঁসাইকে বিশ্বাস করে পার্বতীচরণ তক্ষুণি হরিদ্বারে যাত্রা করল। গঙ্গাতীরে দেখতে পেল সেই দুই বিলেত-যাওয়া সাধু বসে আছেন। তাঁদের কাছে উপদেশ চাইল পার্বতীচরণ। তাঁরা বললেন, 'গোঁসাইয়ের কাছে যাও।'

গোঁসাইয়ের কাছে ফিরে এল। বললে, 'তোমার কথাই ঠিক। বাকি দুই সাধুর দেখা পেলাম হরিদ্বারে। তাঁরা আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বলো আমি কী করব ?'

'বিলেতেই ফিরে যাও।' বললেন গোঁসাই।

পার্বতীচরণের সমস্ত ভার নেমে গেল। বললে, 'গোঁসাই, তুমি আমার মর্মের কথাটাই বলেছ, আমি ফিরে যাব। আমি বুঝতে পারছি আমার এই দেহে এই জন্মে সাধনভজন কিছুই হবে না। কত যে কদাচার করেছি অখাদ্য খেয়েছি পাপে কলুষে

ডুবেছি তার শেষ নেই। শেষে বৃদ্ধ বয়সে বিধর্ম বিবাহ। তবু তোমার যেটুকু কৃপা পেয়েছি এ জীবনে সেই আমার পরম পাথেয়। একটা ভ্রষ্টাচারী নাস্তিক এর বেশি আর কী আশা করতে পারে? গোঁসাই, আর যা হবার তা হোক, তুমি আমাকে ভুলো না।'

গোঁসাই কাউকে ভোলেন না। শুধু মন পবিত্র ও প্রফুল্ল রাখবে। আর মনের মধ্যে সব সময়ে একটি প্রার্থনার ভাব জাগিয়ে রাখবে। সব সময়েই, লেখাপড়া করছ কি কথাবার্তা বলছ বা পথে ঘাটে চলছ, কতক্ষণ অন্তর-অন্তর একটু অবসর নিয়ে ভগবানকে একটু স্মরণ করে নেবে। তিনি সর্বদা সঙ্গে আছেন, আমাকে কত ভালোবাসছেন, কত ভাবে দয়া করছেন, এই ভেবে মনে মনে তাঁকে প্রণাম করবে। যত বেশি প্রণাম করবে তত বেশি মঙ্গল।

ভরতের মনে হল, প্রভু বিনে আমার সুখ কী। কিসের আমার ভোগবিলাস, রাজসিংহাসন! যদি আমার প্রভুকেই সংসারের রাজা করতে না পারলাম তাহলে আমার সংসারে কী হবে? যতদিন তাঁকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনা না যাবে ততদিন আমিও বনবাসী হয়ে থাকব। প্রভু ছাড়া আমার সংসার বন ছাড়া আর কিছু নয়। বলো আমার প্রভুকে কোন দিকে তাড়িয়ে দিলে? আমিও সেই দিকে যাব। আমার সংসারের রাজা, সুখের রাজা চলে গেল আর আমি হরিহারা হয়ে পড়ে থাকব এ হতেই পারে না। আমারে প্রাণারাম রামকে ফিরিয়ে আনো।

৩৪

দর্জির পাড়ায় থাকে, ধাত্রীগিরি করে, নাম ক্ষীরোদা সুন্দরী দাসী। গোঁসাই-প্রভুর শিষ্যত্ব নিয়েছে। তার এ কী ভাব হল। দেখল, এ গোঁসাই কোথায়, এ ষড়ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গ। দেখামাত্রই অচৈতন্য হয়ে পড়ল। তখন আবার তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে শুরু করো নামকীর্তন।

ব্রাহ্ম জ্ঞানেন্দ্র হালদারের মা, ইনিও ব্রাহ্মিকা, গোঁসাইজির কাছে থেকে দীক্ষা নিয়ে বসলেন। দীক্ষান্তে তাঁর মহাভাব উপস্থিত হল। তিনিও বাহ্যজ্ঞান হারালেন। প্রভু তাঁকে সুস্থ করে তুলতেই তিনি বলে উঠলেন, 'আমি পেয়েছি, আমি দেখেছি—'

'তাই তো আপনার দেহও চলে গিয়েছিল।' বললেন গোঁসাইজি।

'তবে আবার বাঁচালেন কেন?'

'এ শহর কলকাতা, না বাঁচালে যে পুলিশ এসে ধরত।' গোঁসাইজি হাসলেন : 'পাহাড় জঙ্গল হত দেহটা টেনে ফেলে দিতে বাধত না। তুমিও তখন মায়ামুক্ত হয়ে যেতে।'

বিশ্বাস কি কখনো দেখেশুনে হয়? অনেকে বলে অলৌকিক কিছু দেখলেই বিশ্বাস হবে। অলৌকিক কিছু দেখলেও অলৌকিকত্ব সম্পর্কে তর্ক করবে। বিশ্বাস পেতে গেলেও, যাকে বিশ্বাস করব, সেই ভগবানের কৃপা দরকার।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুর গোঁসাইজির সঙ্গে দেখা করতে চান। বলে পাঠিয়েছেন, একটু নির্জনে বসে আলাপ করব।

গোঁসাইজি বললেন 'এখানে নির্জনতা নেই। যে যখন চাইছে অবাধে চলে আসছে। একজনের জন্যে আরেকজনকে ঠেকাব কী করে? এমনি চলে আসুন।'

তাই এলেন কালীকৃষ্ণ। তাঁর ঘরে এত ভোগ এত ঐশ্বর্য তবু তাঁর সুখ নেই। শত যশে নামেও তাঁর প্রাণের জ্বালার নিবারণ হচ্ছে না। কী করে শান্তি পাব বলুন।

প্রভু বললেন, 'ভগবান যাকে যা দিয়েছেন তার সদ্ব্যবহার করলেই শান্তি।'

কালীকৃষ্ণ নিজের অন্তরের মধ্যে তাকালেন। আমাকে ভগবান কী দিয়েছেন?

'আপনাকে ভগবান অগাধ ধনৈশ্বর্য দেননি?'

'দিয়েছেন।' সবিনয়ে স্বীকার করলেন কালীকৃষ্ণ।

'তার সদ্ব্যবহার করুন।'

'কেন, আমি তো দান করি।'

'দান করেন, কিন্তু খবরের কাগজের দিকে তাকিয়ে। খবরের কাগজে নামটা ছাপা না হলে খুশি হন না।' প্রভু বললেন স্নিগ্ধ স্বরে, 'প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করে সংগোপনে দিতে পারলেই শান্তি পাবেন।'

'মনি-অর্ডার বা রেজেস্ট্রি করে পাঠাতে গেলেও তো নাম সই করতে হবে।'

'না, না, আপনি সরাসরি খামে পুরে পাঠিয়ে দিন।'

'যদি মারা যায়?'

'যাবে না, ভগবানের জন্যে দান করছেন, ভগবানই সে দান বহন করবেন।'

সম্পূর্ণ স্বত্বত্যাগই দান। কোনো সর্ত সংযুক্ত করে দিলে সে আর দান রইলনা। দত্ত বস্তু হয়ে গেল। দত্ত দ্রব্য আগুনে দগ্ধ হলে হবে, জলে পড়লে পড়বে, পথে মারা গেলে যাবে, আমার শুধু দানেই পরিতৃপ্তি। দানেরও একটা পিপাসা থাকা দরকার। ভয় বা স্নেহ, লজ্জা বা মান, বংশমর্যাদা বা প্রত্যুপকার—এরকম কোনো প্ররোচনায় যে দান সেটা খাঁটি দান নয়। দান করে যদি অনুতাপ হয়, তাও নয়। যে দান ফলাভিসন্ধিহীন, দানের পাত্রকে দেখলেই যা আপনা থেকে উৎসারিত হয়ে ওঠে তাই দানপদবাচ্য।

প্রভু ঠিক করলেন আবার বৃন্দাবনে যাবেন।

'আপনি বৃন্দাবনে গেলে আমার কী উপায় হবে?' এক সাধু এসে কেঁদে পড়ল।

'কেন, আপনার অসুবিধে কী!'

'প্রতিদিন আপনি আমাকে খেতে দিতেন।' বললে সাধু, 'আপনার যাবার পর কেউ আমার দিকে মুখ তুলেও চাইবে না।'

'তাহলে কী করবেন?'

'আমি হরিদ্বারে চলে যাব।' সাধু দ্বিধাগ্রস্তের মতো বললে, 'কিন্তু আমি কপর্দকশূন্য, আমাকে ভাড়ার টাকাটা জোগাড় করে দিন।'

প্রভু ধ্যানমগ্ন হলেন। কতক্ষণ পরে ভোলাগিরির এক ভক্ত এসে উপস্থিত। এসে প্রভুর পায়ের কাছে পাঁচটি টাকা রাখল। প্রভু চোখ মেলে বললেন, 'এই যে আপনার প্রাপ্য টাকা ভগবান রেখে গেলেন।'

সাধু টাকা নিয়ে চলে গেল।

প্রভু বললেন, 'যখন সাধু এসে টাকা চাইল মনে হল নিজের পথের সম্বল যা আছে তার থেকে সাধুকে দিয়ে দিই। গুরুদেব তখুনি ধ্যানে এসে নিষেধ করলেন, সাধুকে কিছু দিয়ে কাজ নেই। কিন্তু আমার প্রাণ যে কিছু সাহায্য করবার জন্যে কাঁদছে। তখন ভগবান এই ব্যবস্থা করলেন। তাঁর দয়া নিরন্তর, নিরবধি!'

বৃন্দাবনে যাচ্ছেন, সবার থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন, বাড়ির মেথর

এসে প্রণাম করলে প্রভুকে। গোঁসাইজি সেই প্রণাম ফিরিয়ে দিলেন। করজোড়ে বললেন, 'আশীর্বাদ করুন যেন রাধারাণীর দর্শন পাই।'

মেথর কাঁদতে লাগল। শিষ্যভক্তের দল অভিভূত হয়ে গেল। এতে অভিভূত হবার কী আছে? গোস্বামী-প্রভু বললেন, সমস্ত মানুষের চরণতলেই ভগবৎপ্রাপ্তির সরণি।

কেশীঘাটে কালাবাবুর কুঞ্জে এসে উঠলেন গোঁসাইজি। সেখানে কিছুদিন থেকে চলে এলেন তীর্থমণিকুঞ্জে। বললেন, 'শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকৃতধাম। এর এক একটি রজকণা এক একটি মহাবিষ্ণুতুল্য। এই ধামের তরুগুল্ম সাধারণ তরুগুল্ম নয়। সকলেই ছদ্মবেশী দেবতা। শুধু একটি সূক্ষ্ম যবনিকা এই দিব্যধামকে আবৃত করে আছে। একটু চোখের আড়াল ভাঙলেই সমস্ত প্রত্যক্ষ হয়ে যায়। থাকো, দেখ আর দেখতে শেখ। এখানে এলেই তো সমস্ত পাপনাশ, সমস্ত প্রারব্ধক্ষয়।

গোস্বামী-শিষ্য বেণীমাধব গৌরলীলার গান ধরেছেন :

গৌর অনুগত না হলে কি তাপিত প্রাণ জুড়ায়
আমরা জেনে শুনে প্রাণ সঁপেছি শ্রীগৌরাঙ্গের পায়।
নয়নরঞ্জন খঞ্জন আঁখি কত দুঃখী তাপীর দুঃখ পাসরায়
নবদ্বীপের নবগোরা দেখবি যদি আয়।
দ্বিজ গোঁসাই চাঁদে বলে, শ্রীগৌরাঙ্গের নাম না নিলে
কি করবে তার বিদ্যা-কুলে, বৃথা জনম যায়॥

এক শিষ্য এসে গোঁসাইজিকে বললে, 'আপনার সাধন আপনি ফিরিয়ে নিন।'

'কেন, কী হল?' গোঁসাইজি শান্তনেত্রে তাকালেন।

'আমরা সংসারী লোক, আমরা কি এ সব সাধন করতে পারি?'

'কেন, বেশি কিছু তো নিয়ম নেই, শুধু মদ মাংস উচ্ছিষ্টমাত্র খেতে নিষেধ। মদ মাংস না খেয়ে পারো না?'

'কী করে পারব বলুন। চিরকাল ও দুটো খেয়ে এলাম, এখন কি আর ছাড়া যায়? ভদ্রলোকেদের সঙ্গে ভদ্রতা রাখতে গেলেই ওসব খেতে হয়। আর উচ্ছিষ্ট? সমাজের মধ্যে বাস করি, দশ বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে হয়, তাতে উচ্ছিষ্ট বিচার চলে কী করে?'

গোস্বামী-প্রভু হতাশ হলেন না, সস্নেহে বললেন, 'আচ্ছা একটু চেষ্টা করো। তারপর না পারলে আর কী করবে।'

শিষ্য স্পষ্টকণ্ঠে বললে, 'ও সব চেষ্টা টেষ্টার ভণ্ডামি আর করতে পারব না। সত্যি কথা বলতে কী, কোনো চেষ্টাই আসেনা মনের থেকে। আজ আপনাকে সত্য কথাটা বলে ফেলে পরিষ্কার হতে এসেছি।'

'একটু অন্তত নাম তো করতে পারো।'

'নামেও রুচি নেই। কখনো-কখনো নামও মনে আসে না। নাম যে করতে হবে সেকথাটাও ভুলে যাই।'

'বেশ, আমাকে শুধু স্মরণ কোরো।' বললেন প্রভু, 'আরও তুমি জেনে রাখো যা তুমি অপরাধ করবে সমস্ত দণ্ড আমি ভোগ করব। কোনো অপরাধই তোমাকে স্পর্শ করবে না। তুমি দণ্ডমুক্ত দায়মুক্ত হয়ে গেলে।'

এত দয়া এত স্নেহ। শিষ্য প্রভুর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল : 'আমার অপরাধের দণ্ড আপনি ভোগ করবেন! আর আমি নিরঙ্কুশ ধর্মের ষাঁড় হয়ে ঘুরে বেড়াব?'

অঝোরে কাঁদতে লাগল শিষ্য। আর বুঝি তার ভুল হবে না, ঘটবে না বিচ্যুতি।

ভগবানে চিত্তসমর্পণ ও অচলা ভক্তি আসবে কিসে? স্বাধ্যায়ে অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থপাঠে ও নামজপে, সৎসঙ্গে, বিচারে আর দানে। বিচার—কী বিচার? বিচার অর্থ সর্বদা আত্মনিরীক্ষণ। যদি বোঝো আত্মপ্রশংসা ভালো লাগে, পরনিন্দায় আমোদ হয়, তাহলে মনে করবে ধর্মবিচ্যুতি ঘটল, নরকের দ্বার প্রশস্ত হল। আর দানের অর্থ দয়া, কারু প্রাণে কষ্ট না দেওয়া। শুধু মানুষকেই নয়, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ কাউকেও কষ্ট দেবে না। সব চেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে অহঙ্কার। লোকের কাছ থেকে সম্মান নিতে নিতে শুধু নিজের কাপট্যই বাড়ে, তাই লোকের সামনে যত হীন ও মলিন রূপে পরিচিত হওয়া যায় ততই মঙ্গল।

বৃন্দাবনে যমুনা তীরে কতগুলো প্রেত এসে গোঁসাইজির কাছে উপস্থিত হল। বললে, 'আমাদের সদ্গতি করুন।'

প্রভু বললেন, 'আমি কিছুই জানিনা। আমার গুরুদেব জানেন।'

'ও সব কথায় কাজ নেই। আপনি যমুনার জলে নামুন।'

ঠাকুর নামলেন। উঠে এলে প্রেতগুলো তাঁর পা থেকে জল নিয়ে খেতে লাগল। দেখতে দেখতে ওদের কালো মূর্তি জ্যোতিষ্মান হয়ে উঠল।

খবর পেঁছুল ভক্ত মহেন্দ্র মিত্রের কাছে। বললে, 'প্রেত উদ্ধার হল, আমরাও বা চরণামৃত ছাড়ি কেন?'

জোর করে মহেন্দ্র নিল চরণামৃত। পিপাসু ভক্তদের বিতরণ করল। সবাই সেই অমৃতে আতরের গন্ধ পেল। এই মহেন্দ্র মিত্রই গোঁসাইজিকে নিয়ে গান বাঁধল:

> 'ভালো ভালো জটে বুড়ি গিয়েছিল বৃন্দাবন,
> লং সাহেবের গির্জা দেখে বলে গিরি গোবর্ধন।
> কেশব সেনের চশমা দেখে বলে কালীর বাঁকা নয়ন॥'

শুনে গোঁসাইজির কি আনন্দ!

এবারে বৃন্দাবনে ময়ূরমুকুট বাবাকে লাভ করলেন ঠাকুর। বাবাজি ন-বছর বয়সে বৈরাগী হয়ে হিমালয়ে চলে যান। সেখানে চার-পাঁচ বছর ঘুরে বেড়াবার পরে এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নেন। হিমালয়ে বহু বছর কঠোর সাধনা করে কৈলাসে চলে যান। সেখানে কৈলাসপতির দর্শন লাভ করেন। কিন্তু আপনা থেকেই অন্তরে বৃন্দাবনের মধুর লীলা স্ফূর্তি পেতে থাকে। আদেশ হয় বৃন্দাবনে গিয়ে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব লাভ করো। চলে এলেন বৃন্দাবন। কিন্তু কোথায় সেই সদ্গুরু যিনি তাঁকে ব্রজলীলা উপলব্ধি করাবেন। ঘুরতে ঘুরতে রাধাকুণ্ডে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে রাধারাণী স্বপ্ন দিলেন, বললেন, কেশীঘাটে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আছেন। তাঁর শরণাপন্ন হলেই তোমার বাসনা চরিতার্থ হবে। কেশীঘাটে এসে গোঁসাইজির দেখা পেলেন সাধু। শিবের কথা, রাধারাণীর কথা সব বললেন তাঁকে। প্রভু তার মধ্যে শক্তিসঞ্চার করে দিলেন। তার ফলে সাধুর কৃষ্ণদর্শন হল। তুমি যে হরি তা বুঝি কী করে? তখনই ভক্তবৎসল কৃষ্ণ একটি ময়ূর হয়ে গেলেন আর ঝোলা ঝাড়া দিয়ে কতকগুলো পালক ফেলে দিয়ে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। বাবাজি পালকগুলো কুড়িয়ে নিয়ে একটা মুকুট তৈরি করে মাথায় পরলেন। সেই থেকে তাঁর নাম হয়ে গেল ময়ূরমুকুট বাবাজি।

পাণ্ডা গোবিন্দজির প্রসাদ এনে দিয়েছে গোঁসাইকে। বাড়ির আবর্জনা সাফ করে

যে মেথরানি তাকে প্রভু কাছে ডাকলেন। বললেন, তুমি মার সমান। মার মতন তুমিই সন্তানের সেবা করছ, এই নাও তোমার জন্যে গোবিন্দজির প্রসাদ রেখেছি।

দুইহাত একত্র করে মেথরানি প্রসাদ নিল। বললে, 'কেউ আমাদের এমন করে ডাকে না, বলে না—'

নামেই সব—বললেন গোস্বামী-প্রভু। শরীর থেকে অহংকে বিচ্ছিন্ন করার কৌশলই নাম। শরীর হতে আমি পৃথক এ উপলব্ধি করতে হলে শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করতে হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করা খুব কঠিন কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস লক্ষ্য রেখে নাম করার মতো উপকার আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। সহজ শ্বাস-প্রশ্বাসে নামটি একবার ঠিকমত গেঁথে নিতে পারলেই আত্মদর্শন।

বৃন্দাবনে ছ সাত মাস থেকে প্রভু ফিরলেন কলকাতা, সেখান থেকে কয়েক দিন পরে ঢাকায় চলে এলেন। সেখানে মাঘমাসে, ধূলোট হবে বলে জানালেন সকলকে। হাজারে হাজারে লোক এসে জড়ো হল গেণ্ডারিয়ায়। উৎসবের আনন্দবাজার বসে গেল। স্থানাভাবের দরুন কত যে তাঁবু পড়ল তারও হিসেব নেই। কত যে কীর্তনের দল এসেছে তারই বা কে খোঁজ করে? কীর্তন আর কীর্তন—চলেছে অন্তহীন অমৃতনির্ঝর। কীর্তনের মধ্যে মাঝে মাঝে প্রভু জয় শচীনন্দন বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠছেন, কখনো বা নাচছেন উন্মত্ত হয়ে। ধূলোটের শেষদিনে নগরকীর্তন বেরুল। আর গান উঠলো ভুবনমাতানো

দয়াল নিতাই ডাকে আয়
প্রেমধন বিলায় গৌর রায়
(এই ধর প্রেম লও বলিয়ে)

সমস্ত ঢাকা শহর কীর্তনে উন্মাদ হয়ে উঠল। শরীর অসুস্থ বলে গোস্বামী-প্রভু ঘোড়ার গাড়ি করে যাচ্ছেন মিছিলের পিছনে, কিন্তু তিনি একাই সমস্ত অগ্রপশ্চাৎ জ্যোতির্ময় করে রেখেছেন। তাঁকে ঘিরেই একটা আনন্দ-অম্বুধি উল্লসিত হয়ে উঠেছে। শ্রীধর নাচছে আর ঊর্ধ্বে আঙুল দেখিয়ে বলছে, ঐ দেখ ক্ষীরোদসাগর! ঐ দেখ শ্বেতদ্বীপ। যে যাকে দেখছে তারই পদধূলি নিচ্ছে—ভক্ত-পদধূলিই জীবনের পরম সম্পদ—রাস্তায় গড়িয়ে পড়ে সর্বাঙ্গে ধূলো মাখছে। কীর্তন বেরিয়ে যাবার পর, যারা কীর্তনে যোগ দেয়নি, তারা রাস্তায় এসে মুঠো-মুঠো ধূলো কুড়িয়ে নিচ্ছে, গায়ে মাথায় মেখে পবিত্র হচ্ছে। চলছে এক পরমপাবনী উন্মাদনা। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল এক সৈন্যবাহিনী, তারা কীর্তনের জন্যে পথ করে দিল, কেউ কিছু বলে নি, কাঁধের বন্দুক অবনত করল।

আশ্রমে ফিরে এল কীর্তনের দল। প্রভু বললেন, 'আজ যে চাইবে সেই সাধন পাবে।'

সকাল নটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত চলল সাধন-বিতরণ। প্রায় পাঁচশো লোক পেয়ে গেল কৃপামন্ত্র।

আশ্রমের গাছগুলো মধুক্ষরণ করতে লাগল। গাছের সমস্ত পাতা ভিজে রয়েছে, মেঘের থেকে বর্ষণ নেই, তবে কেন এই আর্দ্রতা। গাছের গা ফেটেও রস ঝরছে। সকলে আস্বাদ করে দেখছে, মধু। গাছের কীর্তনাশ্রু।

ঢাকায় এই শেষ ধূলোট। উৎসবশেষে প্রভু বললেন, কলকাতায় যাব।

কৃষ্ণ বুঝি মথুরায় চললেন। কিন্তু তাঁর লীলাস্থল গেণ্ডারিয়ায় তিনি কি আর ফিরবেন না? ব্রজবাসীরা যেমন কৃষ্ণের জন্যে কাতর তেমনি ঢাকাবাসীরা বিজয়কৃষ্ণের জন্যে কাতর হয়ে উঠল। কোথায় প্রভুর কোন্ লীলা হবে তা কে বলবে?

হরিদাস বসু বোলপুরে ওকালতি করে। হিন্দুধর্ম আগাগোড়া কুসংস্কারে জড়িত এই জ্ঞানে সে ব্রাহ্ম হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মবিধি পালন করেও তার মনে সুখ নেই। পরব্রহ্ম শুধু একটা কথার কথা। পাপ পুণ্য শুধু সামাজিক সংস্কার। এই সব বিবেচনা করে, ধর্মকর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে সে পুরোদস্তুর বিষয়বিলাসে মত্ত হয়েছে। হায়, সেখানেই বা শান্তি কোথায়? ইন্দ্রিয়সেবায় শুধু স্বাস্থ্যের অপচয়। বোলপুরে তার বন্ধুরা প্রেততত্ত্ব আলোচনা করে, চক্র তৈরি করে বসে পরলোকবাসীদের নামায়, তাদের সঙ্গে আলাপ করে। বন্ধুর এক যুবতী স্ত্রী এ-চক্রের মধ্যস্থ বা মিডিয়ম। তার মুখ দিয়েই কথা কয় আত্মারা।

হরিদাস বলে, গাঁজা।

একদিন বৈঠকে দেখা গেল, যুবতীর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর, সর্বাঙ্গে জ্যোতিচ্ছটা। এই গাম্ভীর্যলাবণ্য তো যুবতীর নিজস্ব নয়। তবে আজ কে এল? যুবতীর মুখ দিয়ে কথা বেরুল: 'আমি অঘোরনাথ। হরিদাসকে ডাকো।'

হরিদাসকে ডেকে আনা হল। হরিদাস স্বকর্ণে শুনল অঘোরনাথ বলছে, 'কলকাতায় যাও। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে গিয়ে দীক্ষা নাও।'

স্বকর্ণে শুনেও হরিদাস যেতে চায় না। বলে, ভুতের মুখের কথা শুনে যেতে প্রস্তুত নই। কিন্তু না গিয়েও তো শান্তি পাচ্ছে না। ভূত কেবলই তাড়া দিয়ে ফিরছে। এ যে সে ভুত নয়। স্বয়ং অঘোরনাথ। তারপর একদিন গেল হরিদাস। বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করল। প্রভু বললেন, 'কাল এস।'

'কখন?'

সময় ঠিক করে দিলেন। কিন্তু হরিদাসের যেতে দেরি হয়ে গেল। দু-দশ মিনিটের ব্যবধানে কী আর এসে যায়?

প্রভু তাকে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, 'ধর্মের প্রথম কথাই হচ্ছে সময়-নিষ্ঠা। যার সময়-নিষ্ঠা নেই তার তো শ্রদ্ধাও নেই। হবে হচ্ছে এই গয়ং গচ্ছ ভাবে ওকালতি চলে কিন্তু কৃষ্ণসাক্ষাৎকার চলে না।'

হরিদাস বোলপুরে ফিরে এল।

৩৫

বোলপুরে ফিরে এসে হরিদাস বললে, দীক্ষা দিলে না। আবার যাও। বারে বারে যাও। না পাওয়া পর্যন্ত নিবৃত্ত হবে না। আবার গিয়ে উপস্থিত হল হরিদাস।

'আবার এসেছ?'

'আমি কি নিজের ইচ্ছেয় আসি? আমাকে জোর করে বারে বারে পাঠায়।'

'কে পাঠায়?'

'অঘোরনাথ।'

নাম শুনে গোঁসাই-প্রভু শিহরিত হলেন। বুঝলেন মর্মকথা। বললেন, 'তোমারে সাধন মিলতে আরো কিছুদিন বাকি আছে। এখন যাও, আমি পরে খবর পাঠাব।'

আবার ফিরে গেল হরিদাস। পরে খবর পাঠাবে! যেন খবর পাঠালেই ছুটতে হবে আমাকে। কিন্তু সত্যি সত্যিই খবর যখন পাঠালেন গোঁসাইজি, হরিদাস স্থির থাকতে পারলনা। ছুটে চলে এল কলকাতা। নীরবে প্রভুর কাছে এসে দাঁড়াল।

'বোসো। আজ দীক্ষা হবে।'

আসনে বসল হরিদাস। বসেও সে বুঝি নিঃসন্দেহ হতে পারছে না। বললে, 'আগে আমার একটা প্রশ্নের মীমাংসা চাই। মানুষ কী করে মানুষের গুরু হয়?'

প্রভু বললেন, 'মন্ত্রদাতা গুরু মানুষ নন, তিনি ভগবান।'

হরিদাস অভিভূতের মতো তাকিয়ে রইল। শান্ত হল। পূর্ণ হল। দীক্ষিত হল!

আগুন তো সর্বত্র আছে, এমন কি শূন্যেও আছে, কিন্তু তাকে ধরি কী করে? যেখানে প্রদীপ জ্বলছে বা চুল্লি জ্বলছে সেইখানেই আগুন বিশেষরূপে প্রকাশিত। সেখানে গিয়ে আগুনকে ধরো। বলছেন প্রভু, তেমনি ঈশ্বর সর্বব্যাপী হলেও কেউ তাঁকে ধরতে পারে না। গুরুতেই তাঁর চিৎশক্তির সবিশেষ প্রকাশ। সুতরাং সেখানে গিয়ে আশ্রয় নাও। গুরুই ঈশ্বর। গুরুর পূজাই ঈশ্বরের পূজা।

গুরুদক্ষিণা কী? মোক্ষার্থীদের গুরুদক্ষিণা নেই। বলেছেন প্রভু, সদগুরু তাদেব আত্মসাৎ করে নেন। যে আপনার জিনিস হয়ে যায় সে কাকে দক্ষিণা দেবে? নিজের থেকে নিজের কি কোনো দক্ষিণা নেওয়া চলে?

সাধন-উল্লাসে হরিদাস দেখল প্রভুর আসনে হরেকৃষ্ণ নাম ফুটে উঠেছে। কতক্ষণ পরে নাম নেই, আসনে যুগলমূর্তি। যুগলমূর্তি আবার আসন ছেড়ে প্রভুর উরুর উপর। আগে শুনলে হরিদাস গাঁজাখুরি বলত, এখন স্বচক্ষে দেখে কী বলবে বুঝে উঠতে পারছে না। শুধু চোখকে বলছে, চোখ, তুমি নিষ্পলক হয়ে যাও। দীক্ষা-অন্তে হরিদাস অন্য রকম হয়ে গেল। নামে রুচি জন্মাল, কীর্তনে আনন্দ। তার বাড়ি কুলীনগ্রাম, যে গ্রামের রামানন্দ বসু মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র ছিল, যার দরুন কুলীনগ্রামের সামান্য কুকুরকেও তিনি প্রিয় বলে অনুভব করেছিলেন, সেই গ্রামে হরিদাস খবর পাঠাল, গোঁসাই-প্রভুর কাছে দীক্ষা নেবে তো কলকাতায় চলে এস। যাওয়া আসার খরচ আমি দেব।

প্রভু তখন ১৪/২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের বাড়ি ছেড়ে ৪৫ হ্যারিসন রোডের বাড়িতে আছেন। একদিন এক দঙ্গল মেয়ে-পুরুষ সেখানে উপস্থিত হল।

'আমরা কুলীনগ্রামের লোক—'

বেশির ভাগই বেশে-বাসে অসম্ভ্রান্ত। কয়েকজন গণ্যমান্য পোশাকের লোকও আছে দলের মধ্যে।

ওরা কারা? গণ্যমান্যদের জিগগেস করলে কেউ। আর আপনারা?

'ওরা, যাকে বলে ছোটজাত, হাড়ি মুচি ডোম দুলে বাগদি—কামার কুমোর ছুতোর মিস্ত্রিও আছে আর আমরা ক-জন বামুন কায়েত। কিন্তু এখন আর ওরা-আপনারা নেই। আমরা এখন সকলে এক গাঁ—আমরা সবাই কুলীনগ্রামের।'

'তাতো হল, কিন্তু আপনাদের মতলবখানা কী?'

'বোলপুরের উকিল হরিদাস বসু এখানে আছেন না? তাকে ডাকুন।'

হরিদাসের তো চক্ষু স্থির! কী সর্বনাশ। এত লোক! শুধু সংখ্যা? এদের অনেকের অপকীর্তি তো অজানা নয়। ওটা তো নামকরা গুণ্ডা। ওটা তো চুরি করে জেল খেটে এসেছে। আর, ছি ছি, শ্যামাকান্ত চাটুজ্জের কানে কানে বলে হরিদাস, 'ও মেয়েটা পতিতা।'

ভক্ত শ্যামাকান্ত বললে, 'পাতকীরাই তো বেশি করে আসবে ঠাকুরের কাছে।'

'কিন্তু গোঁসাইকে গিয়ে বলি এমন সাধ্য নেই।' হরিদাস ফাঁপরে পড়ল : 'যদি বিরক্ত হন, যদি এক কথায় বিদায় করে দেন।'

'কিন্তু এরা যাঁর জিনিস তাঁর কাছে তো এদের একবার পোঁছে দিতে হবে।'

হরিদাস ভয়ে-ভয়ে উঠে গেল উপরে। দেখল প্রভু তখন ভক্তদের কাছে শিবচতুর্দশীর কথা বলছেন। বলছেন কী করে পশুঘাতক ব্যাধকে উদ্ধার করলেন মহাদেব। কথাশেষে হরিদাস বললে, মহাদেব কৃপা করে শুধু একটি ব্যাধকে উদ্ধার করেছিলেন, আজ একশোরও বেশি ব্যাধ কুলীনগ্রাম থেকে এসেছে উদ্ধার পেতে। আমাদের শিবসুন্দর কি কৃপা করবেন না?

কুলীনগ্রাম! সেই প্রিয় নাম! প্রভু চঞ্চল হয়ে উঠলেন, 'কাল দীক্ষা হবে।'

হবে, হবে, আমাদের হবে। আমরাও প্রভুর মনোনীত। আমাদেরও তিনি পায়ের কাছে জুটিয়ে দেবেন। পরদিন লোক যেন আরো বেশি দেখাল। রাত ভোর হতে না হতেই সবাই গঙ্গাস্নান করে হাজির হয়েছে! কেউ বা অন্ধকার না কাটতেই ভিড় করেছে। তাদের সূর্য আজ আলো হয়ে দেখা দেবে না, শব্দ হয়ে ধরা দেবে। প্রশস্ত হলঘরেও কুলিয়ে উঠছে না সকলকে। মেয়েরা একদিকে, পুরুষেরা আরেক দিকে, দু-দিকেই স্তূপীভূত ঔৎসুক্য। প্রভু এসে আসন নিলেন। প্রারম্ভিক উপদেশ বিতরণ করে দীক্ষা দিলেন জনতাকে। মুহূর্তে তুমুল তরঙ্গ উঠে গেল। কেউ আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল, কেউ বা হাসতে লাগল উদ্বেল হয়ে। কেউ নাচতে লাগল, কেউ বা পড়ে রইল অজ্ঞান হয়ে। কে ছোট জাত কে বড় জাত কোনো সীমারেখা রইল না, বামুনে মুচিতে হাড়িতে কায়েতে কোলাকুলি চলল। ভক্তির দেশে আবার জাত কী। ভক্তির কৌলীন্যেই তো কুলীনগ্রাম!

'যাও ঘরে গিয়ে কীর্তন করো গে।'

কীর্তন শোনাতে এল নীলকণ্ঠ, এল গণেশদাস। গণেশদাসের সঙ্গে বৃন্দাবনের বলরামদাস বাবাজি। সেই বলরাম-দাস, বৃন্দাবনে যার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল গোঁসাইজির। কীর্তনে 'সুখময় বৃন্দাবন' কথাটি শুনে ভাবাবেশে তিনদিন অচৈতন্য অবস্থায় কাটিয়েছিলেন। রোমকূপ থেকে রক্তক্ষরণ হয়েছিল। সবাই ভেবেছিল দেহ ছেড়ে দেবেন বোধহয়। গোঁসাইজি তাঁর বুকে কান পেতে শুনতে পেলেন ভিতরে সুখময় বৃন্দাবন ধ্বনিত হয়ে চলেছে। তখন গোঁসাইজি নিজেই কীর্তন শুরু করলেন : সুখময় বৃন্দাবন, সুখময় বৃন্দাবন, আর অমনি হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন বলরামদাস।

বীরভুমের সূর্যনারায়ণ রায়ও কীর্তন শুনিয়ে যান।

'ও যমুনে তোর তীরে শ্যাম আমার বাঁশী বাজাত।
ভুবনমোহন তানে ভুবন ভুলাত।
আমার না হয় হিয়া পাষাণ
তরলে, তোর তো তরল প্রাণ,
না হেরে সে চাঁদ বয়ান, কেমনে আছ জীবিত।'

কৃষ্ণলীলার আরো গান গাইতে যাচ্ছিল, গোঁসাই-প্রভু সূর্যনারায়ণকে বাধা দিয়ে সকাতর বিনয়ে বললেন, 'দয়া করে একটি শ্যামার গান করুন।'

সূর্যনারায়ণ তক্ষুনি গলা ছেড়ে গান ধরল :

'জাননা রে মন পরম কারণ
শ্যামা কভু মেয়ে নয়
সে যে মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ
কখন কখন পুরুষ হয়।'

'আচ্ছা একটা কথা জিগগেস করতে পারি ?' কীর্তন শেষে প্রশ্ন করল সূর্যনারায়ণ।

'করুন।'

'আপনি ওরকম বিনয় করে গানের জন্যে প্রার্থনা করলেন কেন ? আমাকে আদেশ করলেই তো হত। আপনার একটা আদেশই তো যথেষ্ট।'

'না।' বললেন গোঁসাইজি, 'তুমি কৃষ্ণের গান গাইছিলে, আমি তোমাকে কালীর গান গাইতে বললাম। ভাব থেকে হঠাৎ ভাবান্তর ঘটালে ভাবের কাছে অপরাধ হয়, তাই তোমার ভাবের কাছে ক্ষমা পাবার আশায় ঐ ভাবে বলেছিলাম।'

সূর্যনারায়ণ মুগ্ধ হয়ে গেল। অমন করে ক-জন ভাবে।

'ভাবটি যেন কেমন লজ্জাবতী লতা।' বললেন গোঁসাইজি, 'স্পর্শ করলেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। সামান্য অনাদর অমর্যাদা সইতে পারেনা, শুকিয়ে যায়। সুতরাং দেখতে হয় কারু ভাবের কাছে না অপরাধী হই।'

'নটবর বেশে বৃন্দাবনে এসে কালী হলি মা রাসবিহারী।' সূর্যনারায়ণ আবার গান ধরল।

সাবজজ চণ্ডীচরণ সেন এসে জিগগেস করলে, 'সমাজের মঙ্গল হবে কিসে ?'

'ঋষি-প্রকাশিত শাস্ত্রমতে চললে।'

'আমাদের ব্রাহ্মসমাজ তো সেই রকমই চলেন।' বললেন চণ্ডীবাবু।

'না, চলেন না। শাস্ত্রের যে অংশটুকু মতের সঙ্গে মেলে তাই শুধু মানেন, যা মেলে না তা ফেলে দেন। তাতে হবে না। মানতে হলে শাস্ত্রের সমস্তটাই মানতে হবে। হ্যাঁ, সমস্ত—আগাগোড়া।' বললেন গোস্বামী-প্রভু, 'আগে অভিধান দেখে শাস্ত্রের মর্ম নিরূপণ করতাম, বহু অংশ পরিত্যাজ্য মনে হত। কিন্তু একদিন গুরুকৃপা হল, গুরুকৃপায় ঋষিরা প্রকাশিত হলেন, আশীর্বাদ করে বললেন, তোমার অন্তরে শাস্ত্রস্ফূর্তি হোক। সেই থেকে শাস্ত্র-অর্থের রহস্যভেদ হল। বুঝলাম শাস্ত্রের একটি অক্ষরও ত্যাগ করবার নয়।'

'একটি অক্ষরও নয় ?'

'না, একটি অক্ষরও নয়।' গোস্বামী-প্রভু জোর দিয়ে বললেন, 'শাস্ত্র কি অক্ষর, না কালি, না কাগজ ? শাস্ত্র জীবন্ত, স্বপ্রকাশ। শাস্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবে শুধু দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ব্যবস্থা, অধিকারী ভেদে উপদেশ।'

'ব্রাহ্মধর্মের ভবিষ্যৎ কী ?' প্রভুর শিষ্য মণীন্দ্র মজুমদার জিগগেস করলে।

'যার দ্বারা যে প্রয়োজন সাধিত হবার কথা তা হয়ে গেলে তার আর দরকার থাকে না। যেমন কুরুক্ষেত্র বিজয়ের পর গাণ্ডীবের আর দরকার ছিল না।'

'হ্যাঁ, কৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর অর্জুন লাঠি-হাতে সাধারণ একটা ডাকাতের কাছে হেরে গেলেন।'

'গাণ্ডীব তুলতে গেলেন, তুলতে পারলেন না।' বললেন প্রভু, 'যদি বা তুললেন গুণ দিতে পারলেন না। পরাজিত হয়ে চলে গেলেন বদরিকাশ্রম। সেখানে গিয়ে ব্যাসদেবকে প্রশ্ন করলেন, 'এরকম কেন হল?'

'ব্যাসদেব কী বললেন?'

'বললেন, যদ্দিন কৃষ্ণ ছিলেন তদ্দিন তাঁর শক্তিতে তুমি শক্তিমান ছিলে আর সে শক্তির বাহন ছিল গাণ্ডীব। এখন কৃষ্ণ নেই, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও শেষ হয়েছে, এখন আর গাণ্ডীবের কী দরকার? এখন পরলোকে কিসে মঙ্গল হয় তার চিন্তা করো। তপস্যা-নিরত হও।' গোস্বামী-প্রভু বললেন, 'তেমনি ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আর প্রচার-বক্তৃতা করা বৃথা, এখন ব্রাহ্মরা যে যার মঙ্গলের জন্যে তপস্যা করো।'

'ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন কী ছিল?'

'খৃস্টধর্ম থেকে ভারতবর্ষকে বাঁচানো, দেশে সুনীতির প্রচার আর দুর্নীতির উচ্ছেদ।'

প্রতাপ মজুমদার এসেছেন। কথায় কথায় বললেন, 'শুধু মানুষের মুখ চেয়ে-চেয়ে জীবন নষ্ট করলাম। কে কী বলবে কে কী ভাববে, শুধু লোকলজ্জার ভয়ে মারা গেলাম। লোকে বড়লোক বলুক বড়লোক ভাবুক শুধু এই অভিমানে আর ধর্ম হল না।'

গোস্বামী-প্রভু বললেন, 'আপনি গীতা ও ভাগবত পড়বেন। শুধু ইংরেজি ভাবে থাকবেন না। আর যারা শুধু টাকা পয়সা দিয়ে টানতে যায় তারা শুধু অহঙ্কারকেই প্রশ্রয় দেয়, আত্মাকে পায় না।'

অর্থ আর স্ত্রীলোক দুইই ভয়ানক। বললেন প্রভু, 'দুইই ভয়ানক। তবে স্ত্রীলোকে আসক্তির চেয়ে অর্থে আসক্ত বেশি অনিষ্টকর। সম্ভোগে অনেক সময়ে স্ত্রীলোকে আসক্তি কমে, অর্থে আসক্তি সহজে কাটতে চায় না। অর্থ যতই পাওনা কেন কিছুতেই তৃপ্তি নেই। আরো পাও আরো চাও। আবার চাও। কেবল চাও। দরকার নেই ক্ষমতা নেই তবুও চাও। এ আসক্তি ভয়ঙ্কর।'

এক অঘোরপন্থী সাধু এসে উপস্থিত। গোস্বামী-প্রভু তাঁকে খেয়ে যেতে বললেন। সাধু বললে, 'কারণ চাই। কারণ ছাড়া আমি আহার করিনা।'

তাকে মদ আনিয়ে দিলেন প্রভু। সাধু তা খেল আনন্দ করে। প্রভু বললেন, 'এ সুধাপান নয় এ কুলকুণ্ডলিনীমুখে আহুতি।'

মদ পেয়েও সাধু তক্ষুণি আহারে বসল না, তার বুঝি অন্য কিছুতে আকর্ষণ। সাধু যোগজীবনের ঘরে ঢুকল। প্রশ্ন করলে, 'তোমার বাক্সে কত টাকা আছে?'

নির্দ্বিধায় যোগজীবন বললে, 'দুশো টাকা।'

প্রভুর কাছে এসে বললে, 'আমার দুশো টাকার বিশেষ দরকার। যোগজীবনের বাক্সে দুশো টাকাই আছে। ওকে ও টাকাটা আমাকে দিয়ে দিতে বলুন।'

যোগজীবনের টাকা মানে আশ্রমের টাকা। যোগজীবনকে ডাকলেন প্রভু। বললেন, 'ক্যাশবাক্সে যত টাকা আছে সব দিয়ে দাও সাধুকে।'

সমস্ত কুড়িয়ে কাচিয়ে দুশো টাকার কিছু বেশী হল। তাই সব দেয়া হল সাধুকে। সাধু বললে, 'আমি আসছি।'

'সে কি, খেয়ে যাবেন না?'

'এই আসছি, এসেই খাব।'

আর এল না সাধু। বিজয়কৃষ্ণ সমস্ত দিন তার ফেরার প্রতীক্ষায় উপবাস করে রইলেন। সাধু না জোচ্চোর! বাসিন্দেরা সাধুর নিন্দা করছে শুনে প্রভু দুঃখিত। বললেন, 'ঐ টাকা কি আমার? আমার তো অযাচক বৃত্তি। যা দেন ঈশ্বর দেন, তাই ও টাকা ঈশ্বরের।'

'তাই বলে ও টাকা ও সাধু নেবে কেন?'

'সাধু নিয়েছে কে বলছে? টাকা ঈশ্বরই নিয়েছেন। দিলেও তিনি নিলেও তিনি। পূর্ণ-শূন্য সমস্ত তিনি।'

একেই বলে অনাসক্তি।

'সেবা বন্দনা আউর অধীনতা সহজে মিলয়ে গোঁসাই।'

দীনহীন বিনীত হওয়া ছাড়া ভগবানলাভের আর দ্বিতীয় পথ নেই। অধীনতা— অধীন থাকবার ভাব, হ্যাঁ, সবাই আমার শিক্ষক সবাই আমার গুরুজন এই অর্থে আমি সবার অধীন। সেবার মধ্যেও এই দাস্য, এই অনুরাগ। দয়ার ভাব না থাকলে সহানুভূতি না থাকলে সেবা হবে কী করে? পতি-সেবা পত্নী-সেবা সন্তান-সেবা প্রভু-সেবা ভৃত্য-সেবা! সেবায় অভিমান হলেই সর্বনাশ। যাদের সেবা করছি সবাই আমার ঈশ্বর।

বন্দনা—বন্দনা মানে মানুষের বন্দনা, স্থানের বন্দনা, বস্তুর বন্দনা। যে কারো থেকে বা যা কিছুর থেকে সত্য পাওয়া যায়, সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাকেই বন্দনা করো। কেননা সেই তোমার ঈশ্বরের বার্তাবহ। কায়িক, বাচিক, মানসিক—তিন রকম বন্দনা। যুক্তকরে নমস্কার বা ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কায়িক বন্দনা, স্তবস্তুতি বাচিক, আর মনে একটি প্রীতি-উজ্জ্বল পূজার ভাব জাগিয়ে রাখাই মানসিক বন্দনা। আর অধীনতা—অধীনতাই তো আত্মীয় করে তোলে, ব্যবধান দূর করে দেয়।

'আচ্ছা, মানুষের স্বাধীনতা বলে কি কিছু আছে?'

'কিছু আছে। দাঁড়বাঁধা স্বাধীনতা।' বললেন বিজয়কৃষ্ণ।

'দাঁড়বাঁধা?'

'এর চেয়ে ভালো আর কী বলতে পারো! যেন গরুর গলায় দড়ি কে বেঁধে দিয়েছে। দড়ি যতটা লম্বা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ততদূর যাবারই তার স্বাধীনতা আছে— সেই দাঁড়বাঁধা স্বাধীনতাই মানুষের। দড়ির অতিরিক্ত যাবার তার ক্ষমতা নেই। তাই বলছি মানুষ দাঁড়বাঁধা গরুর মতোই স্বাধীন।'

ভক্ত এসে দারুণ হাহাকার করে পড়ল গোঁসাইজির কাছে। বললে, 'ভিতরের যন্ত্রণা যে আর সহ্য করতে পারছিনে। নাম ধ্যান সাধনভজন সব ছুটে গিয়েছে, দিন-রাত জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছি। এবার বোধহয় নাস্তিক হলাম।'

প্রভু শান্তস্বরে বললেন, 'না, নাস্তিক হবে না।'

'তবে কী করব?'

'দিন কতক অন্য কোথাও চলে যাও।' বললেন প্রভু, 'এখানে লোকের দৃষ্টি তোমাকে শুকিয়ে দিচ্ছে।'

'লোকের দৃষ্টি?' ভক্ত চারদিকে তাকাল।

'লোকের দৃষ্টি বড় বিষম। দেখনি জীবন্ত গাছ পর্যন্ত লোকের দৃষ্টিতে শুকিয়ে যায়।'

'তা আমার কী করবে?' ভক্ত বললে, 'আমি তো সবসময়ে আপনার স্নেহদৃষ্টিতে সুরক্ষিত।'

'তবে তোমার আর ভয় কী!' প্রভু প্রসন্ন মুখে বললেন, 'যেখানেই যাও, যদি নরকেও যাও, নিশ্চয় জেনো সেখানেও তোমাকে বুকে করে রাখবার একজন আছেন।'

তবে আর কিসের অন্তর্বহ্নি! কিসের নাস্তিক্য!

'চলো আমার সঙ্গে পুরী চলো।' গোঁসাইজি ঘোষণা করে উঠলেন। সবাই উল্লসিত হয়ে উঠল।

কিন্তু কুলদানন্দের মনে ধাক্কা লাগল। পুরী! প্রভুর জননী স্বর্ণময়ী দেবী যে বলেছিলেন, পুরী গেলে বিজয় আর ফিরবে না।

৩৬

তেরো শ চার সনের চব্বিশে ফাল্গুন, স্টিম-লঞ্চের সঙ্গে দুখানি বজরা বাঁধা, একখানাতে সশিষ্য গোস্বামী-প্রভু, আরেকখানাতে আত্মীয়-স্বজন। পুরী যাত্রা শুরু হল। বিদায়-কালে প্রভু করজোড়ে ভক্তদের উদ্দেশ করে বললেন, 'আশীর্বাদ করুন, আমার যেন ধামপ্রাপ্তি হয়।'

এ কী নিদারুণ কথা, সকলে বিদীর্ণবক্ষে হায় হায় করে উঠল।

'আমরা তবে কী করব, কী নিয়ে থাকব?'

সেই মহাপ্রভুর কথাই বললেন আবার গোঁসাইজি: 'ঘরে কর নাম-সংকীর্তন, শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবন।'

বিকেল চারটে কয়লাঘাটা থেকে স্টিমার ছাড়ল। পরদিন দুপুরে বারোটায় নোঙর করল গেঁয়োখালিতে। ডাকবাংলোয় এসে উঠলেন গোঁসাইজি। সঙ্গে কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী। সেদিন দোলপূর্ণিমা। প্রভুর চরণে আবির দেবার জন্যে ভক্তদল আবেগে রঙিন হয়ে উঠল। আবির দিয়ে রঞ্জিত হল অনুরাগে।

চারদিন পরে স্টিমার কটকে পৌঁছুল। ন-মাইল দূরে বারং স্টেশন, সেখান থেকে পুরীর ট্রেন। গোঁসাইজি ঘোড়ার গাড়িতে করে বারং এলেন, স্ত্রী-ভক্তরা গরুর গাড়িতে আর অবশিষ্টের দল পদব্রজে। দুপুরের ট্রেন, পুরী পৌঁছুতে পৌঁছুতে বেলা গড়িয়ে গেল। ট্রেন দাঁড়াল পুরোনো স্টেশনে, এখান থেকে শহর দু মাইলেরও বেশি। বেশ, তো, ঘোড়ার গাড়ি ডাকি।

প্রভু বললেন, 'না। পুরীধামে যানারোহণ করব না।'

কিন্তু প্রভু হাঁটবেন কী করে? দিবানিশি একাসনে থাকার দরুন তাঁর পায়ে বাত হয়েছে, লাঠি কিংবা মানুষের কাঁধ ছাড়া চলতে-ফিরতে পারেন না। তা কী করা যাবে, যিনি কলকাতা থেকে এতদূরে এনেছেন তিনিই হাত ধরে নিয়ে যাবেন। দু শিষ্যের কাঁধে ভর দিয়ে এগোলেন প্রভু। কিছু দূর গিয়ে পথের পাশের একটা বড় বাড়ির বারান্দায় বসলেন বিশ্রাম করতে। হঠাৎ ক-জন পান্ডা এসে উপস্থিত হল, বললে, প্রণামী দাও। তাদের সকলের পদধূলি মাথায় নিলেন প্রভু, প্রণামী দিলেন। পান্ডার দল যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল।

এ কী, প্রভু নিজের পায়েই সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। না, লাঠি লাগবে না, কারুর

কাঁধ লাগবে না, প্রভু একলাই যেতে পারবেন হেঁটে। হাঁটবেন কী, প্রভু ছুটলেন, কোথায় তাঁর বাতের ব্যথা, কোথায় বা শরীরের দৌর্বল্য। মুখে হুঙ্কার, জয় জগন্নাথ, শরীরে মত্ত মাতঙ্গের বল আবির্ভূত হল। প্রভু ছুটলেন তো পিছু-পিছু আর সকলেও ছুটল— তুলল বিপুল হর্ষধ্বনি। সকলের মনে হল সপার্ষদ মহাপ্রভুই বুঝি এলেন আবার নীলাচলে।

আঠার-নালার কাছে আসতেই শ্রীমন্দিরের ধ্বজা চোখে পড়ল। মহাভাবে বিভোর হয়ে গেলেন গোঁসাইজি, উঠল হরিকীর্তনের সিংহনাদ। প্রভু নাচতে শুরু করলেন। ভক্ত বিধু ঘোষ গাইতে লাগল : 'যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, ঐ দেখ তারা দু ভাই এসেছে রে, গৌর নিতাই ভক্তসঙ্গে এসেছে রে —'

সে কী উন্মাদনা! প্রভুর চরণযুগল কঙ্করবিদ্ধ হচ্ছে সেই যন্ত্রণায় বিধু বারে-বারে পথের উপর শুয়ে বুক পেতে দিচ্ছে আর ইশারায় বলছে, আমার বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যান। এমন সময় আরেক পাগল এসে উপস্থিত, কালিয়া-পাগল, সে নাচতে নাচতে বলতে লাগল, ও পথে নয় এ পথে, যেন মন্দিরের পথ একলা ওরই চেনা। চারদিকে ভাবের হরির লুট পড়ে গিয়েছে। গৌরবর্ণনা লোকে এতদিন কানেই শুনে এসেছিল, এবার দেখতে পেল স্বচক্ষে।

বড়দাণ্ডে নীলমণি বর্মনের দোতলা বাড়িতে প্রভুর থাকবার জায়গা হল। কিন্তু জগন্নাথকে দর্শন করবার আগে স্থির হতে পারছেন না। ধুলো-পায়েই বেরিয়ে পড়তে চান কিন্তু তীর্থগুরু হরেকৃষ্ণ খুটিয়া বললেন, আগে মহাপ্রসাদ, পরে জগন্নাথদর্শন। শ্রীক্ষেত্রে এই পদ্ধতি।

মহাপ্রভুর পাণ্ডাঠাকুর কানাই খুটিয়ার বংশধর হরেকৃষ্ণ।

গোস্বামী-প্রভু হরেকৃষ্ণর পদপুজো করলেন। শিষ্যভক্তের দল তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল। তীর্থগুরুর আশীর্বাদ ছাড়া তীর্থফল জুটবে কী করে? এবার তবে সবাই বসে যাও, জগন্নাথের মহাপ্রসাদ বিতরিত হবে। না, পঙ্‌ক্তি নেই, জাতি নেই, বর্ণ নেই, এমনকি উচ্ছিষ্টবিচার নেই, মহাপ্রসাদ মহাপ্রসাদ। সমস্ত কিছুর বাইরে, সমস্ত কিছুর উপরে। গোঁসাইজির শাশুড়িঠাকরুনের কী ঘোরতর সংস্কার ছিল! সারা পথ কত তিনি বলে এসেছিলেন, তাঁকে নিজের হাতে রান্না করে খেতে হবে, অন্যের ছোঁয়া কিছুতেই খেতে পারবেন না। উচ্ছিষ্ট তো কল্পনার অতীত। সেই শুদ্ধাচারিণী বিধবা ব্রাহ্মণী আজন্মের সংস্কার এক মুহূর্তে বিসর্জন দিল। কই দাও মহাপ্রসাদ, আমিও খাব। শাশুড়িঠাকরুণও বসে পড়লেন পাতা নিয়ে। কী স্বতন্ত্র শক্তি এই মহাপ্রসাদের।

বৃন্দাবনের যেমন রজ তেমনি শ্রীক্ষেত্রের মহাপ্রসাদ। মহাপ্রসাদ ভোজনের পর গোঁসাইজি আবার চঞ্চল হয়ে উঠলেন, চলো, জগবন্ধুর মুখচন্দ্রমা দেখে আসি।

পাণ্ডারা নিরস্ত করতে চাইল। বললে, 'আজ পরিশ্রান্ত আছেন, আজ থাক কাল দর্শন করবেন।'

'কাল?' প্রভু বললেন, 'কালের কথা কিছুই বলা যায় না। মৃত্যু কখন এসে পড়ে তা কে বলতে পারে? সুতরাং আজই এই মুহূর্তেই দর্শন করব।'

রাত হয়েছে, হোক, দলবল নিয়ে প্রভু চললেন শ্রীমন্দির। বিগ্রহ দর্শন করা মাত্রই ভাববিহ্বল হয়ে বসে পড়লেন, যেন কত আপনার জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে এমনি স্নেহাবেশে হাত মুখ নেড়ে অস্ফুটে কত কী বলতে লাগলেন। কত মনের কথা, কত

প্রাণের ব্যথা জমে ছিল এতদিন—সব প্রেমাশ্রু হয়ে প্রকাশিত হল, প্রবাহিত হল। লোকে জগন্নাথকে দেখবে না জগদ্‌গুরুকে দেখবে। দুইই বুঝি একবস্তু।

শ্রীক্ষেত্রে আছেন কিন্তু গৃহস্থের নিত্যকর্ম থেকে তাঁর বিরতি নেই। ধর্মালোচনা, পূজা পাঠ ও কীর্তন সমানেই চলেছে। চলেছে ভিক্ষুক বিদায়, অতিথি সৎকার, বৃক্ষসেবা, পশুসেবা এমনকি কীটসেবা। বইয়ের নিচে বাতাসার গুঁড়ো রেখে দেন যাতে পিঁপড়েরা এসে খায়। আরশুলা, ইঁদুরকেও ভোলেননি। শস্য ছড়ানো দেখে তো পাখিরা আসছেই ঝাঁক বেঁধে। আর আসে বানরের পাল। তাদের সব বিচিত্র নাম রেখেছেন প্রভু। কেউ বুড়ো, কেউ গোদা, কেউ নাককাটা, লেজকাটা, হাঁদাপেটা, কেউ বা শুধু দাদামশাই। একদিন একটা ষাঁড় এসে উপস্থিত। সেও খেয়ে গেল পেট ভরে।

কী বলছে ভাগবত? গৃহস্থের ধর্ম কী? গৃহস্থ কৃষ্ণার্পণ করে যথাযোগ্য ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করবে, সর্বদা অমৃতস্বরূপ ভগবানের অবতার-কথায় অবহিত ও শ্রদ্ধান্বিত থাকবে। যাবৎ অর্থে প্রয়োজন তাবন্মাত্র বিষয়সেবা করবে, অন্তরে থাকবে দেহ ও গেহের প্রতি বিরক্তি, বাইরে আসক্তবৎ আচরণ করে প্রকাশিত করবে পৌরুষ। আত্মীয়দের নিয়ে আমোদ করবে কিন্তু কিছুতেই মমতা রাখবে না। দৈবাৎ যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপার্জন হয়, সেই অতিরিক্ত কদাচ অভিমান করবে না, কেননা, যে পরিমাণে উদরপূর্তি হয় সেইটুকুতেই গৃহস্থের স্বত্ব, যে ব্যক্তি তার চেয়ে বেশি দ্রব্যের অভিলাষ করে সে চোর, সে দণ্ডার্হ। অতএব মৃগ, উষ্ট্র, গর্দভ, মর্কট, ইঁদুর, সাপ, পাখি, মক্ষিকা ইত্যাদি যে কোনো প্রাণী গৃহে বা ক্ষেত্রে প্রবেশ করে শস্যাদি ভোজন করলে তা নিবারণ করা উচিত নয়, বরং নিজের পুত্রের মতোই তাদের দর্শন করা উচিত। সমস্তকে নিয়েই ভগবানের শ্রীঅঙ্গের পূর্ণতা, কাউকে বাদ দেবার বা তুচ্ছ করবার অধিকার নেই। পঞ্চযজ্ঞ নির্বাহ অবশ্য বিধেয়, পঞ্চযজ্ঞ করে যা অবশিষ্ট থাকবে তা দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করবে। মানুষ পশু পাখি দেবতা ঋষি—সমস্ত শরীরই ভগবানের সৃষ্টি, সকল পুরেই তিনি জীবরূপে শয়ন করে আছেন, সমস্ত সৃষ্টিই ঈশ্বরের অবয়ব, কাকে ছোট কাকে বড় বলবে—সমস্তই হরির শরীর, হরির মন্দির।

শান্তিসুধা তার ছেলে কোলে নিয়ে এসেছে, তাকে গোঁসাইজি খেতে দিয়েছেন, অমনি এক বানরের বাচ্চা এসে হাজির। দৌহিত্রের দিকে তাকিয়ে গোঁসাইজি বললেন, 'তুমি যেমন গোপাল এ বানর-শিশুও তেমনি গোপাল। একেও খেতে দিতে হয়।' দুই গোপাল একই থালা থেকে খেল ভাগ করে।

ছোট একটি কাঠের মন্দির এল ঠাকুরের জন্যে। তাতে তিন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত, জগন্নাথ বলরাম আর সুভদ্রা। গোঁসাইজি নিত্য সেই তিন বিগ্রহের পূজো করতে লাগলেন। তারপর শুরু হল তাঁর তীর্থদর্শন। মার্কণ্ডেয় সরোবর, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, মহাপ্রভুর গম্ভীরা, গুণ্ডিচাবাড়ি, সার্বভৌমের গৃহ, হরিদাসের সমাধি, সিদ্ধবকুল, গোবর্ধন মঠ, টোটা গোপীনাথ। তারপর বৈশাখে চন্দনযাত্রা, জ্যৈষ্ঠে স্নানযাত্রা, আষাঢ়ে রথযাত্রা—সকল যাত্রার যাত্রী হলেন বিজয়কৃষ্ণ।

চন্দনযাত্রা নরেন্দ্র সরোবরে। চতুর্দোলায় চড়ে লক্ষ্মী-সরস্বতীসহ মদনমোহন আসে। অন্য দোলায় আসে পঞ্চশিব—যমেশ্বর, নীলকণ্ঠ, মার্কণ্ড, লোকনাথ আর কপালমোচন। দুই নৌকো করে দুই দল সরোবর পরিক্রমা করে। পরিক্রমার পর সরোবরস্থ মন্দিরে

বিগ্রহদের ভোগ-পূজা হয়—সঙ্গে কত নৃত্যগীত কত কথাকীর্তন। তারপর ভোগ-অন্তে বিগ্রহেরা যে যার মন্দিরে প্রস্থান করে।

অক্ষয় তৃতীয়া থেকে শুরু করে একুশদিন ধরে এ উৎসব চলে। প্রভু তাই দেখেন অনিমেষে, ভক্তদের বলেন, তোমরা নরেন্দ্রে স্নান করো, এ সময় এখানে গঙ্গা-যমুনা এসে মিশেছে। একসাথে গঙ্গাযমুনাস্নান হয়ে যাবে।

আনন্দের তুফান তুলে স্নান করে সকলে।

একদিন উত্তর-পশ্চিম কোণের বটগাছের দিকে সকলের দৃষ্টি ফেরালেন প্রভু। বললেন, 'কতদিন এই গাছের নিচে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মহাপ্রভু এসে বসেছেন।' আরেকদিন উত্তর তীরের বন দেখিয়ে বললেন, 'কখনো-কখনো বিপিন ভোজন করে গেছেন ওখানে।' আরেক দিন সেই উত্তর দিকেই অঙ্গুলিসঙ্কেত করে বললেন, 'দেখ দেখ কেমন সুন্দর মন্দির। কেমন সোনার চুড়ো তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সে কী, দেখতে পাচ্ছনা তোমরা?'

কী করে দেখবে? কী করে বুঝবে ঐটিই প্রভুর ভাবী সমাধিমন্দির?

স্নানযাত্রার দিন দয়িতা-পাণ্ডারা প্রভুর কাছে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করে বসল। প্রার্থিত অর্থ না দিলে স্নানবেদীর কাছে যেতে দেওয়া হবে না। অন্যায় দাবি মেনে নিতে প্রভু রাজি হলেন না, দরকার নেই তোমাদের অনুষ্ঠান দেখতে। আমি মন্দিরে চললাম, মন্দিরে বসেই আমি জগন্নাথের অপ্রাকৃত স্নানযাত্রা দর্শন করব। পাণ্ডারা তখন বুঝল তাদের অনুষ্ঠান ব্যর্থ হবে, জগন্নাথ মন্দির ছেড়ে যাবেন না স্নানবেদীতে। তাদের দেওয়া জলে স্নান না করে মন্দাকিনীতেই আজ স্নান করবেন। তখন পাণ্ডারা এসে প্রভুর পায়ে পড়ল। চলুন স্নানবেদীতে, আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন। আপনার যা খুশি তাই দেবেন।

স্নানবেদীর ধারে গিয়ে প্রভু দেখলেন স্নানযাত্রা। তীর্থের সম্মান রাখতে প্রভু যে অর্থ দিলেন, পাণ্ডারা দেখল, তা তাদের প্রার্থনারও অতিরিক্ত।

কিন্তু রথযাত্রার দিন অন্যরকম বিপদ ঘটল। প্রভুর পায়ে ব্যথা উপস্থিত হল, এত ব্যথা যে চলা দূরের কথা, উঠে দাঁড়ানো কষ্টকর হল। রথযাত্রা দেখা বুঝি অদৃষ্টে নেই। ভক্ত-শিষ্যরা বললে, ভাবছেন কেন, আপনার জন্যে আমরা তাঞ্জাম নিয়ে আসব, তাতে চড়ে বামন দর্শন করবেন।

রথে তু বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। শাস্ত্রে আছে, আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে পুষ্যানক্ষত্রে রথে জগন্নাথকে দেখলে পুনর্জন্মের খণ্ডন হয়। কিন্তু পাণ্ডাদের নিজেদের মধ্যে টাকা পয়সার বাঁটোয়ারা নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়েছে, বামনকে রথস্থ করা হচ্ছে না। এদিকে দ্বিতীয়া বুঝি কেটে যায়।

শিষ্যকে পাঠিয়েছেন প্রভু, বামন রথস্থ হলে যেন খবর পাঠায়। খবর পৌঁছুলে তিনি তাঞ্জামে করে রওনা হবেন। শিষ্য খবর নিয়ে এল, দ্বিতীয়া প্রায় শেষ হতে চলল বিগ্রহকে এখনো রথে বসানো হয়নি। তবে আর গিয়ে কী হবে, তাঞ্জাম ফিরিয়ে দাও, যেতে যেতে ফুরিয়ে যাবে দ্বিতীয়া।

'এখনো তো কিছুক্ষণ দ্বিতীয়া আছে, আপনি আপনার বিগ্রহ নিয়ে তাঞ্জামে উঠে বসুন, সেই আমাদের রথস্থ বামন দেখা হবে।' শিষ্যভক্তের দল প্রভুর কাছে সকাতর প্রার্থনা জানাল।

প্রভু উঠে বসলেন তাঞ্জামে। সঙ্গে তাঁর নিজের জগন্নাথ। শিষ্যরা তাঞ্জাম কাঁধে নিয়ে ঘুরতে লাগল। না, দ্বিতীয়ার এখনো অবসান হয়নি। কে আছ রথস্থ বামনকে দেখে জন্মশৃংখল ছিন্ন করো। জয় প্রভু বিজয়কৃষ্ণ।

শিবচতুর্দশীর দিন গেলেন লোকনাথ মহাদেবকে দর্শন করতে। 'হরিহর' 'হরিহর' বলে উন্মত্ত নৃত্য করলেন। বললেন, 'ওঁ নমঃ শিবায়, এই নাম সর্বদা জপ করো, এতেই সিদ্ধিলাভ হবে। স্বয়ং দ্বারকানাথ এই নাম জপ করে সিদ্ধকাম হয়েছিলেন। যে কৃষ্ণকে পূজো করে অথচ শিবকে মানেনা কিংবা যে শিবকে পুজো করে অথচ কৃষ্ণকে মানে না, উভয়েই নরকস্থ হয়। শিবায় বিষ্ণুরূপায় শিবরূপায় বিষ্ণবে। শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণু বিষ্ণোস্তু হৃদয়ং শিবঃ।'

আর দোলযাত্রার দিন মন্দিরে দোলবেদী ঘিরে প্রভুর সে কী মহাভাবময় নৃত্য! লোকে বিগ্রহ দেখবে। স্বয়ং ছত্রপতি বলে উঠল, এই তো স্বয়ং এসেছেন জগন্নাথ। বলে প্রভুর মাথায়ই ছাতা ধরল।

কত লীলা কত ভাব কত আত্মপ্রকাশ। নিত্য সমুদ্রস্নান করেন, সেদিন অতর্কিতে এক ঢেউ প্রভুর বাঁ হাঁটুতে আছড়ে পড়ে অস্থিসন্ধি ভেঙে দিল, আবার তক্ষুনি আরেকটা ঢেউ এসে অনুরূপ আছড়ে পড়ে ভাঙা অস্থিকে জোড়া লাগিয়ে দিল। কেউ জানতেও পারল না কী ঘটে গেল। শিষ্যস্কন্ধে ভর দিয়ে গৃহে ফিরলেন। বললেন, ঢেউয়ের বাড়ি লেগে হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছি, প্রলেপ লাগাতে হবে।

সামান্য ব্যথা, প্রলেপ লাগাতেই সেরে গেল। কিন্তু সেদিন কে হঠাৎ এসে প্রভুর পা টিপতে বসল। হাঁটুর যেখানটায় ব্যথা পেয়েছিলেন সেখানটায় হাত বুলুতে লাগল। তারপরে খানিকক্ষণ ডমরু বাজিয়ে নৃত্য করলে। প্রভুর ব্যথা সেরে গেছে তাতেই যেন তার আনন্দ। নাচতে নাচতে অদৃশ্য হয়ে গেল। কে এই দিব্যকান্তি পুরুষ? প্রভু বললেন, 'ইনি সমুদ্রের অধিষ্ঠাতা বরুণদেব। অতর্কিতে সেদিন সমুদ্র আমাকে আঘাত করেছিল বলে তিনি নিজেকে অপরাধী মনে করে আমার সেবা করতে এসেছিলেন। যারা ভক্ত দেবতারাও তাদের সেবা করেন।'

কখনো কখনো সমুদ্রে গিয়ে স্নান না হলেও আসনে বসেই প্রভুর স্নান হয়ে যায়। ভক্তরা সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে প্রভুর সর্ব শরীর আর্দ্র, জটা থেকে টপ টপ করে অবিরল জল পড়ছে। এ কী অঘটন! প্রভু বললেন, 'সমুদ্রস্নান করে এলাম।'

আসন থেকে উঠলেন না, ভক্তরা অবাক হয়ে ভাবতে বসল, সমুদ্রে গেলেন কখন? প্রভু বললেন, 'আসনে বসেই সমুদ্রস্নান করলাম।'

পুরীতে তখন বানরনিধন চলেছে। বানরেরা শস্যফল নষ্ট করে, সুতরাং এদের মেরে ফেল—সরকার জারি করেছে ফতোয়া। শহরে শিকারিরা বন্দুক নিয়ে ঘুরছে, গুলি ছুঁড়ছে যত্রতত্র। একদিন তো প্রভুর চোখের সামনেই একটা বানর গুলি খেয়ে মারা পড়ল, রক্তে ভেসে গেল রাস্তা। প্রভু বালকের মতো অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। পরক্ষণে বললেন দৃঢ়স্বরে, বিষ্ণুক্ষেত্র বানররক্তে কলুষিত হতে দেব না।

প্রভু তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করলেন। শিকারিরা লুকিয়ে লুকিয়ে ফিরতে লাগল—গোঁসাইজি ও তাঁর শিষ্যদের নজরে যেন না পড়ে। কিন্তু বানরের দল কী উপায়ে কে জানে বুঝতে পেরেছে প্রভু তাদের সহায়-সুহৃৎ। বন্দুক হাতে শিকারি দেখতে পেলেই বানরের দল ছুটে আসে প্রভুর কাছে, একেবারে প্রভুর পা চেপে ধরে

মিনতি জানায়। প্রভু বুঝতে পারলেন আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্যেই তারা ডাকছে প্রভুকে। কী করে তারা টের পেয়েছে প্রভুই একমাত্র পরিত্রাতা।

প্রভুর কাছে খবর পৌঁছে গিয়েছে বুঝতে পেরে শিকারি সরে পড়ে।

কিন্তু একটা স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বার করা না পর্যন্ত গোঁসাইজি ও তাঁর শিষ্যদের স্বস্তি নেই। মিউনিসিপ্যালিটির কাছে প্রভু লিখিত আবেদন পাঠালেন। সে আবেদন সরাসরি অগ্রাহ্য হয়ে গেল।

বানরেরা কী করে বুঝল তাদের পক্ষের আবেদন অগ্রাহ্য হয়ে গেছে। তাই তারা দলে দলে প্রভুর অঙ্গনে এসে ভিড় জমিয়ে বসল। সে এক বিরাট সভা, সবচেয়ে বিস্ময়কর, কোনো কিচিরমিচির নেই, কোলাহল নেই, লঘুতা চপলতা নেই, সব গম্ভীর ব্যথিত মুখে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, যেন বিপদের মুহূর্তে চাইছে উদ্ধারের উপায়। প্রভুই সমুদ্ধর্তা।

ছোটলাট উডবার্নের কাছে আবেদন পাঠানো হল। বানরবধ অবৈধ, অশাস্ত্রীয়। উডবার্ন বানরবধ রদ করে দিল। আনন্দের প্লাবন নামল পুরীতে। প্রভুকে ঘিরে বানরযূথের সে কী নৃত্যরঙ্গ, গতিভঙ্গী প্রভু সাক্ষী, তুমিই আমাদের বাঁচিয়েছ।

চল্ মহাবীর ঠাকুরের পূজা দিই গে।

৩৭

হৃদয় যদি শুষ্ক মনে হয়, অন্তরে যদি ভাব না থাকে, তবে কাউকে কিছু দান করে এস। গোস্বামী প্রভু বললেন, 'লোককে খুব দেবে। দিলেই সব খুলে যাবে।'

দানের স্পর্শেই খুলে যাবে কাঠিন্যের কারাগার, সরে যাবে কার্পণ্যের অবরোধ।

পাত্রাপাত্রের বিচার উঠে গেল। কার কী অভাব বলো, সাধ্যমত মোচন করে যাই। যেদিন কিছু দান হয় না সেদিন বন্ধ্যা দিন।

শ্রীমন্দিরের কাছে এক মিঠাইওলা হাত পাতল। বললে, 'ছেলের পৈতে দিতে পাচ্ছিনা, যদি কিছু দেন—'

প্রভু দশটাকা দিয়ে দিলেন। বললেন, 'পত্র পুষ্প দিয়ে কোনো রকমে।'

আনন্দে ভরে উঠল মিঠাইওলা। বললে, 'রাধারাণী তোমকে বনায়ে রাখে।' পাশের লোককে টাকা দেখিয়ে বলল, 'বাবা মহারাজজিকা জয়। যমুনামাই উনকে বনায়ে রাখে।'

'ঝড়ে ঘর ভেঙে পড়েছে, মেরামত করবার পয়সা নেই।' আরেকজন হাত পাতল।

কুড়ি টাকা দিয়ে দিলেন গোঁসাইজি।

'দেশে ফিরে যাবার রেলভাড়া জুটছে না।'

দিয়ে দিলেন যা দরকার। ভাণ্ডারে যদি একটি পয়সাও থাকে তা দান করে যাবে। সেদিন যে একটি পয়সাও নেই। না, দিন বন্ধ্যা হতে দেব না। দুটি ঘটির একটি বেচে দিলেন প্রভু। সেই পয়সা বিতরণ করলেন।

কলিতে শুধু দুই বস্তু। দান আর নাম। সম্পূর্ণ স্বত্বত্যাগই দান। যাকে দেবে সে যদি তৎক্ষণাৎ তা নষ্ট করে ফেলে, কিছু বলতে পারবে না। আগুনে দগ্ধ করে ফেললেও না। তুমি যদি মনে করো তোমার সর্ত-মতো দ্রব্য ব্যবহার করতে হবে, তাহলে

সেটা আর দান নয়, সেটা ন্যাস—গচ্ছিত রাখা। তেমন দান পাপ। সমস্ত নিঃশেষ করে দেওয়ার নামই দান।

যে চেয়েছে তাকে দেওয়ার চেয়ে যে চায়নি তাকে দেওয়া মহত্তর। কিন্তু যে যাচ্ঞাও করেনি, দান পেয়ে স্বীকারও করবে না অথচ ফিরিয়েও দেবে না তাকে দেওয়াই মহত্তম। সামান্য স্বীকৃতির আশাটুকুও রাখবে না।

চেয়েছে তাই দিয়েছ—সেটা দানমাত্র। কিন্তু চায়নি অথচ দিয়েছ সেটা ইষ্টদেবের পূজা। সে দানের মতো আনন্দ নেই।

'যা খাবেন সমস্ত ভগবানের কাছে ধরবেন।' বললেন প্রভু, 'প্রহ্লাদ যখন বিষ খায় তখন তাও ভগবানকে নিবেদন করেছিল। জলটুকু খেতে হলেও মনে মনে ভগবানে নিবেদন করে নেবেন। বৃন্দাবনে গৌর শিরোমণির নাতিটির কী সুন্দর ভাব দেখেছিলাম। প্রসাদী বস্তু ছাড়া আর কিছু সে মুখে তুলবে না। এমনকি জল পর্যন্ত না।'

বিষয়ের স্পর্শে মলিনতা আসে। প্রহ্লাদ যে প্রহ্লাদ, তারও মতিভ্রম হল। তার মধ্যে দৈত্যভাব জাগ্রত করবার জন্যে দৈত্যরা খাবারের মধ্যে মদ মাংস মিশিয়ে দিতে লাগল। মদ-মাংসের স্পর্শে তার মধ্যে জেগে উঠল তমোভাব। ফলে সে বেরুল দিগ্বিজয়ে। যে রাজ্যে যায় সে রাজ্যেই সকলে তাকে নানা উপচারে পরিতুষ্ট করতে লাগল। শেষকালে বৈকুণ্ঠে এসে উপস্থিত হল প্রহ্লাদ। একেবারে ভগবানের সিংহাসনে গিয়ে বসল। লক্ষ্মী জিগগেস করল, ঠাকুর, প্রহ্লাদ এ কী করল? নারায়ণ বললেন, প্রহ্লাদকে আমি আগুনে জলে পতনে পোষণে সর্বত্র কোলে করে রক্ষা করেছি। ও আমার সিংহাসনে বসেছে এ এমন কী বেশী অপরাধ! নারায়ণ প্রহ্লাদের সামনে এসে দাঁড়াল। নারায়ণে দৃষ্টি পড়ামাত্রই প্রহ্লাদের তমোভাব কেটে গিয়ে সত্ত্বভাব প্রকাশ পেল। এ আমি কী করেছি, বলে কাঁদতে লাগল প্রহ্লাদ। নারায়ণ বললে, ভয় নেই। দৈত্যরা তোমাকে চালাকি করে মদ-মাংস খাইয়ে তমোভাবান্বিত করেছিল। তুমি সেসব খাদ্য আমাকে নিবেদন করে গ্রহণ করলে এমন বিভ্রান্তি ঘটত না। প্রহ্লাদ বললে, ঠাকুর, আমার ওসব নিবেদন করতে কেন ইচ্ছে হয়নি কে বলবে? নারায়ণ বললে, 'বিষয়ের স্পর্শে মলিনতা আসে, সেই মলিনতাতেই এই বিভ্রান্তি।

আহারদোষ স্বয়ং প্রহ্লাদকে পর্যন্ত টলিয়ে দিতে পারে।

'আহারের সঙ্গে ধর্মের যোগ আছে।' বললেন গোঁসাইজি, 'শরীর আর আত্মার একত্র উপস্থিতি। আর শরীরের পরিণতিই তো মন। তাই আহারই সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন। আহারের দোষেই রোগ, আহারের দোষেই ধর্মনাশ। শুদ্ধ প্রণালী মতো আহার করো, তাইতেই সব হবে। আর কিছু করতে হবে না।'

ছান্দগ্য উপনিষদ বলছে, আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্ব গ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ—আহার শুদ্ধ হলে অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি ঘটে, অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হলে নিশ্চলা স্মৃতি হয়। স্মৃতিলাভ হলেই সমস্ত হৃদয়গ্রন্থির বিমোচন।

অযাচিত দান প্রত্যাখ্যান করতে হয় না। করলেই অপরাধ। প্রভু যখন বৃন্দাবনে পরিক্রমা করছেন, দেখতে পেলেন একটি সাধু অনাবৃত শরীরে শীতে ক্লেশ পাচ্ছে। তাকে একখানা কম্বল দিয়ে নমস্কার করলেন প্রভু, বললেন, আপনি এই কম্বলখানা গায়ে দিন। সাধারণ মামুলি কম্বল সাধুর পছন্দ হল না। ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে,

এমন বাজে কম্বল আমি নিই না, এ বাজারে বিক্রি করে দাও। কত অনুনয়-বিনয় করলেন প্রভু, সাধু গ্রাহ্য করল না। আরেক সাধুকে দিতেই সে তা হাত বাড়িয়ে তুলে নিল।

কয়েক দিন পরে শুরু হল তুমুল বর্ষণ। যমুনার চড়ায় যাবে, সাধুদের শারীরিক দুর্গতির শেষ রইল না। কম্বল ফিরিয়ে দিয়েছিল যেই সাধু তার বুঝি বেশি কষ্ট। সে শীতে অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। ধুনি জেবলে যে শরীরটাকে গরম করবে তার পর্যন্ত কাঠ নেই। তখন কাঠের সন্ধানে দিশেহারা হয়ে লড়াকির গোলা থেকে কয়েকটা কুঁদো চুরি করল। লকড়িওয়ালা ছাড়লেনা, চোর বলে ধরিয়ে দিল। বিচারে সাধুর জেল হল। কম্বল ফিরিয়ে দিয়েই তার এই দুর্দৈব।

প্রভু বললেন, 'অভাবে পড়লে অযাচিতভাবে যা আসে তাই ভগবানের দান মনে করে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে হয়। ভগবানের দান অগ্রাহ্য করলে বিষম অনর্থ ঘটে। দেখ ঐ সাধুর দশা। যখনই কম্বল ছুঁড়ে ফেলল, আমার মন বললে, অভিমানী সাধু নির্ঘাৎ বিপদে পড়বে। অভিমান করে শ্রদ্ধার দান অগ্রাহ্য করতে নেই।'

তিনজন পুলিশ কর্মচারী বারোজন সাধুকে ধরে এনেছে। অপরাধ টিকিট না কেটেই ট্রেনে চড়েছে। বারো জনের ভাড়া পনেরো টাকা। এই টাকা না দিলে সোজা হাজতবাস।

গোঁসাইজি পনেরো টাকা দিয়ে দিলেন। খালাস করে নিলেন সাধুদের। বললেন, 'কাল থেকে এদের ভোজন হয়নি, মহাপ্রসাদ পাইয়ে দাও।'

দুপুরে বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন, একটি ওড়িয়া সাধু রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে প্রভুকে প্রণাম করল। পরে উঠে দুই হাতে প্রভুকে আরতি করতে করতে ওড়িয়া ভাষায় গান করতে লাগল।

সাধুর প্রায় উলঙ্গ-বেশ, প্রভু বললেন, 'ওকে একখানা গায়ের কাপড় দিলে হয়।'

সাধু কিছু দূরে চলে গিয়েছে, সতীশ ছুটে গিয়ে তাকে একখানা কম্বল আর চার আনা পয়সা দিয়ে এল। কম্বল আর পয়সা ফিরিয়ে দিল সাধু। আবার গান ধরল ওড়িয়া ভাষায়। গান শেষে চলে গেল হাসতে হাসতে।

'ঐ দুটো গানের অর্থ কী?' একজন জিগগেস করল প্রভুকে।

প্রভু বললেন, 'প্রথম গানের অর্থ, হে রাম, তোমাকে বহুদিন পর দেখলাম। কত তোমাকে খুঁজেছি, পাইনি কোথাও। এত দিন কোথায় ছিলে? কেন দেখা দাও নি? আজ দেখলাম, দেহ-মন জুড়িয়ে গেল।'

'আর দ্বিতীয় গান?'

'দ্বিতীয় গানের অর্থ, হে রাম, হে দয়িত, আর ছলনা কেন? আবার ঐশ্বর্য কেন? কম্বল কেন? আমার কি কিছু অপ্রতুল আছে? আমাকে যে দুখানি হাত দিয়েছ তাই দিয়েই তো আমি শীত নিবারণ করি। পয়সার কী দরকার? আমার তো প্রসাদই আছে।'

সকলে মুগ্ধ হয়ে রইল।

প্রভু বললেন, 'এই কম্বল আর পয়সা আর কাউকে দিয়ে এস।'

একদিন সমুদ্র স্নান করে ফিরছেন, দেখলেন এক নেংটিসার সাধু রাস্তার পরিত্যক্ত হাঁড়ি থেকে মহাপ্রসাদ কুড়িয়ে নিয়ে খাচ্ছে। প্রভু সতীশকে বললেন, 'চারটি পয়সা আর আমার এই গায়ের চাদরখানা ওকে দিয়ে এস।'

সতীশ কাছে যেতেই সাধু তৃণগুচ্ছ হাতে করে প্রভুকে আরতি করতে এল। গান

ধরল : নীল চক্র, জগন্নাথ, মন ভজ না চৈতন্য, মন ভজ না চৈতন্য। প্রভুকে লক্ষ্য করে বললে, 'আমি বৃন্দাবন গিয়েছিলাম। বৃন্দাবন শূন্য। এখন দেখছি দণ্ড কমণ্ডলু হাতে নিয়ে এখানে বিরাজ করছ।'

গায়ের কাপড়, পয়সা, কিছুই নিলে না। বললে, 'আমার প্রারব্ধ যা আছে তাই হবে। একশো বছরের উপর কেটে গেল। জগবন্ধু এখন এসব দিচ্ছেন কেন ?' চলে গেল আপন মনে।

প্রভু বললে, 'কাপড় ফেলে রেখে এস। যে নেবার নেবে।'

কতক্ষণ পরে সেই সাধু ফিরে এল। সবাই ভাবল কাপড় পয়সা নিতে যাবে বোধ হয়। কিন্তু, না, আবার গান ধরল : চৈতন্য ভজ না মন, দেখ মোর কেলে সোনা।' প্রভুকে দেখে তার কী আনন্দ! আবার গান : 'কত রোজ দেখি নাই তোর চন্দ্রবদন। আজ দেখছি। এতরূপ দেখি নাই, এমন প্রেম দেখি নাই।'

নাচতে-নাচতে আবার চলে গেল পথ দিয়ে। কোথায় কাপড়, কোথায় পয়সা, চেয়েও দেখল না।

ঠাকুর বললেন, 'একেই বলে পঞ্চম পুরুষার্থ।'

'আমার আকাশবৃত্তি।' বললেন আবার প্রভু, 'ভগবান যেদিন যেমন দেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকি। কিছু না দিলেও তাঁরই দয়া বলে অনুভব করি। অশনে যে সুখ অনশনেও সেই সুখ। যিনি অশন দিয়েছিলেন তিনিই রেখেছেন অনশনে।'

বৃন্দাবনে আরেকদিন যমুনার চড়ায় গিয়েছেন প্রভু, সাধুদের ভিড় ঠেলে চলেছেন দূর প্রান্তে, সেখানে ফাঁকায় একটি অকিঞ্চন সাধু কয়েকজন জিজ্ঞাসুর সঙ্গে বসে ধর্মালোচনা করছে।

প্রভু এক পাশে বসলেন। অবসরমত জিগগেস করলেন, 'মহারাজ আজ আপকা সেবা হুয়া হ্যায় ?'

সাধু বললে 'নেহি।'

'কাল হুয়া হ্যায় ?

সাধু স্বচ্ছ মুখে বললে, 'নেহি।'

'পরশু হুয়া হ্যায় ?'

স্বচ্ছতর মুখে সাধু বললে, 'নেহি।'

ক্রমান্বিত জিজ্ঞাসা করে প্রভু জানলেন গত সাতদিন ধরে সাধু অভুক্ত আছে। অথচ দেহে অবসাদ নেই মনে অপ্রসাদ নেই। কেন, কেন এই অনাহার ? সাধু বোঝাতে চাইল সব গোবিন্দের ইচ্ছা। চেষ্টা করলে কোথাও কি ভিক্ষে মিলত না ? সাধু বললে, প্রাণ যায় যাবে তবু কারু কাছে যাচ্ঞা করতে পারব না। যার প্রাণ তিনি ইচ্ছা করলে রাখবেন, ইচ্ছা করলে নিয়ে নেবেন।

এইটুকুই জানতে এসেছিলেন প্রভু। তক্ষুনি তাঁর কুঞ্জে ফিরে এসে সাধুকে খাবার পাঠিয়ে দিলেন। সাধু তা প্রত্যাখ্যান করে কী করে ? এ যে অযাচিত পাওয়া। এ যে গোবিন্দের পাঠানো।

গেণ্ডারিয়ায় থাকতে একদিন গোঁসাইজির শাশুড়ি বুড়ো-ঠাকুরাণী নবকুমার বিশ্বাসকে বললেন, 'আজ তো হাতে কিছু নেই, আশ্রমে এতগুলি প্রাণী, খাবার কী হবে ?'

নবকুমার আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'বাজার থেকে ধারে নিয়ে আসি গে।'

চাল ডাল তেল যা দরকার নবকুমার সওদা করে নিয়ে এল।

আহারান্তে প্রভু ডাকলেন নবকুমারকে। জিগেগস করলেন, 'বাজার থেকে কিছু জিনিস ধারে এনেছেন বুঝি?'

'বুড়ো ঠাকুরাণী বললেন তাঁর ভাঁড়ার শূন্য—'

'তা আপনার কোনো দোষ নেই। কিন্তু আপনাকে আমার ব্রতের কথা জানাই। আমার আকাশবৃত্তি, আমার আহ্বানও নেই বিসর্জনও নেই। ভগবান যেদিন যা মেলান তাই আশ্রমের সকলকে সমানভাবে খেতে হবে। নিজের থেকে উদ্যোগ করে সে ভার নিতে গেলে ব্রতসাধন হয় না।'

'আমি জানি না।' নবকুমার হাত জোর করল : 'আমাকে মার্জনা করুন।'

কী বলছে গীতা? 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।' যারা অন্য সব কামনা ত্যাগ করে একমনে আমারই উপাসনা করে সেই নিত্যযুক্ত ভক্তদের আমি ভরণপোষণের ভার বহন করি।

যখন ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন, কেউ কেউ তাঁকে ভয় দেখিয়েছিল, তোমার নিরাশ্রয় পরিবার অনাহারে শুকিয়ে মরবে। গোঁসাইজি বললেন, 'ভগবানের নাম প্রচারের জন্য ভগবান যদি আমার পরিবারকে শুকিয়ে মারেন আমার আক্ষেপ করবার কী আছে!'

আসামে যাচ্ছেন, টাকা যা ছিল জাহাজ-ভাড়াতেই শেষ হয়ে গেল। দুদিন চলে গেল, আহার কিছুই জোগাড় হল না। তৃতীয় দিন খিদের জ্বালায় নদীর পাড়ের খানিকটা পলিমাটি জল দিয়ে গুলে খেয়ে ফেললেন। যাত্রীদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত কয়েকজন এ দৃশ্য দেখে বিমূঢ় হয়ে গেল। এ কী করলেন? গোঁসাইজি বললেন, 'তা আর কী করা! ভগবান যা দিলেন তাই প্রণাম করে সাদরে গ্রহণ করলাম।'

'বা, আমাদেরও তো জানাতে পারতেন।'

গোঁসাইজি হাসলেন। বিনম্রবচনে বললেন, 'আপনাদের উপর নির্ভর করে তো বার হইনি। যাঁর উপর নির্ভর করে বার হয়েছি তিনি যা জুটিয়ে দিলেন তাই খেলাম তৃপ্ত করে।'

ঢাকা থেকে চাটগাঁ যাচ্ছেন পায়ে হেঁটে। যদি শুধু শুকনো চাল জুটছে তো চিবিয়েই খেয়ে নিচ্ছেন। কত দিন তো শুধু রাস্তার দোপাটি ফুল খেয়েই কাটালেন। হাঁটলেন দিনে আটচল্লিশ মাইল করে। যদি কখনো ভাত জুটেছে তো তাই সই, নুন জোটেনি বলে গ্রাহ্য করেননি। যা এসেছে তাই ভগবানের প্রসাদ। যা আসেনি তাও।

আগে আগে বুড়ো ঠাকুরাণীর হাতে আশ্রমের ভার ছিল, তিনি ভেবে-চিন্তে রয়ে-সয়ে খরচ করতেন, তাই বুঝি অর্থও কম আসত। পরে যোগজীবন যখন ভার নিল তখন হিসেব উড়ে গেল, বাছবিচারের সর্ত রইল না। যা পাঠিয়েছেন ভগবান পাঠিয়েছেন, আর তুমি যদি ভগবানের আশ্রিত হও, নাও তোমার প্রয়োজন মতো, যত প্রয়োজন তত আয়োজন। স্রোতের মতো অর্থাগম হতে লাগল। ব্যয়ে কার্পণ্য নেই আয়েও অজস্রতা। যেমন প্রভুর আকাশবৃত্তি তেমনি তাঁর ভাণ্ডারও ভগবানের ভাণ্ডার। আমি নিষ্কিঞ্চন কিন্তু আমার ভগবান যে রাজরাজেশ্বর।

'এসেছে ব্রজের বাঁকা কালো সখা দেখবি আয়
তোদেরি এই নদীয়ায়।

এবার তার রং ফিরেছে ঢং ফিরেছে
কালো এখন চেনা দায় ।।
আর তার কালো বরণ নাই
এবার রাই-অংগ-সংগ পেয়ে গৌর হয়ে তাই
সেই ব্রজের প্রেমের খেলা সেই ব্রজের রসের খেলা
সেই ব্রজের ভাবের খেলা খেলতে এসেছে হেথায় ।।''

ঝুলনপূর্ণিমার দিন সকলের ইচ্ছে হল প্রভুর জন্মোৎসব হোক। প্রভু বললেন, 'যদি কাঙালীদের পেট ভরে ভালো করে খাওয়াতে পারো তাহলেই উৎসব হতে পারবে।'

কিন্তু অত টাকা কই ? কোত্থেকে বিধু ঘোষ এসে বললে, 'এই উৎসবের সমস্ত খরচ আমি দেব। ডাকো কাঙালীদের।'

'জয় জটিয়াবাবার জয়।' কাঙালীদল উল্লাস করে উঠল। এত পিঠে-পায়েস কেউই আমাদের খাওয়ায় নি, তাও এত যত্ন করে। কত জম্বুর রাজা এল-গেল এমন কেউ করবে না।

প্রভু বললেন, 'দেখছ প্রসাদ থেকে কী আশ্চর্য সুগন্ধ বেরুচ্ছে। যথার্থই আজ জগন্নাথের ভোজন হল। এ তাঁরই পরিতৃপ্তির সুগন্ধ।'

আর কী সুন্দর পরিবেশন ! পরিবেশনে এতটুকু অসাম্য নেই। পরিবেশনে অসাম্যও অপরাধ। আর পরিবেশনই তো আমাদের জীবে জীবে কৃষ্ণকে প্রণাম। ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে। প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ। এই তো প্রণাম মন্ত্র।

'রাত্রে শয়নকালে এবং ঘুম থেকে ওঠবার সময়, সাধন করতে বসে এবং সাধনের পর ওঠবার সময় ভগবানকে স্মরণ করে এই মন্ত্র পড়ে নমস্কার কোরো।' বললেন প্রভু, 'ভগবৎবুদ্ধিতে যেখানে যখন নমস্কার করবে এই মন্ত্র পড়ে কোরো। ভগবানের অন্তর্ধানকালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মুনিঋষি দেবদেবী প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণী এই মন্ত্র পড়ে ভগবানকে নমস্কার করেছিলেন। এই মন্ত্র পড়ে ভগবানকে নমস্কার করলে সেই নমস্কার ভগবানের চরণে পেঁছুবে এরূপ বর আছে।'

প্রভু পায়ে হেঁটে সমুদ্রস্নানে যাচ্ছেন, তাঁর ক্লেশ দেখে একজন বাঙালি ভদ্রলোক বললেন, 'পাল্কি চড়েও তো যেতে পারেন—'

প্রভু বললেন, 'এ স্থানের বালুকা স্বর্ণবালুকা। এ গায়ে লাগলে শরীর পবিত্র হয়ে যায়। বরং শরীর পাত করে এ ধূলির সংগে মিশে যাওয়া ভালো তবু পাল্কিতে চড়ে যাওয়া ঠিক নয়।'

'আসল কী জানো ?' বলছেন গোঁসাইজি। 'আসল হচ্ছে ভগবৎ-ইচ্ছা। নিজের ইচ্ছায় চেষ্টায় কিছু হয় না, ভগবৎ-ইচ্ছায়ই সমস্ত। যখন চিকিৎসা করতাম মনে ধারণা হত, এই ওষুধটা দিলেই রোগ আরাম হবে। দেখি তা হয় না। বারে বারেই হয় না। তখন বুঝলাম, ওষুধ কিছুই নয়, আসল হচ্ছে ভগবানের কৃপা। প্রথম প্রথম প্রচার করতে গিয়ে দেখি, লোকে একমনে শোনে, আমায় আনুকূল্য করে। শেষে দেখি সকলে উদাসীন, আমার কথায় কিছু হবার নয়। বুঝলাম আমার শাস্ত্রজ্ঞান বক্তৃতার ক্ষমতা কিছুই নয়—ভগবৎকৃপায়ই সমস্ত। এমনিধারা পুরুষকারে আঘাত খেয়ে খেয়ে বুঝে নিয়েছি, আমি কিছুই নই, অসারের অসার। কর্মকর্তা ভগবান, সর্বনিয়ন্তা, ঐহিক পারত্রিক

বিধাতা। ভেবে চিন্তে ইচ্ছে করে নিজের জীবনই কি আমি গড়তে পেরেছি। টোলে পড়তাম, গোঁড়া হিন্দু ছিলাম, হঠাৎ সংস্কৃত কলেজে গেলাম। হয়ে উঠলাম ঘোর বৈদান্তিক। পরে গেলাম ব্রাহ্মসমাজে। প্রচারক হলাম। ডাক্তারি করলাম। তারপর ঘুরে ফিরে আবার এই অবস্থা। ভগবৎ-ইচ্ছাতেই সমস্ত সম্পন্ন হচ্ছে। এখন শুধু দেখছি শিশুর মতো অবস্থান। যদি যথার্থ শিশুর মতো থাকতে পারি তাহলে মা সর্বদাই দৃষ্টি রাখেন।'

ফরমাস দিয়ে প্রসাদী লাড্ডু আনা হয়েছে। সবাইকে দিয়েছ তো? জিগগেস করলেন প্রভু।

অনেককেই দিয়েছি। ভক্ত উত্তর করল। শুধু পাণ্ডাদের দিইনি। ওদেরকেও কি দেব?

প্রভু বললেন, 'সকলকেই দেবে। চাকর, মেথর, বানর, গরু কাউকে বাদ দেবে না। সকলকে দিলেই ভগবান পান।'

কাকে বাদ দেবে? বাদ দিলে যে ভগবানই বাদ পড়ে যাবেন।

মিউনিসিপ্যালিটি থেকে টিকাদার টিকে দিতে এসেছে, মেয়ে নারায়ণীর গায়ের জামা খুলে টিকাদার দেখছে টিকে দিবে কি না, তাইতে জগবন্ধু ভীষণ চটে গিয়ে টিকাদারকে গালাগাল দিতে শুরু করেছে। প্রভু বললেন, 'একটু হলেই যদি উত্তেজিত হতে হয় তবে আর কী হল। রাগের অবস্থায় স্থির ভাবে কাজ করাই মহত্ত্ব। স্বাভাবিক অবস্থায় স্থির হয়ে কাজ করার মধ্যে বাহাদুরি কী।'

পরে আরো বললেন, 'যদি শান্তি পেতে চাও সকলকে মিষ্টবাক্য বলবে। কাউকে নিন্দা করবে না।'

শ্রীধর বললে, 'ঠাকুর আমাকে কী সুন্দর বলেছিলেন, যেখানে যাবি এমন বাক্য বলি' যেন প্রাণ শীতল হয়ে যায়।'

'আমি দিই তা কে বলে?' বললেন প্রভু, 'সমস্ত জগন্নাথদেবই দেন। তিনি ভিতরে ইচ্ছা না দিলে কেই বা দিতে পারে? কে দাতা কে গ্রহীতা কারই বা এই দানযজ্ঞ?'

'সেই এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে চিত্ত সমাধান কর রে।
আদি সত্য তিনি কারণ-করণ প্রাণরূপে ব্যক্ত চরাচরে।
জীবন্ত জ্যোতির্ময় সকলের আশ্রয়
দেখে সেই, যে জন বিশ্বাস করে।
জ্ঞান প্রেম পুণ্যে ভূষিত নানাগুণে যাঁহার চিন্তনে সন্তাপ হরে।
চির ক্ষমাশীল কল্যাণদাতা নিকটসহায় দুঃখসাগরে।
তাঁর মুখ দেখি সবে হও হে সুখী তৃষিত মনপ্রাণ যাঁর তরে।
ভজন সাধন তাঁর কর রে নিরন্তর চিরভিখারী হয়ে তাঁর দ্বারে।।'

গোস্বামী-প্রভু বিরচিত আশাবতীর উপাখ্যানে আবার একটু ফিরে যাওয়া যাক।

আশাবতী বললে, এ বনপথে একা যেতে আমার সাহস হয় না।

যোগীবর উত্তর করলেন : কেন মা, মানুষ কি কখনো একা থাকে? যিনি বিশ্বনাথ তিনিই তো সঙ্গে আছেন।

আশাবতী বললে, এ কথা সত্য, কিন্তু যতদিন আমি তাঁকে সর্বস্থানে না দেখি ততদিন মুখের কথায় বইয়ের লেখায় সাহস হয় না। একটি পাঁচ বছরের বালক সঙ্গে থাকলে মনে বল থাকে। পরমেশ্বরকে সর্বব্যাপী বলছি অথচ অন্ধকারে ঐ গাছতলায় যেতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। একটা আলো সঙ্গে থাকলে ভয় যায়। জ্যোতির ঘরের মধ্যে আছি, তবু ভয়। অতএব পরমেশ্বর কাছে আছেন মুখে বলা না-বলা সমান।

মা আশাবতী, তুমি যা বললে তা ঠিক। যোগীবর সমর্থন করলেন : ঈশ্বরের দৃঢ় বিশ্বাস লাভ না করে যারা ধর্ম-ধর্ম বলে আন্দোলন করে বেড়ায়, তাদের দৃষ্টান্তেই জগতে নাস্তিকতা বেড়ে যাচ্ছে। যারা মুখে পরমেশ্বর বলে অথচ আচরণে নাস্তিকতা দেখায় তারা ভণ্ড ছাড়া আর কী!

উত্তর আশাবতীর মনঃপূত হল না। বললে, কথার সঙ্গে আচরণ না মিললেই যে ভণ্ড হল তা নয়। যে লোক চেষ্টা করেও কথা ও কাজ এক করতে পারছে না, কিন্তু যত্ন করছে তাকে ভণ্ড বলি কী করে? যে জেনে-শুনে কপট ব্যবহার করে সেই ভণ্ড, সেই চোর, তার দ্বারা সকল পাপই সম্ভব।

যোগীবর প্রসন্ন হয়ে বললে, হ্যাঁ মা, এটাই যথার্থ কথা।

দুজনে মাতাজির আশ্রমে এসে উপস্থিত হল।

মায়ের চরণ ধারণ করে আশাবতী বললে, মা আজ আমার সুপ্রভাত, জন্ম সার্থক। অনেক দিনের আশা পূর্ণ হল, মা।

মাতাজি বললেন, কেন মা, এত দৈন্য কেন? ভক্তিভরে ভগবানের নাম করো, কোনো কিছুর অভাব থাকবে না। যতদিন ভগবৎপদারবিন্দসুধাস্বাদ না হয় ততদিন বিষয়তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না। আর বিষয়তৃষ্ণার নিবৃত্তি না হলে সুখ দুঃখ রোগ শোকের হাত থেকেও নিস্তার নেই।

উপায় কী?

ভগবৎলাভ। জানো তো অনন্তেই সুখ, অল্পে সুখ নেই। পরমেশ্বরই অনন্ত আর সমস্ত কিছুই অল্প। সেই অনন্তকে না পেলে আশার বিরাম হবে কেন? দেখ না, শৈশব হতে আমরা বড় জিনিসই ভালোবাসি। কেবল যে বড় ভালোবাসি তাই নয়, বড়কে ভালোবাসি। সুন্দরকে ভালোবাসি, মঙ্গলকে ভালোবাসি, পুরাতনকে ভালোবাসি, ভালোবাসাকে ভালোবাসি। এ সকল বস্তু পাই না বলেই আশা মেটে না, ছুটোছুটি করতেই প্রাণ যায়।

যোগীবর বললেন, শাস্ত্রও সেই কথাই বলছে। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ, ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে। পরাৎপর পরমেশ্বরকে দর্শন করলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সমস্ত সংশয় দূরে যায়, কর্মফলের ক্ষয় ঘটে।

আহা, কী অপরূপ! শুনলেও প্রাণে আশা আসে। ঈশ্বরকে না দেখা পর্যন্ত প্রাণ সুস্থ হয় না। মাতাজি আশাবতীর দিকে তাকালেন : মা, তোমার নাম কী? তুমি কি বাঙালি?

আশাবতী বললে, এ দুঃখিনীর নাম আশাবতী। বঙ্গদেশেই আমার গৃহ ছিল।

তেরো শ পাঁচ সালের ফাল্গুনে, জগন্নাথের পদ্মবেশ। গত রাত একটা থেকে আজ সকাল দশটা পর্যন্ত শ্রীঅঙ্গে এই বেশ থাকবে। প্রভু সবাইকে নিয়ে চলেছেন জগন্নাথদর্শনে। পথে বড়ছাতার মহান্তের সঙ্গে দেখা। সে প্রভুকে এগিয়ে নিতে এসেছে। মন্দির আজ লোকে লোকারণ্য। তবু ভিড় সরিয়ে প্রভুকে মণিকোঠায় নিয়ে যাওয়া হল। প্রভু ভাবোন্মত্ত হয়ে উঠলেন, হরিধ্বনির পর হরিধ্বনি তুলে বেদীতে মাথা ঠেকিয়ে অজস্র প্রণাম করলেন। কোনোক্রমে একটু বাইরে এসে নাচতে লাগলেন ঘুরে ঘুরে, মুখে শুধু হরিজয়নাদ। জয় জগবন্ধু, জয় সংকর্ষণ, জয় মায়ী সুভদ্রা, জয় চক্রসুদর্শন—শুধুই জয় জয়। আর প্রণাম, পুনঃপুনঃ প্রণাম, মুহুর্মুহুঃ প্রণাম। সমস্ত পাণ্ডা সেবক দর্শক ভক্ত, আপামর সাধারণ সমস্ত জনগণকে প্রণাম।

মন্দির থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির নিচে মুক্তিমণ্ডপের সামনে বসে পড়লেন। ভিড় করে লোক আসতে লাগল প্রার্থনা নিয়ে। কল্পতরু ঠাকুর কাউকে ফেরালেন না। পাণ্ডারা পাঁচ শো টাকা চাইল। কপর্দক নেই, তবু প্রভু সম্মত হলেন।। ত্রিশ টাকার সিকি দু-আনি ভাঙিয়ে নিয়ে এল সরলনাথ, তাই বসে বসে বিলোলেন প্রভু। কোত্থেকে টাকা আসছে কে জানে। পরে কাউকে পাঁচ কাউকে দশ কাউকে পঁচাত্তর টাকা দিলেন। রাধাকুণ্ডবাসী বেণী ব্রজবাসী পঁচাত্তরের কম নিতে রাজি হল না।

ঠাকুর যোগজীবনকে জিগগেস করলেন, 'কি, পারবে দিতে?'

'তুমি ইচ্ছা করলেই হয়।' বললে যোগজীবন।

প্রসন্ন স্বরে ঠাকুর বললেন, 'তুই কিছু ভাবিসনে। অন্তরে সন্তোষ রাখলে যা চাইবি তাই হবে।'

মন্দির থেকে বেরিয়ে পথে যেতে-যেতেই বা কত দান। পট্টবস্ত্র, সাধারণ বস্ত্রই বা কত। যে যা চাচ্ছে তাই পাচ্ছে। শেষে বাকি পয়সা হাতে হাতে দিতে না পেরে পথের মধ্যে লুট দিয়ে দিলেন। যে যা পাও নাও কুড়িয়ে।

বাড়িতে ফিরে এসে সবাই জিগগেস করল এ ব্যাপারের অর্থ কী।

প্রভু বললেন, 'আজ দেখলাম জগন্নাথ গোবিন্দ হয়ে রাখালবালকদের সঙ্গে গোচারণ করছে। আবার কিছুক্ষণ পরে দেখলাম রাজেশ্বর হয়ে যে যা চাইছে তাই বিলোচ্ছে দুহাতে। আমাকে দেখে হেসে বললেন, আজ যে যা চাইবে যত পারিস দে। তাই নির্বিচারে তাঁর আদেশ পালন করলাম।'

কিন্তু শুধু একদিন নয় নিত্য চলতে লাগল এই দানলীলা।

জগন্নাথবল্লভ মঠের মহাবীরের কাছে মানসিক করেছিলেন প্রভু, সেই পুজো দেখতে গেলেন। বললেন, 'মহাবীরের কাছে যে দিন এই পুজো মানস করলাম তার পরের দিনই বানরবধ বন্ধ হল।'

মঠে এক পা-কাটা বাবাজি থাকেন তাকে রেশমি চাদর ও বস্ত্র দিলেন। পুজারিকেও তাই। ছড়িদাররাও বাদ পড়ল না। হাত পাতলেই টাকা, গামছা, বস্ত্র—যেন উৎসবের স্রোত চলেছে। দানের মতো আনন্দ আর কোথায়! ঋণ যে কে দেয়, কেন দেয়, কী করে এর পরিশোধ হবে, কে তার হিসেব রাখে, কে বা তা নিয়ে মাথা ঘামায়!

প্রভু বললেন, 'আমি কিছুই করি না। ভিতর থেকে স্পষ্ট হুকুম আসে। আমার কী সাধ্য কাউকে কিছু দিই!'

কে একজন বললে, 'গোঁসাইপ্রভু বড় নাম করলেন।'

প্রভু বললেন, 'নাম অতল জলে ডুবে যাক।'

গেন্ডারিয়া আশ্রমের দক্ষিণের ঘরটিতে সকাল-সন্ধ্যেয় অনেক ভক্ত শিষ্য এসে জমায়েত হয়, তাদের গোলমালে কুলদার সাধনের ব্যাঘাত ঘটে। তাই একদিন নালিশ করল প্রভুর কাছে।

প্রভু বললেন, 'এদিকে ওদিকে আশ্রমে তো স্থানের অভাব নেই, গাছতলায় বসেও তো নাম করতে পারো। নাম করা নিয়ে তো কথা, তা তো যেখানে-সেখানেই হতে পারে। দশটি লোক যেখানে মিলেমিশে আনন্দ করছে সেখানে তাদের বাধা দিয়ে নিজের সুবিধের চেষ্টা করতে নেই।'

কুলদা বাগ মানল না। বললে, 'যদি বলেন তো আশ্রমের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পুকুরধারে একখানা ছোট ঘর করে নিতে পারি।'

'তারপর?' ঠাকুর তাকালেন মুখের দিকে: 'কোথাও চলে যেতে হলে ঘরখানা উইল করে যাবে কার নামে!'

এক কথায় দমে গেল কুলদা।

শুনতে পেল প্রভু মহেন্দ্রকে বলছেন, 'ওর কৃপণতাদোষে ওর সাধন-ভজন মাটি হয়ে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে ও একশো টাকা জমিয়েছে, তা কোনো উপায়ে খরচ করিয়ে দিতে পারেন? কৃপণতাই সংকীর্ণতা। ধর্মার্থীদের স্বভাবে একটিমাত্র দোষ থাকলেই সমস্ত সাধন-ভজন পণ্ড হয়ে যেতে পারে। তাই এখন থেকেই সাবধান হওয়া ভালো।'

কুলদা শুনতে পেল সেই কথা। প্রভুর কাছে এসে বললে, 'কী করে আমার সংকীর্ণতা যাবে বলে দিন। আমি তাহলে হাতের টাকা কটা দান করে ফেলি।'

প্রভু হাসলেন। বললেন, 'এখন দান করবার প্রয়োজন কী? কোনো কাজই সাময়িক উত্তেজনায় করতে নেই। সমস্ত কাজই স্বাভাবিক অবস্থায় ধীরে সুস্থে করতে হয়। এখন থেকে আর সঞ্চয় কোরো না। তুমি যে পথে চলেছ তাতে সঞ্চয় নেই।'

আবার বললেন, 'ধনীদের মতো যথার্থ বন্ধুহীন লোক অতি বিরল। সকলেই টাকার জন্যে ভালোবাসছে, হাসছে, মুখের দিকে চেয়ে আছে। রোগে শুশ্রূষা করছে, তাও অর্থের জন্যে। কোনো স্বার্থ নেই, এমন কেউ ভালোবাসতে পারে, তবে সংসারে সেই সুখী। সে ভালোবাসাই ঈশ্বরকে ভালোবাসা। সে ভালোবাসাই সুখ। হরিনামই সব চেয়ে সহজ সুখ। নাম করতে করতেই অনুরাগ।'

কুঞ্জ গুহ সুস্থই আছে, প্রভু তাকে হঠাৎ বার্লি খেতে আদেশ করলেন। মহাপ্রসাদের বদলে বার্লি কেন বরাদ্দ হল কেউ নির্ণয় করতে পারল না। বোঝা গেল, দুদিন পরে যখন কুঞ্জর জ্বর হল। বিধু ঘোষ বললে 'এতক্ষণে বুঝলাম বার্লির মহিমা।'

কিন্তু জ্বরকে অগ্রাহ্য করল কুঞ্জ। জ্বর গায়েই নরেন্দ্র-সরোবরে স্নান করল। আর স্নান করেই পড়ল ভারি হাতে। জ্বর একেবারে একশো-পাঁচ। এবার আর বার্লিতে পোষাবে না। ডাক্তার ডাকো।

প্রভু বললেন, 'আমার ইচ্ছে তুমি কোনো ওষুধ না খাও।'

কুঞ্জ একবাক্যে স্বীকার হয়ে গেল। বললে, 'আমারও সেই ইচ্ছে।'

প্রভু শুধু পথ্যের ব্যবস্থা করলেন। সকালে 'পাকাল মহাপ্রসাদ', বিকেলে 'মহাপ্রসাদ,' আর রাতে প্রভুর প্রসাদী আম, ক্ষীর আর মিষ্টান্ন।

আশ্চর্য, তাতেই সেই প্রবল জ্বর প্রশমিত হল।

কিন্তু এমন অসতর্ক কুঞ্জ, আবার ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসল। বৃষ্টিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ভুলে গেল দরজা বন্ধ করতে। ফলে আবার সেই ভয়ংকর জ্বর।

কারা বলাবলি করলে। 'কুঞ্জ না বিনা চিকিৎসায় মারা যায়।'

'বেশ, তবে ডাক্তার ডাকো।' প্রভু সরে দাঁড়াতে চাইলেন।

ডাক্তারে কিন্তু কুঞ্জ রাজি নয়। সে বলতে লাগল, 'না, ডাক্তার লাগবে না। আমি প্রভুর দেওয়া পথ্যেই ভালো হয়ে উঠব।'

কিন্তু কথা যখন উঠেছে তখন বিনা চিকিৎসার অভিযোগ খণ্ডন করে দিতে হবে। প্রভু বললেন, 'না, ডাক্তার ডাকো। আবার বার্লি খাক।'

ডাক্তার বাণীকণ্ঠ ঘোষকে ডাকা হল। সে বসে দেখে-শুনে ওষুধ দিল। কিন্তু কই, রোগ ভালো হয় কই? এক ওষুধ বদলে আরেক ওষুধ দিল, কিন্তু যে জ্বর সেই জ্বর।

এক রাতে জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে পড়ল কুঞ্জ। ডাক্তারের কাছে না ছুটে সবাই ছুটল প্রভুর কাছে। বললে, 'কুঞ্জ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। বুঝি আর বাঁচানো গেল না।'

প্রভু শান্ত মুখে বললেন, 'চিন্তার কারণ নেই। কুঞ্জকে পাকাল খেতে দাও।'

অজ্ঞান কুঞ্জ পাকালের নাম করতেই চোখ মেলল। আর খাবি তো খা এক হাঁড়ি খেয়ে বসল। সবাই ভাবল এই কুঞ্জর শেষ খাওয়া। কিন্তু না, আস্তে আস্তে নামতে লাগল জ্বর। চলল আবার সেই পথ্যচিকিৎসা। পাকাল আর মহাপ্রসাদ আর সেই প্রসাদী আম-ক্ষীর। ক'দিনের মধ্যেই নিরাময় হয়ে গেল কুঞ্জ।

এই কুঞ্জেরই স্ত্রী কুসুমকুমারী। ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিয়ে একেবারে তদ্গতপ্রাণা। ইনিই লিখেছিলেন স্বামীকে, 'ঠাকুরের কাছে প্রদত্ত নাম ও ঠাকুর এক বস্তু। একটি নামে যে আনন্দ তার সহস্রাংশের এক অংশও স্বামী-স্ত্রী সংসর্গসুখে নেই।

কুসুম সন্ধ্যাকালে রান্নাঘরে গিয়েছে রান্না করতে। গিয়ে দেখল উনুনে আগুন নেই। হাঁড়িতে জল দিয়ে বসাল উনুনে, চাল ছেড়ে দিল। হাঁড়ির মুখ ঢাকল সরা দিয়ে। এক মুঠো খড় নিয়ে ল্যাম্পে ধরিয়ে উনুনে গুঁজে দিল। তারপর কাঠ গুঁজে দিতে ভুলে গেল। খড়ের আগুনে ইন্ধন না পেয়ে নিবে গেল আস্তে আস্তে। কুসুমের কিছু খেয়ালু নেই, সে নামানন্দে সমাধিস্থ।

হঠাৎ কুসুম দেখল প্রভু প্রকাশিত হয়েছেন। বলছেন, 'কুসুম, আজ তোমার ভাত অন্নপূর্ণা রাঁধলেন। তোমাকে আজ আর কষ্ট করে রান্না করতে হল না।'

সমাধিভঙ্গের পর কুসুম ভাতের হাঁড়ির সরা সরিয়ে দেখল দিব্যি ভাত হয়ে রয়েছে। ঝরঝরে ভাত, ফেনগালা।

বরিশালের উকিল গোরাচাঁদ দাস জিগগেস করল প্রভুকে, 'মশাই এ কি সত্যি? বিনা আগুনে রান্না?'

ঠাকুর হাসলেন: 'এ আর বেশী কথা কী! পঞ্চভূত তো পড়েই আছে, যে যখন যা সিদ্ধ করে। এ সত্য কথা বৈ কি। সত্য বলতে, এ কথাই সত্য। তোমরা এর মর্যাদা দিতে পারবে না, ভাবের প্রশংসার জন্যে কুঞ্জ আর তার স্ত্রী এ রটনা করছে। যুগযুগান্তর চক্রে

যাবে, পাহাড়ে অঙ্কিত রেখার মতো এ অনন্তকাল সত্য হয়ে থাকবে। ভগবানের অন্নপূর্ণাশক্তিই রান্না করেছেন।'

'চিন্তাময়ী তারা তুমি, আমার চিন্তা করেছ কি ?
নামে জগৎ-চিন্তাময়ী, ব্যাভারে কৈ তেমন দেখি !
প্রভাতে দাও বিষয়-চিন্তে, মধ্যাহ্নে দাও জঠর-চিন্তে,
ও মা, শয়নে দাও সর্বচিন্তে, বল মা তোরে কখন ডাকি ?
অচিন্ত্যরূপিণী মেয়ে, পরম চিন্তামণি পেয়ে
রয়েছ নিশ্চিন্ত হয়ে শম্ভুচাঁদকে দিয়ে ফাঁকি।'

সেদিন জগন্নাথদর্শন করে প্রভু অনেক স্তবস্তুতি করলেন 'তুমি দামোদর, তুমি কেশব, তুমি নৃসিংহ, তুমি বামন, তুমি রুদ্র, তুমি বাসুদেব। তুমি এক বিগ্রহ, চতুর্ধা বিভক্ত—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন আর অনিরুদ্ধ। নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।' অধীর হয়ে বলতে লাগলেন : 'হরিবোল হরিবোল।' পরে পরিপূর্ণ নেত্রে তাকালেন জগন্নাথের দিকে : 'দেখ জগন্নাথদেবের কী অপূর্ব শোভা, নিজের ছটায় নিজেই আলোকিত। তোমরা দীপ দাও কি না দাও, তাঁর কিছুই আসে যায় না। তিনি নিজের আলোয় নিজেই উজ্জ্বল হয়ে আছেন।'

মন্দিরের দীপ নিবু-নিবু হয়ে এসেছিল, পাণ্ডারা কী ভেবে সলতে বাড়িয়ে দিল। ঠাকুর গান ধরলেন

'জান না রে মন, পরম কারণ, শ্যামা তো শুধু মেয়ে নয়,
মেঘের বরণ করিয়া ধারণ কখন কখন পুরুষ হয়।
কভু বাঁধে ধড়া কভু বাঁধে চূড়া ময়ূরপুচ্ছ শোভিত তায়
কখন পার্বতী কখন শ্রীমতী কখন রামের জানকী হয়।
হয়ে এলোকেশী করে লয়ে অসি দনুজদলে করে সভয়,
ব্রজপুরে আসি করে লয়ে বাঁশি ব্রজবাসীর মন হরিয়ে লয়।'

বাড়িতে এক অথর্ব ও অসুস্থ সাধু এসে উপস্থিত। না দেখে শুধু শব্দ শুনেই প্রভু চিনলেন সাধুকে। বললেন, 'এক ঠোঙা চাল ও কিছু পয়সা দিয়ে দাও।'

চাল দেওয়া হল কিন্তু তবিলে পয়সা নেই একটাও।

সাধু বললে, 'পয়সা চাই না। একটি ঘটি দিন।'

ঠাকুর শুনতে পেয়ে বললেন, 'আমার ছোট ঘটিটি দিলে হয় না ?'

'না, সাধু নতুন ঘটি চায়। দিতে হলে কিনে এনেই দিতে হবে। কিন্তু ভাণ্ডার শূন্য।' বললে সারদাকান্ত।

'তাহলে যোগজীবনকে বলে সরলনাথকে বাজারে পাঠিয়ে দাও।' বললেন ঠাকুর, 'সরলনাথ ঠিক বাকি নিয়ে আসতে পারবে।'

'কিন্তু এত অর্থাভাব যে যোগজীবনকে বলতে ইচ্ছে হয় না।'

'এত ভাবনার কী দরকার !' ঠাকুর সরল স্বাচ্ছন্দ্যে বলে উঠলেন : 'সুযোগ এসেছে দান করে ফেল। সুসময় ছেড়ে দিলে আর মেলে না। দুর্যোধন ছেড়ে দিয়েছিল সুসময় যখন শ্রীকৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। আর সেই সুযোগ ফিরে এল না !'

সরলনাথকে সকলে বলে উদাসী সরলনাথ। পুরো নাম সরলনাথ গুহ ঠাকুরতা, বাড়ি বরিশাল, বানরিপাড়া। প্রথম যৌবনেই স্ত্রী আর সংসার ছেড়ে ঠাকুরে আশ্রয় নেয়, একে

নির্ভর করেই ঠাকুর পথ হাঁটেন। ঠাকুরের বস্ত্রযজ্ঞে সরলনাথই প্রধান পুরোহিত। গুরুভক্তিতে নির্বিচল, সরলনাথের সরল সাধন।

সরলনাথের কাঁধে হাত রেখে ঠাকুর পথ চলছেন, হঠাৎ কাউকে দেখে বলে উঠলেন, 'এ'কে কিছু দান করো।'

দান করবে সরলনাথের কাছে পয়সা কোথায় ? কিছু না দিলে গুরুবাক্য লঙ্ঘন হয় যে। সরলনাথ তখন রাস্তার ধারে মুদি-দোকানের কাছে হাজির হয়ে সরল মুখে বললে, 'দান করবার জন্যে ঠাকুর কিছু পয়সা চাচ্ছেন—'

অম্লান মুখে মুদি দিয়ে দিল পয়সা। তাই সরলনাথ এনে দিল প্রভুর হাতে। প্রভু তা প্রার্থীকে দান করলেন।

কোনোদিন প্রভু এমন জায়গায় এসে দানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যার কাছাকাছি কোনো দোকানদানি নেই। না, ঐ দেখা যাচ্ছে একটা পানের দোকান, সেখানে গিয়েই হাত পাতল সরলনাথ। সেই পানওয়ালাই দিয়ে দিল যথাসাধ্য। কেউ-কেউ আবার সাধ্যের অতীত করে দিল। কী যে ইন্দ্রজাল, ঠাকুর চাচ্ছেন শুনলেই যে যার হৃদয়ই শুধু খোলে না, ক্যাশবাক্সও খুলে দেয়। ধার করে দান। ঠাকুরের আবার কখন ইচ্ছে হবে ধার শোধ করবেন। সরলনাথকে বললেন, 'যাদের থেকে ধার এনেছ তাদের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে এস।'

সরলনাথ ফাঁপরে পড়ল : 'আমি কি সকলকে চিনি ?'

ঠাকুর বললেন, 'বাজারে বলতে বলতে যাবে কে আমার কাছে কত পাও নিয়ে যাও এসে। যে ধার দিয়েছে সে ঠিক নিয়ে যাবে দেখো।'

সত্যি, ঘোষণা করতে করতে পথ ধরে চলতে লাগল সরলনাথ। যারা নিজেদের উত্তমর্ণ মনে করছে, নিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রাপ্য টাকা। হিসেবে এতটুকুও ভুল করছে না।

মণ্ডমঠে ঠাকুর প্রায় ছ শো টাকার কাপড় বিলোলেন। যে সাতজন কনস্টেবল ও বারোজন ছড়িদার বিরাট লোকসংঘট্ট নিয়ন্ত্রণ করল তারাও ধুতি পেল। পরে সন্ধ্যায় কীর্তন শুরু হল। সে কীর্তনে এক সন্ন্যাসী এসে যোগ দিল। ঠাকুরের হাত ধরে নাচতে লাগল উত্তাল হয়ে। যাবার সময় বলে গেল, 'আমি লোকনাথে থাকি, সেখানে গেলে দেখতে পাবে আমাকে। কী, চিনতে পাচ্ছ না ? আমি শুধু দুধ খাই।'

লোকনাথে পৌঁছে ঠাকুর বললেন, 'সমস্ত পুরী আচ্ছন্ন করে লোকনাথ বিরাজ করছেন। আকাশ-পাতাল জ্যোতির্ময় হয়ে রয়েছে।' পরে আবার বললেন, 'লোকনাথ আর জগন্নাথ এক। কখনো জগন্নাথকে দেখবে শুভ্র, কখনো লোকনাথকে শ্যাম।'

সত্যি, সবাই দেখল, মন্দিরের মধ্যে সেই সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে। ঠাকুর বললেন, 'উনিই লোকনাথ।'

পাণ্ডারা একুশ টাকা চেয়ে বসল। ঠাকুর সরলনাথের মুখের দিকে তাকালেন। আছে ?

সরলনাথ বললে, 'পাঁচ টাকা আছে।'

'উপায় ?'

'দেখছি।' সরলনাথ তখুনি ছুটল।

দেখল সিংহদ্বারের অদূরে এক দোকান। দোকানী সম্পূর্ণ অচেনা, চেহারাটা অত্যন্ত রূঢ়। কী ভেবে তার কাছেই হাত পাতল সরলনাথ। ঠাকুর পাণ্ডাদের দেবেন বলে ষোলটা টাকা চেয়েছেন, যদি দয়া করেন—

কত ? ষোল টাকা ? লোকটা হঠাৎ কোমল হয়ে গেল। অকাতরে বাক্স খুলে দিয়ে দিল টাকা।

বাসায় সেদিন একটি কুমারী কন্যা উপস্থিত। আবদারের স্বরে ঠাকুরকে বললে, ‘সবাইকে এত বস্ত্র দিচ্ছ আমি বুঝি কেউ নই ?’

ঠাকুর সেই দুঃখিনী কন্যাকে এক পলকেই চিনতে পারলেন। বললেন, বিমলামায়ী।

যোগজীবনকে বললেন, ‘ত্রিশ-চল্লিশ টাকার মধ্যে একখানা শাড়ি কিনে দাও বিমলাদেবীকে। আর দু টাকার পুজো পাঠাও।’

পুরুষোত্তমের যত খাতির তত বুঝি বিমলাদেবীর নয়। অনেকে তো বিমলাদেবীকে দর্শনই করে না। বিমলাদেবীই যে অধিষ্ঠাত্রী দেবী সেই কথাই ভুলে থাকে।

আরেকবার দেখা দিয়েছিলেন পাগলিনী ভিখারিনির বেশে। সমুদ্র স্নান করে ফিরছেন দেখলেন চীরবাসা এক ভিখারিনি আলুলায়িত কুন্তলে ফিরছে পাগলিনীর মতো। প্রভু ব্যাকুল হয়ে বললেন, ‘যার যা আছে সমস্ত এই ভিখারিনিকে দিয়ে দাও। এমন সুযোগ আর না-ও পেতে পারো। পুরুষোত্তমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তোমাদের দর্শন দেবার জন্যে ভিখারিনির সাজে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছেন। দাও কী আছে।’

দেবার লুট পড়ে গেল। সতীশ তার ধোয়া কাপড়খানিই দিয়ে দিল।

ঠাকুর বললেন, ‘যে সব স্থলে ভগবদ্‌বুদ্ধিতে সহস্র সহস্র লোক শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করেন সে সব স্থলে গেলেই ভিতরের ধর্মভাব জাগ্রত হয়ে ওঠে। এটা কি কম কথা ?’

‘আচ্ছা, বিগ্রহ জাগ্রত, তার মানে কী ?’ কে একজন জিগগেস করল : ‘বিগ্রহ কি কথা বলে ? হাত-পা নাড়ে ?’

‘যাঁদের চোখ-কান আছে’, বললেন ঠাকুর, ‘তাঁরা বিগ্রহের হাত-পা নাড়াও দেখেন, কথা বলাও শোনেন।’

‘কিন্তু বৈরাগ্য কী ?’

‘বৈরাগ্য অর্থ ঈশ্বরে সাক্ষাৎ অনুরাগ। বৈরাগ্য অর্থ এই নয় যে কাজকর্ম ছেড়ে দিলাম, ভিক্ষে করে জীবিকা নির্বাহ করলাম। সমস্ত বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়সমূহ সম্পূর্ণ-রূপে নিবৃত্ত হলেই বৈরাগ্য। বিষয়ে অনাসক্ত হলেই বুঝবে বৈরাগ্য হয়েছে। মানুষের মরে যাওয়া আর বৈরাগ্য হওয়া এক বস্তু। মরে গেলে আর কি কেউ জিগগেস করে মরে গিয়েছি কিনা ? তেমনি বৈরাগ্য উপস্থিত হলে আর কি প্রশ্ন ওঠে, কী বৈরাগ্য !’

‘কিন্তু কর্ম ?’

‘কর্ম না করলে বৈরাগ্য হয় না। কর্ম যার যেটুকু আছে, আজ হোক কাল হোক, একদিন করতেই হবে। সেটি না করে কারু নিস্তার নেই। একমাত্র ভগবানের কৃপায় মুহূর্তমধ্যে সব শেষ হতে পারে। না হলে জোর করে কার সাধ্য কর্ম ছাড়ায় ! তবে কর্তৃত্ব যতদিন আছে ততদিন তাপ যায় না।’

‘তাপ কী ?’

‘ভগবৎ-দর্শনের অভাবই তাপ। ভিতরে অকর্তা ও বাইরে কাজ, অর্থাৎ অনাসক্ত কাজ—এই মহাপুরুষের লক্ষণ। কর্তৃত্বের অভিমান ত্যাগ করলেই তাপ যায়। যে মুক্ত-ভক্ত তারই আর তাপ নেই।’

রাস্তার এক অন্ধ বৈষ্ণবকে ঠাকুর সহসা আলিঙ্গন করে ধরলেন। কী ব্যাপার ? আমি যে ওর মধ্যে শঙ্খচক্রধারী বিষ্ণুমূর্তি দেখলাম। বাবাজির বাড়ি রায়বেরিলি। সেখান

থেকে পায়ে হেঁটে দ্বারকায় গিয়েছিলেন, সেখান থেকে রামেশ্বর। সেখান থেকে পুরী। মাধুর্যের প্রতিমূর্তি, সব সময়েই হাসিমুখ। কে এই অন্ধকে পথ দেখায় কাকে দেখে এই অন্ধের এত প্রসন্নতা! মানুষ তো নয় একটি দেবমন্দির।

ঠাকুর বললেন, 'এঁকে ধুতি, চাদর আর একটি ঘটি দাও।' পরে বললেন, 'এ স্থানের প্রতিটি ধূলিকণাই এক-একটি বিষ্ণু। জগন্নাথদেব মহাপ্রসাদ আর রজ, এ তিনই এক।'

আবার বললেন, 'মাথা উঁচু করে কখনো ধর্মলাভ হয় না। অভিমান বিষম জিনিস। জটা মালা তিলক গেরুয়া এসব বেশভূষা ধারণ করে যদি বিন্দুমাত্রও প্রতিষ্ঠার ভাব মনে আসে সেই মুহূর্তে তা ত্যাগ করবে। না করলে ওরাই সাপ হয়ে দংশন করবে। অন্যান্য অপরাধের পার আছে, ধর্মাভিমানের পার নেই। রসনাকে সংযত করবে। রসনা দু কাজ করে। খায় আর বকে। বাক্‌সংযম করবে। জিজ্ঞাসিত না হলে কথা বলবে না। জিজ্ঞাসিত হলেও অতি সংক্ষেপে সত্য উত্তরটি দেবে। জিহ্বা বশ করবার জন্যে ঋষিরা মৌনী হতেন। লোকের গুণানুবাদ, শাস্ত্রপাঠ, নামকীর্তনে জিহ্বা শুদ্ধ ও ভদ্র হয়। ভদ্র হতে-হতেই সংযত হয়ে আসে। আর লোভও কমে যায়। মুনি-ঋষিরা লোভ দমন করতে কী কঠোরই না করেছেন। অনাহারে, গলিত পত্রাহারে দিন কাটিয়েছেন। উপস্থ সংযত করা সোজা, কিন্তু জিহ্বা সংযত করাই কঠিন।'

কিন্তু কঠিনতম পথে না গেলে কোমলতমকে পাব কী করে?

৩১

গোঁসাইজি বললেন, দেবপ্রসাদ আসছে। ওর জন্যে পাশের ঘরখানা ঠিক করে রাখো।

স্বামী দেবপ্রসাদ। পূর্বাশ্রমের নাম দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বাড়ি চন্দননগর। আইন পরীক্ষা পাশ করলেও উকিল হয়নি। সন্ন্যাস নিয়েছে। বিদ্বৎ-সন্ন্যাস। স্ত্রী মারা যাবার পরই মন উঠে যায় সংসার থেকে। কিন্তু, না, একটি শিশু পুত্র রেখে গিয়েছে আর একটি টিয়ে পাখি, তাদের প্রতিপালন করতে হয়। ছেলে কোলে করে দুধের বাটি হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় দেবেন। খিদে মিটে গেলেও ছেলে কাঁদে, মা-মা করে। বুকে যত মমতা আছে, চোখে যত জাগরণ, স্বরে যত মধু, সমস্ত একত্র করে ছেলেকে ঘুম পাড়ায়। সেই ছেলেও চোখ বুজল। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল দেবেন, কিন্তু টিয়ে পাখিটাকে ভুলল না। কুম্ভমেলায় গিয়েছে সেখানেও সেই টিয়ে পাখি।

সবাই কটাক্ষ করল: এ আবার কোন মায়া।

প্রভু-অন্ত প্রাণ, আছেও তাঁর আশ্রয়ে। দেবপ্রসাদ নামও তাঁরই দেওয়া। তিনি বললেন, 'আশ্রিতকে ত্যাগ করবে কী করে? আশ্রিতকে রক্ষা করাই তো ধর্ম।'

পাখি বলে উঠল, 'শিব, শিব!'

কুতুবুড়ি পাখিকে খেতে দেয় আর পাখি তাকে নাম শোনায়। সাধুদের সঙ্গে থাকতে থাকতে পাখিও সাধু হয়ে উঠেছে।

একদিন কুতুবুড়ি বিস্ময়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল: শোনো শোনো পাখি কী বলছে?

কী বলছিস? সবাই ছুটে এল খাঁচার কাছে।

পাখি স্পষ্ট মানুষের গলায় বললে, 'কালী কল্পতরু, শিব জগৎগুরু, শিব শিব, শিবরাম।'

সেই পাখিও আর থাকল না। স্ত্রী আর ছেলের কিছু কাপড়চোপড় একটা পুঁটলিতে করে সঙ্গে-সঙ্গে রাখত স্বামীজি, এবার সেই পুঁটলিটাও উধাও হল। এখন শুধু কমণ্ডলু আর ডোরকোপীন। পুরীতে এসে এখন তার কাজ নীরবে দাঁড়িয়ে প্রভুকে দেখা আর অশ্রু বিসর্জন করা আর সন্ধ্যায় প্রভুর ডান পাশে ধ্যানাসনে শান্ত হয়ে বসে থাকা। উন্মেষ-নিমেষে দুই অবস্থাতেই প্রভুর মাঝে জগন্নাথকেই অবলোকন।

বানরবধের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় বচন কোথায় কী আছে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংকলন করে পাতি প্রস্তুত করার পাণ্ডিত্যও এই দেবপ্রসাদ।

কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্যে কী হবে যদি আসল বিদ্যা হরিভক্তি না থাকে? যদি না থাকে মহৎকুশলা বৈষ্ণবতা? দেবপ্রসাদ মহোত্তম বিদ্বান-বৈষ্ণব। এক কথায় বৈষ্ণবতম। কে বৈষ্ণবতম? যাকে দেখা মাত্রই হরিনাম শুধু মনে পড়ে না মুখে আসে সেই বৈষ্ণবতম। সেই দেবপ্রসাদকে মহোদধি টেনে নিল। স্নান করতে যে নামল আর উঠল না।

ক'দিন আগে থেকেই বলছিল, আমার এখানে থাকতে আর ইচ্ছে হচ্ছে না, কিন্তু কোথায় যে যাই তাও জানা নেই। এমন কেন হচ্ছে তা কে বলবে? নির্বাণ কি একেবারে নিবে যাওয়া, না, নিত্যের ঘরে জ্বলে ওঠা? রোজকার মতো সমুদ্রস্নান করতে এসেছে। তক্ষুনি-তক্ষুনি জলে না নেমে তীরে বসেছে স্থির হয়ে, চোখ বুজে। কেন এই তন্ময়তা তা কে বলবে?

সঙ্গে অশ্বিনী মিত্র ছিল, জিজ্ঞেস করলে, 'স্বামীজি, এভাবে রইলেন যে। স্নান করবেন না?'

'উঠে স্নান করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।' স্বামীজি বললে, 'অন্তরীক্ষে গান শুনছি। অনেক বাজনা বাজছে, যেন থিয়েটারের কনসার্ট বসেছে। যেমন তান লয় তেমনি মূর্ছনা।'

'আপনার বায়ু প্রবল হয়েছে। কাল সারারাত ঘুমোননি।' বললে অশ্বিনী, 'শুধু ভজন করেছেন। এ বিকার তারই ফল। চলুন স্নান করে নিলেই শরীর সুস্থ হবে। কানের মাঝে আর ঝিঁ-ঝিঁ ডাকবে না।'

'না হে, এ বিকার নয়, এ ঝিঁ-ঝিঁর ডাক নয়, এ এক অপার্থিব নৃত্যগীত।' স্বামীজি বললে বন্ধুর মতো 'আরো কিছুক্ষণ শুনতে দাও। বেশি দেরি নেই, নামছি স্নান করতে।'

নামবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রমত্ত জোয়ার এল আর ভাসিয়ে নিয়ে গেল স্বামীজিকে। ভাসিয়ে নিয়ে গেল চক্রতীর্থের দিকে, যে দিকে মহাপ্রভু ভেসেছিলেন। জল থেকে হাত তুলে স্বামীজি দেখাল, কোন এক অদৃশ্য হাত তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। শেষে তিন-তিনবার লাফ দিল ঢেউয়ের উপর, উচ্চারণ করল, জয়গুরু জয়গুরু জয়গুরু।

কুলদানন্দ ভেসেছিল সঙ্গে-সঙ্গে, সেই শুনল সেই গুরুধ্বনি।

কুলদানন্দ ভাসল অন্য পথে, হরিদাসের সমাধির দিকে। দেখল ঢেউয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে তলিয়ে গেল দেবপ্রসাদ।

স্বামীজি আর নেই—আশ্রমে খবর এসে পৌঁছুতেই ঠাকুর তিন-তিনবার শব্দ করে কেঁদে উঠলেন। বললেন, 'ভুতানন্দ স্বামীকে খবর দাও।'

জগন্নাথবল্লভ মঠের প্রাচীন মোহান্ত এই ভুতানন্দ। মহাপ্রভুকে স্বচক্ষে দেখেছেন বলে দাবি করেন। তা হলে তাঁর বয়েস দাঁড়ায় সাড়ে চারশো বছরেরও উপর। এই কল্পনাতীত দীর্ঘ জীবনেও তাঁর ব্রহ্মচর্যের ব্রতভঙ্গ হয়নি, মূর্তিমান অনলের মতো তেজস্বী ছিলেন। কিন্তু এমনি নিয়তির পরিহাস, নরহত্যার দায়ে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হলেন। হাইকোর্টের বিচারে শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেলেন বটে কিন্তু মোহান্তের পদ থেকে তাঁর বিচ্যুতি ঘটল। পড়লেন সম্মানহানির গ্লানিমার মধ্যে। গোস্বামী-প্রভু এসে তাঁকে তাঁর প্রাক্তন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। সবাইকে চেনালেন ভুতানন্দ কোন অভূতপূর্ব আনন্দের অধিকারী। বললেন, ওর সঙ্গ করব এই আশাও আমার পুরী আসার এক কারণ।

আর ভুতানন্দও চিনলেন এ কে দিব্যকলেবর! একদিন ঠাকুরের মুখোমুখি বসে স্থিরচক্ষে তাকিয়ে বলতে লাগলেন করজোড়ে: 'শ্রীসূর্য, শ্রীমহাদেব, শ্রীনারায়ণ, সাক্ষাৎ ভগবান।' বলেই বারবার নমস্কার করলেন।

ভুতানন্দ খবর পেয়ে বিধান দিলেন স্বামীজিকে সমাধি দিতে হবে। সন্ন্যাসীর তাতেই সদ্গতি।

বললেন, 'দেখলাম শ্রীমন্দিরে দেবপ্রসাদ জগন্নাথকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করছে। আপত্তি জানালাম। বললাম, আপনি সন্ন্যাসী, বিগ্রহকে সাষ্টাঙ্গ করবেন কেন? সাষ্টাঙ্গ করে আপনি অপরাধী হয়েছেন। এক কথায় দেবপ্রসাদ পরীক্ষায় পাশ হয়ে গেল। বললে, আপনারা উচ্চ অধিকারী, আমার তো ঐ অবস্থা হয়নি, কেবল পথে প্রবেশ করেছি মাত্র। আমাকে আপনারা শেখান, কৃপা করুন। ভক্তিমান সন্ন্যাসীর সে কী বিনয়, সে কী সর্বসমর্পণ।'

মঙ্গলাঘাটে স্বামীজিকে সমাধিস্থ করা হল।

অশ্বিনী জিগগেস করল, 'স্নানের আগে তীরে বসে স্বামীজি গান শুনেছিলেন বলেছিলেন—সেটা কী?'

ঠাকুর বললেন, 'শাস্ত্রে আছে যোগী সন্ন্যাসীদের প্রয়াণকালে স্বর্গের কিন্নরী অপ্সরী বিদ্যাধরীরা নৃত্যগীত করে আনন্দ-অভ্যর্থনার আয়োজন করে। ওসব গান শুনতে শুনতে যোগী সন্ন্যাসীরা অন্তর্ধান করেন। সন্দেহ কী, দেবপ্রসাদ মহাহংসের পরম পদ লাভ করেছে।'

যারা বানরবধের পাণ্ডা ছিল তারা স্বামীজির মৃত্যুতে উল্লাস প্রকাশ করল। প্রচার করে বেড়াল, বানর না মারতে দেওয়ার দরুনই দেবপ্রসাদের অপঘাত মৃত্যু হল।

ঠাকুর বললেন, 'পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সমুদ্র যাকে নিজে টেনে নিয়ে যায় তার আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না। তাঁর বাসনা কামনা সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল, সেইজন্যে কর্মও আর কিছু ছিল না। তাঁর নির্বাণ মুক্তিলাভ হয়েছে। তিনি ক্ষেত্রবাসী জগন্নাথের নিত্য সহচর হয়ে থাকলেন।'

'এই নির্বাণ অবস্থাই তাঁর অভিপ্রেত ছিল, বৌদ্ধ নির্বাণ।' যোগজীবন বললে।

'মহাপ্রভুকে যেদিকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল স্বামীজিকেও সমুদ্র সেই দিকে নিয়েছে, মহাপ্রভু সমাধিস্থ ছিলেন বলে তাঁর মৃত্যু হয়নি।'

'শেষ সময়ে স্বামীজি তিনবার জয়গুরু বলে লাফিয়ে উঠেছিলেন—' বললে কুলদা।

'তাই তো বলছি তিনি পরমগতি লাভ করেছেন।'

স্বামীজি কি-কি জিনিস রেখে গিয়েছেন ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসা হল। একখানি বইয়ের মধ্যে একটুকরো কাগজে একটা গান পাওয়া গেল—স্বামীজির হাতে লেখা। ঠাকুর নিজেই সুর সংযোগ করে গান করতে লাগলেন :

'কে দরদী ভাবের ভাবী, আপনার খেয়ে আমার হবে।
বিশুদ্ধ প্রেম সেই জেনেছে, নির্হেতু যে জন ভাবে।
যে ছেড়েছে সুখের আশা, তার নির্হেতু ভালোবাসা
নিস্পৃহতার নেইক আশা সেই আশাতেই বসে রবে।'

আর কী জিনিস আছে ?

ছোট একটি পুঁটলির মধ্যে একটি সিঁদুরের কৌটো।

'ওঁর স্ত্রীর বোধহয়।' বললে অশ্বিনী

ঠাকুর বললেন, 'আহা, বিশুদ্ধ প্রেমের এই লক্ষণ। স্বয়ং মহাদেবও সতীদেহ নিয়ে দেশে-দেশে ফিরেছিলেন। যাক, সব এখন সমুদ্রে ফেলে এস।'

কী ভেবে কে সিঁদুরের কৌটোটি খুলল। ও হরি, কৌটোর মধ্যে তিনখানি চিঠি। আর তিনখানিই ঠাকুরের লেখা।

প্রথম পত্রে ঠাকুর স্বামীজির তপস্যার কুশল প্রার্থনা করেছেন। লিখেছেন, যতদিন অর্থের প্রয়োজন আছে অর্থোপার্জন করবেন। কর্মদ্বারাই কর্ম কেটে যাবে। আর যেখানেই থাকুন না কেন, প্রাণের যোগে কিছুই দূরে নয়, সমস্ত নিকট।

দ্বিতীয় পত্রে সময়ের পরিপক্কতার বিষয় লিখেছেন। লিখেছেন, সকল বিষয়েই সময় আছে। সময় হলে ঘরে বসেই কাজ হবে। সময় না হলে সহস্র চেষ্টাতেও কিছু হবে না। তবুও চেষ্টা করতে হয়, আর তার নামই কর্মভোগ। কর্মভোগ না করলে শুভ সময় আসে না। সাধনে অগ্রসর হচ্ছেন এটাই প্রকৃত লাভ। যত আত্মহারা হয়ে নির্ভর করবেন ততই উন্নতি।

তৃতীয় পত্রে শুধু নিষ্ঠার কথা। লিখেছেন, নিষ্ঠা করে সাধন করলে নিশ্চয়ই ফললাভ হয়। ধর্ম আর তখন কথার ব্যাপার থাকে না। কোনো বিষয় অনুমান করে নিতে হয় না। সমস্তই প্রত্যক্ষ।

ঠাকুর বললেন, 'মোক্ষের চারটি দ্বার। প্রথম, শম ; দ্বিতীয়, বিচার , তৃতীয়, সন্তোষ , চতুর্থ, সৎসঙ্গ।

যাই ঘটুক না কেন, তাতে অধীর না হওয়ার নাম শম। সরলতাতেই এ লাভ হয়। সংসারে কোন বস্তু নিত্য আর কোন বস্তু অনিত্য তার তুলনা করাই বিচার। যেদিন যা ঘটে তাতেই খুশি থাকার নাম সন্তোষ। কারু মনে উদ্বেগ না আনা, কারু কাছে কিছু প্রত্যাশা না করা আর ভগবানই পালন-কর্তা এই বিশ্বাসই সন্তোষলাভের উপায়। সন্তোষই মোক্ষের শ্রেষ্ঠ দ্বার, সিংহদ্বার। সৎসঙ্গ অর্থ সাধুলাভ। যাকে দেখলে ভগবানের নামস্ফুরণ হয় সেই প্রকৃত সাধু।'

আবার বললেন, 'বাক্যসংযম করবে। কারু প্রতিবাদ করবে না। সত্যরক্ষা ও বীর্যধারণ করবে। পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি স্থির রাখবে। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করবে। আমার দুটো কথা শুধু ধরে থাকো, তাতেই সমস্ত লাভ হবে। বীর্যধারণ আর সত্যকথা। সত্য বলতে হলেই বাক্যসংযম হয় আর পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি হলেই বীর্য আপনা আপনি স্থির হয়ে আসে।'

স্বামীজির প্রয়াণে সবাই কাতর। যোগজীবন বললে, 'যেই একটা লোক তৈরি হচ্ছে ভগবান তাকে নিয়ে যাচ্ছেন।'

'বৃক্ষে ফল পাকলে পড়ে যাবেই।' বললেন ঠাকুর, 'ডকে জাহাজ তৈরি হলে আর কি তা থাকে? চলে যায়।'

আশাবতীও যোগীবরকে এই কথা জিগগেস করেছিল : 'সময় হয়নি বা সময় হয়েছে এ কথার তাৎপর্য কি?'

যোগীবর বললেন, 'কৃষকেরা শস্য রোপণ করে শস্য না পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করে। পাখি ডিম প্রসব করে তা দিতে থাকে। সময় না হলে ডিম ফোটায় না। অসময়ে ফোটালে ডিম কেঁচে যায়। তেমনি যার হৃদয়ে ধর্মের জন্যে আকুলতা হয়নি, অহঙ্কার নষ্ট হয়নি, তাকে ধর্মের উপদেশ দিলে তাতে উপকার না হয়ে অপকার হয়।'

ঠাকুর বললেন, 'পৈতে ফেলে দিলাম, তাতে অভিমান গেল না। আরো দ্বিগুণ বাড়ল। পৈতে ফেলে দিয়েছি তখন সেই অহংকার। বুঝলাম অভিমান সহজে যায় না। কাম ছাড়ব, ক্রোধ ছাড়ব, লোকে সাধু বলবে, এ অভিমান সকলের চেয়ে বড় শত্রু। বিদ্যার অহঙ্কারে বিদ্যার নাশ, পুত্রের অহংকারে পুত্রের নাশ, মানের অহংকারে মানের নাশ। আর ধনের অহংকারে ধনের সর্বনাশ। আবার যে নির্ধন তার ধনীকে ঘৃণা করার অহংকার, আর তাতে তারও সর্বনাশ। বাগানের কর্তা বাগানে এলে মালী যেমন দূরে গিয়ে দাঁড়ায়, তেমনি দীনবন্ধু হৃদয়-বাগানে এলে অহংকার মালী করজোড়ে দূরে গিয়ে অবস্থান করে।'

সেদিন সন্ধ্যের আগে আশ্রমদ্বারে এক ক্ষুধার্ত ভিখিরি এসে উপস্থিত, আর তার কী গগনভেদী কান্না : মায় ভুখা হুঁ, মায় ভুখা হুঁ।

আসলে ধ্যানস্থ ছিলেন প্রভু। কান্না শুনে চমকে উঠলেন। চেঁচিয়ে বললেন, 'কে কোথায় আছ, শিগগির এই ভিক্ষুককে অন্ন দাও।'

কী ব্যাপার, সেবক ভক্তের দল ছুটে এল। দেখল প্রভু কাঁদছেন, বলছেন, 'আজ সমস্ত দিন জগন্নাথদেবের ভোগ হয়নি, তাই তিনি ক্ষুধায় কাতর হয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছেন।'

কই, কোথায় ভিক্ষুক? তাছাড়া জগন্নাথ তো ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত, তাঁর আবার ভিক্ষে করে বেড়ানো কেন?

'তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত নন তা কে বলছে, কিন্তু যে সকল ভক্ত কাঙাল একমাত্র মহাপ্রসাদের উপর নির্ভর করে থাকে, তাদের ক্ষুধাই তাঁকে ক্লিষ্ট করছে। দেখ, যাও, খোঁজ নাও গে।'

ভক্তদল মন্দিরে গিয়ে খবর নিয়ে জানল পূজারী পাণ্ডাদের মধ্যে কলহ ঘটেছে, তার ফলে জগন্নাথের ভোগ হয়নি এতক্ষণ। জগন্নাথের নালিশ শুনে গোস্বামী-প্রভু চঞ্চল হয়ে ওঠবার পরেই পাণ্ডাদের ঝগড়া মিটেছে। জগন্নাথের ভোগ হয়েছে, প্রসাদ পেয়ে তৃপ্ত হয়েছে কাঙালিরা। আর সেই আর্তনাদী ভিক্ষুকও অন্তর্হিত।

ভক্ত সতীশ মুখুজ্জেও এখানে দেহ রাখল। বাড়ি ঢাকা বিক্রমপুরের বাঘড়া গ্রামে, ময়মনসিংহের জামালপুর হাই স্কুলের প্রধান সহকারী শিক্ষক। ঠাকুর যখন ব্রাহ্মসমাজে ছিলেন, দীক্ষা নিয়েছিল তাঁর কাছে। যখন শুনল ঠাকুর পুরী যাচ্ছেন, ইস্কুল থেকে বেরিয়ে সটান পায়ে হেঁটে চলে এল ময়মনসিং। পরনে কোট-প্যান্টালুন, মানে স্কুলের

পোশাক. ময়মনসিংহের সকলে তো অবাক। এ কী পাগলের মতো অবস্থা ! হ্যাঁ, তাই, পাগল হতে আর বাকি নেই। কেন, কী হয়েছে ? ঠাকুর পুরী চলেছেন। তা যান না যেখানে খুশী, তাতে তোমার কী। আমিও পুরী যাব। কলকাতার টিকিট কেটেছি। এই পোশাকে ? পোশাক দেখো না, প্রাণটাকে দেখ। স্কুলের চাকরি ? ঠাকুর জানেন। কলকাতায় এসে ঠাকুরের সঙ্গ ধরল। চলে এল পুরুষোত্তম।

সবাই পাগল বলে তাকে। জগন্নাথকে নারকেল-জল দান করেছে কিন্তু নারকেলটা সে খাবে। সে কি, জগন্নাথকে দান করবার পর খাওয়া চলবে না। কে বললে ? আমি তো জগন্নাথকে জল দিয়েছি, শাঁস দিইনি। জগন্নাথ তাতে ভাগ চান কোন হিসেবে ?

'সতীশ, কেমন আছ ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'গুরু যদি কৃপণ হন তবে আর আনন্দ কোথায় ?'

ঠাকুর হাসলেন। এই হাসিটুকুই চেয়েছিল সতীশ। এই হাসিটুকুতেই সমস্ত দিন আলোকিত রইল। সারাদিনই সতীশের আনন্দে কাটল।

মহাপ্রসাদে তার কী নিদারুণ শ্রদ্ধা ! বাসি হয়ে পোকা পড়ে পচে গেলেও তার কাছে তার সমান আদর। পোকা বেছেই খেতে লাগল তৃপ্ত মুখে, প্রতি গ্রাসে প্রণাম করে। বললে, 'মহাপ্রসাদে মন বড় প্রসন্ন হয়।'

ঠাকুর বললেন, 'সতীশকে মহাপ্রসাদ কৃপা করেছেন।'

সামান্য দুদিনের জ্বরে সতীশ দেহ ছাড়ল।

সংঘের এত প্রিয়, অথচ সতীশের মৃত্যুতে কারু শোক উপস্থিত হল না। মালিন্যের এতটুকু ছায়া নেই কোথাও। সবাই বিমূঢ়, পরস্পর বলাবলি করছে, আমাদের কান্না পাচ্ছে না কেন ? আমাদের সতীশ নেই, অথচ কান্না কী, তা আমরা ভুলে গেছি।

ঠাকুর বললেন, 'শাস্ত্রে আছে মৃত্যুর পর যার আত্মা সদ্গতি লাভ করে তার জন্যে কারু শোক হয় না।'

যখন সতীশের দেহ মন্ত্রপূত করে হোমাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হল, চিতাধূম থেকে সুগন্ধ উঠল। সবাই মোহিত হয়ে গেল। সাধারণ জ্বালানি কাঠের ধোঁয়ায় চন্দনের গন্ধ !

ঠাকুর বললেন, 'যাদের দেহ ভগবান স্পর্শ করেন তাদের দাহকালে দেহ থেকে অমনি দিব্যগন্ধ নির্গত হয়। কৃষ্ণ পুতনার দেহ স্পর্শ করেছিলেন, তাই তার দাহকালে 'চতুঃসমের' গন্ধ বেরিয়েছিল। সতীশ অপ্রাকৃত ভাগবতী তনু লাভ করেছে। বৃন্দাবনে রাসস্থলীতে তার পাকা বাসস্থান হল।'

ঠাকুরের জন্যে রেকাবে করে মহাপ্রসাদ নিয়ে যাচ্ছে, একটা লাড্ডু আর একখানা খাজা। লাড্ডুর মনে লাড্ডু রইল, খাজাখানা শূন্যে ছিটকে গিয়ে দুতিন হাত দূরে গিয়ে পড়ল।

এ কী ভৌতিক কাণ্ড ! গোল লাড্ডু এতটুকু নড়ল না আর চ্যাপ্টা খাজা উড়ে গেল শূন্যে !

'না, এ কারু অসাবধানতার জন্যে নয়, সতীশ শূন্য থেকে খাজায় থাবা মেরেছে।' বললেন ঠাকুর, 'ওর যে মহাপ্রসাদের জন্যে দারুণ বুভুক্ষা। এ মহাপ্রসাদের জন্যে শুধু সতীশ কেন, কত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব লালায়িত। শোনো, কাল সমুদ্রে গিয়ে ঐ খাজাখানা সতীশকে স্মরণ করে উৎসর্গ করে দিও।'

সতীশই সার্থক সন্ন্যাসী সার্থক সংসারত্যাগী। ঠাকুর বললেন, 'বাড়ি ঘর টাকাকড়ি বিষয়সম্পত্তি এ সকলকে সংসার বলে না। এ সকল ত্যাগ করলেই সন্ন্যাসী হয় না। দেহাত্মবুদ্ধিই সংসার। দেহাত্মবুদ্ধি নষ্ট না হলে সমস্ত বিড়ম্বনা। যতদিন মানুষের যথার্থ বৈরাগ্য না জন্মে ততদিনই কর্ম থেকে যায়। ভগবানকে লক্ষ্য রেখে কর্ম করে গেলে অচিরে সেই কর্মের অবসান হয়। সতীশের দেহাত্মবুদ্ধি ছিল না, সেই প্রকৃত বৈরাগী।'

অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে উৎসব করলেন ঠাকুর। মঠের বাবাজিরা এসে যোগ দিল। ঠাকুর উদ্দণ্ড নৃত্যে । হঠাৎ কোত্থেকে এক রুদ্রাক্ষধারী সন্ন্যাসী এসে ঠাকুরকে প্রণাম করে ঠাকুরের কোমর ধরে নাচতে লাগল। ঠাকুর যেন তার কতকালের অন্তরঙ্গ এমনি ভাবের সৃষ্টি করে সহসা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

'কে ইনি?' জিগগেস করল সরলনাথ: 'হাতে আবার ডমরু দেখলাম না?'

'হ্যাঁ', ঠাকুর বললেন, 'ইনি ভুবনেশ্বরের মহাদেব। কী খেয়াল, ঐ বেশে এসেছিলেন।'

সমুদ্রে সূর্যাস্ত দেখলেন ঠাকুর। বাসায় ফিরছেন একটি তেরো-চোদ্দ বছরের কালো ছেলে ঠাকুরের কাছে ধুতি-চাদর চেয়ে বসল।

ঠাকুর বললেন, 'আমার সঙ্গে বাসায় চলো দেখি কী করতে পারি।'

রাত হয়ে আসছে, এখন আবার কী ঝামেলা, যোগজীবন ছেলেটিকে বাধা দিল। বললে, 'কাল এস।'

'কাল?' ছেলেটি ক্ষুন্ন হল।

'হাঁ, কাল সকালে এস। রাত্রে সুবিধে হবে না। বাড়ি ফিরে যেতে তোমার কষ্ট হবে।'

ছেলেটি চলে গেল।

আশ্রমের দরজায় এসে ঠাকুর থমকে দাঁড়ালেন। সেই ছেলেটি কই?

'তাকে কাল আসতে বলে দিয়েছি।'

'সে কী, আমি তাকে আসতে বললাম আর তোমরা তাকে তাড়িয়ে দিলে?' ঠাকুর দৃঢ়স্বরে বললেন, 'যতক্ষণ ছেলেটিকে না আনবে ততক্ষণ আমি এখান থেকে নড়ব না।'

তখন সকলে ব্যস্ত হয়ে ছেলেটিকে খুঁজতে লাগল। ওরে দেখা দিয়ে আবার কোথায় পালালি? তোকে না পেলে যে ঠাকুর নড়বেন না, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবেন।

একটা চালার মধ্যে বেড়ার আড়ালে ছেলেটা লুকিয়ে আছে। ধর ধর। তাকে পাকড়াও করল সরলনাথ। একেবারে হাতে ধরে টেনে আশ্রমে নিয়ে এল।

ঠাকুরের আনন্দ আর ধরে না। ঠাকুর বালকের পা টিপে দিতে লাগলেন।

ধুতি আর চাদর দেওয়া হল। বালক উঠে দাঁড়িয়ে খুব তেজের সঙ্গে বললে, 'তোমাদের খুব পুণ্য হল।' বলে চলে গেল নিজের পথে।

বালকের মধ্যে ঠাকুর কী দেখলেন?

'দেখলাম বালকের মধ্যে জগন্নাথের মূর্তি। তোমরা যখন তাকে তাড়িয়ে দিলে দেখলাম মণিকোঠায় জগন্নাথ রুদ্র মূর্তি ধরেছেন। বজ্রমুষ্টি তুলে আমাকে প্রহার করতে উদ্যত হয়েছেন। ছেলেটিকে খুঁজে পেলে, নিয়ে এলে আমার কাছে, দেখলাম জগন্নাথের মুষ্টি শিথিল হয়েছে, ভঙ্গিতে এসেছে কোমলতা। আর এখন ধুতি-চাদর দেবার পর তিনি প্রসন্নমুখে কী সুমধুর হাসছেন!'

যেখানে সঙ্কোচ সেখানে ভগবান বাস করেন না, তিনি বৈকুণ্ঠে বাস করেন। বৈকুণ্ঠ মানে কী? মানে যেখানে কুণ্ঠা নেই, শুধু স্বচ্ছতা আর সরলতা। সম্মানের লোভত্যাগই প্রধান ত্যাগ। স্ত্রী-পুরুষ সকলের পদধূলি গ্রহণ করো, বিশ্বাস করো দেহের মধ্যেই সমস্ত আছে। পদধূলি নেওয়ার উদ্দেশ্য বিনয় দেখানো নয়, শরীরে অপূর্ব শক্তি সঞ্চারের জন্যে। পদধূলির অদ্ভুত মাহাত্ম্য।

আর দীনতা ভিতরের বস্তু। একবার হৃদয়ে এলে মন আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে। ঠাকুর বললেন, 'একবার একটি মুসলমান মুটের পা ধরে সাষ্টাঙ্গ করেছিলাম, সে বাপ বাপ বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল, বললে, যিনি রাম তিনিই রহিম, তিনিই কৃষ্ণ।'

বারে বারে চেষ্টা করে অকৃতকার্য হলে ভগবানের উপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে বসে বসে তাঁর নাম করো। নিজের কোনো ক্ষমতা নেই তা তো বুঝলে। তাঁর উপর নির্ভর না করে আর উপায় কী। মন খোলসা করে ফেলে, নিজের দুরবস্থা পরিষ্কার বুঝে সরলভাবে একবার তাঁর দিকে তাকিয়ে যদি বলতে পারো, আমি আর পারলাম না, আমাকে রক্ষা করো, তিনি ঠিক রক্ষা করবেন। ভগবৎকৃপার জন্যেও ব্যাকুলতার প্রয়োজন। ভগবান যেমন সতীকে রক্ষা করেন তেমনি কুলটাকেও পালন করেন। বেশ্যা উপবাসী থাকলে তাকে উপপতি এনে দেন। ভগবানের মতো বন্ধু আর কে আছে? একমাত্র ভগবানের কাছেই সরল হওয়া যায়। কোনো প্রকার সাধন ভজন না করে শুধু সরলতার প্রভাবেই মানুষ মুক্ত হতে পারে। সরল হৃদয়ই সর্বদা—সর্বক্ষণ সত্যবাদী। কপট হৃদয় সর্বদা অসত্য চর্বণ করে, অসত্য রোমন্থন করে। একমাত্র বন্ধুহীনতায়ই তার এই দুর্গতি।

করতালের ধ্বনির সঙ্গে সুর মিলিয়ে ঠাকুর বলছেন: 'বদরিকাধামবাসী সাধু-সজ্জনের চরণে নমস্কার। রামেশ্বরধামবাসী সাধু-সজ্জনের চরণে নমস্কার। দ্বারকাধামবাসী সাধু-সজ্জনের চরণে নমস্কার। শ্রীবৃন্দাবনধামবাসী সাধু-সজ্জনের চরণে নমস্কার। ইহকাল-বাসী নরকবাসী পাপী পুণ্যাত্মা সকলের চরণে নমস্কার। পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ স্থাবর জঙ্গম সকলের চরণে নমস্কার।'

যে এই স্তুতিপাঠ শুনছে সেই দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছে।

৪০

বিজয়কৃষ্ণ নামের অর্থ কী? ঠাকুর নিজেই বললেন, 'আমার নামের অর্থ ঘুরে বেড়ানো।'

কৃষ্ণের বিজয়। তার মানে কৃষ্ণের ঘুরে বেড়ানো।

ঠাকুর বললেন, 'এক ত্রিভঙ্গ আমার মধ্যে প্রবেশ করে আমাকে ত্রিভুবন ঘোরাচ্ছেন। বার হতে চেষ্টা করছেন, পারছেন না। এদিকে ওদিকে ঘুরে ঘুরে ঠেকে যাচ্ছেন, এঁকে-বেঁকে যাচ্ছেন—'

'আচ্ছা, যারা সাধন-ভজন করে, সত্যপথে চলে, ধার্মিক ও সদাশয়, সংসারে তাদেরই যত কষ্ট। আর যারা পাপ করে জাল-জোচ্চুরি করে, অন্যের সর্বনাশ করে, ধর্মের পাশ দিয়েও হাঁটেনা, তারা দিব্যি সুখে থাকে। এ কেন?' একজন জিগগেস করল ঠাকুরকে।

'এখন রাজা যে কলি। তাই ধর্ম করলে পুরস্কার নেই।' বললেন ঠাকুর, 'ধর্ম করলে যে রাজাকে অমান্য করলে, তাই শাস্তি অনিবার্য। বরং অধর্ম করো, রাজ-আজ্ঞা পালন করেছ বলে পুরস্কৃত হবে। কিন্তু তাই বলে মনে কোরো না, ভগবানের রাজ্য উঠে গিয়েছে। পাপের ভরা বোঝাই হলে ভগবান প্রথমত সাবধান করে দেবেন। তাতেও যদি পাপাচারীরা নিবৃত্ত না হয় ভগবান নানাপ্রকার শাস্তি পাঠাবেন—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী জলপ্লাবন, ভূমিকম্প, নানাবিচিত্র দুর্ঘটনা। কলির প্রজারা বিনষ্ট হবে। যারা দু পাতা ইংরিজি পড়েছে তারা হাসবে, এ আশ্চর্য নয়, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অধ্যাপকেরাও শাস্ত্রবাক্যে উপহাস করবে।'

আবো বললেন, 'এ দেশে আগে কখনো বড় দুর্ভিক্ষ হয়নি, এখন হবে, সহজেই হবে। এক রকম খাদ্য অভ্যস্ত হলেই দ্রুত দুর্ভিক্ষ হয়। তা কলিতে হবে, কারণ মানুষের পাপে অন্যান্য খাদ্য হ্রাস পাবে। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কমে যাবে, গরুও আগের মতো পর্যাপ্ত দুধ দেবে না। কৃষকেরা কৃষিকার্য ছেড়ে কলকারখানায় কাজ নেবে, কৃষি রসাতলে যাবে। দুর্ভিক্ষ না হয়ে গত্যন্তর কী! দুর্ভিক্ষের চেহারা ঠিক পিশাচের মতো—দেখলে মনে হয় যেন ভূত প্রেত পিশাচ দেশ ছেয়ে গেছে—শুধু কঙ্কালের মিছিল—'

'কলিতে তবে উপায় কী?' এক ভক্ত জিগগেস করল আকুল হয়ে।

'উপায় হরিনাম। কাতর হয়ে ভগবানকে ডাকা। কলিতে নামজপই একমাত্র উপায়—সমস্ত শাস্ত্রেরই এই একবাক্য। একমাত্র নামেই পাপ যাবে সংশয় যাবে. আসবে প্রেম ভক্তি পবিত্রতা। আসবে বিশ্বাস। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম-সাধনই যথার্থ সাধন।'

এমার মঠে দু হাজার ব্রাহ্মণকে বস্ত্র দেওয়া হল। তাছাড়া জগন্নাথদাস বাবাজির আশ্রমে চার-পাঁচ হাজার সাধু আসছে। বাবাজির ইচ্ছে সাধুসেবায় ঠাকুর পাঁচ-সাত হাজার টাকা দেন। কোত্থেকে দেবেন? ঠাকুরের যে আকাশবৃত্তি—ভাণ্ডার শূন্য। কী করে কী হবে! কিন্তু হতেই হবে। ঠাকুর বললেন, 'আমার এক কানাকড়ির ক্ষমতা নাই থাক, কিন্তু এ জগন্নাথদেবের আদেশ। সাধুসেবা অসম্পূর্ণ থাকবে না।'

পঞ্চায়েত মাধব সোয়ারকে ডাকা হল। ঠাকুর বললেন, 'চার-পাঁচ হাজার সাধুভোজন করাতে হবে। মহাপ্রসাদ, মালপো, ডাল, তরকারি, কানিকা—সব দিতে হবে। ত্রুটি করলে চলবে না। প্রায় তিন হাজার টাকার মতো খরচ। তুমি আমার মুখ রাখলে এই তোমাকে অনুরোধ।'

জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, উচ্চারণ করতে লাগলেন ঠাকুর। যদিও মাধবের কাছে আগের দরুন দেড় হাজার টাকার ধার, মাধব রাজি হয়ে গেল।

শুধু তো ভোজন নয়, সাধুদের বস্ত্র দিতে হবে, ঘটি দিতে হবে। ঘটিওয়ালা চার-পাঁচ শো ঘটি দিতে রাজি হয়েছে, কিন্তু কাপড়ওয়ালার দোকানে সাত হাজার টাকারও বেশি বাকি। আর বাকি ফেলা অসম্ভব, দোকান ফেল পড়বে। কাপড়ওয়ালারা দু ভাই, হরি আর দীনবন্ধু। হরির ইচ্ছে নয় ধার দেয়। কিন্তু দীনবন্ধুর বিশ্বাস গোঁসাইয়ের টাকা মারা যাবে না।

'কোত্থেকে দেবে? ওর কি জমিদারি আছে?' হরি রুখে ওঠে।

'গোঁসাইকে দেখে আমার মনে হয় মহাপুরুষ।' দীনবন্ধু বলে গাঢ়স্বরে, 'তাঁর ধার বলে কিছু থাকতে পারে না।'

দুই ভাইয়ে ঝগড়া হয়ে হরির দোকান ছেড়ে দেশে চলে গেল। দীনবন্ধু বললে, 'যদি কিছু অন্তত দিতে পারতেন!'

ন্যায্য কথা। ঠাকুর বললেন সখলনাথকে, ঢাকায় জায়গায়-জায়গায় টেলিগ্রাম করে দাও। যে যা পারে পাঠাক।

ঘাটওয়ালাও বেঁকে বসল : 'আমারও অগ্রিম কিছু দরকার।'

কিন্তু মাধব সোয়ার নির্বিচল। একবার রাজি হয়েছি তো হয়েছি, আর পেছপা হব না। যদি আমার কোঠাবাড়ি বিক্রিও করতে হয়, সাধুসেবা ঠিক প্রসাদ জোগাব।

জগন্নাথ বাবাজিও কম যায় না। নতুন ভাবে চাপ দিতে চাইল। চার সম্প্রদায়ের সাধু আসছে, এদের উট আর ঘোড়াই চার শো হবে, তাদের খোরাকি বাবদ টাকা চাই, গাঁজা-আফিংএও খরচ কম পড়বে না। তার পর সাধুদের মর্যাদা দিতে হবে, ভেট দিতে হবে নিশানের। মোটমাট আরো দু হাজার টাকা দরকার।

ঠাকুর আদেশ করলেন : 'কলকাতায়ও টাকা চেয়ে টেলিগ্রাম করো।'

যোগজীবন কুণ্ঠিত হয়ে বললে, 'টাকা চাওয়া নিয়ে নানাজনে নানা কটাক্ষ করবে।'

'করুক। তাতে আমার মান-অপমান কী।' ঠাকুর স্নিগ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'এ জগন্নাথদেবের আদেশমত কাজ করছি। যারা বিশ্বাস করবে না, দেবেনা। কিন্তু পৃথিবীতে এমন একজন থাকতে পারে যে বিশ্বাস করবে।'

আগামী কাল 'পঙ্গত' বা সাধুসেবা, কিন্তু এ পর্যন্ত হাতে এসেছে মোটে একশো টাকা।

উপায় নেই, ঐ একশো টাকাই বাবাজিকে দিয়ে এস।

একশো টাকা দেখে বাবাজি খেপে গেল : 'শুধু গাঁজাতেই তো তিন-চারশো টাকা লেগে যাবে। নেমন্তন্ন করে এনে সাধুদের অমর্যাদা করবার হেতু কী? অন্তত এক হাজার টাকা দিন।'

ঠাকুর বলে পাঠালেন : 'শুধু এই একশো টাকাই হাতে এসেছে, হাজার টাকা দেব কোত্থেকে? ভগবান যা জুটিয়েছেন তাই দিয়েই নির্বাহ করা হোক।'

'তবে পঙ্গত বন্ধ করে দি।' বাবাজি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।

ঠাকুর চুপ করে রইলেন। সাধুদের কাছে খবর নিয়ে জানা গেল এখনো তাদের নিমন্ত্রণ হয়নি। কার নিমন্ত্রণ? গোঁসাইয়ের? গোঁসাইয়ের নেমন্তন্নে আমরা অমনি যাব। মর্যাদা লাগবে না। বলে কিনা তিন-চারশো টাকার গাঁজা! বাবাজির মতলব কী। কোঠাবাড়ি তৈরি করবে বোধহয়।

যথাদিনে 'পঙ্গত' বসল। আসতে লাগল ধুতি, আসতে লাগল ঘটি। যত চাও তত নাও, তারপর বিলোও সাধুদের। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব নিয়ে সাধুদের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। প্রত্যেকে একখানা করে ধুতি আর একটা করে ঘটি পেল। কেউ কেউ ছল করে দু-তিনবার করে নিল। আর মাধব সোয়ার যে ভোজ বসাল বিরাটত্বে যা দ্বিতীয়রহিত এমনটি কেউ কখনো দেখেনি, শোনেনি। পুরুষোত্তমের ইচ্ছা পুরুষোত্তমই পূরণ করেছেন।

প্রসাদ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এক মুটে এক ভাঁড় কানিকা বা মিষ্ট পোলাও চুরি করলে। চুরি করে পার পাবে কোথায়, ঠাকুর ঠিক শুনতে পেলেন। লোকটাকে ঠাকুরের কাছে ধরে নিয়ে এল তো। প্রসাদ চুরি করে! পুলিশে দিয়ে দেওয়া উচিত। ঠাকুর অন্তত তীব্র ভর্ৎসনাও তো করতে পারতেন। কী করলেন ঠাকুর?

বললেন, 'আহা, প্রসাদ তো বিতরণ করবার জন্যেই আনা হয়েছে। তুমিও তো এ প্রসাদ খাবার জন্যেই নিয়েছ। কিন্তু এক ভাঁড়ে কী হবে? আরো চার ভাঁড় নাও, নইলে ঘরে গিয়ে দশজনে মিলে আনন্দ করে খাবে কী করে? দাও ওকে আরো চার ভাঁড় দিয়ে দাও।'

ঠাকুরের এ ব্যবস্থায় সকলে হতবাক হয়ে গেল। পরে বুঝল ঠাকুরের করুণার তাৎপর্য। দোষের মধ্যেও গুণদর্শন। চুরি দোষ, কিন্তু নিচ্ছে তো পরিজনকে খাওয়াবার জন্যে।

পরনিন্দা কাকে বলে? একজনের দোষ উচ্চারণ করাই পরনিন্দা নয়। বাপ ছেলের দোষের কথা বলে, সংশোধনের জন্যে—সেটা পরনিন্দা নয়। যখন লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার উদ্দেশ্যে অন্যের কাছে কারুর সম্পর্কে দুর্বাক্য বলা হয় তখনই তা পরনিন্দা। পরনিন্দা মহাপাপ। হত্যা করার চেয়েও গুরুতর পাপ। হত্যায় মৃত্যু শুধু একবার কিন্তু যতবার পরনিন্দা ততবার নিন্দিতের মৃত্যুযন্ত্রণা। পরনিন্দুকের মতো কুসংগী আর হতে নেই। পরনিন্দুকের হৃদয় এত অন্ধকার যে ভগবানও সেখানে তিষ্ঠোতে পারেন না। তাই যেখানে পরনিন্দা হয় সেখানে থাকতে নেই। অন্যান্য পাপীর সহজে মুক্তি আছে কিন্তু পরনিন্দুকের নেই।

আরো শোনো। যার নিন্দা করা যায় তার পাপ নিন্দুকে সংক্রামিত হয়। নিন্দিতের মুক্তি হয় কিন্তু নিন্দুকের নয়।

এক রাজা কুষ্ঠাক্রান্ত হয়ে বনে গেল। বনে না গিয়ে তার উপায় ছিলনা, ভয়ে ও ঘৃণায় কেউ তার কাছে আসে না, সেবা করে না, রাজা বলেও তার কোনো মান নেই আদব নেই, সবাই মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। আর এ ব্যাধি তো শিবেরও অসাধ্য। সুতরাং অন্ধকারে পরিপূর্ণ রাজা বনে গেল আত্মহত্যা করতে। বনে গিয়ে এক সাধুর দেখা পেল। সাধু বললে, আমি ছ মাসের মধ্যে তোমার ব্যাধি সারিয়ে দেব, যদি অবিচারে আমার কথা-শোনো। কী এমন কথা, রাজা স্তম্ভিত হয়ে রইল। এমন কিছু দুঃসাধ্য নয়, আশ্বাস দিল সাধু। তোমার এক সুন্দরী যুবতী বিধবা মেয়ে আছে না? সেও পরিত্যক্ত, তাকে নিয়ে এস। একটি কুটির নির্মাণ করে তোমরা পিতা-পুত্রী থাকো আর মেয়েকে বলো তোমার অবিচ্ছিন্ন সেবা করতে। আমি জানি পিতৃসেবা করতে তোমার মেয়ে কুণ্ঠিত হবে না।

তাই হল। বাপ কুটির বাঁধল আর মেয়ে লাগল তার পরিচর্যায়। ব্যস, আর কথা নেই। দিকে-দিকে রাজার নামে নিন্দা প্রচারিত হতে লাগল, কানে শোনা যায় না জঘন্যতম নিন্দা। কানে শোনা যায় না অথচ মুখে বেশ বলা যায়, নিন্দা ক্রমেই বিস্তৃততর বিপুলতর হতে লাগল। আর কথা নেই, ক্রমে-ক্রমে আরোগ্য হতে লাগল রাজার। ছ মাসের মধ্যে ব্যাধির একেবারে মূলোচ্ছেদ। সমস্ত শরীর স্নিগ্ধ মসৃণ পরিচ্ছন্ন। ক্ষত নেই স্ফীতি নেই, নেই কর্কশতা।

কী করে ঘটল এই অঘটন? রাজা সাধুর পায়ে গিয়ে পড়ল। ওষুধ-বিষুধ দিলেন না, একটা ফুল-পাতা পর্যন্ত না, কী করে ব্যাধির মোচন হল?

সাধু বললে, 'নিন্দা দ্বারা নিন্দুকেরা তোমার পাপ গ্রহণ করেছে। যে পাপে তোমার ব্যাধি, নিন্দুকেরা তা গ্রহণ করাতে তুমি ব্যাধিমুক্ত হয়েছ।'

এত দিয়ে-থুয়েও প্রায় দু হাজার বস্ত্র ও একশো ঘটি উদ্বৃত্ত হল। ঠাকুর সে সমস্ত বড় আখড়ার মোহন্তকে সঁপে দিলেন, বললেন, আপনার ইচ্ছেমত দান করবেন।

কিন্তু বাজার-ধার শোধ হবে কী করে? বাজারে-ধারের পরিমাণ প্রায় কুঁড়ি হাজার টাকা।

'এত ধার গোঁসাই শোধ করবে কী করে?' হাটে-বাজারে সবাই বলাবলি করতে লাগল : 'কোনো উপায়ই তো দেখি না। শেষে একদিন অন্ধকারে গা-ঢাকা দেবে।'

দেখ না কী হয়! এক ধার করে আরেক ধারের নিরাকরণ। শেষে উত্তাল দানসাগরে সমস্ত ধারক্ষয়।

জগন্নাথই তাঁর ঠুঁটো হাত অবাধে প্রসারিত করে দেন। যাঁর ধন তাঁরই ঋণ। যাঁর হরণ তাঁরই আবার পরিপূরণ।

কুঞ্জলাল নাগ টাকা পাঠাল। পাঠাল উমাচরণ। পাঠাল সতীশ মুখুজ্জে। আরো কত শিষ্য-ভক্ত। কুঞ্জলাল নিজেই ঋণগ্রস্ত তবু প্রভুর জন্যে আরো ঋণ করতে পরাঙ্মুখ হলনা। যিনি নেবেন তিনিই আবার দেবেন অঢেল করে। উমাচরণ লিখল, আমি দীনহীন, তবু ঠাকুর আমার অর্থ দিয়ে সাধুসেবা করবেন এই আমার পরম সৌভাগ্য। আর সতীশ মুখুজ্জে, বিখ্যাত 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক, ঠাকুরের জন্যে তার বইয়ের কপিরাইট বেচে দিল। এ তো শুধু দানসাগর নয়, প্রাণসাগর। শুধু সম্ভ্রান্তের দলই নয়, অখ্যাত সাধারণ লোকও নিয়ে এল সাধ্যমত। ভূতনাথ গোয়ালা, গোষ্ঠ কেরানি, বেকার জ্ঞানেন্দ্র হাজরা।

ঠাকুর বললেন, 'ভগবান যে খেলা খেলছেন বসে-বসে তাই নিরীক্ষণ করো।'

যোগজীবন মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে ওঠে, কিন্তু ঠাকুরের নির্মল নিশ্চিন্ততা। শুধু বলেন, 'ভগবানের যা ইচ্ছে তাই হবে। ব্যস্ত হও কেন?'

ঠাকুরের এই প্রশান্তি দেখে সকলে আশ্বস্ত হয়। প্রাণ শীতল হয়ে যায়। কারু অবিশ্বাস করতে সাহস হয় না। দেখতে-দেখতে সব ধার শোধ হয়ে গেল। তখন আবার কেউ-কেউ শোক করতে লাগল, আমার কাছে ঠাকুর কিছু চাইলেন না কেন? আমার কেন দানে সুমতি হলনা? পরসেবায়, নরসেবায়, নারায়ণসেবায় লাগল না, আমার বিষয়-সম্পত্তি দিয়ে কী হবে?

সবাই দেখল, সদগুরুর বাক্য জগদগুরুর বাক্য কখনো অন্যথা হয় না।

> উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্‌বিভাগে।
> বিকশিত যদি পদ্মঃ পর্বতানাং শিখাগ্রে॥
> প্রচলিত যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নিঃ।
> ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ॥

পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় হতে পারে, পর্বতশৃঙ্গে ফুটতে পারে পদ্মফুল, মেরু স্খলিত হতে পারে, আগুন হতে পারে সুশীতল, কিন্তু সজ্জন বা ভগবজ্জনের বাক্যের ব্যতিক্রম হয় না। এমন দয়ালু আর নেই, এমন দাতা আর হবে না, সাক্ষাৎ মহাদেবের মতো এমন শোভন মূর্তি আর দেখিনি, সকলের মুখে এখন শুধু এই কথা। ঠাকুর শুধু সুন্দর নন, সবাই বলছে, ঠাকুর ভুবন-সুন্দর।

মাধোদাস বাবাজির শিষ্য নারায়ণ দাস বাবাজি এসেছে। ঠাকুর সম্পর্কে বলছে, উনি ভগবানের স্বরূপ। তোমাদের সকলকে উনি পরিত্রাণ করবেন। উনিই পারায়ণ-পরায়ণ। ওঁকে নমস্কার করো সকলে।

এক শিষ্য ঠাকুরের আসনের সামনে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করল। ঠাকুর চমকে উঠলেন।

বললেন, 'এ কি ? সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়লেই নমস্কার হল ? শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে না করলে নমস্কার কোরো না, ওতে ক্ষতি হয়। নমস্কার যদি ভাবের সঙ্গে করো, তাহলে যে করে ও যাকে করে দুয়েরই উপকার। ভাব-ভক্তি না থাকলে দুয়েরই অনিষ্ট।'

ঠাকুর মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্যকীর্তনে পঞ্চমুখ—মহাপ্রসাদ ছাড়া আর কিছু তিনি খান না, কেউ মহাপ্রসাদ এনে দিলেও তা প্রত্যাখ্যান করেন না। বলেন, 'যেমন নাম ও নামী, ভক্ত ও ভগবান একই বস্তু তেমনি জগন্নাথদেব আর মহাপ্রসাদও অভেদ। জগন্নাথদর্শনে যে ফল মহাপ্রসাদভোজনেও তাই।'

'তবে মহাপ্রসাদ খাওয়ামাত্রই ফল পাওয়া যায় না কেন ?' একজন সন্দিগ্ধ সুরে জিগগেস করলে।

'ভোক্তার শরীর-মন যে অশুদ্ধ থাকে।' বললেন ঠাকুর, 'বিমল দর্পণে কি ছায়া পড়ে ? তবে দীর্ঘকাল মহাপ্রসাদ পেয়ে-পেয়ে শরীর-মন শুদ্ধ হয়ে উঠলেই পরম ফল লাভ হয়।'

এই যে মহাপ্রসাদ এনেছি—বলে এক বাবাজি একটা বিষ-মেশানো লাড্ডু ঠাকুরের দিকে বাড়িয়ে ধরল। ঠাকুর বুঝতে পারলেন এ বিষ, বিষম ষড়যন্ত্রের ফল, কিন্তু বলেছে মহাপ্রসাদ, মহাপ্রসাদ বলে তাকে নিবেদন করেছে—ঠাকুর লাড্ডু প্রত্যাখ্যান করলেন না, প্রাপ্তিমাত্র প্রণাম করে মুখে ফেললেন। প্রহ্লাদকেও তো বিষ খাইয়েছিল, তার তো মৃত্যু হয়নি। দেখ আমার কী হয় !

মঠের মোহন্তদের রুজি মারা যাচ্ছে, দেশের যত গণ্যমান্য সবাই ঠাকুরের পদছায়ায় এসে বসছে, মোহন্তদের মানসম্ভ্রম ধূলিসাৎ হবার যোগাড়, বিঘ্নরক্ষকে বধ না করতে পারলে তাদের শান্তি কই ?

আত্মশক্তি অসার হতেও অসার। একমাত্র ভগবৎশক্তিই বস্তু। বলছেন ঠাকুর, মানুষ যখন বোঝে তার নিজের কোনোই ক্ষমতা নেই, সামান্য একটা ঘাসও সে নিজের শক্তিতে তুলতে পারে না তখনি তার হৃদয়ে ভক্তি বিকশিত হতে শুরু করে।

'বুঝলে, অহঙ্কারটি নষ্ট হলেই শীত-গ্রীষ্ম মান-অপমান স্তুতি-নিন্দা কিছুরই আর বোধ থাকে না। মানুষ যখন ভগবানে যুক্ত হয়ে যায়, যখন তার আমিত্ব বলে কিছু থাকে না, তখন সুখ-দুঃখ ধন-দারিদ্র্য সমস্তই ভগবান গ্রহণ করেন। ভগবানের কৃপায় ভক্তের সে সব কিছুই ভোগ করতে হয় না।' বললেন ঠাকুর, 'এই নিয়মেই প্রহ্লাদ অগ্নি জল হস্তী বিষ সব কিছু দুর্নিমিত্ত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। প্রকৃতির মধ্যে একটা সাধারণ নিয়ম আছে, যদি একজন আরেকজনকে ভালোবাসে তবে একের কষ্ট হলে আরেক-জন তা ভোগ করে। একের দেহে বেত মারলে অন্যের দেহে তার চিহ্ন পড়ে। তেমনি ভক্তের কষ্ট ভগবান টেনে নেন।'

লাড্ডু খেয়ে ঠাকুর অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। সঙ্গে প্রচণ্ড জ্বর। কেন, কী করে হঠাৎ এমন ব্যাধি এসে পড়ল কেউ কিছু হদিস খুঁজে পেল না। ভক্ত-শিষ্যের দল দিশেহারা হয়ে পড়ল। ডাক্তার ডাকো। কীর্তন লাগাও।

একটা পেরেক-ঠোকা আমগাছের কাতরোক্তি শুনেছিলেন ঠাকুর, তিনি এখন শুনবেন না যন্ত্রণাবিদ্ধ ভক্ত-শিষ্যদের আর্তনাদ ?

একদিন ঢাকায় প্রত্যূষে আসন থেকে ওঠবার আগে ঠাকুর বললেন, 'আহা, আমগাছটি বড় ক্লেশ পাচ্ছে। আমাকে বললে, আমার বুকে পেরেক মেরে রেখেছে, যন্ত্রণায় সারা রাত আমার ঘুম হয়নি। দেখ তো সত্যি কিনা।'

ভক্ত-শিষ্যেরা আমতলায় গিয়ে দেখল চাঁদোয়া টাঙাবার জন্যে ছেলেরা গাছে একটা লোহা পুঁতে রেখেছে। জায়গাটা থেকে রক্তের মতো ঝরছে লালচে রস। আর কথা নেই, লোহাটাকে টেনে তুলে ফেলা হল তক্ষুনি। কত না-জানি আরাম পেল আম গাছ। শুধু পশুপাখির নয় বৃক্ষলতারও খবর নেন ঠাকুর। প্রত্যেকের মধ্যেই প্রাণ, প্রত্যেকেই নিজের গন্ডিতে নিজের প্রয়োজনে অনুভবময়। ঠাকুর সমস্ত চৈতন্যের অতন্দ্র প্রহরী।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ বস্তু এক মাত্র ভগবানের হাতে, দাতা একমাত্র তিনি। পুরুষকার কৃষিকার্যে কৃষকের কর্মের মতো। কৃষক ভূমি প্রস্তুত করে, শস্য বপন করে, এইমাত্র তার কাজ। তার পরে তার আর ক্ষমতা নেই। আকাশ হতে জলবর্ষণ না হলে, শুধু জলসেচন করেও সে কিছু করে উঠতে পারে না। তবু তার প্রাথমিক, তার আন্তরিক উদ্যমটাকে তো চাই। সেইটেই তপস্যা। সেই তপস্যার বলেই জলবর্ষণের মতো কৃপাবর্ষণ অবশ্যম্ভাবী।

সমস্ত চেষ্টাই পুজো, সমস্ত উদ্যমই উৎসব। ঠাকুর বললেন, 'দশ মাসের গর্ভবতীর মতো ধীরে-ধীরে চন্দন ঘষতে হয়। সেই ঘর্ষণে নিজেকে মিশিয়ে দিতে হয়। চন্দন ঘষাই পুজোর্চনা।'

উচ্চ কীর্তনে ঠাকুরের বাহ্যসংজ্ঞা কিঞ্চিৎ ফিরে এল। ওষুধ খাওয়ানো হল। খাওয়ানো হল তেঁতুলের সরবৎ। দু দিনেই প্রভু সুস্থ হয়ে উঠলেন। যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব দেখিয়ে ঠাকুর তাঁর নিত্য পুজো-পাঠে নিযুক্ত হলেন। শিষ্য-ভক্তেরা বুঝে নিয়েছে কেন এই ব্যাধি। যে বাবাজি বিষের নাড়ু দিয়েছিল তাকেও খুঁজে পেয়েছে। খুঁজে পেয়েছে ষড়যন্ত্রীদের। আর কথা নেই, দুর্বৃত্তদের পুলিশে দাও। এত বড় পাপ! প্রভুর প্রাণনাশের চেষ্টা। বিচারে নিশ্চিত দ্বীপান্তর।

সবাইকে নিবৃত্ত করলেন ঠাকুর। বললেন, 'তোমরা শান্ত হও। আমি জগন্নাথদেবের আশ্রয়ে বাস করছি। তিনি সমস্ত দেখেছেন। ইচ্ছে হলে তিনিই প্রতিবিধান করবেন। ইচ্ছে হলে তিনিই ক্ষমা করবেন। আমার দিক থেকে প্রতিকারের কোনোই প্রার্থনা নেই।'

ঠাকুর একবার বলেছিলেন কুলদানন্দকে, 'ব্রহ্মচারী, প্রার্থনা কোরো না। প্রার্থনা করলেই কিন্তু তা মঞ্জুর হবে। সাবধান। তখন আবার সেই প্রাপ্তির থেকে অশান্তি।'

কুলদানন্দ বললে, 'মঙ্গলময় ঠাকুর, তুমি কিসে কী করো, কী তোমার অভিপ্রায় কিছুই বুঝি না। সর্বত্র তোমার ইচ্ছা, সর্বত্র তোমার হাত, এটি পরিষ্কার দেখলেই নিশ্চিন্ত। এ না হওয়া পর্যন্ত কামনা-বাসনার নিবৃত্তি নেই, অহঙ্কারের উচ্ছেদ নেই, নেই শান্তিলাভের সম্ভাবনা।'

ঠাকুরের শরীররক্ষার জন্যে সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্রশ্রয় পেয়ে দুর্বৃত্তরা আবার কী চক্রান্ত করে, কে জানে। কেউ কেউ বললে, ঠাকুরকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে চলো। যেন বাজে লোক ঢুকতে না পায় সব সময়ে কড়া নজর রেখো। ঠাকুর বিরক্ত হলেন। বললেন, 'তোমরা এত ভাবছ কেন? স্বয়ং জগন্নাথদেব দিনে তিনবার করে আমার খবর নিচ্ছেন। আমার ভয় কী! অন্যস্থানে গেলে কি ত্রাণ পাব? সামান্য একটা কাঁটা ফুটলেও মৃত্যু হতে পারে। আর তাঁর ইচ্ছা না হলে ধরে পাথরে আছড়ালেও কিছু হবে না। তোমাদের কলকাতা যাবার ইচ্ছে হলে তোমরা চলে যাও, আমি আমার লাঠি-গাছ ধরে এখানে পড়ে থাকব। যখন সময় হবে তখন ভগবান ঘরের ছেলেকে ঘরে পাঠিয়ে দেবেন।'

নির্ভয় হও। তবে এটা ঠিক জেনো, নরকেও যদি যাও সেখানেও বুকে করে রাখবার

একজন আছেন। ভগবান যখন যেভাবে রাখেন তাতেই আনন্দ করতে হবে। আমার নিজের যাচাই-বাছাই করবার কিছু নেই। 'কাষ্ঠের পুত্তলি যেন কুহকে নাচায়'—আমাকে তেমনি করো।

রেবতীমোহন সেন ঢাকা থেকে এসে পৌঁছুল। অপূর্ব কণ্ঠস্বরের অধিকারী রেবতীমোহন। তাঁর কীর্তন শুনলেই ঠাকুরের গভীর আনন্দাবেশ হয়। পুলকরোমাঞ্চে সর্বশরীর সন্দীপিত হয়ে ওঠে। বলেন, ভগবৎ ভজনের জন্যে ভগবানের বিশেষ কৃপায় রেবতী এই অসাধারণ কণ্ঠনাদ লাভ করেছে। এই নাদে নিজেই আকৃষ্ট ভগবান।

'ভগবানের কাজ দেখে লোকে এত অভ্যস্ত হয়েছে যে ভগবানকেই ভুলে আছে। ভগবানকে কারু প্রশংসা করার ইচ্ছে হয় না।' বলছেন ঠাকুর, 'রবি ঠাকুর গান করলে লোকে কত প্রশংসা করে, কিন্তু এই যে কণ্ঠস্বর দান করেছে সেই ভগবানের কেউ গুণগান করে না। ভগবান কী আশ্চর্য কৌশলে বাকযন্ত্রের সৃষ্টি করেছেন। তোমার মনের যেমন ভাব হবে বাকযন্ত্রে তেমনি শব্দ হবে। রাগরাগিণীর কোনো রূপ নেই, শুধু মানুষের মনের ভাবমাত্র। সেই ভাব মনে আসামাত্র নানা রাগরাগিণী কণ্ঠের শিরায় বাজতে থাকবে। নিরাকার ভাব সাকার হয়ে রাগরাগিণীরূপে পরিণত হচ্ছে। এর প্রশংসা কেউ করে না। কণ্ঠের শিরা কয়েকটিমাত্র, তাতে বিচিত্র স্বর-প্রকাশ।

রেবতী গান ধরল :

'গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর
হরি হরি বলিতে নয়নে ববে নীর।
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে
সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন
কবে হাম হেরব সো বৃন্দাবন॥'

ঠাকুরের শরীর দুর্বল, তবু কী শক্তিতে কে বলবে, অনেকক্ষণ নৃত্য করলেন। বললেন, 'ঐ দেখ জগন্নাথদেব কীর্তন শুনতে এসেছেন। বলছেন যে গাইছে তাকে একজোড়া লুই দাও।'

ব্যবস্থা হল, ঠাকুরকে বেদানার রস খাওয়াতে হবে। কিন্তু তখন কলকাতায়ও বেদানা পাওয়া যাচ্ছে না। তবে উইলসনের হোটেলে এক প্রকার বেদানার রস বিক্রয় হয়, তা দেওয়া যাক। তাতেই উপকার হবে।

ঠাকুর শুনে বিরক্ত হলেন। বললেন, 'সে কী! আমি চিরকাল শাস্ত্রসদাচারের মহিমা প্রচার করছি আর আমিই এখন সদাচারবহির্ভূত কাজ করব? না, কখনো না।'

কুলদানন্দ বললে, 'কেন আপনি তো আগে উইলসনের হোটেলের পাঁউরুটি খেয়েছেন।'

'দশবছর আগে যা করেছি আমাকে এখনো তাই করতে হবে? দেখছ না কোত্থেকে কোথায় এসে পড়েছি আমি?'

শাস্ত্র-সদাচারের অনুসরণই একমাত্র নিরাপদ। শাস্ত্র ঋষিবাক্য, সদাচার মহাজনদের আচরণ। এ বাক্য ও আচরণের সঙ্গে যা মিলবে তাই নেবে, যা মিলবে না তা নেবে না। শাস্ত্রপাঠে অবিশ্বাস নষ্ট হয়, আর শাস্ত্রে বিশ্বাস হলেই শুভবুদ্ধির আবির্ভাব। যে ঋষি-মুনিদের বাক্যে মর্যাদা দেয় সে ঋষি-মুনিদের আশীর্বাদ পায়। যে গৃহে রামায়ণ,

মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত আছে সেখানে সমস্ত তীর্থ বর্তমান। যারা শাস্ত্র মেনে চলে তারা দেবতা, যারা নিজের বুদ্ধিতে চলে তারা অসুর। যদি শাস্ত্র মান্য কর তবে গঙ্গা থেকে চারশো ক্রোশের মধ্যে গঙ্গা বলে যেখানে স্নান করবে সেখানেই পাপমুক্ত হবে আর সেই বিশ্বাসের জোরেই পাবে বিষ্ণুলোক।

'তুমি এখন কিছু দিন শয়ন করলেও তো পারো।' স্নেহে অনুনয় করলেন মুক্তকেশী।

বহু বছর ধরেই ঠাকুর নিদ্রা ত্যাগ করে আছেন। দিনে তো কোনোদিনই নয়, রাত্রেও বহুদিন ধরে জিতনিদ্র। আসনে স্থির হয়ে বসেই ভগবৎধ্যানে রাত কাটিয়ে দিচ্ছেন, কখনো বা জাগ্রত শিষ্যদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করে। কিন্তু এখন এই ভগ্নস্বাস্থ্যে এত কঠোরাচরণ করা কি সমীচীন ? সেই কথাই বলছিলেন শাশুড়িঠাকরুন।

উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'আমি যেদিন শয়ন করব, যেদিন আসন ত্যাগ করব, সেদিন আমি থাকব না।'

আসন সম্বন্ধে স্থিরতা থাকা দরকার। প্রতিদিন সাধনের সময় একই স্থানে একই আসনে একই দিকে অভিমুখী হয়ে বসবে। এসবের পরিবর্তন ঘটলে চিত্তস্থৈর্যে বাধা পড়ে। তেমনি প্রতিদিন একই স্তবপাঠ একই সংকীর্তন-গান একই নামজপ বিধেয়। তাতেই চিত্তের স্থিরতা ভাবের গাঢ়তা ও চরিত্রের শক্তি সাধিত হয়।

এক দিন বলে বসলেন : 'মায়ের কথাই বুঝি সত্য হয়!'

কী মায়ের কথা ? মনে নেই মা এক দিন বলেছিলেন, বিজয় পুরী গেলে আর ফিরবেনা। সে গানটা গাও তো। দীনবন্ধু হে, দিন যাবে রবে না।

রেবতীই গান ধরল :

> দীনবন্ধু হে, দিন যাবে রবে না।
> দিন যাবে সুখে না হয় দুখে, রবে কেবল ঘোষণা।
> লোকে বলে, তুমি দয়াময় দীনবন্ধু, প্রেমময় প্রেমসিন্ধু
> ওহে করুণার সিন্ধু, এক বিন্দু দানে শুকাবে না।
> তুমি বাম করে ধরলে শৈল সে ভার তো তোমার সৈল
> ত্রিজগতের ভার সৈল, বুঝি অধমের ভার সৈল না॥

কে এক নবাগত ভক্তশিষ্য ঠাকুরের পাশে বসে পাখার হাওয়া করছিল। ঠাকুর কুলদানন্দকে ডেকে বললেন, 'ব্রহ্মচারী, যাকে-তাকে বাতাস করতে দাও কেন ? একেবারে উচ্চাধিকার ! একে বলে দাও এ যেন ভালই দেশে চলে যায়।'

সেবা এক মহৎ সাধনা, গুরুসেবা তো মহত্তম। অনেক নিষ্ঠা, ভক্তি ও একাগ্রতায়ই গুরুসেবার উচ্চাধিকার লাভ হয়। অন্তরে অনুরাগ নেই, বাইরে অনুষ্ঠান—একে সেবা বলে না। অন্তরে ব্যথাবোধের থেকেই আসল সেবা।

'অভিমান কি সহজে যায় ?' বললেন ঠাকুর, 'শুধু পরসেবাতেই অভিমানের নিরসন। সংসারে তোমার চেয়ে যাকে ছোট মনে করবে, আসলে ছোট কেউই নয়, তাকেই সেবা করতে হবে। সেবায় বিরক্ত হলে তা আর সেবা থাকবে না।'

'কেউ শীত চায়, আবার শীত পড়লে গরমের জন্যে ব্যাকুল হয়। এক বুড়ি রোদে বড়ি শুকোচ্ছে, হঠাৎ মেঘ করল। বুড়ি প্রার্থনা করতে লাগল, রোদ হোক। পাশেই চাষী ক্ষেত চষছে, তার প্রার্থনা, জল হোক। তা শুনে বুড়ির রাগ। দুজনে লেগে গেল

ঝগড়া, রোদে-বৃষ্টিতে ঝগড়া। এর সামঞ্জস্য কোথায়? একমাত্র ভগবানই সকলের সামঞ্জস্য করতে পারেন।' বললেন ঠাকুর, 'তিনিই বৃষ্টি হয়ে জল দেন, শস্য জন্মান, আবার তিনিই রোদ হয়ে বুড়ির বড়ি শুকোন। আবার তিনিই চাষী তিনিই বুড়ি।'

'মা যার আনন্দময়ী সে কি নিরানন্দে থাকে।
ইহকালে পরকালে মা তারে আনন্দে রাখে।।
সদানন্দময়ী তারা সদানন্দের মনোহরা
এই মিনতি করি তারা ঐ পদে যেন মতি থাকে।।'

'স্ত্রীলোকের প্রতি কুদৃষ্টি?' বলছেন ঠাকুর, 'মাটির দিকে তাকাবে। শুধু বলবে, মা, আনন্দময়ী, আমাকে কৃপা করো। মা আনন্দময়ী সকলের মধ্যে, বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা। বিশ্বজননী মা আর গর্ভধারিণী মা সমান। নারীর মধ্যে যদি সেই দৃষ্টিতে একটি নারীকে ভালোবাসতে পারো, প্রণাম করতে পারো, চণ্ডীদাস যেমন রজকিনীর মধ্যে করেছিল, তা হলেই সিদ্ধি করায়ত্ত।'

কী বলছে শাস্ত্র? বলছে, সাধ্বী স্ত্রী আদরগৌরবে হর্ষোৎফুল্ল থাকলে সমস্ত বংশের শ্রীবৃদ্ধি। আর স্ত্রীলোকের অবমাননা হলে সে বংশের অপঘাত। যেখানে গভীররাত্রে স্ত্রীলোকের দীর্ঘশ্বাস পড়ে সেস্থান অচিরে শ্মশান হয়ে যায়। নারীই অশেষ মঙ্গলের আস্পদ। গৃহের শোভা, সংসারের লক্ষ্মী, অমরাবতীর প্রদীপটি একমাত্র তার হাতে। যে মূঢ় পুরুষাধম স্ত্রীলোককে অবমাননা করে সতী পার্বতী পদে পদে তার অমঙ্গল করেন।

রাতে হঠাৎ ঠাকুর চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ রামঃ।'

পরদিন এক শিষ্য জিগগেস করলেন, 'ঐ মন্ত্র বললেন কেন?'

'আমার অন্তর্জলী হল।'

'সে আবার কী!' চমকে উঠল সকলে।

'কাল যখন দেখলাম রক্ত আক্রমণ করেছে, তখন গঙ্গার বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের আকাঙ্ক্ষা হল। এই সময় দেখি', বললেন ঠাকুর, 'দেবতারা একখানা হীরামাণিকখচিত খাট নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হয়েছেন। বললেন, এতে উঠুন। আমি উঠলাম। বললাম, বসে যেতে পারব না, শুয়ে যাব। দেখলাম খাট গঙ্গাতীরে এসে পৌঁচেছে। বললাম, আমাকে অন্তর্জলী করুন। দেবতারা খাটশুদ্ধ আমাকে গঙ্গায় নামালেন। আমি উচ্চস্বরে বলতে লাগলাম, ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ রামঃ। গঙ্গার হাওয়ায় আমার শরীর পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।'

প্রিয়নাথ ঘোষও ভারি মিষ্টি গায়। ঠাকুর বললেন, 'প্রিয়নাথ, দয়া করে একটি গান শোনাও।'

প্রিয়নাথ গাইল:

'দেখলেম যত নারী বসে নীরে, নিয়ে সে কমলিনীরে
নীরে নিবারিছে আঁখিনীরে।
কেহ নিয়ে যায় তুলসী, করে গঙ্গাজল
রাই ম'ল রাই ম'ল বলে করে অন্তর্জল।
কৃষ্ণ লাগি যার অন্তর জ্বলে কাজ কি রে তার অন্তর্জলে
হরি হরি বল সকলে, কালে কি করিবে কিশোরীরে।

কেহ বলে যায় গো ধনী কেহ বলে আয় গো ধনী
কেহ দিচ্ছে হরিধ্বনি, ধনীর ধ্বনি আর কি শুনব ফিরে ॥'

বাজারের সমস্ত দেনা শোধ হয়ে গিয়েছে, বিষও উঠে গিয়েছে শরীর থেকে—সর্বত্র বইতে লাগল প্রসন্নতার হাওয়া।

'দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরুে।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥'

দেবতা, যদি বিশ্বাস হয়, কথা কন। যেমন ইচ্ছে তেমনি করে নেওয়া যায় দেবতাকে। তীর্থে, তীর্থপাণ্ডারাই গুরু। তাদের না মানলে সবই বৃথা। দ্বিজে, গোব্রাহ্মণহিতায় চ। দৈবজ্ঞে, অরুন্ধতী দর্শন ও সুহৃদবাক্যে বিশ্বাস। দীপনির্বাণের গন্ধ না পায় তো মৃত্যু নিকট।

পাণ্ডারা ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ঠাকুর সরলনাথের সাহায্যে বারান্দায় গেলেন ও পাণ্ডাদের পঁচিশ টাকা দর্শনী দিলেন। বললেন, 'আপনারা আশীর্বাদ করুন আমাকে যে বিষ খাইয়েছিল তার জ্বালার যেন নিবারণ হয়।'

এ যেন সেই প্রহ্লাদের বর চাওয়া—আমার শত্রুপক্ষের মঙ্গল হোক।

এতখানি করুণা আর কার! এতখানি কার আর ভগবৎনির্ভরতা! আকাশঢালা ভালোবাসা!

পাণ্ডারা বললে, 'তাই হোক।'

'আরো আশীর্বাদ করুন যেন জগন্নাথদেবের দাসানুদাস হয়ে থাকতে পারি।'

পাণ্ডারা আশীর্বাদ করলে।

অবিশ্রাম নাম করো। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করো। কে জানে এই হয়তো তোমার অন্তিম শ্বাস। তাই একটি শ্বাসও যেন না বৃথা যায়। নামই শ্রেষ্ঠ মাদক। আর সব নেশা ছুটে যায়, নামের নেশা ছোটে না। নাম করা মাত্রই সমস্ত মহাত্মার দৃষ্টি পড়ে। কোনো ভয় থাকে না। এক হরিনাম ছাড়া সহজ সুখের বস্তু আর কিছু নেই। হরের্নামৈব কেবলম্‌।

কাম নষ্ট হোক, এ কথা ঠিক নয়। কাম থাক কিন্তু ত্রিগুণাতীত হয়ে। এই কামই উপাসনা, ভজন, যা কিছু। তখনই এর নাম প্রেম। যখন দেখবে প্রেম জাগছে না, জানবে কাউকে তুমি অহংকারে অপমান বা অবজ্ঞা করেছ। ভগবান দর্পহারী, অভক্তের দর্প চূর্ণ করেন।

মধ্যরাতে ঠাকুর সরলনাথকে গান গাইতে বললেন। সরলনাথ গান ধরল :

লম্পট নিরদয়, হরি দয়াময় বলে তোমায় কোন গুণে
ও কেউ চন্দনদানে বসল রাজসিংহাসনে
আমরা প্রাণদানেও স্থান পেলেম না চরণে।
হরি সকলি তোমার কৃপায়
তুমি যারে না রাখ পায়, তার বিপদ ঘটে পায় পায়
আর তুমি যারে রাখ পায়, সে সকলই পায়
লজ্জা পায় হে হরি, তোমার পায় ধরা দিনু প'লে মনে ॥

সমস্ত ধার শোধ হয়ে গিয়েছে, পুরীতে আর থাকা কেন, ভক্তেরা কলকাতায় ফেরবার ব্যবস্থা করে ফেলল।

ঠাকুর বললেন, 'নরেন্দ্রের পার থেকে একটি তুলসী গাছ নিয়ে এস।'

তুলসী গাছ আনা হল। ঠাকুর বললেন, 'নরেন্দ্রের তুলসী গাছ নরেন্দ্রই যাবে।'

ঠাকুর চলে যাবেন শুনে মালী আর মহাপাত্র দেখা করতে এসেছে। মালীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'মালী তুমি আমার চিরদিনের মালী, তুমি আমাকে চিরদিন ফুল দেবে।' তাকালেন মহাপাত্রের দিকে . 'সোয়ার, তুমি আমার চিরদিনের সোয়ার। তুমি আমাকে চিরদিন মহাপ্রসাদ দেবে।'

এ সবের মানে কী ? মুক্তকেশীর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। দুই শিষ্য তর্কাতর্কি করতে গিয়ে ক্রুদ্ধ কলহ করে বসেছে। ঝগড়ার সুরটা অস্পষ্ট হলেও ঠাকুরের কানে এসে লেগেছে। তিনি ডাকালেন শিষ্যদের। কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'আমাকে তোমরা ক্ষমা করো।'

দুজনেই বিমূঢ়। আপনি কী বলছেন, আপনাকে ক্ষমা করার কথা ওঠে কী করে।

ঠাকুর বললেন, 'জগন্নাথদেবের প্রকাশ হয়েছিল। আমাকে বললেন, ওদের কাছে তুমি ক্ষমা চাও।'

'সে কী কথা ? আপনাকে ক্ষমা করব কী করে ?' দুজনেই বিহ্বলব্যাকুল।

'তোমরা পরস্পরকে ক্ষমা করলেই আমাকে ক্ষমা করা হয়ে গেল।'

সবাই বুঝলে ক্ষমার তাৎপর্য। দুই তার্কিক তখন প্রসন্নমুখে আলিঙ্গনাবদ্ধ হল।

বাইশে জ্যৈষ্ঠ, তেরোশ ছয় সাল। সমস্ত দিনই ঠাকুর সমাধিস্থ রইলেন। ভক্তের দল কীর্তন সুরু করল : হরি হরয়ে নমঃ। কিন্তু সমাধি ভাঙে কই ?

রাত্রি প্রায় আটটায় ঠাকুরের দিব্যজ্ঞান হল। ব্রহ্মচারীকে ওষুধ দিতে বললেন। জগদ্বন্ধুকে বললেন, 'আমার কাছে থেকো।'

সরলনাথকে ধরে গেলেন স্নানঘরে। ফিরে এসে, এ কী, আসনে বসলেন না, বসলেন নিত্য পুজার তুলসীমূলে। যেদিন আসন ছাড়ব সেদিন আমি থাকব না—এ কী, ঠাকুর যে আজ আসনছাড়া। তবে কি ঠাকুর আর থাকবেন না নরদেহে ? এই তো সেদিন বললেন, তাঁর পথ্য, গাঁদালের ঝোল, জগন্নাথদেব এসে খেয়ে ফেলেছেন—বললেন, 'এমনিভাবে তিনি আশ্বস্ত না করলে দয়া না করলে কি বাঁচি ? তাঁর অপার করুণা !' সেই করুণার ধারা কি আজ শুকিয়ে যাবে ?

বারে বারে জিগগেস করছেন, কটা বেজেছে ? এখন রাত কত ?

জগদ্বন্ধু জিগগেস করলে : 'কেমন আছেন ?'

'ভালো আছি।' ঠাকুর বললেন, 'শুধু মাথাটা ধরে আছে।'

'আপনার চা খাবার অভ্যেস,' জগদ্বন্ধু মিনতিমাখানো স্বরে বললে, 'সমস্ত দিন তো খাননি, একটু চা খাবেন ?'

জগদ্বন্ধুর বুঝি অন্তরতম ইচ্ছে ঠাকুরকে নিজের হাতে খাওয়ায়। তার সে ইচ্ছা পূর্ণ করলেন ঠাকুর। বললেন, 'তাই একটু দাও।'

মাটিতে বালিশে হেলান দিয়ে বসে চায়ের বাটিতে দুবার চুমুক দিলেন ঠাকুর। পরে কাকে প্রকাশিত দেখে উর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করলেন। নতমস্তকে প্রণাম করলেন সেই প্রকাশমূর্তিকে। সেই প্রণামের মধ্য দিয়েই নিত্যধামে মহাপ্রয়াণ করলেন।

রেবতী নক্ষত্রে কৃষ্ণাদ্বাদশী তিথিতে রাত ন-টা বেজে কুড়ি মিনিটে নীলাচলে তাঁর অন্তর্ধান হল।

'বৃন্দাবিপিনে মঙ্গল আরতি হের রে নয়ন আনন্দে
মঙ্গল আরতি হতেছে নাচিছে সখীবৃন্দে
কুঞ্জে কুঞ্জে হইতে ধাইছে সবে হেরিতে শ্রীগোবিন্দে ॥'

ভক্ত-শিষ্যের দল বিচ্ছেদব্যথায় হাহাকার করে উঠল। কিন্তু শোক কেন, শোক কোথায়? তিনি তো ভক্তদের জীবনেই অনুস্যূত হয়ে রইলেন। তিরোধানের আগের দিন বলে দিলেন, 'আজ থেকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব তোমাদের সকলের ভার গ্রহণ করলেন। তার অর্থ আর কী! অর্থ, ঠাকুর আর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব অভেদ। অর্থ, ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবেই বিলীন হলেন।

কীর্তনশেষে ঠাকুর যেমন জয় দিতেন তেমনি জয় দাও সকলে।

শ্রীবৃন্দাবনকি জয়। গোপেশ্বর মহাদেবকি জয়। গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহনকি জয়। কেশীঘাটকি জয়। দ্বাদশআদিত্য টীলাকি জয়। রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ডকি জয়। গিরিগোবর্ধনকি জয়। বিশ্রামঘাটকি জয়। কেশবজীকি জয়। বৃন্দাবনবাসী সাধুভক্ত বৈষ্ণববৃন্দকি জয়।

নরেন্দ্রসরোবরের উত্তরদিকে ইংগিত করে ঠাকুর একবার বলেছিলেন: ওপারে একটি স্বর্ণচূড়াবিশিষ্ট মন্দির দেখা যাচ্ছে। সেই ভবিষ্যৎ-বাণীই বাস্তবে রূপায়িত হল। নরেন্দ্র সরোবরের উত্তরেই ঠাকুরকে সমাধিস্থ করা হল। কালক্রমে নির্মিত হল স্বর্ণচূড় মহামন্দির, লোকমুখে নাম হল জটিয়াবাবার সমাধি-মঠ। তাতে প্রতিষ্ঠিত হল নাম-ব্রহ্ম।

'তোরা কে নিবি লুট নিতাইচাঁদের প্রেমের বাজারে,
হাটের রাজা নিত্যানন্দ, পাত্র হলেন শ্রীচৈতন্য,
মুন্সিগিরি দিলেন অদ্বৈতেরে।
হরিদাস খাজাঞ্চি হয়ে লুট বিলালেন নগরে
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাঁরাও ভাবেন নিরন্তর
ধ্যান করিয়ে না পেলেন যাঁহারে।
নারদমুনি মগ্ন হয়ে বীণাযন্ত্রে গান করে।
হরি বোল বলে রে ॥'

আশাবতী বললে, আমাকে কিছু-কিছু সদুপায় উপদেশ করুন, যাতে যোগীদের নিত্যানন্দধাম দর্শন করে কৃতার্থ হতে পারি।

যোগীবর বললেন, করুণাময় পরমেশ্বর মানুষের প্রতি দয়া করে তাঁকে লাভ করবার সহজ উপায় করে দিয়েছেন। মানুষ কুসংগে কুঅভ্যাসে তার পবিত্র স্বভাব নষ্ট করে ফেলে। সেই কারণে পুনর্বার সেই স্বভাব ফিরে পাবার জন্যে সাধনের প্রয়োজন হয়। তারই নাম প্রায়শ্চিত্ত, অর্থাৎ পুনর্বার পূর্বাবস্থা ফিরে পাওয়া। এই শরীর আমাদের বাসগৃহ, এ একদিন নষ্ট হবে, তবু, দেখ দয়াময় প্রভু এই ক্ষণভঙ্গুর দেহকে রক্ষা করবার জন্যে কত শত উপায় করেছেন। মার বুকে স্নেহ দিয়েছেন, স্তন্য দিয়েছেন, দিয়েছেন জল বায়ু আগুন শস্য খাদ্য ফল-মূল—যা কিছু শরীর রক্ষার উপযোগী তাই সহজলভ্য করে দিয়েছেন। এই শরীরের চেয়ে আবার আত্মা শ্রেষ্ঠ, আর আত্মাই শাশ্বত। আত্মার প্রয়োজনীয় বস্তুকেও দয়াময় প্রভু দুষ্প্রাপ্য করেন নি। শরীরের পক্ষে যেমন মাতার স্তনদুগ্ধ, তেমনি আত্মার পক্ষে প্রেমময় পরমেশ্বরের প্রেমরস। শিশু

সন্তান খিদেয় কাতর হয়ে কান্না জুড়লেই জননী সন্তানের মুখে স্তনদান করেন, তেমনি আত্মা খিদেয় কাতর হয়ে কান্না জুড়লেই বিশ্বজননী তার মুখে অমৃতরস ঢেলে দেন। ঈশ্বরের জন্যে প্রবল ক্ষুধা বা অনুরাগ হলে অনায়াসে যোগলাভ করা যায়। সংসারাসক্তিতে এই ধর্ম ক্ষুধা নষ্ট হয়েছে। এর জন্যেই যোগ-সাধনের প্রয়োজন। শারীরিক খিদে নষ্ট হলে যেমন মন্দাগ্নির ওষুধ খেতে হয় তেমনি আত্মার অনুরাগ-ক্ষুধার মান্দ্যভাব দেখলেই তার চিকিৎসা সাধনভজন করা দরকার।

কিন্তু আমি অসহায়, আমি কী করব ? কী করে আমার অনুরাগ আসবে ? আশাবতী আকুল হয়ে জিগগেস করল।

তুমি পরোপকার-ব্রত গ্রহণ করো। বললেন যোগীবর।

পরোপকার-ব্রতে যে টাকা চাই। আমি টাকা কোথায় পাব ?

না মা, টাকা না থাকলেও পরোপকার-ব্রত সাধন করা যায়। শুধু শরীর দিয়ে পরসেবা করা যায়। যদি শরীরও অক্ষম হয় তবে দুটো মিষ্টি কথা বলে, বিপদে সুপরামর্শ দিয়ে লোকের হিতসাধন করা যায়। সেবাব্রত পালন না করলে হাজার সাধন ভজন কর কিছুতেই পরব্রহ্মের চরণলাভে সমর্থ হবে না।

আমার যে ভয়ঙ্কর স্বার্থপরতা। বললে আশাবতী, আমার সংসারে কেউ নেই, তবু কোনো কিছু যখন পরিবেশন করি, তখন পরিচিতদের ভালো দেখে বেশি-বেশি করে দি, অন্য লোককে যেমন-তেমন করে দিয়ে দায় সারি। সবচেয়ে ভালো জিনিসটি নিজে নিই, মন্দটা পরের জন্যে তুলে রাখি। একবার জগন্নাথে গিয়েছিলাম, পথে অনেক চটি আছে, চটির মধ্যে যেটি ভালো ঘর সেটি আমি নিতাম, ঘুষটুস দরকার হলে তাও দিতাম, আর সকলে যে যেখানে পারুক মরুক গে। লোকে কষ্ট পাচ্ছে তা অনায়াসে দেখতাম। কারো ভালো দেখতে পারি না। অন্যের ভালো দেখলে কষ্ট হয়। এমন স্বার্থপরতায় ভরা মন নিয়ে কী করে পরসেবা করতে সক্ষম হব ? আমার কিছু নেই, তবু এই—যাদের স্বামী-পুত্র টাকা-কড়ি আছে তাদের স্বার্থপরতা না-জানি আরো কত বেশী।

যোগীবর বললেন, মা আশাবতী, সন্দেহ নেই স্বার্থপরতাই সকল পাপের মূলে। সামান্য ওষুধে এ রোগের নিবারণ নেই। সংসার অসার অনিত্য, সর্বদা এই চিন্তা ও আলোচনা করতে করতে আর সাধুসংগ করতে করতে যখন সত্যি-সত্যি সংসারের তাবৎ পদার্থকে অসার বলে উপলব্ধি করতে পারবে তখনই স্বার্থপরতা চলে গিয়ে দেখা দেবে জীবন্ত বৈরাগ্য। সাধকমাত্রেরই প্রথমে এই বৈরাগ্য অবলম্বনীয়। ভস্মমাখা বা কৌপীন পরা বৈরাগ্য নয়, স্বার্থনাশই আসল বৈরাগ্য। যেমন মনে মনে পরপুরুষ কামনা করলে সতীত্ব নষ্ট হয় তেমনি মনে মনে অধর্ম আলোচনা করলে চরিত্র কলঙ্কিত হয়। কলঙ্কিত মনে ধর্মসাধন হয় না। চরিত্র শুদ্ধ রেখে বৈরাগ্য অবলম্বন করে প্রস্তুত থাকো। তোমার গুরুকরণ হবে। পরব্রহ্মে সংযুক্ত হয়ে কৃতার্থ হবে।

'সংসারে থেকে ধর্ম হয়, চিরকাল হয়েছে, এখনো হচ্ছে।' বলছেন গোঁসাইজি, 'এই শরীরই সংসার। এই সংসারে যদি তাঁকে রাজা করতে পারি, তবেই তো সুখ। সংসারে যদি তাঁর সম্মান না দেখি তবে সুখ সৌন্দর্য কোথায় ? অযোধ্যা রামবিহনে শ্মশান হয়েছিল, সংসারও তাঁকে ছাড়া শ্মশান, নইলে প্রভুর গৌরব কী ? প্রভুকে ফেলে নিজে সিংহাসনে বসলাম, আমার স্বার্থ আমার সুখই শ্রেষ্ঠ হল —তবে এ তো পৃথিবীর

রাজত্ব, তাঁর রাজত্ব নয়। যেখানে তাঁর রাজত্ব সেখানেই স্বার্থত্যাগ। সংসার কী? পরমেশ্বরে যে বহির্মুখিতা, তাই সংসার। টাকাকড়ি স্ত্রীপুত্র সংসার নয়, পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করে স্বার্থের পুজো, তাঁর অনাদর, এই সংসার। এই সংসার আমিই সৃষ্টি করি। যদি আমার মনে সত্যিকার ইচ্ছা জাগে, যদি প্রভুকে রাজা করে হৃদয়-সিংহাসনে বসাতে পারি, কারো সাধ্য নেই আমাকে অতিক্রম করতে পারে, পরাজিত করতে পারে। আমার প্রভু পরমেশ্বর আমার সংসারের রাজা এ দেখতে পেলেই আমার জীবন সফল। আমাদের সংসার ধর্মের সংসার হোক, পরিবারে পরিবারে তাঁর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হোক। জয় প্রভু জয় রাজা জয় মহারাজা!'

আরো বলছেন: 'যন্ত্রণাভোগ ছাড়া জীবন প্রস্তুত হয় না, দুরন্ত রিপু বশীভূত হয় না, বন্ধু হয়ে ওঠে না। এ যন্ত্রণা অগ্নিপরীক্ষা, যত পোড় খাবে তত বিশুদ্ধ হবে। যন্ত্রণার সময়ও একমাত্র ভগবানের নামই ভরসা। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করবে, কখনো নাম পরিত্যাগ করবে না। নাম ছাড়া সুস্থ হবার উপায় নেই। জ্বলন্ত দাবানলের মধ্য দিয়েই পথ জানবে। কত জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত পাপ, তাকে দগ্ধ করতে অনেক অগ্নির দরকার। এই যন্ত্রণাই তাই যথার্থ মুক্তির হেতু। প্রথমে যন্ত্রণায় শুকিয়ে নীরস হবে। বিষয়রস একবিন্দু থাকতে ব্রহ্মানন্দ আসেনা।'

'প্রভু, আমার পরীক্ষা আসুক, আমি পরীক্ষা চাই। আমি কেবল বলব হরিবোল, হরিবোল। প্রভু, আমার থেকে সব কেড়ে নাও, আমাকে শ্মশানে নিয়ে যাও, আমাকে কটাহে ফেল, আমার অস্থিমাংস ভস্ম হয়ে যাক, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হরিবোল, হরিবোল বলব। কে আমার এমন বন্ধু আছেন, আমাকে শ্মশানে পুড়িয়ে খাঁটি করে তুলুন। দগ্ধ হয়ে প্রাণ খাঁটি হলেই তো পরমেশ্বরকে খাঁটি হয়ে সেবা করতে পারব।'

'দীনবন্ধু, কৃপা করো। এই যে তুমি সম্মুখে বর্তমান, এই বলে একবার তাঁকে প্রণাম করতে পারলেই যথেষ্ট। এই করো প্রভু, যেন তোমাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখে একটি প্রণাম করতে পারি। এই যেন জপ হয়, প্রভু, সুখে-দুঃখে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।'

'যেমন শোণিত আমার সর্বশরীরে প্রবহমান, তেমনি ধর্ম যদি আমার সমস্ত হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার না করে তা হলে শুধু পোশাকীভাবে অন্বেষণ করে কি শান্তি পাওয়া যায়? লোককে দেখাবার জন্যে, লোকের কাছে সাধুভক্ত বলে প্রশংসা নেবার জন্যে যা করি তাতে কি ধর্ম হয়? প্রাণের মধ্যে অন্ধকারে বসে যেন চিন্তা করে দেখি আমার প্রার্থনা কি কবি-কল্পনা, না সত্য? চাই কী? কী অন্বেষণ করি? এই মুহূর্তেই যদি মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, তবে কি বলি, সংসারের কোনো কিছু চাই না, শুধু ঈশ্বরকেই চাই? পরমেশ্বরই সত্য, এ কথা প্রত্যেক কথায় প্রত্যেক ভাবে শরীরে মনে সর্বাঙ্গে সমস্ত জীবনে বলবে। নইলে হস্তপদ স্তব্ধ হোক, জিহ্বা নীরব হোক, পরমেশ্বরের নাম যেন বৃথা উচ্চারণ না করি। যে নামে পাতকীর উদ্ধার হয় সেই নাম যেন সত্যভাবে উচ্চারণ করতে পারি। রসনা যেন সত্যভাবে তাঁকে ডাকতে পারে এই প্রাণের প্রার্থনা।'

'সেই দিন নৌকো করে ঢাকায় আসতে আসতে দেখলাম তিনটি স্ত্রীলোক বুড়িগঙ্গার পারে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে, বাবা গো, পার করো গো। তাদের বাপ অন্য পারে ছিল, তারা ঢাকার পারে দাঁড়িয়ে ওপারে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ডাকছে, বাবা গো পার করো গো। এই শব্দ অনেকবার শুনেছি, কিন্তু সেদিন যেমন শুনলাম তেমনটি আর কখনো

শুনিনি। ভাবলাম এই তো প্রকৃত অবস্থা। যদি ভবসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে এমনি ব্যাকুল হয়ে প্রাণের সঙ্গে 'পার করো' বলে একবার ডাকতে পারি তাহলে কি আর পারে যেতে বিলম্ব হবে? স্ত্রীলোক তিনটি জানে বাপ শুনতে পেলেই তাদের এসে নিয়ে যাবে। আমরা ওদের মতো অমন প্রাণপণে ডাকতে পারছি কই? আমার প্রাণের বস্তু কই? এখনো মোহ আমাকে ভোলায়, প্রলোভন আমাকে বিচলিত করে, এখনো সেই পারের কর্তাকে সর্বসার বলে বুঝতে পারিনি। যদি বুঝতাম তাহলে তাঁকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারতাম না। আমি তো কত সময় তাঁকে ছেড়ে সংসারের বস্তু নিয়ে থাকি। তবে কেমন করে তাঁকে সারাৎসার বলি? যদি বুঝতাম তিনিই আমার গতি, তিনিই আমার মা-বাপ, তাহলে ঠিক বলতাম, বাবা গো পার করো গো। আমি খেতে শুতে পারতাম না। কত দিন কত সময় তাঁকে পাই না, কিন্তু আমোদ-আহ্লাদ করি, প্রাণের প্রাণ হারিয়ে আমি কি পারতাম আমোদ করতে, নিশ্চিন্ত থাকতে? কবে বুঝতে পারব, কবে বলতে পারব প্রাণের সঙ্গে, বাবা গো পার করো গো।'

'আমার এই বাসনা করহে পূরণ
ওহে অনাথনাথ অধমতারণ।
যেদিকে ফিরাই আঁখি সেদিকে তোমাকে দেখি
হৃদয়মন্দিরে সদা দাও দরশন।
না চাহি বিষয়সুখ চাহি তব প্রেমসুখ
তাহলে যাইবে দুঃখ আনন্দে হব মগন॥'

সমাপ্ত

অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

অষ্টম খণ্ড

তথ্যপঞ্জী
ও
গ্রন্থ-পরিচয়

নিরঞ্জন চক্রবর্তী
সম্পাদিত

অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

অষ্টম খণ্ড

রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ড হতে অচিন্ত্যকুমার রচিত জীবনী-সাহিত্য সংযোজিত করা শুরু হয়েছে। তারপর রামকৃষ্ণ-ভক্তদের যে সকল জীবনী তিনি প্রণয়ন করেছেন, সেই সকল গ্রন্থ ক্রমান্বয়ে পরবর্তী তিনটি খণ্ডে সংযোজিত করা হয়েছে। আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের চিহ্নিত ভক্তদের একজন নহেন। তিনি রামকৃষ্ণ-যুগের একজন অনন্যসাধারণ সাধক এবং ভক্ত। ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হবার পরে তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মের একজন আদি প্রাণ-পুরুষ কেশবচন্দ্র সেনের ব্রহ্ম বিষয়ে ধ্যান-ধারণার বিশেষ রূপান্তর ঘটেছিল। বিখ্যাত বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করেও বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন এবং এই নব-ধর্মের আচার্য ও প্রচারকের পদে দীর্ঘ সাতাশ বছর সংযুক্ত থাকেন। পরবর্তীকালে সেই ধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় বৈষ্ণবকুলে শুধু যে ফিরে এলেন তা নয়, বৈষ্ণবগণ তাঁকে সদগুরু বলেই গ্রহণ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও ধর্মালোচনা হয়েছে বটে, তবে সেই সকল সাক্ষাৎ খুব বেশী সংঘটিত হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গেও তাঁর আলাপ বস্তুতপক্ষে খুবই অল্প। তথাপি ঠাকুর-দর্শন ও বিবেকানন্দ-সহযোগে ধর্ম সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণের ধারণাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল সন্দেহ নেই। বস্তুতপক্ষে রামকৃষ্ণ-যুগের পরমপুরুষ, ভক্ত, মনীষী এবং ধর্ম-গুরুগণের যে সকল অমৃতময় জীবনী-সাহিত্য অচিন্ত্যকুমার রচনা করেছেন, তাঁর রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ড হতে অষ্টম খণ্ডের মধ্যে সেই সকলই সংযোজিত হলো। এই সকল গ্রন্থ এবং রচনাবলীর কোন্ কোন্ খণ্ডে সেই সকল সংযোজিত হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

পঞ্চম খণ্ড : 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' (প্রথম দুই খণ্ড)
: 'পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি'
: তথ্যপঞ্জী—'ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের ধর্ম ও সামাজিক বিপ্লবের পশ্চাৎপট'। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিতামৃত' (প্রথম অংশ)।
'শ্রীশ্রীসারদামণি চরিতামৃত' (সম্পূর্ণ)। গ্রন্থ-পরিচয়। ঠাকুর ও শ্রীমায়ের আলেখ্য।

ষষ্ঠ খণ্ড : 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
: 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ'
: তথ্যপঞ্জী পৃথিবীব্যাপী রামকৃষ্ণ-ভক্তবৃন্দের বাণী সংকলন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতবাণী (দেড় শতাধিক)। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিতামৃত' (শেষ অংশ)। গ্রন্থ-পরিচয়। ঠাকুরের আলেখ্য।

সপ্তম খণ্ড : 'ভক্ত বিবেকানন্দ'
: 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' (প্রথম খণ্ড)
: 'রত্নাকর গিরিশচন্দ্র'
: তথ্যপঞ্জী—'গিরিশচরিত'। গ্রন্থপরিচয়। বিবেকানন্দ ও গিরিশের আলেখ্য।

অষ্টম খণ্ড : 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' (পরবর্তী দুই খণ্ড)
: 'জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ'
: তথ্যপঞ্জী—স্বামী বিবেকানন্দ এবং আচার্য বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে। গ্রন্থ পরিচয়। বিবেকানন্দ ও বিজয়কৃষ্ণের আলেখ্য।

'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থখানি চারখণ্ডে সম্পূর্ণ। এই চারখণ্ড রচনাবলীর পঞ্চম এবং ষষ্ঠ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত। সেইজন্য প্রকাশকগণ এই দুটি খণ্ড একসঙ্গে বাঁধাই করেও প্রকাশ করেছেন। 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' গ্রন্থটিও তিনখণ্ডে বিভক্ত এবং এই তিনখণ্ড রচনাবলীর সপ্তম এবং অষ্টম খণ্ডে সংযোজিত হয়েছে। পাঠকগণের সুবিধার্থে প্রকাশকগণ এই সপ্তম এবং অষ্টম খণ্ডও একসংগে বাঁধাই করে প্রকাশ করেছেন।

গ্রন্থ পরিচয় :

১। বীরেশ্বর বিবেকানন্দ। ১ পৃষ্ঠা হতে ৩৪৪ পৃষ্ঠা

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড শ্রাবণ, ১৩৬৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশক এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, কলকাতা। এই খণ্ডটি রচনাবলীর সপ্তম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ভাদ্র. ১৩৬৮ সালে, এবং তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয় বৈশাখ, ১৩৭৬ সালে। প্রথম খণ্ডের প্রকাশক এই দুটি খণ্ডেরও প্রকাশক। এই খণ্ডগুলির পাঠই রচনাবলীতে গ্রহণ করা হয়েছে।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর চিহ্নিত ভক্তদের আগমনবার্তা ধ্যানমার্গে পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন। এই সকল ভক্তদের দক্ষিণেশ্বর আগমনের পূর্বে তিনি মাতৃরূপিণী মৃন্ময়ী-চিন্ময়ী জগদম্বাকে কেঁদে কেঁদে বলতেন, 'মা, ভক্তদের জন্য আমার প্রাণ যায়, তাদের শীঘ্র আমায় এনে দে। সাধ ছিল, মাকে বলেছিলুম, মা, ভক্তের রাজা হব। আবার মনে উঠল, যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে, তার এখানে আসতেই হবে—আসতেই হবে। যখন আরতি হত, কুঠীর উপর থেকে চীৎকার করতুম, ওরে, কে কোথায় ভক্ত আছিস্ আয়। ঐহিক লোকদের সংগে আমার প্রাণ যায়। তাদের সব দেখবার জন্য প্রাণের ভিতরটা তখন এমন করে উঠত, এমন ভাবে মোচড় দিত যে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়তুম। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হত। তারপর কিছুদিন বাদে সব একে একে আসতে সুরু করল। আর আগে (ভাবে) দেখেছিলুম বলে, তারা যেমন যেমন আসতে লাগল অমনি চিনতে পারলুম।' (কথামৃত ৪।২৫১)।

স্বামী বিবেকানন্দের আগমনবার্তা সমাধিস্থ হয়ে পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণ জেনেছিলেন। এই বিষয়ে তিনি নিজেই বলেন, 'একদিন দেখেছি—মন সমাধিতে জ্যোতির্ময় পথে উঁচুতে উঠে যাচ্ছে। চন্দ্র, সূর্য, তারা—এসব ছাড়িয়ে মন প্রথমে সহজেই সূক্ষ্ম ভাবজগতে প্রবেশ করল। তারপর সে রাজ্যে মন যতই উঁচু থেকে উঁচুতে উঠতে লাগল, ততই নানা দেবদেবীর ভাবে-গড়া মূর্তি পথের দুপাশে রয়েছে দেখতে পেলুম। ক্রমে সে রাজ্যের একেবারে শেষ সীমায় মন এসে হাজির হল। সেখানে দেখলুম যেন এক জ্যোতির বেড়া খণ্ড আর অখণ্ডের জগতকে আলাদা করে রেখেছে। সেই বেড়া ডিঙিয়ে মন ক্রমে অখণ্ডের রাজ্যে গিয়ে ঢুকল। দেখলুম সেখানে সাকার কোন কিছুই নাই, দিব্যদেহী দেবদেবীরা পর্যন্ত এখানে আসতে যেন ভীত। তাই অনেক দূরে নীচে নিজ নিজ অধিকার বিস্তার করে রয়েছে। কিন্তু একটু পরেই দেখতে পেলুম জ্যোতির্ময় দেহধারী

সাতজন প্রবীণ ঋষি সেখানে সমাধি অবস্থায় বসে আছেন। বুদ্ধিমে, জ্ঞানে-পুণ্যে, ত্যাগে-প্রেমে এঁরা মানুষ তো দূরের কথা দেবদেবীদের অবধি ছাড়িয়ে গেছেন। অবাক হয়ে এঁদের মহত্ত্বের কথা চিন্তা করছি, এমনি সময়ে দেখি, চোখের সামনে অখণ্ডের ঘরের জ্যোতির্মণ্ডলের খানিকটা অংশ ঘন হয়ে এক দেবশিশুর আকার ধারণ করল। ওই দেব-শিশু ঋষিদের মধ্যে একজনের কাছে নেমে এসে নিজের কোমল হাত দুটি দিয়ে তাঁর গলা ভালবেসে জড়িয়ে ধরল, পরে অতি মধুর কথায় আদর করে তাঁকে সমাধি থেকে জাগাবার চেষ্টা করতে লাগল। সেই কোমল হাতের ছোঁয়ায় ঋষি সমাধি থেকে জেগে উঠলেন। তারপর ঢুলুঢুলু চোখে একদৃষ্টে সেই আশ্চর্য শিশুকে দেখতে লাগলেন। তাঁর মুখে আনন্দের ভাব দেখে মনে হল শিশু যেন তাঁর বহুকালের চেনা প্রাণের জিনিষ। অদ্ভুত দেবশিশু তখন খুব আনন্দ করে তাঁকে বলতে লাগল, 'আমি যাচ্ছি, তোমায় আমার সঙ্গে যেতে হবে।' ঋষি তার অনুরোধে কোনো কথা না বললেও চোখের ভাব থেকেই তার মনের ইচ্ছা বোঝা গেল। পরে অমনি প্রেমদৃষ্টিতে শিশুকে দেখতে দেখতে আবার সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। তখন অবাক হয়ে দেখি, তারই শরীর মনের এক অংশ উজ্জ্বল জ্যোতির আকার নিয়ে বিলোম পথে পৃথিবীতে নেমে আসছে। নরেন্দ্রকে দেখেই বুঝেছিলুম, এ সেই ঋষি।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ ৫ ১০৯)।

রোমাঁ রোলাঁ লিখিত The Life of Ramkrishna বইতেও এই বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত সন্ন্যাস জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালের এই বীরেশ্বর বিপ্লবী চিন্তানায়কের সম্বন্ধে, তাঁর ধর্মমত, চিন্তাধারা, বিস্ময়কর ধীশক্তি এবং কর্মধারার বিষয়ে দেশে এবং বিদেশে বিশিষ্ট জ্ঞানী ও গুণিগণ প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন। সুতরাং সেই সকল বিষয়ে এবং তাঁর জীবনী বিষয়ে এখানে অতিরিক্ত আলোচনার প্রয়োজন নেই। শুধু নরেন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দ-জীবনের কয়েকটি বিশেষ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো—

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ—নরেন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষের বাসস্থান ছিল বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত কালনা মহকুমার ডেরেটোনা গ্রামে। ইংরেজ আমলের প্রথম যুগে এই দত্ত পরিবারের রামমোহন দত্ত কলকাতার সিমুলিয়া অঞ্চলে ৩নং গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটে বাড়ি তৈরি করে বসবাস করতে থাকেন। রামমোহন দত্তের প্রথম পুত্র দুর্গাপ্রসাদ (দুর্গাচরণ ?)। তাঁর প্রথমা কন্যার শিশুকালে সাত বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। তাঁর একমাত্র পুত্র বিশ্বনাথ দত্ত। দুর্গাপ্রসাদ মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেন।

বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন স্বনামধন্য এটর্নি, এবং তৎকালীন কলকাতাবাসীদের মধ্যে একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। বিশ্বনাথ দত্তর সাধ্বী স্ত্রী ভুবনেশ্বরী দেবীর গর্ভে দশটি পুত্রকন্যার জন্ম হয়। প্রথম পুত্র এবং প্রথমা কন্যাটির (দ্বিতীয় সন্তান) শৈশবেই মৃত্যু হয়। তারপরে হরমোহিনী ও স্বর্ণময়ী এই দুইটি কন্যার জন্ম হয়। তার পরের সন্তান কন্যাটিরও শৈশবেই মৃত্যু হয়। তার পরের সন্তানটিই নরেন্দ্রনাথ। ১২ই জানুয়ারি, ১৮৬৩ সনে, সোমবার ভোর ৬টা ৪৯ মিনিটে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। স্বামী গম্ভীরানন্দের 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে নরেন্দ্রনাথের যে জন্মকুণ্ডলী রয়েছে সেইটি পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হলো—

১৮৬৯—নরেন্দ্রনাথের পরেও বিশ্বনাথের আরো চারিটি সন্তানের জন্ম হয়—তাঁহারা যথাক্রমে কিরণবালা, যোগেন্দ্রবালা, মহেন্দ্রনাথ এবং ভুপেন্দ্রনাথ। ১৮৬৯ সনে পাঠশালায় নরেন্দ্রনাথের প্রথম বিদ্যারম্ভ হয়।

১৮৮১—নরেন্দ্রনাথ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতি শৈশব হতেই তাঁর মনে সাধু-সন্ন্যাসী হবার ইচ্ছা জেগেছিল। এই বিষয়ে শৈশবের অনেক ঘটনাই নরেন্দ্রনাথের বিভিন্ন জীবনীতে উল্লেখ রয়েছে। স্কুলের পাঠ শেষ হবার পরে তিনি প্রথমে প্রেসিডেন্সী কলেজে এবং পরে কলেজ বদল করে জেনারেল্ এ্যাসেম্‌ব্লিস্ ইন্‌স্টিটিউশনে (বর্তমানে স্কটিশ্ চার্চ কলেজ) ভর্তি হলেন। ১৮৮১ সনের কথা। অধ্যক্ষ অধ্যাপক হেষ্টি ইংরেজি ক্লাশে ওয়ার্ড‌স্‌ওয়ার্থের The Excursion কবিতাটি ব্যাখ্যা করে পড়াতে পড়াতে বললেন: 'Such an experience is the result of purity of mind and concentration on some particular object, and it is rare indeed, particularly in these days. I have seen only one person who has experienced that blessed state of mind, and he is Ramkrishna Paramahamsa of Dakshineswar. You can understand if you go there and see for yourself.'

অনেক ছাত্রের মধ্যে নরেন্দ্রনাথও অধ্যাপক হেষ্টির কাছে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের কথা শুনেছিলেন। কিন্তু, তখনকার মতো রামকৃষ্ণ তাঁর মনে তেমন রেখাপাত করে যেতে পারেননি। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে তখন এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে। পরবর্তী-কালে এই সময়ের মানসিক অবস্থার কথা স্বামী সারদানন্দকে বলেছেন: 'যৌবনে পদার্পণ করিয়া পর্যন্ত প্রতিরাত্রে শয়ন করিলেই দুইটি কল্পনা আমার চক্ষের সম্মুখে

ফুটিয়া উঠিত। একটিতে দেখিতাম যেন আমার অশেষ ধন-জন-সম্পদ-ঐশ্বর্যাদি লাভ হইয়াছে, সংসারে যাহাদের বড়লোক বলে তাহাদিগের শীর্ষস্থানে যেন আরূঢ় হইয়া রহিয়াছি, মনে হইত ঐরূপ হইবার শক্তি আমাতে সত্যসত্যই রহিয়াছে। আবার পরক্ষণে দেখিতাম, আমি যেন পৃথিবীর সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া একমাত্র ঈশ্বরেচ্ছায় নির্ভরপূর্বক কৌপীনধারণ, যদৃচ্ছালব্ধ ভোজন, এবং বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করিয়া কাল কাটাইতেছি। মনে হইত, ইচ্ছা করিলে আমি ঐভাবে ঋষিমুনিদের ন্যায় জীবনযাপনে সমর্থ। ঐরূপে দুই প্রকারে জীবন নিয়মিত করিবার ছবি কল্পনায় উদিত হইয়া পরিশেষে শেষোক্তটিই হৃদয় অধিকার করিয়া বসিত। ভাবিতাম, ঐরূপেই মানব পরমানন্দ লাভ করিতে পারে, আমি ঐরূপ করিব। তখন ঐপ্রকার জীবনের সুখ ভাবিতে ভাবিতে ঈশ্বরচিন্তায় মন নিমগ্ন হইত এবং ঘুমাইয়া পড়িতাম।' (যুগনায়ক ১।৬১)।

এই সময়ে বাংলাদেশে ধর্ম ও সামাজিক বিপ্লবের পশ্চাৎপট বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডের তথ্যপঞ্জীতে। অতএব এখানে পুনরায় সে বিষয়ে আর উল্লেখ করা হলো না। আগ্রহী পাঠকগণের জন্য পঞ্চম খণ্ডের তথ্যপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

হিন্দু সমাজের 'কুসংস্কার'-মুক্ত নূতন ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তৎকালে অনেক যুবকই আকৃষ্ট। নরেন্দ্রনাথও ব্রাহ্মসমাজে গমনাগমন আরম্ভ করেন এবং বস্তুতপক্ষে সমাজে নিজের নাম ভুক্ত করেন। তাঁর অনেক ও অশেষ গুণের মধ্যে একটি বিশেষ গুণ ছিল যে, তিনি সুললিত সংগীতজ্ঞ। প্রবেশিকা শ্রেণীর ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি বেণী ওস্তাদের কাছে খেয়াল সংগীত শিক্ষালাভ করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা সভায় সংগীতের জন্য সর্বদাই তাঁর আহ্বান আসত। এই সূত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় এবং জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও তাঁর সর্বদাই যাতায়াত ছিল। তিনি দীপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠী ছিলেন। এই যোগাযোগের ফলে সংগীতজ্ঞ যদুভট্টের নিকট ধ্রুপদাঙ্গ গান শিখবার সুযোগও তাঁর হয়েছিল।

মহর্ষির সান্নিধ্যগুণে নরেন্দ্রনাথের ধ্যানপ্রবণতা অশেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁকে লক্ষ্য করে একদিন দেবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'তোমাতে যোগীর লক্ষণ সকল প্রকাশিত আছে; তুমি ধ্যানাভ্যাস করলে যোগশাস্ত্রনির্দিষ্ট ফল সকল শীঘ্রই প্রত্যক্ষ করবে।' এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা তীব্রতর রূপ ধারণ করেছে। তিনি এবং কয়েকজন আগ্রহশীল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট ধ্যানাভ্যাস শিক্ষা করতেন এবং ধ্যানান্তে মহর্ষি জানতে চাইতেন, কার কিরূপ অনুভূতি হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করতেন, 'যেন একটা জ্যোতির্বিন্দু ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে ভ্রূযুগল-মধ্যে স্থির হইয়া দাঁড়ায়। তারপর ঐ বিন্দু হইতে বিচিত্র বর্ণের অসংখ্য উজ্জ্বল রশ্মি চতুর্দিকে বিকীরিত হয়। ক্রমে তাঁহার চেতনা সসীমের গণ্ডী ছাড়াইয়া এক অসীমের দিকে প্রসারিত হয়; কিন্তু ঠিক এখানে আসিলেই ধ্যান ভাঙ্গিয়া যায়, আর সেই আলোকোদ্ভাসিত বিবিধ বর্ণ অন্তর্হিত হয়।' (যুগনায়ক ১।৯৩)। নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বর যখন সত্য, তখন তিনি শুধু তর্কযুক্তির অনিশ্চিত ভূমিতে আবদ্ধ না থেকে সাধক হৃদয়ে অবশ্য প্রত্যক্ষানুভূতি অবলম্বনে আবির্ভূত হবেন। কিন্তু গভীর ধ্যানের মধ্যেও ঈশ্বর-দর্শন না হওয়ায় তাঁর প্রাণের পিপাসা মিটে না। একদা নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ উপাসনামগ্ন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হয়ে এক অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন, 'মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বর-দর্শন করেছেন?' মহর্ষি এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি।

অতঃপর আরো অনেক ধর্মগুরুর নিকট তিনি একই প্রশ্ন করে কোন সদুত্তর না পেয়ে নিরাশ এবং হতাশ হলেন।

এই সময়ে নরেন্দ্রনাথ এফ. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এই সময়েই তাঁর জীবনে এলো সেই পরমশুভ লগ্ন। তাঁর বাড়ির নিকটেই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ি। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি তাঁর গৃহে ঠাকুরকে আহ্বান জানালেন। ঠাকুরের আগম উপলক্ষে মিত্র মহাশয়ের বাড়িতে এক উৎসবের আয়োজন করা হলো। পল্লীর সুকণ্ঠ-গায়ক নরেন্দ্রনাথের ডাক পড়ল শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শোনাবার জন্য। নরেন্দ্রনাথ এলেন এবং এই মিত্র-বাড়িতেই তাঁর প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন-লাভ ঘটে। তিনি ঐদিন ঠাকুরকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য-রচিত দুখানি গান শোনালেন 'মন চল নিজ নিকেতনে' এবং 'যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়া'। এই সময়ের বিস্তৃত বিবরণের জন্য রচনাবলীর ষষ্ঠ-খণ্ডের তথ্যপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অনেক ধর্মাচার্য-গণের নিকট নরেন্দ্রনাথের একটি বড় প্রশ্ন ছিল, তাঁরা কি কেউ ঈশ্বরদর্শন করেছেন? অবশ্য কেউই এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি। একদা ঠাকুর রামকৃষ্ণকেও তিনি একই প্রশ্ন করলেন, "মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করেছেন?' রামকৃষ্ণও তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "হাঁ, আমি ঈশ্বরদর্শন করেছি, ঠিক যেমন তোমাদের দেখছি, তবে এর চেয়েও আরো ঘনিষ্ঠরূপে।" উত্তর শুনে নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত। পরবর্তীকালে এই বিষয়ে একদা স্বামী সারদানন্দকে তিনি বলেছিলেন, "উহাতে (অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন বিষয়ে স্বীকারোক্তিতে) তখনই আমার প্রত্যয় জন্মিল। মনে হইল, তিনি অপর ধর্মপ্রচারক সকলের রূপক বা কল্পনার সাহায্য লইয়া এরূপ কথা বলিতেছেন না। সত্যসত্যই সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া এবং সম্পূর্ণ মনে ঈশ্বরকে ডাকিয়া যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে প্রথম দর্শনের পর থেকেই কিন্তু চিনতে পেরেছিলেন এবং জেনেছিলেন যে এঁকে দিয়েই তাঁর 'শিবজ্ঞানে জীব-সেবার' মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হবে। ঠাকুর কখনই চাননি যে নরেন্দ্রনাথ অধ্যাত্ম সাধনার নির্বিকল্পভূমিতে পৌঁছে জগতের অন্যান্য ধর্মগুরুদের মতো আর একটি ধর্মমত প্রচার করুক। ঠাকুর কিভাবে নরেন্দ্রনাথকে তৈরি করেছিলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যই বা কি ছিল, সে বিষয় দু-চারটি কথা বলা যেতে পারে, অবশ্য স্বল্পপরিসর জায়গা হেতু সংক্ষেপেই সে কথা বলা হবে।

ছেলেবেলাতে নরেন্দ্রনাথের মাঝে মাঝে দিব্যদৃষ্টি (ক্লেয়ারভয়ান্স) হতো। এই বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন, 'ছেলেবেলা থেকেই সময়ে সময়ে কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা স্থান দেখে মনে হত, ওসব আমি পূর্বে কোথাও দেখেছি, কিন্তু চেষ্টা করেও স্মরণে আনতে পারতাম না।......এখন মনে হয়, এই জন্মে আমার যে সকল লোক বা বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে, তা জন্মাবার পূর্বে চিত্রপরম্পরায় আমি কোনরূপে দেখতে পেয়েছিলাম এবং জন্মাবার পরে তারই স্মৃতি সময়ে সময়ে অমার মনে উদয় হয়ে থাকে।'

পরবর্তীকালে ছাত্রজীবনেও বহুবার তিনি এই প্রকার দিব্যভাবে অভিভূত হয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক উদ্বুদ্ধ হয়ে নরেন্দ্রনাথ গভীরভাবে ধ্যান অভ্যাসে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। অনেক সময়ে ধ্যানকালে তাঁর সময় ও শরীরের জ্ঞান সম্পূর্ণ তিরোহিত হতো।......(ধ্যানান্তে) একদা 'অকস্মাৎ দেখিলেন দিব্যজ্যোতিতে ঘর পূর্ণ

হইয়া গেল এবং এক অপূর্ব সন্ন্যাসী দক্ষিণ প্রাচীর ভেদ করিয়া আসিয়া কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার পরিধানে গৈরিক বসন, হস্তে কমণ্ডলু, মুখমণ্ডল প্রশান্ত, সর্ববিষয়ে উদাসীনতাবশতঃ একটা অন্তর্মুখীনভাব। নরেন্দ্র অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন ও সেই সৌম্যমূর্তি যেন কিছু বলিবার জন্য ধীর পদক্ষেপে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নরেন্দ্র হঠাৎ ভয়ত্রস্ত হৃদয়ে উঠিয়া দ্বার অর্গলমুক্ত করিলেন এবং দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেলেন।' 'বিশ্ববিবেক' ১/৭৫)

এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু নির্বিকল্প সমাধি লাভের পরে অন্যকথা ভাবছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তিনি 'ভক্তের রাজা' হতে চেয়েছিলেন—তাই সেই অনাগতদের আকুল প্রাণে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। তিনি কি তাঁদের শিষ্য করতে চেয়েছিলেন? না। বস্তুতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ কাউকেই তাঁর মন্ত্রশিষ্য করেন নি। তাঁর ঘনিষ্ঠ ভক্তদের মধ্যে মাত্র বারোজনকে তিনি গেরুয়া-বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা প্রদান করেছিলেন। এই বিষয়ে ষষ্ঠখণ্ডের তথ্যপঞ্জীতে 'শ্রীরামকৃষ্ণ চরিতামৃত' দ্রষ্টব্য।

লীলাসম্বরণের কিছু আগে থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে এক অসাধারণ পরিবর্তন এসেছিল। তিনি আধ্যাত্মিক ধর্মের সংগে লৌকিক ধর্মের সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। তাঁর লীলাসম্বরণের কিছু পূর্বের এক বাণীতে পাই : "ভক্ত তোমরা, তোমাদের বলতে কি, আজকাল ঈশ্বরের চিন্ময় রূপ দর্শন হয় না। এখন সাকার নররূপ এইটে বলে দিচ্ছে। আমার স্বভাব ঈশ্বরের রূপ দর্শন-স্পর্শন-আলিংগন করা। এখন বলে দিচ্ছে, তুমি দেহ ধারণ করেছ, সাকার নররূপে লয়ে আনন্দ কর। তিনি তো সকল ভূতেই আছেন, তবে মানুষের ভিতর বেশী প্রকাশ। মানুষ কি কম গা? ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে, অনন্তকে চিন্তা করতে পারে, অন্য জীব জন্তু পারে না। অন্য জীবজন্তুর ভিতরে, গাছপালার ভিতরে, আবার সর্বভূতে তিনি আছেন, কিন্তু মানুষে বেশী প্রকাশ।'

এই পরিবর্তনও কিন্তু তাঁর নিজের ইচ্ছায় হয়নি। তিনি তাঁর লীলাসম্বরণের পরে এমন একটি সংঘগঠনের কথা হয়তো ভেবেছিলেন, যাহার আত্মত্যাগী সন্ন্যাসীগণ আধ্যাত্মিক ধর্মাচরণের সংগে 'জীবকে শিব ভেবে' সেবা করবে। এই প্রসঙ্গে স্বামী গম্ভীরানন্দ 'বিশ্ববিবেক' গ্রন্থে লিখেছেন : 'আমরা যে অর্থে সঙ্ঘগঠনের উল্লেখ করিয়া থাকি তিনি সেই অর্থে কিছু করিয়াছিলেন বলিয়া অকাট্য প্রমাণ আছে কি?......কেন না অবতার পুরুষ কখনও মানবীয় মতিগতি লইয়া অহঙ্কারপূর্বক কার্যে ব্রতী হন না। ......তবে ইহাও স্বীকার্য যে, জগদম্বারই অচিন্ত্য বিধানে শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহমন নবীন যুগের বাণী ও কার্যধারা মূর্তপরিগ্রহ করিতেছিল এবং লোকদৃষ্টিতে বলা চলে যে, ঠাকুরের উৎসাহ, উদ্দীপনা, ইঙ্গিত ও কার্যাবলীর ফলস্বরূপে তাঁহার ভক্তসংঘ গড়িয়া উঠিতেছিল। নির্বিকল্প সমাধিলাভের পর জগদম্বা তাঁহাকে জগৎকল্যাণ সাধনার্থ ভাবমুখে থাকিতে বলিয়াছিলেন।' (তদেব ১/১৯৬)

ইতিমধ্যে অনেক ঘটনাই ঘটে গেল, যার বিবরণ বিভিন্ন পুস্তকে এবং রচনাবলীর পঞ্চম হতে সপ্তম খণ্ডের তথ্যপঞ্জীতে পাওয়া যাবে। ৩১ শে শ্রাবণ, ১২৯৩ (১৬ই আগষ্ট, ১৮৮৬/রাত্রি ১ টা ২ মিনিট) শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারলীলা সম্বরণ করলেন। নরেন্দ্রনাথের শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনলাভ ঘটে প্রথম নভেম্বর ১৮৮১ সনে। তারপর মাত্র পাঁচ বছর ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে একটি তরুণ জীবনে কী অসাধারণ পরিবর্তন ঘটেছিল তা সর্বজনবিদিত।

তারপরে ঠাকুরের সেই ইচ্ছা ও আদেশ বহু বাধা, বিঘ্ন এবং দুর্যোগের ভিতর দিয়ে কার্যকরী হতে শুরু হলো। সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের আনুকূল্যে সংসারত্যাগী ঠাকুরের কয়েকটি ভক্ত প্রায় কপর্দকশূন্য হস্তে এসে উঠলেন বরাহনগরের মনুষ্য-বসবাসের একেবারে অযোগ্য এক ভাংগা বাগানবাড়িতে। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিবেকানন্দ, শিবানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, প্রেমানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, সারদানন্দ, অভেদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি। কোনদিন এঁদের আহারও জুটত না, এমনকি কৃচ্ছ্রসাধিত সন্ন্যাসজীবনের সামান্যতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যও প্রায়ই জুটত না। তবু এই তরুণ নব-সন্ন্যাসীদের গুরু-আদিষ্ট ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার উদ্যোগপর্বে এতটুকু ভাটা পড়েনি।

বিভিন্ন গ্রন্থে এই সময়ের স্মৃতিচারণের উদ্ধৃতি দিয়ে এবং যে সকল ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ তিনি শুনেছিলেন, সেই সকল সূত্র ধরে 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে স্বামী গম্ভীরানন্দ বরাহনগরে অবস্থিত এই প্রাথমিক 'রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ' সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করেছেন: "দানাদের (নবীন সন্ন্যাসীদের) ঘর কখন-কখনও জমজমাট হইত দেশ-বিদেশের নানা চিন্তাধারায়—আলোচনা, বিশ্লেষণ, গ্রহণ, বর্জন, তুলনা ইত্যাদিতে। ক্যান্ট, হেগেল, স্পেন্সার ইত্যাদি দার্শনিকগণ, এমন কি নাস্তিক, জড়বাদী ও অজ্ঞেয়-বাদীরাও এই বাদানুবাদ হইতে বাদ পরিতেন না। গীতা, উপনিষদ, তন্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ মতবাদ, বৈষ্ণবমত, শৈবমত ইত্যাদি বহু বিষয় এই আসরে আলোচনা-প্রসংগে আসিয়া পড়িত। বস্তুতঃ সেই গৃহখানি যেন এক শিক্ষাকেন্দ্রে বা মহাবিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। আর এই কেন্দ্রের মধ্যমণি ছিলেন নরেন্দ্রনাথ।······ সর্বশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা আসিয়া পড়িত। এইসব আলোচনা প্রসংগে নিত্য নূতন চিন্তাধারায় ও আধুনিক গবেষণায় প্রবেশ করিয়া নরেন্দ্রনাথ দেখাইয়া দিতেন, সমস্ত ক্ষেত্রেই ঠাকুরের জীবন ও বাণী কিরূপ অদ্ভুত আলোকসম্পাত করিয়াছে।······হীনযান মহাযান সম্প্রদায়দ্বয়ের নবপ্রকাশিত বহু গ্রন্থ সে পাঠাগারে পঠিত ও আলোচিত হইত। ······পরেই আবার যীশুখ্রীষ্ট তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিলেন।······নরেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে ভারতীয় ইতিহাস বা সমাজ ব্যবস্থার আলোচনায় মাতিয়া উঠিতেন। ভারতীয় ঐক্য কোথায়। শ্রীরামচন্দ্র হইতে সম্রাট আকবর পর্যন্ত ভারতসন্তানগণ কিভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির পুষ্টিসাধন করিয়াছেন ইত্যাদি বিষয়ের বিচারে তিনি দিনের পর দিন বিরত থাকিতেন। বিদেশের ইতিহাস—যথা গিবনের রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতনের কাহিনী, কার্লাইলের ফরাসী-বিপ্লবের ইতিবৃত্ত······জোয়ান অব আর্ক-এর জীবনী······আবার ভারতীয় বীরাংগনা ঝাঁসীর রাণী—তাঁহার নিকট প্রচুর সম্মান পাইতেন।······

"সন্ন্যাসীদের কর্মশীলতা শুধু পঠন-পাঠন, তর্ক-সমালোচনাতেই নিবদ্ধ ছিল না। আর একটি জিনিসের অঙ্কুর এখন হইতে দেখা দিয়াছিল—সেটা হইতেছে সেবাধর্ম।··· তখনও স্বামীজীর উপদেশে এই সকল সন্ন্যাসীরা নিজেরা না খাইয়াও ক্ষুৎকাতর দরিদ্র ও অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গকে আহার করাইতেন···তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এমন কি কুষ্ঠ-রোগীর পর্যন্ত শুশ্রূষা করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না।"···

"···দুঃখ, দারিদ্র্য, অপমান, অত্যাচার, অনাহার, রোগযন্ত্রণা ইত্যাদি সত্ত্বেও মঠ-বাসীরা সেসব দিনে যে আধ্যাত্মিকতার স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল···তাঁহাদের সে কৃচ্ছ্র-সাধনও রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে···ঠাকুরের ভাবরাশি সমাজের

বিস্তৃততর ক্ষেত্রে মূর্তিপরিগ্রহের পূর্বে যে পরিবেশ মধ্যে ঐকান্তিকভাবে লালিত-পালিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল, নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তাহা বরাহনগর-মঠে পূর্ণমাত্রয় সৃষ্ট হইয়াছিল।…শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও সাধনা যেমন ছিল দিগন্ত-প্রসারী, ইঁহাদেরও প্রস্ফুতির ক্ষেত্র ছিল তেমনি সুবিশাল-প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সর্বদেশের চিন্তাজগতে পরিব্যাপ্ত। তাঁহারা যেন তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন শুধু ভারতের জন্য নহে বিশ্বমানবের জন্য।" ('যুগনায়ক'/১/২৩১)।

১৮৮৮ সনের জানুয়ারী মাসে নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসগ্রহণ করে স্বামী বিবিদিষানন্দ নাম গ্রহণ করেন। ১৮৮৮ সনের মাঝামাঝি পর্যন্ত বরাহনগর মঠে প্রস্তুতিপর্ব চলে। এই সময়ে নরেন্দ্রনাথ বড় একটা বাইরে যেতেন না। দারুণ রোগভোগের পরে স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য তিনি একবার শিমুলতলায় গিয়েছিলেন। ঐ বছর আগস্ট মাসে কোন কোন গুরু-ভ্রাতাদের সংগে তিনি ভারত পর্যটনে বের হন। পরে ১৮৯০ সনে তিনি একাকী উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় পর্যটন করেন। আত্মগোপনের জন্য এই সময়ে তিনি বিভিন্ন নাম গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দ নামটিই তিনি শেষবারের মতো গ্রহণ করেন।

এই পরিব্রাজন সময়ে তিনি ইংরেজ শাসনে যে ক্ষুধিত, দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্থ, ভারত-বর্ষকে দেখলেন, তাতে প্রজ্বলিত হলো তাঁর হৃদয় চেতনা। তিনি দেখলেন, 'একটি সহিষ্ণু জাতির উপর কঠিনতম নিষ্ঠুরতা ও উৎপীড়ন'। তিনি ভাবলেন, 'শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি ভিন্ন' এই দারিদ্র্য হতে মুক্তি নেই। তখন হতেই তাঁর মনে বিদেশে যাবার প্রবল ইচ্ছা জাগে। হিন্দুধর্ম ও তার সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে স্বামীজীর অন্ত-দৃষ্টিতে মুগ্ধ হয়ে ১৮৯০ সনের প্রথম দিকে গাজিপুরের জেলা জজ্ মিঃ পেনিংটনই বোধ হয় প্রথম স্বামীজীকে বিদেশে গিয়ে তাঁর ভাবধারা প্রচার করতে উৎসাহিত করেন। ক্রমশই স্বামীজীর মনে বিদেশ গমনের ইচ্ছা প্রবল হয় এবং সেই সুযোগও উপস্থিত হয়।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চতুঃশতবার্ষিক উদযাপন উপলক্ষে চিকাগো শহরে এক বিরাট বিশ্বমেলার উদ্বোধন হয় ১লা মে ১৮৯৩ সনে। এই বিশ্বমেলার একটি অংগ বিশ্ব-ধর্মমহাসভা। এই ধর্মমহাসভার মৌল উদ্দেশ্য ছিলো "তুলনামূলক ধর্মা-লোচনা…বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ঘনীভূত করা; প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব বৈশিষ্টকে আবিষ্কার করা; মানুষ কেন ঈশ্বরে এবং উত্তরজীবনে বিশ্বাস করে তা দেখানো, খ্রীস্টান ও অন্য জাতিগুলির মধ্যে, বিশেষতঃ ধর্মভিত্তিক জাতিগুলির মধ্যে যে বিরাট ব্যবধানের গহ্বর রয়েছে, তার উপর সেতুনির্মাণ করা, মানুষকে তার সাধারণ লক্ষ্যে পেঁছে দেবার ব্রত গ্রহণের জন্য সৎ মানুষকে প্রণোদিত করা, এবং আন্তর্জাতিক শান্তির পথ প্রশস্ত করা।"

এই ধর্মমহাসভার সংবাদ ভারতবর্ষের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হবার পরে এক মহা আলোড়নের সৃষ্টি হয়। মাদ্রাজের তৎকালীন শিক্ষাবিদ্ ডঃ হেনরি মিলার, 'হিন্দু' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক সুব্রহ্মণ্য আয়ার, কলকাতা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ধর্মমহাসভার উপদেষ্টামন্ডলীর সভ্য ছিলেন। মহাবোধি সোসাইটির অনাগরিক ধর্মপালও উক্ত সভার সঙ্গে বিশেষ যুক্ত ছিলেন। এই ধর্মমহাসভার বিশেষ বিবরণের জন্য অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' ও অন্যান্য গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী এবং হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের এই সুযোগ স্বামীজীকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করল। উক্ত ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ হতেই তাঁর আমেরিকাগমনের অর্থ সংগৃহীত হতে লাগল। মাদ্রাজের শিক্ষক আলাসিংগা পেরুমল জনসাধারণের নিকট হতে চাঁদা তুললেন। স্বামীজীর শিষ্য এবং ভক্তদের মধ্যে খেতড়ির মহারাজা, রামনাদ ও মহীশূরের মহারাজা এবং আরো অনেকে তাঁকে ধর্মমহাসভা উপলক্ষে আমেরিকা যাবার জন্য অনুরোধ করেন, অর্থসাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দেন। উক্ত সভা আরম্ভ হয় ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ এবং শেষ হয় ২৭ সেপ্টেম্বর। অবশেষে ৩১ মে, ১৮৯৩ সনে স্বামীজী বম্বে হতে 'পেনিনসুলার' জাহাজে আমেরিকা যাত্রা করেন।

চিকাগো ধর্মমহাসভার ইতিহাস, সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ভূমিকা, আমেরিকায় তাঁর গভীর প্রতিষ্ঠা, অগণিত ভক্তবৃন্দ ইত্যাদি বিষয়ের অপূর্ব ইতিহাস ও তথ্যপঞ্জী অচিন্ত্যকুমার তাঁর অমর লেখনীতে 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দে' গ্রথিত করেছেন। সেই সকল বিষয় পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ 'যত মত তত পথ' বলে সর্বধর্মের সমন্বয় করেছিলেন, মানুষের মধ্যেই ব্রহ্ম লক্ষ্য করে বলেছিলেন 'তত্ত্বমসী'—শিবজ্ঞানে তাদের সেবা করলেই ব্রহ্মের সেবা। বিরেশ্বর বীবেকানন্দ সেই ভাবধারাই প্রতিফলিত করলেন চিকাগো ধর্মমহাসভায়। সেই প্রতিধ্বনির কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হলো। সেই ধর্মমহাসভায় তিনি ঘোষণা করলেন :

. "Children of immortal bliss···the Hindu refuses to call you sinners. Ye are the Children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings. Ye divinities on earth···It is sin to call a man so ; it is a standing libel on human nature···You are souls immortal, spirits free, blessed and eternal···Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often with human blood, destroyed civilization and set whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now···If anybody dreams of the exclusive survival of his own religion and the destruction of the others, I pity him from the bottom of my heart, and point out to him that upon the banner of every religion will soon be written inspite of resistance : "Help and not fight", "Assimilation and not Destruction", and "Harmony and peace and not Dissension".

আমেরিকা জয়ের পরে ইংলণ্ড। ১৮৯৬ সনের মে মাসে লণ্ডনে। ভারত তখন দোর্দণ্ড বৃটিশ শাসনের অধীনে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতায় ও আন্তরিকতায় ইংলণ্ড জয় করতেও স্বামীজীর বেশি সময় লাগল না। বীরেশ্বরের সেই ইতিহাস অচিন্ত্যকুমার তাঁর অসাধারণ লেখনীতে বিবৃত করেছেন। এই ভাবে প্রায় অর্ধেক পৃথিবী জয় করে স্বামীজী ভারতে ফিরলেন ১৮৯৭ সনের জানুয়ারী মাসে। বিবেকানন্দের জীবনের পরবর্তী ঘটনাগুলো রচনাবলীতে বিশেষভাবে বিবৃত হয়েছে।

পৃথিবীতে যে সকল মহামনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন, সন্দেহ নেই স্বামীজী তাঁদের অন্যতম। ধর্মগুরুদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে নিজধর্মপ্রচার এবং শিষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ জীবনের ভাব ছিল অন্যপ্রকার। সে কথা পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী শুধু যে ঠাকুরের আশাই পূরণ করেছিলেন তা নয়, তাঁর অবদান তার চেয়েও অনেক বিস্তৃত। ধর্মচিন্তা, ইতিহাসচেতনা, রাষ্ট্রচেতনা, অর্থনৈতিক চিন্তাধারা, নারীজাগরণ, শিক্ষাচিন্তা, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানচেতনা, এমনকি সংগীত ভাবনা বিষয়েও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও গভীর অনুরাগ বিস্ময়কর। যে মানবসেবা ও শিক্ষা-ধর্মের ধারা তিনি জীবনের অন্তিমলগ্নে বেলুড়ে স্থাপন করেছেন তার ভবিষ্যত বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন—"এই বেলুড়ে যে আধ্যাত্মিক শক্তির ক্রিয়া শুরু হয়েছে, তা দেড় হাজার বৎসর ধরে চলবে—তা একটা বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেবে। মনে কোরো না, এটা আমার কল্পনা, এ আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।"

১৯০২ সনের ৪ঠা জুলাই শুক্রবার (২০শে আষাঢ়, ১৩০৯) এই বিপ্লবী মহানায়ক বীরেশ্বর বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে ইহলীলা সম্বরণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভক্তগণ এঁদের সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থই রচনা করেছেন, সে বিষয়ে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই সংক্ষিপ্ত তথ্যপঞ্জীর জন্য স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা', স্বামী গম্ভীরানন্দের 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ', স্বামী সারদানন্দের 'লীলাপ্রসঙ্গ', রোমাঁ রোলাঁর 'Life of Swami Viveckanada', অধ্যাপক শঙ্করী-প্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' ইত্যাদি গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। গ্রন্থকারদের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

২। জগদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ। (জীবনী ৩৪৫ পৃষ্ঠা হতে ৫৯৪ পৃষ্ঠা)।

অচিন্ত্যকুমারের অমৃত লেখনী হতে আর একটি অপূর্ব জীবনী-গ্রন্থ 'জগদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ'। একটি পরম বৈষ্ণব বংশের কুলতিলকের জীবনে ধর্ম ও ব্রহ্ম-পিপাসা কী গভীরভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সেই অভূতপূর্ব ঘটনাবলীর বিচিত্র ও বিস্ময়কর ইতিহাস-সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৭৩ সালের আশ্বিন মাসে। প্রকাশক কলকাতার ডি. এম. লাইব্রেরী। এই গ্রন্থের একটি নূতন সংস্করণ সম্প্রতি গ্রন্থালয় প্রা. লি. প্রকাশ করেছে। এই সংস্করণের পাঠই রচনাবলীতে গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের ঘটনাবহুল জীবনী বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। শুধু অচিন্ত্য-কুমারের জীবনী গ্রন্থের পরিপূরক হিসেবে বিজয়কৃষ্ণের জীবনের বিশেষ বিশেষ পর্ব-গুলির বিশেষ বিশেষ ঘটনা নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হলো।

বেদভাষ্যকার সায়নাচার্যের আদিবাসস্থান তৎকালীন ভারতের শ্রীহট্ট জেলার নবগ্রামে। তাঁর বৃদ্ধ প্রপৌত্র কুবের আচার্য এবং তাঁর স্ত্রী লাভা দেবীর সন্তান বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি অদ্বৈতাচার্য। তাঁর জন্ম হয় মাঘী শুক্লা-সপ্তমী ৮৪১ সালে (১৪৩৫ খ্রীঃ অঃ)। পরবর্তীকালে এই বংশ নদীয়া জেলার শান্তিপুরে বসবাস করেন।

বৈষ্ণব সমাজের এক অবিস্মরণীয় নাম মাধবেন্দ্র পুরী। তাঁরও আদি বাসস্থান

শ্রীহট্টের এক অখ্যাত গ্রাম পূর্নপাটে। পুরী-মহারাজ এককালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে তীর্থ পর্যটন করে দাক্ষিণাত্যে উপনীত হলেন। কমলাক্ষ মিশ্রও (শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্যের আদি নাম) তীর্থ পর্যটন উপলক্ষে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন এবং সেখানে পুরী-মহারাজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সেইখানেই প্রথম পুরী-মহারাজ ভবিষ্যতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কথা কমলাক্ষ মিশ্রকে বলেন। পরবর্তীকালে এই পুরী মহারাজই শান্তিপুরে এসে কমলাক্ষ মিশ্রকে দীক্ষা প্রদান করেন। তাঁর দীক্ষিত নাম হয় অদ্বৈতাচার্য।

পুরী-মহারাজের ভবিষ্যৎ-বাণী সফল হয়। অদ্বৈতাচার্যের বয়স যখন বাহান্ন তখন নিমাই-রূপে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয় শ্রীধাম নবদ্বীপে, ৮৯৩ সালে (১৩৮৭ সনে) দোল পূর্ণিমার সন্ধ্যায়। কিন্তু মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করে বৃন্দাবনে গেলেন। অবশ্য নিত্যানন্দ মহাপ্রভু একবার তাঁকে নিয়ে এলেন শান্তিপুরে। কথিত, আচার্যের গৃহে মহাপ্রভু মাত্র দশদিন বসবাস করেন, তারপরেই যাত্রা করলেন নীলাচলে। এই ব্যবহারে অদ্বৈতাচার্য অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হলেন এবং এই বলে মহাপ্রভুকে অভিশম্পাত দিলেন যে, দশ-পুরুষ পরে তাঁকে আবার জন্ম নিতে হবে আচার্য-গৃহে। এই বংশের দশম-পুরুষই জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

বিজয়কৃষ্ণের পিতা আনন্দকিশোর ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। পর পর দুবার বিবাহ তাঁর নিষ্ফল হয়। নিঃসন্তান দ্বিতীয় স্ত্রীর যখন মৃত্যু হয় তখন আনন্দকিশোরের বয়স পঞ্চাশের উপরে। তাঁর জ্যেষ্ঠতাত পুত্র প্রভুপাদ গোপীমাধব গোস্বামীর এই সময়ে মৃত্যু হয়। তিনিও ছিলেন নিঃসন্তান। মৃত্যুর দিন তাঁকে অন্তর্জলি করান হয় গঙ্গা তীরে। সেই সময়ে তিনি আনন্দকিশোরকে পুনরায় বিবাহ করবার জন্য অনুরোধ করেন এবং ভবিষ্যৎবাণী করেন যে, এই বিবাহদ্বারা তাঁর দুটি পুত্রসন্তান লাভ হবে। তিনি আরও অনুরোধ করেন যে, দুটি সন্তানের ছোটটিকে যেন তাঁর নিঃসন্তান সহধর্মিনীকে দত্তক দেওয়া হয়।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্তিম অনুরোধ রক্ষার্থে আনন্দকিশোর ১২৪৪ সালের বৈশাখ মাসে তৃতীয়বার বিবাহ করলেন। এবার গৃহে এলেন নদীয়ার শিকারপুরের দহকুল গ্রামের গৌরীপ্রসাদ বাগচি জোয়ারদারের কন্যা স্বর্ণময়ী দেবী। ঐ বছর চৈত্রমাসে তাঁদের প্রথম পুত্রসন্তান ব্রজগোপালের জন্ম হয়। তারপর মাতুলালয়ে দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয় ১৯ শে শ্রাবণ, ১২৪৮ সালে (২রা আগস্ট, ১৮৪১ সন)। ইনিই পরবর্তীকালে আচার্য সদ্‌গুরু শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

১২৫১ সালের বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন রংপুরের জমিদার-শিষ্য মুকুন্দনারায়ণ চৌধুরীর গৃহে ভাগবত পাঠের সময় আনন্দকিশোরের ভাবসমাধি হয়। সেই সমাধি হতে আর তাঁর সম্বিত ফিরে আসে না।

১২৫৩ সালে বিজয়কৃষ্ণের পাঁচ বছর পূর্ণ হলে স্বর্ণময়ী ঝুলন পূর্ণিমার দিনে তাঁকে গোপীমাধব গোস্বামীর সহধর্মিণী কৃষ্ণমণি দেবীকে প্রথামত দত্তক দিয়ে স্বামীর প্রতিশ্রুতি পালন করেন। কিন্তু এই দত্তক প্রদান ফলপ্রসূ হয়নি। বিজয়কৃষ্ণ কৃষ্ণমণিকে ঠিক মাতৃরূপে গ্রহণ করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত স্বর্ণময়ীর পুত্র তাঁর অধিকারেই থেকে যায়।

ঐ বছর ব্রজগোপাল ও বিজয়কৃষ্ণের এক সঙ্গেই হাতে খড়ি হয়। দুই ভাইকেই

অতঃপর শিকারপুরে পাঠশালায় ভর্তি করে দেওয়া হয়। কিন্তু মাতুলালয়ে এই ব্যবস্থা বেশিদিন চলে না। অতঃপর দুই ছেলেকে নিয়ে স্বর্ণময়ী ফিরে এলেন শান্তিপুরে স্বগৃহে। সেখানে ভগবান সরকারের পাঠশালায় দুইভাইকে ভর্তি করে দেওয়া হলো। পাঠ্যাবস্থাতেই মেধাবী ও শ্রুতিধর বিজয়কৃষ্ণের উপর নজর পরে গুরুমশায়ের। কিন্তু ১২৫৩ সালে এই গুরুমশায়ের মৃত্যু হয়।

শান্তিপুর হতে ক্রোশখানেক দূরে পাদ্রি হেজেল সাহেবের বিদ্যালয়। ইংরেজি ও বাংলার সংগে সেই স্কুলে সংস্কৃত বিভাগও ছিল। ব্রজগোপাল ও বিজয়কৃষ্ণ সেই স্কুলে সংস্কৃত বিভাগে ভর্তি হলেন। এই অল্প বয়সেই বিজয়কৃষ্ণের মেধা, স্মৃতিশক্তি ও শিষ্টাচার দেখে পাদ্রি হেজেল সাহেব মুগ্ধ হলেন। বাইবেল পাঠে বিজয়কৃষ্ণের আগ্রহ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সময়ে আর এক পাদ্রি বোমেশ শান্তিপুরে এক স্কুল খুলল। হেজেল সাহেবের স্কুল ছিল দূরে, তাই শান্তিপুরের ছেলেরা এই স্কুলেই ভর্তি হতে লাগল। ছাত্রাভাবে হেজেল সাহেবের স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। বোমেশ পাদ্রির স্কুলে খৃষ্টান ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হতো বলে বিজয়কৃষ্ণ ও তাঁর দাদা এই স্কুলে ভর্তি হলেন না।

প্রায় বছরখানেক এদিকে-ওদিকে কেটে যাবার পরে ১২৫৬ সালে দুভাই ভর্তি হলেন বদনচন্দ্র গুরুমশায়ের পাঠশালায়। এখানেও বিজয়কৃষ্ণের পড়াশুনো বেশিদিন চলল না। অতঃপর তিনি ভর্তি হলেন গোবিন্দ ভট্টাচার্য মশায়ের টোলে। এখানে ব্যাকরণ ও কাব্য পাঠ শেষ করলেন বিজয়কৃষ্ণ। এই টোলে বিদ্যাভ্যাস শেষ করে তিনি তাঁর খুল্লতাত প্রভুপাদ কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী তর্করত্ন মহাশয়ের কাছে প্রথমে সাংখ্য ও পরে বেদান্ত পাঠ আরম্ভ করেন। ১২৫৭ সালের এক শুভদিনে এই তর্করত্ন মহাশয় উপনয়নান্তে বিজয়কৃষ্ণকে গায়ত্রীমন্ত্র প্রদান করেন। উপনয়নের পরেই মাতার নিকট হতে তিনি কুলদীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময় হতেই তাঁর ভিতরে প্রবল ধর্মভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এমনকি তিনি কণ্ঠী, তিলক, শিখা পর্যন্ত ধারণ করেন। গৃহ অধিষ্ঠিত দেবতা শ্যামসুন্দরের সেবা-পূজো তিনি নিজেই আরম্ভ করে দিলেন।

সতের বছর বয়স পর্যন্ত তর্করত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে সাংখ্য ও বেদান্ত অধ্যয়ন শেষ করে, বেদান্ত বিষয়ে আরও অধ্যয়ন করবার জন্য ১২৬৫ সালে তিনি কাশী যাত্রা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর কাশী যাওয়া হলো না, পাটনা হতেই ফিরে এলেন শান্তিপুরে। এই বছরেই তিনি বন্ধু অঘোরনাথ গুপ্তের সংগে কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন।

এই বেদান্ত অধ্যয়নেই তাঁর মনে প্রথম ধর্মবিশ্বাসে সংশয় অস্কুরিত হয়। বেদান্তের 'সোহহং' তত্ত্ব তাঁর ধর্মের ভিত্তিতে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। তিনি ভাবেন, 'ব্রহ্মের সংগে আমি যদি অভিন্নই হই, তাহলে পূজা বা উপাসনার কিইবা প্রয়োজন? পরবর্তীকালে বিজয়কৃষ্ণ লিখেছেন, "যে হিন্দুশাস্ত্র ধর্মের সংরক্ষক, সেই হিন্দুশাস্ত্রই আমার আন্তরিক কুসংস্কারের উন্মূলক হইল। হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আমি ঘোর বৈদান্তিক হইয়া উঠিলাম। তখন সমস্ত পদার্থ ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্ম—এই সত্য বিশ্বাস করিতাম। উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করিতাম না।' ('আমার জীবনে ব্রাহ্মসমাজে পরীক্ষিত বিষয়'—বিজয়কৃষ্ণ)।

বিজয়কৃষ্ণের বয়স যখন আঠারো, তখন শিকারপুরের দহকুল গ্রামের রামচন্দ্র ভাদুড়ীর ছয় বছর বয়স্ক কন্যা যোগমায়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

বিজয়কৃষ্ণের কুলবৃত্তি গুরুগিরি। বেদান্তের 'সোঽহংবাদ' তাঁর মনে হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকলাপের উপরে সংশয় জন্মিয়েছিল। তাই কুলবৃত্তির উপরেও তিনি আস্থা হারালেন। মাতার যুক্তিতর্কও তাঁকে টলাতে পারল না। তিনি ঠিক করলেন কলকাতায় মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়বেন এবং পাঠান্তে ঐ পেশা গ্রহণ করে সংসার চালাবেন। শেষ পর্যন্ত মাতার অনুমতি নিয়েই তিনি কলকাতায় এলেন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবার জন্য। অবশ্য প্রথমেই তিনি সেখানে ভর্তি হতে পারলেন না, কারণ, মেডিকেল কলেজে তখন ইংরেজীর মাধ্যমে একটি বাংলা-বিভাগ খোলা হয়েছিল। ১২৬৭ সালে বিজয়কৃষ্ণ সেই বিভাগেই ভর্তি হলেন।

সমসাময়িককালে বাঙলাদেশে খৃষ্টধর্ম গ্রহণের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। এই সময়ে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের ক্রমশ প্রসার লাভ হয়। বেদের ক্রিয়াকাণ্ড বাদ দিয়ে উপনিষদ্ ও জ্ঞানকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। এই ধর্মের সারমর্ম বিজয়কৃষ্ণকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করে। তিনি ১২৬৮ সালের কোনও এক বুধবার সন্ধ্যায় কলকাতার ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপস্থিত হলেন। সেখানের ভাবগম্ভীর পরিবেশ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ধর্ম ও ব্রহ্ম ব্যাখ্যা বিজয়কৃষ্ণকে এত মুগ্ধ করে যে, প্রতিসপ্তাহেই তিনি ব্রাহ্ম-সমাজে গমনাগমন শুরু করলেন এবং ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেবার জন্য তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে 'সোঽহংবাদ' সম্বন্ধেও তাঁর সংশয়ের নিরসন হয়। এই বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ বলেন, 'উপাস্য আর উপাসক যদি এক হয়ে যান তবে কে কাকে উপাসনা করবে? আর যদি উপাসনাই না করতে পারলাম তবে ব্রহ্মানন্দই বা কি? আর ব্রহ্মোপাসনাও হয় অর্থহীন।' দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মপিপাসিত মনে সিঞ্চন করলেন শান্তিবারি। অবশেষে ১২৬৭ সালে (১৮৬১ খ্রীঃ অঃ) দুই বন্ধু অঘোরনাথ গুপ্ত ও গুরুচরণ মহলানবিশের সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হলেন।

ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে তিনি মালা, তিলক ও শিখা বর্জন করলেন। কিছুকাল পরে উপবীতও ত্যাগ করেন। দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু উপবীত ত্যাগ করেন নি। এই উপবীত ত্যাগ নিয়ে তখন একটি বেশ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ এবং উপবীত ত্যাগের পরে ঐ বছর কোজাগরী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরে গেলেন। মাতার অশ্রুজল সত্ত্বেও বিজয়কৃষ্ণের সঙ্কল্প পরিবর্তন হলো না। শেষ পর্যন্ত মাতা স্বর্ণময়ী তার ধর্মপরিবর্তন মেনে নিলেও বড় ভ্রাতা ব্রজগোপাল কিন্তু মেনে নিলেন না। তিনি সমাজপতিদের এক সভা ডেকে অনুজকে পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু সত্যসন্ধানী বিজয়কৃষ্ণ তাতেও দমলেন না। অবশেষে ১২৬৯ সালের শেষের দিকে ভগ্নিপতি কিশোরীবাবুর পরিবার স্ত্রী সহ কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করলেন।

এই সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটে যাতে বিজয়কৃষ্ণের ডাক্তারি পড়াও অসমাপ্ত থেকে যায়। মিথ্যা ঔষধ চুরির অপবাদে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ চিবার্স সাহেব একটি ছাত্রকে গালি-গালাজ করে। এই নিয়ে বিজয়কৃষ্ণের নেতৃত্বে ছাত্র-ধর্মঘট হয়। এইটিই বোধহয় ভারতে প্রথম ছাত্রধর্মঘট। অবশেষে অবশ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যস্থতায় চিবার্স সাহেবকে দুঃখপ্রকাশ করতে হয় এবং ধর্মঘটও মিটে যায়। ছাত্রগণ ক্লাশে ফিরে

যায়। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ আর ফিরে যান না। তখন মেডিক্যাল কলেজে বিজয়কৃষ্ণের উপাধি পরীক্ষা সমাগত। সেই অবস্থায় তিনি মেডিকেল পরীক্ষা অসমাপ্ত রেখে পাঠ্য জীবন শেষ করেন।

এই সময়ে সংবাদ আসতে থাকে যে, অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু প্রচারক এবং আচার্যের অভাবে এই নবধর্ম প্রসারলাভ করতে পারছে না। ব্রাহ্মধর্মের আর এক কর্ণধার কেশবচন্দ্র সেনের কাছে বিজয়কৃষ্ণ ধর্মপ্রচারকের পদ গ্রহণ করবার বাসনা জানালেন। কেশবচন্দ্র এবং দেবেন্দ্রনাথ নানাপ্রকার উপদেশ দিয়ে ১২৭০ সালের ভাদ্রমাসে বিজয়কৃষ্ণকে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক পদে নিযুক্ত করলেন। নিখিল ভারতবর্ষে তাঁর দ্বারা ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের ইতিহাস এখানে ব্যক্ত করা নিষ্প্রয়োজন। ১২৬৮ হতে ১২৯৪ সাল পর্যন্ত তিনি ধর্মপ্রচারক এবং কলকাতা ও ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদেও নিযুক্ত ছিলেন। এই দীর্ঘ সাতাশ বছরের বিশেষ বিশেষ ঘটনাসকল অচিন্ত্যকুমারের 'জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ' জীবনী-সাহিত্যে পাওয়া যাবে। এই প্রচার বিষয়ে আরও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ (৫ খণ্ড) গ্রন্থে, এবং শ্রীতারিণীচরণ চৌধুরীর 'সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ' গ্রন্থে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, উপবীত ত্যাগ নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের প্রথম হতেই মতানৈক্য হয়। এই বিষয় উপলক্ষ করে কেশবচন্দ্রের ও দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মতানৈক্য হয়। ১২৭১ সালে কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ তাঁদের সমর্থকদের নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ হতে বেরিয়ে এসে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামে এক প্রচার বিভাগ স্থাপন করেন। সমাজের প্রচারকার্য বিভিন্ন জায়গায় বেশ ভালো ভাবেই চলতে লাগল।

ইতিমধ্যে আদিসমাজের রক্ষণশীলগণ নবীনদের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার প্রচার চালাতে লাগলেন। 'যীশুখ্রীষ্ট—ইউরোপ ও এসিয়া' এবং 'গ্রেট মেন' নামে কেশবচন্দ্রের দুটি বক্তৃতার সূত্র ধরে তাঁকে খ্রীষ্টান বলে অপপ্রচার চলতে লাগল। তার উপরে নব্যদলের উপবীত ত্যাগ, বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন ইত্যাদি ঐ অপপ্রচারে ঘৃতাহুতি দিল। ব্রাহ্মধর্ম এবং সমাজের উচ্চ আদর্শ নিয়ে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই সেই ধর্মসংগঠনের অভ্যন্তরে এই পরিণতি দেখে বিজয়কৃষ্ণ বেশ হতাশ হয়ে গেলেন। হিন্দুধর্ম ত্যাগ করবার সময়ে তাঁর মনে যে সংশয় জেগেছিল, আবার সেই সংশয়ের বিপরীত স্রোত তাঁকে ক্রমাগত বিচলিত করতে লাগল। এই সংশয়-ব্যাকুল চিত্তে তিনি ফিরে গেলেন শান্তিপুরে।

১২৭৩ সালের চৈত্রমাসে বৈষ্ণব হরিমোহনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁর কাছে নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করেন। হরিমোহনের অনুরোধে বিজয়কৃষ্ণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ-রচিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' পাঠ করে মনে শান্ত ও অহেতুকী ভক্তিবাদের স্পর্শ পেলেন। হরিমোহনই তাঁকে নিয়ে গেলেন কালনায় ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রমে। এই আশ্রমেই বিজয়কৃষ্ণ প্রথম দেখলেন 'নাম ব্রহ্মের পট'। নবদ্বীপের চৈতন্যদাস বাবাজী ও অন্যান্য বৈষ্ণব প্রভুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর মনে অপূর্ব ভক্তিরসের সঞ্চার হলো এবং মনে প্রশান্তি নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন। এবার তিনি দেবেন্দ্রনাথ পরিচালিত সমাজ এবং কেশবচন্দ্রের পরিচালিত সমাজের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব লক্ষ্য করে প্রীত হয়ে পুনরায় সমাজের প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করলেন।

প্রচার উপলক্ষে ১২৭৫ সালে তিনি ঢাকায় গেলেন। সেইখানেই ভাদ্রমাসে

বিজয়কৃষ্ণের প্রথম কন্যা সন্তোষিনীর জন্ম হয়। তার কিছুকাল পরেই কেশবচন্দ্রের নির্দেশে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন।

১২৭৬ সালের ৭ই ভাদ্র কলকাতায় নববিধান ব্রাহ্মসমাজের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। ঐদিন আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতি একুশজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ১২৭৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ঢাকায় ব্রাহ্মমন্দির স্থাপিত হয়। পূর্বেই কেশবচন্দ্রের অনুরোধে বিজয়কৃষ্ণ ঢাকার সমাজের আচার্যের পদ গ্রহণ করেন। সেখানে নূতন মন্দির প্রবেশ উপলক্ষে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন জাতিধর্ম নির্বিশেষে, এমনকি একজন মুসলমান পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। বলাবাহুল্য, বিজয়কৃষ্ণের ধর্মজীবনের অনুপ্রেরণাই এই সাফল্যের মূলে।

এর পরেই বিজয়কৃষ্ণ নামলেন সারা ভারতে পাঞ্জাব হতে অন্ধ্র পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম প্রচার কার্যে। এই পর্যটনের মাঝে তিনি একবার কাশীতে এলেন। অন্ধ্রপ্রদেশের নরসিংহ রাওয়ের পুত্র শিবরাম। তিনি ছিলেন চিরকুমার। বাহান্ন বছর বয়সের সময়ে তাঁর মাতার মৃত্যু হলে তিনি সেই যে শ্মশানে গেলেন, আর ফিরলেন না গৃহে। ওখানেই গুরুলাভ হয়। কথিত, তিনি ২৭৮ বছর জীবিত ছিলেন। তৈলঙ্গ দেশের সাধু বলে তাঁর নাম হলো তৈলঙ্গস্বামী। পরবর্তী জীবনে তিনি ছিলেন কাশীবাসী। এই 'চলন্ত বিশ্বেশ্বরের' কৃপা লাভ করলেন বিজয়কৃষ্ণ। এই স্বামীজী তাঁকে উপাসনার, দেহ-শুদ্ধির এবং আপদনিবারণের তিনটি মন্ত্র প্রদান করেন। কিন্তু দীক্ষা প্রদান করেন না, বলেন, তাঁর গুরু নির্দিষ্ট আছেন এবং যথাকালে তিনিই দীক্ষা দেবেন।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচার এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রসারকল্পে বিজয়কৃষ্ণের অবদান অতুলনীয়। বস্তুতপক্ষে ব্রাহ্মধর্মের প্রথমাবস্থায় সর্বপ্রকাশ ক্লেশ ও দারিদ্র্য বরণ করে কেবলমাত্র ধর্মপিপাসায় তিনি যেভাবে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন তেমনটি আর কেউ করেছিলেন বলে মনে হয় না। তথাপি বিবিধ বিষয়ে এবং ধর্মানুশীলনের প্রণালী নিয়ে শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ও সতীর্থদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁর মতান্তর হয়েছে। এমনি এক উপলক্ষে তিনি ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে ইস্তফা দিলেন।

ঐ বছর কার্তিক মাসে কেশবচন্দ্র ইংলন্ড থেকে কলকাতায় ফিরে 'ভারত সংস্কার সভা' স্থাপন করেন। তিনি বিজয়কৃষ্ণকে কলকাতায় এসে সেই সভাতে যোগদান করে তাঁর আরব্ধ কাজে সহযোগিতা করতে আহ্বান করেন। ঢাকায় থাকাকালীন ১২৭৭ সালের ২৯ অগ্রহায়ণ বিজয়কৃষ্ণের একমাত্র পুত্র যোগজীবনের জন্ম হয়। তার কিছুদিন পরেই তিনি সপরিবারে কলকাতায় ফিরে এলেন।

কলকাতায় ফিরে বিজয়কৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের কর্মসূচীতে যোগ দেন। ধর্মপরিবার সংগঠনের উদ্দেশ্যে 'ভারত আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হলো বেলঘরিয়ার এক উদ্যান বাড়িতে। নানা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে এই সময়ে বিজয়কৃষ্ণ তীব্র শূলরোগে আক্রান্ত হলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ চিবার্স সাহেবের শরণাপন্ন হতে হলো। ডাক্তার তাঁকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে মরফিয়া সেবনের ব্যবস্থা করে দীর্ঘ ব্যবস্থাপত্র দিলেন। মরফিয়া ব্যবহারে রোগের কিছু উপশম হলো বটে কিন্তু নির্মূল হলো না।

অসুস্থ শরীর সত্ত্বেও ধর্মপ্রচার বাধা প্রাপ্ত হলো না। দেশের নানা জায়গায় তিনি ধর্মজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণের মন জয় করলেন। ১২৭৯ সাল পর্যন্ত তাঁর বিরামহীন প্রচারকার্য চলতে থাকে।

১২৭৯ সালের ভাদ্রমাসে কেশবচন্দ্রের সংগে ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রথম দর্শন হয়। দিনে দিনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি কেশবচন্দ্রের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই ঘনিষ্ঠতার ফলে কেশবচন্দ্রের জীবনে বৈরাগ্যসাধনার সূত্রপাত হয়। এই ধর্মবৈরাগ্য বিজয়কৃষ্ণের মধ্যেও সংক্রামিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করবার পরেও কিন্তু বৈষ্ণবধর্মের মূল তত্ত্ব তাঁর হৃদয়ে ফল্গুধারার মতো বয়ে চলেছিল। এই বৈরাগ্যসাধনায় সেই বিশ্বাস তাঁর ভিতরে ও বাইরে ক্রমশ পরিস্ফুরিত হতে লাগল।

পারিবারিক জীবনে শুধু অনাহার-অনটনই নয়, নানাভাবে দুঃখ-দৈন্য তাঁকে বারে বারে আঘাত করেছে, কিন্তু তিনি কোনপ্রকারেই বিচলিত হন নি। ১২৮০ সালে তাঁর চতুর্থ সন্তান কন্যা শান্তিসুধার জন্ম হয়। ইতিমধ্যে প্রথমা কন্যা সন্তোষিণীর মৃত্যু হয়েছে। দ্বিতীয় কন্যা এবং যোগজীবনের মরণাপন্ন অসুখও বিজয়কৃষ্ণকে বিচলিত করতে পারেনি।

১২৮২ সালের ফাল্গুন মাসে কেশবচন্দ্রের নির্দেশে এক বৎসর বিজয়কৃষ্ণ 'ভক্তি-সাধন' ব্রত পালন করেন। ১২৮৩ সালের ফাল্গুন মাসে এই ব্রত সমাপনান্তে কেশবচন্দ্র আহ্বান করে বললেন, 'বড়ই আনন্দের কথা, তুমি ভক্তিযোগে সিদ্ধ হয়েছ।' ১২৮৪ সালের ভাদ্রমাসে বিজয়কৃষ্ণ যশোহরের বঘ-আঁচড়া গ্রামে গিয়ে নির্জন-বাস করবেন বলে মনস্থ করলেন। সেখানকার ব্রাহ্মগণ বিজয়কৃষ্ণকে পেয়ে আনন্দে মগ্ন হয়ে গেল। তিনি কিন্তু একবছরের জন্য আবার একটি ব্রত গ্রহণ করলেন। প্রাতঃকালে একজোড়া করতাল নিয়ে কীর্তন গেয়ে তিনি ভিক্ষান্ন গ্রহণ করতেন। একজনের উপযোগী ভিক্ষা পেলেই বাড়ি ফিরে এসে স্বপাকে রান্না করে আহার করতেন। দিনরাত্রির বাকি অবসর সময়ে নির্জনে তিনি ভক্তি-সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন।

এই সময়ে ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজে আবার ঘোরতর এক নূতন সমস্যার উদ্ভব হলো। ব্রাহ্ম-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হলে সেই আইন অনুসারেই ব্রাহ্ম পরিবারে বিবাহাদি হতো। কিন্তু সেই বিধি ভংগ করে কেশবচন্দ্র নিজেই তাঁর নাবালিকা কন্যার বিবাহ দিলেন কুচবিহার রাজবংশে। এই নিয়ে প্রায় সম্পূর্ণ ব্রাহ্মসমাজ কেশব-বিরোধী হয়ে উঠল। কিছু কিছু ব্রাহ্ম আবার কেশবচন্দ্রকে অবতার বলে মনে করতেন এবং সেই প্রকারে তাঁকে পূজা করতেও দ্বিধা করতেন না। বিজয়কৃষ্ণ ঘোর প্রতিবাদ করে বলতেন, একমাত্র ব্রহ্মই উপাস্য, মনুষ্য নহে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের ভাংগনটি সম্পূর্ণ হয় ১২৮৫ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ। এইদিন কেশবচন্দ্র-বিরোধী ব্রাহ্মগণ দেবেন্দ্রনাথের অনুমোদনক্রমে কলকাতার টাউন হলে এক বিরাট সভা করে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বিজয়কৃষ্ণ এই সমাজের অন্যতম আচার্য ও প্রচারক পদে বৃত হলেন। পূর্ববাঙলা ব্রাহ্মসমাজ এই নূতন সমাজভুক্ত হলো। ঢাকার ও পূর্ববাঙলার ব্রাহ্মদের বিশেষ অনুরোধে বিজয়কৃষ্ণ পুনরায় সেই সমাজের আচার্যের পদ গ্রহণ করে সপরিবারে ঢাকায় গেলেন জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে। এই সময় হতে ১২৮৭ সালের অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত বিজয়কৃষ্ণ পূর্ববাঙলা ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর এই অবসর গ্রহণকালে পূর্ববংগ ব্রাহ্ম-সমাজের কার্যনির্বাহক সমিতি এক প্রস্তাব গ্রহণ করে বলে: 'তিনি আচার্য নিযুক্ত থাকাতে গত দুই বৎসরকাল এখানকার সমাজের কার্য এমত উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল যে, তাহা সভামাত্রই বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় যে তাঁহার স্থান গ্রহণ করেন এমত লোক এখানে দেখা যায় না।'

কলকাতায় ফিরে এসে বিজয়কৃষ্ণ প্রথমে ভাড়াটে বাড়িতে এবং পরে ব্রাহ্মসমাজের 'প্রচার নিবাসে' বসবাস করতে থাকেন। এই সময়ে বাঙলার বিভিন্ন স্থানে এবং বিহারের নানাস্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে তিনি খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

এই বৎসর মাঘোৎসবের উপাসনা সভায় এক বিচিত্র ঘটনা ঘটে গেল। উপাসনা পরিচালনার সময়ে ভাবোম্মত্ত হয়ে বিজয়কৃষ্ণ 'মা' 'মা' বলে আত্মহারা হয়ে গেলেন। উপাসনা সভার সকলেই অভিভূত, কারো চোখ আর শুষ্ক নয়। তিনি এতই মাতৃভাবাবেগে অভিভূত হলেন যে, সেদিন প্রার্থনার কাজ আর পরিচালনা করতে পারলেন না। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কার্য সমাধা করলেন।

এইরূপে মনের অবস্থা সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণ বলেছেন: '...ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয়ে নবজীবন লাভ করিয়া উদ্ধার হইয়া গেলাম। কিন্তু আমার প্রাণের পিপাসা তাহাতেও মিটিল না; কারণ তখনও আমার প্রাণের প্রিয়তম দেবতাকে হৃদয়ের মধ্যে বসাইয়া পূজা করিতে পারিতাম না।...'

এই ঘটনার পর হতেই বিজয়কৃষ্ণের মনে হতে লাগল, একজন সিদ্ধ পুরুষ কৌলগুরু হয়ে তাঁকে দীক্ষা না দিলে তিনি তাঁর প্রাণের ধর্ম ও ব্রহ্মপিপাসা নিবারণ করতে পারবেন না। জীবনের বিভিন্ন সময়ে স্বপ্নের ভিতর বা জাগ্রত অবস্থাতেও বিজয়কৃষ্ণের দিব্যদর্শন-লাভ হয়েছে। এই সময়ে তিনি পুনঃপুন স্বপ্নে অলৌকিক সাধুসংগ লাভ করতে লাগলেন। বিশেষ করে তিনি যখন ধর্মপ্রচারে উপলক্ষে গয়ায় গিয়েছিলেন তখন নানাপ্রকার অলৌকিক ঘটনা ঘটতে লাগল। কন্যা প্রেমমালার নিদারুণ অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তিনি ১২৮৮ সালের ভাদ্রমাসে প্রচার কার্য হতে কলকাতায় ফিরে আসেন। কিন্তু ফিরে এসে জানলেন যে, পূর্বদিনেই কন্যার মৃত্যু হয়েছে।

এই সময় হতেই বিজয়কৃষ্ণের ধর্মজীবনে এক আমূল পরিবর্তনের সূচনা হতে থাকে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম হলেও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে এসে ধর্মজীবনের মূলে সত্যাদি বিষয়ে এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করেন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে বিজয়কৃষ্ণের প্রথম ঠাকুর-দর্শন লাভ হয়। তিনি পূর্বে হতেই শ্রীরামকৃষ্ণের সংবাদ পেয়েছেন, এবং তাঁর অলৌকিক দর্শন লাভও ঘটেছে বিজয়কৃষ্ণের জীবনে। শ্রীরামকৃষ্ণ কী গভীরভাবে বিজয়কৃষ্ণকে অভিভূত করেছিলেন, একটি মাত্র নিদর্শন দিলেই তা বুঝা যাবে। ১৮৮৩ সনের ২৫শে অক্টোবর শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে বিজয়কৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন। সঙ্গে কয়েকটি ব্রাহ্মভক্তও ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ, লাটু প্রভৃতি অনেক ভক্তও সেখানে উপস্থিত। বিজয়কৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন ঠাকুরকে। তারপর বললেন, "কি বলবো। দেখছি, যেখানে এখন বসে আছি, এখানেই সব। কেবল মিছে ঘোরা। কোন কোন জায়গায় এঁরই এক আনা কি দুই আনা, কোথাও চারি আনা, এই পর্যন্ত। এখানেই পূর্ণ ষোল আনা দেখছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) দেখ, বিজয়ের অবস্থা কি হয়েছে। লক্ষণ সব বদলে গেছে, যেন আউটে গেছে। আমি পরমহংসের ঘাড় ও কপাল দেখে চিনতে পারি। বলতে পারি, পরমহংস কি না।

...বিজয় (হাত জোড় করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) বুঝেছি আপনি কে! আর বলতে হবে না।

...এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে পতিত হইলেন ও নিজের বক্ষে তাঁহার চরণ

ধারণ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ঈশ্বরাবেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন।" ('কথামৃত' ১।১৬।৩)।

এই সময় হইতেই গুরুলাভ ও দীক্ষা গ্রহণের জন্য বিজয়কৃষ্ণ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েন। যখনই তাঁর কোনও সাধু-মহাপুরুষের সংগে সাক্ষাৎ লাভ হয় তখনই তিনি তাঁর কাছে দীক্ষা লাভের অভিলাষ ব্যক্ত করেন। কিন্তু সকলেই বলেন, তার গুরু ঠিক আছে এবং সময়কালে তাঁর দেখা মিলবে।

এমনি করে ১২৯০ সালের আষাঢ়-শ্রাবণ মাস পর্যন্ত কেটে গেল। এই সময়ে তিনি গয়ায় রঘুবর দাস বাবাজীর আশ্রমে সাধন-ভজন নিয়ে অবস্থান করছিলেন। ১২৮৯ সালে ব্রাহ্মগণ গয়ায় মাঘোৎসবের আয়োজন করলেন। উৎসবে আচার্যের কাজের জন্য বিজয়কৃষ্ণকে আহ্বান করা হলো। কিন্তু উৎসবে উপাসনা বেদীতে বসে তাঁর এক অদ্ভুত উপলব্ধি হলো, তাঁর শরীর যেন ক্রমশ অবশ হয়ে আসতে লাগল। তিনি আর উপাসনা পরিচালনা করতে পারলেন না।

১২৯০ সালের ভাদ্রমাসে বিজয়কৃষ্ণের বহুদিনের গুরুলাভের আশা পূর্ণ হয়। এই সময়ে এক অদ্ভুত পরিবেশে গয়াতেই এক আশ্চর্য যোগবিভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষের সঙ্গে এক শুভলগ্নে সাক্ষাৎ হয়—তিনি ব্রহ্মানন্দ পরমহংস। তিনি সুদূর মানস সরোবর থেকে এসেছেন বিজয়কৃষ্ণকে দীক্ষা দেবার জন্য। দীক্ষান্তে ব্রহ্মানন্দজী আবার অন্তর্ধান করলেন। তারপর থেকে মাসাধিককাল রঘুবরদাস বাবাজীর আশ্রমেই চলল তাঁর ধ্যান ও সাধনা একান্তভাবে। মাসখানেকের মধ্যেই আবার ব্রহ্মানন্দজী হঠাৎ বিজয়কৃষ্ণকে দর্শন দিয়ে বললেন যে, কাশীধামে গিয়ে হরিহরানন্দ সরস্বতী মহারাজের কাছে তাঁকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে। সেই মত তিনি কাশী গেলেন এবং হরিহরানন্দ মহারাজের কাছে অকপটে পূর্বজীবনের বৃত্তান্ত বললেন। সব কথা শুনে তিনি বললেন, 'তোমাকে সন্ন্যাস দেবার জন্যই আমি কাশী এসেছি। তোমার এখানকার অবস্থা পরমহংসদেরও দুর্লভ।' ১২৯০ সালের আশ্বিন মাসে বিজয়কৃষ্ণের বিরজাহোমান্তে সন্ন্যাসদীক্ষা হয়। তাঁর সন্ন্যাস- আশ্রমের নাম হয় 'স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী'।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর বিজয়কৃষ্ণ ঠিক করেছিলেন যে, আর তিনি সংসারে ফিরবেন না। কিন্তু গুরু পরমহংসজী প্রকাশিত হয়ে তাঁকে আ[illegible] করেন, 'যেমন ছিলে তেমনি গিয়ে সংসারের কাজ করতে হবে, অনেক কাজ বাকী আছে।' গুরুর নিকট হতে এইপ্রকার উপদেশ পেয়ে তিনি আবার সংসারমাঝে ফিরে এলেন।

দীক্ষা গ্রহণ করা সত্ত্বেও কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের সংগে যোগসূত্র তিনি সম্পূর্ণ ছিন্ন করলেন না। ১২৯৩ পর্যন্ত সেই একই প্রকারে সমাজের প্রচারকার্য চলতে লাগল। আশ্চর্য এই যে, যাঁরা পূর্বে হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে কেহ কেহ বিজয়কৃষ্ণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করলেন। তাঁর অনুসৃত ধর্মজীবনের সংগে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ক্রমশই মতানৈক্য বেড়ে যেতে লাগল। অবশেষে ১২৯৪ সালে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সংগে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন।

তারপরে ১৩০৬ সালে তাঁর মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত জগদ্গুরু বিজয়কৃষ্ণ সার্বভৌম ধর্মের আশ্রয়ে দিব্যলীলায় অভিভূত ছিলেন। তাঁর সেই গুরুলীলা অচিন্ত্যকুমার তাঁর জীবনীতে অপূর্বভাবে ব্যক্ত করেছেন। এখানে তাঁর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শেষের কয়েক বছর তিনি বিভিন্ন স্থানে পরিক্রমা করেন এবং কোন কোন স্থানে

আশ্রম প্রতিষ্ঠিতও হয়। শেষের কবছর তিনি শ্রীক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তমধাম পুরীতে অবস্থান করেন। সেখানেই ১৩০৬ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রি নয়টা বিশ মিনিটের সময়ে সদ্গুরু বিজয়কৃষ্ণ ইহলীলা সম্বরণ করেন।

\+ + +

উক্ত সংক্ষিপ্ত তথ্যপঞ্জী রচনার্থে যেসকল গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি তাঁদের সকলের কাছেই কৃতজ্ঞতা জানাই। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও মুদ্রণ বিভ্রাটের জন্য রচনাবলীর এই খণ্ডটি প্রকাশ করতে অস্বাভাবিক দেরি হলো, সেইজন্য প্রকাশক সকল সুধী পাঠকবৃন্দের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। এই খণ্ডের মুদ্রণ, প্রুফ্ দেখা এবং নানা বিষয়ে সর্বশ্রী দুলাল পর্বত, মুরলীধর ঘটক, বিপুল সেনগুপ্ত এবং আনন্দরূপ চক্রবর্তী বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। সন্দেহ নেই, সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। সেইজন্য সম্পাদক ক্ষমাপ্রার্থী।

নিরঞ্জন চক্রবর্তী

পরিশিষ্ট

অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

প্রথম হতে নবম (এক) খণ্ড পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র

উপন্যাস ও উপন্যাসিকা ॥

বেদে	১
কাকজ্যোৎস্না	১
প্যান্ (অনূদিত)	১
আকস্মিক	২
বিবাহের চেয়ে বড়	২
প্রাচীর ও প্রান্তর	৩
প্রথম প্রেম	৩
দিগন্ত	৩
মুখোমুখি	৩
জননী জন্মভূমিশ্চ	৪
ইন্দ্রাণী	৪
তৃতীয় নয়ন	৪
ছিনিমিনি	৪
তুমি আর আমি	৪
ডাউন দিল্লি এক্সপ্রেস	৪
বাঁকা লেখা (বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে সম্মিলিত)	৪

গল্প, কাহিনী ও গল্প সংকলন ॥

গল্পগুচ্ছ (১২টি অ-গ্রন্থভূক্ত গল্প)	১
অনূদিত গল্প (২টি)	১
টুটাফুটা (৬টি গল্পের সংকলন গ্রন্থ)	২
ইতি (৫টি গল্পের সংকলন গ্রন্থ)	২
কৈশোরক (অ-গ্রন্থভূক্ত ৭টি সংকলিত গল্প)	২
অধিবাস (৮টি গল্পের সংকলন গ্রন্থ)	৩
সংকলন (অ-গ্রন্থভুক্ত ৬টি গল্প)	৩
নাটিকা (মুক্তি এবং কেয়ার কাঁটা একাঙ্কিকা)	১

প্রবন্ধ ও আলোচনা ॥

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	২

পত্র ও পত্র পরিচিতি ॥

বুদ্ধদেব বসু—অচিন্ত্যকুমারকে	৪

তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থ পরিচয় ॥ প্রতি খণ্ডে

উপন্যাস ও উপন্যাসিকা ॥

গল্প, কাহিনী ও গল্প সংকলন ॥

প্রবন্ধ ও আলোচনা ॥

পত্র ও পত্র পরিচিতি ॥